ভারত সাহিত্য গ্রন্থমালা

অমৃতের সন্তান

গোপীনাথ মহান্তি

সূচনা : অন্নদাশঙ্কর রায়

ভূমিকা : হরেকৃষ্ণ মহতাব

অনুবাদ করেছেন

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার



সাহিত্য অকাদেমী

নিউ দিল্লী

Gopinath Mohanty's Oriya Novel

Amritara Santana

Translated into Bengali by

Sudhakanta Raichaudhuri & Jyotirindramohan Joardar

Sahitya Akademi, New Delhi, ১৯৪৮

সাহিত্য অকাদেমী

রবীন্দ্র ভবন, ফিরোজ শাহ্ রোড, নিউ দিল্লী-১

ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯

২১, হ্যাডোস রোড, মাদ্রাজ-৬

মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বোধি প্রেস। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬

উপহার

সংসারের জঞ্জালের গরল যে কণ্ঠে ধরে

দেয় অমৃত

যার বিশ্বাস সাহস ও সাধনাতেই সম্ভব হয় আমার সাহিত্য

উননের আগুনের কাছে তপস্যানিরতা

সেই আমার স্ত্রীকে

উপহার দিলাম।

গ্রন্থকার

সূচনা

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মহান্তিব ওডিয়া উপন্যাস "অমৃতর সন্তান" সাহিত্য অকাদেমীর পুরস্কার পেয়ে ভারতবিখ্যাত হবার পরে তাব হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়-চৌধুবীব উপর তাব বাংলা অনুবাদেব ভার পড়ে। সুধাকান্তদা ওডিয়া জানতেন না, কিন্তু হিন্দী জানতেন হিন্দীভাষীদেব মতো। সুতরাং তিনি মূল ওডিয়া থেকে অনুবাদ না কবে হিন্দী অনুবাদ থেকেই বাংলা অনুবাদ করেন। শান্তিনিকেতনেব অধ্যাপক কুঞ্জবিহাবী দাস ও অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ মিশ্র মূল গ্রন্থখানি তাঁকে পড়ে শোনান ও তাঁব অনুবাদ শোনেন। সুধাকান্তদা লক্ষ্য কবেন যে হিন্দী অনুবাদ আক্ষরিক নয়। আমাব পরামর্শে তিনি মূলেব অনুসবণ কবেন। কিন্তু স্বয়ং ওডিয়া না জানার ফলে তাঁব অনুবাদও আক্ষবিক হয না। অথচ চমৎকাব বাংলা গদ্য। অনুবাদ যাতে নিখুঁৎ হয় তাব জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে পবিশ্রম কবেন। এত পবিশ্রম আর কোনো অনুবাদককে কবতে দেখিনি।

গোপীনাথের মূল বচনা কন্ধ জাতির উপভাষার স্বাদে ভবপুব। কন্ধদেব সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়ে তিনি তাদেব জীবনকে তাদেবি মতো করে ফুটিয়েছেন। সাধু বাংলা, কথ্য বাংলা, কোনো প্রকার বাংলায় তাঁর মনের মতো অনুবাদ সহজ নয়। সুধাকান্তদার অনুবাদ পড়ে তিনি বিস্তর পরিবর্তন কবতে চান। তাঁব তত্ত্বাবধানে শ্রীমান্ জ্যোতিবিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার দায়িত্ব নেন। জ্যোতিবিন্দ্র ছেলেবেলা থেকে ওড়িশায় মানুষ। ওডিয়া তিনি ভালোই জানেন। আব বাংলা তো তাঁর মাতৃভাষা। বাংলা লেখায় হাতও আছে, আমি তাব নমুনা দেখেছি। পবিবর্তিত অনুবাদ মূল লেখকেব অনুমোদন পেয়েছে। গোপীনাথ যে কি বকম খুঁতখুঁতে লেখক তা আমি জানি। তা ছাড়া কন্ধ জাতির উপভাষাকে সাহিত্যে আনা কী যে কঠিন তাও আমার অজানা নয়।

কন্ধদেব সঙ্গে আমাব শৈশবের সম্পর্ক অতি অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে।

ঈশ্বরার মা ছিল আমার দাই। গড়জাতেই আমার জন্ম। গোপীনাথ যে কন্ধদের কাহিনী লিখেছেন এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। সুধাকান্তদা তো তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিশনারীর মতো ব্রত নিয়ে তিনি এই অনুবাদ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রও আমার প্রিয়জন। এঁদের সকলের শ্রম সার্থক হবে বইখানি যদি বাঙালী পাঠকের ভালো লাগে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভূমিকা

ভারতীয় জনসাধারণের যে অংশটিকে আদিবাসী বলা হয় তাদের মধ্যে কেউ যদি কখনো বসবাস করে থাকেন তিনি নিশ্চয় বুঝে থাকবেন আদি-বাসীরা কত সহজ সরল ও অকপট। সেই কারণে কেবল এদেরই বলা যেতে পারে 'অমৃতের সন্তান' যা না কি এই উপন্যাসের নাম।

সরকারী কর্মজীবনের সূত্রে নানা উপলক্ষে গোপীনাথ মহান্তির এই সব অমৃতের সন্তানদের নিকট সংস্রবে আসবার সুযোগ ঘটেছে। এই জন্যই এদের জীবনযাত্রা বিষয়ে প্রামাণিক বর্ণনা দেবার যথোচিত যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর এই উপন্যাস বাস্তবপক্ষে ওড়িশার দক্ষিণ অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনালেখ্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সভ্যতার অসমান বিকাশের ফলে যারা অন্য অন্য স্বদেশবাসী ভাইদের কাছ থেকে বহু শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে আছে, সেই সব লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী লেখক তাঁর শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ইতিপূর্বে এই অন্তরাল ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি ওদিকে কখনো পৌঁছাত না বললেই চলে। অথচ আমাদের এই ওড়িশায় অশোকের দুটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে রাজকর্মচারীদের প্রতি সম্রাটের অনুশাসন ছিল যেন আদিবাসীদের সুখ সুবিধার প্রতি তাঁরা সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এই সব অনুশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যেন স্মরণ করিয়ে দেয় যে সভ্যজগতের আওতার বাইরে যারা পড়ে আছে, তাদের সদ্ধর্ম বা প্রকৃত সভ্যতার পথে আনবার দায়িত্ব পালনে আজো ত্রুটি রয়ে গেছে। গোপীনাথ মহান্তির এই উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে অশোকের সেই সুমহতী বাণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় পাঠকসমাজ জানবার সুযোগ পাবেন ওড়িশার আরণ্যক অঞ্চলে তাদের স্বদেশবাসী একদল ভাই কেমন ভাবে তাদের জীবনযাপন করে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে সাহিত্যকৃতির দিক থেকে এই উপন্যাস ওড়িয়া সাহিত্যের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কি ভাষায় কি বিষয়বস্তুতে পরস্পরের সম্পূরক এমন সার্থক রচনা কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এই উপন্যাসের সমালোচনায় কিছু যদি বলতেই হয় তা হলে হয় তো এইটুকুই বলা চলে

যে বর্তমান কালের ব্যস্ত-বিব্রত জীবনের পক্ষে গ্রন্থের পরিধি কিছু যেন বেশী। এই মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা মেনে নিয়েও বলব যে আমার মতে 'অমৃতের সন্তান' বর্তমান কালে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সাহিত্য অকাদেমী এ-গ্রন্থকে যে সাদর স্বীকৃতি দিয়েছেন তা এর সর্বথা প্রাপ্য। অকাদেমীর আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই উপন্যাস হয় তো ওড়িয়াভাষী পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। জাতির এক অংশ বিষয়ে অন্য অংশের জ্ঞান যাতে বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে যাতে সমগ্র দেশে ঐক্য বোধের বিকাশ ঘটে—সে জন্য সাহিত্য অকাদেমী যত্নবান হয়েছেন। তাঁদের এই সাধু প্রয়াস আমি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি।

ভুবনেশ্বর

হরেকৃষ্ণ মহতাব

॥ এক ॥

কোন সুদূর অতীতের এই কন্ধ জাতি। তাদের পিতৃপুরুষের রাজ্য ছিল নিবিড় অরণ্যে। সেইখানে চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে সরবু সাঁওতার গ্রাম। সে কন্ধ। তার ভাষা অতি প্রাচীন কুভি। তার গোত্র মিণিআকা। মানুষের আদিম শস্য পাহাড়তলির যে শ্যামা ধান, তারই নাম মিণিআকা। গ্রাম মিণিআপায়ু।

সরবু সাঁওতা গ্রামের কুলবৃদ্ধ, সে গাঁয়ের মাথা, সর্দার, সব— তাই সে সাঁওতা। তার গোষ্ঠীতে পাঁচ শ ঘর কন্ধ, এতগুলি বীরের মুকুটমণি সে সরবু সাঁওতা।

সে রাজা নয়, সে প্রজা। তবু সে কন্ধদের সর্দার, সাঁওতা। কৌপীন পরে থাকে, মাথার তামাটে চুল ফুরফুর করে ওড়ে, কশ বেয়ে অবিরাম তামাক পাতার রস গড়ায়। তবু সে সর্দার, যাকে বাঁচায় সে বাঁচে, যাকে মারে সে মরে। কন্ধদের ধারণা প্রজা দরিদ্র হলেও রাজার চেয়ে আভি-জাত্যে উঁচু। রাজা ছোট ভাই, কন্ধ বড ভাই, প্রজা বড় ভাই। বড ভাই ঘোড়ায় চডবার জন্য কঞ্চি ভেঙে আনতে গিয়েছিল, ছোট ভাই ঘোড়ার পিঠে চেপে দে ছুট! সেইদিন থেকে সে রাজা। ঠক ছোট ভাই, বড ভাইয়ের ন্যায্য প্রাপ্য কেড়ে নিয়ে সে যে সিংহাসনে চেপে বসেছিল। বড় ভাই প্রজা, বড ভাই কন্ধ, বড় ভাই সরবু সাঁওতা ছোট ভাই রাজার শত্রুতাকে ক্ষমা করতে শিখেছে, ছোট ভাইকে কম ভালবাসে না সে। মালদেশের পাহাড়ের মতো উঁচু, আকাশের মতো উদার, সরল কন্ধ ভাই।

দিন বয়ে গেছে। কন্ধ ভাই পাহাড়ের উপরে তার ভাঙা কুড়ে ঘরে বসে কাঁদে। তার পিঠে ছেঁকা দেওয়ার দাগ, তার মনে ঘা, পেটে খিদে। কিন্তু সে সহ্য করতে শিখেছে, সর্বংসহা মা দর্তনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্ধ ভাই।

শেষ পৌষের রোদ। আশি বৎসরের বৃদ্ধ সরবু সাঁওতা দরজার সামনে শাল গাছে হেলান দিয়ে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে। মুখোমুখি মস্ত লম্বা লম্বা দুই সারি ঘর, গুনতিতেই তার রাজ্যের হতিশ্রী। কিন্তু এইটুকুই নয়।

চোখ যতদূর যায় ঝিলমিলে পাতলা কুয়াশার মধ্যে উঁচু উঁচু ছুঁচালো পাহাড়, অগণিত ঢেউয়ের মতো, তার তলে তলে দরী, উপত্যকা, সবই তার পূর্ব-পুরুষদের। ঐ ওদিকের লুপ্ত দিগ্বলয়ের ভিতরে গঞ্জামের মাল অঞ্চল। সেখানে কুই-ভাষী কন্ধের বাস, তার পরে আঠারো গড়জাত[১], ছত্তিশ গড়, তারপর মধ্যপ্রদেশের গণ্ডদের দেশ বস্তর, তার পর মাল্যবন্ত গিরির কোইয়া— সবই তার লোক, সব মিলে বিশাল কন্ধদেশ। এইখানেই তার বনেদী পূর্বপুরুষেরা নেচে কুঁদে চলে গেছে, সেও যাবে। সব তার, হোক সে রাজ্যছাড়া, বড ভাই তো!

সরবু সাঁওতা অসুস্থ। বুকে ব্যথা, গায়ে বেদনা। সেকালের বৃদ্ধ সে, সে চলে গেলে থাকবে কেবল ছেলেছোকরার দল। সে তার বয়স হাতড়ে হাতড়ে খুশি হয়। তার কন্ধ দর্শন অনুযায়ী বসে বসে ভাবে, মন্দলোকের আত্মা যদি তার মধ্যে পুনর্জন্ম নিত তবে তো সে শীঘ্রই মরে যেত, কেবল ভাল লোকদের আত্মার পুনর্জন্ম হলেই দীর্ঘ আয়ুলাভ হয়। সে পূব জন্মে ভাল লোক ছিল এই জন্মেও ভাল, এর পরে— অবশ্যই তাব পুনর্জন্ম হবে, সে খুশি হয়। কন্ধ সংস্কৃতির ভাণ্ডার সে, তাতে ভর করেই সে বলে, যায় যাবে, পুরানো হয়ে গেছে এটা— এই অকেজো দেহ, এটাকে ফেলে দিয়ে নতুন করে আবার জন্ম নেওয়া ভাল। সে ভাবে, জন্ম তার আয়ত্তাধীন, তাই দুঃখ নেই।

পাহাড়ী জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সরবু সাঁওতা ভাবছিল আর একবার জন্ম নেবে কিনা। সুন্দর এই পাহাড়ী রাজ্য, এই মালদেশ, অতি সুন্দর নানা বর্ণের পাহাড়ের তলে তলে স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরনা। চারিদিকে হলদে রঙের অলসি[২] ফুলে ভরা। সেই ফুলের মধু নিয়ে মৌমাছিরা দেওয়াল-গুলিতে চাক ঝোলাতে ব্যস্ত। সব সুন্দর।

কিন্তু—

সরবু সাঁওতা ভাবছিল কন্ধের দুর্ভাগ্যের কথা। দিন দিন দুর্ভাগ্য বেড়েই চলেছে। নিচের জমি গেল, কন্ধ উঠল পাহাড়ে। সেখানেও সব পরের, নিজের বলতে কিছুই নেই। এখন শুধু পরের বোঝা, পরের জোয়াল।

১ ব্রিটিশ আমলে উড়িষ্যায় ময়ুর ভঞ্জ, কেউঞ্ঝর, ঢেঙ্কানাল প্রভৃতি কতিপয় বনপর্বত-সমাকীর্ণ করদ রাজ্য ছিল, তাহাদের গড়জাত বলা হইত।

২ তিলজাতীয় তৈলবীজ, niger।

গায়ে ব্যথা লাগে, মনে ব্যথা লাগে। কন্ধের রাজত্ব ঘুচেছে, তার দেশ ছিন্নভিন্ন, হয়তো একদিন মানুষ ভুলে যাবে যে কন্ধ বলে কেউ কোনো দিন ছিল।

বড ভাই সে, কিন্তু চিরদিন কাঙাল। বুড়োরা সব বলত কবে কোন কালে রাম বলে কে একজন রাজপুত্র তাঁর স্ত্রী আর ভাইকে নিয়ে এই বনে পালিয়ে এসেছিলেন। তখনকার দিনে কন্ধদেশে দক্ষিণের সাহু-কারদের ভারি অত্যাচার। পুঁজিবাদীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কন্ধেরা পেল উপযুক্ত সর্দার। প্রাস্কা (হনুমান) গোত্রের হনুকন্ধ আর জাম্বাকা (ভালুক) গোত্রের জাম্ববান কন্ধ তাঁকে সাহায্য করেছিল। অন্যান্য সব গোত্রের কন্ধেরা তাদের সৈন্য হয়েছিল। খণ্ডবিখণ্ড কন্ধগোষ্ঠীদের রামচন্দ্র একত্র করেছিলেন। দীন দরিদ্র মজুর আর চাষী সৈন্য বর্শা খাঁড়া পাথর আর বাঁশ নিয়ে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে উলটিয়ে ফেলেছিল। পরে সেই দরিদ্র নেতা হলেন রাজা, তিনিই আবার সেই পুঁজিবাদী সভ্যতা বসিয়ে দিয়ে গেলেন। গবিব যেখানে ছিল সেইখানে, অচ্ছুত যেখানে ছিল সেইখানে। তাঁর কীর্তি গাইলেন বাল্মীকি (হরিজন জাতিবিশেষ) জাতির রত্নাকর।

রাজা রাজা, প্রজা প্রজা, অবস্থা শোধরাচ্ছে না।

জমি চলে যাচ্ছে, অন্ন চলে যাচ্ছে, জাতি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কন্ধ হয়ে জন্ম নিলে কেবল অপমান বই মান নেই।

সরবু সাঁওতা ভেবে চলেছে। একদিন ছিল যখন কন্ধ রাজা হয়েছিল, যুদ্ধ করত। যুদ্ধের সংকেতের বাজনা আজও আছে, নাচ আছে, যুদ্ধ নেই। কোথায় সেকালের চীৎকার টুণুহায়মু[১]—হাণ[১]—সাত্রি সাদি কিহিমাইঁ মেরিআ[২] সাদি কিহিমাইঁ—শত্রুকে বলি দিচ্ছি, মেরিআকে বলি দিচ্ছি। আর শত্রুকে বলি দেওয়া হয় না, মেরিআকে বলি দেওয়া হয় না। দর্মু[৩] উপোসী রয়েছে, দর্তনি[৪] উপোসী রয়েছে। কন্ধের শক্তি নেই যে শত্রুকে মেরিআ করে কেটে দুই উপোসী দেবতাকে শান্ত করে।

১ ওড়িয়া ও অন্য কোন কোন ভারতীয় ভাষার ন্যায় কন্ধের কুভি বা কুই ভাষায় 'ণ'-এর উচ্চারণ মূর্ধন্য।

২ নরবলির জন্য নির্বাচিত মানুষ। ৩ ধর্ম দেবতা। ৪ ধরিত্রী মাতা।

গাঁ শুনশান। সরবু সাঁওতা একা পড়ে আছে। দর্ভনি মাতার পূজা আরম্ভ হয়েছে. গাঁয়ের লোক সবাই গাঁয়ের মাথায়।

এই পৌষের শেষ। এই পৌষের রোদে মহুয়ার মদের স্বাদ আর নেশা। রোদের ঝাঁজে ঝিমুনি লাগে, পাতলা কুয়াশায় ভেসে চলে ছায়া— অতীতের আর ভবিষ্যতের। ভেবে ভেবে বুড়োর চোখ ঢুলে আসে।

গাঁয়ের মাথায় ঝাকর দেবতাব উপবন থেকে ঢোলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ডুডুম ডুডুম। জানি (পুরোহিত) হয়তো মন্ত্র আওড়াচ্ছে— সকলে সুখে থাকুক, ফসল ভাল হোক, সুবৃষ্টি হোক, বাঘে না খাক, রোগ না হোক— কেবল শুভ কামনা। এত শুভেব চিন্তা করে করে কোন শুভটা ভরে উঠছে কন্ধ দেশে? সব উচ্ছন্নে গেল।

এই কন্ধদেশের প্রসিদ্ধ মেরিআ পূজা, পৌষের শেষে মাঘের আরম্ভে হয়। সেকালে নরবলি হত। আগে থেকে সাঁওতার ঘরে এনে রাখা বলিকে পূজার দিনে লোকেরা কোলাহল করে আনতে যেত। সেই দিনের সমবেত চীৎকার আজও কানে বাজে। শত শত মানুষের সমস্বরে গর্জন—

ওডে নাটতি শিণ্ডি, ওডে নাটতি ত্রায়ুঁ
(ওরে গাঁয়েব বড মানুষ. ওরে গাঁয়ের মাথা)
কোয়ু-হিপা হাবুমন্নেকি, মেল্লু-হিপা হাবুমন্নেকি
(মুরগীর ছানা আছে কি. ময়ূর-ছানা আছে কি?)
নিদা সেডা হাবুমন্নেকি, নিদা ম্রিয়ুঁ হাবুমন্নেকি
(তোব ছেলে আছে কি?)
নাংগে মাঘ লেঞ্জু ওআতে. পুষু লেঞ্জু ওআতে
(মোদের মাঘ মাস এল. পৌষ মাস এল)
কোয়ু-হিপা তিয়ামু. মেল্লু-হিপা তিয়ামু
(মুরগীর ছানা দে. ময়ূর ছানা দে)

প্রথা অনুসারে সাঁওতাকে টাকা দিয়ে বলির মানুষ তারা কিনেছে—দর্ম, দর্ভনির জন্য মেরেছে। কত নির্দোষ মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছে দেবতার প্রস্তর-পীঠে।

আজ নরবলি আর নেই, মানুষের বদলে শুওর, শুওর না জুটলে ইঁদুর

বলি। দমু´ ইঁদুরের রক্ত খাক, দর্তনী খাক, মানুষকে খেয়ে খেয়ে ফোঁপরা করে ফেলেছে, আর মানুষের রক্ত নেই।

লিসেণি-তে (বড় ঢাকে) রক্তপূজার বাজনা বাজছে। বুড়ো সাঁওতা দেখছে অতীতের স্বপ্ন, যখন কেউ কোনো কথা তুলত না, আপত্তি করত না, মানুষের ধারণা ছিল তার আপন রক্ত তর্পণে দেবতার তৃপ্তি। তাই মানুষ আত্মোৎসর্গ করত, নিজেদের ভিতর থেকে একজনকে দেবতার কাছে বলি দিয়ে চীৎকার করে বলত—

হাজি হিলারেটু, কূড়ানি হিলারেটু

(কেউ বিনাশ না হোক, বাঘ না থাকুক)

আবারে মণ্‌বে বালারে মণ্‌বে

(সকলে সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক)

রাজি কাঁগাল্ আতে যকা বিশি কাঁগাল্ হিলারেটু

(রাজ্যে দুর্ভিক্ষ পডলেও দেশে দুর্ভিক্ষ না পড়ুক)

উলি গোজালেহেঁ তাসা আপদি, লেসুণ্‌ গোজালেহেঁ তাসা আপদি

(পেঁয়াজ চাষ ভাল হোক, রসুন চাষ ভাল হোক)

ওটামাড়া লেহেঁ পোরু পায়াপে, পাএর্ মাড়া লেহেঁ কূড়ালা যাঁযাপে

(বনের লতার মতো জঙ্গলের মতো চাষ বেড়ে যাক)

মাপুরু হিকি আদার্ হিহিমঞ্জাইঁ

(মহাপ্রভুকে আহার আমরা দিচ্ছি)

নিংগে পেনু বোগু হিহিমিঞ্জাইঁ

(তোমায় দেবতা-ভোগ দিচ্ছি)

রাজি উজো আতাই দেশ উজো আতাই তিঞ্জিমজানে

(রাজ্য উজ্জ্বল হোক, দেশ উজ্জ্বল হোক তুমি ভোগ খেলে)

মানুষ বলি, রক্তের ফিনকি— চোখ অন্ধ করে, চুলে জট পাকিয়ে মানুষের রক্ত। কিন্তু খালি রক্ত দেখবার জন্য কন্ধ মানুষ কাটত তা নয়। গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য সে বলিদান করত। ভাবত হয়তো দেবতা প্রসন্ন হবে। উপরে ধর্ম দেবতা, নিচে ধরিত্রী। কিন্তু কি দুঃখ! পদে পদে সে বুঝত গোষ্ঠীরই এক জনের সে প্রাণ নিচ্ছে। তাই পূজার আট দিন, পনের দিন আগে থেকে বলির মানুষকে রাজ উপচারে রাখত সে, তার প্রত্যেক আশা, প্রত্যেক ইচ্ছা

পূরণ করত। বলিদানের দিনে মদের নেশায় মেতে সকলে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে ফেলত, তবু কি করুণ স্তোত্র— হেই দেবতা, তোরই শান্তির জন্য এই মানুষ বলি, আমাদের পাপ নেই ; তুই জন্ম দিয়েছিস, তুই খাচ্ছিস, আমাদের পাপ নেই—

নিংগে বারপুজা হিহিমঞ্জাইঁ
(তোমাকে বারো পূজা দিচ্ছি)
বার লাচা হিহিমঞ্জাইঁ
(বারো তোষ দিচ্ছি)
নাংগে পাপু হিল্লেএ
(আমাদের পাপ হচ্ছে না)
নাংগে দোহ হিল্লেএ
(আমাদের দোষ হচ্ছে না)
ইটা কাণ্ডা তিঞ্জিম্‌জানে
(বর্শা খাচ্ছে)
মেরিআ কাণ্ডা তিঞ্জিম্‌জানে
(খাঁড়া খাচ্ছে)
মেরিআ ডোরু নি তিঞ্জিম্‌জানে
(তোমারি বলি-বাঁধা দড়ি খাচ্ছে)
কৃডালি নি তিঞ্জিম্‌জানে
(তোমারি কুড়ুল খাচ্ছে)
তলে দর্তনি মাতাতি, উপ্রে দর্মু দেমৃতা
(নিচে দর্তনি মাতা, উপরে দর্মু দেবতা)
নিংগে নানু হিহিমঞ্জাইঁ, নাংগে পাপু হিল্লে এ
(তোমাকে আমরা দিচ্ছি, আমাদের পাপ নেই)
নানু কোডে আএ, পাপু হিল্লে এ
(আমরা কিছুই করছি না, পাপ নেই)

এমনি করে নিজেকে ঠকিয়ে দর্মুর নামে, দর্তনির নামে কত নির্দোষ মানুষকে তারা বলি দিয়েছে। আজ সাঁওতার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। সব বলি ফুরিয়েছে, দর্মু আছে, দর্তনি আছে, কন্ধের কোনো উন্নতি হয় নি।

সরবু সাঁওতা ভাবছিল— সব বৃথা, সব অন্ধকার, সামনে আর পিছনে। জীবনটা সুখে কেটেছে, ভয় নেই, ভাবনা নেই। খালি শিকার, চাষ, মদ, আর ফুর্তি। 'রে—' সম্বোধন কারো কাছে শোনে নি, 'হুজুর' বলে কাউকে ডাকে নি। যার সঙ্গেই কথা বলেছে কেবল—"ওড়ে সোই, ওডে সোই" (হে সাথী)। কারও স্ত্রীর দিকে নজর দেয় নি, কারও জমি-জমা কাড়ে নি। সরল সোজা সে, শাল গাছের মতো।

আজ দিন যেন ফুরিয়ে এসেছে, এমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে কোথায় কল বিগড়ে গেছে, হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে কোন মুহূর্তে।

যাক— আবার জন্ম নেবে সে। মাড়ুয়ার স্বাদ আছে, মাংসে স্বাদ আছে, মদে আছে নেশা। আর সুন্দর এই বনভূমি, এই অলসি-ছাওয়া ঢালু ঢালু ছোট পাহাড। সবুজে-নীলে মেশা কামরাঙার মতো পাহাড়, তার উপরে হালকা আলগা রঙ-বেরঙের মেঘ, এতে স্বপ্ন রয়েছে। এমন সুন্দর মনুষ্যজন্ম ছেড়ে থাকতে পারবে না সে।

সরবু সাঁওতা উঠে দাঁড়াল। ঘরে গিয়ে তাঁর বাঁশী নিয়ে এল। পৌষের মনমাতানো রোদে দাঁড়িয়ে দু হাত লম্বা বাঁশীতে দুই ক্রোশ লম্বা রাগিণী ভাসিয়ে দিল সে মালদেশের বাতাসে। তার বিয়ের দিনের সুর—

যেইতা নিলস মা বাইলে, বাইলে
যেইতা তালস মা বাইলে, বাইলে—

এই মালের উপরে হারিয়ে যাওয়া যৌবনের প্রেয়সী নিলস তালস লেম্বর ডুম্বর-দের নাম ধরে প্রাচীন রীতিতে বুড়ো সাঁওতা বাঁশী বাজিয়ে ডাকতে লাগল। যেন তার উপরে ঠাকুরের ভর হয়েছে, নাচিনী দেবতার ভর হয়েছে, সেও জীবনীশক্তির পূজা করবে বাঁশীর সুরে সুরে। বুড়ো কুকুর দসূরু রান্নাঘর থেকে হঠাৎ এসে সাঁওতার পা চেটে দিল। বাঁশী বাজাতে বাজাতে সাঁওতা নাচতে লাগল। জীবন সত্য, জীবন সুন্দর, পুরাতন দেহটা যায় যদি তো যাক, আবার সে জন্ম নেবে এই সুন্দর পৃথিবীতে।

পৌষের রোদে প্রজাপতি উড়ছে, কত অজানা বনফুলের বাস ভেসে আসছে, বনদেশের বাস। সামনে পাহাড়ের উপরে রোদে ঢেউ ভাঙছে। গ্রাম ঝিমুচ্ছে। সাঁওতা বাঁশী বাজিয়ে নাচছে।

হঠাৎ বুকের ভিতরে কেমন করে উঠল। শরীরে অসুখ ছিল, বুকে

ব্যথা। শাল গাছে ঠেসান দিয়ে এক হাত বাঁশীতে এক হাত বুড়ো কুকুরের গায়ে রেখে সাঁওতা একটু ঢুলে পড়ল। বুকের ভিতর কেমন করে উঠল, মাথায় যন্ত্রণা, চোখের সামনে গোল গোল কালো কালো ছায়া। অল্পক্ষণের মধ্যে সরবু সাঁওতার জ্ঞান লোপ পেল। নীচে দর্তনি, উপরে দর্মু— কন্ধ জাতির সব চেয়ে বড় পূজার দিনে সরবু সাঁওতার মৃত্যু হল।

॥ দুই ॥

গাঁয়ের উপর থেকে দেখা যায় একটি পাশের গাঁ—পাহাড়ের জংলা চূড়া, তার অর্ধেক পথ অবধি রেড়ির ফসল ধাওয়া করে গেছে, তারপর ঘোর অরণ্য। এক দিকে সপ্তপাতালে আঁধার বনের তলে তলে গভীর খদ, তার ওদিকে অ-তট পাহাড়। একদিকে চাষের উপত্যকা, তার ওদিকে কাস্তের ফলার মত গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট পর্বত ; আর একদিকে গ্রাম। পাহাড়ের নিচেকার ঢালু ধান খেতে নেমে এসে আবার উঠে গেছে অরণ্যময় পর্বতের উপর।

যেদিকে তাকাও অগুনতি পাহাড়ের সারি, ঘন জঙ্গল, তার উপরে যেন থাকে থাকে সাজানো পর্বতের বিমান। গাঁয়ের ভিতর এত ধুমধাম, পাঁচ শ ঘর লোকের বাস ; বাইরে থেকে দেখলে কোথায় গ্রাম টেরই পাওয়া যায় না। গাঁয়ের ধোঁয়া কুয়াশার ধোঁয়ায় একাকার হয়ে মিশে বিছিয়ে পড়ে—খেতের উপরে, বনের উপরে।

এই তার বনিয়াদী ভূমি— সরবু সাঁওতার। আর্যরা এল— সে তো কালকের কথা, তার আগে দ্রাবিড়েরা এসেছিল, তারও আগে হলদে কোনা কোনা মুখ, চেপটা নাক আর মিটমিটে নীল নীল চোখ মানুষের স্রোত, গদবা পারেংগা, সওরা, মুণ্ডারী—কুং-কাং চুং-চাং ভাষী লোকেরা। কিন্তু আদিম কাল অবধি পাহাড়ের সাথী, দর্তনীর সন্তান এখানে কন্ধ। এ তাদের নিজেদের রাজ্য, তাদের চাষের জমি, শিকারের ভূমি।

পর্বতখণ্ডের মতো বিশাল দেহ তার শালগাছের নিচে পড়ে আছে। বাতাসের ঝরঝর শব্দ, যেন বাঁশীর শেষ তানের সর্বশেষ লহরীটি সত্যি সত্যিই

ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাক খাচ্ছে। গাঁ শুনশান, লোকেরা পূজার জায়গায় ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ গেল। সাঁওতার সাড়া-শব্দ নেই। মাছিতে এসে ঘিরল। মনিবের দেহের কাছে বসে দস্রু কুকুর দর্মু দেবতার দিকে মুখ তুলে ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠল—ভো—উ—উ—। দর্মু পাহাড়ের ওপারে মুখ লুকাল। এপার থেকে ওপারে খেলে গেল কতগুলি কাটাকুটি আড়াআড়ি আলো-ছায়ার রেখা। গরু-বাছুর ফিরে এল, ধুলোর মেঘ উড়ল রঙিন আবীরের মতো। খদের ঝরনা ধারের দুড়দাড় ডুংডাং ফুরল। ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় ইঁদুরের রক্ত আর ঘরে তৈরি মদ ঢেলে, এক হাত উঁচু বেদীর উপরে মুরগীর ডিম রেখে, হলদে লাল ফুট-ফুট আঁকা ছোট ছোট কাটের খাঁড়া কাঠের বর্শা আর পুতুলের বাঘ নীচে সাজিয়ে, সব মন্ত্র পড়া সব মঙ্গল-কামনা শেষ করে গাঁয়ের লোক গাঁয়ে উঠে এল। পূজা শেষ হয়ে গেছে, এবার মদ আর ফুর্তি।

আলোর রেখা ছোট হয়ে এল, ছায়ার রেখা বড হল, দস্রু বসে কাঁদছে, তার কুকুরের চোখের কোণ থেকে ঝরে পডছে বড বড জলের ফোঁটা।

নিস্তব্ধ নিঝুম গ্রামে হঠাৎ প্রাণের সাডা জাগল, আনন্দের হর্ষরোল, এবার মদ চলবে। মদ এনে বাইরে রাখা হল। হাতে হাঁড়িভাঙ্গা খাঁপরা, লাউয়ের খোল, বোতল আর টিন নিয়ে সবাই মদের হাঁড়ি ঘিরে বসল। বানরের খেঁকখেঁকানির মতো বুড়োদের কর্কশ কণ্ঠস্বর মদের লোভে আরও ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কারও বা মদ খাওয়া হয়ে গেছে, কেউ বা খেতে যাচ্ছে। একটা বুড়ো বলদ মেরে তাকে দুই খণ্ডে কেটে টাঙানো হয়েছে, টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। মদ খাওয়ার পালা শেষ হলে বড করে আগুন জ্বালা হবে, সেই আগুনে অর্ধেক মাংস ঝলসে পুড়িয়ে খাওয়া হবে। বাকিটা রান্না করা হবে। এক জায়গায় পুরুষেরা মদ খাচ্ছে, আর এক জায়গায় মেয়েরা— হলুদ মেখে, মুখে মাথায় রেড়ির তেল মেখে দল বেঁধে বসে কিহিরি মিহিরি করছে। এখানে ওখানে দু-চারটি কঙ্কা শিশু, ছোট ছোট নেংটি পরে কেউ একপায়ে কেউ দু'পায়ে লাফাচ্ছে, কেউ ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, চোখে মুখে উজ্জ্বল হাসি। আজ বড় দিনের বড পরব।

দস্‌রু কুকুর ডাক ছেড়ে কাঁদছে। মাংসের গন্ধে তার নাকের রেঁায়া ফুলে উঠছে আপনা-আপনি। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে নাক তুলে শুঁকে শুঁকে বোঝবার চেষ্টা করছে গন্ধ কোন্ দিক থেকে আসছে। কিন্তু পাশে সাঁওতার দেহ, কেবল দেহটা—শুকনো সাপের খোলসের মতো। সাঁওতার সঙ্গে ছিল তার এক পাতে খাওয়া, বনে এক সঙ্গে শিকার। রাত্রে যখন বাইরে অজানা ভয়, ঘরের পিছনে কুকুরের যম ডুর্কা (চিতা) বাঘের জলজলে চোখ, তখন ঘরের মধ্যে আগুনের কাছে এক সঙ্গে গুটিসুটি হয়ে সে আর তার সাঁওতা। কে এখন আর তার গোঁফ টেনে টেনে আদর করবে, তার মুখে ভরে দেবে তামাকের ধেঁায়া, গায়ে ঘা হলে শুঁটকী মাছ ধোয়া জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে সারিয়ে তুলবে? বুঝবে তার কুকুর-মনের কথা তার সাঁওতা বিনা? সবাই ভুলে যাবে, মানুষের ভুলো মন, কিন্তু সে—?

মুখ চাটে, পা চাটে, বার বার করে বোঝে সব ঠাণ্ডা, সব শেষ। আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার ছাড়ে দেবতার দিকে মুখ করে। কুকুর সেখান থেকে ওঠে না।

কিছুক্ষণ পরে আরো মদ আনতে, মাংস আনতে, বাসন আনতে সাঁওতার ঘরের লোকেরা ঘরে এল। এল সাঁওতার ভাই লেঞ্জু (চন্দ্র) কন্ধ, সাঁওতার ছেলে দিউড়ু (কার্তিক[১]) কন্ধ—লম্বা পা-ওয়ালা লড়ায়ে মোরগের মতো জোয়ান চেহারা, ছেলেমানুষের মতো মুখ, তার স্ত্রী পুয়ু (ফুল)—ন মাস অন্তঃসত্ত্বা, সাঁওতার আইবড় মেয়ে পুবুলি (প্রজাপতি)। সাঁওতার পরিবার এই কয়জনকে নিয়ে। লেঞ্জু পাশের ঘরে ঢুকল। মদ খাবার জন্য সে ছোট একটি টিন রেখেছে। দিউড়ুর চোখ ঢুলুঢুলু। পুবুলি সাজগোজ করেছে।

সবাই ভেবেছিল অন্য দিনের মতো হয়তো সাঁওতা আরাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দিউড়ু মনে মনে বিরক্ত হল, আজকের মতো দিনে আনন্দ ফুর্তিতে না মেতে বাপ এখন পর্যন্ত শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর একটু পরেই দিনের আলো চলে যাবে। দিউড়ু ভাবলে বাপকে জাগিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য, গ্রামের বারোয়ারী মদ কিছু পেটে পুরে নিক সে, তারপর ঘরে পুরে রাখা

১ মাস, দেবতা নহে।

হবে। দিউড়ু কাছে গেল। কুকুরটার অনর্থক চেঁচানিতে তার বিরক্ত লাগছিল, ঢিল উঁচিয়ে তেড়ে গেল। সাঁওতাকে ডাকল, জবাব নেই। গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল, জবাব নেই। একটু মদের নেশা ধরেছিল তার। বার বার নাড়া দিয়ে শেষে সে বুঝলে, তার নেশায় বুঁদ মাথাটাকে যেন ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বুকের ভিতরে, শিরদাঁড়ার ভিতরে ঢুকে পড়ল একটা হিম শীতল স্রোত। শেষবার সে বাবা বলে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

দিউড়ু চেঁচিয়ে উঠল, ঘরের সবাই এসে জড় হল, সবাই মিলে কাঁদল, মাথা কুটল, বুক চাপড়াল, নখ দিয়ে নিজেদের গাল খামচে খামচে রক্ত বার করল। সকলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদল, মাটিতে গড়াগড়ি দিল।

যেখানে ছিল কার্তিক পরবের আনন্দ উৎসাহ সেখানে নেমে এল সন্ধ্যা আকাশের অন্ধকার। অলো অলো হাতেয়ুঁ হাতেয়ুঁ (হায় হায়, মরে গেল, মরে গেল)। তেল-হলুদ মাখা গায়ে মুখে লেগে গেল গাঁয়ের পথের ধুলো।

কান্না শুনে সকলে এসে ভিড় করল। কান্না বেড়ে উঠল। স্ত্রীলোকেরা সারি সারি বসে সমস্বরে বিলাপ করতে লাগল গান গেয়ে—

অলো অলো হাতেয়ুঁ হাতেয়ুঁ, পাপু
নিংগে ওইয়াতাণাকি নিংগে তিঞ্জাতাণাকি, পাপু

পুরুষেরা সাঁওতার মৃতদেহ ঘিরে ব্যস্ত হয়ে উঠল, অনেক কাজ বাকি। দস্রু উঠল, তার ফুল ঝেঁটার মতো লেজটি মাটিতে আছড়াল, গা ঝাড়া দিল, মানুষ মানুষের ভার নিয়েছে, এবার তার ছুটি। মাংসের গন্ধ রক্তের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে চলল।

চারিদিকে হৈ চৈ গোলমাল, তারি মধ্যে সমস্বরে মৃত্যুর ছন্দ—

নিংগে ওইয়াতাণাকি নিংগে তিঞ্জাতাণাকি, পাপু
(তোমায় চুষে নিল কি, তোমায় খেয়ে ফেলল কি, হায়! হায়!)

দূরের দূরের পাহাড় আর গাছ যা দিনের বেলা আলাদা করে ঠাহর করা যায় না, হঠাৎ লাল রেখা আঁকা দিগ্বলয়ের উপর কালো কালো হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তারপর অন্ধকারের সাগরে ডুবে গেল। রাত হল।

স্ত্রীলোকদের কাঁদতে ছেড়ে দিয়ে পুরুষেরা চোখ মুছতে মুছতে তৈরি হল।

কত বুড়ো, কত জোয়ান, সবাইকার রুক্ষ চেহারা। সকলে সাঁওতার কাছে, ছেলেমানুষ, সেকালের লোক একটি ছিল সে, পাথরের উপরে একলসেঁড়ে অশ্বত্থ গাছের মতো।

কিন্তু কাজ অনেক বাকি, বসে থাকলে চলবে না তো। বুড়ো জামিরি কন্ধ চুরুট ধরিয়ে ঘডঘডে গলায় চেঁচালে—"আরে বসেই থাকবি নাকি রে সব?" এইটুকুর অপেক্ষাতেই যেন সকলে বসে ছিল। কাম্বেলা জানির স্মরণ হল সে গাঁয়ের পুরোহিত, পাণ্ডু কন্ধের মনে পডল যে সে গাঁয়ের ভিসারি, কেবল মদের নেশায় বসে বসে কাঁদলে রাত পুইয়ে যাবে। গাঁয়ের ভৃত্য, একপক্ষে গাঁয়ের বুদ্ধিদাতা, বারিক ভুর্সামুণ্ডা ডোম সৎকারের জোগাড করবার জন্য হাঁক ডাক দিয়ে ফিরতে লাগল। মদেব হাঁড়ি ঘরে তোলা হল। টাঙ্গি কাঁধে ফেলে বনের লোকে অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

শব ঘিরে বসে মেয়েদের বিলাপ চলে, মরণের সংগীত। সাঁওতা সংগীত ভালবাসত। তার জন্ম সংগীতের মধ্যে, মরণ সঙ্গীতের মধ্যে। চারিদিক অন্ধকাব, প্রত্যেক ঘবের সামনে আগুন জ্বলছে। বারান্দায় ফিস্‌ফাস্‌ কথাবার্তা। কোনো শিশু নিচে নেমে পড়ে কৌতূহলী হয়ে কি হচ্ছে দেখতে গেলে ধমক দিয়ে তার মা তাকে হিঁচড়ে নিয়ে আসে। পরিচিত পৃথিবীর শেষ শিশির সইছে সাঁওতা শুয়ে শুয়ে। আর কিছুক্ষণ, তারপর তার অবস্থিতি থাকবে কেবল মানুষের ভুলো মনের আলোছায়ার বনে। সেইখানেই থাকবে সে, ধরা-ছোঁয়ার পৃথিবীতে যাব কেটে গেছে একের পর এক চার কুড়ি বৎসর।

দিউড়ু সৎকারেব বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিল। কাঁদছিল পুয়ু আর পুবুলি। পুয়ুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল জামিরি কন্ধের গিন্নী বুড়ী। "ছি মা। গা-ভারী মানুষ তুই, এমন অধীর হযে কাঁদিস না, অমনটা ভাল নয়।" পুয়ুব কান্না উথলে উঠছে। শ্বশুর যে তার বাপের বাড়া, বাপ তো তার ছেলেবেলায়ই মবেছে। সাঁওতা আদর ক'রে ডাকত—"পুয়ু, আমার ফুলের রানী, কোথায় গেলি পুয়ু।" পুয়ুর পেট বড হয়, দিনের পর দিন আরো আগ্রহ নিয়ে সে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, স্বামী তার আগ্রহ বোঝে না, হেসে চলে যায় কাজে। কিন্তু সাঁওতা ভিন্ন লোক। পুয়ুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেয়ে দেখে আর মাথা নাড়ে সাঁওতা, যেমন করে সেই পাথরের

উপরে বসে বসে সাঁওতা ধুঙ্গিআ (তামাক পাতার চুরুট) ধরিয়ে পুয়ুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এক-একবার হঠাৎ তার মুখের চেহারা কোমল হয়ে আসে, ফুটে ওঠে সরল শিথিল হাসি। কথা সে বেশী বলে না, তার মুখের চেহারাতেই বোঝায় তার মনের ভাব। পুয়ু খুশি হয়।

সেই সে বুড়ো, সে আজ নেই। যার প্রতীক্ষায় এত সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত একদিন না একদিন তার জন্ম হবে, কিন্তু বুড়োর আর তাকে দেখা হল না।

পুয়ু কাঁদে। আবাব এক এক সময় আসে অজানা ভয়। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, পড়ে আছে শবটা, এ তো সাঁওতা নয়। পুয়ুব মনে হল সে ঘরের ভিতর গিয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু সে কাঁদতে থাকে। কান্নাব গীতের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে গেয়ে কাঁদলে কান্না ভয় কিছুই টের পাওয়া যায় না।

পুবুলিও কাঁদছে। জন্ম অবধি বাপকে সে দেখে আসছে একই রকম। তার বাপ যেন কোনো দিনই জোয়ান ছিল না। বাপ ছিল তাব একটা সম্পত্তি, এইটুকুই। মা মরে গেল, তার পর ঘুরে বেড়িয়েই সে বড় হয়েছে। পাড়ার বুড়ীদের কত স্নেহ, কন্ধ রাজ্যে সব ছেলেমেয়েই সকলেব ছেলেমেয়ে। তা ছাড়া আছে গ্রামেব অল্পবয়সী মেয়েরা। গোষ্ঠীর কন্যা সে, কোনো একজনের নয়। কিন্তু তাব বাবা ছিল তার আশ্রিত— তাকে রেঁধে দিতে হত, জল গরম করে দিতে হত, তাব জন্য ফাইফরমাশ খাটতে হত। এইটুকুই সম্বন্ধ তাদের। কন্ধকুলপতি সাঁওতা তার শেষ বয়সের মেয়েব সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলত না। আশি বছর বয়সের মধ্যে দুইটি স্ত্রী তাব মবেছে, মরেছে দশটি সন্তান— জ্বরে, বুকের ব্যাথায়, আরো কত কি বোগে। তাদের পর এই ছেলেমেয়ে দুটো যমের উচ্ছিষ্ট। ছেলেকে সে বুঝতে পারে, ছেলে তার কাজের সঙ্গী। মেয়ে হয় কেবল ফাইফরমাশ খাটতে। সে তো চলে যাবে পরগোত্রে, বেশী সম্বন্ধ নেই তার সঙ্গে।

তবু সেই নীরবতার মধ্যে কোথায় যেন ছিল একটা কোলাহলময় অন্তরালের সম্বন্ধ, আজ বিষম টানে ছিঁড়ে যাচ্ছে। কবে একদিন বাবা নিজের মস্ত হাতের তেলোটা মেয়ের মাথায় চাপড়াতে চাপড়াতে ঘড়ঘড়ে গলায় বলেছিল "এত ধুলো কোত্থেকে লাগল?" এমনি কত দিনের কত

কথা। এইসব মিলে তার বাবা। সেই বাবা আজ নেই। যেখানে এতদিন সব ভরে' ছিল সেখানে আজ কেবল নাই—নাই—। এ অভাব সহ্য হয় না, প্রাণের ভিতর থেকে দুঃখের গর্জন বেরিয়ে আসে। পুবুলি ডাক ছেড়ে কাঁদে। তার কাঁদনভরা মনের উপর শীতল হাত বুলিয়ে যায় গাঁয়ের স্ত্রীলোকদের সমস্বরে বিলাপ। সেই যেন বুকচাপা অন্ধকারের ভিতর পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। পুবুলি কিছুক্ষণ বেসুরো কান্না কেঁদে গড়াগড়ি দিয়ে তারপর প্রাচীন কান্নার ছন্দে গলা মিলিয়ে এগিয়ে চলে—

নিংগে ওইয়াতাণাকি। নিংগে তিঞ্জিতাণাকি। পাপু
তিতিআ কুতানি ডুগিতি। তাম্বেরা কুতানি ডুগিতি।
না হাই হাতিআ না পাপু।

কন্ধ গাঁয়েব রিংগাজানি, সে পুরোহিত—জ্যোতিষী। সে গণনা করে যোগ বলে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যারাত্রির মধ্যেই সৎকার সেরে ফেলতে না পারলে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জ্বালানির কাঠ কুটো নিয়ে লোকেরা জঙ্গল থেকে ফিরে এল, সবাইকে এক টুকরো করে চিতায় দিতে হয়। মড়া উঠল।

দুই দিকে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কন্ধেরা বিলাপ গেয়ে গেয়ে তাদের সাঁওতাকে বয়ে নিয়ে গেল। মাঝপথে এসে ফুটো হাঁড়ি আর টাটকা ভাত রাখা হল। তারপর তারা এগিয়ে চলল দূরে, আরো দূরে। সেখানে গিয়ে চিতা সাজিয়ে সাঁওতাকে শুইয়ে দিলে। তার মাথার কাছে রাখলে ফুটো হাঁড়ি, ভাঙা চুপড়ি। আরো কাঠ সাজানো হল। সাঁওতার মাথায় রেড়ির তেল ঢাললে, চিতায় আগুন দিলে। আগুন ধরে উঠতেই সবাই সেখান থেকে চলে গেল। এর পর আর থাকতে নেই।

সকলে নেয়ে ধুয়ে মাথায় তেল দিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেল।

অন্ধকার রাত্রির মধ্যে একলা জ্বলতে লাগল সরবু সাঁওতা, চড় চড় করে কড় কড় করে জ্বলতে লাগল। পাক দিয়ে দিয়ে এলানো চুলের মতো ধোঁয়া উঠতে লাগল উপরে। নিচে আগুনের বিকট নীলাভ দীপ্তি, আগুনের লকলকে শিখা। সাঁওতা জ্বলে ছাই হতে লাগল। জীবন সত্য, জীবন সুন্দর!

সাঁওতা জ্বলতে লাগল।

॥ তিন ॥

রাতটা স্বপ্নের মতো কেটে গেল। সকালে সবাই উঠল। কেজো লোকের সকাল, সেই চিরন্তন কোলাহল। গরু চরতে যাবে, ক্ষেতে হাল যাবে, লোকেরা যাবে। গেরস্তালির শতেক রীত। গাঁয়ের একদিকে কুয়াশার ভিতর থেকে টকটকে লাল সূর্য উঠল। উঠেছে সে, আর কাউকে বসতে দেবে না। সবই আগের মতো। চারিদিকে হৈ চৈ, গোলমাল, কিছু বদলায় নি। কেবল সাঁওতার শোবার ঘর থেকে সরু গলায় কান্না শোনা যায় পুবুলির।

তারও গেরস্তালির শেষ হবে এবার। যাবে যাবে বলে কত দিন হল তার ইচ্ছে হয়েছে। এখানে কেউ তাকে ধরে রাখে নি, তবু সে যায়নি এখান থেকে। আজ সকালেই প্রথম সে বুঝতে পারল কেন যায় নি— মা নেই, বাপ ছিল, বুড়ো বাপকে ছেড়ে অন্য কারো ঘর করতে যাবার কথায় তার কেমন কেমন ঠেকত, তাই সে যায় নি।

বাবা নেই, এখন সে মুক্ত। কিন্তু এমন মুক্তি কি সে চেয়েছিল? পুবুলি বোঝে না তার বাবা বুড়ো হয়েছিল। ছেলেমেয়ের চোখে বাবা মা কখনো বুড়ো হয় না, তাদের বয়স নেই। তবু তার বাবা বলে ডাকা শেষ হয়ে গেল। কন্যা সে, তার এ কুলের জীবনকে কে জানে কে মাঝ থেকে কেটে অন্ধকার করে দিলে। পুবুলির কান্না বাধা মানে না, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তেমনিই সে কাঁদতে থাকে।

রোদ এসে পড়ল সাঁওতার পোড়া অঙ্গারের উপর। এক রাশ অঙ্গার আর এক রাশ আধপোড়া কাঠ। টুকরো টুকরো হাড় কতকগুলো, কালো সাদা। একটা মাথার খুলি, আর ভাঙা হাঁড়ি, ছেঁড়া টুকরি।

কাল ছিল সরবু সাঁওতা, পাঁচ শ কন্ধের সর্দার।

আবার গাঁয়ের লোক কাঠ নিয়ে আগুন নিয়ে এল। প্রথা অনুসারে চিতাবশেষ সকালে আর একবার পোড়ানো হবে। এক রাশ লোক, অপ্রসন্ন মুখ, একটা অপ্রীতিকর কাজ তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসতে হবে।

দিউড়ুও ছিল। সাঁওতা যেতে না যেতেই তার মাথার উপর এসে পড়েছে কে জানে কত বড বোঝা। তার মুখে দুঃখ জমাট বেঁধে রয়েছে, চোখ কাচের মতো, মুখে কথা নেই। চিতার ঠাণ্ডা ছাই জড করে আধপোড়া হাডগুলিকে আবার চিতায় তোলা হল।

এইবার সব শেষ।

লেঞ্জু কন্ধের হুঁশ হল। এবার সব ফুরুল, বড ভাই আর উঠে বসবে না ঘরের সামনেকার পাথরটার উপরে— সেই প্রকাণ্ড ধুঙ্গিআ চুরুট টানা আর মাঝে মাঝে কাশি। বড ভাই গেল, বাকি রইল সে, একদিন এমনি করেই সেও চলে যাবে। লেঞ্জু কন্ধ কাঁদল। দিউড়ু ঝিম হয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে দাঁডিয়ে ছিল। ডিসারি হেঁাক বললে, "ছি, অকল্যাণ হবে যে, পিছন ফিরে কি কেউ চায়?"

শ্মশানযাত্রীরা আবার নেয়ে ধুয়ে মাথায় রেডির তেল মেখে যখন ঘরে ফিরল পুবুলি তখনও ভাঙা গলায় কাঁদছে। মানুষের কান্না নয় তো, জন্তুর কান্না। গুলি-খাওয়া বুনো শুওর পালিয়ে গিয়ে খদের ঝরনার ধারের কাদায় গডাগডি দিয়ে যেমন করে কাঁদে।

দিউড়ু কাজ করল না। বাপ যে পাথরের উপরে বসত সেইখানে ঝিম হয়ে বসে রইল আর ধুঙ্গিআ টানল। লেঞ্জু গরু বাছুর খুলে চরাতে নিয়ে গেল। পুয়ু ঘরে নেই, হয়তো বনে কন্দ খুঁডে আনতে গেছে, এলে রান্না হবে। ঘরের ভিতরে পুবুলি কোথায় পডে পডে কাঁদছে। দরজার কাছে লেজ গুটিয়ে মুখ গুঁজে দস্রু শুয়ে আছে। দিউড়ু বসেই থাকল। সব শুনশান। ভাবতে মন যায়। ভাবনার মাঝে মাথার ভিতরে তুফান ওঠে, চোখে জল ঝরতে থাকে, মনে হয় নুয়ে পডে ভেঙে পডে মাটিতে ঢুকে পডতে। আবাব সামলে ওঠে, ভাবতে মন যায়, সব যেন ভোঁ ভোঁ, চোখ শূন্য পানে। ধুঙ্গিআ চুরুট জ্বলতে থাকে।

॥ চার ॥

সেদিন সকালে যখন পুয়ুর ঘুম ভাঙল পুবুলি তখনো ঘুমিয়ে, দিউড়ু ঘুমিয়ে। ঘন কুয়াশা। কেবল গাঁয়ের বুড়োরাই উঠেছে, যে যার বারান্দায় বসে আগুন পোহাচ্ছে। কিছুক্ষণ গেল, পুয়ু ঘরের বাইরে এল। জামিরি কন্ধের গিন্নী বুড়ী আগেই উঠেছিল, বারান্দায় আগুন পোহাচ্ছিল। পুয়ু তার কাছে এসে বসল, পুটুর-পাটুর কথাবার্তা কইতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ গেল। ঝনর ঝনর শব্দ, গাঁয়ের আরো মেয়েরা উঠল, ফরসা হল। মুরগীগুলো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। শুওর এসে সুর সুর সোঁ সোঁ শব্দ করছে ঘরের পিছন দিককার নোংরায়। তারপর ঘর-দোর ঝাঁট-পাটের পালা, পুয়ু তার সংসারের কাজকর্ম করতে লাগল।

পুবুলি তখনো ঘুমিয়ে। পুয়ুর কি মনে হল পুবুলির কাছে গিয়ে বসল, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ভারি আলিস্যি লাগছিল। হাত বুলোতে বুলোতে দু চোখের জলের ধারা ঝরে পড়ল পুবুলির মাথায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুয়ু ঘরের বাইরে গেল।

গাঁয়ের মেয়েরা 'ঝোরা'র (খদের তলার ঝরনা নদী) দিকে যাচ্ছে। পুয়ুও গেল। গল্প করতে করতে মনটা হালকা হল। তখন আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পুয়ু ফিরল। সূর্য উঠেছে। লেল্লু কন্ধের বারান্দায় রাখা রয়েছে বড় ঢোল, ছোট ছোট ছেলেপিলেরা ডমাডম পিটছে। গাঁয়ের লোকেরা কাজে গিয়েছে, দিউড়ু বাড়ি নেই। পুবুলি শোর তুলে কাঁদছে। পুয়ু ভাবল ঘরের বাইরে যায়।

এই শোরগোলের মধ্যেও তার লাগছিল সব শুনশান, সব চুপচাপ। ঘর যেন গিলে খেতে আসছে। গ্রামের সব কলরব মিলেমিশে যেন একটা শূন্যতার পটভূমি, ঢেউয়ের মত তাকে ধাক্কা মারছে বাইরের দিকে।

গাঁয়ের মেয়েরা দলে দলে কাজে চলল। অধিকাংশ গেল কন্দ খুঁড়তে। বনে নানা রকমের কন্দ হয়, অনেক নিচ অবধি খুঁড়ে বার করতে হয়। একটা বড় রকমের কন্দ বার করতে পারলে হেসে খেলে দুদিন চলে যায়।

কিন্তু পথ বড দুর্গম, ভয় অনেক, বাঘে খায়, ভালুকে তাড়া করে। পুয়ুর যেতে ইচ্ছে ছিল না। পেটে থেকে থেকে ব্যথা উঠছে, শরীরটাকে যেন কেউ নিচের দিকে টান দিচ্ছে। কিন্তু ঘরেও মন টিকছে না, তার চেয়ে বাইরে ঘুরে ফিরে আসাই ভাল।

ছোট একখানি শাবল নিয়ে দলের সঙ্গে জুটে পুয়ু চলল গাঁয়ের পাহাড়ের চুডোর দিকে। ভেরেণ্ডার বনের ভিতর দিয়ে একজনের পিছনে একজন সার বেঁধে একদল স্ত্রীলোক। খাড়া চড়াই, তাব দুই দিকে কেবল ফাঁকা, শুধু আকাশ, ক্রমে উপবের দিকে—ঐ উপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে সূর্য। দুই দিকের শূন্যে কুয়াশাব সমুদ্র, তার নিচে লুকিয়ে আছে কত গহন বন, যেখানে বাঘ থাকে, হরিণ চরে। সূর্যের শুধু উপবেই বিকাশ, নিচে তার প্রবেশ নেই, শুধু অন্ধকার ঝরনা সাঁ সাঁ করে তুফান তুলে ছুটে চলেছে।

ভেরেণ্ডার বন পিছনে পড়ে রইল, জঙ্গল শুরু হল, এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢেলায় ভরতি, পা হড়কালেই হয় এদিকে নয় ওদিকে অন্ধকারময় রসাতল। আরও উপরে—উপরে—। দুই দিকে আমলকী বন। ডালে ডালে গোছায় গোছায় আমলকী ঝুলছে। এক এক জায়গা নেডা, এক এক জায়গায় ঝোপ-জঙ্গল, এক এক জায়গায় বড গাছ একলা দাঁড়িয়ে। সবখানেই 'পিরি' ঘাসের বন, এক মানুষ উঁচু।

সামনে পৃথিবী যেন সরু হয়ে এল, চারিদিকের বোদে কুয়াশায় মেশা ঝিলমিলে আকাশের মধ্যে পাহাড়ের চূডাটুকু কেবল, জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে উপব পানে চেয়ে আছে, সে জিজ্ঞাসার উত্তর নেই।

পাহাড়ের ও-পিঠ অল্প ঢালু, একটা মস্ত ফাঁকা ময়দানের মত, ক্রমে ক্রমে নিচেব দিকে নেমে গেছে। তার মধ্যে যেখানে সেখানে অসংখ্য গুহা। ঐ পাশে বড কন্দ জন্মায়, ঐ কন্ধনীব কর্মক্ষেত্র।

পাহাড়েব ডগায় একলসেঁডে গাছের উপবে মস্ত বড পেখমওয়ালা ময়ূর বসে রোদ পোহাচ্ছে। ঐ দিকের খদের মধ্যে বিস্তর ময়ূর থাকে। বনের ভিতর থেকে বন-মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় বন-মোরগের পরিবার চরে বেডাচ্ছে। খানিক পরে এরা না জানি কোথায় গা ঢাকা দেবে।

গাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা কন্দের সন্ধানে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ছে।

দেখতে দেখতে তারা কোথায় চোখের আড়ালে চলে গেল। এতখানি চড়াই ভেঙে উঠতে পুয়ুর কষ্ট হচ্ছিল। সকলে এদিক-ওদিক চলে গেল, পুয়ু একা একটা পাথরের উপর বসে পড়ল। কাছেই স্ত্রীলোকদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সকলে কাজে লেগে গেছে। ময়ূরেরা লুকাল। মোরগগুলো ডাকাডাকি করতে করতে চলে গেল। সূর্য আরো উঁচুতে উঠল। পুয়ুর ইচ্ছে হচ্ছিল যেখানে আছে সেইখানেই শুয়ে পড়ে—শুয়ে পড়ে গাছের ছায়ায়, বনফুলের গন্ধে। জীবনে কতবার ইচ্ছে হয় শুয়ে পড়তে, কিন্তু শোয়া হয়ে ওঠেনা, কাজ এসে চরকি ঘোরায়।

পুয়ু উঠল। ঢালু বেয়ে অল্প নেমে গেল একটা পাশে। কাছের কুয়াশা কেটে গেছে, দূরের কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে। জঙ্গল নেমে গেছে পাতালের দিকে। পুয়ু শিআরির[১] ফল তুলল, শিআরির পাতা পাড়ল, বাঁশের কচি কচি কোঁড ভেঙে ভেঙে জড় করল। এক জায়গায় কন্দের লতা-ঝোপ দেখতে পেয়ে পুয়ু বসে কন্দ খোঁড়ায় মন দিল।

নয় মাস অন্তঃসত্ত্বা, পেটে ভার। চারিদিকে কত দেবতা আর ভূত-প্রেতের অশুভ দৃষ্টি. নির্জন বন। কিন্তু নিচে দর্তনি উপরে দর্মু আছেন, বিশ্বাস আছে. চেনা বন, পুয়ুব ভয় নেই। পেটের ভিতরের বিচিত্র জীব কবে থেকেই পুয়ুব সঙ্গী হয়েছে। কেমন যেন অদ্ভুত লাগে. এক দেহের মধ্যে আর একটা মানুষের বাসা। পুয়ুব ভয় কেটে গিয়েছে, এখন মনে মনে অচেনা সঙ্গীর সাথে কথাবার্তা কয়, কল্পনায় গড়ে আগামী অতিথির ভবিষ্যৎ।

নির্জনতাব মধ্যে সাঁওতাকে মনে পড়ল। কোন্ কাল থেকে বসে বসে সময়ের গতি মাপছিল বুড়ো সাঁওতা। [illegible]তে চায়নি, সে মরবে এমন মনে হয়নি তাকে দেখে, তবু সে মরল। কুলবৃদ্ধের আশা ছিল সে নাতি দেখে মরবে, নাতি তাকে প্রবোধ দিত তার পুরাতন ধাবা অব্যাহত চলেছে, এইটুকু।

পুয়ু খুঁড়তে লাগল—কত বিচিত্র চিন্তা, কিসের থেকে কোনটা আসে

১ শিআরি বা শিআলি উড়িষ্যাব একটি সাধারণ বনজাত লতা ও একটি উত্তম পণ্য। ইহার পাতাগুলি বড় বড়, তাহা সেলাই করিয়া খাইবার পাত ও বর্ষাতি তৈযারী হয়, গাছের ছালেব আঁশ দিযা শক্ত দড়ি হয় এবং ফল খাওয়া হয।

তার ঠিকানা নেই। কাজ করতে করতে কোত্থেকে কেন আসে, রঙ লাগিয়ে দিয়ে যায় মনে।

রোদ বাড়ল। মাথার উপরে পাখিরা কোত্থেকে কোথায় উড়ে গেল। আসপাশ থেকে স্ত্রীলোকদের গলা আর শোনা যাচ্ছে না। পুয়ুর বোঝা একটু নড়ে চড়ে উঠল, সারা গায়ে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল একটা বিচিত্র অনুভূতি। পুয়ু কষ্ট পেতে লাগল।

কন্দ খোঁড়া বন্ধ করে পুয়ু একটু উপরে উঠে এসে একটা পাথরের চাতালের মত জায়গায় বসে পড়ল। সেইখানে ছোট এক শাল গাছের গায়ে ভালুকুণীর[১] মত শিআরিব লতা গাদাগাদি হয়ে খানিক ছায়া করে রয়েছে। একলা সেইখানে হেলান দিয়ে বসে পুয়ু কষ্ট পেতে লাগল।

মুখের সামনে আকাশ, সুন্দর নিল। নীচে নীল আর সবুজ। মাঝ-খানটা একেবারে ফাঁকা, সেই ফাঁকা শূন্যে চিল উড়ছে ঘুড়ির মত। কালো কালো পাখির এক একটা ঝাঁক হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে, যেন কেউ শূন্যে ছুঁড়ে ফেলেছে তাদের। কেউ থেমে থাকেনা। এই ফাঁকা শূন্য কোনো আশ্বাস দেয় না দুঃখী লোককে। পুয়ু শূন্যের দিকে মুখ করে কষ্ট পেতে লাগল।

এই সময়টির অপেক্ষায় কত দিন থেকেছিল সে। এই সময় আপনি আসে, আপনি চলে যায়। পাখি ডিম দেয়, দু-চারবার কিচির-মিচির ডাক ছাড়ে, মৌখিক সহানুভূতি জানাতে তার পুরুষ কাছে ছুটে আসে। গরু-মহিষের বাচ্চা হয়, মানুষের সন্তান হয়। দেখে দেখে অতি সহজ মনে হয়েছে। কিন্তু এত কষ্ট!

কাঁদলে কেউ শোনবার নেই, ডাকলে কাছে আসবার নেই। পুয়ু মনকে পাথর করল। ভয় বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠলেও পুয়ু তাকে নিচে ঠেলে দিল। এখানে বিনা যুদ্ধে মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে কিছু পায় না, নিজের যুদ্ধ সে নিজেই করে, মরতে ভয় পায় না।

থেকে থেকে ঝড়ের মত ব্যথা আসে, দেহে প্রবল তরঙ্গ তুলে দিয়ে যায়।

১ উড়িষ্যার কুমারী বালিকারা (আদিবাসীরা নহে) এক বিশেষ ব্রত পালনের কালে আলুলায়িত অবিন্যস্ত কেশে গান গাহিয়া নৃত্য করে। এই অবস্থায় তাহাদের 'ভালুকুণী' (ভল্লুকী) বলা হয়। তাই সেই ব্রতের নাম 'ভালুকুণী ওষা'। 'ওষা' অর্থ ব্রত বা পূজা উপলক্ষে উপবাস।

পুয়ু চীৎকার করে কাঁদে, সব কিছু ভুল হয়ে যায়, বাইরের উজ্জ্বল আলো, মুক্ত প্রকৃতি, সব। যেন তার দেহের ভিতরে কি এক ভয়ংকর বিপ্লব চলেছে, টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি আঁচড়াআঁচড়ি, সব কেবল অন্ধকার, আর কষ্ট। পুয়ু দু হাত দিয়ে শাল গাছটাকে জাপটে ধরে, গাছের বাকলে দাঁত বসিয়ে কামড় দেয়। দেবতার ভর হওয়ার মতো শরীরে শক্তি আসে, পুয়ু সয়ে যায়।

কতক্ষণ এমনি গেল পুয়ুর মনে নেই। হঠাৎ তার মনে হল ঝড় থেমে গেছে, চোখের অন্ধকার কেটে গেছে, তালাধরা কানে কোন এক নতুন জন্তুর চীৎকার, যেন কেউ চেঁচিয়ে তার কান ফাটিয়ে দিচ্ছে যাতে সে শোনে। পুয়ু আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখল। মাটিতে পড়ে আছে রাঙা একটি ছোট্ট মানুষ। পুয়ুর হুঁশ হল।

দুই চোখ ভাল করে মেলে পুয়ু দেখল—অ্যাঁ—এই তার শিশু! এ-ই এতদিন ধরে তার অন্তরেব ভিতরে লুকোচুরি খেলছিল! এ তার! একেবারেই তার! তারই রক্ত-মাংসের এক টুকরো!

ঝড়ের পরের মলিন মুখে স্নেহ আর কৌতূহল-ভরে পুয়ু বার বার চেয়ে চেয়ে দেখল—সারাটা গা-ই লাল—সকালের সূর্যের মতো। মিটমিটে দুটি চোখ ভোরের আধ অন্ধকারের গভীর অতলের ঝোরার মতো। হাত-পা ছুঁড়ছে, কিসের জন্য যেন হাতড়াচ্ছে— চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে নতুন জন্মানো কন্ধঘরের খোকা।

হাত বাড়িয়ে পুয়ু খোকাটিকে ধরল। অবশ দেহে বল এল, মনে নানা বুদ্ধি এল— দেখে শুনে শিখে অনেক কথাই তার জানা।

খানিকক্ষণ পরে পুয়ু উঠল। বাচ্চার কান্নার কামাই নেই। ওদিকে সূর্য মাথার উপরে উঠেছে। বন কোথাও ফিকে দেখাচ্ছে, কোথাও ঝিকমিক করছে। পুয়ুর দুর্বল লাগছে। একলা সে তার শিশুকে বুকে চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল। মাথার চুল এলো হয়ে ঝুলছে, ছেঁড়া কাপড়ের দুরবস্থা। অঙ্গ কালী হয়ে গেছে। কিন্তু তার বুক আর ফাঁকা নয়, বুকে বাচ্চা— তার প্রথম বাচ্চা— খোকা।

দুর্বল হাতে একটি ধারালো পাথরের কুচি নিয়ে সে নিজেই নাড়ী কাটল। কাটা নাড়ীতে লাগিয়ে দিল চেনা ওষুধের গাছের পাতা। নিজে একটা

ওষুধের শিকড় খেল। একটা পাতার রস বাচ্চার জিভে চাটিয়ে দিল। এটুকু কন্ধদেশে সাধারণ জ্ঞান। পায়ের নিচেই ওষুধ রয়েছে।

খোকাকে বুকে নিয়ে পুয়ু ফিরে চলল। কিন্তু অপরিষ্কার হয়ে গাঁয়ে ফিরতে নেই। মাঝ পথে ভেরেণ্ডার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিচের ঝরনায় নেমে যাবার আর একটা পথ আছে। সেই পথে পাহাড়ের দেয়ালের ধার দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সে নামতে লাগল— আস্তে আস্তে। দুর্বল লাগছিল, তবু পাথর থেকে পাথরে পা ফেলে ফেলে নামতে তার পা কাঁপল না, সব তাতেই সতর্ক থাকতে হবে তাকে কেবল এই খোকার জন্য। এক হাতে তাকে নিয়ে আর-হাতে পথের ধারের গাছ আর লতা ধরে ধরে দেয়ালের মতো খাড়া পাহাড়ের পা বেয়ে সে নিচে নেমে পড়ল। সর্বজয়া মাতৃমূর্তি। নির্জন ঝরনার ধার, স্নানের সময় পার হয়ে গেছে। ঝরনার পাথুরে ধারা, নিচে বালি সরছে। দুই দিকে শুধু বন আর বন। এদিক ওদিক তাকাল ; ঝোরার ধারে শিআরির পাতা বিছিয়ে তার উপরে কচি বাচ্চাকে শুইয়ে দিল। নিজে ঝোরায় ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করল, কাপড় ধুয়ে নিল। বাচ্চার উপরে জল ছিটিয়ে দিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বাচ্চাকে বুকে নিয়ে পুয়ু গাঁয়ের দিকে চলল।

কবে কখন পাহাড়ের উপর একলা সে মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল তা পুয়ুর আর খেয়াল নেই। যেন সে কোন অতীতের কথা। রাঙা সূর্যের মতো রাঙা খোকার মুখখানির দিকে সে চেয়ে দেখতে লাগল। এই তার জীবন-প্রভাত, সে ছেলের মা, সে ভাগ্যবতী।

কবে সে ধাংডী (অবিবাহিতা যুবতী) ছিল, গায়ে হলুদ মেখে মাথায় ফুল গুঁজে পাগলী মেয়ের মতো চৈত্রের পরবে গান গেয়ে গেয়ে মনের মানুষ খুঁজে বেড়াত ! কে জানে কেন প্রজাপতির মতো হাওয়ায় পাখা মেলে দিয়ে উড়ে বেড়াত। অতীতের কথা সে আর জানে না। শুধু জানে সেই সব প্রশ্নের সে জবাব পেয়ে গেছে, সে মানুষের ছেলের মা, সে দর্তনী, দর্মু তার কোলে।

তখন রোদ পড়ে এসেছে। পুবুলির রান্না-বান্না সারা হয়ে গেছে। দিউড়ুর খাওয়া হয়ে গেছে, ক্রমে তার মনে আশঙ্কা হচ্ছিল এত বেলা অবধি পুয়ু ফিরল না কেন! থেকে থেকে ভাবছিল যে টাঙ্গি কাঁধে ফেলে বর্শা

আর ওড়িআ নলি (দেশী বন্দুক) নিয়ে জঙ্গলের দিকে খুঁজতে বেরুবে, আবার ভাবছিল তার আশঙ্কা অমূলক।

এমন সময় গাঁয়ের মাথায় কোলাহল শোনা গেল। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা চেঁচামেচি করে সকলে এক দিকে ছুটেছে। দিউড়ুও সেই দিকে গেল। মাঝপথে দেখল পুয়ু বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাকে ঘিরে আশ্চর্য হয়ে কলরব করছে। দিউড়ু হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। কে-একজন খোকাটিকে নিয়ে তার সামনে তুলে ধরল, এবার দিউড়ু হাসল। নতুন আগন্তুকের আশ্চর্য অভ্যুদয় মনের সব দুঃখ সব সন্তাপ উড়িয়ে নিয়ে গেল।

পুবুলি এল, ভাজকে জড়িয়ে ধরল। গোটা গাঁয়ের স্ত্রীলোকের মিছিলের সঙ্গে পুয়ু নিজের বাড়ির দিকে চলল। তার মনে হচ্ছিল যেন সে অতি আশ্চর্য একটা কাজ করে ফেলেছে যার তুলনা সারাটা দেশে কোথাও নেই। ছোট্ট খোকা কাঁদছে, পুয়ু হাসছে।

॥ পাঁচ ॥

কোন কাল থেকে এই পুরানো পৃথিবীটা পড়ে আছে। তারি উপরে দুদিনের ঘরকরনা। দুদিনের জন্য অঙ্কুর গজানো, বেড়ে গাছ হওয়া আর ঝরে পড়া।

কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যায়। সভ্যতা ডুবে থাকে মাটির নিচে, বনের আড়ালে, তার কোনো একটা ধারার সন্ধানে ফিরতে মানুষ নিজেই ভূত হয়ে যায়। সব সংকেত সব পরিচয় আপনার করে লুকিয়ে রাখে গহন বন, নিবিড় মাটি। সমাধির উপরে ঘাস গজায় মনের সুখে, ঘাসে ফুল ফোটে, ঝরে পড়ে।

যে যায় সে যায়। যে কাঁদে সেও চলে যায়। যে আসে কাউকে চেনে না, সেও যায়।

সরবু সাঁওতা চলে গেছে। আজকের এই জগৎটাকে হাতড়িয়ে কে বলবে কোনো দিন সে ছিল?

কিন্তু আশেপাশের পাহাড়ের মতো সে ছিল একটা মানুষ-পাহাড়। যখনই দেখো তেমনি রয়েছে। মিণিআপায়ু আর সরবু সাঁওতা অভিন্ন।

সরবু সাঁওতা এই পৃথিবীকে ভালবাসত। বাছবিচার করে ভালবাসতে সে জানত না। সে যা-কিছু দেখেছে, যা-কিছু পেয়েছে, সব-কিছুকেই ভালবেসেছে। আধখামচা ঘাসে ছাওয়া ধুলোয় ঢাকা মাটিতে ভর দিয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন গড়েছে—সেখানে গোবর, সেখানে থুতু, সেখানে চামড়া পোড়ানোর দুর্গন্ধ, ধোঁয়া, সেখানে জঞ্জাল। সে ঘা-ঘায়েলকে ভয় করে নি, রক্তারক্তিতে পিছ-পা হয় নি। পূজা দেবার সময় কদ্ধ পুরোহিত যেমন করে চাল-খুঁটে-খাওয়া জিয়ন্ত মুরগীর ছানার মাথা নখে টেনে ছিঁড়ে ফেলে তেমনি করেই সরবু সাঁওতা মেরেছে, ছাল ছাড়িয়েছে, খেয়েছে, আদর করে পেলেছে, আবার মনের আনন্দে খেয়েছে। তার বিকার নেই। সে বাঁশি বাজিয়েছে, পাহাড়ী দেশের সৌন্দর্যে নিজেকে ভুলিয়েছে, জীবনকে অনুভব করতে করতে চেখে চেখে সে পান করেছে। সে মেতেছে, বনের ভিতর পিছু ধাওয়া করে করে ভালবেসেছে, দিনের বেলায় খামারের কাছে, বনের আড়ালে মাংসের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

আশি বছরের ভালবাসা তার, আশি বছরের ইতিহাস। 'আমি' আর 'আমার' বলে ভালবাসবার ঈর্ষা করবার যে প্রসারিত সংকুচিত সংসার তার, সে সবই আছে, সে নেই। এই তার ঘর, তার ছেলেমেয়ে গাই-গরু, তার বসবার পাথর— সবই তার। নাতিটি, যে কাল এসেছে, সেও তারই।

কিন্তু সে নেই।

ঝোরার ধারে যেখানে অশুভ অঙ্গার আর ছাই আর আধপোড়া কাঠ ছড়িয়ে আছে, সেখানেও সে নেই। মানুষের যেমনটি হওয়ার কথা সবই তার হয়েছিল, এখন এই মোটে নয়টি দিনেই পৃথিবীর লোক তার সব স্পর্শ সব সম্পর্ক লেপেপুঁছে মুছে ফেলে দিয়েছে। স্নান সারা হল, বাকি শুধু ঘর-দোর নিকনো আর নতুন হাঁড়িতে মাংস ভাত। চারটি মুরগীর ছানা কেটে তাদের রক্ত তার উদ্দেশে ঢেলে দিয়ে মাংসটা নিজেরা সকলে খেল। গাঁয়ের পুরোহিত তার নাম ধরে ডেকে বলল—"সরবু সাঁওতা, সরবু সাঁওতা, আর তুমি এসো না, যে পথ দিয়ে এসেছিলে সেই পথ দিয়েই চলে যাও। তোমার জালে আমাদের ঢেকো না, রোগ দিয়ো না। আমরা আছি বলে না তোমায় যা হোক কিছু দিলাম, না থাকলে কে দিত, কে

তোমার খোঁজ নিত। মাটি খেয়ে খেয়ে পনেরো বছর এমনি পড়ে থাকতে। সরবু সাঁওতা, সরবু সাঁওতা, যা দিচ্ছি তাই নিয়েই তুমি চলে যাও, যাও, আর এস না।"

শুধু পর করে দেবার মন্ত্র :

নিংগে হিয়াতোমি (তোমায় দিচ্ছি)

মাস্থু মচ্চাকিসা হিয়াতোমি (আমরা আছি বলে দিচ্ছি)

মাস্থু হিলাআতেমা এস্বা হিয়াতোমা

(আমরা না থাকলে কোথেকে দিতাম, কি দিতাম)

মাস্থু কোয়ুহিপা হিহিম্ জানোমি

(আমরা মুরগীর ছানা দিচ্ছি)

কোয়ুহিপা আসানাহা নিন্থু হালামুড়ে

(মুরগীর ছানা নিয়ে তুমি চলে যাও)

নিন্থু ইস্বিজিরু·ওআতি এজিরু হালামু।

(তুমি যে পথে এসেছিলে সেই পথে চলে যাও)।

ন'টি দিন মোটে। সকলে তাকে পর করে দিলে। বললে—যাও, যাও। এখন থেকে সে প্রেত, অশুভ। মানুষের গরম উনলের ধারে তার স্থান নেই, ভাগ নেই ভাতের হাঁড়িতে, মদের হাঁড়িতে। সে নেই, সে কেউ না, সে শুধু একটা নাম। কত আত্মা শূন্যে উড়ে চলে গেছে, ফেলে দিয়ে গেছে শুধু নিজের নামের খোলসটুকু। তারপর সময় তাকেও ফোঁপরা করে ফেলেছে, ধুলো করে ফেলেছে, ধুলো ধুলোয় মিশে গেছে, এমনি অসংখ্য নাম, আজ আর তাদের বাছা যায় না।

গাঁয়ের মাঝখানে বড় করে আগুন জ্বালা হয়েছে। চারটি মুরগীর ছানার রক্ত ঢালা হল, গাঁয়ে তৈরি মদ ঢালা হল। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। সরবু সাঁওতার আত্মার শান্তি হোক। পুরোহিত কাম্বেলা জানি শ্রাদ্ধক্রিয়ার মন্ত্র শেষ করল। কন্ধেরা অপেক্ষা করে ছিল। একসঙ্গে সশব্দে বেরিয়ে এল অনেকগুলি দীর্ঘশ্বাস। এবার সরবু সাঁওতার প্রেত গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, এবার শান্তি। কলরব শুরু হল। মদ খাওয়া শুরু হল। কন্ধ বাজনদার মাদল বাজাতে লাগল, কন্ধ ছেলেরা বড় বাঁশির ঐকতান লাগিয়ে দিলে। মুখোমুখি দুই সার হয়ে দাঁড়িয়ে ধাংড়া ধাংড়ী

(অবিবাহিত যুবক যুবতী) নাচতে লাগল, এগিয়ে এসে, পিছিয়ে গিয়ে, সেই সনাতন রীতিতে। মদ খাওয়া বাড়ল, হৈ-হল্লায় সব গোলমাল হয়ে গেল। তার পরে মাংস ভাতের ভোজ। কাকের মতো রব তুললে মানুষ, সকলে মিলে তাল পাকিয়ে মহা হৈ-চৈ। বাজনা থামে নি। থেমে থেমে বাঁশিও চলছিল। ভোজের পর গ্রামের খোলা জায়গায় আবার নাচ। আবার ফুর্তি, কারো হুঁশ নেই। পুবুলি নাচছে। দিউড়ু লুটোপুটি খাচ্ছে। লেঙ্গু এক পাশে হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে শুরু করেছে। গ্রামের লোকেরা আনন্দ করছে।

এও পরব। ভূত তাড়ানো পরব। আগুন-তাতের আরাম, নাচ, ভোজ। ঝোরার ধারে বিজন বনের ভিতরে অঙ্গারের গাদা পড়ে থাকে, শেয়াল ডাকতে ডাকতে যায়, বনের পাখি বিকট ডাক ছাড়ে। শীতের রাত, ঘন অন্ধকার। বন নাক ডাকাচ্ছে, খদের তলাকার ঝোরার ভিতর থেকে যেন তারি শব্দ উঠছে থেকে থেকে। অঙ্গারের উপরে সার সার জোনাকি দপ্ দপ্ করে, শিশির জমে।

রাত বেড়ে চলল, রাস্তার মাঝের আগুন নিবল, জ্বলন্ত কাঠকুটো এদিক-ওদিকে ছিটকে পড়ে আস্তে আস্তে নিবে গেছে। সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে গনগনিয়ে উঠে আগুন যেন মুখ ভেঙায়, আবার মিইয়ে যায়। গাঁয়ের পথ নিস্তব্ধ। কবাট পড়ল।

সরবু সাঁওতা অন্ধকারকে ডরাত, ঘরের গরমটুকু ভালবাসত। ঘরে ঘরে কবাট বন্ধ, ভারি শীত, অন্ধকার।

॥ ছয় ॥

সবাই বলে পুয়ুর ছেলে দেখতে সুন্দর হবে। পুয়ু খুশি হয়, খোকাকে কোলে করে বসে থাকে, খোকাকে পেরিয়ে ওদিকে আর তার নজর চলে না, ঐটুকুই সব। কচি ছেলে মাইয়ে মুখ দিয়ে চোষে, হাত দিয়ে দিয়ে ধরে, সতৃষ্ণ নয়নে পুয়ু ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুক খুলে খাদ্যভরা স্তন বাচ্চার মুখে এগিয়ে দেয়। ঐ পথে গাঁয়ের লোক যায় আসে, স্ত্রী-

পুরুষ যার ইচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে বাচ্চার ভাল-মন্দ পুয়ুকে শুধোয়। সে বিনা সংকোচে তেমনি বসে থাকে, কথাবার্তা বলে। মায়ের দুধ বাচ্চার খাদ্য, এতে কিছু লজ্জা আছে বলে কন্ধনী-মা বোঝে না, কন্ধসমাজ বোঝে না। কন্ধনী-মা গর্বের সঙ্গেই শিশুকে খাওয়ায়: সে দুর্বল নয়, সে বন্ধ্যা নয়, আপন রক্ত দিয়ে শিশুকে সে গড়েছে, শক্তি আছে তাকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করে তোলবার।

পুবুলি জোর করে বাচ্চাকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে যায়, বলে—“তুই কাজ কর, আমি বেদম হয়ে গেলাম।” বাচ্চাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসে, আদর করে আর গুন গুন করে গান গায়। চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে বাচ্চাটার মুখ লাগিয়ে দেয় নিজের বুকে। বাচ্চা হাত দিয়ে খোঁজে, পরিচিত ক্ষেত্র পায় না, চীৎকার ছাড়ে। বাহানা করে কাছে কাছে ঘুর ঘুর করে পুয়ু, দুধ গড়িয়ে পড়তে থাকে, বলে—“দে, তুই যা চুল বাঁধবি, ও উঠতে বসতে দেবে না তোকে।” পুবুলির মনের মধ্যে বার বার বলে সে হেরে গেছে, বুকের ভিতরে কোথায় যেন হাঁকপাক করে, ইচ্ছে হয় বাচ্চাটিকে বুকে করে ধরে নাচে।

পুয়ু বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায়, পুবুলি দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। তার মুখে উদাস ভাব নেমে আসে, চোখে স্বপ্ন ভেসে ওঠে। এই মা, এই তার বাচ্চা, তার ভাইয়ের ছেলে, আর সে নিজে ঐ ভাইয়ের বোন। একবার পুয়ু ননদকে বলেছিল—“দেখ, এর চোখ, কপাল দেখ—ঠিক তোরই মত, তোর থেকেই পেয়েছে। আর পা দেখ, ঠিক তোরই পায়ের মতো ছোট ছোট পা হবে, নয়? দেখ—দেখ।” পুয়ু হেসে গড়িয়ে পড়ছিল, পুবুলিও হেসেছিল।

পুবুলি বাচ্চাটিকে ভারি ভালবাসে।

ছোট্ট আরশিতে নিজের মুখ দেখে দেখে তেল হলুদ মাখতে মাখতে পুবুলি ছল করে বাচ্চাটিকে তাকিয়ে দেখে: সত্যি সত্যিই তার রূপের ছায়া পড়েছে নাকি পুয়ুর ছেলের উপরে? পুয়ু বাচ্চাকে আদর করে, বাচ্চা মায়ের গায়ে সেঁটে যায় টিকটিকির মতো, পুবুলি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, কেন যেন তার মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। আঠারো বছরের সব অভিজ্ঞতার ঝুলি ঝেড়ে ঝুড়ে পুবুলি তার থেকে বেছে তোলে খালি যত দুঃখের অনুভূতি।

মরা মায়ের আঁচল যেন পুবুলির গা ছুঁয়ে যায়, বুড়ো বাপের কথা মনে হয়, আরো কত কথা মনের মাঝপথ অবধি উঠে এসে আবার লুকিয়ে যায়।

উদাস হয়ে পুবুলি দূরে তাকায়। ঐ পাহাড়ের ওপারে, ঐখানে বন্দিকার গ্রাম, হিকোকা বংশের কন্ধদের বসতি। সকাল-সন্ধে সেখানে ধোঁয়া ওঠে, পাহাড়ের খালে আছে গ্রাম। গাছের ভিতর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে, তারি খেই ধরে ধরে ভাবতে পুবুলির ভাল লাগে। সেখানে জোয়ান সাঁওতা হিকোকা হাণ্ডর্ণা। দিউড়ুর মতো অত লম্বা নয়, কিন্তু দেহটা যেন কুঁদে কাটা। ছেলেবেলা থেকে কতবার সে দেখেছে হাণ্ডর্ণাকে —মাঝে মাঝে আসত, সরবু সাঁওতার পায়ের কাছে বসত। পুবুলি ধোঁয়ার খেলা দেখে। সরবু সাঁওতা ধোঁয়ার মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে। সে হাণ্ডর্ণাকে ভালবাসত।

পুবুলি হাণ্ডর্ণার কথা ভাবে। লোকে বলাবলি করে সাঁওতার মেয়ের জোড় ওদিককার সাঁওতার সঙ্গে বেশ মানাবে। কিছুদিন হাণ্ডর্ণা এদিকে আসে নি। ফসল কাটার সময় মিছামিছি পুবুলি হাণ্ডর্ণার ভাবনা ভাবতে বসে— আহা, তারও বাপ মা নেই।

খোকার নামকরণ হবে। পুয়ু তার খোকার ভবিষ্যতের কথা ভাবে। তাকে কোঁচড়ের মধ্যে নিয়ে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার সময় পুয়ু সবাইকে শুধোয় খোকার কি নাম দেওয়া যায়।

পুয়ু ভাবে একটা কোনো বড় রকমের নাম রাখা হবে, গুরু-গম্ভীর, ভয়ংকর —যাতে বড় হলে লোকে মানবে, ভয় করবে। যেমন দামানা, মেণ্ডেলা, ডণ্ড। ইচ্ছে হয় দিউড়ুকে শুধোয় তার মতামত কি। দিউড়ুর কি জানি হয়েছে, সে আর তেমন দেখা দেয় না। বাচ্চাটি হওয়ার পর থেকে পুয়ু ভারি রোগা হয়ে গেছে বলছে সবাই। দিউড়ুর উপর পুয়ুর অভিমান হয়—এতই কি কাজ তার! কত কথা শুধোতে চায় সে, সে সব কেবল তার আর দিউড়ুর পরামর্শ। ফসল কাটা হচ্ছে, গ্রামের সকলে পাহাড়ের নিচে। গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। পুবুলিও মাড়ুয়ার খেতে যায়। পুয়ুর জন্য মাড়ুয়ার ভাত রেখে দিয়ে ভাই আর কাকার জন্য নিয়ে যায়। খেতের উপর মাচান বাঁধা হয়েছে। পাকা ফসল আর কাটা ফসল পাহারা দেবার

জন্য পুরুষেরা নিজের নিজের মাচানের উপরে ছোট্ট কুঁড়ের ভিতরে রাত কাটায়।

পুবুলি সন্ধ্যায় ফেরে, দস্‌রু কুকুর ফেরে তার সঙ্গে। রাত্রে বনের জন্তু তাড়াবার কথা মনে হলে লোকেরা চীৎকার শব্দ ছাড়ে, শিঙা ফোঁকে। পুবুলি পড়ে ঘুমায়, পুয়ু শিঙার আওয়াজ শোনে। শিঙার শব্দ শুনলেই দস্‌রু ধড়মড়িয়ে উঠে এক টানা 'ভো—উ' সুর তুলে কাঁদে। বাচ্চা চেঁচায়। ঘরে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে, সুর সুর করে ধোঁয়া ওঠে। নিচু ঘর, শীতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে শুয়ে পুয়ু দিউড়ুকে ভাবে।

এই ফসল পাকা আর কাটার দিনগুলিতে খেতের কাছে বনের আড়ালে কত হাসিখুশি কত ভালবাসাবাসি কন্ধ দেশে। মাঘ মাসটা কেবল বিয়ে বাড়ির মাস। পাকা ফসল দেখলেও পেট ভরে, শীতের রোদে মন মাতায়, শীতে মানুষকে মেলায়। পুয়ু পুবুলিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, তার ভিতরটাকে যেন দেখতে চায়, পুবুলি গভীর ঘুমে শুয়ে থাকে। নির্জন অন্ধকার শীতের রাত। শুধু শিঙা ফোঁকার শব্দ। কাকাকে পাহারায় রেখে দিউড়ু কি আসতে পারে না? কি যে পুরুষ মানুষের মন সত্যি! —পুয়ু ভাবে।

সকাল হয়েছে। ঘন কুয়াশা। পাশের গোয়ালে বলদ দুটো একের পর এক ডাক ছাড়ছে। পুয়ু উঠল, দেখল পুবুলি আগেই উঠে গেছে। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলো। আগুন নিবে গেছে। বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। পুয়ু ছল করে শুয়ে রইল, দেখবে পুবুলি কখন ফেরে। বলদ দুটো আস্তে ডাকতে লাগল। ঘরের মধ্যে আলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। খোকা চোখ খুলে ড্যাব ড্যাব করে চাইল।

পুয়ু খোকাকে কোলে নিয়ে উঠে পড়ল। তখন দেখতে পেল খোকার নাই পড়ে গেছে। পুয়ুর কুঁড়েমি কেটে গেল। নাই পড়েছে, আজ ঘর-দোর নিকনো চুকনো, মেলা কাজ। দিউড়ুর উপরে রাগ হল, ঘরের ঝক্কি সে একটুও কেন সামলায় না, শুধু একবার দুবার তাড়াহুড়ো করে যাওয়া-আসা!

গাঁয়ের বারিক ভুর্সামুণ্ডার ছোট ছেলে তুরুঙ্গা ছোঁড়া গরু খুলে নিতে এসেছে, চরাতে নিয়ে যাবে। তারই মারফতে পুয়ু দিউড়ু আর লেঞ্জুর

কাছে খবর পাঠাল, ভুর্সামুণ্ডাকে ডেকে পাঠাল। সাঁওতার মৃত্যুর পর এখন দিউডুই গাঁয়ের সর্দার হবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। বারিক গাঁয়ের সর্দারের আজ্ঞাবহ, সেজন্য সে বারিকভূমি ভোগ করছে। খবর নিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে যাওয়া— সেও ভুর্সামুণ্ডার কাজ।

খবর পেয়েই সে এল। পুয়ু তার বাপের বাড়ির গাঁ মিটিং-এ খবর পাঠাল। ছেলের শুভ কাজে তার মামার বাড়িতে খবর পাঠানো বিধি।

পুবুলির দেখা নেই তবু। কুয়াশা কেটে আসছে। জামিরি কন্ধের বুড়ীর কাছে বাচ্চাকে রেখে নাই পড়ার কথা বলে পুয়ু উঠল পাহাড়ে। লাল গেরিমাটি, সাদা খড়িমাটি আর শিআরির পাতা নিয়ে এল।

ফিরে এসে দেখে পুবুলি খোকাকে নিয়ে বুড়ীর কাছে বসে গল্প করছে। পুয়ু ঘরদোর নিকিয়ে ফেলল। গোয়াল পরিষ্কার করল। দুয়ারে মঙ্গলচিহ্ন শিআরির পাতা গেঁথে ঝুলিয়ে দিল। কাপড়-চোপড় সিদ্ধ করল।

ঝোরা থেকে ফিরে এসে দেখে দিউডু এসেছে। শীতের ঠাণ্ডা রাতে মাচানে বসে শিঙা ফুঁকে ফুঁকে রাত জাগার পর সে এক পেট মদ খেয়েছে। পুয়ুকে দেখে তার পিছন পিছন হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মদের নেশাধরা চোখে গাড়োলের মতো তাকিয়ে পুয়ুর হাত ধরে হেঁচকা টান দিলে। পুয়ুর কোলে ছেলে, বললে, "ছি, ছি, খোকার লাগবে।" খোকা মায়ের দুধ মুখে পুরে এক চোখে বাপের দিকে চেয়ে আছে। দিউডু দমে গেল। পুয়ু বললে, "মদ খেয়ে মাতাল হলেই তো চলবে না, কত কাজ পড়ে আছে, বেজুণীকে[১] ডাকতে হবে, ডিসারির কাছে পরামর্শ নিতে হবে। নাই পড়েছে, ছেলের নামকরণ করতে হবে।"

দিউডু বেজুণীকে ডাকতে বেরিয়ে পড়ল— যেন কলের পুতুলের মতো। অনেক উন্মাদনা নিয়ে সে আজ কতদিন পরে বাড়িতে ছুটে এসেছিল। পুয়ুকে বড় রোগা লাগছে, ফেকাশে মুখ, শীতে ঠোঁট গাল ফেটে গেছে, চুল এলো-থেলো। মনে মনে সেই চেহারাটা দেখতে পাচ্ছিল, তাতে সোহাগ চাগে না। পিছন থেকে যেন সে খোঁচাচ্ছে— যাও, কাজে যাও। শীতে দিউডুর গা চাড়া দিয়ে দিয়ে উঠছে। মুখ বিস্বাদ লাগছে। ছেলে হওয়ার পর থেকেই পুয়ু যেন খালি খেদিয়ে দেয় তাকে, ছেলে হবার আগে থেকেই সে

১ বেজুণী—মন্ত্রসিদ্ধি ও দৈবশক্তির খ্যাতিসম্পন্না একলা নারী, গ্রামের নমস্যা।

এমনি খেদিয়ে দিচ্ছে। বনের মানুষ দিউড়ু, কতদিন এমনি করে তার চলবে? সকাল বেলা ঝোরায় চলেছে গাঁয়ের ধাংড়ীরা, মাথায় হাঁড়ি কলসী আর কাঁধে নেকড়া চোকড়া। ডুম্বর[১] চলেছে, নিলস[১] চলেছে— হরিণীর মতো —স্ত্রীপশু। দিউড়ু দেখতে দেখতে চলল। দড়ির খাট মাথায় নিয়ে চলেছে ভুর্সামুণ্ডার ছেলে বালমুণ্ডার স্ত্রী সোনাদেঈ। বছর খানিক হল কেলার গ্রাম থেকে এসেছে। বালমুণ্ডা লম্বা রোগা, হাড ক'খানা সার। সোনাদেঈ মাথা নিচু করে চলেছে। কি সুন্দর দেখতে সে। তার গোলগাল মুখখানি সর্বদা কি যেন এক অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারেব মধ্যে জলজ্বল করে কেবল তার দুটি চোখ, তাতে আড় চাউনি ঝলসে ওঠে।

দিউড়ু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। এক বছর আগেকার পুয়ুর কথা মনে পড়ে গেল তার। দস্রু কুকুরটা কখন পিছন পিছন এসেছে, বাটে ঘাটে কেবল কুকুর আর কুকুর ছানা। কেঁউ কেঁউ—রাগ ধরে।

॥ সাত ॥

বেজুণীর বাড়ি এল। গাঁয়ের এক মুড়োয় একল ঘর একখানি। চারিদিকে মূর্বা ঝোপের বেড়া। ভিতরে আগাছার জঙ্গল। তারি ভিতরে ভাঙা ঝরঝরে একখানি চালা। বেজুণী বুড়ী ঐখানেই থাকে, তাব কেউ নেই। কন্ধ সমাজে বেজুণীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সে যখনই ইচ্ছে করে তার উপরে দেবতার ভর হয়। যে-দেবতাকে সে ডাকে সেই এসে তার উপরে ভর করে। সে বন্ধ্যা। জিয়ন্ত আর মরার মাঝখানে বেজুণী বুড়ী যেন এক ধাপ সিঁড়ি।

লোকেরা তাকে ভালবাসে না, কুশ্রী সে। বাজপাখির নখের মতো বাঁকানো আঙুল তার, মুখে দুটো বড বড হলদে দাঁত, ধূমল চোখ, ঝুলে পড়া গায়ের চামড়া। কেউ তাকে ভালবাসে না, সবাই তাকে ভয় করে। তার হাড় বার করা বুকে নানা রঙের কাচের মালা, গোছা গোছা মাদুলি, তাবিজ, জড়ি বুটির মালা। সে অসাধ্য সাধন করে। আগুনের উপর হাঁটে,

১ এইগুলি আদর ও সোহাগের নাম।

কাঁটার উপরে বসে, পেটে তলোয়ারের কোপ মারে। সে দেবতার বাহন—বেজুণী।

বেজুণীর ঘরের বেড়ার কাছে গিয়ে দিউড়ু থমকে দাঁড়াল। ঘরের চারিদিকে কালো কালো বড় বড পাথর আর ঝোপ জঙ্গল। লোকে বলে বেজুণী সাপ পোষে, শেয়ালের সঙ্গে কথা বলে।

ঘরের রোয়াকে কার গলা শোনা যাচ্ছে। দিউড়ু ঢুকল। রোয়াকে পা মেলে দিয়ে বেজুণী বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে, শণের নুড়ির মতো মাথার চুলের গুছি ঝুলছে। কানে মাদারের ফুল, কোমরে রঙিন নেকড়া জড়ানো। আপন মনেই বকছে, এমনি সে আপন মনে কে জানে কাদের সঙ্গে কথা বলে।

সিরসিরে শীতের হাওয়া বইছে। এই হাওয়াতে বেজুণীকে ছুঁয়ে কথা বলে প্রেতেরা উড়ে চলে যায়। বেজুণীব চোখ সামনের শূন্যপানে চেয়ে। চষা জমির মতো লম্বা লম্বা কোঁচকানো দাগ তার সরু কপালে, তার ধূমল চোখে দূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সে সব দেখে। তাব দিব্য দৃষ্টি আছে, কেউ তার চোখের দিকে সামনাসামনি তাকায় না।

দিউড়ু চেঁচিয়ে ডাকল, "বেজুণী, হেই বেজুণী।" বেজুণী ঘাড় ফেরালে। হাসলে। শুধু একটা হাঁ, দুটো বড় বড় হলদে দাঁত। এদিকে ওদিকে ঘাড় দুলিয়ে বলল, "নাই পড়েছে?"

দিউড়ু বলল, "জানিস তুই?"

বেজুণী আবার হাসলে। বললে, "আমি জানব না?" নিজের মনেই বলতে লাগল, "সরবু সাঁওতার ডুমা (আত্মা) জন্ম নিল, হাকিনা—হাকিনা।" আপন মনে বলে চলল—"সাঁওতা, সাঁওতা, এলি আবাব তুই বে? বেজুণী এখন আর ধাংড়ী নেই যে তাকে নিয়ে নেচে বেড়াবি বনে বনে। আচ্ছা, কোলে নিয়ে বসব তোকে। খেতে দেব কি? দুধ তো আর নেই।" বেজুণী হাসল। "সরবু ছিলি, হাকিনা হলি, হাকিনা—হাকিনা।" বেজুণী বুড়ী নিজে নিজেই বকে গেল, দিউড়ু থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিউড়ু আবার বলল, "বেজুণী, বেজুণী, আমার ছেলের নামকরণ করবি আজ তুই। তোকে ডাকতে এসেছিলাম।"

বেজুণী প্রকৃতিস্থ হল। কানের মাদারের ফুল খুলে ফেলল। সরু সরু

হাত-পায়ের উপর কাপড় টেনে দিয়ে বললে, "যা রে বাপু, যাব। এখন তো যোগ (লগ্ন) নেই। যা, পুয়ুকে বলে দে, গাঁয়ে জানিয়ে [illegible] এখন কেবল অসহায় বুড়ীটি সে, লোকের ছেলেপিলে হবে আর [illegible]কে শুধিয়ে তাদের নামকরণ করবে, পুজো দেওয়াবে, হি হি হি করে চেঁচাবে আর নাচবে।

দিউড়ু ফিরল। গাঁয়ের পথে উঠে মনে মনে ভাবল—বেজুণীর বুঝি ভীমরতি ধরেছে, এবার সেও যাবে।

ডিসারিকে ডাকতে গেল। ডিসারি পাণ্ডু কন্ধ খেতের দিকে গিয়েছিল। বেশি বুড়ো নয় সে, সুন্দর সুপুরুষ, ফরসা চেহারা। তার দৈবশক্তিতে গাঁয়ের লোকের খুব বিশ্বাস। সে কন্ধ জ্যোতিষী, কিন্তু তার কোনো আড়ম্বর নেই, ধুঙ্গিআ-চিবানো চাষবাস করা সাধারণ কন্ধ একজন। তার বাপ ছিল প্রসিদ্ধ ডিসারি, 'মেবিআ' পূজার যোগ ধরে দিত। যুদ্ধ বাধলে কোন সময়ে কোন ক্ষণে লড়াইয়ে বেরতে হবে, কোন দিন কি করলে কি ফল হবে, সব বলত। পাণ্ডু কন্ধও অল্পবিস্তর শিখে রেখেছে। মাঝরাতে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে নক্ষত্র গুনে গুনে সে বিধান দিয়ে দেয়, যা বলে সব ফলে। কোন দিন বিয়ের লগ্ন, কোন দিন কোন সময়ে কোন পুজো, কোন দিন নতুন আম খাওয়া হবে— সব কিছু সে ঠিক করে দেয় রাতের তারা গুনে গুনে।

ডিসারিও বললে, গরু ঘরে ফেরার বেলায়—।

দিউড়ু ফিরে এল। রোদে ঘুরে ঘুরে তার খিদে পেয়ে গেছে। কোমরে গোঁজা বাঁশের চোঙের তামাক পাতাও ফুরিয়েছে। পুয়ুর উপর আরো রাগ হল। গরু ঘরে ফেরার সময় গিয়ে সেই কখন, নাহক তাকে দৌড় করাচ্ছে রোদে।

হাকিনা— হাকিনা, নামটি মন্দ নয়, ভালই শোনাচ্ছে দিউড়ু ভাবল। কিন্তু হাকিনা বলতে উপোসী কাঙাল বেচারা বোঝায়, তার ছেলে কি না খেয়ে থাকবে? বেজুণীর আক্কেল নেই।

কিন্তু নাম দেওয়া তো বেজুণীর হাতে নেই, যে নাম বললে চাল দাঁড়াবে সেই নামই তো বেজুণী দেবে, তাতে কেবল দেবতার হাত। যাক গে, পরে দেখা যাবে।

অপেক্ষায় অপেক্ষায় সারাটা দিন গেল, সূর্য অস্তদিগন্তে ঝুলছে, পুয়ু ছট-ফট [illegible] গেল। এটা সেটা নানা কাজে তার সারা গা বারবার ঘামে ভি[illegible], তবু তার ক্লান্তি নেই, মনে হচ্ছে আরো যদি কাজ থাকত। আজ তার ছেলের নামকরণ হবে, সেই নাম নিয়ে সব দেবতার আশীর্বাদ মাথায় করে শাল গাছের মতো সরল সোজা হয়ে পাহাড়ী পূর্বপুরুষদের মাটিতে দাঁড়াবে এই ছেলে, পুয়ু তার মা। কত বিঘ্ন, কত রিষ্ট আছে এখানে মানুষের কপালে। বনে বাঘ, খেতে সাপ, কত জ্বর জাড়ি বুক ব্যথা। দশটিকে জন্ম দিয়ে পেলে বড করার পর কোথাও-বা একটি যমের উচ্ছিষ্ট হয়ে বেঁচে থাকে। আবার তারও কপাল, কত শত্রুতা কত অত্যাচার সাহুকারের, বড়লোকের। পাহাড় মাথায় নিয়ে সে মানুষ হবে। কারও দৃষ্টি না লাগুক, কারও কোপ না পড়ুক, আহা।

উঠোনটা সতেরোবার ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। ঐখানে পুজো হবে। শুকনো আলপনার জন্য রঙিন মুরুজ[১], তা ছাডা ভেলায় ফল, শিআরির পাতা, নতুন প্রদীপ এই সব কত যত্নে যোগাড় করে রাখা হয়েছে। একটি পাতার দোনায় হলুদের গুঁড়ো, আর একটিতে আতপ চাল। পুয়ু বারবার দেখে যাচ্ছে, চরকি ঘুরছে।

লোক জমা হল, বাজনা বাজল, ডিসারি আর বেজুণীকে সঙ্গে নিয়ে দিউড়ু এল। লেঞ্জু ছিল, পুবুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে চুল বেঁধে অপেক্ষা করছিল। ভিড় বাড়ল। পাণ্ডু ডিসারি যোগ ধরে দিয়ে বললে, "এবার আরম্ভ হোক।" ধূপ জ্বালানো হল। বেজুণীর উপরে দেবতার ভর হল।

বাজনার তালে তালে বেজুণী বেসামাল হয়ে নাচছে, একটু সরে গিয়ে গ্রামের লোকেরা বসে দেখছে। বেজুণী লাফায়, দৌড়য়, ধূপের ধোঁয়া গেলে। কাছে যারা বসে আছে কখনো বা হঠাৎ তাদের উপরে গিয়ে পড়ে, তাদের চুলের ঝুঁটি ধরে টানে, মুখে মাথায় নখ দিয়ে আঁচড়ায়। লোকেরা মাথা নিচু করে স্থির হয়ে বসে থাকে। খেপা বেজুণীকে নাচতে দিয়ে পাণ্ডু ডিসারি অর্ধেক বাজনদার উঠিয়ে নিয়ে 'ঝাকর' দেবতার পূজা দিতে চলে গেল। কতক্ষণ পরে ফিরল। বেজুণী মন্ত্র পড়ে পড়ে নাচছে, আর দুটি

১ চাউল ও খড়ির গুঁড়া।

বুড়ীও সঙ্গে জুটেছে, বেজুণী ক্লান্ত হয়ে এদিকে ওদিকে টলে পড়লে ওদেরই হাতে একটু ভর দিচ্ছে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বেজুণীর নাচ বন্ধ হল। পুয়ু ছেলেকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেজুণী আলপনার মতো করে মুরুজ ছড়িয়ে দিল, হলুদের গুঁড়ো ও আতপচাল তার উপরে ঢেলে দিল। তিনটি ছোট ছোট মুরগীর ছানা এনে তিন বুড়ী আতপ চাল খাওয়াতে লাগল। বাজনা বাজছে। ধূপের ধোঁয়া ঘন হয়ে উঠছে। মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে মঙ্গল কামনা করে, মাস দিন ক্ষণের নাম নিয়ে দেবতাকে ডেকে, বেজুণী একটির পর একটি তিনটি মুরগীর ছানারই টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে তাদের রক্ত মাটিতে ঢালল, তৈরি করা মদ ঢালল। মাথায় জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে সে তিন বার মা আর ছেলেকে প্রদক্ষিণ করল। পাহাড়ের ওপারে সূর্য অর্ধেক ডুবেছে, সেই দিকে তাকিয়ে প্রদীপে জল ভরে মন্ত্র পড়তে পড়তে বেজুণী জলটা ঢেলে দিল। এইবার নাম দেওয়া হবে। পুয়ু উৎসুক হয়ে উঠল। সকলের চোখ নিচের দিকে। বেজুণী মাটিতে বসে এক-একটি নাম বলে আর সঙ্গে সঙ্গে হলুদ মাখা আতপ চাল মাটিতে ছিটিয়ে দেয়। প্রথা এই : যে-নামে চাল মাটিতে পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সেই নাম দেওয়া হবে শিশুকে।

বেজুণী নাম ডেকে গেল—

দিন অনুসারে— সোমা, মংড়া, বুদ্রু, গুরু, শুক্রু, সনু। মাস অনুসারে —জেটু, আসাড়ু, বান্দাপানু, বেশু, দস্‌রু, দিউড়ু।

পশু-পক্ষীর নাম অনুসারে—মেম্নু (ময়ূর), লেম্নু (চিল), মায়ুঁ (হরিণ)।

গাছ অনুসারে, ফল অনুসারে— কাম্বেলা (কমলা), জামু (পেয়ারা), মুণ্ডা (শসা), উণ্ডা (আখ), দেরু (বাঁশ), মাহাআঁ (আম)।

প্রাচীন কন্ধ নাম— জাগিলি, ববন, গয়াঁ, লেতা, লাকা, আর্জু।

নক্ষত্রের নাম— আস্‌নী (অশ্বিনী), বারনী (ভরণী), সাল্‌পা (শুক্র), রাণ্ডা (মঙ্গল), উত্রা, লদা।

তার পরে লেঞ্জু (চাঁদ), টির্ণি (বিদ্যুৎ), পিয়ু (মেঘ)—কত নাম।

নামের স্রোত বয়ে চলে, পুয়ুর বুকের ভিতর হাতুড়ি পড়তে থাকে, অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করে, চাল দাঁড়ায় না। বেজুণী নির্বিকার ভাবে নামের

ফর্দ গেয়ে যায়, নজর করে করে দেখে কোন নামে চাল দাঁড়ায়। সবাই চেয়ে আছে—ভাবছে ভিড়ের মধ্যে আধ ছায়ায় ঐ বুঝি দেখা যায়। বেজুনী কাঁপা গলায় গর্জন করল—"হাকিনা" ! বলল, "চাল দাঁড়াল। ছেলের নাম হাকিনা রাখলেন দর্মু দর্তনী—মিণিআকা হাকিনা এই ওর নাম।"

পাণ্ডু কন্ধ একদিকে চোখ বুজে পাথরের মূর্তির মতো বসে ছিল, চোখ খুলে বলল—"এ সরবু সাঁওতার ডুমা।"

পুয়ুর চোখ বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ল। পুবুলি দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

পুয়ু খোকাকে আদর করে বলতে লাগল— "হাকিনা, আমার সোনা, আমার মানিক।"

পূজা শেষ হল। মদ খাওয়া আর ধোঁয়া টানার পর্ব কাল হবে। দিউড়ু বলল, "দে, কি রেখেছিস দে। মাঠে যেতে হবে।"

পুয়ু বলল, "আজকেও যাবে ?"

"যাব না ? ওদিকে পাকা ফসল হরিণে খেয়ে যাবে, সম্বরে খেয়ে যাবে, ডোম পট্‌কার (ধড়িবাজ বদমাশ) চুরি করে নিয়ে যাবে। আমি কি তোরি মতো বসে থাকব ঘরের কোণে ?"

খেয়ে দেয়ে মস্ত একটা পাকানো খড়ের দড়িতে আগুন করে নিয়ে দিউড়ু চলে গেল।

পুবুলি কোথায় ? পুয়ু মিস্টি গলায় ডাকল—"পুবুলি কোথায় গেলি ? আয় না এদিকে, হাকিনা ডাকছে।"

॥ আট ॥

উপরে গ্রাম, পাহাড়ের নিচে খেত, তার ওপারে আবার জঙ্গলে বোঝাই পাহাড়। ঢালু দিয়ে নেমে গেছে কাটা শাল গাছের ঠুঁটো গোড়ার সমাধি। যতদূর চোখ যায় কেবলি কালো কালো পাথরের সারি, দু পাশে আরো জঙ্গল। মাঝ খানে খোলা জায়গায় শ্যামা ধান আর অলসির ক্ষেত, উপরের দিকে বড় অড়হর (কান্দুল), সবার নিচে ধান।

শ্যামা ধান আর মাড়ুয়া অর্ধেক কাটা হয়ে গেছে, অর্ধেক এখনো কাঁচা। ধানে হলদে রং ধরেছে। যে যার খেতে রাতে জেগে থাকবার জন্য ঘর তৈরি হয়েছে। কতগুলি ঘর উঁচু মাচানের উপরে, কয়েকটি উঁচু উঁচু বড় ছুঁচালো পাথরের উপরে, কয়েকটা গাছের ডালের উপরে। নিচে আগুন জ্বলে। রাত জেগে যারা পাহারা দেয় তারা মাঝে মাঝে নিচে নেমে আগুন পোহায়, থাকে কিন্তু উপরে কুড়ের ভিতর।

মাঘের শুরু, ভারি শীত। অন্ধকার রাত্রিতে ঢালু জায়গায় আর খদের মধ্যে কেবল কুয়াশার ঢেউ উঠতে থাকে, তারার আবছা আলো ঝক ঝক করে। কুয়াশার মধ্যে এখানকার ওখানকার আগুন দেখায় যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, ছলকে ছুলে উঠছে, দূরের থেকে বাঘের চোখের মতো লাগে।

পিঁ পিঁ শব্দ করতে করতে হরিণ আর সম্বরের দল উপরের অড়হরের খেত থেকে নিচে নেমে আসে, মাচানের উপর থেকে শিঙা বেজে ওঠে, বিকট চীৎকার শোনা যায়, লোকেরা কেনেস্তারা পেটে, টমক[1] বাজায়। শুকনো কাঠ ভাঙার মট্ মটাস্ শব্দের মতো আওয়াজ করতে করতে বুনো শুওর ফসল ওপড়াতে নেমে আসে। আস্তে আস্তে খসর খসর করে কুট্রা (এক জাতের ছোট হরিণ) মাড়ুয়া খেয়ে যায়। কখনো কখনো দূরের মাচান থেকে কে যেন ওড়িয়া নলি ফোটায়, পর্বত কন্দরের নীরবতা ভঙ্গ হয়।

সারা রাত এমনি শোরগোল লেগে থাকে।

কখনো কখনো মহাবল বাঘ[2] গর্জন করতে করতে তলা দিয়ে ছুম ছুম থপ থপ করে যায়। মাচানের উপর থেকে হুর হুর করে জল ঝরে পড়ে, গাছের পাতায় ঝম ঝম শব্দ ওঠে, ধুলো ঝরে পড়ে। বছরের এই সময়টাতে ভারি বাঘে খায়। মাচান নিচু হলে, নয়তো তার উপরে ওঠবার বা লাফ মারবার উপায় থাকলে, খোঁচাখুচি টানাটানি করে মানুষ ধরে নিয়ে যায়।

আরো কত জন্তু। কত রকমের ডাক, ছোট ছেলের কান্নার মতো ভালুকের কান্না, নিশাচর পাখিদের চীৎকার।

সব শব্দ সব শীত মিলে মিশে বনের মাঝে অন্ধকার রাত। তার মধ্যে

১ একমুখী মাদলের ন্যায় ঢোলক। ২ ডোরাকাটা বাঘ।

মানুষ জেগে থাকে, মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলে-তৈরি ফসল পাছে খেয়ে যায় পরের-খাথায়-খাওয়া হিংসুক জন্তু—সেইজন্য শীতে হিমে পাহারা দেয়।

শীতের অন্ধকারে লেঞ্জু কন্ধ মাচানের উপরে কুড়ে ঘরে শুয়ে আছে, এক পাশে দিউড়ু এক পাশে লেঞ্জু। বিছানা কেবল শুকনো খড আর গায়ে দেবার জন্য ছেঁড়া চট। কাছে খেতের পাহারাদারদের হৈচৈয়ে লেঞ্জুর ঘুম ভেঙে গেল। হু হু করে ঠাণ্ডা আসছে। দিউড়ু ঘুমচ্ছে। লেঞ্জু আস্তে আস্তে কুড়ের মুখের দিকে গেল। নিচে তখনো একটু দড়ির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। সাবধানে সে বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল। কোথাও কিছু দেখা যায় না, খালি তাল তাল অন্ধকার। ধুঙ্গিআর ধোঁয়ার মতো কুয়াশা, উপরে জ্বলজ্বল করছে তারা। লেঞ্জু কন্ধ চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আজ রাতে তেমন তার ঘুম হচ্ছে না, গা ছম ছম করছে।

বড একা লাগে, তার নিঃসঙ্গ জীবনটা ভিখারীর মতো লোটায় নিচের অন্ধকারে। তার কেউ নেই।

বুড়ো ভাই ছিল, একটানা এতদিন কেটে গেল তারই মুখের দিকে চেয়ে। ভাই নেই, তার কেউ নেই।

একদিন তারও বিয়ে হয়েছিল, এই লেঞ্জু কন্ধের। কবে, সে কত দিন হয়ে গেছে রুকনি তার ঘর আলো করেছিল। রুকনিকে বাঘে খেল। কন্ধ আইন অনুসারে লেঞ্জু আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না— কেবল বাঘে খেয়েছে এমন লোকের বিধবা স্ত্রীকে ছাড়া।

নিঃসাড অন্ধকার রাতে খেতে জেগে বসে থাকলে রুকনিকে কেবল মনে পড়ে। এমনি শীতের রাত ছিল সেদিনও। মাড়ুয়ার খেতে মাটির উপরে ছোট কুডে। লেঞ্জু যতই বারণ করুক তার পিছু ধাওয়া করে রাত্রে রুকনি চলে আসে। বলে, "এখানে তোর ভয় করবে, ঘরে আমার ভয় করবে।" এমনি শীতের রাত। দোর গোডায় আগুন জ্বলছিল। আগুনের কাছেই শুয়েছিল রুকনি। মাঝ রাতে আর্ত চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। রুকনি নেই! ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে তার কাতর চীৎকার। আগুন নিবে ধোঁয়া মরে সব ঠাণ্ডা হিম। লেঞ্জু পাগলের মতো দৌড়ে গেল, রুকনির চীৎকার আর শোনা যায় না। দূরে অন্ধকারে কাছাকাছি দুটো চলন্ত

আগুন, মাটি থেকে বুক সমান উঁচুতে। কেবল সেই দীপ্তিটুকুই দেখা যাচ্ছিল। বিরাট মহাবল দেখতে দেখতে বনের অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে গেল। লেঞ্জু কাঠ হয়ে রইল। সকালে লোকেরা এল। মাড়ুয়ার খেতে হেঁচড়ানোর দাগ, ঝোপঝাপের গায়ে টুকরো টুকরো কাপড়, খেতের আলের কাছে বড় বাঘের পায়ের ছাপ, এক জায়গায় রক্ত জমে আছে, তার ওদিকে গহন বন।

রুকনি— কথায় কথার হাসত, হাসি তামাশা ভালোবাসত— রুকনি, ওঃ!

মন ভেঙে গেল, চাষবাস নষ্ট হয়ে গেল, আবার পেছন থেকে ঠেকনা দিয়ে দাঁড় করাল ভাই। বলল, "ওরে শোন্, কার জন্য এ সব? এ সব তোর।"

ভাই চলে গেল, সেও চলে যাবে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হল, কিন্তু জীবনটা গেল বৃথাই। রাত্রির শীত আর অন্ধকার তার মনে জাগায় একটি কথা: সরবুর দিউড়ু আছে, দিউড়ুর হাকিনা আছে, তার কেউ নেই, সে গেলে সব শেষ। আজ রুকনির প্রেত পারে না পৃথিবীর আনন্দকে তার চোখের আড়াল করতে। লেঞ্জুর কেবল মনে হয় তার জন্য ঘরে তার পথ চেয়ে কেউ বসে নেই। গা তেতে ওঠে, মন হাঁইপাই করে, এমনি হাঁইপাঁই করতে করতেই আয়ু ফুরিয়ে যাবে, ভোগ তার কপালে নেই।

লেঞ্জু কন্ধ ধুঙ্গিআ চুরুট টানতে টানতে ভাবতে লাগল— ভোগ কত রকমের হতে পারে তার ভাগ্যে। নিচের অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে সব চিন্তা এসে তার মনে তা দেয়, বাইরে ভারি শীত। লেঞ্জু কন্ধ জোয়ান বয়সী হয়ে গেল। মনে মনে নিত্যি দিনের দেখা কত রমণীর ছবি আপন মনের বিকারের রঙে রাঙিয়ে দেখে সে খুশি হয়ে উঠল। ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে হালকা মনে সে এখন ভাবতে পারে, মনে মনে আর কাউকে নেই ভয়-ডর, বাঁধন-ছাড়া মন। মন চায় বেঁচে থাকতে থাকতে পৃথিবীর সব স্বাদ সব রস শুষে নেয়, বাধা নেই।

একসঙ্গে কেনেস্তারা আর শিঙা বেজে উঠল। হৈরৈয়ের শব্দে দিউড়ু জেগে উঠল। দুয়ারের কাছে এসে শুনল নিচে খস্ খস্ দুপ্ দুপ্ শব্দ। দিউড়ু হাঁকল—"'ইচাবা' (ছোট বাবা), শুনতে পাচ্ছিস না জন্তুতে আমাদের

ফসল খেয়ে যাচ্ছে ? অর্ধেক খেয়েই ফেলল বুঝি। কি করিস বসে বসে, কেবল ঝিমুচ্ছিস !" জন্তু তাড়াবার জন্য দিউড়ু বিকৃত স্বরে চেঁচাল—"ই—হা, ই—হা—" আবার বলল, "কোনো কাজের ন'স তুই। দে, শিঙেটা দে।"

লেঞ্জুর রাগ হল। তার মনে হল দিউড়ু সাঁওতা হয়েছে বলে এবার বড় বড় কথা বলতে শুরু করেছে। ঝেঁজে উঠে বললে, "তুই তো নাক ডাকাচ্ছিলি। জেগে ছিল কে ? এত সর্দারি দেখাচ্ছিস যে ?" তার এই অকারণ রাগ দিউড়ু বুঝতে পারল না। সে খুব জোরে শিঙা বাজাল, জন্তু পালাল।

লেঞ্জু বিড় বিড করতে লাগল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে চট গায়ে দিয়ে বিচালির গাদার ভিতরে সেঁধিয়ে পেটে হাঁটু গুঁজে শুয়ে পড়ল।

লেঞ্জু কন্ধের ঘুম এল না। তার মনে হল দিউড়ু তাকে অপমান করেছে। তার কেউ নেই, সে পরের ঘরে কোনো মতে টিকে আছে খড়ের চালে গোঁজা আলগা কঞ্চির মতো। মিথ্যে বেগার খাটছে, গঞ্জনা শুনছে। ভারি রাগ হল, সে আর উঠল না।

দিউড়ু বসে রইল। রাত বাড়ছে। দিউড়ুর রাগ হতে লাগল। তার সব রাগ গিয়ে পডল পুয়ুর উপর। সে একটি একটি করে ভেবে দেখতে লাগল পুয়ু কোথায় কি অপরাধ করেছে যে জন্য তাকে গালি দেওয়া যেতে পারে। সেই তার জেগে থাকবার উপায়।

॥ নয় ॥

রাত পোহাল। পুয়ু তার খোকাকে কোলে নিয়ে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে গিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আসে। আজ তার বাপের বাড়ি থেকে লোক আসবে। খবর গেছে, ভুর্সামুণ্ডা বারিক (কন্ধ গ্রামের সাধারণ ভৃত্য) গেছে।

তার বাপের বাড়ির গাঁয়ের নাম মিটিং। ভোর ভোর বেরুলে গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা দুপুর গড়িয়ে সূর্য এক হাত নেমে পড়ে। লেডেং-এর কাছে মিটিং, পাহাড়ের ঘাঁটি পেরিয়ে যেতে হয় অনেকখানি পথ।

সেখানে বাপ-মা নেই, কোন কালে গেছে তারা, আছে কতকগুলি বুড়ী। তাদের জ্ঞাতিকুটুম্ব, তাদের কেউ কেউ আসবে। খোকার নাই পড়েছে, মামার বাড়ি থেকে কেউ না এলেই নয়।

পুয়ু জানে এত সকালে শীতের কুয়াশা সাঁতরে সেখান থেকে কেউ আসতে পারবে না।

কিন্তু কেউ আজ আসবে, পথ বলছে— যে সরু পথটি গাঁয়ের পাহাড় থেকে নেমে বনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে।

পুরুষের মুখ চেয়ে বাপের বাড়ির গাঁয়ের পাহাড় ঝরনা সব ভুলেছিল সে, ভুলেছিল গাঁয়ের নিত্যি নাটের পথের ধুলো। আজ সে ছেলের মুখ চাইছে, আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে সেদিনের পুরুষকে, সব সে ভুলে যাচ্ছে। তবু এমনি করেই এক-একদিন কোন কথা থেকে কোন কথা মনে পড়ে, মনের ভিতরে কেবল হালকা মেঘ ভেসে বেড়ায়।

কি হবে সে পোড়া ভাঙা ভিটের কথা ভেবে, আয়ুর স্রোতের টানে সে সবের দিকে পিছন করে এক মুখে সে চলেছে সেই কবে থেকে।

আজ মনে পড়ছে সেখানেও সূর্য ওঠে, আর রাঙিয়ে দেয় দুদিকের উঁচু উঁচু ছুঁচালো পাহাডের চুড়ো। সেখানেও ময়ূর নাচে, সেখানেও তরুণীরা কাজের ফাঁকে গাছ থেকে থোপা থোপা সাদা ফুল পেড়ে পেড়ে মাথায় গুঁজে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায়, ওদিকের পাহাড় থেকে তরুণীরা তোলে তার প্রতিধ্বনি।

সেও তরুণী ছিল।

কত লোকে চাইত তার মুখের দিকে—পাওয়া-না-পাওয়ার সন্দেহ দ্বন্দ্বে চোখ জ্বল জ্বল করে। সেখানে তার কেউ নেই। তবু তারও একটা বাপের বাড়ি আছে, সেখানে আছে তার অতীত যার কথা ভাবতে ভালো লাগে।

আজ বাপের বাড়ি থেকে লোক আসবে। পুয়ু যত্ন করে তার ঘরের কাজ করল। নিজের চেহারার দিকে চেয়ে দেখল— কি ভাববে তারা? ভাববে কি যে পুয়ু কেমন ছেলের মা হয়েছে! এখানে দুঃখে কষ্টে আছে, এখানে তাকে খেতে পরতে দেয় না, খালি খাটায়—এমন শুকিয়ে যাচ্ছে যে! পুয়ু নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকাল। হাতের খাড়ু পায়ের

মল একবার কেটে ছোট করা হয়েছে, তাও আবার ঢিলে হয়ে গেছে। হাসি পেল পুয়ুর। আজ আবার যেন তার ধাংড়ী মন হয়েছে! রূপের অভাব যখন মনে বড় লাগে, কোথায় কি যেন বেসুরো বাজে— মনের রাগিণী থেকে আলাদা হয়ে খুলে খুলে পড়ে।

ননদের সঙ্গে অনেক মস্করা করল—"আজ আবার আমার বাপের বাড়ি থেকে কারা সব আসবে লো, সেজেগুজে থাক, যদি তোকে পছন্দ না হয়?"

পুবুলিরও মনের ভিতর কেমন একটা চমক জাগছিল— নতুন লোকের পথ চেয়ে থাকলে ধাংড়ী মনে যে চমক জাগে। বাইরে সে সব হেসে উড়িয়ে দিলে।

দুজনেই নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হল, চুল বাঁধল। পুবুলি তার সাজ-গোজ করল। দিউড়ু আর লেঞ্জু দুজনে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেল। দুজনেরই মুখ ভার ভার, দুজনেই গরগর করছে।

গাঁয়ের পুরুষরা মাঠে চলে গেল। তরুণীরাও অর্ধেক চলে গেল। বেলা বেড়ে সূর্য মাথার উপর উঠে এক হাত নেমেও পড়েছে। পুয়ু খোকাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে শুয়ে ছিল কান পেতে। কত ক্ষণ পরে দূর থেকে গানের আওয়াজ এল, অচেনা গলায় কোনো পথিকের দল গান গেয়ে গেয়ে চলেছে, পালটা গান গেয়ে তার জবাব দিচ্ছে খেতে কাজ করতে করতে এ গাঁয়ের ধাংড়ীরা। কন্ধ দেশে ধাংড়ীর দল দেখলে ধাংড়ার দল গান গাইতে থাকে, একবার এরা একবার ওরা। পথে যেতে যেতে পথিকেরা গানে গানেই নিজেদের মনের কথা পথকে শুনিয়ে শুনিয়ে যায়। উন্মত্ত প্রকৃতি মানুষকে গান গাওয়ায়, নাচায়, মাতায়। কন্ধদেশে সব কিছু হয় গানে।

গানের শব্দ কাছে এল, পুয়ু কান পেতে শুনতে লাগল। জোরালো হয়ে গান ছলকে উছলে কাছে এসে লাগল, পুয়ু অর্থ ধরতে লাগল।

পুরুষেরা বলছে—"ওগো অচেনা মেয়েরা, সাধ করে তোমাদের নাম দিচ্ছি আমরা: নিলস, তালস, লেম্বর, জাম্বর[১], নাও তোমরা। হয়তো আমাদের মনে রাখবে। তোমরা সত্যি কি আমাদের পুছবে? জোনাকীর মতো ঝিলিক দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যাবে, 'এসি' পাখি পাতার ভিতর থেকে ডেকে উঠে যেমন লুকিয়ে পড়ে, তেমনি করে তোমরাও মুখ লুকোবে।

১ এই নামগুলির অ-কারান্ত উচ্চারণ করিতে হইবে।

তোমরা আমাদের দিকে চেয়ে থাকো কেবল কাঁকড়া যেমন তার গর্তের ভিতর থেকে চেয়ে থাকে, তা কি আমরা জানি না ? হাটে নিয়ে যাওয়া পসরার মতো আমাদের স্মৃতি তোমাদের মন থেকে কোথায় চলে যাবে। তোমরা হলে বড় লোক, তোমাদের কোঠাঘর থেকে না সর্বক্ষণ চুনের গুড়ো ঝরে! কেন তোমরা এই গরিবদের দিকে চাইবে ?"

পুরানো কালের গান। তার ধুয়া—"সুনুগুগুা ডুলানে হে"—

যেইকে মা'ল নিলস, যেইকে মা'ল তালস,
সুনুগুগুা ডুলানে হে,
যেই আর্‌গুলু বাইলে, যেই ডুম্বর বাইলে,
সুনুগুগুা ডুলানে হে।

নেহাত চেনা দেশের নেহাত চেনা গান। পুয়্ ছুটে এল। পাহাড়ের তলায় পথ বেয়ে কারা সমস্বরে গান গাইতে গাইতে উপরে উঠছে। গাঁয়ের ও-মুড়োয় একদল যুবতী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গানের জবাব দিতে লেগে গেল। দূরের যুবতীরাও একসঙ্গে দল বেঁধে পালটা গান গাইতে গাইতে গ্রামের দিকে আসছে। সুরে সুরে ঢেউ উঠছে। "সুনুগুগুার" সঙ্গে মিলিয়ে "হিংগা (হলুদ) গুগুা"—"না, তোমরা হলে ধনী সওদাগর, এত হলুদ তোমাদের, সর্বক্ষণ তোমাদের বাড়িতে হলুদের ছড়াছড়ি। দূর পথের পথিক, মান অভিমান ভুলে যাও, ক্লান্তি ভুলে যাও, কাজ তো দিনরাত আছেই। এসো, আমাদের গ্রামে এসো, আমাদের গ্রামে কিছুক্ষণ থেকে যাও। আমরা কত গান গাইব, কত নাচ নাচব। দেখা যাবে আমরা তোমাদের ভুলি, না তোমরাই আমাদের ভোল।"

পুবুলি গিয়ে দলে ভিড়েছে। কন্ধ ধাংড়ী কন্ধ ধাংড়ার গান শুনে চুপ করে থাকতে পারে না। পুয়্ হাসিতে ফেটে পড়ল। পুরানো গান, নতুন নয়। তবু যত বারই শোন হাসি পায়। হাকিনা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। গ্রামের যুবতীরা এক জোট হয়ে হটে এল গাঁয়ের গলিপথের মুখে। পাহাড়ের ঢালু পথে এক-একটি করে ছয়টি মাথা ছয়টি ঘাড় দেখা দিল। তাদের কাঁধে বাঁকের ভার আর টাঙ্গি, হাতে বর্শা আর লাঠি। পুয়্ দৌড়ে গেল, বাপের বাড়ির গাঁয়ের লোক এসেছে। সকলের আগে আছে বেস্তু কন্ধ, ধবধবে ফরসা চেহারা, বলিষ্ঠ শরীর। মিটিং গাঁয়ের রঘু সাঁওতার

ছেলে সে। খাসা জোয়ান, গভীর ঘন বনের শিকারী। তার হাতে বর্শা, কাঁধে মস্ত বড় ওড়িআ নলি। মিটিং গাঁয়ের লোকেরা ঢালুর উপরে উঠে এল, গান বন্ধ হল। ভার এসেছে ছড়া ছড়া কলা, চারটে মোরগ, ছোট ছোট ঝুড়িতে নিজেদের খাবার সরঞ্জাম, আর কুটুম বাড়ির জন্য পিঠে। পিছনে আসছে একজন বুড়ো কন্ধ—মেটা কন্ধ— সম্পর্কে পুয়ুর কাকা। একটু দূরে তফাতে লাঠিতে ভর দিয়ে আসছে এ-গাঁয়ের বারিক বুড়ো ভুর্সামুণ্ডা ডোম।

-সকলেই এগিয়ে এল, বেণ্ড কন্ধ 'ঝোড়ি' গাছের নিচে থেমে রইল। বেলা যায় যায়, ঝাঁকড়া 'ঝোড়ি' গাছ চুল এলো করে দেওয়া কন্ধনীর মতো থমকে দাড়িয়ে আছে। হরিয়াল পাখিতে 'ঝোড়ি' গাছের কুল খাচ্ছে। বেণ্ড কন্ধ ভাবলে একবারেই তার কেরামত দেখাবে, কুটুম বাড়ির জন্য সওগাতের ব্যবস্থাও করবে। বন্দুক তুলে বেণ্ড গুড়ুম করে ছুঁড়ল, চারটে হরিয়াল পাখি পড়ল। গাঁয়ের সবাই দৌড়ে এল। এ-গাঁয়ের লোক ও-গাঁয়ের লোকদের অভ্যর্থনা করে গ্রামের ভিতরে নিয়ে এল। দিউড়ু সাঁওতাকে মাঠ থেকে ডেকে আনতে লোক গেল।

॥ দশ ॥

গাঁয়ের মাঝখানে বড় চেটালো পাথর পড়ে আছে, বসবার জায়গা, গাঁয়ের ভেরামণ্। সবাই সেখানে গিয়ে বসল। আগে তামাক পাতা দেওয়া-নেওয়া। কোমরের কৌপীনের ডোর থেকে, মাথার চুলের ভিতর থেকে বড় বড় পাতার কলকের মতো ধুঙ্গিআ বেরুল। কুরুহেই গাছের একটা শুকনো ছোট ডালের উপরে আর একটি ছুঁচালো কুরুহেইয়ের ডাল সোজা করে বসিয়ে দু হাতে মউনি করার মতো করে একটু আগুন করল কেউ। আগুনে ধুঙ্গিআ ধরানো হল। গল্পসল্প শুরু হল। ধুঙ্গিআর ধোঁয়া খাওয়ার আসর বসে গেল কন্ধ রীতিতে। কেবল হাসি মস্করা আর পথঘাটের কথা।

কন্ধ আর ধুঙ্গিআ— অভিন্ন সঙ্গী। গল্প চলছে, ছেলেবুড়ো সকলেই

গুলতানি করছে, সকলেই ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ছে। কাছাকাছি ঘেঁষে বসে অনর্গল গল্প—

এ বছর বাঘে খাওয়া বেশি নেই, হয়তো এর পর হবে। পথে একটা বাঘ ছিল। একটা শুওর বনের মধ্যে কোথায় খুট খুট ঠক ঠক করে আওয়াজ করছিল। বাঘ যাকে খায় তার প্রেত বাঘভুমা হয়ে বনের ভিতর ঘুরে বেড়ায়, ছোট ছেলের মতো দেখতে, মাথায় চুল নেই, চোখ আর ঠোঁট খুব লাল। পথে আসবার সময় ঘন বনের মধ্যে বাঘভুমা কাঠ কাটছিল, কচি ছেলের মতো কাঁদছিল। এই শুনেই পাণ্ডু কন্ধ কান খাড়া করে চোখ কুঁচকে বলে উঠল—"কোথায়, কোথায়?" সে ডিসারি, তার বিদ্যা জানা আছে। এমন বন্ধন করে দেবে যে বাঘভুমা আর দেখা দেবে না। নইলে বাঘভুমা সবাইকে ভয় দেখাতে থাকবে, মানুষখেকো বাঘের লেজের উপরে বসে তাকে আরও মানুষ খাওয়া শেখাবে, তাকে মানুষের গোষ্ঠীর সব কায়দা কেতা বাতলে দেবে।

হাঁ, পথে কুট্‌রা কান নেড়ে নেড়ে শ্যামা ধান খাচ্ছিল। ভারী চালাক সে, খেতের মাঝখানে আসে না, খেতের ধারে ধারে জঙ্গলের কাছে কাছে চরে। বেশু কন্ধ ছুটে গিয়েছিল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে, কুট্‌রা শব্দ পেয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। হাঁ, তা হবে না কেন, প্রবাদই আছে 'দেখতে ময়ূর শুনতে কুট্‌রা'। সত্যি কথা।

চার দিকে ফসল কাটা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কি হবে? এই বোঝা বোঝা ফসল সবই তো ঢুকবে গিয়ে সাহুকারের ঘরে। খেতে হাল দেবার আগেই পেট জ্বলার দিনে সাহুকার এসে অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছে, তখন থেকেই দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেছে। মুখ দেখে দর। কারও কাছ থেকে টাকায় কুড়ি 'মাণ' ধান, কারও কাছ থেকে ত্রিশ 'মাণ'। এই সময়ে দাদনে কেউ টাকা নিয়েছে, কেউ নিয়েছে চারটি ধান, কেউ বা খেয়েছে দুফোঁটা মদ। তারই জন্য এখন সাহুকারের ঘরে ঢেলে দিতে হবে কন্ধ দেশের সমস্ত ফসল, ধান, মাড়ুয়া, শ্যামা ধান, কান্দুল (বড় অড়হর), তিল, অলসি, রেড়ি—সব। কোন গাঁয়ে কোন দিন সাহুকারের দূত এর মধ্যে দেখা দিয়েছে সে কথা হচ্ছিল।

এরপর অধিকারীদের (সরকারী কর্মচারী) কথা। এই ফসল কাটার

সময়ে তাদেরও দেখা পাওয়া যায়। কেউ আসে খাজনা আদায় করতে, কেউ ঘর তল্লাসি করতে। তাদের মালপত্র বাঁকে বইবার জন্য ভারী চাই, তাদের দেবার জন্য জিনিস চাই, অনেক জিনিস চাই। কন্ধভাইরা তাদেরও সন্তুষ্ট করবে। তাই দুই গাঁয়ের কন্ধরা একত্র হলে অধিকারীদের শিকারের কথাও হয়।

তারপর গরু-রোগের কথা, কে তুক করে পরের গরু মেরে ফেলে, কে বিষ দেয়, কুঁচ ফল ভিজিয়ে বেটে তাই ছুঁচালো কাঁটায় মাখিয়ে গরুর গায়ে ফুটিয়ে দেয়, আবার নির্জন খদের মধ্যে গরুর দুই শিঙের মাঝখানে টাঙির উলটো পিঠ দিয়ে এক ঘা মারে। এই সব যত ফিকির কেবল ডোমেদের। তারা নিজের হাতে চাষ করা পছন্দ করে না, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙে। এই শীত কালে খেতের ফসলের সঙ্গে দেদার চামড়াও যায় হাটে।

দুই গাঁয়ের লোক একসঙ্গে বসে কন্ধজীবনের বিশিষ্ট ঘটনার আলোচনা করছে। গল্প শুনতে স্ত্রীলোকেরাও এসে জমল। বাচ্চা কোলে ডোক্রীরা (বিবাহিতা কন্ধ নারীরা), খোঁপা বেঁধে মুখে তেল হলুদ মেখে ধাংড়ীরা। কন্ধ সমাজে শিষ্টাচারের অভাব নেই, কন্ধদের বৈঠকে মেয়েদেরও স্থান আছে। তারা নিজেদের মতামত দেয়, আলোচনাকে এগিয়ে দেয় সরস করে।

বেগু কন্ধ আবার শিকারের গল্প আরম্ভ করল। তার কোলে ওড়িআ নলি, বর্শা মাটিতে পড়ে আছে, তার ফলাটা রয়েছে কোমরের কাছে। উত্তেজিত চোখে, তরল কপালে নানা ভাব খেলিয়ে বেছে বেছে সে অভিজ্ঞতার নানা কাহিনী বলতে লাগল। তার গাঁয়ের লোকেরা মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে, আর এ গাঁয়ের লোকেরা চুপ করে শুনছে। জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে একা বনের ভিতর ঢুকে শিকার করা—যাকে বলে ডোক্রা বেন্ট— তার গল্প। আবার রাত্রিতে মাচানের উপরে পাতার কুড়েতে ওত পেতে বসে থাকার কথা, নিচে বাঘ চড় চড় করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার শিকার খায়। বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার গল্প, বাঘের চোট থেকে প্রাণ বাঁচানোর গল্প, যা শুনলে চোখের পলক পড়ে না, গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। সবাইকে মাতিয়ে দিল বেগু কন্ধ। হরিয়াল পখির ডাক চাপা পড়ল, ময়ূরের ডাক চাপা পড়ল, সব কিছু চাপে ফেলে বেগু কন্ধের গল্পে

জেগে উঠল কোথায় পাহাড়ের খোলের ভিতর কোন এক মিটিং গাঁ, সেখানে বকের পাখার মতো ধবধবে ছলছলে নদী চম্পা ঝরনা, সেখানে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে গহন বন যেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না, আর সারাক্ষণ থেকে থেকে গুড়ুম গুড়ুম শিকারীদের বন্দুক ফোটে, শিকার চলতে থাকে দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে।

॥ এগারো ॥

সন্ধে হল, লোক জমল। দিউড়ু আর লেঞ্জু ঘরে ফিরল। হাকিনাকে বাইরে আনা হল। ছোটখাট একটি পুজো সেরে তার বাপের বাড়ির লোকেরা একসঙ্গে তাকে আশীর্বাদ করল :

"দীর্ঘায়ু হ—
বনের ছেলে, বনের মতো সর্বদা পূর্ণ হ তুই।
তোর জীবন ঝরনার মতো বয়ে চলুক।
সুখে থাক শান্তিতে থাক, স্ত্রীপুত্র ধন জন কিছুতে তোর অভাব না হোক।"

বাজনা বাজছে। উভয় কুলের লোকেরা বসে রয়েছে। একটুখানি আগুন জ্বলছে। ছোট একটি ছায়ামণ্ডপ তৈরি হয়েছে। পুরোহিত (জানি) মন্ত্র পড়ছে, সব দিন, বার, মাসের নাম নিয়ে কন্ধ দেশের প্রত্যেকটি পর্বতকে স্মরণ করে করে মঙ্গল বর্ষণ করছে। সমস্ত মঙ্গলের মধ্যে বেড়ে উঠে সরবু সাঁওতার ডুমা দিউড়ু সাঁওতার ছেলে স্বাধীন আনন্দে হাসিখুশিতে দিন কাটিয়ে যাবে এই কন্ধ পৃথিবীতে। দেশ উজ্জ্বল হবে, কুল উজ্জ্বল হবে।

অন্তহীন মন্ত্রের স্রোত, কন্ধদেশের অন্তহীন গানের মতো। ডুড়ুম ডুড়ুম বাজনার সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল স্তোত্র চলেছে। সেকালের পৃথিবীর ছেলেবেলার কথা। কেবল কাদা জলের দেশ, গাছপালা নেই। তারপরে প্রথম কন্ধ কন্ধনী, ধর্তনীর প্রথম ছেলেমেয়ে, জন্ম নিল। প্রেতেরা তাদের খাবার জন্য ধাওয়া করল। সাত দিন পর্যন্ত অন্ধকার করে মহাপ্রভু তাদের লুকিয়ে রাখলেন। শিমুল গাছের ডোঙায় বসে তারা ভাসতে থাকল। তারপর

আলো ফুটল, মাটি শুকাল, জঙ্গল গজাল, মহাপ্রভু বললেন—"ঘর সংসার কর।" কিন্তু যতবারই তিনি দুজনকে একসঙ্গে করেন, তারা বলে, "আমরা ভাইবোন।" দুজনকে আলাদা আলাদা করে মহাপ্রভু বনের মধ্যে কতবার তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এনে আবার এক ঠাঁই করলেন, তবু সেই চেনাচেনি, ভাইবোন বলে। মিলতে তারা রাজি হল না। বাধ্য হয়ে মহাপ্রভু বসন্ত রোগ সৃষ্টি করলেন, তাইতে ভাইবোনের চেহারা বদলে গেল। পরস্পরকে চিনতে না পেরে তারা স্বামী-স্ত্রী হযে ঘর করতে লাগল। তাদের সাতটি ছেলে হল, প্রথমটি মিণিআকা, দ্বিতীয়টি হিমেরিকা, তৃতীয় হিকোকা, তার পরে প্রাস্‌কা, মুষ্‌কা, জাম্‌বাকা, মেলাকা। প্রত্যেক ছেলেব নামে এক-একটি বংশ। আবার নাতিদের নাম অনুসারে বংশ। বেড়ে চলল দেবতারা। আইন হল, ইতিহাস হল। তারপব দেশ গেল, সভ্যতা ভাঙল, সব গিয়ে কেবল রইল আদিম পর্বতমালা, সেও দেবতা, সেও স্মরণীয়— প্রাচীন গিরি-কন্দরের ভিটেমাটি। সব যাবে, থাকবে ঐটুকু, ঘন জঙ্গল মুড়ি দিয়ে হারানো অতীতের বিস্ময় ঢেকে আকাশে মাথা তুলে মহাবলী পর্বত শিখবী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালি (শিখরী) আব দমক (চেটালো-মাথা পাহাড)—কন্ধ সংস্কৃতির বিকট স্মারক।

কাণ্ডারাণিতি—টিণিবাণিতি
রেকমাড়িতি—কুলের্‌-পাণিতি
কোড়িহিঁমাড়িতি—শোবাহাঁমাড়িতি
পাণ্ড্‌মাড়িতি—ডণ্ড্‌মাড়িতি
হাতীমাড়িতি—বাযামাড়িতি
গুআমাড়িতি—আন্দামাড়িতি
পাশাপাটিআতি—সোদাতাড়িআতি
লেঞ্জুওআলিতি—রাস্কাকোটাতি[1]

১ মাড়ি—মালি (শিখবী); কাণ্ডাবাণি—নামান্তরে হাতীমালি পর্বত, চাবঅড়ার গ্রামেব কাছে; টিণিবাণি—লচুমণি গ্রামেব কাছে বিশাল পর্বত, 'টিণি' অর্থ বিদ্যুৎ; রেকমাড়ি—কাকিবিগুম্মা গ্রামের কাছে; কোড়িহিঁমাড়ি—চেম্মা গ্রামের কাছে অত্যুচ্চ পর্বত; শোবাহাঁমাড়ি—নাবণপাটনার কুম্‌হাবুরুপুট্টি এর কাছে; পাণ্ড্‌মাড়ি— দাণ্ডবাড়ি গ্রামের কাছে, পঞ্চড়া থেকে দশমস্ত্‌পুর যেতে পথে পড়ে; ডণ্ড্‌মাড়ি—দশমস্ত্‌পুর অন্তর্গত

এই সংস্কৃতির উপরে সামনে মুখ করে শাল গাছের মতো দাঁড়াবে মিণি-আকা হাকিনা। তার নামকরণের পিছনে রয়েছে তার বাপের বাড়ির আর মামার বাড়ির দুই কুল, তাই তো এত পূজা, এত মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন। পৃথিবী— মানুষের জন্ম— কন্ধ জাতি— কন্ধদেশের সদা জাগরূক ভীষণ গিরিশৃঙ্গ—মিণিআকা হাকিনা। এত মন্ত্র শুধু এইটুকু বোঝাতে যে সে কোথাকার কেউ নয়, কালকের বেঙের ছাতার মতো হঠাৎ সে গজিয়ে ওঠেনি, শেওলা নয়—সময়ের প্রভাবে নিজের চিত্র বিস্তার করে চোখ ধাঁধিয়ে গতকালের অন্ধকারের পর থেকে আগামী কালের অন্ধকারের পূর্ব পর্যন্ত যার মেয়াদ। সে কোথাকার ভেসে আসা কেউ নয়, নয় এমন কেউ যার বাপের কুল নেই মায়ের কুল নেই, বনিয়াদ নেই অতীত নেই— যে শুধু পাহাড়ের ঢালুর হলদে নির্মূলী আলগা-লতা, পরগাছা, কাঠের উপরে গজানো ছাতা।

বাজনা বাজছে, মন্ত্রপড়া চলেছে কতক্ষণ ধরে। এর মধ্যে তামাক পাতার ধোঁয়া ফুরাল, মদ খাওয়া শুরু হল, ফুরাল। ছোটখাট ভোজ একটা হল, দুই পক্ষের লোক তাতে পাত পাড়ল।

মিণিআকা হাকিনা কন্ধ গোষ্ঠীর একজন হল।

॥ বারো ॥

গা ছম-ছম করা রাত। দুই ঘড়ি রাতে চাঁদ উঠল। দূরের ছুঁচালো পাহাড়ের উপরে ঝিকমিকে একখানি কাস্তে। কাস্তে একখানি— এই পৌষ মাসেই না ফসল কাটার পালা, কন্ধ ডিসারির মেড়িংশিরা যোগে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। দূরের ‘পরজা’ জাতির গ্রাম থেকে পৌষ পরবের গান শোনা যায়, শোনা যায় কন্ধ জুড়ী বাঁশিয়ালের বাঁশিতে জোড়ায়

যোড়িপাই-এর কাছে ; হাতীমাড়ি— মিচিং ও চম্পা ঝরনার কাছে ; বায়ামাড়ি— নারণ-পাটণার আত্‌মা পর্বত, বারামাল অঞ্চলে ; গুআমাড়ি— গুআমাল অঞ্চলের বড় পর্বত ; আন্দামাড়ি— মুদারি মুঠার প্রসিদ্ধ দেওয়ালির উচ্চতম শিখরী ; পাশাপাটিআ— কাপ্‌সিগুট্টি-এর বিখ্যাত দমক ; সোদাতাড়িআ— বিজাঘাটির উৎরাই অঞ্চলের বিখ্যাত দমক।

জোছনায় পাহাড়ী রাগিণী। চাঁদ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে উঠল আনন্দ কোলাহল। পাড়ার অল্পবয়সী মেয়েরা এবাড়ি ওবাড়ি করতে লাগল। ছেলেপিলেরা মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। গলি-পথে জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে। আগুনের চারিধারে গাদাগাদি করে এক-এক দল বসে গল্প করছে। পুবুলিকে ডাকতে এসেছে তার সঙ্গী মেয়েরা— রেন্দ, পুলমে, কাঠ্‌ক, টিট, জংজই। একা ঘরে বসে কেন? শীতের চাঁদনী রাতে হিমেল জ্যোৎস্নায় একসঙ্গে গান গাইতে গাইতে পাড়ার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো কতবার পাক দিতে হবে না। পুবুলিও ঘরে বসে বসে ঠিক এই কথাই ভাবছিল। পথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, দুই দিকের ছোট ছোট কুড়ে ঘরগুলি মাথা নুইয়েছে সেই আলোয়। এই গ্রামে আজ নতুন লোকেরা এসেছে। হাসি শোনা যাচ্ছে, শিটি শোনা যাচ্ছে, সুরুড়ি (বাঁশি) ডাকছে। মেয়েরা গান করতে করতে বাইরে বেরিয়ে পড়ল, ছেলেরা এক জায়গায় জড় হল। মুরুব্বি লোকেরা জ্বলন্ত খড়ের দড়ি নিয়ে খেতের দিকে গেল, লেঞ্জুও গেল।

ধীরে ধীরে গাঁয়ের গলিপথে গান রঙ্গ-তামাশা গড়িয়ে চলতে থাকল। বুড়ো জামিরি কন্ধ গাঁয়ের বারিককে ডেকে বলল—"ছেলেমেয়েদের সাধ হয়েছে, এইবার ডোম বাজনা আনা।"

মেয়েরা মিটিং গাঁয়ের লোকদের লক্ষ্য করে গান গাইতে লাগল। আদর করে তাদের নাম দিল: লেউরা, জিরু, কেব্‌ডা, আর্‌গু। গান গেয়ে গেয়ে নাম দেওয়া চলতে থাকে। মিটিং গাঁয়ের লোকেরাও প্রত্যুত্তরে মেয়েদের নাম দিলে: ডেংজুরি, ওআএরি, নিলস, তালস, আন্দুজোড়ু, পাংগুজোড়ু। গানের উপর গান, গাইতে গাইতে নাচ। একসঙ্গে কোমর ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে যুবতীরা যুবকদের দিকে এগিয়ে আসে, হাত-পা নেড়ে গান গাইতে গাইতে যুবকেরা নেচে নেচে এগিয়ে আসে যুবতীদের দিকে। নাচে গানে সকলের আগে আগে থাকে বেঙু কন্ধ, আশেপাশে থাকে তার দলের জোয়ানরা-- সুব্‌রি, জাগিলি, আর্জু, লেতা। গানের নেশায় পৌষের শীত কারো গায়ে লাগে না। প্রথমে সাধারণ আদরের গান, স্নেহের ডাক, মধুর সম্বোধন। আস্তে আস্তে মাত্রা বেড়ে চলে: "এসো গো মেয়েরা, তর তর করে পা ফেলে, ছাগলের মতো গরুর মতো যাদের পা,

এসো এসো, সাপ আর বেঙ একসঙ্গে মিলি এসো (পাইন পাইন রাচুড়ে কুড়াইঁ)।” গানের নেশায়, বাজনার তালে, এতবার কাছে এসে পিছিয়ে যাওয়ায়, ধাংড়ীদের সান্নিধ্যে ধাংড়াদের রক্ত তেতে উঠতে থাকে। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা আরো ঘন করে, হাতে হাত বেঁধে, সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দুলিয়ে, থেকে থেকে তরতরিয়ে এগিয়ে আসে ধাংড়ীরা।

“থুঙ্গিআ ইচন হিয়া মু, গাজিআ ইচন হিয়া মু”
(তামাকপাতা একখানা দে)

ধাংড়াদের গান আরো উগ্র হয়ে ওঠে, নিঝুম হিমেল রাতের আকাশ থেকে নেমে আসে কাদা-মাটির পৃথিবীতে, যেখানে শুধু মাটির ব্যাপার, যেখানে স্বজন হয়, ফুল নানা ফাঁদ পাতে ভ্রমরের কাছ থেকে পরাগ পেতে, ফল ফলাতে, যেখানে কচি ডালে মুকুল ধরে, জন্ম নেয় ছোট ছোট শিশু, ছোট ছোট আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে মাটিকে। ধাংড়াদের মত্ত গর্জনে শোনা যায় ষাঁড়ের হুঁকার, গান ছোটে: “জীবনে শ্রেষ্ঠ-মিলন, সেই জীবনের চরম, ফুল কেবল মাটির পাত্র, তাতে পরাগ ঝরে, রস ভরে; ওগো ফুল, সংসারে তুমিই সব নও।”

“আঁটালো বাঁশ ভারী শক্ত (নিমাদেরু জম্বেএ)।” ধাংড়ারা গান গাইতে থাকে—

পুচি রুম্বেলি পুয়ুলো
তাণ্ডি শুগেলি পুয়ুলো
নিমাদেরু জম্বেএ—

ধাংড়ীরা সেই বহুকণ্ঠের ধুয়ো ধরে, তাদের চোখে নেশা, মুখে স্বপ্ন, সর্বাঙ্গ টলমল। ধাংড়ী ধাংড়া একসঙ্গে মিলেমিশে উত্তুঙ্গ পাহাড়ে গভীর খদে ভাসিয়ে দেয় গানের মালা—নিমাদেরু জম্বেএ। এইটুকুতেই সব, প্রকৃতি ও পুরুষ, আকাশ আর মাটি। বাহিরে সৃজনী শক্তির মায়া, ভিতরে দারুব্রহ্ম। আর অনাদি দেবতা, যোগীশ্বর মহাদেব, অর্ধনারীশ্বর!

গাঁয়ের সকলে গানে আর নাচে যোগ দিয়েছে, বুড়োরা দেখছে; দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে চলে-যাওয়া যৌবনকে ফিরিয়ে এনেছে। কন্ধ যৌবন ভালবাসে, জীবন ভালবাসে, একবার নাচ-গান শুরু হলে মেতে থাকে তারা সারা রাত। বুড়োবুড়ী সবাই গিয়ে জড় হয়। তারা তাদের

আইবত্ত ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা দিয়েছে। ধাংড়ার ইচ্ছার উপর কারও লাগাম নেই, সমাজ দূরে সরে থাকে, লাগাম দেয় বিয়ে হয়ে গেলে।

অনেক রাত হয়েছে। নিমাদেরু জয়েএ—এর পরে সব গোলমাল হয়ে গেল। গান বন্ধ হল, কে কোথায় গেল তার ঠিক নেই। নিশিতে পাওয়ার মতো পুবুলি আর তার পাঁচ সখী মিটিং গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে গিয়ে মিলল গাঁয়ের কাছে পাথরের আড়ালে। কথাবার্তা অল্প, খালি কাছাকাছি দুই দল। পুবুলি বেগু কন্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, বেগু কন্ধ সুরুড়ি (বাঁশি) বাজাচ্ছিল। ছায়ার মতো পুবুলি দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের ওপাশে। সুন্দর চেহারা বেগু কন্ধের, তার তামাটে চুল চিকচিক করছে জ্যোৎস্নার আলোয়। পুবুলি হরিণীর মতো গলা উঁচু করে তাকিয়ে আছে অচেনা অতিথির দিকে। মুখে কথা নেই, দেহে গতি নেই।

জ্যোৎস্না, আর বাঁশির প্রাণমাতানো কান্না আর বলিষ্ঠকায় শিকারী বেগু কন্ধ—সব মিলে একটা যেন আদর্শ, যে-আদর্শ কন্ধনী ভালবাসে। হাগুর্ণার কথা আর তার মনে ছিল না। হাগুর্ণা ছেলেবেলার, বেগু কন্ধ যৌবনের। এই বেগু কন্ধ যেন তার মনের প্রশ্নের উত্তর, যেন এত বছর ধরে সে অপেক্ষা করে ছিল এই রাতটির জন্য, এই মানুষটির জন্য, এই যেন তার জীবনের প্রভাতী।

বেগু কন্ধ বাঁশি রেখে দিল, দু জনেরই হুঁশ হল। নির্জন রাত্রি। সঙ্গী সাথীরা কে কোথায় গেছে, টপ টপ করে শিশির পড়ছে। পুবুলি ফিরে চলল, ছোট একটি ছায়া। মনের নেশা ছাড়েনি, চলেছে সে এঁকে বেঁকে, চাঁদনী রাতের প্রজাপতির মতো। বেগু কন্ধ কাছে এল। কাঁপা কাঁপা চাপা গলায় পুবুলিকে চমকে দিয়ে বলল, "বস্নপি" (হে যুবতী)। কন্ধ দেশে গোপন কথার ইশারা এই "স্ন", দুটি মনের একান্ত ঘনিষ্ঠ কথার জন্য। পুবুলি ঘুরে দাঁড়াল, চাঁদের আলো পড়ছে বেগু কন্ধের তেতে ওঠা চোখে, নাক ফুলে ফুলে উঠছে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, নীচের ঠোঁট এগিয়ে আসছে সামনে। তার কেঁপে কেঁপে ওঠা সুডৌল চওড়া বুক পুবুলির দিকে ঝুঁকিয়ে, বেগু কন্ধ "স্ন" ইশারায় আবার বলল, "বস্নপি।"

পুবুলি জবাব দিল, "এস্নেনা দাস্নাদা?" (কেন ডাকছ?)

বেগু কন্ধ পিছিয়ে গেল, ঢোক গিলতে গিলতে বলল, "লোস্নড়া স্নাস্নানো"

(কাজ আছে)। শুরু হল কন্ধ দেশের প্রাচীন মন দেয়া-নেয়ার কথাবার্তা, প্রশ্ন আর উত্তর, উত্তর আর প্রশ্ন, অবিকল যেমনটি হাজার হাজার বছর ধরে হয়ে এসেছে কন্ধ দেশে, অচেনা তরুণ তরুণী যতবার পাথরের আড়ালে গাছের আড়ালে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পূর্বরাগের রাগিণীতে পরস্পরকে সম্ভাষণ করে এসেছে, হাসিতে ভালবাসাতে জন্ম দেওয়াতে কন্ধ ধরিত্রীতে বারবার নতুন করে সাজিয়েছে সেকাল থেকে একাল অবধি।

পুবুলি কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে দাঁতে আঁচল চেবাতে চেবাতে পা নাড়াতে নাড়াতে বলল, "ওএস্লেস্মু" (বল)।

বেণ্ডু অধীর হয়ে বলে উঠল, "হিস্নিয়াদেকি আস্নাএ ?" (দিবি কি না ?)

পুবুলি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুচকি হেসে বলল, "এস্লেহ্না আস্না হেলোওঁ" (কিছু তো আমার হাতে নেই যে দেব)।

বেণ্ডু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "তুস্নুআঁ হিস্নেয়ামু" (তামাক-পাতা থাকে তো দে)।

পুবুলি সহজভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "ইস্নিম্বি তাস্নানা পাস্না মাস্নাইঁ ?" (কোথায় পাব ?)

বেণ্ডু বলল, "দেস্নেদে হিস্নিয়াস্নামু" (একখানা থাকলে দে)।

পুবুলি বলল, "এস্নেনাতানা হিস্নিয়াই ?" (কোত্থেকে দেব ?)

বেণ্ডু সাগ্রহে নিজের ট্যাঁক হাতড়াল। বলল, "নিস্নিংগে হিস্নিয়া হিলাআতেহেঁ নাস্নান্নু" (আমি তোকে দেব)।

পুবুলি খিলখিলিয়ে হেসে বলল, "তাস্নাতিহেঁ" (দাও তবে।)

বেণ্ডু তামাক-পাতা বাড়িয়ে দিল, পুবুলি নিল, আবার মুখ নিচু করে চলল। কিছু দূর যেতে না যেতে বেণ্ডু কন্ধ পিছন থেকে এসে আস্তে তার আঁচল ধরে টান দিল, কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় আবার বলল, "বস্নপি" (হে যুবতী)।

পুবুলির সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, বলল, "এস্নেনা দাস্নাদা ?" (কি ?)

বেণ্ডু নরম করে মন ভোলাবার সুরে বলল, "নাস্নাতানা নেস্নেহি মস্নাস্নুভি ?" (আমার সঙ্গে ভালভাবে থাকবি কি ?)

পুবুলি বলল, "মাস্নানা আতিহেঁ নিস্নিম্নুএ" (কেন থাকব না, তুমিই বরং

থাকবে না।) আবার বলল, "নিস্নিইঙ্‌" মা নাম্নাটো ওআম্নাক্তিরেঁ ইম্নিনি কাম্নাতা যোম্নালাইঁ" (তুমি আমাদের গাঁয়ে এসে থাকলে তবে না যা কিছু কথা বলতাম।)

বেশু বলল, "ওআম্নানি যাকে ইম্নি ইম্বিআ যোম্নোলাদি, উম্ন্‌জেএ ওআম্নাইঁ" (এখানে এলে তবে কথা বলবি ! মিথ্যে আসা।)

পুবুলি বেশুর দিকে মুখ তুলে চাইল, হেসে বলল, "ওআরতিহিঁ নিসাঁ কাম্নোর্যোমি।" (তুমি এলে তবে না— । ঘর-জামাই হয়ে এস।)

বেশু বলল, "আম্নাৎ ওওঁ" (পারব না)। "হেম্নো ও গ্‌গাঁআঁ বাম্নামু" (তুই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 'উচ্লিআ' চলে আয়)।

পুবুলি বলল, "লাম্নাজা আম্নাএ কি ?" (আমার কি লজ্জা নেই ?)

পুবুলি আবার দু পা এগিয়ে গেল, বুকের ভিতর ঝড় বইছে, ঝড় উঠে আসছে চোখে। পিছন পিছন বেশু ছুটে এল, চেঁচিয়ে উঠে বলল সাফাইয়ের সুরে—"কাম্নার্যোমি আম্নানওঁ" (ঘর-জামাই হয়ে আসতে পারব না)।

পুবুলি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, "ও আম্নাল্‌কা ওআম্না হোদিকি ?" (ঘর-জামাই হলে তোমায় পাথর ভাঙতে হবে না কি ?)

বেশু অতি আবেগের সঙ্গে বলল, "ওআম্নামু" (বেরিয়ে আয়।)

পুবুলি সরে গেল। সে চলে যাচ্ছে, মনের ভিতর তোলপাড়। মন বলছে সে হেরেছে কিন্তু বিজয়ের উল্লাস-কলরোল শোনা যাচ্ছে মনের গভীরে। সে চলে যাচ্ছে, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত তালে, কিন্তু পাদুটিতে গতিবেগ নেই, চলন তার নির্জীব। বেশু অসহায়ের মতো চেয়ে রইল এক মুহূর্ত, তার ধৈর্যের বাঁধ টুটল। দুই লাফে সে কাছে এসে পুবুলির কাঁধে হাত রাখল, তার গালের কাছে মুখ নামিয়ে এনে আবার বলল, "বম্নপি।" তার তপ্ত নিশ্বাসে পুবুলির গাল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল তার মুখের দিকে, মনে হচ্ছিল গা এলিয়ে দেয়। চোখ দুটি বুজে এল, তবু বলল—

"লাম্নাজা, কুম্ন্‌ইঁ" (লজ্জা, না না)।

বেশু পটানোর সুরে তার কানে কানে বলল, "এম্নেম্বা এম্বারি হিলেরি" (এখানে কেউ নেই।)

পুবুলি তেমনি আচ্ছন্নের মতো বলল, "লাম্নাজা, কুম্ন্‌ইঁ (লজ্জা করছে, না না)।

আস্তে একটা টান দিয়ে সে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, চলে গেল ধীরে ধীরে। বেণু বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল সেই দিকে। পুবুলির ছায়া ঘরের কাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল কে জানে কোথায়।

বেণু কন্ধ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে গেল তার বাসায়।

॥ তেরো ॥

সেই পাথরের ঢিবির কাছে গ্রামের ডিসারি পাণ্ডু কন্ধের কুটির। বুড়ো পাণ্ডু কন্ধ পাথরের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে বসে নক্ষত্রের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশে এই যে সব ছোট ছোট জ্বলন্ত বিন্দু তাদের প্রভাব পড়ে মানুষের ঘর-গেরস্তালির উপর। তাদের যাওয়া-আসা টানা-হেঁচড়ায় তৈরি হয় 'যোগ'। কোনো যোগে ভাল হয়, কোনোটাতে বা মন্দ। মোট সাতাশটি নক্ষত্র, তাদের নামে সাতাশটি যোগের নাম। যোগ ভাল না হলে কন্ধেরা বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় না। এই জন্য ডিসারির রাতভর পরিশ্রম।

গাঁয়ে আজ এত হইচই হল, পাণ্ডু ডিসারি কেবল কিছুক্ষণ সেখানে বসে চলে এল। তার মন আকাশের তারার দিকে। সকাল হতেই লোকে জিগ্যেস করবে ফসল কাটব কখন? ডিসারিকে বলতে হবে মেড়িংশিরা যোগ কখন পড়বে। কখন ফসল ঘরে তুলতে হবে? খোঁজ উত্রা যোগ। অন্ন ছাড়াবার জন্য বেজুনীকে কবে নাচাতে হবে? লদা যোগ ঠিক করে দিতে হবে।

ডিসারি নিজে পরিশ্রমকে ভয় করে না। কিন্তু সে সংসারের হাল চাল দেখে, নক্ষত্রদের দেখে, দেখে যোগ অনুসারে ফল ফলে যাচ্ছে। কারও বা কত কষ্ট করে তৈরি করা ঘর ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে, কারও গাই গরু মরে যাচ্ছে, কারও ছেলে মরে যাচ্ছে। পরিশ্রমের মূল্য আরো পরিশ্রম, রুখু মাথায় তেল আর পড়ে না।

ডিসারি তখন খোঁজ করছিল জেটি যোগের। একজন এসে জিগ্যেস করে গেছে ঝোরার খাড়া পাড় ভেঙে সে ধানের জমি তৈরি করবে। ডিসারি উপর পানে চেয়ে চেয়ে অস্থির হচ্ছিল। এমনি সময়ে দেখল মিটিং গাঁয়ের

ধাংড়ারা আর এই গাঁয়ের একদল ধাংড়ী পাথরের আড়ালে আসছে। ডিসারি ঘাড় নাড়ল, ঠিক কথা রেদাসি যোগ পড়েছে, এই যোগে ধাংড়া যায় ধাংড়ীর সন্ধানে। ডিসারি হাসল। গেল তারা পাথরের ঢিবির কাছে। হয়তো ভাবছে কেউ জানে না, কেউ বুঝি আসেনি এই দিকে। কত বার পাথরের উপরে বসে সে দেখেছে তরুণ-তরুণীদের দল চলে এসেছে এই পাথরের ওপাশে ঠিক এই রেদাসি যোগে! তারা ভাবে তাদের এ-কাজ পৃথিবীতে এই নতুন, আর কেউ কখনো এই পথে আসেনি, আর কেউ এমন ভালবাসেনি। নিজের জীবনে কতবার এই রেদাসি যোগ এসেছে। ডিসারি ভেবে চলল—সেও মানুষ, সেও যোগের অধীন। ভাবল, এই প্রকাণ্ড পাথরটা কোন যোগে তৈরি হয়েছিল, নিশ্চয়ই কোনো শুভ যোগে, ধরা যাক রোহিণী যোগে। পাথরের কাছ দিয়ে কয়েকটি যুবক-যুবতী চলে গেল। ডিসারি আশ্চর্য হল, কই রেদাসি যোগ তো এখনো যায় নি। বাঁশি বাজল। তার কতক্ষণ পরে 'বম্নপি'—'এম্নেনা দাম্নাদা'। ডিসারি মাথা নাড়ল, যোগ ব্যর্থ হতে পারে না, এই যোগের লক্ষণই এই রকম। সব সে দেখল, শুনল। সব ঠিক চলেছে, সেই প্রাচীন রীতিতে, সম্ভাষণও ঠিক সেই রকম। ভালবাসলে মনে হয় যেন নিজের এই ব্যাপারটিই পৃথিবীতে একেবারে নতুন, আর সবই পচা, পুরানো কেবল ধুলো কাদা, গাছ পাথর। কাঁচা বয়সের এই ঔদ্ধত্যকে বুড়ো ডিসারি ক্ষমা করতে শিখেছে। ঐ—কানের কাছে মুখ নিয়ে গেছে—কি যে করে এরা—মা না, আলাদা হয়ে চলে গেল—ঠিকই বটে, ঠিক ঠিক। তবে এরা চলে গেল বটে, কিন্তু আবার এদের দেখা শোনা হবে, রেদাসি যোগের কথাবার্তা এইটুকুতেই শেষ হয় না। এখন শুধু রেতি যোগ পড়তে যা দেরি, রেদাসির মন দেওয়া-নেওয়া তখন এসে দাঁড়াবে বিয়েতে। সামনে চৈত্রের পরব, তখন আসবে রেতি যোগ। পাণ্ডু কন্ধ আরো ভাবল—ছোকরাটি কে জানা নেই, চেহারাটা খাসা, কাজে মজবুত হবে নিশ্চয়ই। ছুকরীটি সরবু সাঁওতার মেয়ে। ডিসারি তারার দিকে চেয়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম করল। সরবু সাঁওতার প্রস্তাব ছিল বন্দিকার গ্রামের হাগুর্ণা সাঁওতার সঙ্গে এর বিয়ের। ডিসারি তাতে সায় দেয় নি। হাগুর্ণা ছেলে ভাল, কিন্তু করবে কি সে, তার জন্ম বড়েভাই যোগে। সে যোগে যার জন্ম হয় তার বিবাহ ও বিবাহিত জীবন অতি দুঃখের হয়।

এমন সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে মনের সুখে ঘর করবে-সে কেমন করে ? বৃথা— ।

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভবিষ্যতের বিষয়ে অনেক তথ্য সে সংগ্রহ করেছিল। রাত অনেক হল, অন্ধকারে কেবল তারা, উপরে ঐখানে নিষ্পত্তি হচ্ছে সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের কথা। ডিসারির মাথার মধ্যে ঘুরছে কেবল যোগ। 'সালপা' (শুকতারা) উঠল, ঝকঝকে উজ্জ্বল। এই যোগে জন্মালে সাপে কাটবে।

ধুজিয়া ধরিয়ে পাণ্ডু, কন্ধ নিজের ঘরে চলল।

॥ চৌদ্দ ॥

সকাল হল।

নিত্যি দিনের ধুলো-ময়লাভরা গ্রাম্য পথের গৎ চলেছে তো চলেইছে। তাতে রস নেই, উচ্ছল মনের তরঙ্গ নেই তাতে। দিনের আলোয় গাছ শুধু একটা গাছ, বন শুধু বনই ; ধাংড়ী কন্ধ দেশের কেজো মেয়ে, ধাংড়া কন্ধ চাষী।

রাতের স্মৃতি—কোথাও খোঁপার থেকে খসে পড়া ছেঁড়া ফুল, কোথাও রাতের আগুনের অঙ্গার আর ছাই, কোথাও এঁটো পাতা—সব ঝাঁট-পাট দিয়ে সাফ করা হল, গাঁয়ের গলিপথে ঝাড়ু চলল। ক্ষেতের মইয়ের মতো টানা ঝাড়ু, তার উপরে ছোট ছেলেকে বসিয়ে একজন সেটা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যায়—সব জঞ্জাল সাফ।

মিটিং গাঁয়ের লোকেরা মিণিআপায়ু থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল। তাদের গ্রামেও ফসল কাটাকাটি আছে, পাহাড়ের নীচে রাত জেগে ক্ষেত পাহারা দেওয়া আছে। নিজের কাজকর্ম ছেড়ে পরের ঘরে এক বেলার জায়গায় দুই বেলা থাকাই অসম্ভব।

সকাল বেলা গান নেই, বাটে ঘাটে ব্যস্ত মেয়ে পুরুষ সবাই তরতরিয়ে চলেছে। কন্দ খোঁড়া আছে; ক্ষেতের কাজ আছে, গরু চরানো আছে। সবাই চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই সকলের গায়ে দর দর ঘাম ছুটছে, মুখ হাঁ

করে হাঁপ ছাড়তে হবে। পাহাড়ী দেশের কাজ। চলেছে সবাই, নাচবার জন্যে কারো পা সুড় সুড় করছে না, কেউ কুঁড়েমি করে বসে থাকছে না সুরুড়ি ফোঁকবার জন্য।

মিটিং গাঁয়ের কন্ধেরা যে যার বাঁক কাঁধে তুলে বিদায় হল। বলে গেল চৈত্র মাসে আবার আসবে, সে সময় গোটা মাসই ছুটি, হই হল্লা, শিকার, তখন আবার দেখা সাক্ষাৎ, আপাততঃ বিদায় ততদিন অবধি। ধাংড়ীরা একটু হাসল, রাত্রির পরিচয় সেইটুকু। বেণ্ড কন্ধ পিছন ফিরে তাকাল, পুয়ু দাঁড়িয়ে আছে, পুবুলি দাঁড়িয়ে আছে। বেণ্ড বলল, "কসৃবার হাটে যায় না তোমাদের গাঁয়ের লোক?"

পুবুলি বলল, "কেন যাবে না? যার দরকার পড়বে সে ডুম্বাগুড়ার হাটেও যাবে।" কসৃবা হাটে যেতে হলে মিটিং-এর পথ দিয়ে যেতে হয়, ডুম্বাগুড়া যেতে হলে মিণিআপায়ুর পথ দিয়ে। বেণ্ড বুঝতে পারল, হাসল শুধু। পুবুলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, পুরুষরা এমনি হয়, সব ভালবাসা শুধু ঐ দু দণ্ডের। পুবুলির নারী-মন পুরুষকে দোষ দিচ্ছিল। পুরুষ নিজে কোনো অসুবিধা ভোগ করবে না, সব লেপে দিয়ে যাবে মেয়েদের কপালে।

মিটিং-এর লোকেরা চলে গেল।

ঝোরায় উলঙ্গ হয়ে গাঁয়ের স্ত্রীলোকে স্নান করছে, এই রকমই কন্ধ দেশের অভ্যাস। সেই পথে ভিন্ গাঁয়ের লোকেরা ঝোরায় নেমে পার হয়ে গেল, একবার তাকালও না সেদিকে। তাকানো শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তাছাড়া এই দেশে সব কিছুই প্রায় উলঙ্গ, প্রকৃতি থেকে শুরু করে সকলে, উলঙ্গ দেহের কোনো বিশেষ চমক লাগেনা কারো চোখে।

পথে বেণ্ড কন্ধ গুম হয়ে রইল। রোদ বেড়েছে, এবার মনে হচ্ছে অনেকখানি পথ। হ্যাঁ, যুবতী রাজি হয়েছে, বিয়েতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়েটা হবে কেমন করে? নানা রকমের কথা তার মাথায় ঘুরতে লাগল। সে সাদা-সিধে মানুষ, দায়িত্বের কথা ভাবলে তার মাথা গোলমাল হয়ে যায়। ধাংড়ীর সঙ্গে মেলামেশা তার কাছে নতুন নয়। তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে ধাংড়ীরা তার দিকে আপনা থেকেই ঝোঁকে। কিন্তু কি হল কাল রাত্রিতে। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, ঢুকল গিয়ে একেবারে বিয়ের কথায়। কবে থেকেই তো সে ঠিক করেছে এবার সে

বিয়ে করবে। পুবুলি আরো দু চারটে কথাবার্তা বললে বুঝি ভাল হত। কেন সে এই গাঁয়ে দৌড়ে এসেছিল? বিয়ের জন্য কনে ঠিক করতে? ফিরে যেতে তার খারাপ লাগছিল, রাগ ধরছিল, চাদর মুড়ি দিয়ে আরাম করে ঘুমোবার সময় কেউ ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে যেমন লাগে।

গ্রাম আড়ালে পড়ল, এইবার পাহাড়ী জঙ্গল। দলের বুড়োটি পিছনে পড়ে রইল, চড়াই পথ ভেঙে বেচারা তাড়াতাড়ি উঠতে পারছে না। এইবার বেগু কন্ধ এগিয়ে চলল, নতুন দায়িত্ব তার। দলের মধ্যে সেই শিকারী, সবাইকে পিছনে রেখে নিজে বনপথের বিপদের মহড়া নেওয়া তার কর্তব্য। তার পিছনে রয়েছে সুব্রি, জাগিলি, আর্জু, লেতা। তাদের হাসাহাসি চলেছে—গত রাত্রির কথা নিয়ে, মেয়েদের কথা নিয়ে। বেগু বলল, "বুড়ো মাঝখানে আসুক।" সকলের হুঁশ হল যে এখন সতর্ক হওয়া দরকার। হাতে বর্শা আছে, কাঁধে টাঙ্গি, আর বেগুর বন্দুক। তবু যেমন ভাবেই চল না কেন বাঘে নিয়ে যায়। এখানে সমস্ত জমি উঁচু নিচু, কোথায় যে বাঘ লুকিয়ে থাকে টের পাওয়া যায় না। সকলে নাক তুলে গন্ধ নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে। এক রকমের লতা আছে যার ফুলের গন্ধ বাঘের গন্ধের মতো, কালখুন্ট গাছের ফুলেরও তেমনি গন্ধ, মাঝে মাঝে আঁতকে উঠতে হয়।

চোখ সদা সতর্ক, কান খাড়া—কে জানে কোন্ ঝোপের আড়ালে জন্তু লুকিয়ে বসে আছে। জঙ্গল ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে, শীতের দিনেই বেশী জঙ্গল। দুই দিকে যেন লাল রোশনাই জ্বালিয়েছে গির্লি ফুল। পালে পালে সম্বর নামে গির্লি ফুল খেতে। দুই দিকের বনের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা সরু পথ, আর কেবল পাথরের ঢিবি, কোথাও চড়াই ঘাট, কোথাও উৎরাই, কোথাও ছোট ঝোরা, তার ভিতরে আরো জঙ্গল।

মুরগীর বেলা ময়ুরের বেলা কখন পার হয়ে গেছে। বন থমথম করছে। মাঝে মাঝে ঝোরার ধারে কুশ্রী চেহারার কুচিলাখাই পাখী ভয়ঙ্কর পিলে-চমকানো রব ছাড়ছে। এক জায়গায় বুনো লেবুর গাছে মস্ত বড় কাঠ পিঁপড়ের বাসা। কন্ধেরা চেঁচিয়ে উঠল—"মইরিকা—মইরিকা!" (কাঠ পিঁপড়ে)। জাগিলি আর আর্জু নীচে নেমে গিয়ে গাছের একটা ডাল টেনে ধরল, বেগু তার টাঙ্গি দিয়ে ডালটা কেটে ফেলল। ইতিমধ্যেই

লেন্তা আর সুররি কাঠে কাঠ ঘষে একটু আগুন করেছে, বুড়ো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে এনেছে। জাগিলি আর আর্জুর গায়ে মাথায় কাঠ-পিঁপড়ের ছেয়ে গেল। পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে দুজনে চীৎকার করে লাফাতে লাগল, চুল ছিঁড়তে লাগল, কিন্তু ঐ পিঁপড়ে যে কন্ধদের প্রিয় খাদ্য, ভাগ্যে থাকলে তবেই জোটে। অতএব মহা আনন্দ, পিঁপড়ে আগুনে ঝলসে নিয়ে সযত্নে রাখা হল। এখন কেবল এগুলো কচলে গুঁড়ো করে মাড়ুয়ার জাউয়ের মধ্যে ফেলে দিতে হবে, কি সুন্দর টক টক লাগবে খেতে। ঐটুকু কল্পনা করেই সকলের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জাগিলি আর আর্জু হাসছিল। বুড়ো বলল, "কাঠ পিঁপড়েতে কামড়েছে ভালই হয়েছে, ধকল কেটে যাবে। জ্বর হলে তো আবার কেউ কেউ মাথায় এই পিঁপড়ের কামড় খেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তবে আর কি ?"

গোড়াতেই মইরিকা লাভ। কিছু দূরে যেতে বানরের পাল নজরে পড়ল। আবার কন্ধদের লাফ ঝাঁপ, খাবার দরকার পড়ল, বানর অতি প্রিয় খাদ্য। বেণ্ড তাড়া করল, একটা বানর মারল। বুড়ো কন্ধের জিভ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কিন্তু ছোকরাদের কাছে লুকোবার জন্য বুড়ো তামাক পাতা চিবুতে লাগল। এর পর ঐ দূরে উসুকাবটা গ্রাম। ক্ষেতের জমিতে ঝোপ ঝাড় গজিয়ে গেছে। তার ভিতর জায়গায় জায়গায় দেখা যায় বন-কেটে-তৈরী কন্ধ চাষীর চাষের জমি—কন্ধ গুড়িআ, তার মাঝে মাঝে এক এক জনের কুঁড়ে ঘর। এখানে জল যথেষ্ট, রান্নার সুবিধা। তারপর থেকে চলবে ছাতিফাটা চড়াই আর ভীষণ বন, তবে নিত্যি যাতায়াতের পথ চেনা-জানা।

ঝোরার ধারে একটা ঝাঁকড়া আমগাছ, গাছের তলায় দুটো চেটালো পাথর, বসবার জায়গা। এখানে ওখানে পাথর সাজিয়ে উনন করা রয়েছে, পোড়া পাথর, অঙ্গার আর ছাই। জঙ্গলের পথে এমন অনেক জায়গা থাকে। প্রতিদিনের পথিকদের রান্না করবার জায়গা, বুনো পথের চেনা।

একটু এগিয়েই একটি ছোট আম বন। সেখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে অনেকগুলি চেটালো পাথর। যেন চারিদিকের পাহাড়ের ঢালুর যত খণ্ড খণ্ড পাথর গড়িয়ে নেমে এসে জটলা করছে। 'এগুলি দেখলে বুঝতে হবে যে একটি ডংগরিআ (বুনো) হাট। সপ্তাহে একবার এখানে একটি ছোট

হাট বসে। মোটে ঘণ্টা দুয়েকের হাট, এরি জন্য কত দূর থেকে লোকেরা আসে, সেজেগুজে আসে। দু ঘণ্টা গেলে হাট খোলায় থাকে কেবল কাক আর চড়ুই পাখী—সেই সন্ধে অবধি। তারপর আবার সব শুনশান সাত দিন পর্যন্ত।

র঑াধবার জায়গা, হাট, বসে গায়ের ঘাম মরিয়ে নেবার ঠাঁই, চড়াইয়ের মাথা, উৎরাইয়ের তলা—এইভাবে বনের পথ বিভক্ত।

মিটিং গাঁয়ের লোকেরা কাঁধ থেকে বাঁক নামিয়ে রেখে রান্নাবান্না করল। মিণিআপায়ু কত পিছনে পড়ে আছে। এখান থেকে এখন সোজা গাঁ-মুখো। আজ দেরি হয়ে গেল, পৌছতে পৌছতে শিকারের সময় পার হয়ে যাবে বোধ হয়। এক দিনের কাজ কামাই গেল। রোদ মাথার উপর উঠেছে, এখন সারা পথ কেবল গরম আর ঘাম। নতুন জায়গায় নতুন অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে, দূরের স্মৃতি পিছনে পড়ে থাকে। সুব্রি, জাগিলি, লেতা আর আর্জু ভুলে গেছে কালকের রাত ভিন গাঁয়ে কেমন করে কেটেছিল। সে সব কেবল মাংসের অনুভূতি, শরীরের খিদের কথা। খিদে পায় সেই কিছুক্ষণ, খাওয়া দাওয়া সারা হলে পরে কেউ খাবারের কথা মনে করে করে কবিতা গাঁথে না। আবার নতুন খিদে, নতুন খাবার, কেবলই এগিয়ে। উনন ধরানো হল। বুড়োকে উননের কাছে বসিয়ে রেখে জোয়ানেরা ঝোরায় গিয়ে কৌপীন খুলে ফেলে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করল। স্নান করতে করতে বেশুর মনে পড়ছিল পুবুলির মুখ, অনুতাপ হচ্ছিল এই ভেবে যে কিছু পাকাপাকি করে আসা উচিত ছিল। যেন কি একটা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। কনকনে জলের কামড়ে যখন গায়ের মাংস চন্ চন্ করে ওঠে, ডেলা ডেলা মাংস পাথরের মতো ফুলে দাঁড়িয়ে ওঠে, তখন মানুষ কোনো একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারে।

পুবুলিকে মনে পড়ছিল। সে অতি সহজ ভাবে বলেছিল, "ঘর-জামাই হয়ে এস।" একটুকু হেসে নিজেকে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে সে চলে গেল, তার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা রেখে দিয়ে গেল। ঘর-জামাই হয়ে সে আসতে পারবে না, তার মান ইজ্জত আছে, সাঁওতার ছেলে সে। কিন্তু যাই হোক আবার সে গিয়ে দেখবে, এতেই শেষ নয়, শেষ হতে পারে না। বেশু কত বার বার পুবুলির কথা ভাবল, না এইটুকুতেই শেষ নয়, এই সবে শুরু।

॥ পনরো ॥

বন আর বন।

চারিদিক নীরন্ধ্র নিবিড়। বনের লোকে আরামে নিশ্বাস নেয়, এই প্রাচীরের মধ্যেই তাদের সব ঘর করনা; বনের বাইরের লোকের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সে যেন বন্দী।

রাস্তা নেই, গরুর গাড়ির চাকার দাগ নেই, মানুষ নিজের বোঝা নিজেই বয়। গহন বনের ভিতর দিয়ে ক্রমে একদিন খোলে পায়ে-চলা পথ, সরু, এই দেখা যায় এই দেখা যায় না। উঠে, নেমে, সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে যায় এ গাঁ থেকে সে গাঁ, পনের ক্রোশ, কুড়ি ক্রোশ, তবে গিয়ে তার দেখা হয় গরুর-গাড়ি-চলা পথের সঙ্গে। শীত কালে দু দিক থেকে চেপে আসে মানুষ প্রমাণ উঁচু পিরি ঘাস, উপরে জায়গায় জায়গায় গাছ থেকে গাছে ডিঙ্গি মেরে যায় বুনো লতা। 'ওটা মাড়া', 'প্যুএর মাড়া'। পায়ে-চলা পথ লুকিয়ে থাকে ঝাড় জঙ্গলের নীচে। পথে এখানে ওখানে পাথরের গাদা, মাঝে মাঝে অতট খদের নীচে ঝরনা, পথ সেখানে নিবে যায়, ও পারে কোথায় আবার ফুটে ওঠে তা বনের লোকেই জানে।

এ ওর থেকে দূরে দূরে সরে সব গাঁ। উপত্যকার ভিতরে—যেখানে জল হাওয়া সুবিধা মতো সেই সব জায়গায় চাষ আবাদ হতে পারে। উপত্যকার ভিতরেও গহন বন, কেবল জন্তু জানোয়ারের বাস। যেখানে মাটির নীচে লোহাপাথর, ম্যাঙ্গানীজ-পাথর, আগ্নেয়গিরির পাথর সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে চলেছে শাল বন। অন্যান্য গাছ আছে, শাল প্রধান। অপেক্ষাকৃত নিচু সমতলে নীচেকার মাটি বেলে, হালকা, অভ্র মেশা। পাথরগুলি আলগা; সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ চলেছে বাঁশ বন। নানা জাতের বাঁশ, ঠাসা, ফাঁপা, সরু, মোটা, বেঁটে, লম্বা—নানা রকমের।

তখন এ জঙ্গলে পথ ছিল না। মানুষের অগ্রগামী বাহিনী এই কন্ধ ভাই, তার অস্ত্র কাঁধের টাঙ্গিখানি আর আগুন। কন্ধ কামার (লোহ্রা) লোহাপাথর গলিয়ে লোহা বার করে টাঙ্গি তৈরি করে। কন্ধভাই জঙ্গল

কাটে, পথ সাফ করে, চাষের জমি সাফ করে, রোদের দিনে কাটা গাছে আগুন ধরিয়ে দেয়, তার ছাই দিয়ে সার হয়। কখনো কখনো তারা পাহাড়ের উপরে গ্রাম বসায়, পাহাড়ের ঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ-আবাদ করে। প্রথম বছর লাগায় মাড়ুয়া, দ্বিতীয় বছরে অড়হর, রেড়ি, 'আলসি' আর তৃতীয় বছরে শ্যামা ধান। আরো দু এক বছর দেখে। যদি মাটির রস শুকিয়ে যায় কন্ধেরা সেখান থেকে গ্রাম উঠিয়ে নেয়, নতুন জঙ্গল দেখে। কখনো বা আগেকার কোনো সময়ে সাফ করা, চাষ করা, ছেড়ে যাওয়া ক্ষেতের ঝোপ-জঙ্গল আবার কেটে পুড়িয়ে সেখানে নতুন করে চাষ করে। এই রকম আবাদ করাকে সরুআ-ডংগর চাষ বলে। তাতে উৎপন্ন বেশী হয় না, আবাদও বেশী দিন করা যায় না। তাই কন্ধরা ঠাট্টা করে বলে—সরুআ-ডংগর চাষ, কুটরা হরিনের মাংস, বুড়ো বুড়ীর আয়ু সব সমান। আবাদের জমি তৈরি করে কন্ধ, পিছন পিছন আসে 'সভ্যতা'—সাহুকারেরা, ফরসা জামা পরা লোকেরা, দেখে ভাল জমি, সেটা হাত করে। কন্ধ উপরে ওঠে, তার পরে আরো উপরে। তাই যেখানে বন সেখানে কন্ধ। জঙ্গল কাটা হয়ে গেলে, পথ খুলে গেলে কন্ধ সেখান থেকে তাড়া খায়।

পাহাড়ের উপরে কন্ধের চাষ। নীচে যে সব জমি স্থায়ী ভাবে চাষের জন্য তৈরি করে ছেড়ে দিয়ে গেছে সে সব পরের। ধীরে ধীরে সাহুকারেরা আসছে, ক্ষেত বাড়াচ্ছে, কন্ধদেশে শিকড় গাড়ছে। যেখানে চোখে লাগার মতো ধানের ক্ষেত ক্রোশের পর ক্রোশ ছড়িয়ে আছে, সেখানে সাহুকার, শুঁড়ী, ব্রাহ্মণ, তেলেঙ্গা। বাইরের সভ্যতার উপচে-পড়া ভাতের ফেনের মতো তারা বনে এসে পড়েছিল লোটা-কম্বল সম্বল করে, এখন তারাই মহাজন। শুঁড়ীরা মদ বেচে বেচে জমি করল। ব্রাহ্মণেরা নাকি এখান ওখান থেকে ভিক্ষা করা চাল জড়ো করে রেখে যায় গ্রামের মোড়লের ঘরে, সেই চাল দেড়া সুদে লাগায়, ক্রমে খাতকের জমি দখল করে। তেলেঙ্গারা সব উপায়ই খাটায়, কেউ দেড়া সুদের মহাজনি করে, কেউ বা শুধু এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে চালাকি করে জমি হস্তগত করে, নানা ফিকিরে। বন্ধু সেজে এসে সাঙাত মিতা পাতিয়ে মদ খাইয়ে খাইয়ে আস্তে আস্তে গ্যাঁট হয়ে বসে। যারা অধিকারীদের (সরকারী কর্মচারী) অনুগৃহীত তাদের

তো সাত খুন মাপ। কাগজ আর 'বটু' চিহ্ন (টিপ সই), বটুচিহ্ন আর কাগজ—জমি হাসিল! কেউ বন্ধকী বলে বিক্রি কবালা লিখিয়ে নিয়ে যায়, কেউ রসিদ নেবার ছলে না-দাবি (ছাড়পত্র) লিখিয়ে নেয়। বন্দোবস্ত নেই, খতিয়ান নেই, মালিকানা স্বত্বের মোটে ধারণাই নেই, জোর যার মুলুক তার, পোশাক যার জোর তার। কন্ধ ভাই কাগজে বটুচিহ্ন মেরে দিয়ে চলে যায় নতুন জমির সন্ধানে পাহাড়ের উপরে।

অন্ধকার জঙ্গল, যাবার পথ নেই। চারিদিক থেকে ক্রমে ক্রমে সাহুকার আসছে, ক্রমে ক্রমে তাদের ব্যবসা বাড়ছে, তাদের শহর বাজার বসছে, গ্রাম বসছে। কন্ধের ধন কন্ধকেই কর্জ দিয়ে তারা সুদ খায়। কন্ধ তাদের গোতি[1] হয়, সেই পুরাতন ক্ষেতেই চাষ করে, কিন্তু তাদের চাকর হয়ে। এখন কেবল ফসল উৎপন্ন করাই তার কাজ, ফসলের মালিক সাহুকার; ফসল পাকবার আগেই কিছু কিছু টাকা ফেলে দিতে পারলে তারা দশগুণ সস্তায় ফসল কিনে নিয়ে যাবে। একে বলে গড়ম্। ফুঁ আর তালি, আদিবাসী খতম। বনের ভিতর উড়ে উড়ে চলেছে সাহুকার-তন্ত্রের পাখীধরা জাল, তারি নাম সভ্যতা।

সেই জালে কন্ধ ভাইও ধরা পড়ে, একটু ছটফট করে, তারপর তার দফা শেষ। ঠকায় তো পড়ে, পয়সা যায়, তারপর গোতি হয়ে নিজের জীবনের উপর ছেলে নাতিদের জীবনও বাঁধা দিয়ে যায় খেটে মরবার জন্য। কিন্তু এতেই যদি নিস্তার পেত! বনের বাইরের এই লোকেরা বনের ভিতরে চোখ ধাঁধানো নতুন আলো আনে, আনে নানা রঙের কাচ, আর আদিবাসীরা তাতেই মেতে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত সে নিজের হাতে তৈরী ধুঙ্গিআ খেত, এখন সভ্যতা দেখায় বিড়ি। নিজের হাতে বুনে সে কাপড় পরছিল—ডোমের খাদি, 'মিরিগান'দের কুম্ভপাড় মোটা কাপড়, 'পরজা'দের 'পঞ্চিআ' শাড়ী, 'কেরং' গাছের আঁশ আর সুতি মিশিয়ে তৈরী 'গদবা'দের বাঘের ডোরার মতো ডুরে শাড়ী, সভ্যতা এসব ডুবিয়ে দেয়, দেখায় নতুন কাপড়, কোট কামিজ। আদিবাসীর বাবু হতে ইচ্ছে যায়, তার কৌপীনের

[1] মহাজনের কর্জ শোধ দিতে অক্ষম হলে চাষী কেবল পেটভাতায় মহাজনের কাছে চাকরি করে। তাতে বছরে একটা নির্দিষ্ট হারে ঋণ শোধ হতে থাকে। এই রকম চাকরকে বলে 'গোতি'।—অনুবাদক

উপর কোট চড়ায়, তেলেঙ্গা সাহুকারের অনুকরণ করে কৌপীনের সঙ্গে কানে পরে কুণ্ডল, মাথায় মস্ত বড় পাগড়ি, পাতার কলকের মতো ধুঙ্গিআ চুরুট খান চারেক তারি ভিতর গুঁজে দেয়। কেবল এইটুকুই নয়, সে নিজের বনিয়াদকে ঘৃণা করতে শেখে, নিজের ভাষাকে ভুলতে চায়, কিছু কিছু তেলেঙ্গা ওড়িআ মিশিয়ে কথা বলে।

রাস্তার ধারের আদিবাসীরা নিজেদের ভাষা ভুলে গেছে, নিজেদের বেশ ছেড়েছে, তাদের ঘর করনায়, ঘর তৈরির প্রাচীন রীতি কবে থেকেই ঘুচেছে। গদবা-দের মন্দিরের মতো সরু মাথা ঘর, পরজা-দের চৌখুঁটো ঘর নানা রঙের মাটি দিয়ে চিত্র করা, কন্ধদের গোষ্ঠীর নিয়মে গড়া সারি বাঁধা গ্রাম—এ সবের পরিবর্তে কতকগুলো ভেড়ার খোঁয়াড়ের মতো জঘন্য কুড়ে ঘর সেখানে।

সামাজিক জীবনেও সেই রকম বিভ্রাট। নতুন সভ্যতার কবলে পড়ে সমাজে ভাঙন ধরেছে। সাবানে ধোয়া শাড়ী পরা মেয়েরা বেশী সাবানে ধোয়া বেশী ফরসা কাপড় পরা বাইরের পৃথিবীর পুরুষদের দিকে চলকে উঠেছে। তেলেঙ্গাদের দেশ থেকে প্রবেশ করেছে যৌন রোগ আদিবাসী পল্লীর অস্থিমজ্জার ভিতরে।

কন্ধ অভিধানে 'বেশ্যা' শব্দের প্রতিশব্দ নেই, গদবা অভিধানেও নেই। কিন্তু সৌরপল্লী হাট, নারণপাটণা, বন্ধু গাঁ, আলমণ্ডার কন্ধ ; ডুম্‌রিপুট, সিমিলিগুড়া, জই নগর, নওরঙ্গপুরের গদবা ; নারণপাটণা, কোরাপুটের কাছে চিন্দিরি গাঁ এবং আর কয়েকটি এলাকার পরজা ; এবং সব অঞ্চলেরই নতুন হাওয়া লাগা খ্রীষ্টান ডোম বা পাণ-অ—এদের অভিধানে খারাপ শব্দের আবশ্যকতা কবে থেকেই হয়েছে। জাতিক্ষয়কারী রোগ তো আগুনের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। বন আর রাস্তার ধুলোর সংঘর্ষে যারা নবরূপ লাভ করছে তারা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির মতো, তারা উদ্দেশ্যহীন কামক্ষুধার ফল। তাদের সৃষ্টিতে কোনো বাছবিচার নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই। তাদের মস্তিষ্ক দুর্বল, মনে বিকট পাশবিকতা, তাদের দেহে রোগ বা রোগের উপরোগ গেঁটে বাত, পেট ফোলা, তাদের চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন : সাহেবদের চোখের মতো চোখ, ব্রাহ্মণ কপাল, কন্ধ ঠোঁট, গদবা ভুরু।

তাদের অতীত ফুরিয়েছে ; আবার কত পুরুষ গেলে কবে হয়তো তারা

নতুন করে দল বাঁধবে। তাদের নিজস্ব মূল ভিত্তি কোথায় কেউ জানবে না। তারা গোতি মজুর, কুলি। সাঁঝের বেলায় রাস্তায় তারা দলে দলে যাওয়া-আসা করে, চোখে আশা নেই, বুকে বল নেই। তারা মদের দোকানের কাছে ভিড় করে, তাদের ঘরের মেয়েরা খোঁপায় ফুল গুঁজে ফিটফাট হয়ে কাপড় পরে হি হি করে ঘুরে বেড়ায়। নির্জন রাস্তায় পুরুষ দেখলে গান গাইতে শুরু করে।

এই আধা প্রেতদের মধ্যে কোন্ দেশ বিদেশের কত ধনী বড় লোক আর ছোট লোকের ছেলেমেয়ে আছে কে বলবে। নির্জন বাংলা ঘর, বিলাতী মদের নেশা, ঘরভোলা পথিক, তার নির্জন বনবাস, উলঙ্গ বনদেশ —সব মিলে এই বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, আগাছা আবর্জনা, আজে বাজে। পথের পথিক চলে গেছে, সে তার মান সম্মান মাথায় নিয়ে পথ চলছে হয়তো কোন দূর দেশে, এখানে তার প্রেত সন্ততি—যারা কোনো কুলের নয়—কুলি, গোতি, সি-টি-এম্[১], বেশ্যা।

এই সভ্যতার প্রথম রূপ, পয়লা ভেক, বনদেশে।

ষোল

মিণিআপায়ু এই সভ্যতা থেকে দূরে, বন্দিকার দূরে, মিটিং দূরে। সেখানে পাহাড় জঙ্গল বাঘ, পথ ঘাট নেই। আজও সেখানে কাউআ-হরড় (বড় জাতের হরিয়াল) ডাকে, শুকসারী এসে শালিকের মতো বসে পড়ে ঘরের আঙিনার ঝাঁকড়া গাছে, ঘরের পিছনে ময়ুর নাচে। কন্ধ দেশের প্রাচীন রীতি আছে সেখানে। গাঁয়ের মোড়লের সম্মান আছে, গণমত গণতন্ত্র আছে সামাজিক জীবনে। তবু এই জঙ্গলের ভিতরেও বাইরের পৃথিবীর প্রভাব কিছু কিছু পড়তে শুরু করেছে। মেরিআ বন্ধ হয়েছে, অধিকারীরা কমান্ বা গস্ত করতে আসে, সাল্টু (আবকারী বিভাগের লোক) আসে মদ চোলাই দেখতে, বনের গারড (ফরেস্ট গার্ড) বন কাটা দেখতে আসে, আলের উপর দিয়ে সাহুকাররা আসে ক্ষেত দেখতে, নিজেদের পসার

[১] সি-টি-এম্ (C. T. M.)—Criminal Tribes Member.—অনুবাদক

বাড়াতে। তবু এখনো এই এলাকায় লাল সড়ক আসেনি, মাল দেশের গুমর ভাঙেনি, বাঘ রোগ পর্বত রয়েছে পাহারায়।

তবু এমনি করেই এক দিন বনের বুক চিরে খুলবে লাল সড়ক। সেই পথে গাড়ি বোঝাই ফসল চলবে অন্ধকার থেকে আলোয়, গাড়ি বোঝাই মানুষ চলবে আসামের চা বাগানে, বাংলো উঠবে, অধিকারীরা এসে থাকবেন, স্কুল হাসপাতাল কাছারি, আরো অধিকারী। বনদেশ সভ্য হবে। পরিবর্তনহীন কন্ধ দেশ কাঁপবে, ডুলবে যুগ-সভ্যতার চাপে।

কন্ধ ডিসারি আকাশের তারা গুনে চলেছে, দিব্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের পানে। কি যেন সব দেখা যায়, গোলমেলে ঝাপসা, তার স্বরূপ বুঝবার ধৈর্য থাকে না, বুঝি সব মনের খেয়াল, মদের ধোঁয়া।

জঙ্গল ফুরিয়ে আসছে, বর্ষা কমে যাচ্ছে, ঘর ভাঙছে, ক্ষেত চলে যাচ্ছে। জাতি শেষ হতে চলেছে, রক্ত ঘোলা হচ্ছে, নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। গোলমাল হইচই বাড়ছে, নানা বিচিত্র শব্দে কানে তালা ধরছে, বনের শব্দ ডুবে যাচ্ছে।

চারিদিকে কারা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ গাছ থেকে ও গাছে, এ ঘর থেকে ও ঘর। তারা মুন্ধা (লাল মুখো বানর) নয়, প্রাস্কা (হনুমান) নয়, অথচ বানর, আর তাদের লেজে বড় বড় আগুনের শিখা। সেই আগুনের জ্বালায় ছট ফট করে তারা লাফাচ্ছে, নিজেরা জ্বলছে দেশটাকে জ্বালাচ্ছে—দলকে দল। গাছ নেই, পাতা নেই, কেবল নেড়া পাথর। তারি উপরে জ্বলন্ত লেজ নিয়ে লাফাচ্ছে বানরগুলো। গ্রামকে গ্রাম, দেশকে দেশ, সব পুড়ে ছারখার হচ্ছে, আকাশে উঠছে ধোঁয়া, জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিলে যেমন করে ধোঁয়া ওঠে। প্রবীণ ডিসারি পাণ্ডু কন্ধ এই রকমের কত স্বপ্ন দেখে, তার মাথা গোলমাল হয়ে যায়। মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরে গিয়ে এক পেট মদ খেয়ে সে আশ্বস্ত হয়। তবু কন্ধ ডিসারি না ভেবে পারে না যে কাঁথা-মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলেও নক্ষত্রের যোগ থেকে পার পাওয়া যায় না। যা হবার তা হবেই। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে দিয়ে কন্ধ ঘরকন্না করে যায়। ভোর বেলায় পাহাড়ের উপরে আকাশের লাল রেখার মতো জঙ্গলের ধারে ধারে দেখা দেয় লাল সড়কের রেখা, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ভিতরে, আরো ভিতরে।

॥ সতরো ॥

লেঞ্জু কন্ধ দিউডু সাঁওতার সঙ্গে মনে মনে অনেক বার সন্ধি করে ফেলে, আবার মনে মনে রাগ করতে থাকে। দিউডু তার চেয়ে অনেক ছোট, তার ভাইপো, কিন্তু দিউডু সাঁওতা আর লেঞ্জু কন্ধ রায়ত। কন্ধ দেশের কানুন অনুসারে সাঁওতা গাঁয়ের সর্দার, সব রায়তই তার অধীন, তার বাধ্য। সেই সেকালে সাঁওতাই দলপতি, সে যাকে যা বলবে সে তা করবে। দিউডু তার আপন কাকার কাছ থেকে এমন বাধ্যতা কখনো দাবী করে না, কিন্তু কথায় কথায় লেঞ্জু কন্ধ ভাবে সে অপমানিত হল। ভাই মরবার পর থেকেই তার মনে অভিমান ঢুকেছে, সে অছিলা খোঁজে রাগ করবার, গর গর করবার।

সরবু সাঁওতা কিছু বলত না, দিউডুও কিছু বলে না। কিন্তু দিউডুর পক্ষে সেটা মনে হয় যেন অবহেলা, বে খাতির। সরবু সাঁওতার পক্ষে কি ছিল লেঞ্জু তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় নি।

যত বার সে ঘরে আসে দেখে ভাই নেই। ঘর যেন গিলতে আসে, কেন গিলতে আসে সে তা বুঝতে পারে না। কেবল অস্থির অস্থির লাগে, সর্বদাই খালি খেঁক খেঁক, খুঁত খুঁত। ঘরে মন টিকতে চায় না।

বাড়ি এলে চোরের মতো লাগে, চুপটি করে সে বারান্দায় বসে পড়ে, ধুঙ্গিআ টানে, গাঁয়ের দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে। গাঁয়ে কাজকর্ম লেগে আছে, যেখানেই দেখ মানুষ জন কিলকিল করছে, ভিড়, হইচই। কেউ মাঠে যাচ্ছে, কেউ বা মাঠ থেকে ফিরল, কেবল ফসলের বোঝা মাথায় গাদা গাদা মানুষ, গাঁয়ের গলি পথে খড়, কুটো, ফসল। সারা বছরের মধ্যে এইটাই ফসল কাটার প্রধান সময়, এই সময়ে ফসল ঘরে তোলা হবে।

ক্ষেতের পাকা ফসল ঘরে আসে, লেঞ্জু কন্ধ দেখে মাথার বিচালির বোঝায় ফসলের বোঝায় ভালুকুণীর[১] মতো মুখ ঢেকে, মানুষ আশা-ভরা প্রাণে আসা যাওয়া করে, কেবল কলরব। লেঞ্জু কন্ধ নিজেও সাঁওতার

১ ওষা (ব্রত) করিবার সময়ে মুক্তকেশী কুমারী। ২০ পৃষ্ঠার ফুট-নোট দ্রষ্টব্য।

ক্ষেতের ফসল বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসে, প্রত্যেক বছরই এনেছে, এ বছরও আনে। কিন্তু গাঁয়ের এই গেরস্থালির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বারান্দায় বসে ধুন্সিআ টানতে তার কেমন এক রকম ভাল লাগে। পাশে দস্রু কুকুর বসে লেজ আছড়ায়, তাঁকে চাপড়িয়ে লেঞ্জু কন্ধ আনন্দ পায়। দুনিয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে এই শীতের দিনে লেঞ্জুর ঘরের গরম আরামের কথা মনে হয়, এত লোকের মতো তারও যদি একখানা আলাদা ঘর থাকত, মনে পড়ে কে সেই ঘরে থাকত, কন্ধ দেশের যেমন রীতি তেমনি পিছন দিকে তার পিঠের উপর হেলান দিয়ে বসে বসে মাথার উকুন বেছে দিত, জল গরম করে দুপুর বেলায় লাউয়ের খোলে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে তাকে ডলে ডলে গা ধুইয়ে মুছিয়ে দিত—মনে পড়ে অনেক কথা।

পিছন থেকে হাকিনার কান্না শোনা যায়, পুয়ু ছেলেকে ভোলায়। লেঞ্জু কন্ধের মনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। এবার নিজেকে তার মনে হয় সত্যিই পর, চোরের মতো লাগে, চুপটি করে উঠে সে চলে যায় ক্ষেতের দিকে।

সে-দিন পুয়ু তার ছেলেকে তার হাতে তুলে দিয়েছিল। লেঞ্জু কন্ধ ছোট ছেলে-পিলে ভালবাসে, কিন্তু বাচ্চা সামলানো তার পক্ষে কঠিন কাজ। সাগ্রহে সে তার লম্বা লম্বা দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। হাকিনা দাদুর কোলে এল, তার ছোট ছোট হাত-পা আরো ছুঁড়তে লাগল, আকাশের দিকে মিট মিট করে চেয়ে চেয়ে খুব এক চোট কাঁদল। লেঞ্জু কন্ধের বড় বাধো বাধো লাগছিল, বড় যত্নে বড় ভয়ে ভয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়েছিল, বড় ভয় পাছে তার রুক্ষ পাথরের মতো হাতের চাপে কচি মাংসের তালে ব্যথা লাগে। এই না বংশধর, তার আর তার মরা ভাইয়ের! ইচ্ছে করছিল শিশুকে তুলে ধরে সে নাচে, মদ খেয়ে যেমন করে নাচে। কিন্তু তার বাধো বাধো লাগছিল, বড় সসংকোচে সে বাচ্চার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ছেলের মুখ কালো হয়ে গেল, ছেলে পেচ্ছাপ করে ফেলল, হাসতে হাসতে পুয়ু ছেলেকে লেঞ্জু কাকার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিল। আঁচল দিয়ে নিজের পিঠে বেঁধে নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেল, ছেলের কান্না বন্ধ হল। লেঞ্জু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে কোনো দায়িত্ব ঘাড়ে করতে চায় না, তাছাড়া এ দায়িত্ব তার নিজেরও নয়।

এমনি এক একটি দিনের কথা তার মনে খোঁচা দেয়। কিসের থেকে কি হয় তার খেই সে ধরতে পারে না, সে ভাবতে পারে না, এটার সঙ্গে ওটা জুড়তে পারে না, কেবল দিউড়ুর উপর গর গর করে, এ বাড়ি থেকে গা ছাড়া দিয়ে তফাতে তফাতে থাকে।

হাড় কাঁপানো শীত। দিনের বেলাতেও এক-একবার অন্ধকার ঘিরে আসে। লেঞ্জু কন্ধ অনুভব করে এতদিনের নীরবতার ভিতর থেকে, মনের গহন থেকে কি যেন জ্বলতে জ্বলতে উঠে আসতে চাইছে যা এ-রকম জীবনকে স্বীকার করে না, তার ব্যর্থতাকে অস্বীকার করতে চায়, তার মাথায় গজাল মেরে গুঁজে দিতে চায় যে সে ফালতো নয়। তার মাথার তামাটে চুলে খয়েরী রঙ ধরে আসছে, গাল চুপসে গেছে, দাড়ি গজানো মুখখানা কেবল হাড়ের কাঠামো। দিন দিনই তার মনে হয় এই কয়েদখানার ভিতর থেকে পালিয়ে যাবে সে এক দিন, তখন তার খয়েরী চুল আর হাড়-বার-করা মুখ হেরে যাবে, আবার সে তেমনি করেই বাঁচবে যেমন করে সে বাঁচতে পারত। তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে। কিছু একটা করা দরকার, হয়তো সে এমনি করেই বুড়ো হয়ে যাবে, আয়ু ফুরিয়ে যাবে, তখন এত বড় জীবনটা তো অমনিই গেল।

এতদিন পর্যন্ত কি একটা অন্তরায় ছিল যেন, তারি নাম বোধ হয় সরবু সাঁওতা। একটি একটি করে লেঞ্জু কন্ধ ফর্দ করতে বসে—তার কি কি চাই। অন্তর বোঝে, মনের মধ্যে কথাটা উঠলে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই কথা ভাবে। তার প্রয়োজন জীবনের, যা চলে গেছে তারি প্রয়োজন তার, সব আবার নতুন করে।

কত তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে তার জীবন। তার মাপ তার ভাইয়ের মৃত্যু, দিউড়ুর ছেলের জন্ম— দিউড়ু, কালকের ছেলে সে। সময় চলে যেতে থাকে। কেবল এক একটা ঘটনা চেতিয়ে দেয় কতখানি গেল।

মাপতে বসলে হিসেব কষতে হয় কত লাভ কত ক্ষতি।

মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ক্ষতি ছাপিয়ে লাভ করে নিতে। লেঞ্জু কন্ধ ঘর-গেরস্থালি করবার জন্য ছট ফট করে।

ভাই মরার পর কালকের ছোকরা এই দিউড়ু! লেঞ্জু কন্ধের মনে হয় এ যেন তার সঙ্গে ঠাট্টা, তামাশা। তার ঠুঁটো নেড়া জীবনের প্রতি দাঁত-

বার-করা বিদ্রূপ। খুড়ো ভাইপো দুজনেই মদ খায়, দুজনেই নেশায় বুঁদ হয়ে গড়াগড়ি যায়, আবার দুজনেই ঘরে ফিরে আসে, একই ঘরে। কিন্তু ভাইপোর বয়স আছে, ঘর-সংসার আছে, আছে সামনের বড় জীবনটা, আর খুড়োর নেড়া পাথরের মতো অস্তিত্ব পিছনে ঢলে পড়ছে যেমন পড়ে অস্তগামী সূর্য ও-পারের অন্ধকারের দিকে। সেই তার অভিমান, তার সব ছটফটানির বাইরে। সে উদ্দেশ্যহীন, সে নিষ্ক্রিয়, সে বিধাতার উপহাস। পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে সে বসে থাকে, চুপসে যাওয়া গালের উপরে রুদ্ধশ্বাস যত চিন্তা যায় আসে, কপালে ভাবনার ছায়া, চোখ শূন্য পানে। সে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কেবল দেখাতেই তার অধিকার। বয়স তার পঁয়তাল্লিশ, সে এখন দাদুর মতো, বাপের মতো। যুবতীরা কখনো তাকে নিজেদের সঙ্গী মনে করবে না, তার ছায়া দেখলে যুবক-যুবতীরা পালাবার পথ খুঁজবে, কারও ঈর্ষা হবে না তার প্রতি, সে যেন থেকেও নেই।

ক্ষেতের কাছে কাছে খামার, দিনের বেলায় খামারের পিছনে ঝোপের আড়ালে কারা সব কত কি গল্প করে যায়, ফিস ফিস করে কথা, আস্তে আস্তে হাসি, কত মন-ভোলানো, কত মিষ্টি কথা। ছল করে লেঞ্জু কন্ধ সেই দিকে যায়। এমন দিনে দুপুর বেলা নির্জন বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। কে জানে কোথাও যদি হরিণ কি সম্বর নেমে এসে থাকে ক্ষেতে। লেঞ্জু কন্ধ বেড়াতে বেড়াতে পাতার ফাঁক দিয়ে নজর করে দেখে, কান শব্দ পাওয়ার জন্য খাড়া হয়ে থাকে, শোনা যায় তরুণ-তরুণীদের কথা-বার্তা, খোশ গল্প। লেঞ্জু কন্ধের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে, দেহের রক্তবেগ দ্রুত হয়, সে এগিয়ে যায়। তার পায়ের শব্দে, তার ছায়ার নড়া-চড়ায় গাছের পাখীরা উড়ে যায়, যুবক-যুবতীরা সচকিত হয়ে চুপ করে যায়, কেউ কোথাও গুটি-সুটি মেরে থাকে, কেউ বা হাসতে হাসতে উছলে পড়ে এদিকে ওদিকে দৌড়ে পালায়। কেবল ভাগাতেই পারে লেঞ্জু কন্ধ, বয়োবৃদ্ধ মান্য লোক সে।

কিম্ভূত কিম্পুরুষ সে। কেউ এগিয়ে আসে না হাসতে হাসতে, নরম লাজুক সুরে কেউ বলে না—"এস্রেনা দায়াদা." "লায়াজা কুস্‌ুই"। সে প্রেতের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, চোখ দুটো চাকার মতো ঘুরে চারিদিকে চায়, কান শোনে, রক্ত, তেতে ওঠে কিন্তু সে শুধু দর্শক, নিজেকে

চোখ ঠেরে যেন কিছুই হয়নি ভাব দেখিয়ে মাথা নাড়ানো ছাড়া তার ভাগে আর কিছু নেই।

তার ভাবনার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীরসম্বন্ধশীল ব্যবহার তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, মনের যত নালিশ মনেই মরে যায়।

এর পর তার মনে নিত্যই বিকার আসে, জেনে শুনেই আপন মনকে সে মাতিয়ে তোলে, ধাংড়ী খোঁজে, পায় না, হতাশ হয়ে ফেরে। মনকে যত মাতায় তৃষ্ণা ততই বাড়ে। বাইরে পঁয়তাল্লিশ বছরের সমাজপতি সে, বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়াবার খেলা তাকে বজায় রাখতে হয় নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে।

মানুষ বয়সের হিসাব রাখে না, বয়সই হিসাব রাখে মানুষের। সমবয়সী ছেলে-মেয়েরা নিজের নিজের বয়স অনুসারে আলাদা আলাদা দল বেঁধেছে। দলের চারিদিকে দুর্ভেদ্য জালি বেড়া, বেড়ার ওদিক থেকে লেঞ্জু কন্ধ কেবল উঁকি মারে দলছাড়া গরুর মতো, ভিতরে ঢোকবার উপায় নেই, কেবল হাঁই পাঁই।

নিজের ঘায়েল-হওয়া মনকে পুষতে গিয়ে সে দিউড়ুর সঙ্গে ঝগড়া করে। ঝগড়া করলে অভিমান করলে ঘায়ের চারিপাশের মামড়ি ছিঁড়ে যায়, ঘা বেড়ে যায়, কিন্তু মনে একটা আরাম পাওয়া যায়।

সে-দিন দুপুর বেলায় খেয়ে দেয়ে ক্ষেতের কাছে পায়চারি করবার সময় সে চেয়ে দেখছিল এ গাঁয়ের আর অন্য গাঁয়ের মেয়েরা কাজ করতে করতে এদিকে ওদিকে যাওয়া আসা করছে। ফসল কাটার ধুম পড়েছে। মাছ ধরার সময়ে আর ফসল কাটা ফসল মাড়াইয়ের সময়ে, মানুষ কিলবিল করতে থাকে। জায়গায় জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে ফসল মাড়াই করবার জায়গা, ফসল গাদা করে রাখবার জায়গা, তৈরী হয়েছে। মাড়াই করবার জায়গাতে ঘি সিঁদুর ফুলের চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, ফসল রাখবার জায়গাতে কাঁটা দিয়ে ছাওয়া উঁচু উঁচু ফসলের গাদা, চারিদিকে আনা-নেওয়া করবার জন্য দলে দলে মেয়ে। দিউড়ু সাঁওতা এল, মদ খেয়ে চোখ লাল করে মাতাল হয়ে এসেছে সে। মদের ঝোঁকে গান গাইতে গাইতে টলতে টলতে সে এদিকে ওদিকে ঘুরছে ফিরছে, মেয়েরা হেসে হেসে তাকে সহ্য করে যাচ্ছে। লেঞ্জু কন্ধের বড় কেমন কেমন লাগতে লাগল। আস্তে আস্তে রাগ বাড়তে লাগল

তার। দিউড়ু আগে তো এমন ছিল না, এত নেশা তো করত না, এমন বেয়াড়াপনা করত না। কোথাও তার দিকে পিছন করে মেয়েরা ফসল বাঁধতে ব্যস্ত, মাতাল দিউড়ু টলতে টলতে গিয়ে পিছন থেকে তাদের ঠেলা দিচ্ছে, মেয়েরা অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে হাসতে এদিকে ওদিকে ছিটকে পালাচ্ছে। লেঞ্জু কন্ধের মনে হল এ-সব ভাল কথা নয়। সাঁওতার পক্ষে দিন দুপুরে খোলা ক্ষেতের মধ্যে এ-সব ইতর চাল-চলন সাজে না। মাতাল, বললে কথা শুনবে না, মিথ্যে গোল বাধবে তার দোষ ধরতে গেলে।

ভাবল, ছেলের বাপ হয়ে, গাঁয়ের সাঁওতা হয়ে দিউড়ুর মাথা গরম হয়েছে, এমনি করেই সে উচ্ছন্নে যাবে।

বিরক্ত লাগল। এই ছোড়াছুঁড়ীগুলো—ছিঃ—!

গজর গজর করতে করতে সেখান থেকে সরে গিয়ে লেঞ্জু কন্ধ ভাবল ঐ আম গাছের ছায়ায় একটু বসা যাক। সেখানে ছোট ছোট ছেলেরা লাফা-লাফি দৌড়দৌড়ি খেলা করছে। ছোট ছেলেপিলেদের খেলা তার বরাবরই ভাল লাগে। আম গাছের ছায়া হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। আম গাছের ওপাশে জামিরি কন্ধের ধানের ক্ষেত। সেখানে একটি স্ত্রীলোক কাঁধে ঝুড়ি নিয়ে নুয়ে নুয়ে এখানে ওখানে কি কুড়োচ্ছে দেখা যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছিল, সে ভুর্সামুণ্ডা বারিকের ঘরের বউ, বালমুণ্ডা ডোমের স্ত্রী সোনাদেঈ। আম গাছের ছায়া ভাল, ছেলেপিলেরাও সেখানে খেলা করছে, লেঞ্জু কন্ধ সেখানে চলল।

একটেরে নিরিবিলি জায়গাটি। "কি দাদুভাইরা, কি খেলছ তোমরা ?" "খরগোশ শিকারের খেলা খেলছি, খরগোশ আর বুনো কুকুর।"—"আমরা খরগোশ, আমরা পালাব।"—"আমরা বুনো কুকুর, আমরা ঘাঁটি আগলাব, তাড়া করব, ধরব।"—ছেলেপিলেরা চেঁচামেচি করে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল।

সোনাদেঈ ধান কুড়োচ্ছে। ফসল কাটা হয়ে যাবার পর গরিব-গুরবোরা ঝুড়ি নিয়ে এমনি করে ঘুরে ঘুরে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিছু কিছু পায়। সোনা-দেঈ বোধ হয় ওদিকের ক্ষেত থেকে ধান কুড়িয়ে এইবার এদিকে আসছে। সত্যিই কত কষ্ট করছে ডোম বউটি।

—"ওরে, তোরা রোদে এত দৌড়াদৌড়ি করছিস কেন ? পাথরে হাত

পা ছিঁড়ে যাবে, রক্তারক্তি হবে, তোদের বাবারা বকবে। অতো ছুটো-পাটি করছিস্ কেন? শান্ত হয়ে খেলা কর্ না। কি দুষ্টুরে তোরা!"

আম গাছের ছায়া। ছেলেরা খেলা করছে। সোনাদেঈ এই দিকে আসছে। তাইতো, বেশী ধান হয় তো এই দিকেই পড়ে আছে, কেমন বোকা সে!

লেঞ্জু কন্ধের নীতিবাক্যে ছেলেদের হুঁশ হল। সত্যি তো সে তাদের সঙ্গীসাথী হতে পারে না! তারা ভেগে পড়ল, পাঠশালার পণ্ডিতমশায়কে দেখলে ছেলেরা যেমন করে। খেলার জায়গা দূরে সরিয়ে নিল। দূরে, দেখা না যায়, একটা বড় পাথরের আড়ালে।

দার্শনিক লেঞ্জু কন্ধ চুপচাপ আলের উপর বসে ধুঙ্গিয়া ধরাল। দিউড়ুকে মনে মনে গাল দিতে লাগল, বড় অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে সে।

সোনাদেঈ গাছের কাছে এসে ধান কুড়োতে লাগল। লেঞ্জু কন্ধের গাছের ছায়া ভাল লাগছিল, ভাল লাগছিল ধুঙ্গিআর বুকভরা লম্বা টান।

সোনাদেঈ মুখে কিছু বলে না, কিন্তু কি মুখর তার হাব ভাব, তার ভঙ্গী, তার মাংসপেশীর গড়ন। এই সব এক সঙ্গে মিলে কথা বলে, বলে— নিরাশ্রয় আমি, স্বামী আমার অপারগ। আমার দেহ আছে, মন আছে, সব আছে, কিন্তু স্রোতে ভেসে যাওয়া ফুল আমি, আশ্রয় চাই। বলে—দেখ আমার যৌবন, এত থেকেও আমি তৃষিত, একটু জল দেবে কেউ?

সংসারের উপরে বোঝা, একটা দায় সে, এই সোনাদেঈ। কি রূপ, কি ডৌল! রোদে রোদে ঘুরে মাঠে মাঠে ধান কুড়িয়ে বেড়ানো তার সাজে না। কি পরিশ্রম!

সোনাদেঈ মুখ তুলে চায়। ডাগর চোখ দুটি স্থির করে রাখে একটুক্ষণ, লেঞ্জুকে না দেখে তার ভিতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেন দেখে নেয়, আবার নিজের কাজ করে। লেঞ্জু কন্ধের কেমন কেমন লাগে।

"তোকে পাঠিয়ে দিয়ে সবাই সরে পড়েছে, হাঁলো সোনাদেঈ? বারিক বুড়ো কোথায় গেল?"

সোনাদেঈ মুচকে হাসল। বলল, "সবাই যে যার কাজে গেছে।"

"এত রোদে ঘুরছিস্ কেন, কোথাও বসে একটু জিরিয়ে নে না।"

সোনাদেঈ হাসল। কাজ করতে করতে আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল।

ভাল লাগল লেঞ্জু কন্ধের। তার মুখের চেহারা বদলে গেল, মন ছটফট করতে লাগল। সোনাদেঈ ধান কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে চলেছে। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সোনাদেঈ এ-ক্ষেত ও-ক্ষেত করতে করতে আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল। লেঞ্জু কন্ধ দেখল ছেলেরা আর খেলছে না, কখন থেকে এখানে ছায়াও নেই, রোদ মুখে এসে পড়েছে।

লেঞ্জু কন্ধ উঠে চলে গেল।

॥ আঠারো ॥

মিণিআকা হাকিনা এই কন্ধ দেশে এসেছে প্রায় এক মাস হল। ছোট শিশু সে, তারও এই পৃথিবীর উপর সমান অধিকার। মানুষের দেহে মনে যা কিছু থাকা দরকার সবই তার আছে। সে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ততখানিই যতখানি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ পৃথিবীর আর সব জায়গার মানুষ-শিশুরা। তার জন্মদিন কোথাও লিখে রাখা হয় নি, তার কোষ্ঠী নেই ঠিকুজি নেই; কেউ তার জন্মদিন পালন করে নি, তার জন্মে রাজ্যময় সাড়া পড়ে নি বা তার কোন স্মারক ছবি কোথাও ছাপানো হয় নি। সংসারের অসংখ্য শিশুর মতো সেও একটি শিশু।

কিন্তু আকাশের নক্ষত্রের 'যোগ' বলছে যে সে রাজা হবে না, তার ডিঙা ভাসবে না, সে মানুষকে খেলনা করে ফেলা-ছড়া করবে না, তাদের নিয়ে পুতুল নাচাবে না, তাদের খাটাবে না, মহলের উপর মহল ইমারত তুলবে না সেকালের সেই রাবণ সাহুকারের স্বর্গের সিঁড়ির মতো। এই রকম, অনেক 'না' 'না' আছে তার জীবনে—নক্ষত্রের যোগ বলছে।

দৈব তার জন্য দড়ি এক গাছি তৈরি করে খোঁটার সঙ্গে তাকে বেঁধে দিয়েছে, তারি মধ্যে সে চরবে, ফিরবে, তার বাইরে কেবল 'না' 'না'।

খোকাটি হয়, মা কল্পনা করতে বসে কি হবে এর কপালে, আদর করে ছোট মাথাটিতে আঙুল বোলাতে বোলাতে ভাবতে থাকে সত্যি এই ছোট্ট

এক রত্তি ছেলে এক দিন মানুষ হবে, কে জানে কি আছে এর ভাগ্যে! দেবতার কাছে মানত করে, অনেক রকমের তোষ যাচে। গোপনে গনৎকার ডাকিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করে সব মঙ্গল তো? না আর কিছু? বল, বল। গনৎকার খড়ি পাতে, দিনক্ষণ হিসাব করে, মোটামুটি গণনা করে বলে যোগ অনুযায়ী কি হবে। মা তাতেই সন্তুষ্ট।

কি হবে না সে কথা বলে না গনৎকার।

মিণিআকা হাকিনার সঙ্গে আর যারা এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে তাদের চেয়ে সে কম কিসে? অথচ অনেক জুলুম, অনেক দুর্ভোগ তোলা রইল তারই কপালে। তার সঙ্গে যে শিশুরা এসেছে তারা বড় হয়ে তার জন্য আইন বেঁধে দেবে, কেবলি নিজের কোলে ঝোল টানবে, তাদের কথায় তাকে উঠতে বসতে হবে, সে যে গরিব কন্ধ ভাই।

যত লোক জন্মায় তাদের অধিকাংশই এটা বুঝতে পারে না যে তাদের জীবনে এই 'না' 'না' কত। তাদের জীবনের কলও কোনো প্রশ্ন না করে চলতে থাকে, যা পায় কুড়িয়ে নেয়—হোক তা আধপোড়া বিড়ি কিংবা সীতাভোগ মিঠাই। যা পায় কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে বুঝে নেয়। না পাওয়া জিনিসের তো কোনো হিসাব নেই, খায় দায় আর দশ জনের মতো সামনের দিকে মুখ করে দশ জনের চলা পথ ধরে চলে যায় শেষ পর্যন্ত।

অল্প কয়জনই দলকে চালায়, খাতায় নাম ওঠে তাদেরই, তাদেরই ইঙ্গিতে পৃথিবীতে ঝড় ওঠে, বাজ পড়ে—খরগোশই বেশী, বুনো কুকুর অল্প।

মিণিআকা হাকিনা পৃথিবীটাকে দেখে মায়ের বুক থেকে, নরম গরম, অভাব নেই, ঝরনার অফুরন্ত ধারার মতো মুখের ভিতরে চলে মায়ের দুধ, কি সুন্দর খোলা আকাশ, নীল আকাশ, সেখানে তো কোন আল নেই, কোনো বেড়া নেই। আরামে মিণিআকা হাকিনা চোখ মটকায়, দেখে সার সার এক আড়ার ঘর দুই সারি, সব ঘরে উনন, সব ঘরেই গরম, সব সমান।

মানুষকে সে দেখে এক বুক উঁচু থেকে, ছোট বড়র তফাত তার নজরে পড়ে না, নড়ছে চড়ছে অনেকগুলি মুখ, স্থির হয়ে আছে যে সে তার মা, সর্বদা একই রকম। কখনো কখনো হাকিনার পৃথিবীটা দোলে, একটা ঝুড়ির মধ্যে তাকে শুইয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ঘরে আড়কাঠে নয়তো গাছের ডালে। কাছে চেনা মুখগুলিকে দেখতে পায় না, হাকিনার ঘুম পায়।

কখনো বা বাইরে কেবল মাটিতে একখানি নেকড়ার উপরে পড়ে থাকে সে। চোখের সামনে দিয়ে একটির পর একটি অনেকগুলি ছবি চলে যায়, সেগুলিকে সে এক এক করে ধরবার চেষ্টা করে মনের ভিতরে, ধরতে পারে না, কাঁদতে থাকে। সামান্য অভাবেই সে কেঁদে ওঠে, আর কাঁদলেই অভাব ঘুচে যায়। মিণিআকা হাকিনার এক রত্তি মাথাটুকুর মধ্যে একটি ছোট্ট দাগ পড়ে যায় যে কাঁদলে অভাব ঘোচে।

নিজের অভাব মেটবার পর সে হয় একটি ছোট্ট দর্শক, পায়রার চোখের মতো চোখ, সরষেটি পড়লে দেখতে পায়। কিন্তু তার চাউনিতে কেবল প্রশ্ন। এই পৃথিবীর ছল-ছাঁদের বাঁধা গৎ সে বুঝতে পারে না। কাকের ঠোঁটে ঠোঁট ঢুকিয়ে কাকের ছানা কি খাচ্ছিল, একটি মানুষ এল, কাক উড়ে গেল। কত পাখী তার চারিদিকে কিচির-মিচির করতে থাকে, কিন্তু তাদের মন সদা সতর্ক, কাছে আসতে ভরসা পায় না। তার ইচ্ছে করে পাখীরা যদি তার আরো কাছে এসে বসত। সকলের সম্বন্ধেই তার এমনি মনে হয়, কেউ তার কাছে বসে থাকে না।

তার দেখায় কোনো কমতি হয় না। সে রঙ চিনতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে, যখন বাইরে সে ঝুড়ির মধ্যে গাছের ডালে ঝুলতে থাকে যত ঝিকমিকে রঙ সব তার নজরে পড়ে, রঙে রঙে পৃথিবীটা ঝলমলে দেখায়। কিন্তু আবার রঙ বদলে যায়, হাকিনার মনে অভাব লাগে, সে কেঁদে ওঠে।

মায়ের নিত্য দেখা মুখের রঙগুলিকে চিনে রাখবার জন্য তার চোখ দুটি ঘোরে, সেখানেও থেকে থেকেই পরিবর্তন। কখনো কখনো মায়ের মুখ থেকে উজ্জ্বল বর্ণের আভা নিবে গিয়ে থাকে শুধু মেটে কালো, দেখলে কান্না পায়।

ছোট্ট মানুষটি, মনের গভীরে তারও ওঠে পড়ে অভাব আর পূর্ণতার ঢেউ। সে কাঁদে, হাসে, সব কিছুতেই বাঁধা পড়ে থাকে তার মায়ের আঁচলটিতে।

॥ উনিশ ॥

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুর বেলা ননদ ভাজ দুজনে পাড়ার স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, এমন প্রায়ই যেতে হয় কন্ধ স্ত্রীলোকদের। পুরুষেরা চাষের কাজে ব্যস্ত। হাকিনা মায়ের বুকে বাঁধা ছিল, তার বনের জীবন শুরু তার চোখ মেলবার দিন থেকেই। পুন্নুর দুর্বল লাগছিল, ইদানীং কেন জানি তার ভারী দুর্বল লাগছে দিন দিন।

পড়ন্ত রোদ। ভারী বন, শাল আর বাঁশ, নিচে পাথরের গাদা। এখানে ওখানে শুকনো ডাল, শুকনো বাঁশ, উই ধরেছে। এই বন থেকে বাঁশ কেটে কেউ বাইরে নিয়ে যায় না। নানা জাতের বাঁশ।

স্ত্রীলোকেরা বকর-বকর করতে করতে চলেছে। মাঝে মাঝে যেন আশ্বাস দেওয়ার মতো বনের ভিতর এক এক জায়গায় শোনা যাচ্ছে আস-পাশের লোকেদের সাড়া শব্দ, কুড়ুলে কাঠ কাটার শব্দ। ককোড়ি (ফার্ন) ঝোপের ঘন বনের মধ্যে বুনো ঝোরা কাচের থামের মতো শুয়ে পড়ে আছে। দুই দিকের লম্বা লম্বা শাল গাছের মাথার মাঝে জায়গায় জায়গায় অল্প একটু ফাঁক, সেইখান দিয়ে ঝকঝকে আলো ঝরে পড়ছে, সেখানে আলো ছায়ার বনভূমি, কন্ধনীর চেনা মাটি।

পথ উঠে পড়ে চলেছে। কোথাও উঠছে তো উঠেই চলেছে কত উঁচুতে, শাল গাছের মাথার উপরে, গাছের মাথার সমানে গাছের গোড়া, আবার ঘুরপাক খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে ছায়ার সমুদ্রের ভিতরে যেখানে নির্জন বনের তলার সরু ঝরনা খিন খিন করে কাঁদে, পাথর থেকে পাথরে সরু লম্বা পা ফেলে দুই লাফে পার হয়ে আবার চড়াই, ঝরনার খাড়া পারের গা বেয়ে উপরে ওঠা।

এখানে পথ শেষ হয় না, কাজও শেষ হয় না। কোন্ কাজ কখন আরম্ভ হয় আর কখন শেষ হয় তার খোঁজ কেউ রাখেনা। ঠিক কাজ সারবার জন্য কেউ কাজে লেগে থাকে না, লেগে থাকে অভ্যাসের বশে।

সবাই মিলে একসঙ্গে কন্ধনীরা চলেছে। কোথাও পথের মাঝে শুকনো

ডাল শুয়ে শুয়ে তাদের অপেক্ষা করছে, কোথাও সরু মরা গাছ। কন্ধনীরা কাজে লেগে যায়, কাঠ ভেঙে নেয়। কেউ শিআরিরি পাতা পাড়ে, কেউ কন্দ খোঁড়ে, কেউ বা বাঁশের কোঁড় তোলে, কেউ বা থোপা থোপা ফুল দেখে আর লোভ সামলাতে না পেরে ছুটে যায় তুলতে। ঝোপের ভিতর বন-মুরগীর ডিম, ময়ুরের ডিম, মাথার উপরে কাঠ পিঁপড়ের ছাতা, পাথরের খাঁকে মৌচাক, অভ্যস্ত চোখে সহজেই ধরা পড়ে।

কিছু দূর উপরে উঠে ঝাঁকড়া আম গাছের তলায় সকলে সারে সারে পা মেলে বসে পড়ে, কেউ বাচ্চাকে আদর করে, মাই দেয়, কেউ কেউ বসে উকুন বাছে, কেউ চুরুট খায়, গল্পগাছা হয়। স্ত্রীলোকেদের এমনি বৈঠকে মানুষের জীবনের বড় বড় সমস্যার আলোচনা হয়।

এদের সঙ্গে তাল রেখে চলে সেই বনের ভিতরেই বনের জন্তুরা, গাছের ছায়ায় তাদেরও বৈঠক বসে, বড় বড় গাছের তলায় বানরের দল, নিচে নদীর বালিতে পালে পালে হরিণ আর সম্বর, বনের মাঝে খোলা জায়গায় বনমোরগ, ছোট ঝোপ-জঙ্গলে ছাওয়া পাহাড়ের ঢালুতে পালে পালে ময়ূর। খাবার জিনিসে ভরা জঙ্গলের ভিতরে দল বেঁধে ঘুরতে ঘুরতে জুটো খুঁটে নেওয়া, পরস্পরের সান্নিধ্য আর সুখালাপ, বনে ঘুরে বেড়ানো—এইটুকুই। নিবিড় বনের ভিতরে না টের পাওয়া যায় জন্তুর বাসা, না টের পাওয়া যায় মানুষের কুড়ে ঘরের বসাত। একই দশা সকলের।

মিণিআকা হাকিনা সব দেখে, কান খাড়া করে সব শোনে, বুনো পৃথিবীর সঙ্গে তার জানা-শোনা বাড়তে থাকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ের তরঙ্গ ওঠে, খণ্ড খণ্ড অনুভূতি মিলে মিশে এক হয়ে আকার ধারণ করে, বনের সন্তান বনকে চিনতে থাকে।

পুয়ু ছেলের মা, বন তার ভাল লাগছে, কতদিন পর আজ সে ছুটি পেয়েছে। খোলা ফাঁকা দেশের মানুষে এই অন্ধকার জঙ্গল দেখলে তার বুক কেঁপে উঠবে, চলতে গেলে পা মচকিয়ে পড়বে গিয়ে কোন গভীর ঝোরার ভিতরে। এখানে বাঘ ভালুক, এখানে সাপ, কোন্ মুহূর্তে প্রাণটি যাবে তার ঠিক নেই। খোলা দেশের লোক একে ভয় করে। জীবজন্তুর চাইতে বেশী ভয় অজানা বনের আড়ালকে। সরু পথে একজনের পিছনে আর এক জন, ঘন পিরি ঘাসের বন বড় বড় গাছের তলা দিয়ে দিয়ে, কোরাপুটিয়া

ঝোপের জঙ্গল, তাতে একে অন্যের মুখ দেখতে পায় না, দেখাশোনা চেনা-জানা কেবল শব্দ দিয়ে। কিন্তু বনের ভিতরে এই অজানায় চমকই কন্ধ ভাইয়ের আনন্দ, কন্ধনীর সাধ-আহ্লাদ। নির্জন বন নির্জন নয়, সেখানে চেনা-জানা অতি পরিচিত গাছ-পাথরের সঙ্গে। জন্তু—সে তো দূরের মনমাতানো স্বপ্ন, তারা নিজেদের সেই নেহাত চেনা জায়গায় চরে ফিরে চলে যায়। ভয় আর কষ্ট এও আছে, না থাকলে এর সৌন্দর্য বোঝা যেত না। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতাও সর্বত্র, ভয় নিবারক অশরীরী কন্ধ দেশের দেবতা, প্রহরী। বিশাল উদার আকাশ, সেখানে দর্মু দেবতা, অন্ধকার গিরি-কন্দরেও তার দৃষ্টি। নীচে দর্তনী, বসুমতী, মানুষের মা, ঘাট পর্বত চড়াই উৎরাই সব নিয়ে সর্বত্র। বনে বনে হোরু পেনু (বন-দেবতা), ডাকলে 'ও' বলে সাড়া দেয়। আর, যেখানেই যাও কন্ধ জগতের ঘর-দেবতা ঝাকর পেনু, কেবল তাকে স্মরণ করা হোক এইটুকু চায়। এই সব দেবতার আশীর্বাদেই সব শুভ হয়, অমঙ্গল থাকে পিছনে পড়ে। দেবতার উপরে বিশ্বাসের ভর করে করে সামনের দিকে চেয়ে মানুষ এগিয়ে চলে, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সচেতন থাকে, হোঁচট খেলেও ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সব সয়ে যায়, চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মনে খেদ নেই।

এই বিশ্বাসের জোরে কন্ধনী ব্যাঘ্রসংকুল বনে কাঠ কাটতে যায়, এই বিশ্বাসের জোরেই তার শিশুকে বিনা আবরণে খোলায় মেলায় মানুষ করে তোলে, বন আর পাথর, শীত আর বর্ষা, যে উপাদান ঠাকুর দিয়েছেন তারি মধ্যে। এতে তার দুঃখ নেই, এইখানেই ঘর দুয়ার, চলা ফেরার জায়গা, যাই থাক না সেখানে। বাঘের গর্জন তার পরিচিত শব্দ, চিল শকুন তার নিত্য সঙ্গী, এই সব না থাকলে তার সংসার অপূর্ণ থেকে যেত, কোথায় কিসের ফাঁক থেকে যেত যেন।

বাইরের ভয় ভয় নয়, বাইরের কষ্ট কষ্ট নয়।

বাইরের ঝড় সয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ভিতর থেকে বেরোয় আগ্নেয়গিরির তরলাগ্নির স্রোত, রোখা যায় না তো, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে, তার ওষুধ নেই। আছে আছে হঠাৎ কি কথায় কি কারণে খুলে যায় রুদ্ধ কান্নার মুখ। তখন বাইরের ঝলমলে রোদ, ঝিকমিকে সুন্দর অগণিত পাখীর মেঘ মানুষকে বোধ দিতে পারে না ; মন মানে না, মানুষ কাঁদে।

মনের গহনে অন্ধকার কন্দর, তারই ভিতরে হাসি-কান্নার তরঙ্গ, ছলকানি লাগতে থাকে ক্রমাগত উপরের দিকে।

গাঁয়ের মেয়েরা কাঠ কাটতে বনে ঘুরতে যাচ্ছে। পিছনে পিছনে চলেছে বুড়ী আর আধবুড়ীদের দল, সকলের আগে আগে চলেছে দলছাড়া হয়ে আইবড় মেয়েরা, মাঝখানে বউরা। পথ চলতে গেলে দল আপনিই ভাগ ভাগ হয়ে যায়, কেউ জেনে-শুনে সাজিয়ে দেয় না। পুরুলি আগের ভাগেই আছে, অগ্রগামী প্রজাপতি-বাহিনী তাদের। সেই দলে রয়েছে রেন্দ, কাঠ্‌ক টিট, পুলুমে। কাজ করা কেবল একটা ছুতো, কাজের জন্য কারো গরজ নেই। কেবল সবায়ের থেকে আলাদা থাকবার একটা উপলক্ষ্য খোঁজে মন, হাতে হাত বেঁধে গলাগলি করে কানের কাছে ফিস্‌ফিস করে কথা বলবার, অকারণে হেসে লুটোপাটি খাবার। কলরবের অর্থ নেই, উদ্দেশ্য আছে। যৌবনের স্বপ্নের রূপান্তর, আনন্দ। রূপান্তরিত স্বপ্নের কাহিনীতে ওঠে টুকরো টুকরো অনুভূতির কথা—কে কবে ক্ষণিকের জন্য চোখ ঝলসে দিয়ে চলে গিয়েছিল! কেউ তা আঁচলে বেঁধে রাখেনি, সে শুধু একটা প্রতীক, মনের গভীর তলদেশে তার কোনো ছাপ নেই, এইজন্যই তা হাসির উপাদান। ছোট ছোট কথা, ভাষা অল্প, অভিব্যক্তি বেশী, সঙ্গে সঙ্গে হাসি। হাসতে হাসতে একজন ছুঁয়ে ফেলে নীরন্ধ্র মনের কোনো গভীর স্মৃতি—শুয়ে শুয়ে যে অপেক্ষা করে ছিল সে কোন রেদাসি যোগের। অজানতেই ছুঁয়ে ফেলে। চোখ খোলে, দেখে কিরীট কুণ্ডল পরা হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখ যেন স্বপ্নে ভাসছে, চার চোখ এক হয়, যুবতীর চলকে-ওঠা হাসি আর শোর ঢালে না। অনন্ত শব্দ ব্রহ্মের পটভূমিতে বাজে অনাদি মন্ত্রের ধ্বনি। যুবতী মাথা নিচু করে থাকে, দল থেকে আলাদা, একা, অলস, আনমনা। পা ভারী ভারী, আধ বোজা চোখে ভাবের নেশা। প্রথম চমক সামলে উঠে সে চেয়ে দেখে চারিদিকে নতুন বউল, নতুন পাতা, নতুন ফুলের তুফান উঠেছে। সেও নিজের বাকল ছাড়ে।

তাদেরি পিছন পিছন কচি ছেলে বয়ে চলেছে বউদের দল। তরুণ গাছে মুকুল ধরেছে, স্থিতি উদ্দেশ্য পেয়েছে। পথের কাঁটা নেই, আঁচড় খাওয়া নেই, প্রতীক্ষার আনন্দ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। চলা পথে চলার আরাম, আনন্দ কেবল অভ্যাসের দরুন, চলন তাদের ধীরে ধীরে। ছেলেপিলে হয়েছে,

আরও হবে, ঘর-করনা আরম্ভ হয়েছে, আরও বাড়বে। এরা সংসারে ধরা পড়েছে। নিত্যদিনের দিন বাঁচাতেই তাদের আনন্দ। চারি পাশের দেখা পরখ করা মানুষ আর জিনিসের উপরেই তাদের নির্ভর, তাদের বলের উপাদান স্বপ্ন নয়, স্মৃতি নয়, কেবল বিশ্বাস।

পিছনে পিছনে আসছে বৃদ্ধ ভবিষ্যৎ, অস্ত সূর্যের হলদে আলোয় তাদের প্রকাশ। বিশ্বাসের জোর নেই, নেই স্বপ্নের নেশা, থুর থুর করে পা কাঁপে, মনে নিষ্ফল বিদ্রোহ, চিন্তায় সাত-পাঁচ ভাবনার আড়াআড়ি।

বনের ভিতরে চলে এই তিন দল।

গাছ মুড়িয়ে বুড়ীরা কাঠ ভেঙে নেয়, কোঁড় ভেঙে ভেঙে বাঁশ ঝাড়ের গোড়া সাফ করে ফেলেছে, পা গুনে গুনে পথ চলে, হোঁচট খায়, যুবতীদের সমালোচনা করে, পথকে গাল দেয়, যত নালিশ যত অভিযোগ তাদের।

—"ও মেয়েরা, কোন্ দিকে তাকিয়ে পথ চলিস্ লো তোরা, কেমন কাঠ-পিপঁড়ের বাসা ছেড়ে চলে গেলি, ঐ দেখ, ওখানে, ভেঙে নিলে কাজ দিত না?

—"তুই ভেঙে নে না কেন, আই?"

—"আমার ভেঙে নেবার ক্ষমতা থাকলে আর তোদের ডাকতে যাব কেন?—আঃ, দেখ দেখ এদের কাণ্ড! আর একটু পরেই আঁধার হবে; জন্তু-জানোয়ার বেরোনোর সময়, একটুও ভয়-ডর নেই, গেল সব কোথায় জঙ্গলের ভিতর ফুল পাড়তে।"

কত ঘুরে ফিরে এঁকে বেঁকে চলে গাঁ কাছে এল। জঙ্গলের নীচে দিয়ে ধীরে ধীরে ঢালু পথ দিয়ে সবাই নেমে পড়ল নীচে। এবার গাদা গাদা পাথর, এক একটা পাথুরে ঢিবির উপর অল্প অল্প ঝোপ ঝাড়, তার ওদিকে দূরে দূরে এক-একটি ক্ষেত। আর তারও ওদিকে গাঁয়ের পাহাড়ের চড়াইয়ের ঢালু।

গ্রামের কাছের এই নিচু পাথুরে ফাঁকা জায়গায় কত মানুষকে বাঘে খেয়েছে। জঙ্গলের ভিতরে তত বেশী বাঘে ধরে না যত ধরে জঙ্গলের কাছে এই ফাঁকা জায়গায়। দূর থেকে কন্ধ জুড়ী বাঁশিয়ালের বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। চৈত্র মাসের তেমন দেরি নেই, এমনি সময় অল্প অল্প চৈতী নেশা খেলে যেতে শুরু করে চারিদিকে। জোড়া

বাঁশির সুর যেই শোনা অমনি তরুণীদের দল পাথুরে ঢিবি জায়গাতেই যে যেখানে ছিল থমকে দাঁড়িয়ে গেল, নাকের পাতা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

—"দাঁড়ালি কেন রে? বেলা যে পড়ে এল, কিসের যেন গন্ধ পাই। চল্, পালাই এখান থেকে—।" বুড়ীরা কাছে এসে পড়ল, মেয়েরা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ঢিবির উপরে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশ থেকে পাহাড়ের ওপারে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে তার তেজ। বাঁশির সুর কাছে এল। মাঠের উপরে সরু পথ বেয়ে কাঁধে হাতে বর্শা নিয়ে কারা এক দল এল জোরে জোরে কথা বলতে বলতে। এদিকের দল এগিয়ে চলল, ঐ পথ কেটেই এদের যেতে হবে।

দেখা-সাক্ষাৎ হল, এক অচেনা কন্ধের দল। মাঝে একটি যুবতী, তার পাশে পাশে এক জোয়ান, মনের আনন্দে চলেছে। যুবতীরা যুবতীর কাছে গিয়ে জুটল। অন্য স্ত্রীলোকেরাও কাছে গেল। ছোকরারা কত ছলে গল্প করার জন্য এগিয়ে এল।

"ও আই, তামাক পাতা আছে? দেবে একটু? আসছ কোত্থেকে?··· এই বনে বাঘের উৎপাত শুরু হয়েছে? ··তোমাদের গাঁয়ে মদ তৈরি করেছ? গেলে দেবে তো?" তারা পণ্ড্কাপাই গ্রামের লোক, মেয়েটি গেচেলা গ্রামের বউ। তার পাশের জোয়ানটি পণ্ড্কাপাইএর এক আইবড ছোকরা, বাকী সকলে তারই নিজের লোক। কত বারই গেচেলা গ্রামের পথে কম্পা হাটে যেতে হয়, পথে মেয়েটির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। মেয়েটির স্বামী বয়সে তার দেড় গুণ বড, বেজায মাতাল, হলই বা সে সাঁওতার ভাই। যুবক আর যুবতীব ভাব হল। নিজের বিবাহিত জীবন অসহ্য হয়ে উঠল যুবতীর। মাতাল স্বামী অত্যাচার করে, বড় ভাই সাঁওতা মাঝে পড়ে এ-কথা সে-কথা বলে দুজনকে শান্ত করে। বউটি যতই অনিচ্ছা জানিয়ে বলে না না, তাকে গেচেলা গ্রামে আটকে রাখা হয়। স্বামীকে সে দশ জনের সামনে স্পষ্ট বলে দিয়েছে—"তোমাকে আমার দরকার নেই।" কন্ধ আইনে এইটুকু বললেই বিয়ে ভেঙে যায়। তবু সে এতদিন আসতে পারে নি। যোগ-সাজশ করে কম্পা হাটে গিয়ে সেইখান থেকেই আজ সে উধাও হয়েছে—এবার সে মুক্ত।

যুবতীদের আগ্রহ বেড়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা বউটি

সহানুভূতি পেয়ে মহা উৎসাহে নিজের কথা বলতে লাগল,—কত অত্যাচার সহ্য করার পর সে নতুন স্বামী পছন্দ করে বেরিয়ে এসেছে। সে নতুন কিছুই করেনি, মনের মিল না হলে নতুন স্বামী গ্রহণ করার অধিকার কন্ধ-দেশে আছে। আপন ইচ্ছা অনুসারেই মুখ ফিরিয়ে সে চলে এসেছে ; সঙ্গে তার নতুন স্বামী। পুরানো স্বামী টের পাবে, মদের নেশা ছুটলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে খুঁজতে বার হবে। হয়তো এবার সে তার অধিকার জারি করবে ক্ষতিপূরণের জন্য টাকা চেয়ে— স্ত্রীর কাছে নয়। ঠেঙ্গা লাঠি বর্শা তীর-ধনুক পর্যন্তও গড়াতে পারে ব্যাপার। কন্ধ যুবকেরা হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা— তারা প্রস্তুত আছে।

—"চললাম আই। অনেকক্ষণ থেকে গেলাম, আঁধার হয়ে যাবে।"

কিছু দূর যাবার পর যুবকেরা খুব টেনে টেনে গান গাইতে লাগল— "আজ আমাদের ভাগ্য ভাল। দেখ না কেমন খাঁচা খুলে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বনের পাখীকে, আমাদের সঙ্গীর জন্য !—আজ আমাদের সবই ভাল ছিল, কেবল একটু বাধা রয়ে গেল এই যে তোমরা দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়লে। তোমরাও বনের পাখী, কিন্তু আমাদের সঙ্গে উড়ে যেতে তোমরা চাও না। কেন মিছে আমাদের চোখে পড়ে গেলে তোমরা— এবার শুধু আঁধার কঠিন পথ—"

গানের তরঙ্গ দূরে মিলিয়ে না যেতেই যুবতীরা এক তানে তার জবাব দিল—"ওগো সাথী, আমরা খাঁচার পাখী নই, আমরা বনের পাখী, তোমরা মনের পাখী খুঁজছ না তো বন্ধু, তোমরা খুঁজে বেড়াচ্ছ খাঁচার পাখী, তা না হলে তোমরা কি আসতে না ওগো বিদেশী ? বেশ, যাও যাও ! শুভ হোক তোমাদের রাত্রি।" গানের সুর মিলিয়ে গেল, এবার সামনের দলে হাসি ছুটল, মাঝখানের দলে তর্ক আর পিছনের দলে সমালোচনা।

সন্ধে হল। গাঁয়ের শেয়াল ডেকে উঠল। জঙ্গল ঘোরায় আজ বিশেষ কিছুই হল না, কেবল শেষে যা একটু মজা দেখা গেল। সেই অচেনা মেয়েটি—আর এক জনের ভরসায় অজানা পথে যে পা বাড়িয়েছে—সে যেন সকলের সাহস, সকলের ধমকের মূর্তি, তানা-না-না সংশয়ের শত্রু, নিজেই গড়ে, নিজেই ভাঙে, নিত্যিদিনের কন্ধ মেয়ে সে। তার চেহারায় ন্যায়বোধের জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। সে নিজের সমাজকে চিনেছে, জেনেছে নিজের

সমাজের ন্যায়-অন্যায়ের কথা। অপমান সহ্য করা, অবহেলা অনাদর সহ্য করা সেখানে অন্যায়, নিজের রুচির বিরুদ্ধে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা সেখানে পাপ সর্বজয়া নারী নিজের মর্যাদা রক্ষা করেছে, তাতে সে হারালই-বা স্বামী, হারালই-বা দুর্বল পুরুষের তৈরী গোষ্ঠী।

গ্রামে ফেরার সময় সারাটা পথ কেবল এই গল্প।

মাঘের সন্ধ্যা। এখন শীত আর অন্ধকার। সব শীত সব অন্ধকার পায়ে দলে পথ চলবে তারা—এই বনবাসীর আদর্শ। তাতে ভালমন্দের বিচার নেই, কেবল একটা আদর্শ, যার অনুসরণ করতে মন চায়।

পুয়ুর খোকা মায়ের বুকে ঝিমুচ্ছে। আলো চলে গেলে তার ঘুম পায়। পুয়ু ভাবছিল অনেক কথা। দিউড়ু ফিরে হয়তো মাঠে চলে গেছে। ঐ যে যুবতীটি আর একজনের হাত ধরে চলে গেল, তেমনিই একদিন তার আর দিউড়ুর ভালবাসা অটুট ছিল। দিউড়ু বদলেছে, এখন তার মন আর এমন নেই যে কখন পুয়ু আসবে বলে পথ চেয়ে বসে থাকবে। কেন এমন বদলে গেল দিউড়ু, কি তার অপরাধ? কত বার অভিমান হয়, দিউড়ু তার মান ভাঙাবার চেষ্টা করে না। সেদিকে তার লক্ষ্যই নেই। অভিমান আপনিই হয়, আপনিই মরে, বুকের ভিতরটা ঝাঁজরা করে দিয়ে যায় দিন দিন।

দিউড়ু স্ত্রীর উপরে অত্যাচার করে না। কিছুই করে না সে, সেটিও তার বদলানোর লক্ষণ। স্ত্রীলোকের মন কুকুরের নাকের চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ, একেবারেই বুঝে নেয় যে স্বামীর মন ভেসে চলেছে অন্য এক ঝরনা বেয়ে।

পুয়ুর গায়ের জোর কমে গেছে, এটা সে নিজেই বোঝে। তার উপর খাটুনি বেড়েছে, খাটুনি এই ছোট্ট মানুষটির জন্য। পুয়ু তাকে বুকের দুধ খাওয়ায়, আদর করে, অজানতে তার চোখে জল টল টল করে। মনের মধ্যে অজস্র প্রশ্ন, কচি ছেলে মায়ের মুখের দিকে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চায়, জবাব মেলে না তার কাছ থেকে। মনের আগুন আপনা-আপনিই নিবে যায়, কিন্তু এক-এক দিন কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা যে মনে পড়ে—যেমন আজ সাঁঝের বেলায় ঐ অচেনা পথিক মেয়েটিকে দেখে মনে পড়ছে।

জীবনের রসে মন টস টস করে, মনের মধ্যে কত কি সুখের স্বপ্ন উজ্জ্বল

হয়ে দেখা দেয়। বাঁধা রাস্তায় চলা কলের পুতুলের ভিতর এক নতুন রূপের নতুন সৃষ্টির চেতনা আসে, আবার সে উত্তেজনা জলে গিয়ে রেখে যায় অঙ্গার আর ছাই। কাজ করতে গিয়ে মানুষ দেখে তার হাতখানি নেই। উই-ঢিপির উপরে কচি লতার জাল লোটায়, ফুল ফোটে, তলাকার ঠুঁটো গাছ কবে থেকেই ফোঁপরা হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

পুয়্‌ চুপচাপ চলেছে। পুবুলি হইহল্লা করছে। পিছনে ফেলে আসা স্বয়ংবরা মেয়েটির কথা তখনও তাদের শেষ হয়নি।

—"সত্যি লো পুলুমে, ওদের ছেড়ে দেওয়াটা ভাল হয় নি। রাতটা আমাদের গাঁয়ে থাকতে দিয়ে সকালে বিদায় করে দিলেই ভাল হত। শীতের রাত, জঙ্গলা পথ—"

—"কোনো দরকার নেই, পুবুলি, জঙ্গলা পথ তাদের কি করবে? ওর কপাল খুলেছে। মাতাল আধবুড়ো খিটখিটে বর ছেড়ে ভাল বরের, জোয়ান বরের হাত ধরে যে নতুন ঘর পাততে চলেছে তার মনে যদি ভয় ডর থাকত তাহলে সে নিজের সুখ নিজের হাতে তৈরি করে নিতে পারত না।"

—"ভারী ভাল মেয়েটি লো—"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু যাই বল, আমাদের গাঁয়ে রাতটা থেকে গেলে ভাল হত, পথে যদি বাঘে ধরে, তাহলে?"

—"না থাকল নাই।—চইত পরব আসুক তখন যাবো ওদের গ্রামে। চেনা-শোনা তো পথে হয়েই গেছে, গেলে কি আমাদের পুছবে না?"

পিছন থেকে বুড়ীরা ঠাট্টা করল—"কেন লো হাঁকপাঁক করছিস্ তোরা? গেলি না তোরাও ওদের সঙ্গে সঙ্গে ওদের এগিয়ে দিতে? ভয় কি, কত ধাংড়া তো ছিল!"

—"না না, ডেকে আনলেই ভাল হত। আমাদের মেয়েরা নাচত, রাতটা কাটত ভাল। দেখিস্ নি সে রাত্রে কেমন ভাল পটেছিল মিটিং গাঁয়ের জোয়ানদের সঙ্গে?"

যুবতীদের মধ্যে যারা আগে আগে যাচ্ছিল খুব এক চোট হাসল। গলাগলি করে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলল গ্রামের ভিতরে।

পুবুলির মনে পড়ল মিটিং গাঁয়ের বেন্ত কন্ধকে।

বন্ধন নেই, বাধা নেই, জীবন ততটা নীরস নয় মানুষ যতটা ভাবে মাঝে মাঝে, কেবল দড়িতে গেরো দিয়ে দিয়ে দিন গুনতে হয়—ভাবল পুবুলি।

একটি ছুটি তারা ফুটেছে, অন্ধকারে গ্রামের গলি পথে আলো জলেছে।

॥ কুড়ি ॥

মিণিআপায়ুর ফসল কাটা প্রায় শেষ। ক্ষেতগুলি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, খাঁ খাঁ করছে। দিনের বেলায় ক্ষেতের আগলদারের কুঁড়ে ঘরে ছোট ছেলেরা বসে খেলা করে। কেউ বা মাচানের খুঁটির উপরে চড়ে, খুঁটি বেয়ে কেউ বা বানরের মতো ক্ষেতের উপর লাফ দিয়ে পড়ে।

যেখানে সেখানে টুকরো টুকরো ইতস্ততঃ ছড়ানো নেড়া ক্ষেত নজরে পড়ে। ওরই মধ্যে কোথাও কোথাও দেরিতে পাকা ফসলের হলদে হলদে ক্ষেত। ক্রমে এই ফসলও উঠে যাবে।

দিউড়ু সাঁওতার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সারা বছরের পরিশ্রমের রোজগার কেটে বেঁধে সে আর লেঞ্জুকন্ধ ঘরে তুলেছে। আর কিছু অলসি আছে, তাও তোলা হয়ে যাবে।

এখন থেকে চাষীর হালকা কাজ, ফসল যত্ন করে রাখবে, আগামী ফসলের কথা ভাববে, হাটে হাটে ঘুরবে। নিশ্বাস ফেলার অবসর না পাওয়া কাজ থেকে ছুটি পেয়ে একটু বাঁশি বাজাবে, বসে বসে ধুঙিআর ধোঁয়া খাবে আর গল্প করবে, সব চলবে ঢিমে তেতালা চালে।

বেশীর ভাগ সময় এখন ঘরে বসেই কাটবে। চারিদিকে আনন্দের ধুম, রাত্রিতে নাচ। এই সময়ের কথা ভেবে অবকাশকে সরস করবার জন্য মহুয়া গাছ থেকে পাকা ফল ঝরে পড়ছে। পাহাড়ের খোলে, ঝোপের ধারে ধারে, মদ তৈরির মহোৎসব লেগে গেছে।

সেদিন ছুপুরে দিউড়ু বাইরে বেরিয়েছিল। ঘরে বসে বসে একঘেয়ে লেগে গিয়েছিল। কেজো লোকের ঘরে বসে থাকলে যেন কেমন কেমন লাগে, সেখানে ছেঁড়া পুরানো কাঁথার মতো সেই একই দৃশ্য, বাচ্চাকে আঁচলে চাপা দিয়ে তার মা কাজে অকাজে ব্যস্ত, বোন এখানকার জিনিস ওখানে,

ওখানকার জিনিস এখানে রাখছে। দোড় গোড়ায় বরাবরের মতো চার পা মেলে শুয়ে দস্রু কুকুর নাক ডাকাচ্ছে, উপরের ঠোঁট একটু ফুলে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে। লেঞ্জু কন্ধ ঘরে নেই।

দিউড়ু গাঁয়ের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো অবধি গেল। গলি-পথের দু পাশে মানুষ কিলবিল করছে। তোলা ফসল কোটা হচ্ছে বাড়া হচ্ছে, লঙ্কা শুকোচ্ছে তামাক পাতা শুকোচ্ছে, কোথাও বা কেউ বসে বসে দড়ির খাটিয়া বুনছে। বুড়োরা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে পানসে চোখে মিটমিট করে তাকিয়ে ধুঙ্গিআ টানছে। ছেলেরা খেলা করছে। গাঁয়ের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো খালি এই দৃশ্য। এক জায়গায় নিষ্কর্মা ছোকরার দল বারান্দায় বসে ঢোল পিটছে। দিউড়ুর বিরক্ত লাগছিল, কিছুদিন ধরেই তার বিরক্ত লাগছে! এমন কোনো পথ দেখতে পাচ্ছেনা যে সোজা চলে যেতে পারে। জীবন হয়ে উঠেছে উদ্দেশ্যহীন। রোদের তেজ বেড়ে মানুষের মনে উল্লাস এনে দিচ্ছে দিন দিন। কাঁচা-মিঠে ডাঁসা আমের মতো শীতের আমেজ আর চৈত্রের রোদ। মানুষ এর জবাব খুঁজে বেড়ায় বাইরে, পায় না, রাগ ধরে।

সদ্য পাওয়া সর্দারি সাঁওতাগিরির অভিমানে বুক ফুলিয়ে দিউড়ু চারিদিকে চেয়ে দেখে। মনে মনে খোঁজে কত ফুল চন্দন ধূপের অর্ঘ। সাত পুরুষের পর্দা উঠে উঠে যায় তার পিছনে একটার পর একটা করে। মত্ত ষাঁড় যেমন শিং দিয়ে মাটি খোঁড়ে ঘাড় ফুলিয়ে সামনে চাইতে তেমনি সেই অতি অতীতের মনের ভিতরকার কোন আদিম ব্যক্তিত্বকে তার মন বুঝে কষে নিতে চায় বাইরে,—সে অঙ্কের উত্তর পায় না দিউড়ু সাঁওতা। চৈত্রের উষ্ণতা মনকে মাতায়, বাইরে চাইলে মনে পড়ে বুড়ো লেঞ্জু কন্ধের হাড় বের করা মুখ, তাতে একটা অবজ্ঞার, তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসি। দেখে পুয়ুর মুখ, শুকনো, সিঁটকে, নীরস। পুয়ুর চোখ এখন আর ঝোপ-জঙ্গল হাতড়ে দিউড়ুকে খোঁজে না, দিউড়ুকে দেখলে কুঁকড়ে যায়। তার ব্যক্তিত্ব বন্দী হয়ে থাকে এক রতি শিশুর চারিপাশে। দিউড়ু সব কিছুই চায়, কিন্তু কারো কাছে কিছু পায় না। মনে হয় যেন তার কি রোগ হয়েছে। ঘুম আসে না। চোখ লাল লাল, যেন কেউ চোখ দুটোকে চার দিক থেকে টেনে ধরেছে। সংসারের বিরুদ্ধে তার মন বিদ্রোহ করে এই জন্য যে সে কেজো মানুষ কিন্তু কাজের শেষে একটুও শান্তি নেই তার। কেউ তার

মহত্ত্ব বোঝে না, এগিয়ে আসে না তার গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে একটু পাখার বাতাস করতে।

দিউড়ু সাঁওতা গাঁয়ের গলি-পথে এখানে ওখানে থেমে থেমে এগিয়ে চলল। কোমরে হাত রেখে খোলা গাটাকে রোদ খাওয়াতে খাওয়াতে সে কিছুক্ষণ অলস দৃষ্টিতে যেদিকে পথ বেরিয়ে গেছে সেদিকে চেয়ে থাকে, কিছুই বোঝে না। কেউ উঠে আসে না সে পথ দিয়ে।

গাঁয়ের মাথায় একটু তফাতে বারিকের ঘর। বারিক জাতিতে ডোম, তাই সে তফাতে। আলাদা এক সারি ছোট ছোট কুঁড়ে। ঘরের চালের ছাউনি পুরানো ঝরঝরে, কোথাও কোথাও খড় নেই। বাড়ির চারিদিকে ভাঙা বেড়ার ধ্বংসাবশেষ। ভিতরে আবর্জনার মতো কতকগুলো আধমরা গান্টিআ (জোয়ার) গাছ, ছড়ির মতো দাঁড়িয়ে। ঘাসের উপর কুমড়ো আর লাউ লতিয়ে আছে। ছাই-পাঁশ আবর্জনা গাদা গাদা। পায়রা আর মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের দুই মুড়োর দেওয়ালের এ পাশে চাল থেকে ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া নেকড়া ঝুলছে রোদে শুকোবার জন্য। চালের এক জায়গায় খুর শুদ্ধ একটা গরুর পায়ের হাড়। এরা ডোম, অজাত। ছোট জাত। সকলের ধারণা মানুষের সব নীচের শ্রেণী এরা। এদের কোনো মান-অপমান নেই। তাই আত্মসম্মান বজায় রাখবার না আছে কোনো ইচ্ছা, না আছে চেষ্টা।

তখন ডোমের বাড়ির হতশ্রী ভাব দেখে তা অনুভব করবার মতো চেতনা দিউড়ু সাঁওতার ছিল না। ঘরের পিছনে যত নোংরা, সেই দিকে বসে বালমুণ্ডার স্ত্রী সোনাদেঈ চুল শুকচ্ছে। বেলা দুপুর, নেয়ে ধুয়ে একটি ছোট্ট কাপড় পরে চুল এলিয়ে সে বসে ছিল। দিউড়ু দাঁড়াল। ডোমের ঘরের পিছনে বিশ্রী গুমসো গন্ধ। একটা হাড় জিরজিরে রোগা কুকুর একটা আবর্জনার গাদা আঁচড়াতে ব্যস্ত। পাশেই মুরগীর দল কিলবিল করছে।

ঐ কুকুরের মতোই রোগা ভুর্সমুণ্ডা বারিক কাঁধের উপর ছড়ানো রুক্ষ জটা ঝাড়তে ঝাড়তে ঝকঝকে দাঁতের পাটি মেলে হাড় সর্বস্ব গালে মুচকি হাসি হেসে উঠে এল। পিছনে পিছনে এল তার ছিপছিপে জোয়ান ছেলে ভুরুণ্ডা। কৌপীন পরা, হাতে একটি গাছের ছড়, ধুলোয় ভরা গা। অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে ঘাড় হেলিয়ে দুলিয়ে বারিক বলল, "সাঁওতা, সাঁওতা! খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে? এই দুপুর রোদে কোথায় চলেছিস?

বারিক খোশামোদ করে। সাঁওতা তার মনিব। সাঁওতা গাঁয়ের সর্দার, নায়ক। তার কাজ প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে খাজনা উসুল করে রাজার ঘরে আমিন আর রিবিনির (রেভিনিউ অফিসার) কাছে জমা দেওয়া, গ্রামের লাভ-ক্ষতির বিষয় চিন্তা করা। গ্রামের শ্রেষ্ঠ লোক সে, সম্মানের পাত্র। আর বারিক তার হাতের হাতিয়ার, তার হুকুমের মধ্যে গ্রামের যে কোন কাজের দরকার হলে বারিককে তা করতে হয়। প্রজাদের ঘরে প্রজাদের ক্ষেতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। সাঁওতা যেখানে বলে সেখানে যায়। গ্রাম পাহারা দেয়। সাঁওতা তার সুখ-দুঃখের তত্ত্ব নেয়। বারিকের কাজের জন্য জমি দেয়, খোরাকি দেয়। প্রজারাও ঘর-পিছু তাকে কিছু কিছু দেয়। এই ভাবেই বারিকের চলে।

যত কূট বুদ্ধি সব এই ডোম জাতির বারিকের। ঘর ভাঙা, ঘর জোড়া দেওয়া, ঝগড়া বাধানো, মেটানো, পরামর্শ দেওয়া—সব। স্বভাবতঃ ছেলেবেলা থেকেই ডোমের উর্বর মস্তিষ্ক, কিন্তু তার মধ্যে সর্বক্ষণ কোনো-না-কোনো দুষ্ট বুদ্ধি খেলে এইটুকুই যা। ডোম নিজে শ্রমকাতর, তাই দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য মতলব বার করাই তার একরকম ব্যবসা। ভুর্সামুণ্ডা পুরাতন ঝুনো বারিক। তার বুঝতে বাকি ছিলনা যে দিউড়ু সাঁওতা ছোকরা হলেও সেই তার মনিব, তার সব ভাল মন্দ সাঁওতার হাতে।

কাজকর্ম না থাকায় অলস অবসর ক্ষণে বারিকের বাক্‌চাতুরী মন্দ লাগল না দিউড়ুর। "সাঁওতা তুই, তবু আমি তোর বারিক বলেই না কিছু-ক্ষণ এখানে এসে থেকে গেলি, আমরা তোর গু-মুত খেয়ে পড়ে আছি। সরবু সাঁওতা আমার বাপের মতো ছিল। তুইও আমার বাপের মতো। বাঁচালে বাঁচাতে পারিস, মারলে মারতে পারিস্ তুই, তুই-ই তো সব!"

পিছন থেকে সোনাদেঈ চেয়ে ছিল।

বারিক বকে চলেছে—"কি করব, আমার কপালই এমনি, সাঁওতা। সবই কপাল। আমার বাপের মতো সরবু সাঁওতা—মরে গেল!" বারিক কেঁদে ফেলল—"জোয়ান বয়সে ঠিক তোরই মতো ছিল সে। এমনি গড়ন, এমনি গতর। একশ' লোকের মধ্যে চেনা যায়। ···আমিও সব প্রভুর সব অধিকারীর সেবা করে পড়ে আছি, কত এল কত গেল। 'শালা' বলে গাল দিয়েছে বটে, আর কিছু বলেনি··· আমি আর আমার ছেলেপিলেয়া

সব। তোর কুকুর, দেখবি তুই—" বারিক পাগলের মতো বকবক করে, এক কথা থেকে আর এক কথায় লাফিয়ে যায়, ঝপাঝপ নতুন নতুন কথা ঝাড়তে থাকে।

"বুঝলি সাঁওতা, সব আমার অদৃষ্টের ফের। আমার জমি হল এইটুকু, পেট অনেক গুলি, সকলের মুখে অন্ন জোটেনা। সাঁওতা বলেছিল আরো কিছু জমি জোগাড় করে দেবে। কই দিল? নিজেই তো মরে গেল।"

বারিক আবার ফোঁপাতে লাগল। সে লক্ষ্য করল, দিউড়ু অন্যমনস্ক হয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বলল—"দেখ, সাঁওতা আমার কপাল, এক বছর হল এই ছুঁড়িকে কেলার গ্রাম থেকে এনেছি—তার বাপকে তিন কুড়ি টাকা 'ঝোলা' (পণ) দিয়েছিলাম। এনেছিলাম আমার ছেলের ঘর করবে বলে। তা এমন বউ, সাঁওতা—কি করব, কপাল—ছেলেটা এই বউয়ের কাছেও ঘেঁসে না, বউ বলে 'নিচু'—'নিচু' (উঁহু উঁহু, না না)। কখন আর কার হাত ধরে ঘর করতে চলে যাবে কে জানে।"

দিউড়ুর যেন হুঁশ হল। বললে, "চলে যাবে? কেন?"

"জিগ্যেস কর্ সাঁওতা, ওকেই জিগ্যেস কর্। আমার ছেলের সঙ্গে তো ওর ঝগড়া হয় না। সব সময় আমার সঙ্গেই ঝগড়া করে। বলে—আমায় কেন পুতবউ করে এনেছিলি? জিগ্যেস কর্, ওকেই জিগ্যেস কর্। —ও সোনাদেঈ—"

সোনাদেঈ হেসে বেড়ার কাছে উঠে এল। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বারিক বলল, "ওকে জিগ্যেস কর্ কেন চলে যাবে। জিগ্যেস কর্ ওকে কি শাস্তি দিয়েছি? খেতে না দিয়ে রেখেছি? চলে গেলে আমার তিন কুড়ি টাকা কে দেবে? বলুক ও। আমি না হয় সরে যাচ্ছি।"

দিউড়ু সাঁওতার আগ্রহ বেড়ে উঠেছিল। সে সকলের ভাল-মন্দ জানবার হকদার। তার শাসনাধীনে বারিকের পুতবউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে? কেন? কি জন্য?

"তুই চলে যাবি?

সোনাদেঈ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কেন তুই চলে যাবি?"

জবাব নেই।

"বল্ বল্। আমাকে ভয় করিস্ না। বারিক 'আলুয়া' (হনুমান) করে?" তারপর গলা নামিয়ে বলল, "বালমুণ্ডা তোর যত্ন করে না?"

দুইজনেই নীরব। দিউড়ু খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, "বালমুণ্ডার কি হয়েছে? 'কাইলা' (অসুখ) আছে কিছু? বল্—বল্—"

সোনাদেঈয়ের মুখ ঘেমে উঠল। একটা পা নেড়ে নেড়ে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে ঘষছিল। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তার পর পিছন ফিরে চলে গেল। দিউড়ু কেবল শুনতে পেল—"ছি ছি"।

সোনাদেঈ হাসতে হাসতে চলে গেল। দিউড়ুরও হাসি পেল। এই সোনাদেঈ যদি ডোম না হয়ে কন্ধ হত, তাহলে বয়স অনুপাতে সে দিউড়ুর স্ত্রী হবার উপযুক্ত। এখন তাকে কি আর বলা যায় কেন সে তার স্বামীর কাছ থেকে চলে যেতে চায়! বুড়ো বারিক এক পাগল। বারিক আবার এসে উপস্থিত হল। বলল, "বলবে না তো? আমি জানতাম বলবে না, ঐ রকমই ও। ছোট বেলা থেকে ওর মা বাপ ওকে বোবা তৈরি করেছে। কিন্তু তুই ওকে জিগ্যেস কর্ সাঁওতা, তোর যখন ইচ্ছে হবে ওকে এসে জিগ্যেস করিস্। আমি তো হার মেনেছি। সন্ধ্যের সময় জিগ্যেস করে একা একা বোঝাপড়া কর্।" বলে বারিক হাসল। দিউড়ু সাঁওতাও হেসে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। পিছন থেকে বারিক ডেকে বললে,—"আমার জমির কথা মনে রাখিস্ সাঁওতা, তোরই কৃপা।"

॥ একুশ ॥

দিউড়ু এগিয়ে চলল। এইখানেই গ্রাম শেষ। দিউড়ু কোথায় চলেছে সে জানে না। শুধু যেতে ইচ্ছে করছে তাই যাচ্ছে। গ্রাম পেরিয়ে গেলে আলের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে জমি, টুকরো টুকরো জঙ্গল। দিউড়ু সেইখানে উঠে দাঁড়াল। গাছের ছায়া পড়েছে, বউল ধরেছে, কাঁঠাল ফুলের মন মাতানো গন্ধ আসছে। পায়ের নীচে খাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে রেড়ির গাছ। পাহাড়ের ধার বেয়ে নেমে গেলেই সামনে চারিদিকে

গোল করে পাহাড়ে ঘেরা বিরাট গহ্বরের মতো উপত্যকা। এইখানেই কন্ধদের ফসলের ক্ষেত, যাকে বলে "কন্ধগুড়িআ"।

বাতাস উঠল, গায়ে আরাম লাগল। চমক ভেঙে দিউড়ু চারিদিকে চেয়ে দেখল। বাতাসে কোত্থেকে টাটকা মদের গন্ধ আসছে। হয়তো রোদে ধোঁয়া নজরে পড়ছে না, মদ তৈরি হচ্ছে কোনো কন্ধগুড়িআতে।

দিউড়ু নামল।

উপরে গ্রাম, নীচ দিয়ে দিয়ে ক্ষেত। আরো নীচে পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলের মাঝখানে ঘরের মেঝের মতো নাবাল জমি, ঝাড় জঙ্গল সাফ করে ফেলা মাটির ভিতের উপরে তৈরী। এক-একটি অঞ্চলে এক এক জনের চাষের জমি, তাতে একখানি করে চাষ ঘর। বাঁশের পাতলা চটা দিয়ে দিয়ে তৈরি চাটাই গোল করে ঘিরে গোয়ালের দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। এই মস্ত বড় এক-এক জনের এক-এক চাকলা করে যে চাষের জমি তাকেই বলে "গুড়িআ।" সেগুলিতে সব জায়গায় চাষ হয় না। মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় পাথর আছে, ছাড়া ছাড়া লতা-পাতার বন এখানে-ওখানে। যেখানে চাষ হয় সেখানে অড়হর ফসল হয়েছে, তামাক আর রেড়ি হয়েছে, লঙ্কা আর হলুদের ক্ষেতও আছে। চারিদিকের পাহাড় থেকে সরু সরু নালার মতো ঝরনা নেমে এসেছে, উঁচু ক্ষেতে জল তোলবার জন্য জায়গায় জায়গায় তেণ্ডার[১] ব্যবস্থা। যেখানে জলের কাছে উর্বর জমির চাকলা আছে সেই সব জায়গায় কন্ধদের আদিম ফল কাম্বেলার (কমলা লেবু) বাগান। অনুকূল জল হাওয়া মাটি পেয়ে কমলা গাছ ভালুকের মতো ঝাঁকড়া হয়ে বেড়েছে, কত জায়গায় কমলার জঙ্গল, পাকলে কখনো কখনো কমলা ঝরে পড়ে ঝরনার স্রোতে ভেসে যায় দূরের নদীতে। একের গুড়িআ আর অন্যের গুড়িআর মধ্যে মাঝে মাঝে কাঁকর আর পাথরের ঢিবি আর খানিকটা করে বন। কোথাও কোথাও বা গভীর খদ, শুকিয়ে আসা সোঁতায় জল, বালি সরছে। এমনি পাথুরে ঝোপ জঙ্গলে আর বালি সর সর ঝরনায় হরিণ নেমে আসে, চৈত্র মাসে যখন চারিদিকে খেদা শুরু হয় তখন এইখানে শিকার মারা পড়ে।

দিনের বেলায় যখনই দেখ কন্ধগুড়িআতে লোক থাকে, তখন গাই গরু থাকে। কেবল এক-একটা কুঁড়ে ঘর পড়ে থাকে খালি, নির্জন।

১ একদিকে ভারী পাথর লাগানো কপিকল বিশেষ।—অনুবাদক

খুব জোর মদের গন্ধ আসছে, দিউড়ু অস্থির হয়ে উঠল, যাকেই জিজ্ঞাসা করে কেউ জানে না।

দিউড়ু ভাবল এই কন্ধগুড়িআতে কোনো ঝোরার ধারে কুঁড়ে ঘরের কাছে নিশ্চয়ই মদ তৈরি হচ্ছে, অনেক মদ তৈরি হচ্ছে, তা না হলে বাতাসে এত তীব্র গন্ধ আসবে কোত্থেকে? বড় উনুনের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে পচা মহুয়া সিদ্ধ হচ্ছে, হাঁড়ির মুখের ঢাকনির ফুটো দিয়ে বাঁশের লম্বা ফাঁপা নল বেরিয়ে আর একটা মুখ বন্ধ করা হাঁড়িতে গিয়ে ঢুকেছে—যে হাঁড়িকে বলে ধরণি, এই হাঁড়িতে ফাল করে কাটা বাঁশ বেয়ে ঝোরার জল পড়ছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ধরণি খুলে মদ বার করে নিয়ে রাখছে। সেখানে ঝোরার ধারে এ গাছ ও গাছের নীচে কত লোক শুয়ে আছে ধরণি হাঁড়ির পানে চেয়ে। মদ তৈরি, মদ খাওয়া, গাছের ছায়া, নিরালা—সেই কন্ধ ভাইয়ের আরাম, তার স্বর্গ। মদের গন্ধ, ফাল্গুনের বাতাস, সুন্দর কন্ধগুড়িআ—দিন দুপুরেও মানুষ স্বপ্ন দেখে।

নিত্যদিনের অনুভূতির সেই একটিই প্রিয় ছবি দিউড়ু সাঁওতার বার বার মনে পড়ছিল; কিন্তু এইটুকুতেই ছবি সম্পূর্ণ হবে না। এর সঙ্গে আরো চাই রঙিন শাড়ী পরা মিশমিশে কালো মানুষ-জন্তু সারা শরীরে যার গোল গোল মাংসপিণ্ড। সে হরিণ নয়, কিন্তু ধরতে গেলে হরিণীর মতো পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। সে পাখী নয়, কিন্তু দূর থেকে তার ডাক শুনতে লাগে যেন পাখীর সরু গলার মতো, মানুষ তাতে আরোই ছুটে যায় পাহাড়ের খোলে খালে প্রতিধ্বনি তুলে—সেই ছবি, সে পাহাড় দেশের ধাংড়ী। ধরা দিতে দিতেও বাঁধন ছাড়িয়ে পালায় তৈরী মদের গন্ধের মতো।

এটুকু বিনা সব ফুল, সব মদ, সব ছায়া, আঁধার ঝোরার আড়াল, অপূর্ণ।

দিউড়ু খুঁজে ফিরছিল।

ফাঁকা মনের পিছন দিকে আছে এক ফাঁকা ছবি, সেখানে আছে তার ঘর, পুয়ু, পুবুলি, লেঞ্জু, হাকিনা। কিন্তু মনের সমস্ত প্রবণতা সামনের দিকে, অচলা পথের দিকে। অচলা পথ মনে পড়ে, যতই ভুলুক বে-খেয়ালে থেকে থেকে চাগিয়ে ওঠে। তৃষ্ণা বাড়ে, অনুতাপ হয়, অচলা পথ ডাকে।

বয়সের হিসাব কন্ধ রাখে না। কে জানে কত বছর আগে—হয়তো ছয় বছর—তখন সেই অচলা পথের একলা পথিক ছিল সে, ঠোঁটে হাসি, দেহে প্রথম যৌবন।

কত রকমের খেয়াল ছিল সে সময়ে—সংসারের সব সুখ নেবে, ভাগী হবে না কোনো দায়িত্বের। এমনি হালকা পাখায় কতদিন উড়ে চলেছিল জীবন। শক্তিশালী সাঁওতার কুলের একমাত্র পুত্র, কেউ কখনও বলেনি এটা করো না, কেউ বারণ করেনি। তার বয়সের অন্য নওজোয়ানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে কতবার জিতেছে, কতবার হেরেছে—অচলা পথে হার জিতের স্বাদ।

আজ সে সব নেই, সব ধরাবাঁধা।

মদ আর ধাংড়ীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে কন্ধগুডিআতে ঘোরাফেরা করতে করতে কখন পুয়ু এসে তার মন ছেয়ে ফেলেছিল দিউডু জানতে পারে নি। বুনো গাঁ মিটিং, উঁচু উঁচু পাহাড়। দিউডু সেখানে গিয়েছিল অতিথি হয়ে। সেখানেও কন্ধগুডিআ আছে। দুই দিকে দু-ফাল হয়ে চিরে বয়ে চলে গেছে একটি পাহাডী ঝরনা। ঘাটে বাটে চেনাচিনি, যেন কিছুই জানে না এমনি ভাবে চলে যায় ধাংড়ী, চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ধীরে হেসে ডাকে—"আয় আয়," রাত্রির আচে নিবিড পরিচয়. কন্ধগুডিআতে গানে বাঁশির সুরে উছল হয়ে এ ওর পিছু ধাওয়ার খেলা। এমনি ফাগুন তখনও, এমনি মহুয়া ফুলঝরা, কন্ধগুডিআতে এমনি মদের গন্ধ।

অড়হরের বন পেরিয়ে, রেডির বন পেরিয়ে এমনি সেদিন সে চলেছিল আনমনা হয়ে। সামনে একটি বড কন্ধগুডিআ। সেখানে সরু ঝোরার ওপারে উঁচু জায়গার উপরে ছিল কমলা লেবুর বাগান। মুখের কাছে অসময়ের গির্লি ফুল ফুটে ছিল, ঠিক এমনি লাল লাল ছুঁচালো থোপা। দিউডু কমলা বনের দিকে চলল। পথে যেতে এক জায়গায় নীল নীল ফুলের জঙ্গল, সে ফুলের নাম নেই, জংলী ফুল, গাছ ভরে ফুটে রয়েছে কতদূর অবধি। তার ওদিকে থোপা থোপা সাদা ফুল এখানে ওখানে ছড়ানো নীচের সবুজের উপরে। তার ওদিকে মাঝে মাঝে সুগন্ধি ফুলের বন, পাথুরে মাটি। কমলা বন শেষ হল। কন্ধগুড়িআয় কারো বা ক্ষেত ফাঁকাই পড়ে আছে। জালের মতো আগাছার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ চলে গেছে সামনে

একটু দূরে দেখা যাচ্ছে যে চাষঘর—সেইখানে। সেদিনের ছবি, সব তেমনি রয়েছে, মন কিছু ভাবতে, ভালমন্দ বাছতে চায় না, সব নিজের করে নিতে চায়। হুঁশ নেই, কলের মতো চলেছে সে। মিটিং কি মিনিআপায়ু, ছ বছর আগে বা ছ বছর পরে কে চায় তার হিসেব। অনুভূতি বয়ে চলেছে পুরাতন ছবিতেই।

চাষঘরের কাছে আসতে ভিতর থেকে গানের গুন গুন শব্দ। এও আগের থেকে জানা। একটা কুড়ের চাল থেকে শিকায় ঝুলছে ঢাকনা দেওয়া একটা হাঁড়ি। ঠিক আগেকার মতো। দিউড়ু ঢাকনি খুলল, তার মুখে খেলে গেল একটা অদ্ভুত বিকট ছবি। হাঁড়িতে মদ। এক পেট মদ খেয়ে শরীরটাকে গরম করে নিয়ে যে কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে গানের শব্দ আসছিল গুটি গুটি সেইদিকে চলল। দুই পাশে কলাগাছের বন। একটা ঝিঁঝিঁ পোকারা ধরল। এবার কুঁড়ে ঘরের গান যেন ভোরের ময়না পাখীর মতো সুন্দর। বাঁ দিকে খদের ঝোরার ছল ছল শোনা যাচ্ছে। চারিদিক নির্জন।

কুঁড়ে ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে পা মেলে বসে একটি ধাংড়ী। কোঁচড় ভরতি ফুল নিয়ে বসে অতি যত্ন করে মালা গাঁথছে, আর আপন মনে গান গাইছে।

সেই সেদিনকার ছবি। দিউড়ু টলতে টলতে ভিতরে ঢুকলো, উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—"হাদ্দিগো" (বাহবা, বেশ বেশ)।

ধাংড়ী চমকে উঠল। ঘাবড়ে যাওয়া চোখে একবার তাকিয়েই ফুলগুলো সেইখানে ফেলে দিয়ে এক লাফে ঘর থেকে দে ছুট। চক্ষের পলকে সব শেষ। পিছনের ছবি পিছনে মিলিয়ে গেল। না, এ তো সেদিনের মিটিং গাঁয়ের পুয়ু নয়, এ মিণিআপায়ুর কঙ্কগুড়িআতে পুল্‌মে, পুবুলির সখী। সে দিন গেছে, পুরাতন স্মৃতির পিছন পিছন গাছের গুঁড়ি চিনে চিনে অর্ধেক পথ অবধি ধাওয়া করে চলে যাওয়া যায় আপনা-আপনি, তারপর হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে মানুষের হুঁশ হয়।

দিউড়ু থমকে গিয়ে সেইখানে বসে পড়ল। ঘরের ভিতর শুনশান।

পুয়ু নয়, পুল্‌মে—হল কি? পুয়ুকে খুঁজতে খুঁজতে সে কি এত দূরে চলে এসেছিল? তা এলই বা, পুল্‌মে পালাল কেন? নিরালায় দুটো কথা হত। দিউড়ুর রাগ হল।

মদের নেশা ধরেছে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। দিউডু লম্বা হয়ে খালি মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। ছড়ানো ফুলগুলি কেবল গায়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে লাগে, হাত দিয়ে পা দিয়ে ঘষে কচলে দূরে ঠেলে দিল সেগুলো দিউডু। বৃথা আবর্জনা।

দিউডু ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ বাইশ ॥

ডুম্বাগুড়ার হাটের দিন। পুবুলি এসে বলল—"চল্ না যাই, পুয়ু? সবাই যাচ্ছে।"

"অত দূরে?"

"দূর কিসের, পুয়ু? লোকেরা সকালে বেরিয়ে দুপুরে পৌঁছে যায় আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে। কষ্ট হলে রাতটা বরং থেকে যাব, কি বলিস?"

পুয়ু হাসল। বলল, "পথে বন্দিকার পড়ে। বেশ গাঁ খানি, নালো পুবুলি?"

বন্দিকারের নাম করে পুয়ু পুবুলিকে খেপায়, বন্দিকারে হাগুর্ণা সাঁওতার বাড়ি।

পুবুলি ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলল, "খালি বন্দিকার কেন, আরো ভালো গাঁ নেই?—আয় আয়, তোর চুলটা আঁচড়ে দিই। চল যাই আজ ডুম্বাগুড়া, সবাই যাচ্ছে, ভাইও[১] যাচ্ছে। তুই যাবি না?"

পুয়ু আর ঠাট্টা করল না, তার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল। হাঁ, কন্ধদেশের প্রথা হাটে গেলে কিংবা অন্য কোনো গ্রামে বেড়াতে গেলে স্বামীর পিছন পিছন স্ত্রীও যায়, বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর ছায়া। কিন্তু তার অবস্থা অন্য রকম। স্ত্রীর আদর সোহাগ বুঝি তার ফুরিয়েছে। দিউডুর সঙ্গে হাটে যাবে দিউডুর তা সইবে?

পুবুলি নজর করল, বলল, "কাঁদছিস্ কেন, পুয়ু? কি হয়েছে তোর?"

"কাঁদছি? তুই ডুম্বাগুড়া হাটে যাবি এই ভেবে কাঁদছি। জানিস,

১ উড়িষ্যায় দাদাকে ভাই বলে ও ছোট ভাইকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

ছেলেমানুষ তুই, ভুম্বাগুড়া হাট তো যেমন-তেমন জায়গা নয়। কোথায় কত দূরে, কলাহাণ্ডির[১] সীমানায়। কত পাহাড়-বন পেরোতে হয়, পথে কত নদী-নালা। এক পোঢ়-গাড় নদীই বিশবার পার হবি। আর শুধু কি তাই? পুবুলি, ধাংড়ী মেয়ে তুই, কে জানে পথে কেউ যদি তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়—?"

ভাজের মুখে হাত চাপা দিয়ে পুবুলি বলল, "থাক থাক, বুঝেছি। তোর কি হয়েছে বল দেখি?

"বলব?"—পুয়ু খুব চেঁচিয়ে হেসে উঠল—তার দুর্বল শরীর যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে চায়। খুব হাসল, বলল, "তোর না হয় কিছু হয় নি, আমার কি হয়েছে তুই জানিস না? আমার খোকা হয়েছে!"

পুবুলি পুয়ুর মুখের দিকে, শরীরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, যেন সে আজ তার ভাজকে নতুন দেখছে। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল, তার মুখখানি উদাস হয়ে উঠল। "সত্যি পুয়ু, এমন দুর্বল হয়ে শুকিয়ে পাকিয়ে বাঁদরীর মতো হলি কবে তুই? দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিস। তোর কি কোনো অসুখ করেছে? তোর হাসি-খুশি নেই, ঘুরে ফিরে বেড়ানো নেই, গান গাওয়া নেই, শখ-সাধ নেই; মাথার চুলে জট পড়েছে। কি হয়েছে বল না? ডিসারিকে শুধিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করা যাবে।"

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে পুয়ু বলল, "সত্যিই ভুম্বাগুড়া যাবি? কে কে যাচ্ছে?"

"গাঁয়ের অর্ধেক লোক। এ সময়কার হাট ছাড়ে কে? ফসল হল, তা সেগুলো কি কেবল তোলা থেকে থেকে পচবে? একদল নাকি বেরিয়েছে ধুঙ্গিআ আনবে বলে। কাপড-চোপড় ছিঁড়ে গেছে, চইত আসছে, কত কি দরকার। পথও তো এখন আর অসাধ্য নয়, কি হবে ঘরে বসে থেকে?"

পুয়ু একটু ভাবল। পুবুলির এতখানি আগ্রহ ভেঙে দিতে তার মন সরল না। বলল, "আচ্ছা তবে যা।"

"আর তুই?"

"আমি?" বড় করুণভাবে পুয়ু তাকাল,—"ওলো, তোরা না এখনো ছুঁড়ি আছিস্, দৌড়-ঝাঁপ করে যাবার মতো তোদের শক্তি আছে, আমি কি

১ কলাহাণ্ডি—ব্রিটিশ আমলে—এই পুস্তকটি লিখিবার সময়—গড়জাত নামে উড়িষ্যার কিয়ৎস্বাধীন করদ রাজ্যগুলির অন্যতম, অধুনা উড়িষ্যার অন্যতম জেলা।

আর পারব ? তা কেঁদে ককিয়ে কোনমতে গেলেও যেতে পারি। খোকার কথা একটু ভেবে দেখ। কচি ছেলে, দূর পথ না, আমার যাওয়া চলে না।"

"ছেলেকে তো আমিই কোলে করে নেব, ও কি কেবল তোর ভেবেছিস ? কত বউ তো যাচ্ছে ছেলে কোলে করে, তুই না যাবি কেন ?"

"না না, সোনা আমার, জেদ করিস না, বুঝলি পুবুলি বেশী খাটলে আমার হাত-পা ঝিম ঝিম করে কিছু দিন হল। রোদ চড়া হচ্ছে বলে না কি চড়াই ভেঙে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, বুকের মধ্যে খালি খালি লাগে।"

"তাহলে তোর কিছু হয়েছে, আমার কাছে লুকোচ্ছিলি কেন ? ভাইকে বলব ?"

"তোর ভাই কি আমার মধ্যে ঢুকে বসে আছে যে জানলেই আমাকে ভাল করে দেবে ? কিছু না, এই ছেলেটা হল কিনা। কম হয়রানি, বোন। থাক, তুই ছেলেমানুষ। এমনি লাগছে কিছু দিন হল, আপনিই ভাল হয়ে যাবে। তুই যাবি তো যা। আমাব জন্য নয় তো চারখানা খাজা কিনে আনিস, কলাহাণ্ডির ভালো খাজা পাওয়া যায় ওখানে। আর বুঝে শুনে হুঁশিয়ার হয়ে চলিস। জঙ্গলে পথ, ঘাট পাহাড় দেখে শুনে যাস, সকলের মাঝখানে থাকিস। বাহাদুরি দেখাবার জন্য দল ছেড়ে একলা চলিস না। ঐ বন্দিকারের ঘাট পার হওয়াই তোর পক্ষে মুশকিল, নিজেই বুঝবি তুই—না লো ?"

পুবুলি হাসল।

হাটে যাওয়া কন্ধদেশের যুবকযুবতীদের একটা কাজ তো নয়, একটা অছিলা, একটা সুযোগ। বিভুঁই পথে, কত জানা অজানা নতুন পুরাতনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, চেনাচেনি হয়। হাটে দশ জায়গায় মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। সেখানে দেওয়া-নেওয়া চলে। ধাংড়া কিনে দেয় মুড়ি, গুড, খাজা, রাঙ্গা-আলু সিদ্ধ, কাচের মালা, পিতলের আংটি। ধাংড়ী কিনে দেয় তামাক পাতা, আখ। এই নূতনত্বের চমক লেগে মন দেওয়া-নেওয়া শুরু হয়। হাট একটা মহোৎসব।

কোনো কাজ থাকে না, কেনা-বেচাও বিশেষ থাকে না, খুব হোল তো কেউ দু পয়সার নুন কেনার জন্য যাচ্ছে, কেউ এক আঁজলা লঙ্কা বেচবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তবু দশ ক্রোশ পনের ক্রোশ দূর থেকে লোকেরা পিঁপড়ের

মতো পিল পিল করে হাটমুখো চলতে থাকে, সারা পথ ভরে ওঠে রঙে আর গানে।

পুয়ুর ইঙ্গিত পুবুলি বুঝতে পেরেছিল। ডুম্বাগুড়া যেতে পথে পড়ে বন্দিকারের ঘাট। সত্যিই বন্দিকারে আছে হাগুর্ণা সাঁওতা, যুবক সে। আগে হাগুর্ণা প্রায়ই আসত। গ্রামের লোকেরা তো ভেবেই নিয়েছিল যে পুবুলিকে নিয়ে হাগুর্না গেরস্তালি পাতবে, দুই গাঁয়ের দুই সাঁওতার ঘরের মধ্যে কুটুম্বিতা হবে।

হাসতে হাসতে পুবুলি বলল, "এইজন্যই তো তোকে বলছিলাম সঙ্গে চল, পথ দেখিয়ে দিবি। কেবল ঘরে বসে থাকলে কি হবে, তুই এলে তবে না—।"

"আমি গেলে তোর পায়ে ছাঁদন পড়বে লো, মিথ্যে তোর কাছ থেকে গালমন্দ শুনতে হবে। তুই যা।" শুকনো মুখে পুয়ু একটু হাসল। পুবুলির বুকে যেন ছুরির মতো বিঁধল। সে উঠে সাজগোজ করতে গেল, ঠিক হল সেই যাবে কেবল। পুয়ু একলা থাকলে হয়তো কিছু মনে করবে, কিন্তু তবু সে যাবে। পুয়ুর উপর অভিমান করে সে নিজের মনকে শক্ত করল—পুয়ু যাবে না তো নাই বা গেল।

একলা বসে পুয়ু ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে, ও ঘর থেকে পুবুলির গানের গুন গুন শোনা যাচ্ছে। পুবুলি গাইছিল সেই গান যে গান দুই দলে দেখা হলে প্রশ্ন আর উত্তর হিসাবে গাওয়া হয়। সামনে রয়েছে হয়তো ছোট একটি আয়না, তেল-হলুদের হাত তরতরিয়ে চলেছে গালে আর গলায়, রেড়ির তেল দিয়ে মাথার চুলগুলি মোলায়েম করেছে, তারপর নিজের মুখখানি নিরীক্ষণ করে দেখা, নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি, নানান ঢঙ।

পুয়ুর তাতে ঈর্ষা হল না, দয়া হল। যাচ্ছে তো যাক! তার 'যোগ' আসেনি, কপাল খোলেনি, তাই সে এত দিন বাপের বাড়িতেই আছে, ওর বয়সে পুয়ু তো শ্বশুর বাড়ীতে খাটছে।

না আছে বাপ, না আছে মা। কত দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে সে, আরও কত কপালে আছে কে জানে। বাপ মরে যাওয়ার পর কত কাতর হয়ে ভেঙে পড়েছিল সে। মুখখানি শুকিয়ে কতদিন সে বসে থাকত। আজ যদি এই

ফাগুনের দিনে তার মন বাধা-বাঁধন ভাঙতে চায়, ভালই। কেউ কেন তাকে ধরে রাখবে? পুয়ু পুবুলির কথাই ভাবছিল। হঁ্যা, পুবুলির পরিবর্তন ঘটেছে, তার চলনে, চাউনিতে, কথায়।

তার মনে কেউ বাসা বেঁধেছে? কে সে? হাণ্ডর্ণা? মিটিং গাঁয়ের কেউ? আর কে হতে পারে?

এইটুকুই তো ধাংড়ীর রহস্য।

পুয়ু বোঝে এই কথাটুকু খুঁচিয়ে বার করতে গেলে নারী-মনে কষ্ট হয়। তার আনন্দের বারো আনাই তো এই ভেবে যে তার গোপন কথা আর কেউ জানে না।

যাই হোক, পুবুলি এবার যাবে। সে তো নিজের সুখের জন্য যাবে, কিন্তু তারপর?

ভাবতে গেলে মনের ভিতরটা শুকিয়ে যায়। সেও যাবে, তার ভাব-ভঙ্গী বলে দিচ্ছে যে সে যাবে। সকলেই গেলে থাকবে কে?

ছেলে দুধ খাচ্ছে, ভাববার সময় নেই। দুধ খাচ্ছে আর এক চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। পুয়ু ছেলের গায়ে তার শীর্ণ হাতখানি বোলাতে বোলাতে বসে রইল।

আজ তাড়াহুড়ো করবার কোনো প্রয়োজন নেই। যাদের জন্য তাড়া তারা তো আজ হাটে যাচ্ছে। আজ সারা দিনের মতো পুয়ুর ছুটি। ডুম্বাগুড়া হাটে যারা যাবে আজই তাদের ফিরে আসবার কোনো আশা নেই, স্ত্রীলোকেরা যাচ্ছে। কাজ-কর্ম নেই, যত অবসাদ এসে তার ভারে নুইয়ে দিচ্ছে তার গোটা অস্তিত্বটাকে, একটি একটি করে ভাবতে হচ্ছে সব কথা, একদিকে ছেলে আর একদিকে তার সমস্ত লাভ-ক্ষতি।

পুবুলি সেজেগুজে বার হল, নিজের ও ভাইয়ের জন্য পথে খাবার সরঞ্জাম পোঁটলা বেঁধে নিল। একবার দিউড়ুও কিছুক্ষণের জন্য ঘরে এসে তার দরকারী জিনিস-পত্র নিয়ে গেল। পুয়ু ভেবেছিল আর একবার সে নিশ্চয়ই আসবে। তার দিউড়ু কেমন যেন একটু বিগড়ে গেছে। ছেলের মুখের দিকে চাইলে কখনো কখনো তার মনে আশা হয় যে দিউড়ু অনুতাপ করবে। একসঙ্গে ঘর করলে মনোমালিন্য যে বরাবরই থাকে তা নয়। অভ্যাস

অনুযায়ী দিউড়ু নিশ্চয় আজও এসে জিজ্ঞাসা করবে—"আজ কি কি আনতে হবে? তোর জন্য কি আনব?"

আজ হাটের দিন, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে দিউড়ু কেনই বা যাবে? সে হল ঘরের ঘরনী। পুরুষ মানুষ রোজগার করে এনে দেবে, ঘর-সংসার তো সেই চালাবে। নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবার জন্য দিউড়ু আসবে। পুয়ু ভাবছিল যে সে কি বলবে। দু'টো কড়া কথা শুনিয়ে দেবার লোভ হচ্ছিল তার—"আজকাল তোর হয়েছে কি? মাথা বিগড়ে গেছে নাকি? ঘর সংসারের খবর নেওয়া তো দূরের কথা, ঘরে আসতেই চাসনা। ঘর যেন তোকে ধরে খেতে আসছে। কত দিন হয়ে গেল মুখে একটা কথা নেই? খালি গর গর করা, ফোঁস ফোঁস করা? কেন? অপরাধটা কি? দেখ বাপু, অনাদর আর অবহেলার মধ্যে পড়ে থাকবার জন্য আমাদের কন্ধসমাজের স্ত্রী দাসখত লিখে দেয় না। শুঁড়ী কিংবা পাইকের ঘর নয় যে স্বামী যা ইচ্ছে তাই করুক, আরো দশটাকে রাখুক, মুখ বুজে পড়ে থাকতে হবে। আর শুঁড়ীর ঘরে পাইকের ঘরেই বা আজকালকার দিনে কে এত সহ্য করে? আমাদের কন্ধের ঘরে বিয়েটা দাঁড়ায় মনের মিলের উপরেই। মন না মানলে শুধু একটি কথা—'নানু কুইনি' (আমি না করছি, আমার ইচ্ছে নেই)।

"বেশ, বিয়ে ভেঙে যাবে। যদি কোনো কারণে তোর আর ইচ্ছে না থাকে তো সে কথা বললেই হয়, আমরা আলাদা হয়ে যাই। এমনি করে কত মাস কেটে গেল হিসেব কর তো একবার? মেয়েমানুষের মন তো আমার, না আমি পাথর?"

মনে মনে স্বামীর সঙ্গে এমনি বোঝাপড়া করতে করতে তার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। বাইরে দিউড়ুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল—"আরে তাড়াতাড়ি কর।" তার কথার রুক্ষ সুর শুনে পুয়ুর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। নিজেকে কাঠের মতো শক্ত করে সে বসে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল। তুরুঙ্গা ডোম আর লেঞ্জু এল। তিন ভার 'অলসি' ঘর থেকে বাইরে নেওয়া হল। খাবার জিনিসের পোঁটলা মাথায় নিয়ে পুবুলি প্রস্তুত হল। মেয়েদের একটা বড় দলও মাথায় পোঁটলা নিয়ে এসে পেঁছাল। —"কে হাটে যাবি লো? পুবুলি, বেরো বেরো।"

একটু হেসে পুবুলি বিদায় নিল—"যাচ্ছি।"

পুয়ু বলল, "যা।"

॥ তেইশ ॥

পুয়ু কেবল চেয়ে রইল। গ্রামের অর্ধেক মানুষ জিনিসপত্র নিয়ে শোরগোল করতে করতে এক সঙ্গে চলল ডুম্বাগুড়ার হাটে। দিউডু গেল, লেঞ্জু গেল। দিউডু একবার এলও না বলতে যে সে যাচ্ছে।

শূন্য মনে পুয়ু তেমনি বসে রইল, নড়লও না চড়লও না। ভাবল, তার আর দিউডুর মধ্যে এই বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেল। কান্না পাচ্ছিল, চেপে রইল, বাইরে সান্ত্বনা নেই যে সে কাঁদবে। মরুভূমির তপ্ত বালুতে চোখের জল ফেলতে ইচ্ছে হয় না।

নিজের কিছু সে দোষ দেখতে পেল না। সব দোষ দিউডুরই, সে বদলে গেছে। ভাবল, মানুষ এমনই বটে, সব ভালবাসা তাদের দু দিনের। সে কিছু নিজে যেচে এসে এ-বাড়ির হাঁড়ির জল ঢেলে খায় নি। কত না ছোটাছুটি দিউডুর, কত মন ভোলানো, কত আশ্বাস—"এমনি ভালবাসব চিরদিন। ফুলের মতো তুই কেবল হাসবি, তুই পুয়ু (ফুল)। যত শক্ত কাজ, সে আমার, তোর শুধু হাসা। আসবি না! না আসিস যদি তাহলে আমি তোর জন্য কেঁদে কেঁদে মরে যাব। কি হবে এই বিফল জীবন রেখে?"

সে বিশ্বাস করেছিল।

দিউডু তার বিশ্বাস রাখে নি।

দসরু কুকুর এসে পাশে দাঁড়িয়ে কিঁউ কিঁউ করতে করতে লেজ নাড়তে লাগল। সে বলতে চায় যে তার খিদে পেয়েছে। হঠাৎ পুয়ুর মনটা কোমল হয়ে উঠল। মনে পড়ল সাঁওতার কথা। সাঁওতা থাকলে আজ হয়তো তার কাছে নালিশ জানাত পুয়ু। আজ নালিশ জানাবার কেউ নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিকল মন নিয়ে পুয়ু চেয়ে রইল। হাকিনা ঘুমিয়ে পড়েছে। রোদ বেড়েছে, নিঝুম লাগছে। দসরুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "খিদে পেয়েছে বুঝি? দাঁড়া, দিচ্ছি খেতে।"

পড়শী ঘরের জামিরি কন্ধের বুড়ী তাদের আঙিনায় স্নানের জল রেখে গেল, বুড়ো জামিরি কন্ধ এসে বসল স্নান করতে। জামিরি কন্ধের স্নান করতে একটি ঘণ্টা লাগে। রোজ ঠিক এই সময়ে বুড়ো-বুড়ী দুজনে ঐখানটায় বসে। বুড়ী বুড়োকে স্নান করিয়ে দেয়। লাউয়ের খোলে করে জল তুলে বুড়োর গায়ে ঢালল সে, গা রগড়ে রগড়ে ধুইয়ে মুছিয়ে দিল। প্রতিদিনের মতো বুড়ো পরম আরামের ভঙ্গীতে উজ্জ্বল মুখে ছোট ছেলেটির মতো বসে আছে, বুড়ীর আদর-আবদার সইছে।

কন্ধ দেশে স্বামীকে স্নান করানো স্ত্রীর একটা অধিকার এবং অভ্যাস। যে যতই হাসুক কন্ধ দেশের দাম্পত্য জীবনের এই তামাশাটুকু এক প্রাচীন শিষ্টাচার। তৃষিত চোখে পুয়ু বসে বসে এই দৃশ্য দেখল। কত আস্তে কত যত্নে বুড়ী ডলে দেয় বুড়োর গা, কত ধৈর্য ধরে রগড়ে রগড়ে গায়ের ময়লা ছাড়ায়। জামিরি কন্ধের স্নান শেষ হল। বুড়ী ভাল করে তাকে মুছিয়ে দিল। জামিরি কন্ধ অথর্ব নয়, বেশ মজবুত কন্ধ বুড়ো সে।

ছেলেপিলে হয়েছে, তারা বড় হয়েছে, নিজের নিজের ঘর গেরস্তালি পেতেছে আলাদা আলাদা, বুড়ো বুড়ী পরস্পরকে নিয়েই রয়েছে সেকাল থেকে একাল অবধি।

পুয়ু ডাকল, "ও আই, এদিকে আয়।"

"কি, হাটে যাসনি নাকি লো? তা কোলে ছেলে, যেতিসই বা কেমন করে। বসে আছিস যে? খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?"

"আজ আর রাঁধিনি, শরীরটা ভাল লাগছে না।"

"উপোস করে থাকবি নাকি? এ কেমন ধারা কথা?"

"না, সত্যিই ভাল লাগছে না।"

"ছি ছি, এও কি একটা কথা। আয়, আমার সঙ্গে দুটি খেয়ে নে। না খেলে দুধ শুকিয়ে যাবে লো, ছেলেটা খাবে কি?"

"খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, আয়, আয়।" বুড়ী জোর করে টেনে নিয়ে গেল পুয়ুকে, আপন মনেই তার স্বাধীন মতামত দিয়ে বলল—"দেখ দেখি আজ-কালকার ছেলেমেয়েদের রকম সকম। হ্যাঁ, আমি জানি লো, সব জানি। আয়, আয়।"

বুড়ো হয়তো পথ চেয়ে বসে আছে। বুড়ী না এলে সে খাবে না। কেবল স্নেহ আর ভালবাসার বিবাহ বন্ধন যেখানে সয়না সেখানে ভেঙে যায়, যেখানে না ভেঙে টিকে যায় সেখানে সে বন্ধন বজ্রের মতো অটুট থাকে শেষ পর্যন্ত।

॥ চব্বিশ ॥

হাটের পথ, বোঝা কাঁধে তরতরিয়ে চলা, তরতরিয়ে—পড়ুক না পথে ঢিবি ঢালু. খোল খাল। কাঁকুরে পথ, পড়ে আছে রাশি রাশি পাথরের গাদা, পায়ের খানিকটা করে ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে। বালিভরা পথ, মরা নদীর চিতার ছাই—গরম বালি।

মানুষ চলেছে।

পুরুষেরা পরেছে সরু কৌপীন, তেলচিটে ময়লা, বাকী গা খালি। কালো কুচকুচে গায়ে ঘাম ছুটছে, সমস্ত পেশী চকচক করে উঠছে। কাঁধে টাঙ্গি, হাতে লাঠি আর বর্শা। বোঝার ভার বয়ে পুরুষেরা চলেছে।

পাহাড়েব কোন খোলের ভিতর থেকে বেবিয়ে এসেছে সরু সরু রাস্তা গড়িয়ে এসেছে, একসঙ্গে মিলে জাল বুনেছে। পথ দেখা যায় না, কেবল সার সার মানুষ, একজনের পিছনে আর একজন। হাঁটুভর কোমরভর পরি ঘাস আর লতা জঙ্গলে ঢাকা। ভিন্ন ভিন্ন পত্তনে ভিন্ন ভিন্ন সারি, যেন স্বর্গ থেকে পাতালে এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে নীচে—আরো নীচে।

ছোট ছেলেরা চলেছে বাঁকে বাঁকে বাঁধা ঝুড়ির মধ্যে, মাথার উপর লাউয়ের খোল লটকানো, পোঁটলা পুঁটলি ঝুলছে, নীচে ঝুড়ির ভিতর থেকে মিট মিট করে তাকাচ্ছে ছোট ছোট চোখগুলি ; তাদেরও হাট দেখবার শখ আছে, দেখে দেখেই তারা বুঝবে, শিখবে।

অগণিত স্ত্রীলোক। হাট আর বাট তাদেরই রাজ্য। নানা ধরনের পোশাক তাদের। গদবা যুবতী, তার মাথায় লাল পটি, দুটি কানে পিতলের তারের বড় বড় দুই কানবালা কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। গায়ে হাতে-বোনা

কেরংপট এর[১] কাপড়, গায়ে আঁট হয়ে লেগে আছে। কোমরের পিছনে সুতলির গোছা কাপড় ফুলিয়ে রেখেছে। পরজার মেয়ে, ডোমের মেয়ে, কন্ধের মেয়ে, সকলেরই হাত-পা চারখানি খোলা, আর কেবল গদবা মেয়ের গায়ের রং দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল হলুদ বরণ। পরজা মেয়েদের গোল গোল হাত পা, আগা গোড়া উলকীতে ভরা। হাসি হাসি নানা রঙের দুনিয়া—হাটের পথ।

কিছুদূর চলবার পর দিউডু আর লেঞ্জুতে ঝগড়া। দিউডু নিয়েছে একটা হালকা বোঝা, আগে আগে গল্প করতে করতে চলেছে ; তার ভারী বোঝার একটা তুরুঞ্জা আর একটা লেঞ্জু বইছে। লেঞ্জু পিছিয়ে পড়েছিল। তুরুঞ্জার চঞ্চল দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরছে—হাটের পথে কত রকমের মজা, কত ফুর্তি হতে পারত, কত লোককে ঠকানো যেত, চুরি করা যেত, বোঝা কাঁধে সে-সব সম্ভব নয়। বিরক্ত লাগছিল তার, মেয়েরা আগে আগে যাচ্ছে। লেঞ্জুও ভাবছিল, মেয়েরা আগে আগে চলে গেল।

মনের খেদ কোনোমতে বার করে ফেলবার চেষ্টায় তুরুঞ্জা লেঞ্জুকে রাগিয়ে দিল, বলল, "দেখ, সাঁওতা বেশ আগে আগে চলেছে। তোর মতো তো নয়, সে হল সাঁওতা। তাই তোর আর আমার ভারী বোঝা, তার হালকা বোঝা। ভালই, সাঁওতা মর্যাদায় বড, আগে সে যাবে না তো আর যাবে কে? সেই তো আমাদের মাথা।"

তুরুঞ্জা আরো কত কিছু বলত, কিন্তু লেঞ্জু কন্ধ রেগে গিয়ে বলল, "চুপ কর ডোম পটকার (মিথ্যুক), কালকের ছোঁড়া দিউড়ু, সে হবে আমাদের মাথা না মুণ্ডু। ফাঁকি দিয়ে বজ্জাত আমাদের ঘাড়ে ভূতের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে চড়াই পথে, আর এ তার প্রশংসা করতে লেগেছে—"। তুরুঞ্জা এই চাইছিল : যাহোক এবার তবু একটু মজা হবে। বলল, "আমি কি মিথ্যে বললাম যে তুই রাগ করছিস? তুইও বোঝা বইছিস আমিও বোঝা বইছি। তুইও প্রজা আমিও প্রজা। আমরা তো গাঁয়ের সাঁওতা নই, সাঁওতা সে। সে আগে আগে গেলে আমরা পিছন পিছন যাব।"

লেঞ্জু তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাকল, "হেই দিউড়ু, থাম থাম।"

১ কেরং গাছের আঁশ ও সুতি মিশাইয়া বোনা কাপড়।

দিউড়ু থামল। তারপর লাগল দুজনে বাগ্‌বিতণ্ডা, বোঝা অদল বদল করা নিয়ে। দিউড়ু নারাজ, লেঞ্জুও নাছোড়বান্দা। পথের মাঝখানে মহা ঝগড়াঝাটি গোলমাল। দিউড়ু বলে, "বোঝা বইবি না কি রকম? হল কি? অর্ধেক পথ তো তুই বয়ে নে, বাকী অর্ধেক পথ আমি বইব।" লেঞ্জু আরো রেগে ওঠে, শেষে বোঝা মাটিতে নামিয়ে বলল, "আমি পারব না, আমার তোর মতো জোয়ান বয়স নয়। এই রইল এখানে।"

দিউড়ু গজগজ করতে করতে একটু নরম হয়ে এল। বোঝা বদল হল। কিন্তু লেঞ্জু যে পিছনে সেই পিছনে, দিউড়ু আগে আগে।

ঘাটের মাঝখানে এসে লেঞ্জু একা বসে পড়ল। রোদ তেমনি রয়েছে, গা দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। অনেক উপরে উঠে এসেছে তারা। উপর থেকে সারি সারি ছোট পাহাড়ের ধার দিয়ে পত্তন গড়িয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে, বহু দূর অবধি দেখা যাচ্ছে, এক এক জায়গায় পাহাড়ের সারি, বাকী সব এত উঁচু থেকে দেখাচ্ছে থালার মতো সমান, সেখানে মানুষের চোখ দেখে কেবল রোদের মধ্যে ধোঁয়াটে নীল কুয়াশা।

উপরে—তার উপরে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে মানুষের সার চলেছে থাকে থাকে, একের পর এক পাঁচটি থাক। কোথাও বা একটা থাক শেষ হয়েছে, কোথাও বা উপরে নীল বনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। ভীষণ নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে পথ, তার ধার ধার দিয়ে আঁধার ঝোরা, তার তলা দেখা যায় না, শুধু সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ক্লান্তিতে লেঞ্জুর সব উৎসাহ নিবে গেছে। কোন পথভোলা বাতাস এসে কচি পাতাগুলিকে নাড়িয়ে দিয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এ-কোণে ও-কোণে ঘুরে ফিরে দু'চারটি কথা বলে যায়। লেঞ্জু ধুঙ্গিআ ধরাল। মন-গহনের বিরক্তির পটভূমিতে যত রাজ্যের উদাস ভাবনা এসে জড় হল। লেঞ্জু ধুঙ্গিআ টানতে টানতে আধ শোয়া হয়ে বসে ভাবতে লাগল তার কেউ নেই, কেউ তাকে চায় না, এই দিউড়ু—সেদিন পর্যন্ত যাকে সে কোলে পিঠে করেছে, বাপ মারা যাওয়ার পর সেই আজ নিজেকে মস্ত একজন ঠাউরে বসেছে!

লেঞ্জুর মনে হল এ তার কেউ নয়, এ ঘর তার নয়, এসব কাজ তার কেবল বেগার খাটা। সকলেরই সব আছে, তার নেই।

দলে দলে লোক চলেছে। লেঞ্জু বসেই রইল। লোকের এই

ভিড়ের মধ্যে পরের বোঝা বয়ে আবার পথ চলতে তার কোনো আগ্রহ নেই।

কিছুক্ষণ পরে—ঐ যে, ও তো সোনাদেঈ, না? সঙ্গে বুড়ো বারিক ভুর্সামুণ্ডা। বারিকের কাঁধে বোঝার ছোট একটি বাঁক, সোনাদেঈয়ের মাথায় একটা পোঁটলা। হাটে চলেছে।

"পিছিয়ে পড়েছিস, সাঁওতা?"

লেঞ্জু উঠল, হাসল, বলল, "বুড়ো হয়ে গেলাম বারিক।"

"তুই কিসের বুড়ো রে সাঁওতা? সেদিন তোকে পিঠে করে বেড়াতাম আমি, এইটুকু ছিলি তুই—"। সোনাদেঈ হেসে ফেলল বারিকের কথা শুনে। বারিক বলল, "আমরা থাকতে থাকতেই তোরা সব বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস ভেবেছিস বুঝি?

একসঙ্গে পথ চলতে লাগল তারা। বারিক তাকে সাঁওতা বলে ডেকেছে, লেঞ্জু ভারী খুশী। এমনি ছোটো ছোটো কথা জানা মনের কোন মর্মে গিয়ে বাজে, মনের ভিতরে বিদ্যুতের চমক খেলে যায়, জানা মনে একটা রূপ ভেসে ওঠে, অজানা মনের গভীরে পড়ে তার প্রতিবিম্ব।

'সাঁওতা'—কত ভাল লাগে কথাটি। সত্যিই তো, তখন বড ভাই বেঁচে ছিল, মায়ের পেটের ভাই, পাকা চুলে জটা নিয়ে সে ছিল সাঁওতা. ভালো দেখাত, ভালো মানাত। আর এখন এই অর্বাচীন গুয়ের ডিম দিউডু সাঁওতা বলে জাহির হবে আর সে হবে সামান্য প্রজা। বাইরে থেকে অধিকারীরা আসবে, তারা চাইবে সাঁওতাকেই, মতামত দেবে সে, গ্রামের ভালোমন্দের জন্য দায়ী হবে সে, পাথুরে নদীর ভিতর দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাবে পাঁচ শ লোককে নৌকায় বসিয়ে।

সাঁওতা হওয়া তার প্রাপ্য, দিউডুর নয়।

কথাটা তুলল লেঞ্জু, বললে, "বুড়ো তো চলে গেছে। আমাদের গাঁয়ের হাল দেখছিস তো? ছেলে-ছোকরা দিয়ে কি কাজ চলে? কেবল তুই এক সে যুগের লোক এখনো আছিস, তাই না! নইলে লোকেরা কার ভরসায় এই জঙ্গলে পড়ে থাকত।"

"ঠিক বলেছিস সাঁওতা। বুড়ো মানুষ ঠিক এই বুড়ো বট গাছের মতো, কিছু করুক না করুক দেখলে মনে সাহস আসে। বুড়ো কেউ যদি দাঁড়িয়ে

থাকে তবে সব ঠিক। হবে কি, আজকালকার মানুষে কি এসব কথা বোঝে ? গাঁয়ের জন্য এত করলাম। কত গাঁয়ের লোক যেচে এসে আমাকে ডেকেছে, বলেছে—চল, আমাদের গ্রামের বারিক হবি চল্, হাল দেব, বলদ দেব, জমি দেব, তুই যা চাইবি তাই দেব। 'না' করে দিলাম সাঁওতা, 'না' করে দিলাম। বললাম—এই আমার ভুঁই, এইখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। কি আর করব, বুড়ো হয়ে গেছি। আর কিছু করতে পারি না, এদিকে নানান অভাব বেড়েই চলেছে, পেট চলে না। দিউড়ু সাঁওতার কাছে এক টুকরো জমির জন্য ঘোরাঘুরি করছি, দেবে কি না কে জানে, ছেলে-মানুষের মন তো।"

"ছেলেমানুষের মন ঠিক মন নয় বারিক, নিজের কথা ছাড়া ওরা আর কিছু জানে না। পরের দুঃখ বুঝলে তবে না দশজনের মোড়ল হয়ে গ্রাম সামলাবে। এ ছেলে-ছোকরা মানুষ, তার কি বুঝবে ?"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে বারিক বলল, "ঠিক ঠিক।"

লেঞ্জু বলল, "মদখোর মাতাল একটা।"

বারিক মাথা নেড়ে সায় দিল।

বোঝা বইতে কষ্ট হচ্ছিল, রোদ গায়ে বিঁধছিল, পিছনে ফেলে সবাই এগিয়ে গেছে। লেঞ্জু বলল, "নিজের স্ত্রীর দিকে মন নেই।" সোনাদেঈয়ের কৌতূহল বাড়ল, সে ক্রমশঃ কাছে ঘেঁসে এল। লেঞ্জু বলল, "কতদিন হয়ে গেল একসঙ্গে বসা-ওঠা নেই, ভাব-ভালবাসা নেই : ঘরের কথা আর অন্যকে কি বলব। মেয়েটাকে দেখলে কষ্ট হয়। পঞ্চায়েত বসাতে যাব কার কাছে ?"

সোনাদেঈয়ের আগ্রহ খুব বেড়ে গেছে। হাসি হাসি চোখে সে বার বার লেঞ্জুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বারিক ভেবে চিন্তে শুধু বলল, "হুঁ হুঁ।"

কিছুক্ষণ ভেবে বারিক আবার বলল, "তুই কিসের জন্য এমনি পড়ে আছিস্ সাঁওতা ? তুই কেন সাঁওতা হলি না ? আমিন রিবিনির (রেভিনিউ অফিসার) কাছে দশজনে গিয়ে নালিশ করলে স্বচক্ষে সব দেখে শুনে তারা যদি কিছু করে দিত তাহলে কেমন ভাল হত, গাঁয়ের কপাল খুলে যেত। তোর মতো সাঁওতা—আমি বরাবর তোর পায়ের তলায়। কি বলিস তুই ?"

লেঞ্জু শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

সোনাদেঈয়ের সান্নিধ্য তার চেতনার মধ্যে আগুন জ্বালছিল। বানডাকা নদীতে ফুলে ওঠা জোয়ার, ভেসে চলেছে অঙ্গারের রাশি।

"কি বলিস তুই? চিরকাল কি এমনি ভেসে চলবি? বল, খালি তোর মুখ থেকে একটা কথা শুনলেই আমি লেগে যাব তদ্বির করতে, এ কি আর একটা কিছু বড় কাজ। আমিন রিবিনিকে খুশী করে দিলে সব কাজ আপনিই হাসিল। এবার তো তারা আসবে 'শিস্ত' (খাজনা) উসুল করতে, তাঁদের বলা যাবে। না সাঁওতা, তুই আর অরাজি হস না। তোর ভাই ছিল, কি সুন্দর মানাত তাকে এ গাঁয়ে, তার বদলে তুই। তুই সাঁওতা হবি, তোর বয়াটে ছেলেকে (ভাইপো) তুই শাসন করবি। সে মানুষ হল কই? তার বাপ তোকে দিয়ে গেছে তাকে, তুই তো তাকে মানুষ করে তুলবি।"

"ওটার হবে কি, বারিক? তার কি কোনো কিছুর ঠিকানা আছে? নিজের স্ত্রী থেকে তো এমনি—, পথে ঘাটে যাকে দেখবে তার পিছু পিছু ছুটবে। কোথাও একটা ঠিক ঠিকানা নেই। কেবল এক পেট মদ আর চার দিকে চোখ, ছি—"

এবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার পালা সোনাদেঈয়ের, এবার পথ চলার সবটুকু ক্লান্তি তারই।

"দূরের পথ, সকলেই বেরিয়ে পড়লি, ঘরে রইল কে?" শুধাল লেঞ্জু কন্ধ।

"ঘরে আছে বালমুণ্ডা। দেখ একবার রকম, বুড়ো বাপ যাবে হাট করতে আর জোয়ান ছেলে থাকবে ঘরে বসে।"

"কাঁধে বসিয়ে আনলি না?"

সবাই হাসল। বারিক বলল, "না, সত্যিই সাঁওতা, বড্ড আলসে ওটা, আজকালকার ছোকরারা সবাই আলসে।"

বালমুণ্ডার নিন্দা সোনাদেঈয়ের কানে খুব ভালো লাগছিল। সোনাদেঈয়ের সান্নিধ্য লেঞ্জু কন্ধের মনটাকে খুব উসকে তুলছিল। মুখ ফুটে এতক্ষণ কেউ কাউকে কিছু বলেনি, মনে মনে পরস্পর বোঝাপড়া চলছিল। কথায় কথায় লেঞ্জু কন্ধ ভরসা করে বলল, "বুঝলি বারিক, ছেলেরা

এমনি 'নিত্তা' (অলস) 'পিত্তা' (নিকর্মা) হয়ে ঘরে বসে থাকলে বউ আগলাবার জন্য বুড়ো বাপকেই ছুটতে হয় ।"

"মিথ্যে বলিস নি সাঁওতা, ঠিক, ঠিক ।"

॥ পঁচিশ ॥

কিছুদূর গিয়ে—

সোনাদেঈয়েব পিছন পিছন লেঞ্জু কন্ধ, বারিক একটু এগিয়ে।

পথ চলতে ভালো লাগছিল, কি সুন্দর ঠাণ্ডা ছায়া। একটার উপরে একটা পাহাড়ের উপর পাহাড়, সোজা লম্বা লম্বা শাল গাছেব জঙ্গলে ভরতি পাহাড, নীচে কত ফুল পাতার জড়াজড়ি জঙ্গল। এক এক জায়গায় বুনো কলার বন দেখা যায়, ঘন জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুতে তার বাসা। বুড়ো পাহাড়ের ফাটা ঠোঁট দিয়ে ঝির ঝিব করে জল গড়িয়ে পড়ছে, সেখানে ফুলের বন। উপরে আমের বউল, কাঁঠালেব ফুল ; নীচে মরা পাতা আর বউলের গদি বিছানো, চারিদিকে মৌমাছি আর তাদের অবিরাম গুন গুন, কোথাও কোথাও অজানা বুনো নদীর সাঁই সাঁই।

পথ বটে এই। আগে আগে সোনাদেঈ, পিছনে পিছনে লেঞ্জু। কেউ কাবো মুখ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু ঘাসে পাতায় পা ঘষার শব্দ, গা ঝাড়া দেওয়ার নানা ভঙ্গী ; লেঞ্জু কন্ধের হাঁস-ফাঁস. সোনাদেঈয়ের ভঙ্গীতে পথ চলার মন ছলকাবার তরঙ্গ। কি সুন্দর তার কাঁধের উপরটিতে উপরের আর নীচের কাপড়ে গাঁট বাঁধা। খানিকটা লাল. খানিকটা নীল. খানিক সবুজ—ডোমেদের কাপড। খোলা দুটি বাহুর পিছন দিক, খোলা দুখানি পায়ের গুলি ; মাঝে ধীর তরঙ্গ আর উঁচু উঁচু নিত্য চেনা নিত্যি সুন্দর সকালের পাহাড় দেশের মতো !

পথ চলতে চলতে কে কত পিছন থেকে এসে দলে দলে হই হল্লা করতে করতে গান গাইতে গাইতে হেসে খেলে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। সোনাদেঈ গতি বাড়ায় না, লেঞ্জু কন্ধ কাজের কথা ভুলে গিয়ে আপিষ্ট বনে কলের মতো পথ চলে।

সারা দেশটায় হুলুস্থুল বাধিয়ে কন্ধ যুবক-যুবতীদের গান চলে ; কোন অন্ধকার পাহাড়ের খাঁজ থেকে দলে দলে তারা আসে যায় গান গেয়ে গেয়ে। লেঞ্জু কন্ধ ঘেমে ওঠে।

"বারিক বুড়ো গেল কোথায়, সোনাদেঈ ?"

"গিয়েছে হয়তো ঐ পথে কোথাও মদ খেতে।"

বেশী কথা নেই। চেনাচেনি পায়ের শব্দে, ভঙ্গীতে—।

সবই মনে মনে। যেন সব কিছু খোলাখুলি হয়ে গেছে, প্রশ্ন হচ্ছে, উত্তর আসছে,—সবই আপনা আপনি, মনে মনে।

"চিনতে পারিস্ আমায় ?"

"চিনেছি চিনেছি, এই খর নিঃশ্বাস, পায়ের এই বেতাল, এই অসম্ভব মৌন সব আমি চিনি।"

"পালাস্ না কেন তবে—?"

"পালাব কেন ? এ সংসারে আমি ভিখারিনী, যা পাই তাই নিয়ে নিই।"

"নিবি ?"

"জানি না, কি আমি চাই জানতে চাই না, কেবল যা পাই তাই নিই।"

"কি বলছিস ?"

"কিছু না।"

"তাহলে আমি যাই ?"

"দেখতে পাস্ না মূর্খ, আমি আপনা আপনি কেমন পিছিয়ে পড়ছি ? আর বেশী কি বলব ?"

"আরো কাছে যাই ? আপত্তি আছে কিছু ?"

"আমার ভয় করছে, আমারও সমাজ আছে, সব সমাজের মতো সেখানেও সকলের নিয়ন্তা ভয়।"

"তাহলে আমি পিছিয়ে যাই ?"

"না, এই ভালো ; আমাদের মনের উগ্র আগ্রহ আপনি কখনও সুযোগ এনে দেবে। ভয়ের মধ্যেও আশ্রয় নেবার মতো ফাঁক আছে, প্রদীপের নীচে অন্ধকার।"

লেঞ্জু কন্ধ চল্লিশের কোঠায়। সোনাদেঈ তার অর্ধেক, সে বিবাহিতা।

সোনাদেঈ তার ভাবভঙ্গী দেখেছে, তার বয়স দেখেনি। দুজনে দুজনের ভঙ্গী দেখেছে, তা তাদের বয়সের, তাদের অবস্থার সব অসামঞ্জস্য ঢেকে দিয়েছে। লেঞ্জু কন্ধ ভাবছিল অনর্থক তার জীবনের এতগুলো দিন বৃথা কেটেছে, এখন এসে ঘিরেছে ক্ষুধা, তাব ভোগ চাই। সোনাদেঈ ঠিক সেই কথা ভাবছিল। ভাবছিল বালমুণ্ডা তার স্বামী নয়, বালমুণ্ডা তার বন্ধন; সংসারে-যত পুরুষ আছে সকলেই বালমুণ্ডার চেয়ে ভালো।

একটু নির্জন হল পথ, লেঞ্জু কন্ধের নিশ্বাস আটকে আসছিল যেন। পথের ধার থেকে এক থোকা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে একটু ইতস্তত করে সোনাদেঈয়ের হাতে দিয়ে বলল, "নে, এইটে পরে নে। সবাই ফুল পরে হাসতে হাসতে চলেছে, তুই কেন খালি মাথায় চলেছিস?"

সোনাদেঈ চমকে উঠল, একটু হেসে চারিদিকে তাকিয়ে ফুলের গোছা হাতের মুঠোয় করে নিয়ে চলল। কিছু দূরে গিয়ে মচকানো ফুলগুলিকে মাথায় গুঁজল। এইবার সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

"এত তড়বড়িয়ে চলতে শুরু করলি কেন লো?"

"ভারী দেরি হয়ে যাচ্ছে সাঁওতা।"

লেঞ্জু কন্ধ পিছনে পিছনে চলেছে, মেয়েমানুষের মন সে বুঝতে পারে না। তার চৈতন্য হল বৃথাই সে এই ঘাটের ঘোরা পথ দিয়ে এত রাস্তা ভেঙে এসেছে। বন্দিকারের পথ দিয়ে গেলে সোজা হয়, বন্দিকার কত নীচে পড়ে আছে ডান হাতি। শুধাল, "এই পথে তোরা কেন এলি বল্ তো?"

সোনাদেঈ খুব সহজভাবে বলল, "তোমাদের বারিক আগে থেকেই বলেছিল যে এই দিক দিয়ে এলে মদের ভাটি থেকে একটু মদ খেয়ে যাবে।"

লেঞ্জু কন্ধের মনে হল অনর্থক এই ঘোরা পথে চড়াই পথে সে এল, বারিক মদ খাবে বলে কষ্ট পেল সে! রাগ করবে কার উপরে? কেউ তো বলেনি এই পথে আয় বলে। দিউড়ু হয়তো ধাংড়ী আম খেন্দা (ঘাট) বেয়ে মজা করে নেমে যাচ্ছে, আর সে—। আরো খানিক এগিয়ে যাবার পর পাশের একটা রাস্তা থেকে বারিক এসে উপস্থিত হল, মদ খেয়ে ঢুলুঢুলু চোখ। মদো গলায় চেঁচিয়ে সে বলল, "আছিস তো? আমি তাই ভাবছিলাম চলতে চলতে যে ধাংড়ী আম খেন্দার পথে নেমে গেলি না এলি। কেমন করে নিজের ধাংড়ীকে একলা ফেলে অন্য পথে যাবি, অ্যাঁ? এটা কার ধাংড়ী?

আমার ধাংড়ী না তোর ধাংড়ী? আমি তো বুড়ো হলাম, আমার আর কি। তুই ধাংড়া আছিস, এটা তোর। তা না তো কি? ধাংড়া লোকের ধাংড়ী হবে না তো কি বুড়ো মানুষের হবে? এই সোনাদেঈ!—আর 'ঝাটি' (ঝগড়া) লাগাস নে চলে যাব চলে যাব বলে। 'নিক' (ভালো) ধাংড়া। এই—ইদিকে আয়, এটা তোর,—খাসা ধাংড়া—এইটা তোর—" বারিকের মুখে হাত চাপা দিয়ে সোনাদেঈ বলল, "হয়েছে হয়েছে, চল্ চল্।"

পিছন ফিরে দেখল লেঙ্গু কন্ধ হাঁ করে হাসছে। সোনাদেঈয়ের বুক ঢুপ ঢুপ করতে লাগল। বারিকের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "চল্ চল্।" বারিক চেঁচিয়ে উঠল, "আমাকে কেন এমন করে ধরছিস লো, আমি বুড়ো মানুষ, ওকে ধর্। ধর্ ওকে, ওটা তোর।" সোনাদেঈ তার মুখ বন্ধ করে আবার বলল, "চল্ চল্ বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"দেরি? কিসের দেরি? ধাংড়া ধাংড়ী এক সঙ্গে থাকলে দেরি ন। শিগগির কে খোঁজ রাখে? কেমন কথা বলিস গো—"

বারিক হল্লা করতে করতে চলল, তাকে ধরে ধরে চলল সোনাদেঈ। লেঙ্গু কন্ধ পিছিয়ে গেল, ভাবল মদ পাওয়া গেলে সেও একটু খেয়ে নিত।

॥ ছাব্বিশ ॥

পথ, পথ, পথ—পুবুলি চলেছে। মনে ছিল না পুয়ু আসেনি। পুয়ু যে তার ছায়া, তার অর্ধেক, পুয়ু অভিমান করে রয়েছে। এই তাদের প্রথম বিচ্ছেদ! উদাস চোখে তার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে পুয়ু হয়তো বসে আছে বাইরের বারান্দায়, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে। ঘরে কেউ নেই, লিকলিকে একরত্তি ছেলে চুষছে মায়ের হাড় বেরুনো বুক।

মনে ছিল না যে পুয়ু তার থেকে খসে পড়ে গেছে, এবার সে একা। সরু পথ বনের ভিতর দিয়ে দিয়ে, তার সতের বাঁক আঠারো পত্তন, তার উচ্ছ্বাস আঁকা নেই কোথাও, তার কাহিনী চলতি পথের। নতুন মানুষের চমক, পুরানো মানুষের স্মৃতি, বাঁকে বাঁকে পদে পদে নতুন আর পুরাতনের প্রতীক্ষা, পুবুলি চলেছে।

দলে দলে যুবকরা আসে, শরীর যেন কুঁদে কাটা, হাতের কবজিতে বালা কানে মাথায় বন-ফুল। সদর্পে চলে যায় লাঠি আর বর্শা উঁচিয়ে। খালি গা, হাঁটু অবধি ধুলো। কেউ খোঁজ করতে বসে না কি তাদের পরিচয়, কেবল এক চলন্ত ছবি, দেখে মনের ভিতরে সুড়সুড়ি লাগে। ধাংড়ীরা হাসে, এ ওকে চিমটি কাটে, ঠেলাঠেলি করতে করতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বনের মধ্যে। অনর্থক হাসি। এদের দেখে যুবকের দলের অকারণ কক্ষ-চ্যুতি ঘটে, সিধে রাস্তা থেকে একটু সেই দিকে চলে, পা টলে যায়। তার পর ইচ্ছে হয় কোনো ছুতো করে আস্তে চলতে। কেউ পিছনে পিছনে চলেছে, সোজা গেলে সোজা, বাঁকা গেলে বাঁকা। কেউ বা তেমনি আগে আগেই চলেছে, দেখে দেখে পুরানো হয়ে গেছে। যে ধাংড়ী পথে বেরিয়েছে পথের পূজা তার পাওনা।

"পুবুলি, ঐ যে বন্দিকারের গদবা গুড়া, ঐখান থেকে আর একটু উপরে উঠে গেলেই তো—"

"আগের থেকেই কাউকে বলে রেখেছিস নাকি, টিট?"

"আমার কথাতেই কি সে ওখানে থাকবে?"

"ছেলেটি ভারী ভালো, নয় লো?"

"ভারী ভালো, পুল্‌মে'। কবে পছন্দ করলি লো? আজ রাস্তা থেকে 'উড়ুলিআ' পালাবার (পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবার) মতলবে বেরিয়েছিস নাকি লো?"

"আমি পালিয়ে যাই, আর তুই কেঁদে কেঁদে মর্‌, কেমন?"

"তোর ইচ্ছেয় তুই যাবি, আমি কেন কাঁদব?"

"কাঁদবি না? দেখি তোর চোখ!" তার পরেই হাসাহাসির ধুম। সারাটা পথ এমনি চলতে থাকে। এত লোক, সকলে এক সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে একটা চলন্ত দৃশ্য; মানুষ মানুষ নয়, মানুষ জাতি; এক পুরানো ঘষা ছবি।

একদিকে পাশ কাটিয়ে গদবা-গুড়া চলে যাচ্ছে। সেখানে গদবা জাতির লোকের বাস, তারা হিকোকা হাওঁগার প্রজা।

গদবা ও তাদের একটি ছোট অংশ পারেংগা একটি বিশিষ্ট জাতি, ওড়পুর ও পারলার 'সওরা'-দের নিয়ে মুণ্ডা মুণ্ডারি জাতিদের ধরে বঙ্গ ও আসামের

পথে ভারতের মাটিতে প্রাচীন চীনা রক্তের ধারার সূচনা দেয়। গদবার চেহারা সেই রকমই, তার ভাষাও সেই রকম, তার চরিত্র—স্বাধীনতাপ্রিয়, নির্ভীক, অভিমানী অদৃষ্টবাদী, রক্ষণশীল, অতিশয় তুক-তাকপ্রিয়।

কন্ধরা গদবাকে বলে কদ্‌মাং, গদবা নিজের ভাষায় নিজেকে বলে গুতব্‌। কাছাকাছি থেকে একই গাঁয়ে বসবাস করেও কন্ধ গদবার বুলি বোঝে না, গদবাও কন্ধের বুলি বোঝে না, এ ওকে কিছু দেবার চেষ্টা করে না, যে যার নিজের ছোট গোষ্ঠীটির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ব্যস্ত।

এই গদবা-গুডাতে কুয়োর মতো নিচু গর্ত জায়গার মধ্যে বস্তি। মন্দিরের মতো ছুঁচালো-মাথা ঘর, চারিদিকে গোল করে 'পিরি' ঘাস দিয়ে ছাওয়া। বস্তির চারিদিক ঘিরে পাঁচিল উঠেছে, গাছ উঠেছে, খোলা খনির মতো বস্তি, অদ্ভুত। এর পরে অল্প ঢালু খোলা ক্ষেত, সেখানে ভুট্টার ফসল হয়, অড়হর হয়। তার ওদিকে কন্ধ বস্তি, বড়গাঁ বন্দিকার।

গদবা-গুডার ভিতরটাও দেখা যাচ্ছিল। মানুষ বেশী নেই, কেবল শুওর, মুরগী, কুকুর। দুপুর গড়িয়ে গেলে গাঁয়ে কেউ থাকে না, তায় আবার আজ হাটের দিন।

হাণ্ডর্ণার গ্রামের লোকেরা হয়তো হাটে চলে গেছে। রোদ উঠেছে। বন্দিকারের ওপাশে একটা গাছে ভরা ছায়াময় কুঞ্জ, আর কাছেই জল। পথের খাওয়া-দাওয়া ঐখানেই হবে ঠিক হল।

বন্দিকার গ্রামে ঢুকতে দেখা গেল গ্রামের লোকেরা নেই, কেবল বুড়ী আর ছোট ছেলেরা। গাঁয়ের মাথা থেকে তাদের আগ বাড়িয়ে নিয়ে যাবার গানও নেই, উছলে পড়া হাসিও নেই। ঘরে ঘরে ঝাঁপে ঝাঁপে দড়ি বাঁধা, দরজায় দরজায় কুকুর শুয়ে আছে পাহারায়।

"এই ঘরেই তোকে মানাবে ভালো, পুবুলি। দেখ্‌ তো দরজায় কেমন সুন্দর চিত্র করা, কি মোলায়েম বারান্দা—"

"তোর পা বেথিয়ে গেছে, তুই এইখানেই থেকে যা, টিট। আমার পা তো এখনো ব্যথা করে নি।" হাসাহাসি করতে করতে তারা এগিয়ে গেল।

মুখে হেসে উড়িয়ে দিলেও পুবুলির মনটা কেমন করে উঠল। এরা মিছামিছি ঠাট্টা-তামাশা করে, কোন ছেলেবেলাকার চোখ না ফোটা দিনের

কথা সে। বুড়োবুড়ীরা ভেবেছিল যে বন্দিকার আর মিনিআপাযু এক সুতোয় বাঁধবে, পুবুলির সঙ্গে হাগু'ণার বিয়ে হবে। বুড়োবুড়ীরাও ছেলে-খেলা করে, মিছিমিছি বিয়ে ঠিক করে খুশী হয়, কারণ তাদের নিজেদের আর বিয়ে হবে না। পুতুলের বিয়ের স্বপ্ন দেখে তাদের শুকনো হাড় বার করা শরীরের ভিতরে কল্পনার ঝরনা লাফিয়ে ওঠে, হারিয়ে যাওয়া অতীতের পথের পাশের কাঠের খুঁটি চিনে চিনে মিলিয়ে মিলিয়ে আবার নতুন করে মনে পড়ে সব কথা। বুড়োবুড়াদের কৌতুক সে, কন্ধ যুবতী তা মাথায় তুলে নিতে বাধ্য নয়।

হাগু'ণার কথা—সে কোথায় কত নীচে ঢাকা পড়ে গেছে, হাজার তালি দেওয়া কাপড়ের মতো।

তবু পুবুলির মনে নাড়া লাগল। হাত দিয়ে গ্রহণ না করুক তবু চোখ দিয়ে দেখতে সে চায়। তাছাড়া তাকে গ্রহণ করবেই না এমন প্রতিজ্ঞাও তো সে করেনি, কোনো দিব্যিও কাটেনি। হাটের অর্ধেক আনন্দই তো এই—

না কিনলেও—দর দস্তুর করার আনন্দ।

হাগু'ণা নেই গ্রামের যুবকরাও নেই। এদিকে রোদ বেড়ে চলেছে। ডুম্বাগুড়া কোথায়, কত দূর? কচি পাতা থেকে পিছলে পড়ে, পাথুরে মাটি থেকে ঠিকরে উঠে বাড়ন্ত রোদ্দুর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

ক্লান্তি। কুঞ্জের ছায়াতলে পা মেলে বসে পড়ে পুবুলি বলল, "এই বেশ ভালো জায়গা। এইবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক।"

॥ সাতাশ ॥

রোদ মাথায় করে তরতরিয়ে হনহনিয়ে আসছে মানুষ কত দূর থেকে। কোথায় পৃথিবীর কোন পাহাড়ের ফাটলে, কুঁচকে ওঠা ভূস্তরের আড়ালে লুকিয়ে আছে তাদের বসতি। দুপেয়ে খাড়া দাঁড়ানো জন্তু, দেহের ভর পৃথিবীর উপরে, মাথা আকাশে। এক একটি হিসাবে এরা কিছুই নয়, একটা ছোট পাথর তোলবার মতো জোর তার কোমরে নেই। আয়তনে

'পিরি' ঘাসের ঝোপের চেয়েও ছোট। আছে গোটা কয়েক হাড়, তাতে খানিক খানিক মাংস, কত সামান্য। তাদের সব জোর এক জোট হলে পর তখন তারা চোখে পড়বার মতো হয়, দল বেঁধে নাচে, হল্লা করে, কিংবা ঝগড়া করে।

জঙ্গলের মধ্যে এদের গ্রাম যে কোথায় ঠাহর করা যায় না। পাহাড়ের খাঁজে খোঁজে দু'চার জন জড় হয়ে যায়, চারিদিক ফাঁকা, জঙ্গল, আর পাথর—।

একত্র হলে তখন শুরু হয় তাদের যত রকম কারসাজি, তাদের সভা মজলিস, যুদ্ধ আর 'পোড়ু' চাষ, অর্থাৎ জঙ্গল পুড়িয়ে চাষ—যাতে পোড়া জঙ্গলই সারের কাজ করে। কিলবিল করে মানুষ ডেয়ে পিঁপড়ের মতো। শহর বসে, পাহাড় কাটে, নদী বাঁধা পড়ে—সব দলবাঁধা মানুষের হাতের কেরামতি। ঘটনা ঘটায় দল অথবা গণ, তার নাম যাই হোক—আর নামও তার একটা নয়। এই ডেয়ে পিঁপড়েদের গতি ও বিরতিতেই তৈরি হয় ইতিহাসের এক একটি যুগ। জল বয়ে গেল, ভেসে গেল পিঁপড়েরা দলে দলে। আগুন লাগল, মরল কতকগুলি ছটফট করে। জায়গা খালি হল, লেগে গেল আবার এক দল, জঙ্গল কাটা হল, তারপর দেখতে দেখতে উঠল ধবধবে ইমারত, পাথরের উপর পাথর বসিয়ে মন্দির উঠে গেল আকাশের দিকে। নিজেদের হাতে তৈরী গন্ধমাদনের তলায় আর তার আসে পাশে পড়ে থাকে এদেরই হাড়ের টুকরো টাকরা—কেউ খোঁজও রাখে না। এদের মধ্যে হাতে হাতিয়ার নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে এক জন, সে কিছু তৈরি করেনি, শুধু খেয়েছে; সে কিছু দেয় নি, কেবল নিয়েছে; সে অন্যদের জন্য ন্যায় বিচারের শিকল গড়ে তাতে ওদের বেঁধেছে, নিজে বাঁধা পড়েনি। তারই নামে সকলের গ্রাম, লাল চোখ দেখিয়ে সবাইকে লুটেপুটে বুক ফুলিয়ে গদির উপরে বসে চীৎকার করে—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আমি বীর, আমায় পূজা করো।"

একজন মাত্র সে, তেমনি এক সামান্য, সোজা পা-ওয়ালা আধখানি জন্তু। ভাল ভাল মানুষের নিঃশ্বাসেই সে উড়ে যেতে পারে, তাদের গরমের দিনের ঘামে আর ঠাণ্ডার দিনের প্রস্রাবে তার জলসমাধি হতে পারে, এই সব ফাঁকে ফাঁকে লোকের পায়ের তলায় সে থেঁতো হয়ে গুঁড়ো হয়ে মাটিতে

মিশে যেতে পারে চক্ষের নিমেষে—কিন্তু তার কিছুই হয় না, সে ঘোড়ায় চড়ে আর সবাইকে চরায়।

তার কিছু হয় না, কারণ এখনও আদিম রাত্রির অন্ধকার পৃথিবী থেকে কাটেনি, যে অন্ধকার ডিসারি বলে সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছিল। রাত যেখানে এখনও কাটেনি সে রাত্রির পিশাচ হয়ে আসে, মড়াগুলোকে দাঁড় করায়, ঘুমন্ত মানুষদের চালায়, নাচায়। তার অস্তিত্ব আর আবির্ভাবে সেই আদিম রাত্রির আদিম অসভ্যতার অস্তিত্বের পরিচয়।

এই ডুম্বাগুডা হাট। কোরাপুট জেলার উত্তর আর কলাহাণ্ডি রাজ্যের* দক্ষিণ সীমান্তে। এপাশ ওপাশের প্রাকৃতিক সীমানার মতো এখানে দুই দিকে পাহাড় দাঁড়িয়ে। মাঝখানে উপত্যকা। এদিকে পাহাড়ের সারি চলে গেছে পূব পশ্চিমে পনর ক্রোশ পর্যন্ত, কসাকেন্দু আর ভিতর-বাগ্রি থেকে শুরু করে গিরলিগুম্মা কাট্রগডা পর্যন্ত। অন্য দিকে কলাহাণ্ডির বাঁশবনে ভরা ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ।

ডুম্বাগুড়ার হাট কোরাপুট জেলার একটি বড় হাট। এখান থেকে লাল পাকা সড়ক কম পক্ষে পনর ক্রোশ দূরে। বাঁকে বোঝা নিয়ে লোক চলেছে। গরু আর মহিষের কাঁচা চামড়া বোঝা বোঝা, ছাগলের মতো ছোট ছোট রোগা রোগা কলাহাণ্ডির বলদ; বোঝা বোঝা দেশী লোহার ফাওরা কোদাল, কুড়ুল আর লাঙ্গলের ফাল; গোড্রি গ্রামের প্রসিদ্ধ কামারদের তৈরী 'ওডিআ নলি' (বন্দুক), বর্শা, ছুরি; রঙ্গিন মাটির হাঁড়ি-কুড়ি, নানা চিত্র আঁকা কলসী, ফুল ঝাঁটা, আরো কত কি।

সব চেয়ে বেশী—ফসল।

ছোট ছোট হাড়-চামড়াসার ঘোড়ায় চড়ে আসে অতিকায় সাহুকার, গুঁফো, কুণ্ডল পরা, ভুঁড়িওয়ালা। জবরদস্ত সাহুকার। এদের মধ্যে কতক শুঁড়ী, কতক তেলেঙ্গা। মোপন্না, পাপন্না, গম্পা গধবনা, অপ্তাভরপু ভালিসেঠি, ভোগিলা, অপ্পল সোঁয়াইয়া, পেণ্টাইয়া, একাইয়া, সীতাইয়া, চলপত রাও, জগন্নাথ রাও, রামা রাও, গুম্পুস্বামী, নারায়ণ মূর্তি।

এরা সাহুকার। এদের জাতিতে এদের নিজেদের দেশেও কিষাণ মজুরই

* কলাহাণ্ডি—ব্রিটিশ আমলে গড়জাত বলিয়া অভিহিত উড়িষ্যার স্বাধীন রাজ্যগুলির অন্যতম, অধুনা উড়িষ্যার অন্যতম জেলা।

বেশী, বেশীর ভাগ গরিব। কিন্তু এরা সাহুকার। গরুর গাড়ি এনেছে, পথের উপরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। সঙ্গে আছে টাকার থলে, মাপবার "মাপ", ছোট বড় কুনকে। কেনবার বেলা বড় কুনকে, আর বেচবার বেলা ছোট কুনকে। বট গাছের তলায় পর্বত প্রমাণ কুচকুচে কালো 'অলসি'র গাদি, পড়ে রয়েছে মাড়ুয়া, ধান, হলুদ, বুনো অড়হর, তিল, রেড়ি, কন্দভাইদের সর্বস্ব। নির্বোধ আদিবাসীরা সিদ্ধ রাঙ্গা-আলুর হাটেই ব্যস্ত। রঙিন কাচের মালার দোকানে লোকের ভিড লেগেছে। শস্তায় মাল কিনে নিয়ে যাবে বলে রোগা রোগা ঘোড়ায় চড়ে পথের শ্রম স্বীকার ক'রে সাহুকারেরা এসেছে। এক চোটেই সব নিয়ে তুলবে দুর্লভ শুঁড়ীর ঘরে, চম্পিআ শুঁড়ীর ঘরে, সেখান থেকে সব চলে যাবে শীঙ্গি সেঠির গুদামে নয় তো চিটি বাবুর গুদামে, সেখান থেকে আলোয়।

ফসল যাবে, আসবে কিছু টাকা। আদিবাসীরা বাঁশের চোঙে এই টাকা ভরে পুঁতে রেখে দেবে। সাহুকারের সুদ গুনতে আর খাজনা দিতে দেখতে দেখতে সে টাকা কোথায় উডে যাবে। তার পর সব শূন্য। আবার নখে আঁচড়ে শাবলে খুঁড়ে পাথুরে পাহাড়ের খাঁজে আরো চাষ, আর রাতে মদ খাওয়া, নাচ, ডুঙ্গডুঙ্গা বাজানো, বাঁশিতে সুর তোলা। হাটে ঢোকার পথে হাটের ঠিকেদারেরা 'পান্নু' (হাটের কর) আদায় করছে। মাথার পসরা নিয়ে টানাটানি, হাত ধরে টানা হেঁচড়া। কেউ এক ডালা বাঁশের কোঁড় এনেছে, ফেল দুই পয়সা। 'ফারেস্টি' (ফরেস্ট্) গার্ডরা বনজাত দ্রব্যের কর আদায় করছে। বুক ফুলিয়ে লাল পাগড়িধারী দু'একজন ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতে ছোট ছড়ি নিয়ে। কাল হয়তো ছিল আদিবাসী, আজ মাথায় লাল পাগড়ি উঠেছে। এদের দেখে লোকেরা পথ ছেড়ে দিচ্ছে, ভিড় আপনি নড়ে উঠে সরে যাচ্ছে তাদের সামনে পিছনে। এক জায়গায় সাহুকারের দল বসে আছে, সামনে একটা করে কাঠের বাক্স। ফসল মাপা হচ্ছে। মাথায় বড় বড় পাগড়ি আর ঠোঁটে দুর্গন্ধ চুরুট, কানে কুণ্ডল ঝুলছে, হাতে সোনার বালা—জবরদস্ত দুঁদে সাহুকার সব।

পিছন থেকে চামড়ার হাটের পচা চামসা গন্ধ। গো-হাটায় গরুর গন্ধ। হই-চই গোলমাল—"বাছুরটি ভালো। দেখতে এমন হলে হবে কি, এই দেখ এর দাঁত, দশ টাকার কমে বিকোবার নয়।" এখানে ওখানে শুকনো

পোকার মতো কালো কালো শুঁটকী মাছ, মাছি ভন্ ভন্ করছে, অসংখ্য পসরা। দুর্গন্ধময় ঘোল, তার মধ্যে লাউয়ের খোল ডোবানো। লাল নুনের ছোট ছোট ঢিপি, তামাক পাতা, লঙ্কা, হলুদ। বনের কন্দ, তিলের খোলের মোয়া, মুড়িব মোয়া, খইয়ের মোয়া অনেক। লোকেরা চলেছে, ধাক্কাধাক্কি ঘেঁষাঘেঁষি সারি সারি দোকানের ফাঁকে ফাঁকে। বাগ্রি গাঁ, চেমা গাঁ, কেলার গাঁয়ের কুষ্ঠরোগী গোয়ালা আর দূরের গ্রাম বগ্নিগিমুঠার কুষ্ঠরোগী কন্ধ। কস্‌পাওআলসা কুমুড়াগুড়া অঞ্চলের 'মজ্‌'-রোগগ্রস্ত কন্ধ—তাদের গালে পিঠে যেখানে সেখানে গোল গোল চাকা চাকা ঘা, তাই ঘিরে উড়ছে ছোট ছোট কালো কালো পোকা। এদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করে চলেছে সুস্থ লোকে, চিকন ছিমছাম ফুলপরা সাজগোজ করা ধাংড়া-ধাংড়ী। মাছি আর ধুলো, গুড়ের হাঁড়ি পিঠে। যে যেখানে বসে আছে সেইখানেই মুখ চলচে। মোয়া হোক, কিংবা কন্দ সিদ্ধ, নয়তো কোনো ফল। অধিকাংশ দোকানই ছোট ছোট, তবু হই-চইয়ের শব্দে কানে তালা ধরে।

অসংখ্য লোক। অসংখ্য পাহাড়ী বুলি। কেউ ক্লান্ত হয়ে আমগাছের তলায় বসেছে, আবার হাটের ভিড়ের মধ্যে ঢোকবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অন্যদিকে কেউ বা রীতিমত আড্ডা জমিয়েছে। পথে পথে বনদেশীয় কুকুর। ছোট রোঁয়া লম্বা লেজ 'বিড়ারি' কুকুর, বড় বড় চোখ। ভালুকের মতো ঝাঁকড়া লোম, ঝাঁটার মতো লেজ—কন্ধ ঘরের কুকুর। এরাও কত দূর দূর থেকে মানুষের পিছনে পিছনে চলে এসেছে হাটে। ভাল কুকুর, ঘেয়ো কুকুর, মর্কুটে কুকুর। গরু মোষ মানুষ। গোবর, গাছের বাকল, ফলের খোসা, ধুলো। হই-চই, চীৎকার, হরেক রকম দৃশ্য আর শব্দ।

এই হাট, মানুষের পটভূমি। একে বাদ দিলে লেঞ্জু, দিউড়ু, পুবুলি, পুলুমে কাউকেই বোঝা অসম্ভব। এই বিশৃঙ্খল হাসিখুশী দায়িত্বহীন সংসার-যাত্রাই এখানকার মানুষের সমাজের বনেদ। সে যেদিকে খুশি সেদিকে বেরিয়ে পড়তে চায়। যেখানে ইচ্ছা সেখানে পিক ফেলতে চায়। লুকো-চুরি নেই, ভয়-ভাবনা নেই। ঐ ওখানে গাছের তলায় স্ত্রীলোকেরা দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তাদের বোঝা, বসে প্রস্রাব করা তাদের অভ্যাস নেই। আর এক জায়গায় ভাব-ভালবাসা হতে হতে ধাংড়া-ধাংড়ী একটু জড়াজড়ি

করছে। হাটের মধ্যে পরপুরুষের গায়ে গা দিয়ে বসে আছে অগণিত স্ত্রীলোক। দেহের দিকে খেয়াল নেই, মনের আনন্দে চুক চুক করে মায়ের দুধ খাচ্ছে বাচ্ছারা। বিকার নেই, বন্ধন নেই, ছন্দহীন চিত্রবহুলতাই এ দেশের ছন্দ।

বেলা পড়তে না পড়তেই চেঁচামেচি করতে করতে লোকেরা হাটের থেকে বেরিয়ে পড়ল সারে সারে। আজকের মতো এই পর্যন্ত। দেখা শোনা সারা হয়েছে। কেউ বা পনর ক্রোশ দূর থেকে এসেছিল কেবল এক পয়সার তামাক পাতা কেনার জন্য, তা কেনা হয়ে গেছে। কেউ বা এসেছিল দশ ক্রোশ দূর থেকে শুধু কেবল তার ঘরের পিছনে গুটি চারেক বেগুন হয়েছিল তাই বেচবার জন্য, তা বেচেছে। কেউ বা একটি ছাগল কাঁধে করে মহানন্দে নাচতে নাচতে ফিরে যাচ্ছে। আবার মানুষের মিছিল চলল, কারো কাঁধের বাঁক থেকে একদিকে ঝুলছে ছোট বাচ্ছা, আর এক দিকে একখানা পাথর বোঝা সমান রাখার জন্য। হই-চই, গোলমাল। হাট ভাঙল, পাহাড়ী হাট, দেখতে দেখতে আসে-পাশে লোকের চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

সন্ধ্যা হল। হাট ফেরতা দূর পথের পথিকেরা এক জায়গায় জড় হয়ে বসে পড়ল। পোঢ়গাড় নদীর (আক্ষরিক অর্থ—মোষেদের গড়াগড়ি দেবার নদী) ধার। পাহাড়ের মাঝে খানিক খানিক মাঠের সমান জায়গা, সেখানে পাতলা ঝোপের বন। তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলল দাউ দাউ করে, চার শ লোকের একত্র বাস আজ সেখানে। সেইখানে ঝগড়া-ঝাঁটি, গল্প-গুজবের আড্ডা, নাচ আর গান।

রাত বাড়ল। আগুন নিবল। সবাই ঘুমুল। উপরে খোলা আকাশ, নীচে গাছের তলায় শ চারেক লোকের নিশ্বাসের সোঁ সোঁ শব্দ। সামনে পাথুরে পোঢ়গাড় নদীর ছল ছল, সাঁই সাঁই।

সবাই ঘুমুচ্ছে, পুবুলি, সোনাদেঈ, লেঞ্জু, দিউড়ু—। ঘোর রাত্রি। থেকে থেকে বুনো পাখীর কিচির-মিচির। চার শ মানুষ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এক এক জনকে তুলে দেখলে এক একটি জীবনব্যাপী উপন্যাস।

॥ আটাশ ॥

হিকোকা হাণ্ড্ণা কন্ধ বন্দিকার গ্রামের সাঁওতা। হিকোকা তার গোত্র, হাণ্ড্ণা তার নাম, কন্ধ তার জাতি। তার বাপ ছিল লেন্নু, অর্থাৎ বড় চিল। ছেলের নামকরণের সময় হাণ্ড্ণা নামে চাল দাঁড়িয়েছিল, তাই ছেলে হল হাণ্ড্ণা, অর্থাৎ শকুন, জটায়ু পক্ষী। সেও সুন্দর। গাঁয়ের ঐ পারে বিরাট যে পাহাড় উঁচু হয়ে চলেছে, আকাশের ভিতরে তার নাক, উপরের শাল গাছগুলিকে দেখায় যেন ঘাসের ঝোপ, তারও কত উপরে সুন্দর নীল আকাশে উড়ে বেড়ায় এই শকুন, সে একটা বিস্ময়। যা কিছু বিস্ময় আনে কন্ধ মনে তাই সুন্দর। তাই হাণ্ড্ণা নামটিও সুন্দর।

উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পড়বে। এখনই সে সংসারের ভার বইবার যোগ্য হয়েছে। পাঁচ বছর বয়স পুরতেই ছোট্ট দু আঙুল কৌপীন পরে মা বাবা আর গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সেও পাহাড়ে পাহাড়ে ছোট্ট খুরপি নিয়ে মাটি খুঁড়ত। সাত বছর হতে সে ছাগল চরাতে শুরু করল। ন বছর বয়সে হালের মুঠিও ধরতে লাগল। গাছ কাটা, গাছে ওঠা, দৌড়ানো সব কিছুতে সে ছেলেবেলা থেকেই দড় হয়েছে। ছ বছর থেকেই সে ধুঙ্গিআ টানতে শিখেছিল, ন বছরে মদ। চোদ্দ বছর বয়সে যখন দেহ ভিতর থেকে সিরসিরিয়ে ভরে উঠছিল তখন থেকে সে মেয়েমানুষ চিনেছে। উনিশের শেষে সে সম্পূর্ণ।

মা নেই, বাপ নেই, আত্মীয়-স্বজনও নেই। নিজের ঘরের মালিক সে নিজেই। খেত-খামার যথেষ্ট আছে, গাই-গরু অনেক। সে সব দেখা-শোনা করবার লোক, কাজ কর্ম করবার লোক সে নিজে আর তার 'গোতি' চাষী মজুররা। কাঁচা বয়সে মুরুব্বীর অভাবে তার মাথা বিগড়ে যায় নি, মাথা বিগড়ানোর মতো কোনো প্রলোভন উপস্থিত হয়নি। যা চেয়েছে তা পেয়েছে, অশান্তিতে দগ্ধে মরবার জন্য ডাক দিতে কোনো আলেয়ার আলো কখনো জ্বলেনি তার উঁচু পাহাড় ঘেরা দিগ্বলয়ের উপর।

হিকোকা হাণ্ড্ণা অবিবাহিত। তার সংস্কারগত ধারণায় ফুর্তি করা

এক কথা আর বিয়ে করে ঘর গেরস্থালি করা অন্য কথা। বিবাহ বিষয়ে তার মতামত আছে। আর, সব মতামতের পিছনে উঁকি মারে একটি ছোট্ট মোহ। আঠারো থেকে উনিশ, উনিশ থেকে বিশ চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে।

সে মিনিআপায়ুর সাঁওতার মেয়ে পুবুলি।

হিকোকা হাণ্ড্শার নজর মান সম্ভ্রমের দিকে। সাঁওতার ছেলে, নিজেও সাঁওতা। সাঁওতার মেয়েই সে চায়। আসে পাশের গাঁয়ে সাঁওতার ঘরের মেয়ে কোথাও নেই, আছে এক পুবুলি।

সেহু কন্ধ নিজের ছেলের জন্য পুবুলিকে পছন্দ করেছিল, তাও হাণ্ড্শার মনে আছে। এসব 'কারণের' কথা বিষয় বুদ্ধির কথা। আর হাণ্ড্শার বিষয়-বুদ্ধি খুব, কিন্তু কেবল কয়েকটি মোটা কথা আর 'কারণ' যে তাকে এ অবধি ঠেকিয়ে রেখেছে তা নয়। পুবুলিকে সে দেখেছে। ছেলেবেলা থেকে যাওয়া আসা।

তার বেশী আর কিছু নয়। বৃদ্ধ সরবু সাঁওতার ধূমল চোখের দৃষ্টির সামনে তার মাথা নুয়ে পড়ে, সব আটকে যায়, কেবল নিজেকে ধরে রাখবার ধৈর্য ধরে থাকবার পীড়া আর প্রতীক্ষার পুঁটুলি বেঁধে হাণ্ড্শা ফিরে আসে আর ভাবে।

সরবু সাঁওতা মারা গেল। খবর এল। হাণ্ড্শা ভাবল এইবার সে যাবে, তার যাওয়া দরকার। যাব যাব করতে করতে সংসারের হাজার কাজ পায়ে ছাঁদন দড়ি হয়ে জড়িয়ে যায়, যাওয়া হয়ে ওঠে না। বেল পাকার দিন গেল দিন রাতের খবরদারি করতে করতে।

তার পরে ফসল কাটা, হাটের কাজ, সাহুকারদের সঙ্গে দর কষাকষি, মাল বিক্রি।

উনিশ বছরে অনেক দায়িত্ব।

লোকে বলে, "বিয়ে কর না কেন?" চতুর্দিক থেকে কেবল ঐ এক কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়। সেও নিজেকে জিজ্ঞাসা করে সে বিয়ে করে না কেন। কেন জানি আবার পিছিয়ে যায়, কি যেন সংশয়। একটু আলাদা সে, কেবল বউ আনা ছাড়া আরো অনেক স্বপ্ন তার, মনে মনে গড়ে নেয়।

মামার বাড়ী নারণপাটণার কাছে। এখান থেকে অনেক দূর, ঘাট,

পাহাড়, চড়াই, উৎরাই, তিন দিনের পথ। বছরে সে দুবার যায়, মামার বাড়ির লোক দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে।

মামার বাড়ির পথে বনের ধারের সভ্যতা তার মনকে টানে। সে ভাবে সেও ঐরকম হবে। তেলেঙ্গা সাহুকারদের কোঠা বাড়ি, খড়ের চাল, সামনের দিকে দরমার বেড়া, গরুর গাড়ি, গুদাম, কারবার।

মনের এই ভাব নিয়ে বারে বারে হাগুর্ণা ফিরে আসে, নিবিষ্ট চিত্তে নিজের চিরাচরিত সংস্কারগুলিকে যাচাই করে, ভাবে কেথায় কি পরিবর্তন করা যেতে পারে। তার মামার বাড়ির লোকেরা বাড়িতে কৌপীন পরে, বাইরে বেরুলে ছোট পরিস্কার ধবধবে কাপড় একখানা জড়িয়ে নেয়, গায়ে কোট কামিজ, কানে কুণ্ডল, হাতে বালা পরে। হাগুর্ণার ছোকরা মনের স্বপ্নের ভিতরে তাও এসে ঢোকে।

বাপ তার পুরাতন পদ্ধতির দুই সারির বস্তি থেকে একটু তফাতে আলাদা একটি গুদাম ঘর তৈরি করে মারা গেছে। নারণপাটণা অঞ্চলের সাহুকারদের ধান রাখবার মরাইয়ের মতো সেটাও একটা মরাই। দেড় মানুষ উঁচু ক'রে তৈরী ধান রাখবার জালার মতো গোল ঘর একটা মাচানের উপরে বসানো। বাঁশের কঞ্চি আর মাটি দিয়ে তৈরী পুরু দেয়াল, উপরটা বন্ধ। নীচে আর উপরে ধান রাখবার ও ভরবার জন্য কবাট লাগানো জানালা।

হিকোকা হাগুর্ণার কল্পনার মধ্যে আধুনিকতার এই প্রথম বাস্তব রূপ। অনেক কথা উঠেছিল, গ্রামের জানি ডিসারি সকলেই আপত্তি করেছিল—যা এ-পর্যন্ত চলেনি তা চালাবে কেমন করে লেল্লু সাঁওতা। লেল্লু সাঁওতা আপত্তি শোনেনি। তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা দাঁড়িয়ে থেকে তাকে সাহস দিল, মরাই গড়ায় সাহায্য করল, মরাই তৈরী হল।

হিকোকা হাগুর্ণার চোখ খুলে গিয়েছিল। লেল্লু কন্ধের আর একটা সাধ ছিল, সে ভেবেছিল একটা গরুর গাড়ি করবে। এ-অঞ্চলের অরণ্যবাসী কন্ধদের মধ্যে গরুর গাড়ি কারও নেই, যদিও গরুর গাড়ির সঙ্গে পরিচয় আছে সকলেরই। ঝুড়িতে পুরে বাঁকেতে করে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দূরের হাটে মাল নিয়ে যাওয়া বড় হয়রানি, গরুর গাড়ি হলে ভালো হত। কিন্তু পাহাড়ী রাস্তায় গরুর গাড়ি যাবে না। বর্ষার সময় জঙ্গল আর খেত, কেবল গ্রীষ্মকালের এই চার মাস গাড়ি চলতে পারে। কিন্তু গরুর পায়ে

পায়ে যে চলা পথ হয়ে গেছে সেই পথে গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। উত্তর দিকে উঁচু পাহাড়ের পথে নিয়ে যেতে না পারলেও দক্ষিণে লক্ষীপুরের দিকে হয় তো যেতে পারবে। তার পর গরু হাঁটা পথ ধরে ধরে আনা গাঁয়ের নানা গাড়ির সঙ্গ ধরে কখনো থেমে কখনো চলে ক্রমে নারণপাটণার নয়তো রায়গড়ের সমতল ভূমিতে যাওয়া যেতে পারবে।

হাণ্ডর্ণার ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় এই বিষয়টিও ছিল। গরুর গাড়ি তৈরী হবে, তাতে মাল বোঝাই করে সে রায়গড়ে যাবে, সেখান থেকে গাড়িতে তামাকপাতা বোঝাই করে বিক্রি করে দেখবে আসে-পাশের হাটগুলিতে আর ডুম্বাগুড়ার হাটে।

মনে মনে এমনি তার কত অভিযান। কাজে লেগে থেকে আর কাজের নানা কথা ভাবতে ভাবতেই তাঁর দিন কেটে যায়। বিয়ের চিন্তা তার মনকে তেমন আচ্ছন্ন করে না। বিয়ে করা তো হাতেই রয়েছে। যা তার হাতের বাইরে তার জন্যই তার মনে আগ্রহ বেশী। সে অনেক উপরে উড়তে চায়, সে হাণ্ডর্ণা (শকুন)।

পঁচিশ জনের কাঁধের বাঁকে নিজের মাল চাপিয়ে সে হাটে গিয়েছিল অনেক আগেই। মাঝ হাটে বেলাবেলি ভর দরে সে সব বিক্রি করে ফেলেছিল, খুব লাভ পেয়েছিল। আগে আগেই ফিরেও এসেছিল। চৈতের পরব আসছে, আগে থেকে সব সংগ্রহ, সঞ্চয়, তারপর এক মাস ধরে চলবে চৈত্রের মহোৎসব, সারা বছরের মতো মন ভরে ফুর্তি, তারপর আবার শুরু হবে হাড়ভাঙা খাটুনি, রোদ মাথায় করে মাটি কাঁকর আর পাথরের সঙ্গে লড়াই।

হাট থেকে ফিরে এসে সেই সন্ধ্যাবেলাতেই একবার ঘুরে ফিরে নিজের সম্পত্তি সব দেখে-শুনে এল। সে ক্লান্তি জানে না। সব গাই-গরু গোয়ালে আছে কি না। ধানের গোলাগুলোর পাহারায় লোক আছে কি না। রোজ সন্ধ্যায় একবার ঘুরে সব দেখে-শুনে আসা তার কাজ। তারপর সে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। সারা দিনের লাভ লোকসানের কথা হয় গাঁয়ের লোকের সঙ্গে। গল্প করে গ্রাম ঘুরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। রাত হলে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান ফুর্তি, নয়তো একলা বসে বাঁশি বাজানো।

হাণ্ডর্ণা বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল। রাত অনেক হয়েছে।

বাঁশিতে পুরানো উদাস করা রাগিনী। দুইটি মাত্র পদ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই দুটি পদই বাজাচ্ছে। আঁধার রাতে ফাগুন শেষের ছোট একটি ঝড় হু হু করে সব নাড়িয়ে কাঁপিয়ে বইতে লাগল। পাহাড়ী দেশে কখন ঝড় ওঠে তার ঠিকানা নেই।

হাণ্ডর্ণা বাঁশি বন্ধ করল। বাইরে অন্ধকার রাত, ঝড়।

হাণ্ডর্ণা একলা শোয়। মন ছটফট করছিল। ঘুম আসছিল না। এই অন্ধকার রাত্রি পাহাড়ের উপরে কোথাও কোনোদিকে যেন সে বেরিয়ে পড়তে চায়। আঁধার ঝড়ের ভিতর ছুটে চলল কুড়ি বছরের আবেগ।

একা লাগছিল। রাত্রে এমনি বাঁশি বাজানোর পর এই রকমই তার লাগে, মন চায় বাসা বাঁধতে। গাই-গরু ধানের গোলা হাট-ব্যবসা—মাঝ রাতের নয় এরা, এসব বৃথা। তাহলে কার জন্য তার প্রতীক্ষা? যত কল্পিত পাত্রী একটি একটি করে সকলের কথা সে ভেবে দেখল। কতজনের সঙ্গে তার চেনা পরিচয়, অন্ধকার রাতে ঝড়ের রাতে এদের স্মরণ করলে এরা আসে। নিরালায় হাণ্ডর্ণা একটি একটি করে তাদের যাচাই করে দেখল। কারো নাকটি ছোট, কারো কোমরটি বেশী সরু, কেউ বা বেশী হাসে না, কেউ বড় বেশী হাসে। কাউকেই তার পছন্দ হয় না। পুরাতন পদ্ধতিতে পরখ করে পরে পরস্পরকে বিদায় দেওয়া—তেমন বিবাহ করবার পাত্র সে নয়। তার এক কথা, যাকে ভালবাসবে সব কিছু ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে ভালবাসবে।

কাউকে পছন্দ হয় না, তবু তো ভাবতে ভালো লাগে।

সব শেষে সকলের নীচে দেখা হয় পুবুলি, যেন সে-ই সত্যি, সে-ই চিরন্তনী। পুবুলিকে আড়ালে বসিয়ে রেখে অন্যদের একে একে ডেকে আর যাচাই করে ফিরিয়ে দিতে ভালো লাগে। এই হাণ্ডর্ণার খেলা।

রাত বেড়ে চলল। ক্রমে ক্রমে হাণ্ডর্ণা স্থির করল যে এমন করে বসে থাকলে তার চলবে না, বড় খালি খালি সব। এখন সচেষ্ট হতে হবে। কন্ধ দেশে ধাংড়ীর ইচ্ছা অনুসারে বিয়ে হয়। তার উপরে আর কারো মত চলে না। ধাংড়ীই রেষারেষি বাদ-প্রতিবাদের শেষ ফল। হাণ্ডর্ণার বিশ্বাস পুবুলি তাকে ভালবাসে, তাকে সে 'না' বলবে না, কেবল একটি বার জিজ্ঞাসা করার ওয়াস্তা।

শেষ প্রহরে সে স্বপ্ন দেখছিল যে তার নতুন গাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। নতুন গাড়ি হাঁকিয়ে সে চলেছে, গাড়ি বোঝাই অলসি নিয়ে চলেছে। ফেরার পথে তামাক পাতা বোঝাই করে আসবে। আসল কলিঙ্গী তামাক পাতা, নারকেলের জলে জারানো, দেখাবে যেন গাঢ় হলুদ রঙে ছোপানো। গাড়ি চলেছে, চৈত্রের ফুলে ভরা বনের ভিতর দিয়ে। সামনে বড় বড় পাহাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন সামনে আর পথ নেই, এইখানেই বুঝি গরুর-গাড়ি-চলা পথের শেষ। কিন্তু গাড়ি থামছে না। পাহাড়ের অন্ধি-সন্ধির ভিতর দিয়ে, কোথাও পাথুরে জমির উপর দিয়ে পথ চলে গেছে, তার গাড়িও চলেছে। কত নতুন নতুন বন আর নতুন নতুন গ্রাম চোখে পড়েছে। কমলা লেবুর বন, কমলা ফলে রয়েছে। দলে দলে যুবতীরা আসছে যাচ্ছে, বলছে কি সুন্দর গাড়ি, কোথায় চলেছিস? নিবি আমাদের তোর গাড়িতে? না—না—না। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সে চলেছে। সব কিছু দেখতে দেখতে যাচ্ছে, থামছে না কোথাও। একটা পাথরের ঢিবির উপরে পুবুলি দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ি থামল, পুবুলি লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। দুজনে এক গাড়িতে। এবার গাড়ি আকাশে উড়ে চলল। পর্বতের চুড়োগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। সাঁই সাঁই করে হাওয়া বইছে। চারিদিকে কেবল ধোঁয়াটে মেঘ। মেঘের উপর ভেসে ভেসে তার গাড়ি চলেছে —চলেছে।

কার ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘোর-লাগা চোখে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল। কোথায় গাড়ি, কোথায় পুবুলি, কোথায় মেঘ?

"কাল রাতে খুব টেনেছিলি বুঝি সাঁওতা? ছোকরা মানুষ, এত মদ খাওয়া ঠিক না।" মাইলা কন্ধ গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়েছিল। মাইলা কন্ধ গ্রামের গোয়ালের পাহারাদার।

"অ্যাঃ?"

"ছুটো মন্দা মোষ মরে পড়ে আছে, দেখবি চল্।"

ধড়মড় করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হাণ্ডর্পা, বলল, "কি? কি বললি?"

"ছুটো মোষ।"

হাণ্ডর্পা গোয়ালের দিকে দৌড়ে গেল। সত্যিই ছুটো মন্দা মোষ মরে

পড়ে আছে। কথা নেই বার্তা নেই রাতারাতি মরে গেল? হাঙর্ণার মাথায় বাজ পড়ল যেন।

"আগে কিছু বুঝতে পেরেছিলি, মাইলা?"

"কিছু না।"

"তা হলে?"

মাইলা কন্ধের ভয় লাগছিল। কানের কাছে মুখ এনে গলা নামিয়ে বলল, "দিব্যি সুন্দর দেখতে হয়েছিল হয়তো কারো দৃষ্টি পড়ে থাকবে, কেউ হয়তো বাণ মেরেছে, সাঁওতা। তার উপর আর কার জোর আছে বল্?"

তিন দিন জঙ্গলে জঙ্গলে চরে বেড়িয়ে কাল সন্ধ্যের সময় মোষগুলো ঘরে ফিরেছিল। রাত্রিতে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে,-তা না হলে এমন হঠাৎ—। গোয়ালের ভিতরে সব গরু মহিষ যে যাঁর খুঁটোয় বাঁধা ছিল। ছাড়া পাবার জন্য ডাকাডাকি করছে। মোষেদের চোখে চির অভ্যস্ত গভীর কিন্তু নির্বোধ চাহনি। কোনোটা বা জাবর কাটছে, কোনোটা লেজ নাড়ছে, কোনোটা মাথা নাড়ছে, ঐখানেই দুটো মোষ মরে পড়ে আছে সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। ভারী শোরগোল হল। হাঙর্ণার মুখ শুকিয়ে গেল। হাটে বেচলে কম পক্ষে এক একটি মোষের দাম হত তিন কুড়ি টাকা। কন্ধের ভারী বড় সম্পত্তি সে।

দুঃখের পর এল রাগ। চোখ মুছে মাথার চুলের গোছা পিছনের দিকে বেঁধে দিয়ে হাগুর্ণা গর্জন করে উঠল। রাগে ফুঁসতে লাগল, কাঁপতে লাগল। রেগে উঠলে তাকে ভয়ঙ্কর দেখায়। টাঙ্গি উঁচিয়ে সে মাইলা কন্ধের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তোর জন্যই আমার মোষ মরেছে, এখন আবার ভালো মানুষ সাজছিস্! নিংগে টুণুহাইনি (তোকে কেটে ফেলব)।"

সকলে তাকে ধরে থামাল। মাইলা কন্ধ ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, "মিথ্যে আমার উপর রাগ করছিস, সাঁওতা। আমি কিছু জানিনা—কিচ্ছু জানিনা।"

লোক জড় হয়ে গিয়েছিল। কে একজন বলল, "গায়ে তো কোনো দাগ নেই। নিশ্চয় কেউ বাণ মেরেছে।" কথাটা সকলের মনে ধরল। লাল লাল চোখ করে ঘাড় ফুলিয়ে গর্জন করে সাঁওতা বলল, "বাণ মেরেছে? বেশ, দেখা যাক কে বাণ মেরেছে। বেজুণীকে ডাক, পুজো কর। তার

উপর দেবতার ভর হোক, সে নাচুক। ঠাকুর নিজেই এখনি বলে দেবে কে বাণ মেরেছে। তার পর…"

ডোমেদের এক দল হাঁ করে সে দিকে তাকিয়েছিল। মরা মোষ দেখে তাদের লোভ হচ্ছিল। হাণ্ডর্ণা তাদের দিকে তেড়ে গিয়ে বলল, "তোরা এসেছিস্ কেন? তোরাই বিষ খাইয়ে মেরেছিস্ বুঝি, এখন দেখতে এসেছিস্?"

তার ধরন দেখে "আমি না, আমি না" বলতে বলতে তারা সরে পড়ল। যে রেগে গেছে তার সঙ্গে উচ্চবাচ্য করা ঠিক নয়। তার এক্তিয়ারে আর কেউ চড়াও হয়ে তার ক্ষতি করে দিয়েছে এই ধারণা হলে কন্ধ রেগে যায়, আর রাগলে বনের মানুষের হাত চলে যায় কাঁধের টাঙ্গিতে। পরিণাম চিন্তা করে মেপেজুকে সামাজিক ন্যায়বন্ধনের মধ্যে চলা তার অভ্যাস নয়। কোথাও হয়তো খেত খামার নিয়ে ঝগড়া বাধল, হয়তো কারো 'সলপ' গাছে বাঁধা তাড়ির ভাঁড় অন্য কেউ নামিয়ে নিয়ে গেল, কেউ কারো স্ত্রীর উপর নজর দিল, তাহলে কথায় কথায় অমনি একজনের কাঁধের টাঙ্গি আর একজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, অবলীলাক্রমে মানুষ খুন হয়। আদিম মনের নিয়ন্তা ভয়। দিন দিন নানা দুর্দশায় পড়ে ভয় যতই বাড়ছে খুনোখুনি ততই কমছে। তবু থেকে থেকে আদিম বন্য মানুষের আপন আইনের দণ্ড মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, বাধা-নিষেধ মানে না, আজকের আইন মানে না।

॥ উনত্রিশ ॥

রোদ ঝাঁ ঝাঁ করা দুপুরে বন্দিকার গাঁয়ের বেজুণী সাঁওতার ঘরের দুয়ারে লম্ফ ঝম্প করে নাচছে। গাঁয়ের লোকেরা জড় হয়েছে, অপেক্ষা করছে দৈববাণীর। মরা মোষ দু'টো এক ধারে পড়ে আছে, তাদের ঘিরে মাছি ভন ভন করছে। সবাই ভাবছে না জানি আজ কার মাথায় বাজ পড়ে। ধূপধুনোর ধোঁয়া গিলে গিলে বাজনার শব্দে কালা হয়ে বেজুণী কোনো একজনের উপর দোষ চাপিয়ে দেবে। তার পর পঞ্চায়েতের কাছে তার বিচার হবে, শাস্তি হবে। আগেকার কাল হলে তো বেজুণীর কথাতে যে

দোষী তাকে লোকেরা মেরে ফেলত, নয়তো কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কেটে অপমান করে গ্রাম থেকে বের করে দিত। কিন্তু এখন আইন বদলেছে, প্রাণ যাবে না, কষ্ট পাবে এই যা।

প্রত্যেক কন্ধ গ্রামের সাঁওতা, জানি, ডিসারির মতো বেজুণীও একটি প্রতিষ্ঠান। হাগুর্ণার রাগ কমে এসেছে, এবার উচিত উপায় হচ্ছে।

ময়ূর নামার বেলা হল, বেজুণী নেচে নেচে থকে গেছে, ক্লান্ত স্বরে বললে, "মোষ মরেছে মরুক, কেটে খাও। কথায় কথায় আমাকে কেন ডাকিস্। আমার ইচ্ছে হয় বলব, ইচ্ছে না হয় বলব না। আমরা দেবতা, আমরা তোদের চাকর নই।"

বেজুণীর মুখ দিয়ে দেবতার উত্তর।

গ্রামের লোকেরা তাকে নানা রকমে খোশামোদ করল, দেবতা রেগে গেল, বলল, "দেখ্, যা বলবার বলেছি, আর বিরক্ত করলে তোদের 'আল্‌রা' (হয়রান) করে দেব, সাবধান!"

বেজুণীর ঘোর কাটল। যারা অত্যন্ত বিশ্বাসী তারা বলল মোষ দুটোকে দেবতা খেয়েছে। দেবতার যাকে খাবার ইচ্ছে হয় খায়। আর কত লোক চুপ করে রইল। দেবতার উপর বিশ্বাস থাকলেও এ গাঁয়ের বেজুণীর উপরে অনেকের বিশ্বাস নেই: ফিস্‌ফাস্ চলেছে। ইতিমধ্যে খবর এল আর এক জোড়া মোষ মরেছে—অন্য একজনের, ঠিক অমনি ভাবেই।

জানি বলল, "এমনি করে সব মোষ মরে যাবে। বেজুণী যদি এমনি বলতে থাকে 'আমরা দেবতা, আমরা বলব না', তাহলে তো আমাদের দফা রফা।"

"এই বেজুণীকে আর কিছু বলে দরকার নেই, চল মিনিআপায়ুর বেজুণীকে জিগ্যেস করি গিয়ে। আসল দেবতা ভর করে তার উপরে।"

"এমন বেজুণী আমাদের কোন্ উপকার করবে? চল্, মিনিআপায়ুতেই যাওয়া যাক, আর কি করা?" বল্‌ল হাগুর্ণা সাঁওতা। পর গাঁয়ে হাত পাততে সাঁওতার ভালো লাগে না, সে কারো ধার ধারতে চায় না, কিন্তু নিরুপায়।

মরা মোষগুলো গদবারা কিনে নিয়ে গেল, গদবারা গরু খায় না, মহিষ খায়।

হাণ্ডর্ণা সম্মতি দিয়েছে। এবার ভিলারি যোগ ধরে দেবে, সেই যোগ দেখে একদল কন্ধ মিনিআপায়ু যাবে, সেখানকার বেজুণীর উপরে দেবতার ভর করিয়ে মরবার কারণ জেনে এসে তার প্রতিকার করবে। নতুন কিছু ঘটলে বনের লোক চুপ করে থাকে না, খুঁজে পেতে কারণটা বোঝে যতক্ষণ না নিজের বিশ্বাস জন্মায় যে সে বুঝেছে। এই জন্য সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখা তার অভ্যাস, নতুন কোনো কিছুতে তার কৌতূহল আর সন্দেহ। লণ্ঠনটা জ্বলে কেমন করে, ঘড়ির মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ কেন হয়, ছাতা কেমন করে বন্ধ হয়ে যায় এমনি সব কথা থেকে আরম্ভ করে জন্ম মৃত্যু অনাবৃষ্টি ফসলহানি মড়ক পর্যন্ত তাদের কারণ খোঁজা। যা সে বুঝতে পারে না তাকে ভয় করে। যেমন, কাগজে আঙুলের টিপ সই দিতে, কাগজে তার সম্বন্ধে কিছু লিখে দেওয়াতে, মোষগুলো কেন হুসহুস করে মরে গেল তার কারণ না বোঝাতে।

বনে সাপ বাঘ, সমাজে সাহুকার অধিকারী। কন্ধজাতি যে এমন আশ্চর্যভাবে বেঁচে আছে সে কেবল এই কারণ খোঁজার জোরে।

মিনিআপায়ু—। হাণ্ডর্ণা ভাবল, দুই কাজই হবে—চইত পরব আসছে—, ঐ গাঁয়ে পুবুলি—

॥ ত্রিশ ॥

সকাল নাগাদ আরো দুটো মোষ মরল।

দিনের বেলায় কিছুই বুঝতে পারা যায়নি, রাত্রিতে কি হল কে জানে সকালে দেখা গেল মরে কাঠ হয়ে আছে। গায়ে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। কামড়ানোর কোনো লক্ষণ ছিল না, অথচ দু'দিনের মধ্যে গাঁয়ের ছ'টা মোষ মরে গেল।

কেটে দেখা গেল রক্ত মলিন হয়নি, টকটকে লাল কেবল দানা বেঁধে গেছে। গায়ে কোনো সামান্য আঁচড়ের পথ দিয়ে ভিজে জমি থেকে 'অ্যানথ্র্যাক্স-এর বীজাণু ঢুকে গেছে। কন্ধ তা দেখতে পায় না, এ একেবারেই তার হিসাবের বাইরে। বনবাসী মানুষ মাথা চাপড়ায়,

বেজুনী নাচিয়ে দেবতার কাছে উত্তর চায়, বিশ্বাস করে করে তার দিন চলে যায়।

বন্দিকারের সাঁওতা আর কয়েকজন মাতব্বর রায়ত চলেছে মিনিআ-পায়ুর বেজুনীর কাছে মোষ মারা পড়বার সত্যিকার কারণ অনুসন্ধান করতে।

বড় রোদ। ফাঁকা খেতগুলো খাঁ খাঁ করছে, ফসল উঠে গেছে, এবার সব খালি। বনের তেজ কমে এসেছে, চড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে।

কিছু দূর যাবার পর বনের ভিতরে 'বাঘমারু' ঝোরা। গোবর পড়ে আছে, একটু দূরে এক ধারে গরুর হাড পডে আছে, আর বড় বড় চারটে নিবস্ত উনুন। টিংগু কন্ধ বলল, "দেখেছিস্ সাঁওতা, এ কোনো ডোম পটকারের (চোবের) কাজ। গরু মেরেছে আর খুব মজা করে খেয়ে ফূর্তি করেছে।"

সোভনা কন্ধ বলল, "কেমন করে জানলি যে গরু মেরেছে? খালি উনুন থাকলেই গরু মেরেছে বুঝতে হবে? মরা গরুর হাড কি এখানে ওখানে পডে থাকে না? একি একটা বড কথা?"

"না ভাই না, ডোম না হলে কার এত লোভ হবে যে পরের গাই গরুর মাথায় টাঙ্গির উলটো পিঠের ঘা মেবে মেরে ফেলে খাবে বল্? বাঘ যত না খায় ডোমেরা খায় তত, সত্যি কি না? ভাবী 'গণ্ডা' (বদমাশ) জাত ওরা।"

হাণ্ড'ণা সাঁওতা কোনো মতামত দিল না। একটা প্রচ্ছন্ন ভয় হচ্ছিল তার। এই যে ছটি মোষ মারা পড়ল ডোমের হাত কি থাকতে পারে না এতে? তাবা তো 'ডুম্বা'র (পিশাচ) জাত, 'পা' না'র (বেঙ) জাত, যদি কেউ লুকিয়ে বিষ দিয়ে থাকে? গাই গরুকে বিষ দেওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে মেরে ফেলা, এ সবে তো ওরা ধুরন্ধর। চাষবাস উঠে যায়, বন পোড়াতে গরু এখানে ওখানে ঘুরে বেডায়, তাদের পেটের অসুখ হয়, 'ফাটিআ' রোগ হয়, গোবসন্ত হয়, বনের মধ্যে আর কোনো উপায় নেই তো—আর ঠিক এই সময়েই ডোমেদের শত্রুতা।

হাণ্ড'ণা বলল, "এত বকবক করে কি হবে? মিনিআপায়ুর বেজুনী বুড়ী যদি সত্যি তেমন বলবার ক্ষমতা রাখে তাহলে তো আর কিছুক্ষণ পরেই

সব জানতে পারা যাবে। যদি ডোমেরাই আমাদের মোষগুলোকে বিষ দিয়ে থাকে তাহলে আমরা কি আর তাদের সহজে ছাড়ব?”

টিংগু বলল, “জানতে পারলে তো—তাদের নাম-ধাম সব? কোন্ গ্রামের ডোম এসেছিল তা ঠিক করে কে বলবে? কাজকর্ম নেই, খালি খালি বদমাশি করবার জন্য ‘ডম্বকুদা’ (ডোমের দল) এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। কেউ দেখে ফেললে বলে—আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি যাচ্ছি, হাটে যাচ্ছি, বোঝা বইতে যাচ্ছি, এমনি কত কি। ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায়?”

সোভনা বলল, “আর বিষ দিলেও তুমি জানবে কেমন করে? খাবার জায়গায় বিষ দিয়ে থাকতে পারে, জড়িবুটিও খাইয়ে দিতে পারে, কুঁচ বেটে তাই ছুঁচালো সরু কাঁটা দিয়ে গায়ে বিঁধিয়ে দিয়ে থাকতে পারে। ওস্তাদ ওরা, কত ফিকির জানে।”

হাগু’ণা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে থাকে। জীবনের এত যে জটিলতা সব কিছুর সমাধান তাকেই করতে হবে, তবে গিয়ে সে সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে, লোকের বিশ্বাস আসবে সে তাদের নায়ক, তাদের সাঁওতা। নিজের গোষ্ঠীর সব ভালো-মন্দের জন্য সে দায়ী।

বিরক্ত হয়ে সে বলল, “আহা, কেন কেবল ঐ কথা আর ঐ কথা, আর কিছু বল্।”

“সত্যি কথা,” টিমা কন্ধ বলল, “এবার জঙ্গল শুরু হল, ধর, গান ধর।”

কেউ এক পদ গান আরম্ভ করে দিল, তার পর সকলে এক সঙ্গে গান ধরল। গলা ছেড়ে, সুর কখনো চড়িয়ে কখনো নামিয়ে গর্জন ছেড়ে গাইতে গাইতে কন্ধেরা চলল, এই তাদের পথ চলার রীতি। গানের ধুয়ো “বাইলে বাইলে” এরই ভিতর দিয়ে গানে গানে নিজেদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে লাগল। চাষবাসের অবস্থা, মহাজনদের গালি-গালাজ, মরা মহিষের গুণ গেয়ে শোক—সব তারই মধ্যে। কথার বিকল্প এই গান, উপরন্তু তাতে আছে স্বরলহরী।

কিছু দূর যাবার পর দেখা গেল একজন তাদের দিকে ছুটে আসছে, হাতে বিঘত খানিক লম্বা একটা বাতা, তাতে কি যেন বাঁধা, সামনে দেখা যায় একটা বড় লাল লঙ্কা। গানের লহর চুরমার হয়ে গেল, সকলের মুখ শুকিয়ে গেল, থমকে দাঁড়াল সবাই। সকলের দৃষ্টি ঐ লাল লঙ্কাটির দিকে।

যে আসছিল সে এবার ধীরে সুস্থে কাছে এল। হাতের বাতাটা তুলে ধরেছে, মুখখানা খুশী খুশী। ঘামে কপাল চুপচুপ করছে।

কছে এসে হেসে বলল, "যাহোক আমার বরাত ভালো, এইখানেই দেখা পেয়ে গেলাম। রোদ্দুরে এতটা পথ দৌড়তে দৌড়তে এসেছি, আবার দৌড়তে দৌড়তে বন্দিকার অবধি যেতে হত। জিরিয়ে নিই একটু। আগুন আছে? একটু বের কর।"

"কোত্থেকে এলে?"

"অনেক দূর থেকে, ভালুযোডি। যাচ্ছিলাম তো তোমাদের বন্দিকার গাঁয়েই। আর পারি না, এবারে তোমরা নাও, আমার কাজ শেষ।"

"আমাদের গাঁ বন্দিকার বলে কেমন করে জানলে?"

আগন্তুক হাসল। বলল, "এই কথাই তো বলছিলাম। আসছিলাম একা, কান খাড়া কার চারিদিকের শব্দ শুনতে শুনতে আসছিলাম, তাই তোমাদের গান শুনতে পেলাম। তোমরা সবাই জোয়ান লোক, তাই না —তোমরা গান গাইতে গাইতে বলছিলে তোমরা বন্দিকারের বলে। নয় তো আমি নিজের পথ ধরে অন্য দিক দিয়েই চলে যেতাম। কিন্তু তা হবে কেন? আমার কপালে ছিল এইখানেই আমার বোঝা নেমে যাবে।"

"বোঝা!"

"হাঁ গো, বোঝা।" সে লঙ্কার দিকে আঙুল দেখাল—"আমিন এই 'ঠপা' (চিঠি) পাঠিয়েছে ফট্কিযাম থেকে। নিয়ে যেতে হবে ডোক্রি-বেডাতে 'রিবিনি'র কাছে। জরুরী চিঠি, তাই লঙ্কা বেঁধে দিয়েছে। দৌড়ে দৌড়ে যেতে হবে। আমার পালা বন্দিকার পর্যন্ত। তারপর যা করো সে তোমাদের ইচ্ছে। দেখা তো হয়েই গেল, এবার তোমরা বুঝে নাও, আমি যাচ্ছি।"

পাতার কলকের মতো চুরুটটি কৌপীনে গুঁজে নিয়ে কাঁধে টাঙ্গি তুলে আগন্তুক বনের মধ্যে অন্য এক পথ ধরে চলে গেল।

লঙ্কা বাঁধা বাতা আর চিঠি ঐখানেই পড়ে রইল। বিমর্ষ হয়ে সকলে তার দিকে তাকিয়ে রইল। যে চিঠিতে লাল লঙ্কা বাঁধা থাকে পাহাড়ীরা বোঝে তা অত্যন্ত জরুরী, সেটা দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে পৌঁছে দিতে হয়। লঙ্কা বাঁধা হয়ে গেলে চিঠি কারও একজনের হাতে দিতে হয়, ঠিকানাটা বলে

দিতে হয়, তারপর চিঠি আপনা-আপনিই চলল, দৌড়ে দৌড়ে চলল, যখন যার ঘাড়ে চাপে সে দৌড়ে গিয়ে অন্য গাঁয়ে দিতে বাধ্য।

কোন্ প্রাচীন কাল থেকে কন্ধ দেশে এই প্রথা চলে আসছে। বোধ হয় কন্ধদের রাজত্বের আমল থেকেই এক টুকরো শুকনো গাছের ডালে চিঠি ঝুলিয়ে তাতে একটা লাল লঙ্কা বেঁধে দিলে খবর জরুরী হয়, হাঁসফাঁস করতে করতে দৌড়ে গিয়ে সে খবর পৌঁছে দিতে সকলে বাধ্য, না বলবার কারো উপায় নেই। কালক্রমে অন্যেরা এই প্রথার সুযোগ নিয়েছে, তাদের জিনিস-পত্রের বোঝার সঙ্গে ঘরোয়া চিঠিতেও লাল লঙ্কা বাঁধা।

হাণ্ডর্ণা বলল, "বেগার খাটুনির দায় জুটে গেল মাঝ পথে। যেতে তো হবেই। যা, গোত্রি পর্যন্ত আমাদের গ্রামের নিয়ে যাওয়ার কথা, সেইখানেই পৌঁছে দিয়ে আয়।" রঘু কন্ধ আর দাস কন্ধ বেরিয়ে পড়ল, দল পাতলা হয়ে গেল।

পথে ঐ চিঠি নিয়ে আলোচনা—

—"কি লিখে পাঠিয়েছে কে জানে।"

—"শিস্ত দাস্ত' (খাজনা), 'কমান্' (অফিসারের সফর), বা আর কোন কথা লিখেছে কে বলবে?"

—"আর নয় তো সরু চাল, ঘি, পালো, মুরগী, ছাগল—" সোভনা বলল, "কোথাও বিয়ে বাড়ি লেগেছে কারো?"

—"কবেই বা ওদের বিয়ে বাড়ি না লাগে বনে এলে?" বলল টিংগু কন্ধ, "একবার এদিকে ওদের আগমন হলেই তো ভারের পর ভার জিনিস-পত্র পৌঁছে দেওয়া লেগেই থাকে, আমরা বোঝা বয়ে বয়ে 'বাইলে বাইলে' (বিশেষ করে বিবাহ উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়) করতে করতে ছুটতে থাকি, ঠিক বিয়ের বউ পৌঁছে দিতে যাওয়ার মতো।"

সবাই হাসল।

"আর জিনিসের সঙ্গে যদি ডোম পাড়া নয় তো খিরিস্তান পাড়া জুটে গেল তো নিরালা বাংলা ঘরে অমনি চলল বিয়ে বাড়ি! এমনিই তো ওদের ধরন," সোভেনা বলল।

সবই হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

জোয়ান সাঁওতা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "খালি হাসছিস্ তোরা, ব্যাপার বুঝিস্ না কেউ।"

"কি?"

"চিঠি তো গেল, এখন যদি সেই অনুসারে কারো 'কমান' পড়ে তাহলে তো আমাদের হয়রানি হবে। বাঁক আর ডুলি বইতে বইতে কাঁধ ভেঙ্গে যাবে।"

"বলিস্ না সাঁওতা, বলিস্ না। অমঙ্গলে কথা ও সব। কোথাও আমাদের গ্রামে কেউ সফরে এসেছে? আমরা তো বনের একেবারে খোলের মধ্যে আছি। অনেক দিন ও-সব ঝঞ্ঝাট নেই, কখনো ক্বচিৎ কোনো বড় অধিকারী এসে পড়ে, আরাম চৌকির পায়ায় বাঁশ বেঁধে ডুলির মতো করে তাকে বয়ে নিয়ে যাই। তা কেবল যদি অধিকারী ডুলিতে যেতেন—হাঁ, আমাদের মা-বাপ, মোটে তো একজন, বয়ে নিতাম। কিন্তু এইটুকুই তো নয়, চাপরাশী বাবুদের জন্য ডুলি, কেরানী বাবুদের জন্যও ডুলি চাই, চাকরদের জন্য, রাঁধুনীদের জন্য, জুতো-বওয়া লোক, জলতোলা লোকের জন্য চাই, শেষটা কুকুরের জন্যও ডুলি। এরা সব চেপে বসবে আর আমরা বয়ে বয়ে নেব, আবদার কি কম?"

"ডুলি বন্ধ হয়ে গেছে সোভেনা ভাই," টিংগু কন্ধ বলে উঠল, "গভর্নমেণ্টের হুকুম হয়ে গেছে যে ডুলি বওয়া বন্ধ। তা না হলে যতই পাহাডের খোলের মধ্যে থাক না কেন এর থেকে রেহাই পেতে না।

"ঠিক ঠিক," সোভেনা বলল। "সণ্ড সাহেব (স্যাণ্ডার্স্) এসেছিল যে—আহা কোথায় গেল সে, যেখানেই থাক তার মঙ্গল হোক, হাজার বছর বাঁচুক। বাঁচিয়েছে—বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে সে আমাদের। সেই তো ডুলি বন্ধ করে দিয়ে গেছে। হাটে বাটে ঢেঁডা পিটিয়ে দিল যে সরকারের হুকুম—ডুলি বন্ধ, কেউ ডুলিতে চাপবে না, কাউকে ডুলিতে চাপিও না। আহা হা, দেবতার মতো মানুষ, বড় ভালো লোকের 'ডুমা' সে। যেখানেই থাকুক, তার জয়জয়কার হোক, কন্ধ লোকের মা-বাপ।"

বন্দিকারের 'জানি', বুড়ো শলপু কন্ধ, চোখের পাতার লোমও তার পেকে গেছে। বুড়ো চুপচাপ পথ চলছিল আপন বয়সের বোঝা বয়ে। স্যাণ্ডার্সের নামে তার ধোঁয়াটে নীল চোখে আগুন জ্বলে উঠল, বিজলির চমক খেলে

গেল তার গায়ের ভিতর। কন্ধ কৃতজ্ঞতায় বাঁধা পড়ে, দয়া পেলে আপনি সে শিকল পরে, সংসারে আর কিছু নেই যা তাদের দুরন্ত মনে বেড়ি পরাতে পারে।

"কার নাম ধরলিরে তোরা আজ"—ফাঁপা গলায় বলল শলপু কন্ধ, "আহা হা! আজকের সারা দিনটা ধন্য হয়ে গেল। তোরা কখনো তাকে দেখেছিস্? সেই সণ্ট সাহেবকে? দেখলে পাপ চক্ষু পবিত্র হত।"

কর্কশ পথ কোমল হয়ে উঠল সণ্ট সাহেবের স্মৃতিতে। বৃদ্ধ শলপু কন্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে বার বার মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাতে জানাতে বলে চলল, "অধিকারীরা আসে—আমাদের এই কন্ধ পৃথ্বী জয় করেছে—তাই শাসন করতে। কিন্তু সণ্ট সাহেব? সণ্ট সাহেব আমাদের ভালোবাসতে এসেছিল, আমাদের ছেলের মতো পালতে এসেছিল।

"আগে সে ছিল সাহেব লোকেদের ডিসারি (অর্থাৎ মিশনারি), তাবপর হল পুলিসের 'সুপ্রণ্ট্' (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)। তাকে সাহেব বলাই বা কেন? তার রঙ সাহেবদের মতো বটে, কিন্তু মানুষটি এমন ভালো—ঠিক কন্ধের মতো। আমাদেরই মতো কাপড় পরবে, লাউয়ের খোল ঝোলাবে, বৃষ্টি নামলে তলৃরাতলৃরি (পাতার তৈরী বর্ষাতি) পরবে, একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বনের ভিতরে ঢুকবে। উঃ, কি হাঁটাই হাঁটত সে, ঘাট পাহাড় সব পায়ে হেঁটেই ঘুরে বেড়াত। আমাদের মতো 'পেজ্' (মাড়ুয়ার জাউ) খাবে, 'ওগুাতংপা' (মাড়ুয়ার ভাত) খাবে, বাইরে খোলা জায়গায় গাছতলাতেই শুয়ে পড়বে। এত বড় সাহেব, দেমাক নেই, আড়ম্বর নেই, কিছু নেই। ঠিক আমাদের লোকের মতো।

"যখনই আসবে আমাদের জন্য ধুঙ্গিআ আনবে, পিঠে আনবে, সামান্য লোকটির মতো গুটি গুটি এসে গাঁয়ের গলি পথ থেকে হাঁক দেবে—'নায়ক মহাপ্রভু, সাঁওতা মহাপ্রভু, প্রণাম—প্রণাম।"

"বারান্দার উপর বসে পড়ে বলবে, 'কোনো ভয় নেই, আমি তোদের বন্ধু, একটু 'পেজ্' খাওয়াবি?' সণ্ট সাহেব—মহাত্মা সে।"

"তার 'জাবি' (থলে) থেকে খাম বার করবে, কাগজ বার করবে, বলবে, 'এই নে। তোরা তো লিখতে পড়তে জানিস্ না, কেউ তোদের অনিষ্ট করলে কি করবি? এই দেখ্, যদি কেউ তোদের মারধর করে তাহলে এই

কাগজে পোড়া কয়লা দিয়ে এই এমনি একটা ঢেরা কেটে দিবি। কেউ যদি পয়সা-কড়ি চায় তাহলে এই কাগজে এমনি একটা গোল চিহ্ন এঁকে দিবি। তারপর কাগজটা খামের মধ্যে পুরে দিস্। হাটের দিনে যদি কেউ নারণপাটণা কি ডুম্রিপুট্ কি কোরাপুট কি কোনো স্টেশনের দিকে যায়, সে ডাকে ফেলে দেবে। ডাকে ফেলে দিলে আমি চট্ করে চলে আসব।' আর আসতও সে। সণ্ড সাহেব—কথা দিত, কথা রাখত।"

"দোরাগারু একজন অধিকারী ছিল, হাতীর মতো চেহারা, বাঘের মতো গর্জন। সে এলেই সকলের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। তার এই বড় এক ডুলি, যেন একটা গাড়ি, তার মধ্য সে বসতে পারে, শুতে পারে, মালপত্র রাখতে পারে। প্রত্যেক তিন ক্রোশ অন্তর তার জন্য গ্রামের লোকেরা রাস্তায় জমা হয়ে থাকত। সন্ধ্যার সময় সে ডুলিতে চাপবে, ডুলি বয়ে দৌড়ে দৌড়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে। দুই পাশে জলন্ত মশাল আর বর্শা হাতে নিয়ে কুড়ি জন লোককে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে হবে। ডুলি চলল। প্রতি ছয় ক্রোশ পরে পরে লোক বদল হত। এক রাত্রিতেই কোরাপুট থেকে গির্লিগুমা, ঝাড়া ত্রিশ ক্রোশ পথ।"

"সণ্ড সাহেব তাকেও সোজা করে ছেড়েছিল। একবার সে ডুলি চেপে যাচ্ছে, এই আমরাই ডুলি বইছি, সণ্ড সাহেব ডুলি আটকে দিলে। দোরাগারু বলে উঠল—'কে রে?' সাহেব বলল, 'আমি সণ্ড, আমি সুপ্রণ্ট, চিনতে পারলি?' বলল, 'ঢের আয়েস করেছিস, চর্বি বেড়েছে। এখন নেমে আয়, তুই ডুলি ব।' আমাদের তুললে ডুলিতে আর তাকে দিয়ে বওয়ালে। বলল, 'এখন বুঝলি ডুলিতে চড়বার সুখ? সরকারী হুকুম ডুলি চড়া বন্ধ কর। আর একদিন ডুলিতে চড়েছিস কি দেখবি।"

"সণ্ড সাহেব ডুলি বন্ধ করে দিয়ে গেছে।"

সবাই বলল, "এমন ভালো লোকটি, কোথায় গেল, আর কি কখনো দেখতে পাব?"

"দেখতে পাব না?"—শলপু কন্ধ বলল—"কেন দেখতে পাব না? যত দিন বেঁচে আছি হয়তো দেখা পাব না, কোথায় সে আর কোথায় বা আমরা। কিন্তু মরার পর সেই রাজ্যে তাকে খুঁজব আমরা, সবাইকে জিগ্যেস করে করে খুঁজব। বলব কোথায় গেল আমাদের সণ্ড? আমি বন্দিকারের শলপু

কন্ধ এসেছি, তাকে একটু খবর দিস্ তো। হবে আবার দেখা হবে, সেই আগের মতোই স্নেহ ভালবাসা, পরস্পরের খোঁজ খবর নেওয়া। সে আমাদের চুরুট দেবে, আমরা তাকে 'পেজ' দেব।"

সকলে চুপচাপ, কারো মুখে কথা নেই।

লাল লঙ্কা এসেছে, নিশ্চয় কারো শুভাগমন হচ্ছে—সকলেই তো সণ্ড সাহেব নয়।

মিনিআপায়ু প্রায় এসে গেল। চড়াইয়ের পথে এক দল ধাংড়ী। আবার গান আর পালটা গানে তার জবাব, লাফ মেরে কাপড় উড়িয়ে, হাঁক ছেড়ে জোয়ানরা এগিয়ে চলল।

লাল লঙ্কার কথা ভুলল।

॥ একত্রিশ ॥

মিনিআপায়ু গাঁয়ের 'ভেরামন'-এ (গাঁয়েব মাঝে সাধারণের বসবার জায়গা) পঞ্চায়েত বসেছে। কন্ধ জাতির সামাজিক ব্যাপারে সব বিষয়েই পঞ্চায়েত বসে। কে কাকে গাল দিয়েছে, কার গরু কার ফসল খেয়েছে—এসব তো ছোটখাট ব্যাপার; ব্যভিচারের শাস্তি, চোরের দণ্ড, কোনো অন্যায় সম্বন্ধে মতামত দেওয়া—এ সবও হয়। তারপর গোষ্ঠীর কথা—কোথায় জঙ্গল পরিষ্কার কবতে হবে, কোথায় ঘর তৈরি করতে হবে, কোন দল বা গ্রামের সঙ্গে বন্ধুতা বা শত্রুতা করতে হবে।

আজকের পঞ্চায়েতের একটু বিশেষত্ব ছিল। গাঁয়ের এক বুড়ো বাআলি কন্ধের ছেলে সুগ্রি কন্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়াতে ভিন গাঁয়ে ভোগিলা জগন্নাথ নামে এক শুঁড়ীর কাছে 'গোতি' হয়ে আছে, তাদের কেনা গোলাম। জগন্নাথের দশটি টাকা কর্জ এনেছিল সুগ্রি কন্ধ, সেই জন্য দু'বছর বিনা মাইনেয় খাটতে হবে। দিন রাত তার কাছে বাঁধা, মাসে কেবল এক 'পুটি' (শস্যের মাপ) মাড়ুয়া, শীতের সময় একটাকা দামের একখানি কম্বল। সুগ্রি কন্ধ ঐ শুঁড়ী সাহুকারের ছাগল আগলায়। সাহুকারের বাড়ির কাছে ছাগল রাখার কুড়ে ঘর। একদিন রাত্রে পাহারার ভার সাহুকারকে

দিয়ে সুগ্রি খেতে গিয়েছিল। সে ফেরবার আগেই সাহুকার বাড়ি চলে গেল। সুগ্রি কন্ধ ফিরে এসে দেখে এক চিতা বাঘ কুড়ের ভিতর ঢুকে সব ছাগল মেরে ফেলেছে, শুধু ভোজ খাওয়া বাকী। সুগ্রি কন্ধ টাঙ্গি উঁচিয়ে ছুটে গেল, বাঘ পালাল। সাহুকার খবর পেয়ে এসে ছাগলের দাম কষে দিল সুগ্রি কন্ধের উপর। অধিকাংশ ছাগলই ছিল বাচ্ছা, কিন্তু সাহুকার বলল যে সেগুলো একদিন তো বড় হত, তাই সবগুলোরই দাম ধরল বড় ছাগল হিসাবে। বলল, "তুই খেতে না গেলে আমার ছাগলগুলো মরত না, অতএব তুই ওগুলোর দাম দিতে বাধ্য।" সুগ্রি কন্ধের টাকা নেই, সাহুকার ঠিক করে দিল যে এই বছরটা সে আগের শর্ত অনুসারে কাজ করবে। কর্জের বাকী পাঁচ টাকা আর ছাগল বাবদ পঞ্চান্ন টাকা, সেজন্য সুগ্রি কন্ধকে খোরাকি বাবদ মাসে এক 'পুটি' মাড়ুয়া নিয়ে পনর বছর খাটতে হবে, মাইনে কিছু পাবে না। বছরে পাঁচ টাকা হিসাবে ঐ কল্পিত ষাট টাকা অমনিতে বারো বছরে শোধ হয়ে যেত, কিন্তু ভোগিলা জগন্নাথ তাকে বুঝিয়ে দিল যে বড় হলে সে ছাগল বেচে সেই টাকা সুদে খাটিয়ে তিন গুণ করতে পারত, পনর বছরের বদলে মেয়াদ হওয়া উচিত কুড়ি বছর, কিন্তু সে দয়া করে পাঁচ বছর কমিয়ে দিয়েছে। এই সব শর্তে পনরো বছরের জন্য কেনা চাকর হয়ে থাকবার অঙ্গীকার-পত্র ভোগিলা জগন্নাথ এক আনা মূল্যের স্ট্যাম্প লাগানো কাগজে সুগ্রি কন্ধের কাছে লিখিয়ে নিয়েছে। ভবিষ্যতে তার কি দশা হবে এই ভেবে কেঁদে-কেটে গ্রামের লোকেদের কাছে পরামর্শের জন্য সুগ্রি কন্ধ পঞ্চায়েত বসিয়েছে।

ছোকরার দল আর বুড়োর দলে বাদ-প্রতিবাদ চলছিল। এমনি সময়ে সেখানে বন্দিকারের লোকেরা এসে উপস্থিত হল। দিউড়ু সাঁওতা তখন বলছিল, "দে, অমান্য করে দে তুই ও কথা। কি করবে তোর সাহুকার? বাঘে ছাগল খেয়েছে, বেশ করেছে। তুই তো আর বাঘকে শিখিয়ে দিস্‌নি। দোষ যদি কারো হয়ে থাকে তো সে সাহুকারেরই। তুই ফেরাবার আগেই সাহুকার ছাগলের খোঁয়াড় ছেড়ে চলে গেল কেন?"

বুড়োর দল শর্ত অমান্য করার বিরুদ্ধে। তাদের নেতা লেঞ্জু কন্ধ। সে বলল, "তোমরা বুঝতে পারছ না। সাহুকার তার ক্ষতিপূরণ তাহলে পাবে কেমন করে?"

"পাবে বাঘের কাছ থেকে।"

"কেন, 'গোতি' হয়েছিল কে, বাঘ না সুগ্রি? 'গোতি'র কাজ ছাগল আগলানো, বাঘের কাজ ছাগল মারা। বাঘ তো নিজের কাজ ঠিকই করেছে, 'গোতি' তার কাজ করেনি, সেই দেবে ক্ষতিপূরণ।"

"ভারী সাহুকারের দিক টেনে কথা বলছিস্, কাকা! বুড়োদের বিচার কি এমনিই, না বুড়ো হলে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়? বাঘে খেল ছাগল, বেচারা সুগ্রি কি করল? সাহুকারকে বলে ছুটি খেতে গিয়েছিল। এটা কি একটা দোষের মধ্যে যে ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছিস্?"

"না না, ছেলে-ছোকরাদের বিচারের মাথা ভারী ঠিক! সাঁওতা হয়েছিস্ কিনা, তাই তোর বুদ্ধি বেজায় বেড়ে গেছে বটে, আর আমরা বুড়োরা সব বোকা! আচ্ছা, সুগ্রি কন্ধের কোনো দোষ থাক আর নাই থাক, সাহুকার তো তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। এখন কি করবি কর্।"

"কি করব? তার লেখা তার কাছেই থাকুক, তার লেখা নিয়ে সে যাক তার বাপের কাছে, আমার তাতে কি আসে যায়? আমি 'গোতি' খাটব না, সে কি করবে করুক।"

"এমনি দুর্বুদ্ধি দিয়েই তুই গাঁয়ের সবাইকে ভাসিয়ে দিবিরে ছোকরা। ছেলে-ছোকরার বুদ্ধি—ছিঃ থুঃ!" লেঞ্জু কন্ধ থুতু ফেলল। আবার বলল, "সামান্য কথা নিয়ে তুই বড়লোকের সঙ্গে বাদ করবি, একজনের জন্য সবাইকে মরতে হবে? না কি বলিস্ তুই পাণ্ডু জানি, ঠিক বলেছি কি না? সাহুকারের পক্ষে সব বড় লোকেরা। কাউকে সে টাকা দিয়েছে, কাউকে সরু চাল, আনাজ, গুড়, কমলা লেবু, 'কান্দুল' (বড় অড়হর)। দরকার হলে এক কুড়ি মেয়েমানুষও যোগাড় করে দেবে। যত সব বড় বড় লোক এসে তারই বাড়িতে ওঠে, তার সঙ্গে বিবাদ? আমরা টিকতে পারব? তার সব আছে, আমাদের কিছু নেই—কেউ নেই।" অতি করুণ ভাবে লেঞ্জু কন্ধ মাথা নাড়ল। তার ওজস্বিনী বক্তৃতা, তার বলবার ঠাট-ঠমকে সব বুড়োই মুগ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে বলে উঠল—"ঠিক ঠিক।"

পাণ্ড জানি বলল, "সবই যোগের কথা বাছারা, সবই যোগের কথা। মিথ্যে তোরা অস্থির হচ্ছিস্। ঐ উপরে (আকাশের দিকে হাত তুলে)—ঐ উপরে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে, তাদের দেখা-সাক্ষাৎ বিদায়-মেলানিতেই তোর

আমার ভাগ্যে ভালো-মন্দ ঘটে। এ সব তো পুরনো কথা। সাহুকারের জন্ম হয়েছে 'মাকড়ি' যোগে। আমাদের সুগ্রি তার কাছে গিয়ে পৌঁছাল 'সঅদা' যোগে। এই যোগে মানুষ হেনস্তা হয়। ছাগল ছানাগুলোর জন্ম হয়েছিল 'মাগা' যোগে। তা না হলে তাদের বাঘে খেত না। সবাই এক সঙ্গে জুটল, একজন 'পট্‌কার্', একজনকে বাঘে খাবে, একজন হেনস্তা হবে। দলিল লেখা হয়েছে, কথা দিয়েছে, এখন এ থেকে রেহাই পাবে কেমন করে ?

এই তর্কাতকির মধ্যে বন্দিকারের লোকেরা এসে পড়ল, তারাও তাতে যোগ দিলে। সবাই একটু থামে, তার পরেই হই-হই করে তর্কাতর্কি শুরু করে, তার পর একজন কথা বলে, বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়।

দিউড়ু বলল, "ন্যায় বিচারের কথা না বলে খালি ভয়-ডর দিনক্ষণ গ্রহ-নক্ষত্রের কথাই বলবে তোমরা বুড়োরা। সাহুকার একজনকে অনর্থক নাকাল করছে, সে তোমাদের কাছে নালিশ করতে এসেছে, আর তোমরা বড়লোকের সঙ্গে বাদ করলে পাছে তোমাদেব গায়ে আঁচড়টি লাগে তাই তাকে ভয় দেখাবার ফন্দি করছ ? তোমরা না নিজেদের কন্ধ বল ? লজ্জা হয় না তোমাদের এই রকম ভয়ে ভয়ে কথা বলতে ? বড়লোকেরা ঠেঙাতে থাকবে, তাদের লাথি খেয়েও তোমরা বলতে থাকবে 'চিতম্ চিতম্' (যে আজ্ঞে যে আজ্ঞে)—তল দেশের লোকেদের মতো. কোন্ গাঁয়ের কন্ধ তোমরা ? ভীতু বুড়োদের যদি প্রাণের এতই ভয় তাহলে তারা কোন্ মুখে পঞ্চায়েতে বসতে আসে ?"

খুব একটা গোলমাল বেধে যেত, কিন্তু বন্দিকারের বুড়ো শলপু কন্ধ গম্ভীর ভাবে বলল, "আর. কোন গাঁয়ের কন্ধ তুমি ছোকরা সাঁওতা যে অমান্য করবার পরামর্শ দিচ্ছ ? কন্ধ মরতে ভয় পায় না, অসত্যকে ভয় করে। তোমাদের সুগ্রি কথা দিয়েছে, রাজি হয়ে গেছে, কোন্ আক্কেলে বিধান দিচ্ছ সব কিছু ফাঁকি দিয়ে উড়িয়ে দিতে ? কন্ধ কখনো কথা দিয়ে কথা ভাঙে না। যদি সাহুকার অন্যায় করে থাকে তাহলে তাকে দণ্ড দেবে সে (আকাশের দিকে হাত তুলে), তোমাদের অধিকার নেই, নিজের কথায় তোমরা নিজে বাঁধা পড়েছ।"

সবাই চুপ করে রইল। হাগু´ণা কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বলল, "শত্রুকে নিকেশ করবার কি কোনো যোগ নেই, জানি ?"

"আছে, থাকবে না কেন? আমরা কি কোনো দিন যুদ্ধ করিনি? কখনো শত্রু নিপাত করি নি?" পাণ্ডু জানির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই তো হালেরই কথা, কত হানা কাটা, কত যুদ্ধ হয়ে গেছে। আমরা 'মেরিআ' পূজা দিই 'রোহিণী যোগে, 'আস্তা উত্‌রা'র শুভ যোগে ঘর থেকে বার হই, যুদ্ধ আরম্ভ করি 'জেটি' যোগে, শত্রু নিপাত করি 'পুর্ঘআ' যোগে —"

"তবে তাই হোক, 'জানি'। সাহুকার আমাদের শত্রু, আমাদের চাই 'পুর্ঘআ' যোগ। আমরা করব রোজগার, সাহুকার খাবে, আমরা না খেয়ে মরব আর সে ধন দৌলত করবে, খামকাই সে হবে সাহুকার আর বিনা দোষে আমরা হব 'গোতি', তার ধারের টাকা তো সাত পুরুষেও শোধ হবে না, আমার গাইটি বিয়োলেই তার মনে পড়বে সুদের কথা, তার ছাগল বাঘে খাবে আর আমরা দেব ক্ষতিপূরণ। সে আমাদের শত্রু, আমাদের শত্রু। বার কর 'পুর্ঘআ' যোগ, 'টুণু হায়মু' (হানো, কাটো)।"

ছোকরাদের দল চারিদিক কাঁপিয়ে গর্জে উঠল—"টুণু হায়মুঁ— টুণু হায়মুঁ—!"

তার পরে বুড়োদের তিরস্কার—"ছি ছি, কি করছিস্ তোরা ছেলে-ছোকরারা—ছেলেমানুষরা! এমনি মাথা গরম করে নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারবি, বাপদাদাদের নাম ডোবাবি! পুলিস আছে, মেস্‌রেট (মেজিস্ট্রেট) আছে, জেলখানা আছে, ফাঁসি আছে। অনর্থক বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে 'টুণু হায়মুঁ, টুণু হায়মুঁ'? বুদ্ধির ধার ধারিস্, না খালি মদ?"

পঞ্চায়েত ভেঙে গেল, বাআলি আর সুগ্রি নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

তারপর অতিথি সৎকার। মদ, ধুঙ্গিআ, মিষ্টি কথা।

"এত দিন পরে—?"

"ধাংড়ীর সন্ধানে বেরিয়েছিস্ নাকি, সাঁওতা?"

"সে দুঃখের কথা আর বলিস্ কেন, সরবু সাঁওতা মরে গেল—।"

এই তাহলে হাগুর্ণা ? পুবুলি দেখল তাকে,—এই নাকি তার বর !

মনে মনে তাকে নিয়ে কত কিছু কল্পনা করেছিল সে, তাকেই এখন স্বচক্ষে দেখে তার বুকটা কেঁপে উঠল। লজ্জা করছিল, সত্যিই হাগুর্ণা যদি তার জন্যই এসে থাকে। নইলে এত লোকজন সঙ্গে বাঁকে ভার নিয়ে—।

ঘরের ভিতর থেকে পুয়ু ডাক দিল—"আজ সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ছুঁড়ি ? রুখু চুল ফর ফর করছে, সারা গায়ে ধুলো। আয় চুল বেঁধে দিই।"

"আর তোরই বা কি ছিরি বেরিয়েছে পুয়ু, যে আমায় বলছিস্ ?"

"আচ্ছা, আয় আয়," হাসতে হাসতে ডাকল পুয়ু, "এখন আমার বয়েস আরো আসছে কিনা সাজগোজ করবার। তা বরেরা আমায় পছন্দ না করে না করুক, তুই তো আয়। খাস্ নি তো কিছু।"

পুবুলির হাসি পাচ্ছিল না। অজানা অচেনা মানুষদের দেখে আর তাদের উদ্দেশ্যের গন্ধ পেয়ে সে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভয় লাগছিল। এই সন্ধিক্ষণে যতবার সে ভাবছিল যে এখন তার পক্ষে কিছু একটা স্থির করে ফেলা দরকার ততবারই তার মন কেমন এক শঙ্কায় কুঁকড়ে উঠে পিছিয়ে যাচ্ছিল, যেন বলছিল যে সে এখনো প্রস্তুত নয়, সে আরও দেখবে, আরও ভাববে, আরও সময় চাই তার।

কোথায় একজন তুরীতে ফুঁ দিচ্ছে, হাকিনা তাকিয়ে তাকিয়ে কান পেতে শুনছিল। হাকিনা ক্রমে চনমনে হয়ে উঠছে, তার চোখে বুদ্ধির আভা ফুটতে আরম্ভ করেছে। পুবুলি হাকিনাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। যেন মনটা শীতল হল, মনে হচ্ছিল যেন ঝড় তুফানের মধ্যে এই এক রত্তি খোকা তার আশ্রয়। পুয়ু হাসছিল। পুয়ু বুঝি কিছু একটা বলবে এই আশঙ্কায় পুবুলির বুক কাঁপছিল। বলল, "যাই, ছেলেটাকে একটু ঘুরিয়ে আনি।"

"আচ্ছা যা," পুয়ু বলল। "কিন্তু এটা ভালো বুদ্ধি নয় কিনা—বাচ্ছা

কোলে করে বাইরে বার হবি, কেউ যদি ভাবে তোরই বাচ্ছা, তখন তোর কোন বর ছুটে আসবে তোর কাছে বল্ তো? তা নয়, দে, বাচ্ছাকে আমায় দে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেগুজে বাইরে বেরো। হাগুর্ণা এসেছে, বন্দিকারের লোকেরা এসেছে, অমন করিস্ না।" পুয়ু খুব হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিল, হাকিনা মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। পুবুলি দৌড়ে পালাল।

পুয়ু ডাক পাড়তে লাগল—"এমন অস্থির হয়ে চলে গেলি, এত তাড়া তোর? না পরলি ফুল, না পরলি মালা—"

পুবুলির লজ্জা করছিল। অনেক দিন পর আজ তার আবার লজ্জা করছে। একটা কিছু স্থির হয়ে গেলে বনের মেয়ে আর লজ্জা করে না, তখন সে বরং আগ বাড়িয়ে যায়, বাপের বাড়ির সমস্ত স্নেহের ডোর ছিন্ন করে পরের হাত ধরে চলে যায় বনের ভিতর দিয়ে অন্য কোথাও। কিন্তু এক্ষেত্রে এখনো কিছু স্থির হয়নি। হাগুর্ণা হঠাৎ এসেছে অকালে, যে ফুটুর ফাটুর কথা লেগে রয়েছিল ছেলেবেলা থেকে—তারই অনাহুত প্রতিমূর্তি।

বেলা শেষ হয়ে আসছে, গাই-গরু ঘরে ফিরছে, পুবুলি তরতরিয়ে গাঁয়ের বাইরে চলেছে। পথে যত জনের সঙ্গে দেখা হয় সবাইকার মুখে ঐ এক কথা "হাগুর্ণা এসেছে, হাগুর্ণা এসেছে, কোথায় চললি তুই? হাগুর্ণা এসেছে।"

পাহাড়ী দেশের সূর্যাস্ত। বনের ঢেউয়ের উপর সোনালী রঙিন আবীর ঝরে পড়ছে। চৈত্রের বাতাস, কচি পাতার সাজ পরা তন্দ্রালস গাছগুলি আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র সেই একটি কথা—"হাগুর্ণা এসেছে।"

পুলুমের সঙ্গে দেখা হল—"আজ একলাটি যে? ও বুঝেছি! যা যা, ঐদিকে গেছে। হাগুর্ণা এসেছে।"

গ্রামের বাইরে 'ঝোড়ি' গাছের নীচে একটা পাথরের উপরে পুবুলি পা মেলে বসে পড়ল আর ভাবতে লাগল—কেন সবাই তার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নেবার জন্য এত ব্যস্ত? হাগুর্ণা এসেছে তো আসুক, সে তার কে—

অকারণেই পুবুলির কান্না পেতে লাগল, পুবুলি কাঁদল। কেঁদে তার মনটা হালকা লাগল। ঘুরে ফিরে সে সেই একই কথা ভাবছিল। বাপ নেই—চলে গেছে সরবু সাঁওতা। হাকিনা নাকি তার 'ডুমা'র পুনর্জন্মের

রূপ। হাকিনাও পিছনে পড়ে থাকবে, পুয়্ পিছনে পড়ে থাকবে, এই গাঁ পিছনে পড়ে থাকবে, আবার কোথায় কোন অজানা বনদেশে তৈরি হবে তার নিজের সংসার।

তাকে যেতে হবে—

হাগুর্ণা,—হাঁ কি না! হাঁ-না'র সঙ্গে মিছেমিছিকার কানামাছি খেলা খেলতে খেলতে আজ সত্যি সত্যি হাগুর্ণা এসে উপস্থিত হয়েছে। ছেলেবেলায় বুড়ো বুড়ীদের মধ্যে স্থির হয়েছিল। হাগুর্ণা তার সেই দাবির কথা পাড়বে। হাগুর্ণার কথা ভাবতে ভাবতে বেণ্ড কঙ্কের কথা মনে প'ড়ে গেল। হাগুর্ণা ছোট হয়ে গেল, বেণ্ড বড় হয়ে উঠল ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের মতো। অন্ধকার হল, ঝক্‌ঝক্ করছে তারা, যেন তারই মনের ভিতরকার অস্থির চিন্তার বিন্দু। অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল, সেখানে হাগুর্ণার স্থান নেই। বেণ্ড কঙ্ক নিশ্চয়ই আসবে, পুবুলি পথ চেয়ে আছে। বাতাস উঠল, পুবুলি এবার মনে সোয়াস্তি পেল।

ফিরে আসতে আসতে হাগুর্ণার গলা কানে এল। গাঁয়ের খোলা জায়গাতে ধুঙ্গিআর আগুন জ্বলজ্বল করছে, কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পুবুলির লজ্জা করল না, সব লজ্জা সে গাঁয়ের বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছে। হাগুর্ণার গলা শুনে তার মন আবার জেগে উঠল। কিন্তু এখন আর কোনো মোহ নেই তার, সে জেগেছে।

কি বলছে সে—মোষগুলো মরে গেছে! আহা, বড় দুঃখের কথা। পুবুলি চুপচাপ ঘরে ফিরে এল। ভিতরে পুয়্ উনুন ধরিয়েছে, বাইরে অন্ধকার। সে ডাকল—"পুয়্—"

"কি লো, ভারী চুপচাপ আসছিস যে? দেখা হল?"

পুবুলি ঘরের ভিতরে চলে গেল।

॥ তেত্রিশ ॥

তিন গাঁয়ের লোকেরা এসেছে, আজ আবার রাত্রে আনন্দ উৎসব। মিনিআকা বংশের দিউড়ু সাঁওতা মদ মাংস ধুজিআ সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিল,-যাতে কেউ নিন্দে করতে না পারে এই বলে যে সে অতিথি সৎকার করতে জানে না। অতিথির সমাদর করায় কন্ধরা সবাইকে হার মানায়। খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্ব নেওয়া, ফরমাশ যোগানো, লোক যোগানো, রাত্রে আগুন জেলে তাদের আগলে শুয়ে থাকা—এ-সব তো কন্ধ জাতির অতি সাধারণ ভদ্রতা। কন্ধ কেবল এইটুকু চায় যে অতিথিরা যেন ভালো মানুষ হয়, কন্ধের কোনো জিনিসের দিকে, তার স্ত্রীর দিকে নজর না দেয়, কাউকে অপমান না করে, কষ্ট না দেয়—কেবল এইটুকু।

নেশাখোর চিংড়ু কন্ধের স্ত্রী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার স্বামীকে ঘুম থেকে তুলছে—"কেমন মানুষ তুই? অতিথিদের কোনো খোঁজ-খবর করা নেই, কেবল নিজের পেটটি আর নিজের ঘুমটি? উঠছিস কিনা—?"

বন্দিকারের লোকেদের ঘিরে বসে আছে এ গাঁয়ের যত কচিকাঁচা আর বড়রা—সবাই। ভদ্রতাব আদান-প্রদান, তামাক পাতা দেওয়া-নেওয়া, আর সারাটা দেশের যত লোকের কথা, সে কথার শেষ নেই।

"কোন কোন গাঁয়ে বাঘে মানুষ নিয়েছে?...এবার কোন দিকে 'পোড়ু' (জঙ্গল পুড়িয়ে বন পরিষ্কার) করছ?...হাটে কি কি বার করলে?...

"আমিনের দেওয়া খবর তোমাদের গাঁয়ে পৌঁছেছে কি?...খাজনার টাকার যোগাড় হয়েছে?...কোন চাপরাসী আসছে আমিনের সঙ্গে কিছু খোঁজ রাখো?

"চুরির ভয় কি রকম তোমাদের গাঁয়ে? ডোমেরা উৎপাত শুরু করেছে নাকি?"

নানান কথা।

বেজুণী বুড়ীকে ডাকতে লোক গেল। বেজুণী বললে, "কাল সকালে। রাতের সময় দেবতাকে বিরক্ত করা ভালো নয়।" হেসে বলল, "গাঁয়ে

ছুঁড়ি নেই নাকি ? এই রাত্রিতে নাচ দেখবার ফরমাশ কেন রে বাপু ?" অগত্যা সবাইকে অপেক্ষা করতে হল। বেজুনীর কথার উপর আর কথা চলে না।

রাত্রে ডোমের বাজনা বাজিয়ে নাচ হল। সবাই নাচল।

অর্ধেক রাত। নেশার ঘোরে লোকেরা লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে। জংজই আর পুবুলি ক্লান্ত হয়ে দল থেকে বেরিয়ে বাইরে এল। গাঁয়ের মাঝখানে আলো জলছে, তার চারি পাশে মিশ-কালো অন্ধকার রাত। থেকে থেকে হুহু করে বাতাস বইছে; পাহাড়ের উপরে এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের শব্দ ভেসে আসছে। চইত পরব আসছে, তারই আগমনীর বাজনা বাজছে।

গাঁয়ের মধ্যে হইচইয়ের শব্দ উঠছে, নাচের গর্জন। ঘরে যারা রয়েছে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জংজই বলল, "ভারী সুন্দর রাতটি হয়েছে লো, অনেক দিন পরে আজ নাচ—"

"হ্যাঁ," পুবুলি বলল, "কিন্তু সেই রাতের মতো রাত আর ফিরে আসবে না। কি সুন্দর জোৎস্না ছিল সে রাতে, আর আজ কেবল অন্ধকার।"

"সেদিনকার জোয়ানরাও ভারী মজার ছিল, হাসিয়ে হাসিয়ে পেট ফাটিয়ে দিয়েছিল। কই আর তো তারা এল না ?"

"সে কোথায়—কত দূর" পুবুলি বলল, "পুয়ুর বাপের বাড়ির গ্রাম মিটিং। সেবার নেমন্তন্ন করা হয়েছিল তাই না এসেছিল। রোজ রোজ কি আর আসবে তারা ?"

পুবুলির মনটা ভারী হয়ে উঠল, এ-প্রশ্নটা যেন তারই আপন অন্তরের, আর তার জবাবটাও। তার মধ্যে শান্তি নেই।

"বলবি একটা কথা, পুবুলি ? এই যে হাগুঁণা, এ তো নিশ্চয়ই তোর জন্যই এসেছে, তা তুই তার ঘরে যাচ্ছিস্ কবে ?"

"ধেৎ !"

"ধেৎ কেন ? খুব ভালো হবে পুবুলি, কেমন চনমনে ছেলে একখানা হয়েছে—মনে মনে জানছিস কি আর না !"

"তুই খালি আজে বাজে বকছিস'। নিশ্চয়ই তোর আবার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে, চল্, ফিরে চল্।"

জংজই বারবার হাগুঁণার কথা পাড়তে লাগল, কিন্তু পুবুলি কেবলই

এড়িয়ে যায়। দুজনে ফিরে চলল। পাণ্ডু ডিসারী নিজের ঘরের সামনে আধশোয়া ভাবে আকাশের দিকে মুখ করে বসে তারা দেখছে আর ধুঙ্গিআ টানছে। জংজই ডাকল—"ডিসারী—"

ডিসারী চমকে উঠল—"অন্ধকারে কি দুষ্টুমি করতে গিয়েছিলি রে ছুঁড়িরা? এদিকে যে গাঁয়ে নাচ হচ্ছে।"

"আমরা চুরি করতে বেরিয়েছি, ডিসারী," বললে জংজই।

"কাকে চুরি করে এনেছিস? সে কই?"

"তোকেই চুরি করব, ডিসারী।"

ডিসারী হাসল, বলল, "আমি বুড়ো মানুষ, না আছে রক্ত না আছে মাংস। আর যেটুকুও বা আছে তার খবরদারি করবার জন্য বসে আছে লাঠি নিয়ে ঘরের ডাইনী। কোন দিকে গিয়েছিলি?"

"ভারী বিশ্রী রাতটা, ডিসারী." পুবুলি বলল, "বেজায় গরম।"

"তোরা বলছিস বিশ্রী রাত, আমি বলছি ভালো রাত। এই দেখনা আদ্রা যোগ পড়েছে, যা খুঁজবি তাই পাবি।"

"সত্যি নাকি ডিসারী?" ঠাট্টা করে বলল জংজই, "যা খুঁজব তাই পাওয়া যাবে? হারানো গরু পাওয়া যাবে?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ডিসারী হেসে বলল, "কেবল হারানো গরু? হারানো মানুষও ডাক দিলেই কাছে এসে দাঁড়াবে। আছে কেউ তেমন? ডাকব?"

জংজই অপ্রস্তুত। তার বয়সে অনেক মেয়েরই হারানো মানুষ থাকে, অন্ধকার রাতে তাদের হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে ইচ্ছে করে। পুবুলি বলল, "আচ্ছা ডিসারী দাদু, সারা রাত ধরে এমনি বাইরে বসে তুই যে উপরের দিকে চেয়ে থাকিস—কি এত দেখিস, ডিসারী দাদু?"

"এত বড ব্যাপারটা কি বলে তোকে বোঝাব গো মেয়ে—?"

"সত্যিই কি এর মধ্যে কিছু আছে?"

"কিছু নেই? দেখ্‌তো কেমন সুন্দর আঁধার রাত, আজ চারিদিক অন্ধকার, অন্ধকার"—মধু খাওয়ার মতো মুখ করে ডিসারী বলল, "অন্ধকার —কি সুন্দর!" উপরের দিকে হাত তুলে বলল, "আজ ওঁদের রাত। সব বড় বডরা আজ বেরিয়েছেন—সাতাশ জনের সবাই: আসনি, বারনি,

কার্তিকা, রোহিনী, মেড়িংশিরা, আদ্রা, ব্‌ডেতাই, পুষুবেলি, সালূপা, মাগা, রাগুা, আন্তা; উত্‌রা, সঅদা, লদা, জেটি, মুড়া, সুড়া, সাত্‌বিষি—কত বলব, বুড়ো মানুষ। সকলেই ওখানে বেরিয়েছেন, সভা করছেন, আর আমি তাঁদের পূজারী। এমন রাতে অজ্ঞ লোকেই না মদ খাবে, নাচবে, ঘরের ভিতর পড়ে ঘুমতে থাকবে—আমি কি করে ঘুমিয়ে থাকব ?

"অন্ধকার, তাল তাল, চাপ চাপ অন্ধকার, আর উপরে যে যার এক একটি করে আগুন জ্বেলে বসে সকলে সভা কবছেন—কি সুন্দর।"

গল্পবাজ বুড়োর কাছে বসে থাকতে বিরক্ত লাগে। ওদিকে ডং ডং বাজনা বাজছে, হাসি গান ছলছলিয়ে আসছে। বাজনার তালে তালে পা আপনা থেকেই নেচে উঠছে। জংজই বলল, "এত কথা জানিস ডিসারী বুড়ো, বল্‌ তো আমাদের পুবুলিকে হাগুর্ণা এবার নিয়ে যাবে কিনা, এত দলবল নিয়ে এসেছ যে ?"

"হাগুর্ণা। বন্দিকারের সাওতা!" হো হো করে ডিসারী হেসে বলল, "হাগুর্ণা এই ছুঁড়ীকে নিতে এসেছে ? না—জিগোস কর ওকে, অ-ই ওকে, ওর নাম বডেতাই ?" ডিসারী বুড়ো আরো খানিক হাসলে। বলল, "বডেতাই যোগে যার জন্ম তার বিয়েতে আছে দুঃখ ভোগ।" গম্ভীর হয়ে বলল, "বড দুঃখী বে সে, বড দুঃখী। পুবুলি ছুঁড়ীকে সে পাবে না, বডেতাই-এর হুকুম নেই।"

মাঝ রাতে কোন প্রেতলোক থেকে এসে পৌঁছাল এই জবাব : নিষ্ঠুর, নির্মম, করুণার কোনো স্থান নেই তাতে। যা কিছু মানুষ দেখে, বোঝে, সবই যেন ফাঁকা হাওয়া, তাব কোনো রূপরেখা নেই, তাব মধ্যে কোনো বস্তু নেই, শুধু বয়ে চলেছে একদিক থেকে আর একদিকে, সব কিছু মিথ্যে : আর সত্যি কেবল এই অন্ধকার, এই তাবা, আর ডিসারী বুড়োর প্রলাপ। রাতের পাখীরা কিচিবমিচিব করে উঠল, মেয়ে দু'জন চমকে উঠল। অন্ধকার রাতে দৈববাণী বড অশুভ শোনাল। দুজনে দৌডতে দৌডতে চলে গেল নাচের দিকে।

ডিসারী বুড়ো হেসে বললে—"মূর্খ—"। তারপব আবার শান্তভাবে তারা পড়ায় মন দিল।

॥ চৌত্রিশ ॥

নাচের শেষে হাণ্ডা পুবুলির কাছে এল, দুই হাতের পাতা বাড়িয়ে বলল, "ও 'মুনি'—"

"কি ?"

"আমার সঙ্গে খেলবি না ?"

"খেললাম যে ? এত নাচলাম, আর কি ?"

হাণ্ডা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পুবুলি বললে, "যাই, ভারী ঘুম পাচ্ছে।"

পুবুলি চলে যায়, হাণ্ডা চেঁচিয়ে বলল, "কাল আমি চলে যাব, শুনছিস্ ? কাল আমি চলে যাব—"

পুবুলি চলে যাচ্ছে। হাণ্ডার খারাপ লাগল। অনেক কিছু বলার ছিল তার। ভাবল, তাহলে কি বিয়ের কথা বললে হত ? কিন্তু বিয়ে করবে বলে তো সে এখনো নিশ্চয় করেনি, কি বলত তাহলে ? পুবুলি তো এমন করে পালায় না। হয়তো অভিমান করেছে, বাপ মারা গেছে অথচ হাণ্ডা খোঁজ-খবর নিতে আসেনি বলে। ক্ষণিকের অভিমান, তার উপরে জোর আছে বলেই না সে অভিমান করেছে। সে কাজের মানুষ, অভিমান কি ? পুবুলিটা চিরকালই ছিঁচকাদুনী ছিল, অল্পেই রাগে, আবার অল্পেই বোঝে। এই সব ভেবে হাণ্ডা নিজেকে প্রবোধ দিল। তারও চোখ ঢুলে আসছে, পথের ক্লান্তির উপরে এই নাচ। ভাবল, চইত পরব আসছে, তখন দেখা যাবে।

পুবুলি যখন ঘরে ফিরল তখনও পুযু শোয়নি। তার চোখে ঘুম নেই। অন্ধকার রাত, নাচের শব্দ, ছেলেকে নিয়ে সে একলা ঘরে। ছেলে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নিজের সমস্ত ধাংড়ীপনার প্রতিনিধি হয়ে পুবুলি বেরিয়েছে, গেছে যেখানে মানুষ হওয়া সার্থক হয়, যেখানে দেওয়া নেওয়ার মহোৎসব, যেখানে আঁধারে আঁধারে চির যৌবনের ফল্গুধারা।

আজ তার কিছু নেই, কেবল অন্ধকারের ভাগী সে।

পুবুলি এল। "কি লো, ঘুমস্‌নি নাকি?"

"ভারী গরম।"

"হ্যাঁ।"

পুযুর মন আরো পুড়তে লাগল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

গাঁয়ের শেষে বীমা কন্ধের একজন থাকা ঘরের চওড়া বারান্দায় বন্দিকারের লোকেরা শুয়ে আছে। ও দিকে একটা মহুয়া গাছ, শেষ রাতে তার সুগন্ধ আসছে। হাগুর্ণা ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষ রাতে সে স্বপ্ন দেখল যে সে নিজের গাঁয়ের কাছে 'মাহাল' গাছের তলায় একটা উই ঢিপির উপর বসে আছে। তার মাথায় দুটো শিং বেরিয়েছে, আর দু' কাঁধের কাছে দুটো ডানা গজিয়েছে। সেই উঁচু আসনে সে বসে আছে আর জোড় হাতে কত অল্পবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে, অতি করুণভাবে মিনতি করছে। তাদের মধ্যে পুবুলিও আছে, সকলের সামনে। আর হাগুর্ণা বার বার গর্জন করে হাঁকছে—"নাঃ—নাঃ—নাঃ।"

কিসের জন্য মিনতি করছে তারা? কি নিষ্ফল অনুরোধ এক সুরে কেঁপে উঠছে এতগুলি কোমল কণ্ঠে? হাগুর্ণা তার ডানা ঝাড়া দিল, তার ফড়ফড় শব্দ তার নিজের কানে বাজল, সে ভাবল এবার সে ঠিক এখান থেকে উড়ে চলে যাবে। ঠিক সেই সময়ে বুকফাটা 'ওঃ। ওঃ।' চীৎকার করতে করতে দুই হাত বাড়িয়ে পুবুলি তার কাছে ছুটে এল। হাগুর্ণা সরে যেতে পারল না। পুবুলির গরম নিশ্বাস তার গালে মুখে লাগছে, পুবুলির দু'চোখ দিয়ে জল ঝরছে, হাগুর্ণা তার বীরপুরুষের মতো ভঙ্গী একটু নরম করে চেয়ে আছে, চতুর্দিকে কেবল উঃ—আঃ, উঃ—আঃ, আর গরম গরম—প্রাণের ভিতরকার উষ্ণ আবেগ।

হাগুর্ণার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সব যেন সত্যি বলে মনে হচ্ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কোথায় গেল সব মেয়েরা?—চেনা আধচেনা তরুণীরা? কেবল অন্ধকার—পাতলা হয়ে এসেছে, আর আসেপাশেই

কোথায় যেন সেই মর্মভেদী হাহাকার—ও: ও:, উ: উ:। স্বপ্নের নেশা কেটে গেল। ভোর হয় হয়। বারান্দার নীচে তাল পাকানো অন্ধকার, আর জগতের যত করুণ বেদনা সব যেন জমে আছে তারই শোবার বারান্দার নীচে।

এক লাফে হার্গুর্ণা তার বর্শা হাতে করে কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে উঠে দাঁড়াল—হঠাৎ একটা কিছু ঘটলে বনের মানুষ যেমন সজাগ হয়ে ওঠে। নীচের দিকে তাকাতেই তার হুঁশ হল। উঁচু বারান্দায় সে ঘুমিয়েছিল ঠিকই বটে, কিন্তু নীচে পুবুলি নয়—একটা প্রকাণ্ড ভালুক। দুই হাত দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে সে বারান্দার উপরের ধার পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছে আর যেন বড় দুঃখে গোঙাচ্ছে।

শোরগোল করে হার্গুর্ণা সবাইকে তুলল—"ওড়ে সোই—জাম্বা—জাম্বা—(ওরে ভাই, ভালুক)" হইহই করে সবাই তাড়া করে গেল, ভালুক পালাল। তখন শুরু হল হাসির পালা। বিপদ কেটে গেলেই বনবাসীদের হাসি বেরোয়। এমনি করে সেদিন ভোর হল। চৈত্রের আরম্ভেও পাহাড়ী দেশে শেষ রাতে ঠাণ্ডা পড়ে। আগুন জ্বালা হল, গল্প শুরু হল। যখন সকাল হব হব করছে তখন সে দিক দিয়ে গ্রামের যুবতীরা বাইরে বেরুল। হার্গুর্ণা ভাবতে লাগল কেন এখানে ছুটে এসেছে সে। ভোর বেলাকার অপ্রীতিকর অনুভূতির পর তার মনের ভিতরটা করকর করছিল। সকালেই ভালুকের মুখ দেখল, হয়তো সারা দিনটাই নিষ্ফল যাবে। কয়েকটা মোষ মরল, প্রথা অনুসারে বেজুণী নাচল, কাজ ফুরাল। তার পরেও আবার ব্যাপারটাকে খুঁড়ে খুচিয়ে এতটা পথ পেরিয়ে ভিন গাঁয়ে আসবার কিছু দরকার ছিল না। কিন্তু কোনো কিছু করবার সময় দরকার অদরকারের হুঁশ কঙ্কের হয় না। পাঁচজন বসে, সবাই এসে জড় হয়, যা হোক একটা স্থির হয়, সেই মতোই কাজ হয়। তারপর দৌড়-ঝাঁপ করে দম বেরিয়ে কাবু হলে সবাই আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে যায়। প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে এমনি বাজে কাজ অনেকবার আসে। একজন হয়তো শুধু একটি পায়রা কিনতে গিয়ে এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম, ও গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বা গেছে ইঁদুর ধরতে। টাঙ্গি কাঁধে গান গাইতে গাইতে এক পাক বেড়িয়ে আসাও একটা কাজ।

শলপু কন্ধ বলল, "বুড়ো সাঁওতা এই গাঁয়ে কি সুন্দর মানাত, আজ কোথায় সে ?"

সোভেনা বলল, "বুড়োরা কি চির দিনই থাকবে ? তাহলে তো তাদের 'ভুমা' (আত্মা) নতুন জন্ম নিত না, নতুন ছেলেপিলে হত না। মানুষে বিয়ে করে বসে বসে কেবল অপেক্ষাই করত, ছেলেপিলে বন্ধ—এই তো, না কি ?"

শলপু কন্ধ বলল, "মানলাম সত্যি কথা, তা বলে এই সব কথা নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার কি ? তুই তো আর বিয়ে করবার কথায় মন দিস্ না।"

হাগুর্ণা, বলল, "মন দিলেই কি বিয়ে হয়ে যায় ?"

শলপু—"তবে আর কেমন করে হয় ?"

হাগুর্ণা—"আঃ, সে যখন যা হবার তাই হয়।"

টিংগু—"সত্যিই সাঁওতা, আসাই হয়েছে যখন এত দূর, তখন তোর বিয়েরও একটা পাকাপাকি করে গেলে হত, সাঁওতা। কেবল বেজুণী নাচিয়েই ফিরব নাকি ?"

শলপু—"এখন আর কে পাকাপাকি করবে, সাঁওতা তো মরে গেল।"

সোভেনা—"ছুকরীকে জিগোস করেছিস্ ? নয় তো চল্ তাকে তুলে নিয়ে যাই। সমাজে তো এমনি চলন আছেই। ছুকরীর মত থাকলে আমরা তুলে নিয়ে চলে যাব। আমাদের কে কি করবে ?"

শলপু—"অমন 'উডুলিআ' (পালিয়ে গিয়ে নিয়ে) ঢঙের বিয়ে করবে নিজে গ্রামের সাঁওতা হয়ে ? অমন বিয়ে তো করে গরীবেরা, নয় তো যারা কন্যাপক্ষের মত পায় না। এই দুয়ের মধ্যে আমাদের সাঁওতা কোন্টা যে লুকিয়ে-চুরিয়ে বিয়ে করবে ? কিসের জন্য ? ভালোভাবে পাঁচজনকে ডেকে বলে কয়ে মেয়ে নিলে কেউ কি বারণ করবে ?"

টিংগু—"সত্যি, সত্যি।"

শলপু—"সত্যি সত্যি নয় তো কি তুই মিথ্যে মিথ্যে ভেবেছিলি ? ওরে ছোকরা, অনেক দিন তো কাটালি ধাংড়ী নাচিয়ে নাচিয়ে, এই বার দেখে শুনে পছন্দ কর্, বিয়ে কর্, ঘর কর্। কনে বাছ্, মন স্থির কর্। যাতে পরে আর কাউকে দেখে মন হাঁই পাঁই না করে। তারপর, আমরা যে

ক'জন বুড়ো এখনো নড়নড় করছি—তোরা তোদের যেমন আনন্দ করবার কর্, আমাদের কেবল একবারটি বল্, আমরা আমাদের রীতি অনুযায়ী যা কর্তব্য তা তোদের বলে দেব। তোদের জন্য যেন আমাদের কথা শুনতে না হয় বা আমাদের জন্য তোদের কথা শুনতে না হয়।"

হাণ্ডর্ণা সাঁওতা এই সদুক্তির কোনো উত্তর দিল না। একবার ভাবে পুবুলিকে বিয়ে করবে, আবার ভাবে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে একজনের কাছে বাঁধা পড়ে নিজের বেপরোয়া 'ধাংড়া'পনা থেকে 'ডোক্রা'পনায় ('ডোক্রা', অর্থাৎ বিবাহিত, বুড়ো) নেমে পড়তে তার মন সায় দেয় না। এই মুক্ত জীবনটাকে নিয়ে আরো কিছুদিন বরের খেলা খেলে যাওয়া ভালো। এত তাড়া কিসের ?

খেলা খেলে যাওয়াই ভালো।

ঠিক। কিন্তু খেলা খেলতে খেলতে যদি ওদিকে পুবুলি হাত থেকে ফস্‌কে যায় ? যদি তেমনি আর যত চেনা জানা মেয়ে আছে সবাই চলে যায় নিজেদের ইচ্ছে মতো ? মন আর সব সয়, কেবল ঐটুকু সয় না—যে তার নিজের অধিকার জারি করবার মতো গুটি চার পাঁচ তার নেই। ঐ টুকু মন চায় না যে ভোগ না হোক, কিন্তু ভোগের সামগ্রীও থাকবে না। ধরতে চায় না, কিন্তু ধরার জিনিস ছেড়ে চলে গেলে মন হাহাকার করে, দোটানার মধ্যে পড়ে হয়তো ভাবে যা হাতছাড়া হয়ে গেল তাই ছিল তার সবচেয়ে ভালো, তার চেয়ে ভালো আর হবে না।

সকালে খুব ভরসা করে সে পুবুলির ঝোরা থেকে ফেরবার পথে এক গাছতলায় অপেক্ষা করে রইল। পুবুলির সঙ্গে একটু কথা বলা তার নিতান্ত দরকার। পুবুলি ঠিক ঐ পথ দিয়েই ফিরল, কিন্তু একলা নয়। সঙ্গে এক পাল মেয়ে। চড়াইয়ের পথে উপর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে তারা পুবুলিকে ঘিরে ধরে ঠেলা দিয়ে দিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করল—"দেখ্ লো দেখ্, দাঁড়িয়ে আছে।" টিট গান ধরল। হাণ্ডর্ণা অপ্রস্তুত হয়ে গানের পাল্টা জবাব খুঁজে পেল না। ভাবল ধেৎ, পরে দেখা যাবে।

'পরে দেখা যাবে' 'পরে দেখা যাবে' করতে করতে সময় বয়ে গেল, সুযোগ আর এল না।

॥ ছত্রিশ ॥

লোকের ভিড় জমল, গ্রামের খোলা জায়গায় বেজুণী নাচল, এমনি করেই তার গৌরবের দিন আসে, যখন তার প্রাধান্য স্বীকার করে ভিন গাঁয়ের লোক আসে তার সাহায্য ভিক্ষা করতে। বাজনা বাজল, বেজুণী নাচল। কন্ধদের ধারণায় ভর করা দেবতা বেজুনীর মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

দেবতা—সে সর্বত্র। তার অবয়ব এই আকাশ, মানুষের বহু ঊর্ধ্বে। সে করে যায়, মানুষ সয়ে যায়। কিন্তু মানুষ ভাবে তার আপন উপায়ের দ্বারা সে দেবতাকে আটকে গোষ্ঠীর সামনে এনে দাঁড করায়,—দেবতা বর দেবে, পথ বলে দেবে, তাদের কোন কর্মের কোন ফল তাই বুঝিয়ে তার হিসাব নিকাশ করবে, কৈফিয়ত দেবে। সেই উপায়ের জন্য মানুষ সব উপাদান সংগ্রহ করে: নিজের মনের বিশ্বাস, পূজা, বলিদান, যত ক্রিয়াকর্ম।

সাঁওতা শুধাল, "দেবতা, আমার মোষ কেন মরল?"

বেজুণী জবাব দিল, "কেন কেউ মরে? আয়ু পূর্ণ হয় বলেই না।"

"কে মারল, দেবতা? হাতীর মতো ছয়-ছয়টি মহিষ আমার গাঁয়ের, কে মেরে ফেলল?"

বেজুণী হাসল। বলল, "তুই পাগল হলি বাছা? কেউ কি মারতে পারে? কেউ কি কিছুই করতে পারে? সব আমিই করি। আমি বাঁচাই, আমিই মারি, সব আমি।"

"বলে দে দেবতা, কে আমাদের এমন দণ্ড দিলে? নিজের গাঁয়ে খোঁজ খবর করলাম, বেজুণী নাচালাম, সেখানে তুই বললি, 'আমি বলব না, আমার ইচ্ছে।' এখন এখানে জিগ্যেস করছি। তাও এমনি করে আমায় ধোঁকা দিচ্ছিস, যা চাইবি তোর কাছে বলি দেব, তোকে কোটি কোটি নমস্কার, বলে দে, কার হাত দিয়ে আমার মোষ মারলি, কেন মারলি, তোর পূজায় কি দোষ হল—"

বনের মানুষ তর্ক বোঝে না, কেবল বোঝে সাফ সাফ দুটি কথা, নিদানের কথা—কে? কেন?

বেজুণী আপন খেয়ালে সাত পাক নাচল, চৈত্রের ঘূর্ণি হাওয়ার মতো—যেন দেবতা দেখাচ্ছে তার আপন স্বরূপ, নিজের খেয়াল খুশি মতো যেমন করে সে দুই কুল খেয়ে হেলতে দুলতে চলে যায় তাই দেখাচ্ছে। সকলে আশান্বিত হয়ে রইল, অপেক্ষা করে রইল। বড় ভয়ঙ্কর, বুড়ী বেজুণীর উপর নাচের দেবতা ভর করেছে, শ্মশানে কাঁপা মাথার খুলির ভিতরে সোঁ সোঁ করা বাতাসের মতো। সেখানে ধুনোর ধোঁয়া, 'মুরুজ' (রাঙ্গা খড়ি-মাটির গুঁড়োর আলপনা), ফুল, ভেলার ফল, সেখানে বিকট বাদ্য কেবল মনে করিয়ে দেয় সৃষ্টির শেষ দিনের ধ্বংসলীলার কথা, মাঝখানে উত্তাল অসামাল বেজুণী এক নর কঙ্কাল, বিকট বীভৎস। কেবল আগুনের মতো উজ্জ্বল দুটো চোখ আর অসম্ভব ভ্রূকুটি। বেজুণীর হুঁশ নেই, দেবতার হুঁশ থাকে না। যা অসম্ভব, অদ্ভুত, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে, তাকেই মানুষ নিজের সামনে খাড়া করে রাখে অসাধারণতার মাপকাঠির মতো, তাকেই করে দেবতা।

সবাই ঘিরে বসে ছিল। হয়তো এবার বেজুণী জবাব দেবে, এক কথায় পরিষ্কার হয়ে যাবে বন্দিকারের অনিষ্টের জন্য দায়ী কে। পাণ্ডু জানী রোদের দিকে তাকিয়ে 'যোগ' মেলাচ্ছিল। সময় বুঝে হাত জোড করে সে শুধাল, "বল্ বেজুণী, বল্ দেবতা, কে মেরেছে বন্দিকারের মহিষ? অনেক আশা করে সে গাঁয়ের লোকেরা ছুটে এসেছে তোর পায়ের কাছে, বলে দে কেন মরল।"

তেমনি খেয়াল-শূন্য ভাবেই বেজুণী বলল, "তোরা মানুষরা প্রত্যেক কথায় আঁধার বনের মায়ার কথা জিজ্ঞেস করে বসিস্। সর্বদাই তোদের ইচ্ছে কেমন করে দেবতার হাত থেকে দৈবের চাবিকাঠি নিজের হাতে নেওয়া যায়। সবই তো তোদের উপুড় করে ঢেলে দিয়েছি বাছারা, সব ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে একটু খানি কেবল রেখেছি—একেবারে নীচেকার তলানিটুকু তাও তোরা নিয়ে নিতে চাস্—

"দেখ্ কি আছে আর আমার কাছে, কি আছে? শূন্য ঝুলির মধ্যে শুকনো চিমসে এক টুকরো জড়ি বুটি, কোন কালের পুরানো। সেই আমার

'কাউঁরি হাড়'*, তাও রেখেছি তোদেরি জন্য. তোরা তার ব্যবহার বুঝবি না।

"যদি সেটুকুও আজ আমার ঝলি থেকে তোদের হাতে গিয়ে পড়ে আর তোরা জানতে পারিস্ কেন—কি—কেমন করে, তাহলে হয়তো আলোর পর আঁধার রাত্রি আসবে না, চাঁদের আলোয় উজ্জ্বলও হয়ে উঠবে না এই বনের পৃথ্বী, সব পাওয়ার নিরাশায়, সুখের পূর্ণতায় তোরা ডুবে মরবি মধুর হাঁড়িতে পিঁপড়ের মতো। তোরা আমার পূজা করিস্. আমাকে ভয় করিস্, কিন্তু কেবল ভয়ই তো নয়, নিশ্চিন্ত নির্ভর। অজানার সুখস্বপ্ন অজানার মায়া এইটুকুই তোদের সুখের শয্যা, ওটুকু গেলে কেমন করে কাটবে খালি পাথরের উপরে শুয়ে আঁধার শীতের রাত, যখন তারার ঝিকিমিকিও থাকবে না, থাকবে না দূরের গাছের আডালে জ্বলজ্বল করা কারও হাতের দড়ির আগুনটুকু, কেবল হু হু বাতাস।

"সব তোরা জেনে নিতে চাস্. সব জানলে বাঁচবার মোহ টুটে যাবে, সব করতে পারলে গডবার পুঁজি শেষ হয়ে যাবে, তার পর নীরব নীরস কঠিন দিন গোনা ভাল লাগবে তো ?

"না না, আমার বাছারা, 'আমি 'দমু' আমি 'দর্তনী', আমার গডা এই সংসার এমনিভাবেই চলতে থাকুক, তাতে সুখ দুঃখের রঙ লাগতে থাকুক, আলো আঁধার ছিটিয়ে ছিটিযে পডতে থাকুক পাশাপাশি।

"না বাছারা, না, আমি তোদেব সুখের জন্য দায়ী—তোরা নিবোধ, আমি বলব না, বলব না—"

সবাই হাঁ ক'রে তাকিয়ে শুনছিল। বন্দিকারের লোকেরা বড অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল, কোথায় বা তাদের প্রশ্নের জবাব আর কোথায় বা এই সমস্ত গোলমেলে কথা। এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল—কেবল এড়িয়ে যাওয়া, অস্বীকার করা। সকলেই উসখুস করছিল এক শল্‌পু কন্ধ ছাড়া। খুব নিবিষ্ট মনে বেজুণীর দিকে চেয়ে সে ঘাড় নাড়ছিল বার বার। কত রঙের কত রসের ছবি ঢেউয়ের মতো খেলে যাচ্ছিল তার মুখের উপর। বেজুণীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বার বার মাথা নেড়ে শল্‌পু বলে উঠছিল—"আহা হা, আহা হা!" কাছেই একটু ঢিবি মতো জায়গায় বসে পাণ্ডু

* কাউঁরি হাড়-অ—কুমারীর অস্থি, যাদুশক্তি সম্পন্ন এই প্রসিদ্ধি।

ভিসারী ভিন গাঁয়ের লোকেদের উপরে নিজের গাঁয়ের বেজুণীর ভাষণের ফল কি হয় লক্ষ করছিল। শল্‌পু কন্ধের তদ্‌গত অবস্থা দেখে আত্মপ্রসাদে তার চোখ আর কপাল উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

হাগুর্ণা আর সামলাতে পারল না, সোভেনাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "হাজুঃ—হাজুঃ (চল্‌—চল্‌), আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, কি বকে যাচ্ছে এ সব, মাথা নেই মুণ্ডু নেই—কোথাকার কথা কোথায় এনে ফেলছে, কি বা তার মানে, নয় তো মিথ্যেই কি আর ভোর বেলাতেই ভাল্লুকের মুখ দেখে উঠেছে মানুষ! হাজুঃ—হাজুঃ, পাগল হয়ে গেছে ও।"

সোভেনা হাসল। বলল, "বুড়ী একেবারে একটা পাগলী, দেবতা ভর করেছে না পাগলামি চেপেছে। এমন বেকুব এ গাঁয়ের লোকেরা, এই পাগলীর কপচানি শোনবার জন্য এত ব্যস্ত। মিথ্যে মানুষ এত কষ্ট করে এই 'নিস্তা' (বাজে) গাঁয়ে ছুটে এল। কাল রাতে যা মশার কামড়, ছ্যাঃ।"

হাগুর্ণা বলল, "চল, যাই, আর দেরি করা কেন? কাল সারা রাত কষ্ট ভোগ, সকালে ভাল্লুক, দুপুরে এই পাগলী, এর পর আরো কি আছে কে জানে! এ গ্রাম থেকে সবে পড়াই ভাল—"

সোভেনা বলল, "সত্যি কথা। এখানে জল আছে কিন্তু খাওয়া যায় না, ফুল আছে কিন্তু গন্ধ নেই, মানুষ আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই—দেখ্‌, দেখ্‌, কেমন লাফাচ্ছে, ছেলেপিলেরা দেখলে দাঁত কপাটি লাগবে।"

তার এমনি চেঁচিয়ে কথা বলায় বিরক্ত হয়ে শল্‌পু কথা বলল, "অন্যমনস্ক হয়ে দেবতার কোপ মাথায় টেনে নিস্‌ না ছোকরারা, শোন্‌ শোন্‌। কি সুন্দর —দেখ্‌—"

"বুড়ীর নাচ তুই দেখ্‌ দাদু, আমাদের দরকার নেই।"

"হ্যাঁ, তোদের ধাংড়ীর নাচ দরকার—যা, যা।"

বেজুণী অনেক কথাই বকে গেল। বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে বলল, "বন্দিকারের মহিষ মানুষে মারেনি, দেবতা রোগ পাঠিয়ে মেরেছে। এতে কারো হাত নেই।" বেজুণীর উপরে দেবতার ভর তখনও রয়েছে, শল্‌পু কন্ধ উঠতে নারাজ। ছোকরারা উঠে গেল। দিউড়ু সাঁওতার বাড়িতে তাদের খাওয়া-দাওয়া হবে। বারান্দায় পুয়ু বসে ছিল। পুবুলিও।

পুয়ু মনে মনে অস্থির হচ্ছিল—পুবুলির বিয়ের কোনো কথাই উঠল না। বন্দিকারের লোকেরা এসে গেল, কাজের ছুতো ক'রে পুবুলি ভিতরে চলে গেল। পুয়ু বলল, "দেখলে? তোমাদের দেখে লজ্জা হচ্ছে! ওলো, এরা তো তোর আপন লোক। ঘর তো পর। ঘরে ক'দিন ঢুকে বসে থাকবি?"

জামিরি কন্ধের বুড়ী গিন্নী এসে উপস্থিত হল। হাগুর্ণাকে লক্ষ্য করে বলল, "আমাদের মেয়েদের তোরা নিয়ে যাবি আর আমরা তাদের মা, আমাদের সঙ্গে দুটো ভালো-মন্দ কথা বলবি না?"

সোভেনা মস্করা করে বলল, "আমাদের বাপেরা থাকলে না কথা বলত!"

পুয়ু বলল, "কি সব চুপি চুপি কথা হয়ে গেল তোমাদের? আমাদের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাবে না তো?"

হাগুর্ণা একথার উত্তর দিল না, শুধু হাসল। জামিরির বুড়ী বলল, "আহা, আজ যদি সরবু সাঁওতা থাকত রে, কত স্নেহ করত সে এই হাগুর্ণাকে। নইলে কি আর খামকাই সে ঠিক করেছিল: একটি মাত্র মেয়ে তার, তাকে এ বিয়ে করবে?"

তাই শুনে সোভেনা আর টিংগু ঘরের ভিতরে উদ্দেশ করে ডাক পাড়লে—"কাঁকড়ার মতো গর্তে লুকোলে চলবে না, বেরও বেরও—!"

"কি রে সাঁওতা, কথা বলিস্ না যে?"

"হ্যাঃ, এত লোকের সামনে কি কথা বলা যায়? কথা যেখানে হবে সেখানে—"

অনর্গল ঠাট্টা-তামাশা চলল। হাগুর্ণা আর পুবুলির মুখ যেন সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। তারা এ ওকে আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এই নীরবতার আড়ালে দুজনের দুজনকে কত রকমে বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা, কত সাত পাঁচ ভাবা; বাইরে চুপচাপ, কারো মুখে কথা নেই। শেষে হাগুর্ণা ভরসা করে পুবুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা তো এলাম, তোমরা কবে যাবে আমাদের গ্রামে? এই চইতে এস।"

পুবুলি দরজায় হেলান দিয়ে দাঁতে নখ চিবোচ্ছিল। তার হয়ে পুয়ু বলল, "ওকে কেন জিজ্ঞেস করছ? নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো। তর সইছে না বুঝি?"

দিউড়ু বসেছিল, মিনিআপায়ুর জোয়ান ছেলেরা এসেছিল। হাগুর্ণা

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "না, আমি বলছিলাম কি অনেক সম্বর নেমেছে আমাদের বনে. লোকে বলছে কলাহাণ্ডির জঙ্গল থেকে 'বলিআ' কুকুরে (এক জাতির বুনো কুকুর) তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। তোমরা গেলে খুব শিকার হত, নাচ হত, বেড়ানোও হত।"

এমনি অনেক কথা হল। হাণ্ডর্ণার কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল কেবল, আর কিছু না। পুবুলির বিয়ের কথা পরিষ্কারভাবে কিছু স্থির হল না। তাছাড়া কন্ধ সমাজে বিয়ের কথা খুব বেশী পাকাপাকি করে স্থির হয়ও না। পরস্পরের সঙ্গে দেখা শোনা, পরস্পরকে ঠাউরে বোঝা, এসব হয়ে গিয়ে বিয়ে করা যখন একেবারে ঠিক হয়ে যায়, তখন উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধবদের বৈঠক বসে, মদ আর ধুঙ্গিআর আসর জমে. আর সেই আসরেই কথাটা পাড়া হয়। বরপক্ষ কন্যা মাগন করে আর কন্যাপক্ষের লোকেরা কন্যার জন্য 'ঝোলা' (পণ) মাগন করে. দুই পক্ষ পরস্পরের দাবি মেনে নেয়।

বেলা বাড়ল। বন্দিকারের লোকেরা উঠল। যাবার সময় হাণ্ডর্ণা সাওতা দিউড় সাঁওতাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেল—'নিশ্চয়ই আসবি. নিশ্চয়ই।"

বনদেশের মুক্ত প্রজাপতি, তারও ধরা দেবার ইচ্ছে হয়।

ঐ ওরা চলে যাচ্ছে—ঐ যে দূরে—পুবুলি একা দাঁড়িয়ে দেখছে। এই বার ওরা খাদের ভিতরে নামছে—কি সব তরিয়ে চলেছে—কেন জীবনভর মানুষের খালি তরতর—তরতর? এই—আর ওদের মাথা দেখা যায় না. পাহাড়ের আড়ালে পড়ল ওরা. পুবুলি দেখল। ওরা চলে গেল।

এক দৃষ্টে সে তাকিয়েছিল। কি বলছিল পাণ্ডু ডিসারী?—হাণ্ডর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে কখনো হবে না। পাণ্ডু ডিসারীর কথা এতক্ষণ পুবুলির মনে ছিল না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে কেবল দেখছিল। পাহাড় বন পেরিয়ে ভিন গাঁয়ের পুরুষ এসেছিল। তারা চলে গেল, হয়তো আর কখনো আসবে না।

এই ঘাটির উৎরাইয়ের পথে নেমে চলে গেল তার ছেলেবেলাকার একটি স্বপ্ন, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে ও মনে সে স্বপ্ন বেড়ে চলেছিল এত দিন ধরে. আজ মনে হচ্ছে যেন তার স্থান শূন্য করে দিয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল, আর আসবে না—আর আসবে না। হাণ্ডর্ণা তার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে গেল না, তার সঙ্গে কথা বলে গেল না. হাণ্ডর্ণা আর তার নয়—তার

নারী মন এই কথা তাকে নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিয়েছে, পুবুলির মনে বড় বাজল। সেই সঙ্গে আবার মনের ভিতর জেগে উঠল শিকারীর ছলা কলা—তাগুর্ণাকে সে পায়ে দলবে।

আবার পিছন পানে চেয়ে অন্তর আকুল হয়ে পিছু ডাকছিল—"আয় আয়, ফিরে আয়, আমি খেলব, আমি খেলব।" কিন্তু বাইরে কেবল নীরবতা, মুখ তালা বন্ধ।

তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। নারীর চরম অপমান ব্যর্থতা, তার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, শুকনো মুখে আনমনা হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল রোদের মধ্যে।

পাহাড়ের উপরের গাঁয়ে দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কন্ধ মেয়েটি, অলসভাবে চেয়ে আছে মহুয়া ফুলের গন্ধমাখা বাতাসে—বাইরে থেকে দেখতে এইটুকুই, নিত্যি দিনের একটি ছবি।

কিন্তু পুবুলির মন কাঁদছিল, তাগুর্ণার জন্য নয়, নিজের জন্য। আপন অন্তরে মনের মানুষের ছাঁচ ফাঁকা হয়ে বেড়ে ওঠে, বাহিরের চলন্ত মিছিলের মানুষ এক একটি করে এসে ছাঁচের সঙ্গে গরমিল হয়ে বাইরে থেকে চলে যায়, থাকে না…

উনিশ বছর হল তার, তবু সে অপূর্ণ।

কেউ থেকে যায় নি।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

গাঁয়ের ও-মুড়োয় সেই ঝরঝরে ঘরে, আগাছার জঙ্গলে ভরা উঠানে, হাতের উপর গাল রেখে সোনাদেঈ বসে বসে ভাবে কে কার, আর কে তার।

গায়ে তেমনি ফাটা ছেঁড়া কাপড়, মাথার চুল তেমনি আলুথালু, আর চাউনি—নিত্যিদিনের নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় জীবনের ভাবনায় ভারী ভারী।

কবে সে বাপের বাড়িতে হেসেছে, ফুল পরেছে, কত তরুণ আশাভরা প্রাণে চেয়ে বসে থেকেছে তার তখনকার সেই মুখের দিকে। তার পর জোয়ারে পড়ল ভাটা—অক্ষম স্বামী, বালমুণ্ডা।

প্রথম কিছু দিন গেল ভুল ভাঙতে। মন মাতে দেহ তাতে, আকুল হয়ে হাতড়ে হাতড়ে হাতে ওঠে কেবল বোবা বালি, অভাব মেটে না।

তারপর সকলের চলা-পথে পা আপনিই ঠিক ঠিক পড়তে থাকে, আর সব লুকিয়ে থাকে—যত ইচ্ছা, যত আবেগ। জীবনটা বেশ এক রকম ভুলেছিল সে। তার অক্ষম স্বামী, তার শ্বশুর, দেওর—তারা চোর হোক, ভিখারী হোক, তাদের ভাঙা-চোরা জোড়াতালি দেওয়া ঘর-সংসারের কেন্দ্র তো সে, সোনাদেঈ। এই সংসার চালানোর আনন্দ কিছু পাওয়ার আনন্দকে ছাপিয়ে ওঠে, প্রতিটি দিনের ভাব ভুলে থাকতে পারে সে।

এমনি কত পুরুষ, কত স্ত্রী।

কিন্তু কোন্ হাওয়ায় কবে কি উড়ে আসে অতীতের স্মারকপত্রের মতো, বলে—"আমি চিনেছি, চিনেছি তোকে"। কবে হয়তো বা জল হাওয়ার সুযোগ পেয়ে ঠুঁটো ডালেও বিনা পাতায় মুকুল ধরে, আবার মনে পড়ে সব কিছু, অতীতের প্রেত মাথায় চড়ে বসে।

যমুনা উজান বয়।

দিউড় সাঁওতা গ্রামের সাঁওতা। কারণে অকারণে ছল করে এসে বারিক বুড়োকে হাঁক দিয়ে দিয়ে যায়। ঠিক তার পরে পরেই সময় ঠাউরে ঠাউরে আসে লেঞ্জু কন্ধ চলে যায় না, সেইখানে থেকে যায় কিছুক্ষণ, সোনাদেঈয়ের কাছটিতে এসে অতি নরম সুরে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বলে। তার মুখে সর্বক্ষণ হাসি লেগেই থাকে, হেসে হেসেই সে সোনাদেঈয়ের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে চায়। পুরুষ মানুষ কখন খোঁজ-খবর নিতে আসে স্ত্রীলোক তা বোঝে, বলে দেবার দরকার হয় না। সোনাদেঈ বোঝে,—কেবল ভাবে সে কথা, মনের উপর থেকে একটার পর একটা খোলস ছাড়তে ছাড়তে শেষে বেরিয়ে আসে তার অতীতের মন, যখন সে কারো কাছে বাঁধা পড়েনি, যখন সে ছিল স্বয়ংবরা।

কেলার গ্রামের গর্জন ডোম ওরফে রাফাএল খ্রীষ্টান ছিল তার বাপ, প্রসিদ্ধ ডোম গোষ্ঠীর মেয়ে সে।

প্রাচীন কাল থেকেই ডোম জাতির পেশা গরু চুরি, সিঁদ কাটা, ঠকামি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি। এমন কি এদের মধ্যে প্রথা আছে যে ছেলে জন্মালে দেওয়ালে ফুটো করে তার মধ্যে তার মাথা ঢুকিয়ে এব

পূজা দেওয়া হয় যাতে ছেলেটি বড় হ'য়ে সিঁদ কাটায় ধুরন্ধর হয়। রামায়ণের যুগেও এদের এই বৃত্তি ছিল। সে যুগের ডোম বীর কবি রত্নাকর, পরে তিনি হলেন বাল্মীকি। তাঁরই নামানুসারে মৎস্যকুণ্ড উড়গড অঞ্চলের ডোমেরা নিজেদের বাল্মীকি বলে থাকে।

জাত ব্যবসার প্রসারের জন্য ডোমেদের ঘরকরনা, তাই ডোম ছেলেরা বিনা কাজে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে থাকে, ডোম মেয়েরা ছোট পসরা মাথায় নিয়ে এ-হাট ও-হাট ঘোরে, ডোম পুরুষেরা চাষবাসের কাজ করাকে একেবারেই অপছন্দ করে। এই চৌর্যবৃত্তির একটি উন্নততর প্রকাশ দল বেঁধে সশস্ত্র ডাকাতি, হাট লুঠ, গ্রাম লুঠ, রাহাজানি। পুলিসের শাসন শক্তিশালী হয়ে উঠবার পূর্ব পর্যন্ত এই জঙ্গলময় মাল দেশে অনেক ডাকাতের দল ছিল। হাটে যাবার পথে মাল বোঝাই গরুর গাড়ি লুঠ করত, গ্রামের লোকেরা মাঠে বা হাটে চলে গেলে এরা দিন দুপুরেই গ্রাম লুটপাট ক'রে আগুন লাগিয়ে চলে যেত। এই রকম করেই অনেক জায়গা এদের দখলে ছিল, গড বসিয়েছিল এরা, সেমিলিগুড়ার ভাঙা ডোম দুর্গ তার স্মারক। কন্ধদের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ হয়েছিল। ফুলবেড়া এবং পঞ্চড়ায় যুদ্ধও হয়েছিল, তাতে কন্ধরা ডোমেদের নিপাত করেছিল। কেলার গাঁ সেই পঞ্চড়া অঞ্চলে, কাকিনিগুম্মার কাছে।

ডোমেদের কল্পনাশক্তি প্রবল—প্রথম থেকেই। তার সঙ্গে মিশেছে সাধু পরিশ্রমের প্রতি অতি বিমুখ মনোভাব। এই দুই শক্তির মাঝখান দিয়ে ঠেলা খেয়ে ডোম আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে যায়। কথায় কথায় এদের মুখ দিয়ে মিথ্যে বেরোয়, বিকৃত মন বংশপরম্পরাক্রমে চলতে থাকে, ফন্দি-ফিকির করা হয়ে দাঁড়ায় এদের জাতিগত গুণ চোখ সব সময় পরের জিনিসের উপরে। চাষবাসে ইচ্ছে নেই, তাই গরু কেবল এদের ভোজ্যবস্তু—যেখানে সুবিধা পাও গরু চুরি করো, টাঙ্গির উলটো দিক দিয়ে দুই শিঙের মাঝখানে লাগাও এক ঘা, তারপর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রির জন্য তো অনেক হাট আছে। যে-ধন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করতে হয়নি তা ব্যয় করতেও তেমনি কষাকসি নেই। তাই কেবল দায়িত্বহীন ভোগের ঘর-করনা—ঘরে, বাইরে।

সর্বদাই মদ আর মাংস। পুরুষদের প্রকাণ্ড চেহারা, মুখের ভাব নৃশংস,

অবিশ্বাসী। মেয়েদের বাড়ন্ত গড়ন, তার ভাবে প্রকাশ পায় কেবল অলস পাশবিকতা। ঘর-গেরস্তালিতে কেবল ঝগড়াঝাঁটি, চেঁচামেচি। দাম্পত্যের ডোর অতি ক্ষীণ, অল্পেতেই ছিঁড়ে যায়, সহনশক্তির বড় অভাব। সব স্বামী বেঁচে থাকতেও বার বার একটার পর একটা বদলে বদলে ঘর করা—এমন দেখা যায় এই জাতিতে, চরিত্রহীনতার চরম এখানে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চেষ্টা আর উদ্দেশ্য কেবল ক্ষণিক সুখ। পুরুষেরা লম্পট, মেয়েরা স্বৈরিণী। পথ চলতে মেয়েরা সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হাব ভাব দেখিয়ে যায়, সর্বক্ষণ অস্থির, চঞ্চল। মিথ্যাচরণ এদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় হওয়াতে এদের কথাবার্তায় সর্বদা বাকচাতুরী ফুটে ওঠে, বেজায় কথা বলে এরা, উদ্দেশ্য কোনোরকমে অন্যের বিশ্বাস অর্জন করা, তাই এদের কথাবার্তা একটা অভিনয়। অত্যন্ত বিনয় অতিশয় ভক্তি দেখায়, আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরের কাছে অনেক নীচু সে হতে পারে। সে বিচিত্র, সে মায়াবী, মালদেশের কাক।

যখন পুলিসের প্রতাপ এত ভিতর পর্যন্ত আসেনি—অভাব ছিল না। কখন কোথা থেকে ভালো ভালো কাপড় চোপড় এসে পৌঁছাত, আর কখনো আর কিছু, প্রতিদিনই মাংস ভাত। রাত্রিতে পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ত, স্ত্রীলোকেরা বসে থাকত পথ চেয়ে। সকালে ঘর ভরে যেত, ধানচালের দিনে ধান চাল, মাড়ুয়ার দিনে মাড়ুয়া, আখ, গম, তৈলবীজ—দেশের সব ফসলই আসে, তার জন্য রোদে রষ্টিতে মাঠে খেটে মরতে হয় না। কেউ কোনো দিন বাইরে ঘুরে এলেও খালি হাতে ফেরে না, মাথায় একটা কিছু ফন্দি খেলে গেলেই ট্যাঁক ভরে ওঠে। কোনো গ্রামে কেউ হয়তো তার পোষা ছাগল কেটে ভোজ করছে, এমন সময় কোত্থেকে এক ডোম এসে হাজির হল, কেবল এক ধমক দিল—"পুলিসে রিপোর্ট না করে কেন ছাগল কেটেছিস্?" এই ধমকের চোটেই সে ডোম নিজের কিছু উপায় করে নিল। আমিন বাবু সফরে বেরিয়েছেন, পিছন পিছন ডোম গিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে ঘুরে সকলের কাছ থেকে তাঁর পাওনা বলে বেশ কিছু আদায় করে নিল, নানা রকমের জিনিস-পত্রও নিয়ে এল। ডোম ছেলেরা কয়জন পরামর্শ এঁটে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে, পয়সা দিয়ে কারো গরুর গাড়িতে উঠে বসে, বলে, আমাদের হাটে যেতে হবে।

অন্ধকার হলে পিছনের গাড়ির ছোঁড়ারা চেঁচিয়ে ওঠে—"চোর! চোর।" তাই শুনে সামনের সব গাড়িওয়ালারা পিছনের গাড়ির দিকে ছুটে যায়। এই ফাঁকে সামনের গাড়ির ডোম ছোঁড়ারা গাড়িওয়ালার কাপড় গামছা সব বাগিয়ে নিয়ে উধাও হয়। তালা-বন্ধ ঘর থেকেও চুরি হয়ে যায়। বাইরের দরজায় তালা দেওয়া আছে, দেওয়ালে সিঁদ কেটে ছোট একটি ডোম ছেলে ভিতরে ঢুকে খিড়কির দরজা খুলে দেয়। কাজ সারা হলে খিড়কির দরজা বন্ধ করে দেওয়ালের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে। বড়দের ধরবার উপায় নেই। কতই ফন্দি। তারপর নিজের গাঁয়ে ফিরে এসে, বসে হাসাহাসি করবার মতো যথেষ্ট অবসর থাকে তাদের।

ক্রমে ক্রমে পুলিসের শাসন বাড়ল, ডোমেদের স্বরাজ্য ফুরাল। জোড়ায় জোড়ায় সব বেঁধে নিয়ে গেল পুলিসে। তারপর হল নতুন আইন: একবার চুরি করলে অমনি নজরবন্দী, পুলিসকে না জানিয়ে গ্রাম থেকে বাইরে এক পা বাড়ালেই আবার জেল। 'ক্রিমিনাল্ ট্রাইব্'দের জন্য এই আইন। ডোমেরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। বড় বড় ডোম ঘর ভেঙে গেল। অনেকে খ্রীষ্টান হয়ে গেল এই আশায় যে পাদ্রী সাহেব আইনের কবল থেকে রক্ষা করবেন। ক্রমে সে মোহ ভঙ্গ হল, খ্রীষ্টান হওয়াও কমে গেল। দমন নীতি নতুন আইনের ক্রূর বিধান, ডোম ভেঙে পড়ল।

এরপর অন্যান্য জাতিদের গাঁয়ে বুদ্ধিদাতা 'বারিক' হয়ে, গরুর রাখাল হয়ে, নয়তো কুলি মজুর হয়ে ডোমেরা এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল, চাষবাস আরম্ভ করল। ঢোল বাজানো, শিঙা সানাই বাজানো, কাপড় বোনা, ছোট ছোট পসরা মাথায় নিয়ে হাটে হাটে ঘুরে বিক্রি করা, চাল বেচা,—ডোমেদের এই সব সাবেক পেশাই চলল খুব। চোর ডাকাতেরা এখন সমাজের মধ্যে এসে বসল কিন্তু যতই আত্মগোপন করুক অন্যদের দৃষ্টি থেকে, ঘৃণা থেকে নিষ্কৃতি পেল না। আর নিষ্কৃতি পেল না তাদের নিজস্ব প্রবৃত্তি থেকে।

ডোমেরা যত না চুরি করে নিন্দে পায় তার চেয়ে বেশী। ডোম, পাণ-অ গণ্ডা—এরা সব একই পাহাড়ী জাতি, একই চেহারা, জাতিগত গুণও একই রকম। কুলদিপিআ, মহানন্দিআ, কাট্রি, টাক্রি, কম্‌লা, গরড়া, বাঘ, মৃগ, খগ, মাছ—এমনি সব গোত্র এদের। অন্যান্য বন্যজাতির মতো

এদেরও নামের শেষে গোত্র যুক্ত থাকে। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের প্রথা এদের সকলেরই প্রায় একই রকম। বর-কন্যার মাথায় জলের কলসী রাখা হয়, দুজন দুজনের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চেপে দাঁড়ায় আর পরস্পরের গায়ে থুতু ফেলে। ঘাটে গিয়ে একটা পুজো হয় তার নাম রাহুপূজা। এদের সব ক্রিয়াকর্ম পাহাড়ী পদ্ধতিতেই হয়, ব্রাহ্মণ লাগে না।

এই ডোম কুল সোনাদেঈয়ের পিছনকার বনেদিয়ানা, তাই তার সুখ ভালো লাগে, অভাবের মধ্যে হাঁসফাঁস লাগে, দল-ছাড়া গরুর মত যেখানে সেখানে মুখ দেয়। গর্জন ডোম পুলিসের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাফাএল কিষ্টান হয়েছিল, তবু রক্ষা পায়নি। কেলার গ্রামের ডোম-শ্রী হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, যারা রইল বাধ্য হয়ে তাদের কুলিগিরি, 'গোতি'-গিরি করতে হল।

অনাহুত অবাঞ্ছিত ভাগ্যবিপর্যয়ে যখন সব ছারখার হয়ে গেছে সেই সময়ে সোনাদেঈ বালমুণ্ডার ঘর করতে মিনিআপায়ু এল। কন্ধ গ্রামের বারিক তারা, ভাল রোজগার। সোনাদেঈয়ের উচ্চাশা ছিল, কিন্তু আশায় আশায় দিনের পর দিন কেটে গেল, বিয়ের সুখ পেল না। বাপের কুলে কেউ নেই, কোথাও কোনো ভরসা নেই, এই কন্ধ অঞ্চলে কাছাকাছি বেশী ডোমও নেই যে সোনাদেঈ ঘুরে ফিরে দেখে শুনে মনের মতো কাউকে বেছে নেবে, নতুন করে ঘর বাঁধবে। তাই মিনিআপায়ুর মাটি আঁকড়ে তেমনি সে পড়ে রইল—সুদিনের অপেক্ষায়।

নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া সে করে নিয়েছে, বালমুণ্ডার কাছে সে থাকতে চায় না, কাজ শুধু দিন গোনা।

এমনি সময়ে সে লক্ষ্য করল যে তার প্রতি লেঞ্জু কন্ধের আগ্রহ বাড়ছে। লেঞ্জু কন্ধ ছোকরা নয় বটে, কিন্তু ডোমের মেয়েও একেবারে তরলচিত্ত নয়। আগে তার লাভ লোকসানের হিসাব। দিউড়ু সাঁওতার নিজের স্ত্রী আছে, দিউড়ু মদখোর, তার যা কিছু সবই দুদিনের। তার পাশে লেঞ্জু কন্ধকে দাঁড় করিয়ে সে দেখে। বারিকের সঙ্গে লেঞ্জুর ফুসফাস্ কথা লেগেই রয়েছে সর্বদা, তার কিছু কিছু সোনাদেঈয়ের কানে আসে। লেঞ্জু কন্ধের ভবিষ্যৎ আছে, তার চাউনিতে দিন দিন টলমলিয়ে উঠছে একটা নেশা, সেইটুকু দেখবার জন্য সোনাদেঈ অধীর হয়ে তাকিয়ে থাকে।

লেঞ্জু কন্ধ আসে যায়। কোথায় যে ওত পেতে থাকে সে, যখন কেউ কোথাও থাকে না, নদীর খাদের ভিতর থেকে, বনের আড়াল থেকে, বেড়ার ও-পাশ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে ঘড়ঘড়ে মোটা গলায় ডেকে দাঁড় করিয়ে দেয়। থেমে থেমে ঢোক গিলে গিলে কথা বলে। কত প্রশ্ন তার—বারিক কোথায়? বালমুণ্ডা কোথায় গেছে? দিউড়ু কি এদিকে এসেছিল? সব প্রশ্নের জবাবের জন্য সে ছুটে আসে সোনাদেঈয়ের কাছে! তার সব পেখনা সোনাদেঈ দেখে, মুখ নিচু করে হাসে।

বারিক বুড়ো কবে থেকে লেঞ্জু কন্ধের এত বড় বন্ধু হয়ে উঠল?—সোনাদেঈ ভাবে। ঠিক সন্ধে হতেই লেঞ্জু কন্ধ বারিক বুড়োর খোঁজে আসে, বারিক ঘরে থাক বা না থাক।

॥ আটত্রিশ ॥

সারি সারি বুড়ো পাহাড়ের দেশ। প্রাচীন কালের কোন ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসে তৈরী সে। আজ আর সেই দিনের উত্তাপ নেই। গলিত তরল পাথর এখন জমে শক্ত হয়েছে. কেবল এক কালের তরল ধারার কঠিন পাথুরে শিরা একের পর এক নেমে এসেছে উপর থেকে নীচে—ঘোলমউনির মতো। সকলের উপরে এক কাদাভরা পুকুর—আগ্নেয়-গিরির মুখ ছিল এক দিন। পাহাড়ী বাতাসের তীব্র ধমক সে সয়ে থাকে, সয়ে যায় পাহাড়ী দেশের হাতীর শুঁড়ের মতো দরদর ধারায় বৃষ্টি। কতখান থেকে কত চাকলা গেছে, পাথরের ফাঁকের ভিতরকার মাটি ধুয়ে ধুয়ে ভেসে চলে গেছে, থেকে গেছে শুধু গভীর গহ্বর। পর্বতের কত বিচিত্র রূপ, আর জায়গায় জায়গায় উঁচু দেওয়ালের মতো হয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ চলে গেছে 'মালি', 'দমক', কত উপরে উঠে গেছে, উপরটা সোজা সমতল। তলায় যে মাটি আছে তাও পাথর, কোথাও ঢালু, কোথাও খাড়া, কোথাও নিচু, কোথাও উঁচু, সেও পাহাড়ের মতোই।

পর্বত আর পাথর, এই সূচনা দেয় সারাটা দেশ। এইটুকুই যেন তার বর্ণনা। আর এ দেশের মানুষের ধরন—পর্বতগুরু যেন তাদের শিখিয়ে

দিয়েছে তার নিজের আদর্শ—আঘাতের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ইতিহাসের আরম্ভ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পড়ে থাকতে। অপরিবর্তনীয় আদর্শ। এই আদর্শেই বনের জীবন বনের মধ্যে চলে এসেছে চিরকাল—নগ্ন, নির্বিকার। সভ্যতার মুখোস পরে চকচকে পোষাকের তলায় গায়ের দাদ আর মনের কপটতাকে ঢাকা দিয়ে বেঁচে থাকা সে শেখেনি; তাই সে অসভ্য। সেখানে ষড়রিপু আছে, দুর্গন্ধ আছে, ময়লা আছে; সেখানেও যা সবখানেই তা, কিন্তু মানুষের মনের মূল রূপটি দুলছে এই বনের তরঙ্গে—পরিষ্কার, খোলা। তাই সেখানে বাতাস লেগেই ঘা শুকোয়, রোদ বৃষ্টি লেগে শরীর শক্ত হয়, মনের ব্যথা প্রকাশ পেয়ে নিকাশ হয়। দুঃখ সেখানে হয়ে দাঁড়ায় না গ্রামের পুকুরের পচা পাঁক, প্রকৃতির বিশাল আনন্দ মানুষের হতাশ দুর্দশাকে আপন পরশ দিয়ে সারিয়ে তোলে, মশা ডাঁশ, নানা উৎপাত আর শত্রুতার ঝঞ্ঝাবায়ুতেও মানুষের মনে কোমল রাগিনী বাজতে থাকে, থামে না।

বুড়ো পাহাড়ের মতোই বুড়ো—মানুষের সমাজ।

মানুষের মৃত্যু নেই। প্রাণ দেহ ত্যাগ করে গেলে পরজা বলে গদবা বলে কন্ধ বলে যে আত্মা ('ডুমা') আবার দেহ ধারণ করবে, আবার জন্ম নেবে। শিশু জন্মালে খোঁজ পড়ে সে কার 'ডুমা'। ডিসারী তার পূর্বজন্মের ইতিহাস বলে। সকলেই তার কথা বিশ্বাস করে। সকলেই জানে প্রত্যেকেই তারা কে কার 'ডুমা'।

সে গীতা পড়েনি, কিন্তু তার পূর্বপুরুষেরাও এদের এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা রেখে দিয়ে গেছে যে আত্মা অবিনশ্বর। সে বেদ পড়েনি, কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে আনন্দই জীবনের শ্রেয়।

পাহাড়ের উপরে ঋতুরঙ্গের মতো মানুষও প্রকাশ পায় ঋতুতে, বিভিন্ন ঋতুর ক্রিয়া কর্মে, কখন জমি চষা হবে, কখন ফসল কাটা হবে,—কখন 'দণ্ডা' (আখ), কখন 'জোনা' (ভুট্টা),—এমনি সারা বছরের কর্মচক্র। কেবল তারই ফাঁকে ফাঁকে চাষ আর ফসলের ক্রম অনুসারে এক একটি পরব—যেমন পৃথিবীর সব দেশে কৃষিকাজের ধাপে ধাপে পাল-পার্বণ গাঁথা।

ফসল কাটা হয়ে গেছে। আবার জমিতে হাল দেওয়া হবে। নতুন বন কেটে পুড়িয়ে জমি তৈরি করা হবে। কাজের চাপ নেই, নাচ গানের

সময় আছে। মহুয়া পেকেছে, প্রচুর মদ। জঙ্গল শুকিয়ে যাওয়াতে শিকারের সুবিধে। বসন্ত এখনো যায় নি, মাল দেশের শোভায় মোহিত হয়ে থেকে গেছে আর একটু। এই সময়ে পূর্বঘাটের মালদেশে ওড়িশার গড়জাতের লোকেদের বিখ্যাত 'চইত' পরব, বনবাসী মানুষের সারা বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব,—সর্বত্র।

বনবাসী মানুষ দিন গোনে, ফাল্গুনের চাঁদকে অভিসম্পাত দেয়, কবে সে মরবে, চইতের চাঁদ উঠবে, শুরু হবে চইত পরব। কত আশা নিয়ে নূতন আনন্দের জন্মলগ্নের অপেক্ষায় সে পথ চেয়ে থাকে—আনন্দ আসবে. আনন্দ তাদের মাতাবে, নাচাবে, রেখে যাবে স্মৃতির ঝলক—চইত পরব, চইত পরব।

এক মাস আগে থেকে সাজসজ্জা শুরু হয়ে যায়। পরব আরম্ভ হলে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ, মজুর মজুরি খাটবে না, ভারী ভার বইবে না,—কেবল ফুর্তি। সেই জন্য আগে থাকতেই সব পুঁজিপাতি যোগাড় করে রাখতে হয়, যাতে মানুষ বসে খাবে, খুব ভালো করেই খাবে। কাঁধের জোয়াল, বয়সের বোঝা নামিয়ে ফেলে রাত্রিদিন কেবল নাচ গান ভোজ শিকার, মালদেশে বসন্তের অভিযান।

ভেদাভেদ নেই, মান-অভিমান নেই, আপন-পর নেই। রাস্তায় অরাস্তায় তরুণ-তরুণীর দল। সকলের ঘর সবখানে। সর্বত্র আনন্দের বিহ্বল ভাব। কেবল হাসি, কেবল ফুল, কেবল হাতে হাত বেঁধে দলে দলে নাচ। তাতে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। পাহাড়ের ফাটল থেকে, খোল থেকে, সমগ্র দেশ জুড়ে কেবল নাচের বাজনার শব্দ, নানা ধ্বনের। বনের ভিতরে জন্তু খেদানোর উল্লাসের হইরই, ওড়িআনলি ছোঁড়ার দুড়ুম দুড়ুম। গাছের তলায় চেটালো পাথরের সমান জায়গায় বুনো নদীনালার পাড়ে বনভোজন, নাচ। লতাপাতার ঝোপের আড়ালে সাধ-সোহাগের কথা প্রাণে প্রাণে।

এমনি সময়ে মানুষ প্রমাণ করে যে পয়সা তার শ্রেয় নয়, শ্রেয় তার প্রাণ। 'কান্তরাটি' (কনট্রাকটর্) মাথা চাপড়ায়, সব কাজ বন্ধ। অধিকারীরা সফরে বেরিয়ে কষ্ট পান, ভারী নেই যে তাঁদের মাল বইবে। গ্রামে গেলে একটি লোক নেই যে কাজ করবে। এই সময়ে কাউকে পয়সার লোভ দেখানো যায় না, যতই পয়সা যাচো কোনো ফল হবে না। পাহাড়ী লোকেরা

চায় সকলেরই কাজ বন্ধ থাক্, সকলেই আনন্দে মাতুক। ধাংড়ীর দল রাজার হাতী আটকায়, অধিকারীদের মোটর আটকায়, রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থামিয়ে নিজেদের দেশের নাচ দেখায় আর যে যা 'ইনাম' দেয় তাই নিয়ে চলে যায়। পথচলা লোককে ঘিরে তারা নাচে। 'সভাইনস্‌পিটি' (পুলিস সাব্‌ইন্‌স্পেকটার) 'ইনাম' দিতে দিতে নাজেহাল।

এই সময়ে বিদেশীর কাছে নিমন্ত্রণ যায়। এক থালা চাল, কয়েকটি মুরগীর ডিম, কলা, পান, ধুঙ্গিআ। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে একটি নমস্কার। নিমন্ত্রণ—এসো আমাদের গ্রামে এসো, আনন্দ উপভোগ করো।

এই চইতে নাচের জোয়ার আসে, ঢেউ ওঠে। প্রাচীন পর্বত বনানীর দৃশ্য, সারা দিন ক্ষণে ক্ষণে নতুন তুলিতে নব নব বর্ণের বিন্যাস—ঢেউ খেলানো পাহাড়ে, খোলে, খাঁজে। বনমল্লিকার মনমাতানো সুগন্ধ—চাঁপা ফুল, মহুয়া; আর ঢোল টমক শিঙা ডুঙ্গডুঙ্গার উত্তাল নাদতরঙ্গে সমগ্র দেশব্যাপী সুস্থ সুঠাম রক্তমাংসে গড়া উজ্জ্বল অঙ্গসমষ্টির নৃত্য।

নৃত্যের দেবতা তর্জনী তোলে, অন্ধকারের পর্দা সরে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে চইতের চাঁদ, জ্যোৎস্না ওঠে, চইতের ধুম লাগে।

এমনি করে নাচের দেবতা বার বার নাড়া দিয়ে দোলা দিয়ে যায়, বন-দেশের শান্ত প্রকৃতিতে করে ছন্দের যোজনা। বুড়ো পাহাড় ঝিমোতে ঝিমোতে দেখে এই আনন্দের হিল্লোল। বছরের পর বছর কেটে যায়।

বছরের অর্ধেক দিন খেতে হয় মাড়ুয়ার জাউ, আর বাকী অর্ধেক দিন 'শলপ' গাছের গুঁড়ি, আম আঁটির কষি, তেঁতুল বিচির শাঁস, আর যত শক্ত পাথুরে শেকড় বাকড়। পরতে হয় কৌপীন। কাঁধে বোঝার ভার, পরের জোয়াল। মনে আদিম যুগের অন্ধ বিশ্বাস আর স্বপ্ন। বনের শোভা আর মানুষের শ্রী তাদের মন ভোলায়, মহুয়ার মদ মাতায়, চইত নাচিয়ে নাচিয়ে গেঁথে রেখে দিয়ে যায় কন্ধভাইয়ের জীবন, বেলফুলের মালার মতো।

॥ উনচল্লিশ ॥

পরজাদের গ্রামে, গদবাদের গ্রামে চইত পরব লেগে গেছে। পরব লাগে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন দিনে। ডিসারীর গণনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে পরবের দিন ধার্য হয়। পরজাদের পুথি আছে, ওড়িআ অক্ষরে লেখা তালপাতার একটি পাঁজি। তাতে এক শ বছর পর্যন্ত কাজ চলবে। তার পরে নাকি আবার ঐ পুথিরই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আরো এক শ বছর চলবে। দিনের ফলাফল অথবা কোনো যোগের কথা সব এক জায়গায় লেখা থাকে না, আগাগোড়া সারাটা পাঁজি খুঁজে পেতে পরজা ডিসারী সব কথা বলে যায়—কোন দিনে কোন্ সময়ে কি কাজ করতে হবে, কার পক্ষে কোন্ দিন ভাল, ইত্যাদি। কেবল পরজাই নয়, ওড়িআভাষী ভোতড়া, ঝিরিগাণ, বণ্ডা, পুটিআ, পাইক, মালি,—ইত্যাদি সকল জাতির লোকেরাই এমনি বিচিত্র পাঁজি অনুসারে চলে। ওষুধের জন্যও এমনি ওড়িআ অক্ষরে লেখা পুরানো পুথিই তাদের সম্বল।

কন্ধ প্রাচীন ওড়িআ রাজ্যের একটি সামন্ত জাতি। কন্ধ ভাষায় রাজাকে বলে 'ওডেসি', অর্থাৎ ওড়। কিন্তু কন্ধ কোনো লেখা পুথি ব্যবহার করে না, তাদের লেখবার হরফ কিছু নেই, সব জ্ঞান মুখে মুখে বলা, অর্থাৎ শ্রুতি, সমস্ত জ্যোতিষ চাক্ষুষ গণনার উপর। এরা মাটিতে কাঠি পুতে সূর্যের গতি মাপে। সময় গণনা করে লাঠির হিসাবে, অর্থাৎ সূর্য কত লাঠি উঠল সেই হিসাবে। রাত্রির গণনা করে তারা দেখে দেখে, চোখের উপর আঙুল পাকিয়ে তারই ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে তারা দেখে।

এই সব চোখে দেখে হিসাব আর মাপের উপরে আবার আছে ডিসারী আর বেজুণীর দিবা দৃষ্টির ফল। তার কতখানি দিব্যদৃষ্টি আর কতখানিই বা মদের ভাপরা কে বলবে তা? এ সব বিশ্বাসের কথা, যাতে একবার বিশ্বাস হয়ে যাবে এই অরণ্যবাসীরা তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, যাই হোক তার ফল। কবে কে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে যে কালো জিনিসে অমঙ্গল হয়, যেমন কালো ছাগল, কালো শুওর, কালো মুরগী। বিশ্বাস বাড়ল তো

অমনি যত কালো জিনিস কালো জন্তু এক দিনে সব সাবাড়। পাহাড়ী ঝড়ে ভর করে যেন আসে এমনি সব বিশ্বাস যার কথায় এদের বিশ্বাস আছে সে যা কিছু বলে এদের ক্ষেপিয়ে তুলবে তাতেও এদের তেমনি বিশ্বাস।

বিশ্বাস আর গণনার মতভেদ অনুসারে 'দেশকে ফাঁক নদীকে বাঁক' নীতির মতো এক এক সময়ে শুভদিন আর পূজাপার্বণের যোগ এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে তফাত হয়ে যায়।

ডুঙ্গ ডুঙ্গা (লাউয়ের খোলের একতারা), বাঁশি, ডোমেদের ঢোলক, ডোমেদের শিঙা, বড় বড় মাদল আর টমক—প্রভৃতি বাজনার শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে চারিদিক থেকে বাতাসে ভেসে এল. গাঁয়ের লোকেরা ভিন গাঁয়ের বাজনার ঠাট্টা-টিটকারিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। তখন গাঁয়ের ডিসারী পাণ্ডু জানী সকলকে ধমক দিয়ে বলল, "থাম্. এখনো সময় হয়নি।"

ছেলে ছোকরারা প্রতিবাদ তুলল—"বুড়োদের কথাই অমনি, তাদের সময় হতে হতে মানুষের শক্তি থাকে না।"

পাণ্ডু জানী নক্ষত্র গুনে গুনে নিজের হিসাব কষে. বলে—"না না, এখনো সময় হয়নি।"

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ছোকরা-ছুকরীরা তৈরি হতে থাকে, গান-বাজনা ক্রমেই বেড়ে চলে। ছোকরারা দিনে দুপুরে ঢোল টমক নিয়ে নাচের বাজনা বাজাতে থাকে, রাখালেরা আরো আরো বাঁশি বাজায়. কাজ করতে করতে ছুকরীরা গান করে. নাচে।

পাণ্ডু জানী সব দেখে, অস্থির হয় না।

তার বিশ্বাস, সংসার একটা শৃঙ্খলা অনুসারে চলেছে ; বাঁধা আইনে যখন যেটা হবার হয়েই যাবে, সেটাকে আগে-পিছে করার জন্য হাত-পা ছুঁড়ে তাড়াহুড়ো করা নিষ্প্রয়োজন। এ-তারা নীচে না নামলে ও-তারা উঠবে না। সব যেন যে যার নিজের নির্ঘণ্ট অনুসারে চলে, তারা আর পৃথিবী, সব কিছু। তাই সে নিজের ঘরের সামনে আকাশের তলায় দড়ির খাটিয়াটিতে পড়ে পড়ে ধুঙ্গিআ টানতে ভালবাসে। ঘরের ভিতরের যত শব্দ, যত রকমের গোলমাল, ঘরনীর যত বকাবকি, সব তার কানে সংগীতের মতো লাগে। তার ছেলেপিলে নেই, কত কিছুই তো নেই, কিন্তু সর্বত্র সে অদেখা হাতে তৈরী শৃঙ্খলা দেখতে পায়, তার মনে সন্তোষ, অন্তরে ধৈর্য।

এমনি করে একদিন নিজের গণনা অনুসারে পাণ্ডু জানী বিধান দিয়ে দিল 'উত্রা' যোগের, যে-যোগে ঘর-দেবতার পুজো হয়। ঘর-দেবতা ঘরের ভেতরেই থাকে, ঘর আগলায়, মানুষের শরীরের ভালো-মন্দ শুভাশুভের খবরদারি করে। কোনো মঙ্গল কার্য অনুষ্ঠান, কোনো পর্ব পালন করবার আগে তার পুজো। এই পাহাড়ী অঞ্চলে 'পরব পালা' না বলে লোকে 'পরব খাওয়া' বলে, কারণ প্রায়ই কোনো না কোনো নতুন ফলের বা নতুন ফসলের সময়েই নতুন পরব পড়ে। আগে খায় ঘর-দেবতা। আশ্বিন কার্তিক পৌষ মাঘ চৈত্র এই পাঁচ মাসে বড় বড় 'পুজো খাওয়ার' আগে মাসে একবার কোনো বৃহস্পতিবারে ঘর-দেবতার পুজো হয়।

পদ্ধতি ক্রমে ঘর-দেবতার পুজার পরে পরেই 'ঝাকর' দেবতার পূজা, তার জন্যও কন্ধ ডিসারীর যোগ আছে। 'আশনি' বা বারনি' নক্ষত্রের যোগ। 'ঝাকর পেনু (দেবতা) আর কেউ না--ধরিত্রী মাতা, চাষের দেবতা সে, গ্রীক পুরাণের মা সিরিস। এই চাষের দেবতা মালদেশে নানা নামে খ্যাত, কোথাও 'নিসানি মুণ্ডা, কোথাও ঝাকর', কোথাও 'দর্তনী'। যে সময়ে মানুষের মনে ধর্মভাবনা প্রথম অঙ্কুরিত হচ্ছিল সে সময়ে মানুষ দেখল উপরে আকাশ নীচে মাটি এই দুই সকলের চেয়ে বড়। আকাশের রাজা সূর্য। মাটিতে কেবল প্রজা, এখানে রাজার স্থান নেই, সর্বত্র সমান। অতএব প্রথম দেবতা দুই জন—উপরে ধরমু, নীচে ধর্তিনী। ধর্তিনীর অপর নাম 'ঝাকর' দেবতা। কমকাণ্ডে বছরে চার বার তার বড় পূজা। একবার 'পণ্ড' (অগ্রহায়ণ) মাসে, বীজবপনের ঠিক আগে একবার মাঘ মাসে, ভাদ্রে নবান্নের সময় একবার, আর এক বার এই চৈত্রে, আম খাবার আগে, শিআরি ফল খাবার আগে।

গ্রামের কাছে নির্জন জায়গায় কোনো বড় গাছের তলায় ঝাকর্ দেবতার আস্থান। নিরালা ঝোপ-জঙ্গলের ভিতরে একটুখানি জায়গা। সেখানে খেলার পুতুলের মতো মাটির হাতী ঘোড়া কতকগুলি পড়ে থাকে। ছেলেদের খেলনার মতো ছোট ছোট কাঠের তলোয়ার, বর্শা, তাতে লাল আর কালো ফুটফুট দাগ। সেই খানেই নীচে মদ ঢালা হয়। কঞ্চি দিয়ে তৈরী হাঁটুভর উঁচু মণ্ডপের উপরে মুরগীর ডিম ভেঙে ভেঙে রাখা হয়। সেখানে জানী মন্ত্র পড়ে পড়ে মুরগীর ছানাকে আতপ চাল দেয় খুঁটে খুঁটে

খেতে, তার পরে তাদের গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলে ঐখানেই মাটিতে তার রক্ত ঢেলে দেয়, সেইখানেই শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে বেজুণী নাচতে থাকে। বুড়ীরা একে অন্যের হাত ধরে সাতবার সতরবার ঘুরপাক খায়। একদিকে সমান তাল রেখে ঘণ্টা বাজার মতো ঢোল বাজতে থাকে টাঁইটাঁই করে। অতি পবিত্র স্থান ঝাকর দেবতার আস্থান।

গ্রামের ঝোরার ধারে ঝাকর্ দেবতার আস্থানের কাছে নীল ফুলের বন, কুরেই ফুলের বন। পাতায় ভরা নানা জাতের ককোডির (ফার্ন্) জঙ্গল, তার উপরে জালের মতো ছেয়ে আছে গুলঞ্চ লতা, কোন্ কালের পুরানো। ঝোরার কিনারে কিনারে থোকা থোকা উজ্জ্বল হলদে সুনারি ফুলের ঝাড জলের উপর ঝুলে পড়েছে। চৈত্রের কচি পাতা, জায়গায় জায়গায় শাল গাছের উপরে শিআরির লতা চতুর্দোলার মতো খাটানো আছে। আম গাছে হাড-জোড়া লতা জড়িয়ে আছে। গাই-গরুর হাড ভেঙ্গে গেলে এই হাড়-জোড়া অব্যর্থ ওষুধ, অল্প দূরে দূরে কুলোর মতো আকারের পাতা। নীচে জায়গায় জায়গায় বুনো কলার গাছ, তার উপরে বসে ছোট ছোট নানা রঙের পাখী মিষ্টি সুরে গান গায়। ময়ূর নাচে, ডাহুক পাখী লুকিয়ে বেড়ায়, কোক্ পাখী গুমরে গুমরে ডাকে, কন্দ খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ নিচু করে বুনো শুওর ঘুট্‌ঘুট্ শব্দ করতে করতে নীচে নেমে গিয়ে বাশের বনে ঢুকে পড়ে।

সেইখানে ঝাকর্ দেবতার আস্থান কত প্রাচীন অতীতের ভক্তির উচ্ছ্বাসে ঢালা খাদ্য ও অখাদ্যের রঙ্গে গন্ধে লেপালেপি মাখামাখি। সেখানে কেউ শিকার করে না, কেউ অপবিত্র কোনো কাজ করে না। ঝাকর্ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা যত, তার চেয়ে ভয় বেশী, অমান্য করলে বিনাশ হয়ে যায় যদি!

ঝাকর্ পুজো হল মহা সমারোহে। নতুন আম খাওয়া হল, নতুন শিআরি ফল খাওয়া হল, গ্রামে খুব ধুমধাম, মদ খাওয়া আর ভোজ। কারণ এই পূজা চইত পরবের প্রথম তরঙ্গ। দেবতার কাজ শেষ হল, এইবার মানুষের কাজ।

ফাল্গুনের চাঁদ আর অল্প বাকী, এর পর সে মরবে—

সবাই আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, ফাল্গুনের চাঁদ দিন দিন কেমন সরু হয়ে যাচ্ছে। আর তার কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই, গুলি-খাওয়া বাঘের

মতো। গুলি-খাওয়া বাঘ যদি গুলির ঘায়ে না মরে তাহলে সে ঝোরার ধারে ঝোপের ভিতরে ঘষটে ঘষটে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যায়, তখন তার গায়ে কেবল হাড় আর চামড়া।

তেমনি এও। এখন আর সে মাঝরাতে জঙ্গলের মাথার উপরে নিজের সিংহাসনে রঙচঙে পাগড়ি মাথায় সগর্বে বসে নেই, এবার সে নেমে আসছে ক্রমেই নীচের দিকে। ছায়া অন্ধকার বাড়ছে, খাদে খন্ডে সব জায়গায় আসন্ন ভবিষ্যতের নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। এর মধ্যে আঁধার ঝরনা বয়ে চলেছে, আঁধারে ভালুক মহুয়া খাচ্ছে, মানুষ রচনা করছে আসন্ন আনন্দের স্বপ্ন।

সব নির্ভর করছে এই ফাল্গুনের চাঁদের মবার উপরে, সে মরলে তবে আর সব। তবু তো আর আর চাঁদের মতো সেও ছিল একটা চাঁদ, এই যে আজ রাতের শেষে যার গেরুয়া ফালিটুকু লেগে আছে কালো আকাশের ধারে। আজকের রাত ঝকঝক করছে, আকাশে অগনতি তারা জ্বল জ্বল করছে। আজ সবাই মিলে সভা করে চাঁদের উপরে তাচ্ছিল্যের প্রস্তাব চাপিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু একদিন সে আপন তেজে তাদের গ্রাস করত,—টুকরো টুকরো এই অগণিত তারার দলকে। আবার আগামী ভবিষ্যতে চৈত্রের চাঁদ—সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সর্দারি করতে করতে সেও দিনে দিনে বড় হয়ে উঠবে, 'সবাই সমান' বলতে বলতেই সে আপন গরিমায় অসমান হয়ে দাঁড়াবে, তারপর তারও দিন যাবে। চিরদিন আছে চাঁদ, চিরদিন আছে তারা, কমা-বাড়া চিরদিন। কেবল আশা আর স্বপ্ন এই যে একদিন সব সমান হবে, প্রশান্ত আকাশের কালো পটে উঠবে প্রত্যেকটি তারার উত্তপ্ত ঝলক, অগণিত তারার অগণিত আত্মার স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সৌর জগতের আকাশ, অনাদি হতে অনন্ত পর্যন্ত।

ফাল্গুনের চাঁদ। কেউ চেয়েছে সে যাক, মরুক, কত জায়গায় সে বসন্ত রচনা করেছে, এনেছে আমোদের তুফান, মরমের ভাবের বন্যা। কেউ তার কথা গেয়ে উঠেছে কবিতায়, কেউ তার নামে প্রিয়জনের নাম রেখেছে সাধ করে—'ফাগুন'। ফাগুন! কত ফুল কত বউল কত আবীর ভারে ভারে এনে ঢেলে দিয়ে গেছে সে এই পৃথিবীতে, কত জায়গায় লাগিয়েছে দোলযাত্রার মহোৎসব। ফাগুন! আজ সে সর্বস্বান্ত, আজ সে প্রায় মুছে

যাওয়া একটুখানি দাগ কেবল, সেটুকুও লোকের চোখে সহ্য হল না, সকলের দৃষ্টি তারই উপরে—সে মরুক !

সেদিন অমাবস্যার রাত, মরল ফাগুনের চাঁদ। অসংখ্য আগুন জ্বলল গ্রামে গ্রামে, উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় কেবল দাউ দাউ আগুন। অমাবস্যার রাতে পূর্ব ঘাটের পাহাড়ী দেশের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল নাচ। সব দিক থেকে এক সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল উত্তাল বন্য বাজনার ঘনঘটা—ডোমের বাজনা, ডুঙ্গডুঙ্গা, কন্ধের সারেঙ্গী আর বাঁশি, 'পেরেঙ্গা'র গান-বাজনা। আঁধার রাতে সমস্ত তারা ঝক্‌ঝক করে উঠল। নীচে চেতনা-প্লাবী আনন্দ। সকলের মুখে শোনা যায় কেবল 'কাল চইত !—কাল চইত !' নাচের হুল্লোড়ে মদের হাঁড়ি ভাঙ্গল, খোঁপার ফুল ছিঁড়ল।

ফাগুনের চাঁদ মরেছে।

॥ চল্লিশ ॥

লাল রাস্তা ধীরে ধীরে ঢুকছে—একখানা তাতানো লাল ছুরির মতো। এই ছুরির ছোঁয়া লেগে কত রাজ্যের কত রাম-রাবণের আমলের দণ্ডকারণ্যের মাল্যবন্ত গিরির কত শাল গাছ নির্মূল হয়েছে, হয়েছে নতুন করে সপ্ততাল ভেদ, দুন্দুভি অসুরের কঙ্কাল-স্তূপের মতো রাশীকৃত হয়ে পড়ে আছে প্রাচীন মানবের সংস্কৃতির কোনারক, পড়ে আছে পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে।

লাল রাস্তার ধারে ধারে হাঁটু-মাপের হাফ্‌প্যান্ট্‌ আর শোলার টুপি পরা মানুষ, লম্বা পায়জামা পরা মানুষ, সেখানে কলের দুরমুশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নীচের পুরাতন মাটিকে পিষে মাড়িয়ে আপন খুশিমতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। সেখানে দশলোকের হাট, সাত ঘাটের জল মিলে মিশে একাকার। তার আদর্শ ধবধবে পরিষ্কার পাকা বাড়ি—একতলা দোতলা তিনতলা, মানুষের ভোগবিলাসের জটিলতা ; সেইজন্য হাতের কাজ কম, কলের কাজ বেশী, ক্ষিপ্রতা, চাঞ্চল্য, অতি গতি, প্রগতি। কিন্তু সেখানে মানুষের শিক্ষিত উন্নততর মন গাছ আর জঙ্গলের পরিবর্তে ইট চুন সুরকির প্রাণহীন

কোঠাবাড়ির ভিড়ে অ-প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছটফট করে। বনের নদীতে ভেসে যাওয়া ফুল পাতার চঞ্চল ভঙ্গিমার পরিবর্তে দেখা যায় শহরের রাস্তা-নদীতে অসমঞ্জস মানুষ আর গাড়ির স্রোত। সেখানে গোলমাল, হইচই, মানুষের নিশ্বাসে দম বন্ধ হয়ে আসে, ধুলো আর ধোঁয়া—রাস্তার, অসংখ্য কলের। সূর্যোদয় সেখানে কেবল মানুষের পেটের চিন্তায় ছটফট করাকেই আরো স্পষ্ট করে দেখায়, ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে সূর্যাস্ত যেন তাল গোল পাকানো মানুষের ভগ্ন আশাউচ্ছ্বাসের নিবন্ত অঙ্গারের মতো মনে হয়। সেই সভ্যতারই এক ভগ্নাংশ গড়িয়ে চলে লাল রাস্তা বেয়ে ক্রমাগত ভিতরে, আরো ভিতরে। লম্বা হয়ে বেড়ে চলে লাল রাস্তা।

তার কলকবজার আধুনিকতাকে উপহাস করে সেই পথে পার হয় চইত পরব, ঐ রাস্তা ধরেই, নয় তো বন থেকে বেরিয়ে এসে সেই রাস্তাকে কাটাকাটি করে, রাস্তাকে উপেক্ষা করে। কৌপীন পরা উন্মত্ত পুরুষ, হাতে ধনুর্বাণ, বর্শা, ওড়িআ নলি। দলে দলে স্ত্রীলোক, ঘরে চোলাই মদের হালকা নেশায় তাদের ঢুলু ঢুলু চোখ, ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যায় ঝকঝকে দাঁত, মাথার চুলে রেড়ির তেল চুঁইয়ে পড়ছে, সারা গায়ে হলুদ মাখা, কুয়াশায় ভেসে চলার মতো তাদের স্থির দেহে হালকা চাল, কেবল ফুল মদ গান। এমনি করে চলে এসেছে চইত তাদের দেশে চির দিন, যত দিন যার মনে পড়ে।

এই নগ্ন সরল সভ্যতা, লাল রাস্তার ধার সে ধারে না। এখানে পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ নাচে পর্বতমালার ঢেউয়ের ওপারে, খোলা বাতাসে তার বিজয়ের সাজ নির্মল অমলিন, মাঝে নেই ধুলো, নেই ভিড করা বাড়ি-ঘরের কুশ্রী অভ্যন্তরের ছায়া।

লাল টকটকে পূর্ণিমার চাঁদ লাফ দিয়ে উঠে এল পর্বত সমুদ্রের ভিতর থেকে ঢেউয়ের উপরে। চাঁদ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ফুরফুরে বাতাস, চাঁদ উঠলে একটু বাতাসও ওঠে কেন জানি। চাঁদ উঠবে—কত আগে থেকে তার সূচনা। মাঝে সব চুপ চাপ, তাতে বিপ্লবের পূর্বের প্রতীক্ষা, বিস্ময়ের শান্তি। তারপর বাতাস উঠল, হঠাৎ যেন চমক খেলে গেল, লাল চাঁদ উঠল, চারিদিকে কলরব, চইত পরব আরম্ভ হল।

চইতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে দিউড়ু সাঁওতা ভাবছিল, তার মদ খাওয়ার

শেষ নেই, ভাবনারও অন্ত নেই। পাহাড়ী মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ সে, একটি ঘটনার পাশে আর একটি ঘটনা রেখে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ভাবতে সে শেখেনি, সে কাজ করে আর ভাবে—যখন যা মনে পড়ে তাই নিয়ে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাবনা তার। দিনের উজ্জ্বল আলোয় সে শিকারের ফন্দি আঁটতে আঁটতে গ্রামের সভায় উৎসাহ প্রকাশ করে : সরুগি ঘাটি চন্দনি ঘাটিতে শিকার হবে, দল বেঁধে সবাই জন্তুদের ছোট জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে সেই দিকে নিয়ে যাবে। দিনের বেলায় সকলের সঙ্গে নানা রকমের কাজ, নানা রকম চিন্তা, সে সব দলের চিন্তা।

রাত্রি,—প্রথম প্রহরে গাঁয়ে এটা সেটা ধান্দা লেগে থাকে, হট্টগোল। তারপর খাওয়া-দাওয়া, পেট ভরে গেলে মদের পালা, গাঁয়ের মাঝে খোলা জায়গায় শোরগোল করে নাচ। কিন্তু যখন গায়ের বস্তিগুলি নীরব নিশুতি হয়ে যায়, যারা জেগে থাকে তারা সবাই গিয়ে জড় হয় পথের উপর নাচের জায়গায়, সেই সময় শুরু হয় তরুণ-তরুণীদের মন দেওয়া-নেওয়ার অভিযান, কে কোথায় আড়াল খুঁজে লোকের চোখ এড়ায় তার ঠিক নেই।

ঘুরে ফিরেই লেগে আছে গাঁয়ে নাচের হুল্লোড়। তার থেকে উছলে পড়ে দিউড় সাঁওতা এক জায়গায় একলাটি গিয়ে বসে আছে, সে আর চাঁদ, একলা। নানা রকমের হাসি, নানা রকমের পায়ের শব্দ তার কানে আসছে। পায়ের শব্দ ঠাওরানো বনদেশের লোকেদের বৈশিষ্ট্য। জন্তুর পায়ের শব্দ শুনে তার ধরন বোঝবার চেষ্টা করতে করতে মানুষেরও পায়ের শব্দ শুনে তার অবস্থা আর গুণাগুণ আপনা-আপনিই বোঝা যায়। দুপ—দুপ—দুপ—দুপ, কেউ নিষ্কর্মা হয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল নেই, হায় হতভাগ্য। দুপ্-দুপ দুপ্-দুপ্ দুপ্, প্রতীক্ষা, অস্থির লাগছে—অন্য জন কেন এখনো পর্যন্ত বাইরে এল না। নানা রকমের উদ্দেশ্য, নানা রকম চরিত্রের মানুষ। ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়, কোনো যুবতী সেজে-গুজে নাচতে যাচ্ছে, কেউ ফিরছে নেচে ক্লান্ত হয়ে, এখন একটু শোবার জায়গা পেলেই শুয়ে পড়বে।

নির্জন চিন্তায় দিউড় শান্তি পাচ্ছিল না, জ্যোৎস্না রাত্রি মনে ভরে দিয়েছিল কামনা, চোখ কুঁচকে উঠেছিল, কামনা চিরদিন অতৃপ্ত। সেই পুরাতন অভিযোগ তার মনে জাগছিল। বেছে বেছে পুযুকে পছন্দ করে

সে এনেছিল তার ঘর করতে, কিন্তু পুয়ু আর সে পুয়ু নেই। এই ঘরনী আর সেই ধাংড়ীর মধ্যে কত না তফাত, চিন্তা উজান বয় কেবল মনকে খুঁইয়ে খুঁইয়ে জ্বালাতে। কি যে হয়েছে পুয়ুর, না আছে সেই দেহ, না আছে সেই মন। শুধু রেঁধে বেড়ে দেয় আর সংসারের কাজে ডুবে থাকে, বাচ্চা কোলে করে এ-ঘর ও-ঘর করে, সামনা সামনি পড়ে গেলেও মুখে একটা সোহাগের কথা নেই, মুখখানা ভার করে থাকে যেন কিসের অভিমানে, যেন কে তার কি অনিষ্ট করেছে। কত দিনে হয়তো একবার সে স্ত্রীর কাছে যায়, কিন্তু স্ত্রী কিছুই বোঝে না। বনে গেলেও তবু গাছপালার ছায়া আছে, স্ত্রীর কাছে তাও নেই। চইতের রাতে স্ত্রীকে সঙ্গে করে নাচতে হয়, কিন্তু স্ত্রী আর নাচুনী নয়।

ভাবতে ভাবতে দিউড়ুর রাগ হল। উঠে দাঁড়াল সে, প্রতিজ্ঞা করল আজ যে করেই হোক পুয়ুকে আঁধার ঘর থেকে বাইরের আলোয় টেনে বের করে আনবে—ঝোরার ধারে, চইত ডাক দিয়েছে, আজ আর এড়িয়ে যাওয়া নেই। বুক দুড় দুড় করতে করতে চোরের মতো দিউড় ঘরে এসে উঠল—নতুন পরিচয়ের পরে প্রথম কাছে যাওয়ার মতো। এমনি করে সে প্রথম বার পুয়ুর কাছে গিয়েছিল।

ছাঁচতলা অন্ধকার, ঘরের ভিতর অন্ধকার।

দরজা খোলা ছিল, দরজার সামনে নিত্যিদিনের পাহারাদার বুড়ো কুকুর দসরু। ঘুমের ঘোরে ঘেউ ঘেউ করে সে দৌড়ে এল, বার বার দিউড়ুকে দেখে আশ্বস্ত হল। এই প্রথম বাধা। দিউড়ু প্রকৃতিস্থ হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল। মাথা গরম হয়ে উঠেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। মুখের ধুঙ্গিআ চুরুটটা টেনে টেনে তার আগুনটা উসকে নিল, তারই সামান্য আলোয় সে দেখল পুবুলি আর পুয়ু মুখোমুখি ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে আছে। পুবুলির কোলের কাছে হাকিনা ঘুমচ্ছে। দিউড়ু পুয়ুর উপরে ঝুঁকে পড়ল। তার শীর্ণ মুখখানি ভালো করে দেখা যায় না। অন্ধকার সব কিছু আড়াল করে আছে, সব দুর্বলতা, সব নিস্তেজ ভাব। সেই অন্ধকারের তরঙ্গের উপরিভাগের মতো কেবল একটি সুষুপ্ত নারীদেহ—সে তারই, সে তারই। দিউড়ু পাগলের মতো পুয়ুকে নাড়া দিতে লাগল। পুয়ুর ঘুম ভাঙল না। নুয়ে পড়ে দিউড়ু পুয়ুর পা ধরে টান দিল। এইবার পুয়ুর ঘুম ভাঙল। টানাটানিতে

হাকিনাও জেগে গিয়ে চীৎকার শুরু করল। পুয়ু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল, ভাবল এটা হয়তো চইতের মদের ফল। পুবুলিরও ঘুম ভাঙার উপক্রম, নাচের শ্রান্তি তার যায়নি, সর্বাঙ্গে বাটা হলুদের গন্ধ। এইবার দিউড়ু কাবু, এদিকে হাকিনার চীৎকার ওদিকে পুবুলির ঘুম-জড়ানো গলায় 'আঁ—আঁ'। পুয়ু ঠোঁটে দাঁত চেপে আস্তে আস্তে বলছে, "এনৃহা—এনৃহা (কি, কি ?)।" নিরস্ত হয়ে দিউড়ু ফিরে গেল—যেন অন্ধকারে একটা ঝড় এসে ঢুকে পড়েছিল, অন্ধকারেই বেরিয়ে চলে গেল ফিরে।

বাইরে এল দিউড়ু। ভারী রাগ ধরছিল তার। হুহু করে এগিয়ে যাওয়া মনের ঝড় হঠাৎ যেন ফিক ব্যথায় আটকে যাওয়ার মতো হয়ে মাথার ভিতর ঝনঝনিয়ে উঠছিল। তার বিকারগ্রস্ত মনকে টিটকারি দেওয়ার মতো শোনা যাচ্ছিল চইতের নাচের গান-বাজনার কোলাহল। কত লোক সেখানে আনন্দে মাতামাতি করছে, কন্ধ গোষ্ঠীর টলমল করা আনন্দ। দিউড়ুর সে সব তেতো মনে হচ্ছে। সেখানে যেতেও ইচ্ছে হয় না অথচ সেখানকার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও ইচ্ছে নেই। পুরানো ঘা চুলকে চুলকে রক্ত বার করার মতো ভাব নিয়ে দিউড়ু মহুয়া গাছে হেলান দিয়ে সেই কোলাহল শুনতে লাগল। রক্ত গরম হয়ে উঠল, আবার রাত্রি ঘনাল তার মনে, পাগল জ্যোৎস্নায় পাগলের নেশা।

ধাংড়ারা করুণ সুরের গান ধরেছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার অভিমান-বৃষ্টি করে চলেছে ধাংড়ীদের উপর :—

"কেন তোমরা চলে গেলে ?

"বনে জ্যোৎস্না লুকোচুরি খেলছিল, পায়ে আন্দু আর পংগু পরে তোমরা কেমন সুন্দর ছন্দে ঘুরে ফিরে নাচছিলে। ঝম ঝম করে তোমাদের হাতের চুড়ি আর পৈঁছা বাজছিল শিল পড়ার মতো শব্দে। মোরগ না ডাকতে কেন তোমরা চলে গেলে, কুয়াশায় কি তোমাদের ঢেকে ফেলল, না খেপা হাওয়ায় টেনে নিল ! গাছের আড়াল থেকে পিওটি পাখী কাঁদছে, অপটি পাখী কাঁদছে, সব কিছু শূন্য করে চলে গেলে। কেন তোমরা চলে গেলে ?"[১]

১ তিনি দাণি ভোটা তাঁ আজিয়ঁা রিতু ল'াহঁ্ গাজিয়ঁা রিতু / যেহঁ পংগুযোড় যেহঁ আন্দুযোড় ল'াহঁ্ গাজিয়ঁা রিতু / কোয়োক্‌ণে কুপতে তাঁ আজিয়ঁা রিতু ল'াহঁ্ আজিয়ঁা রিতু /

দেহের ক্ষুধার মান, মনের অভিমান, শূন্য হৃদয়ের কবিতা, তার উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে উসকে, উত্তেজিত করে পশুর মতো ছোটাবার জন্য চাবুক মারা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ নীচের দিকে ঢলে পড়েছে, চিন্তাজর্জর হয়ে দিউড়ু এগিয়ে চলল। মনে মনে সে পুয়ুকে পরিত্যাগ করলে। কিছু মদের ঘোরের সঙ্গে অভিমান মিশিয়ে সে ভাবতে লাগল পুয়ুকে সে শেষ বারের মতো সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু পুয়ু তাকে কাছে টেনে নিল না। সে তার দোষ নয়, সব দোষ তার স্ত্রীর, সব দোষ পুয়ুর। এমন করে নিজেকে শুকিয়ে শুকিয়ে মনকে বিরস করে নিজের পৌরুষকে অপমান করে কতদিন সে পড়ে থাকবে? পুয়ুর উপর প্রতিশোধ সে নেবে, নিশ্চয়ই নেবে, আজই রাত্রে।

এমনি আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে সে চলছিল, হঠাৎ মাথায় একটা খোঁচা খেয়ে তার চমক ভাঙল। দেখল সে অনেক দূর চলে এসেছে, কন্ধ বস্তি ছাড়িয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে ডোম বারিকের ঘরেব পিছনের জমিতে ঢুকে সে এসে দাঁড়িয়েছে বালমুণ্ডা ডোমের শোবাব ঘরের সামনে, ছাঁচ তলার নুয়ে পড়া চাল তার মাথায় লেগেছে।

ভাবল, এই ভালো, এই ভালো, নিজের বিবাহিত স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ডোমের ঘরে ঢোকা এক রকম ভালোই। জাতি কুল আভিজাত্য সব ডুবিয়ে দিয়ে সোজা এসে একেবারে ডোমের ঘরে। ডোমের কলসী থেকে জল কিংবা ডোমের হাঁড়ির ভাতের ফেন ঢেলে খেলে তো অ-ডোম ডোম হয়ে যায়। তার পর তো সব সহজ।

কিন্তু সে ডোম হতে চায় না, পুরুষানুক্রমে চলে আসা কন্ধকুলের সাঁওতা-গিরির পরিবর্তে ছোট লোকেদের কোনো গ্রামে ডোম বারিক হয়ে গরু চরাতে সে চায় না।

চিন্তা নেই, বিবেচনা নেই, উপরে চাঁদ, মনের ভিতরে উদ্দাম পাশবিকতা। তার হুঁশ হল যে সে সোনাদেঈয়ের ঘরের দরজার কাছে। হয়তো ভিতরে আছে সোনাদেঈ, অক্ষম স্বামীর সঙ্গে থেকে যার মনে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জলছে না জানি কত দিনের অতৃপ্ত ক্ষুধা। সেইখানে দিউড়ু কাঠ হয়ে

এহি আঁঙ্গু হোতা ডাঁ আজিষ'। রিতু ল'াই_গাজিষ'। রিতু / এহি বাযা হোতা / পিণ্ডটি ল ড়িতে অণটি ল ড়িতে ল'াই_গাজিষ'। রিতু / তিনি দাণি তোটা ডাঁ আজিষ'। বিতু ল'াই_গাজিষ'। বিতু।

দাঁড়িয়ে রইল, মাথায় ঠোকর লাগার মতো হঠাৎ তার হুঁশ হল সে অনেক দূর চলে এসেছে। পাহাড়ী বাতাসে শীত করছে, দূর থেকে যেন কার গলা খাঁকারির মতো শোনা গেল। নাচ-ফেরতা কেউ হয়তো আসছে। ভীত মন তাকে জানিয়ে দিল যে সে পাপ করতে যাচ্ছে। পরের জমি আর পরের স্ত্রীর দিকে নজর দেওয়া কন্ধ সমাজে পাপ। সে ভাবলে কোনো ভুমা তাকে এত দূরে নিস্তব্ধ রাত্রে পথ চলিয়ে নিয়ে এসেছে। আগাগোড়া সব ভুল। গলা খাঁকরানির শব্দ ক্রমে কাছে আসছিল, সেই শব্দেই ধর্মের ধারণা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে দিচ্ছিল। কেউ যদি আসে কি বলবে সে?

আবার গলা খাঁকরানি। দিউড়ু সাঁওতা গুটি গুটি সরে পড়ল। কি বলবে সে? চেক্? (ইংরাজী 'চেক্'-এর অপভ্রংশ) হ্যাঁ, ঠিক তাই। রাতের সময় ডোমেরা বাড়িতে আছে কি না, থাকলেই বা কি করছে এই সব খোঁজ নেবার জন্য চেক্ করতে আসা গ্রামের সর্দারের পক্ষে অসাধারণ কিছু ব্যাপার নয়।

ঘরের পিছনের জমি পেরিয়ে রাস্তায় কিছুদূর চলে আসবার পর সে দেখলে গ্রামের বেজুণী বুড়ী কাশতে কাশতে আসছে। গলায় তার জবা ফুলের মালা। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। আপন মনে বকতে বকতে বেজুণী চলেছে নির্জন রাস্তায় এত রাত্রে।

পূর্ণিমার রাতে নরকঙ্কালের মতো বুড়ী বেজুণীর পথ চলা চইতের ফুর্তির সঙ্গে বড়ই বেমানান ঠেকল সাঁওতার চোখে—ভয়ে ভয়ে সে একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগল কোথায় গিয়েছিল বেজুণী, কোত্থেকে এল?

ছেলেবেলা থেকেই বুড়ীর কথা ভাবতে গেলে মনে যে ভয় জাগত এখনও তেমনি ভয় হল। তার এই ভয়ের গোড়ায় আছে কেবল এই বিশ্বাস যে বেজুণী দেবতাদের সঙ্গে প্রেতদের সঙ্গে মেলামেশা করে। সে মানুষ বটে কিন্তু অসাধ্য সাধন করে।

বেজুণীর সঙ্গে ভূত প্রেতও কি যাচ্ছে না তাকে বাড়ি পৌছে দিতে? গ্রামে বাজনার শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। পথে কোথাও কেউ নেই। চাঁদের আলোয় গাছগুলি ঝিলমিল করছে। আলো আঁধারে মিলে মিশে কত জায়গায় কত রকমের আকৃতি দেখা যাচ্ছে। বনের জন্তুদের মতো অন্ধকার মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে চাঁদের দিককার পাহাড়গুলি, আর গাঁয়ের

নীচেকার গুড়ি আ—সেখানে চাঁদের আলো যেন চারিদিক থেকে গড়িয়ে এসে পুকুরের জলের মতো জমে আছে।

বিকৃতভাবে কাশতে কাশতে গলা খাঁকরাতে খাঁকরাতে বেজুণী বুড়ী সোজা চলে গিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। দিউড়ু তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার বন্য মনে প্রধান প্রক্রিয়া ভয়ের, ভয় গেলে খাদ্যের, তারপর কামের। ভয় তার গড়নের উপকরণ। নির্জন পথে ভূত দেখার মতো বুড়ী বেজুণীকে দেখা, এর পর একলা যেতে আর তার সাহসে কুলাল না, মনের ভিতর নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে বংশ পরম্পরায় পাওয়া রাশি রাশি ভয়ের বীজাণু। দিউড়ু আবার ফিরে এল, ভাবল ডোম বারিককে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। নির্জন পথে গ্রামের প্রান্তে বড় তেঁতুল গাছের তলা দিয়ে একলা সে কিছুতেই যাবে না।

কিন্তু ফিরে আসার পথে সে দেখল আর এক দৃশ্য—বারিক ডোমের রাস্তার মোড় থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেলতে দুলতে কে যেন এগিয়ে আসছে, লম্বা পাতলা গড়ন, মুখটা দেখা যাচ্ছে না, মাথা নিচু করে সোজা সামনে এগিয়ে আসছে।

এই সময়েই এমন দৃশ্য দেখবে তা সে মোটেই ভাবেনি। বেজুণী এই গেছে হাঁকার দেওয়া রাত্রির বাঘের মতো, এখন আবার আধিভৌতিক ঢেঙা 'কেউ' হঠাৎ এগিয়ে আসছে কাছে। দিউড়ু দেখলে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই।

দিউড়ু সাঁওতা দৌড় দিল।

সেই মূর্তিটাও ঠিক তার পিছু নিল, সেও দৌড়তে লাগল। বস্তির কাছাকাছি এসে সে দৌড়তে দৌড়তে "চোর—চোর" বলে চীৎকার করতে লাগল। কোত্থেকে একটা কুকুরও এসে উপস্থিত হল। এই সব দেখে আশ্বস্ত হয়ে দিউড়ু সাঁওতা দাঁড়াল, জিরিয়ে নিল, কারণ সে বুঝতে পারল যে পশ্চাদ্ধাবনকারী ভূত প্রেত কেউ নয়—মানুষ, কেবল মানুষ নয়, তার লেঞ্জু কাকা।

দিউড়ু অন্ধকারে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, তার সামনে দিয়ে গ্রামের কুকুরদের সতর্ক করতে করতে লেঞ্জুকাকা দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল।

দিউড়ুর মনে হল কাকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, আবার ভাবল বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে সে নিজেই ধরা পড়বে।

কিছু বলতে পারল না, কিন্তু সন্দেহ হল এত রাতে লেঞ্জুকাকা কোথায় গিয়েছিল।

॥ একচল্লিশ ॥

সেই চইত পরব লেগেছে বন্দিকার গাঁয়ে।

গাঁয়ের বাইরে ঢিবিতে ঢালুতে ফুলের গহনা পরা তেল-হলুদ মাখা যুবতীদের অহরহ নাচ, সর্বক্ষণ ঢ াই ঢ াই বাজনা কানে বাজে, তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কামারশালে ভারী ভিড, ওড়িআ নলি, ঝামকি নলি (ছয় ফুট লম্বা দেশী তোপ), কেপু নলি সব মেরামত চলেছে। লোহ্রা (কামার) লোহাপাথর গলিয়ে গলিয়ে লোহা বার করে তাই দিয়ে গড়ে দিচ্ছে নতুন নতুন বন্দুক, বর্শা, লোহার গুলি।

সর্বত্র শিকারের আয়োজন। কেউ শিকারী কন্ধ কুকুরের দল নিয়ে ভেড়া ছাগল তাড়িয়ে আনবার ছলে চৈতী বেণ্ট (শিকার) অভ্যাস করছে, কেউ বা হাতের উপরে ভৃঙ্গরাজ পাখী বসিয়ে দেখছে কেমন করে ফিঙে পাখীর মতো এইটুকু পাখী ঝাপটা মেরে মেরে আর চোখের কাছে ডানা ফরফর করে বনের বড় বড় জন্তুকে বাইরে বার করে আনে, বিশেষকরে বাঘকে। বনের মধ্যে গিয়ে মাদল বাজালে বাঘ মামা নিশ্চয় বন থেকে বেরুবে। আবার তন্ত্র-মন্ত্র জানা লোক আছে, তারা কি যেন পাতে, তাতে জন্তু আপনি যেন কিসের ডাকে বাইরে বেরিয়ে আসে আর বন্দুকের গুলি খেয়ে না মরা পর্যন্ত বাইরেই থাকে, যতই গুলি ছোঁড়া হোক ভয় পেয়ে পালায় না। বর্ষা আর শীতের সময়ে বাঘ যত মানুষ খেয়েছে, জঙ্গল শুকিয়ে যাবার এই ঋতুতে তোলা হয় তার প্রতিশোধ। তাই এত গুলি, বর্শা, বন্দুক। যারা বিষ দিতে জানে তারা তীরের ফলায় বিষ চড়াচ্ছে, জড়ি বুটির বিষ, পচা মাংসের বিষ। সবখানেই চলেছে শিকারের চর্চা। কেউ কেউ হরিণ, সম্বর মারবার জন্য জঙ্গলে খারি ছড়িয়ে এসেছে—খারি বলতে নুন, মুত, শুটকী মাছ, মেথি,

রসুন ইত্যাদি চটকে মেশানো, তাই ছড়িয়ে দেওয়া হয় খানিকটা জায়গায়, জন্তুরা খেতে আসে। গাঁয়ের ছেলেরা খরগোশ ধরবার জাল নিয়ে গাঁয়ের নীচে ঝোপ জঙ্গলে শিকারের খেলা আরম্ভ করেছে। রাত্রিতে আলো জ্বেলে ঘণ্টা বাজালে খরগোস আসে।

মদ খেয়ে মশগুল হয়নি এমন পুরুষ অল্প। জঙ্গলের ভিতর থেকে গোপনে চোলাই করা মদের আমদানী প্রচুর হয়েছে, সবাই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, হয় লম্বা বক্তৃতা নয় গান লেগেই আছে সকলের মুখে।

প্রতিদিন মাংস, গ্রাম থেকে দূরে পাথরের চাতালে বুড়ো বলদের মৃত দেহ পড়ে আছে, আর লোকেরা শকুনের মতো তাকে ঘিরে বসে হাতিয়ার দিয়ে মাংস কাটাকুটি করছে, মাংস আসছে।

চইতের হট্টগোলের মধ্যে বিয়ের চিন্তা, পুবুলির চিন্তা বাজনার তালে তালে লুকিয়ে এসে আবার দূরে সরে যায়, হার্গুণা সাঁওতা পরবের কাজে মন দেয়, কারণ চইত আপন ঘরকরনার দিন নয়, ঘর উজাড় করা গোষ্ঠীগত আনন্দের দিন। গাঁয়ের মোড়ল সে, বয়সে বড় হোক ছোট হোক, পাকা দাড়িগোঁফওয়ালা বয়োজ্যেষ্ঠরাও কারণে অকারণে তার কাছে পরামর্শ নিয়ে যায়। সে অনুভব করে যে সব কিছুতেই সে। যখন হয়তো দড়ির খাটিয়ায় বসে এক মুহূর্ত বিশ্রাম করছে, কন্ধভাইরা মদ খেয়ে হইহই করে এসে উপস্থিত হয়, খাটিয়া শুদ্ধ তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হইরই চীৎকার করতে করতে 'বাইলে—বাইলে' গানের ধুয়ো ধরে নাচতে নাচতে নিয়ে যায় তাকে নাচের মণ্ডপে।

ডাকাডাকি পড়ে যায়—"সাঁওতা—সাঁওতা—আমাদের জোয়ান সাঁওতা!" কখনও বা নাচুনী মেয়েরা তাকে ঘিরে তার গায়ে ফুল ছোঁড়ে, ঠাট্টাতামাশা করে, জোর করে তাকে নাচায়। তারই গ্রামের ভিতর দিয়ে দলে দলে ভিন গাঁয়ের মেয়েরা গান গাইতে গাইতে চইতের রঙিন স্রোত বেয়ে চলে যায় —বড় শংকার, নিসার, খালকণা, কনাপাড়ি, দামনগণ্ডা, কার্লি, এমনি কত গাঁয়ের মেয়ে—কন্ধনী, পরজানী, ডোমনী। ভিন্ন ভিন্ন মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন দল। নিজের জাতির লোক পেলে খুব ধুমধাম হয়। তাদের ফুর্তি প্রকাশ্যে —হাঁ বললে হাঁ, না বললে না। সব কিছুই ধাংড়ীর যেমন ইচ্ছা, ইচ্ছা হলে খেলবে, তা না হলে বলবে—'নিচু নিচু, কুইঁ কুইঁ', না না, ইচ্ছে নেই।

সারা দেশটা জুড়ে মেলামেশার আনন্দ, সব কেবল ভোগের জন্য। বিরহ বেদনায় করাতে চেরা মন নিয়ে, গোমড়া মুখ ফুলিয়ে বসে থাকার না জোটে সময়, না জোটে সুযোগ।

কিন্তু হিকোকা হাগুর্ণা সাঁওতা চইত পরবে যেতেও তার মামার বাড়ির রাস্তায় যেতে যেতে নারণপাটণার পাহাড়তলির নব্য সভ্যতার কথা ভুলতে পারে না। মনে মনেই সে সাত-পাঁচ চিন্তা করে যে চৈত্রের ধুমধাম শেষ হলেই সে একটি গরুর গাড়ি করবে আর লোহার কড়াইয়ে কেমন করে গুড় তৈরি হয় তার খোঁজ-খবর নেবে। নিজের উচ্চাশা, নিজের প্রগতিবাদে তার দলের অন্যান্য কন্ধদের চাইতে আপনিই যেন উঁচুতে উঠে যায় সে। অল্প বয়সে বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি আর খেলাধুলোর মধ্যে তার মনের গেরস্থালি গোছানো স্বভাব চাপা পড়ে যায় না। গরুগুলিকে পরবের পেটভরা খাবার খাওয়াবার সময় বসে বসে তাদের ভাল করে দেখে আর ভাবে তার গাড়িতে জুতবার জন্য কোন্ বলদ জোড়া সে বাছাই করবে, আর কখনো কোনো বলদের অসুখ হলে বদলি দেবার জন্য কোন্‌টাকে রাখবে। এই হিসাব কেতাবের মধ্যে কন্ধের সাধারণ বিবেচনার নিক্তিতে ওজন করে সে মনে মনেই কষে দেখে কাকে সে ঘরে আনবে তার ঘরনী করে—তার দেহে শক্তি থাকা চাই, সহিষ্ণুতা থাকা চাই, তাকে পরিশ্রমী হতে হবে, বুদ্ধিমতী হতে হবে সাধারণ মতো ; আমরণ তার সঙ্গী হয়ে থাকবে, সন্তানের মা হওয়াতে গৌরব বোধ করবে, হাগুর্ণার মতো তার স্ত্রীরও উদ্দেশ্য হবে নূতন সভ্যতার সুযোগ নিয়ে বর্ধিষ্ণু পরিসরের মধ্যে ঘরকরনা করতে করতে এগিয়ে চলা।

এই সব চিন্তা বিবেচনার ফলে সে চইত পরবের মধ্যেও ঘরনী আনার কথা ভাবে, সেই সূত্রেই আসে পুবুলির চিন্তা—কেবল স্ত্রীলোকের চিন্তা হিসাবে নয়, ভোগে সে অনভ্যস্ত নয়, স্ত্রীর চিন্তা হিসাবে।

মিণিআপায়ু থেকে ফিরে আসার পর টিংগু, টিমা, সোভেনা কেউ ঐ পথের ধুলোর কথাও আর মনে আনেনি, দুঃখ হয়েছিল কেবল শলপু কন্ধের। সে বুড়ো মানুষ, বুড়ো সরবু সাঁওতার অভাবের আঘাত নিয়ে ফিরেছিল সে। তার বড় আশা ছিল যে এইবারের দেখা শোনার মধ্যে পুবুলি আর হাগুর্ণার মধ্যে একটা কিছু ঘটবে, কিন্তু কিছুই ঘটল না। শলপু কন্ধ কড়া মেজাজের মানুষ বটে, বাহিরটা তার তেমন কোমল নয় ; কিন্তু বুড়োরা অন্যদের দু'হাত

এক করায় সুখ পায় আর শলপু কন্ধের মন গোষ্ঠীর প্রত্যেক কন্ধের প্রতি কেবল স্নেহ আর শুভেচ্ছায় ভরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবলে দুই গাঁয়ের দুই সাঁওতা ঘর বিয়ের গাঁঠছড়ায় বাঁধা পড়বে এ-আশা তার কেবল দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে।

সেই শল্‌পু কন্ধই হাগু্ণাকে মনে করিয়ে দেয় মিণিআপায়ুর পুবুলির কথা: 'চইত পরব তো এসে পড়ল সাঁওতা, চল্ না এ বছর মিণিআপায়ু যাই, না কি বলিস্?"

"এই সেদিন তো সেখানে বেজুণী নাচিয়ে এলাম"—হাগু্ণা বললে।

শল্‌পু বলল, "সে এক কাজ, এ আর এক কাজ। চল না একবার যাই। তোরা জোয়ানরাই আগুসর হয়ে বেরুবি, নয় তো কোথাও যাওয়া না যাওয়ায় আমাদের বুড়োদের কি এসে যায়।"

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শল্‌পু সেই কথা পাড়ে, কিন্তু হাগু্ণা সহজে ধরা দেবার ছেলে নয়। আপন গুমরে সে ফুলতে থাকে এঁটুলির মতো, ভাবে—এত কাজ তার, কোনো ধাংডীর মন তোষ করবার জন্য রঙ্গ ঢঙ্গ করবার তার মোটে সময় নেই।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মাথায় বিছে কামড়ানোর মতো লাগে, এত নাচ এত ধাংড়ীর মধ্যেও হাগু্ণা উদাস হয়ে ওঠে। এসব কোনো কিছুই তার ভালো লাগে না, ভাবে সব মেয়ে সমান, একই রকম নির্বোধ, একই রকম হিংসেবী, স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর। তার চেয়ে বরং তার নিজের গাড়ি কেনার কল্পনা করে সে, তার ভাবী বণিক-জীবনের প্রথম ধাপ সেটা।

গরুর গাড়ি—চাষ—ব্যবসা—ব্যাপার—। সে প্রস্তুত থাকবে, হয়তো এরপর কোনো দিন রাস্তা এসে যাবে, পাকা বাড়ি তৈরি হবে, ব্যবসার বাজার ভাল হবে।—সেই দিনের জন্য সে প্রস্তুত হতে থাকে। বড় ঘর, ধান আর মাড়ুয়ার জন্য মরাই—কানে কুণ্ডল, মাথায় পাগড়ি, গায়ে কোট কামিজ। কোমরে লম্বা লেজওয়ালা রঙ্গিন কৌপীন—সাহুকারবৃত্তি, টাকা, গলায় সোনার হার। ঘরে হয়তো ঐ এক রকমের বাতি যা সে দেশের লোকে দোকানে টাঙ্গিয়ে রাখে, দূর থেকে দেখায় উজ্জ্বল তারার মতো।

বাকী আর সব সে হেসে উড়িয়ে দেয়, ভেবে ভেবে স্বাস্থ্য নষ্ট করে না।

এই বাকী সবের তালিকায় স্ত্রী জাতি। যে এগিয়ে আসবে আসুক, নিজে আগ বাড়িয়ে যাওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ।

॥ বেয়াল্লিশ ॥

চৈত্রের বনকে সান্ত্বনা দিয়ে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে চৈত্রের পথ : ওর ছিল, আজ নেই : এর ছিল না, আজ হয়েছে। দুয়ে মিশে গিয়ে আবার সেই চেতনার ঘন বন। গাছের বন পাতলা হয়েছে, মানুষের বন বেড়েছে।

সেই সরু সরু পায়ে দলা চলা পথ, লাজে সিরসির, ভয়ে থুরথুর, আভিজাত্যের পিত্তল-ফলক বুকের উপর ঝকঝকিয়ে যে কখনো ইতিহাস রচনার দম্ভ দেখিয়ে পৃথিবীর সামনে নিজের কথা ব্যাখ্যান করেনি, তারি শিরায় শিরায় আজ মানুষের ঠেলাঠেলি, তার বাঁকে বাঁকে আজ সৃজনের অপূর্ব আদর সোহাগ, সেখানে কোলাহল, সেখানে আনন্দ, সেখানে রঙ। কত দল আসে, কত দল যায় ঐ আপন-ভোলা সরু পথ দিয়ে। পাহাড়ের অন্ধিতে সন্ধিতে, ঘাট আর টিলার ধাপে ধাপে, লতাপাতার ভিতরে চঞ্চল হয়ে ফেরে অসংখ্য নর-নারী, পথের বটগাছের তলায় মেলা বসে, খড়ের ভিতরে শিকার চলে। পাথুরে ঝরনা-ধারের ছোট ছোট গুহার মধ্যে শেওলার গালচের উপরে, যেখানে ঝরনার ছলছলানিতে চেতনার উন্মেষ হয় সেখানে বনের মায়াজালের তলে তলে তরুণ-তরুণী বসে পড়ে কুরুহেই ফুলের ফুরফুরে সুগন্ধের মধ্যে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মানুষের ক্রমবিকাশের কোন্ ফাঁকে পালিয়ে এসে কবে তারা বনের অঞ্চলতলে আশ্রয় নিয়েছিল, আজ তারা আনন্দের পূজারী। চৈত্রের পথে পথে আজ আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে। সেখানে আছে আনন্দের কত উপায়, কত বিধান, কত আশা। ভাঙা মদের হাঁড়ি, ছেঁড়া ফুল, খসে পড়া ছেঁড়া নেকড়া, অগণিত পায়ের অজস্র ধুলো, এই সে পথের ভূষণ, পথের কাহিনী ; যেন নানা ছবি, কিন্তু তাদের ঝলক এক রকমের হলেও ফলক এক নয়, তাই তারা বিভিন্ন, আলো কেবল এক।

চইত পরব। বিভিন্ন ছবি, এক এক জন এক এক রকম, এক এক দল

এক এক রকম। দূর দেশ থেকে সাহুকারের গোতির দল ছুটিতে ফিরছে, ডুগডুগা বাজিয়ে হইরই করতে করতে ফিরছে সব উৎকল-সন্তান, কল-কারখানার দেশের চাকরির জায়গা থেকে, সাহেবের চা-বাগান সেই কোন্ সুদূর আসাম থেকে—খুব অল্প। এক দল শিকার করে ফিরছে নিবিড় বন থেকে, মরা জন্তুর দেহগুলিতে গোছা গোছা ফুল ঝুলিয়ে বাঁশে বেঁধে নাচতে নাচতে ফিরছে। এক দল খালি হাতে মাথা নিচু করে। এক দল বীর বেশে বুক ফুলিয়ে চলেছে শিকার করতে, যেন পাহাড় উপড়ে ফেলবে। গান গাইতে গাইতে চলেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধাংডার দল। পিছনে পিছনে ধাংড়ার দল। অসংখ্য লোক চলেছে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি। আরও অসংখ্য চলেছে বউ আনতে। নতুন বউরা শ্বশুর বাড়ি চলেছে। থেকে থেকে মুখ ফিরিয়ে থেমে মায়ের আঁচল ধরে টানতে টানতে বলছে "যাব না —যাব না।" কেউ বা একটি 'বউ' কোলে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে, এই তার 'উঢ়লিআ' বিয়ে। তেমনি পলায়নপর 'উঢ়লিআ' 'বর'কে ঘিরে ধরে 'বউ'-য়ের সঙ্গিনীরা গরুর মার মারছে, সে সইছে। উঁচু থেকে কনে হাসছে।

এই পাগল চইতের অলস পথে পথিক থেমে থেমে তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখতে দেখতে কান পেতে শুনতে শুনতে পথ চলে। সেই পথ দিয়ে আসছিল দুই জন--একটি বুড়ী আর একটি অল্প বয়সী মেয়ে। বেলা আছে, বন্দিকার কাছিয়ে এসেছে, এই ঘাট থেকে নেমে গেলেই তার ওদিকে বন্দিকার। বে-[illegible]ড়ে এলে চড়াই শুরু হবে।

ঘোলমউনির মতো শির তোলা পর্বত, তার উপরে দিন শেষের আলোর খেলা। বুড়ী [illegible]র ফিরে দেখছে, কখনো বা হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে। মেয়েটি চাইছে সামনে, আসে পাশে, যেদিকে হাসাহাসি করতে করতে [illegible] ঠাট্টা-তামাশা করে লোকে চলে যাচ্ছে। আপন রূপের শ্রীতে আ[illegible] হয়ে সে পথ চলছে। তার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকছে না, তার রূপ দে[illegible]থ ভুলছে না এইটুকুই তার দুঃখ।

দেহের [illegible]র যৌবন হাত বুলিয়ে গেছে, তাকে পরিপাটি করে তুলেছে মানুষের হাত। চৌদ্দ হাত রঙিন শাড়ী তার পরনে, নীচের দিকে কুঁচি দেওয়া, উ[illegible]র [illegible]ল এক গোছা রঙিন পইতার মতো খোলা গায়ে কোমর থেকে গলা পর্যন্ত শুয়ে আছে যেন। মাথায় দক্ষিণী খোঁপা, তাতে নানা

রকমের ফুল। পায়ের ধুলোর সঙ্গে লাল আলতা মিশে গেছে। স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ দেহ, হলুদ আর রেড়ির তেল মেখে আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্যময় দেহের গঠন। কিন্তু এই সব এক দিকে, আর দিকে তার মুখখানি —যে মুখ একবার দেখলে চোখের ভিতর দিয়ে মনে গভীরে নেমে গিয়ে রাত্রির স্বপ্নের মধ্যে জাগতে থাকে—যে সময় মেঘলা চাঁদের হালকা আলোয় মানুষ স্বপ্ন দেখে: সে কেবলই গভীর ঝোরার খদে নেমে হরিণ মারতে চলেছে, উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠে নীচে খদের দিকে দৌড়ে দৌড়ে নামছে,-কেবল বনের দৃশ্য যত।

ফুল গোঁজা খোপার উপরে মাথার পুঁটলি নিয়ে বুড়ীর আগে আগে মেয়েটি চলেছে, বুড়ী তার পিছনে যেন পাহারাদার। বুড়ীর কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, পরনে মোটা ময়লা তেলেঙ্গা কাপড়, মুখে জ্বলন্ত তেলেঙ্গা চুরুট। হাড় বের করা তোবড়া গালের গর্ত যেন কর্কশ কুটিলতা ঢালাইয়ের ছাঁচ। তার হাতের কবজিতে মোটা চৌকোনা পেটা পিতলের বালা, সেও তার সাধারণ কঠিনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বড় বড় পা, শির বের করা পায়ের মাংসপেশী। সবটা মিলে দেখতে লাগে যেন ঠিক শুটকী মাছওয়ালী।

লোকে দেখে ভাবে হয়তো বা তেলেঙ্গা ব্যাপারী এরা, তামাক পাতা নয় তো শুটকী মাছ বেচবার জন্য দশ ক্রোশ পনর ক্রোশ পাহাড়ী পথ পার হয়ে হাটে হাটে ঘুরে বেড়ায়, কেউ যাদের দিকে চেয়ে দেখে না। কিন্তু এই দু'জন—এদের মাথায় কেবল যে পসরা নেই তা নয়, এদের সঙ্গে দলও নেই। সব চাইতে আশ্চর্য, এদের মুখে অনর্গল তেলেঙ্গা ভাষার শব্দবাহুল্য নেই। যতই পথ চলছে ততই বুড়ির কাঠিন্যের উপরে পড়ছে ঔদাস্যের ছায়া। যেন এসব তার চেনা এমনিভাবে চারিদিকে চেয়ে সব ঠাউরে নিচ্ছে। মেয়েটি রাগ করছে, এমনি পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা নামা ঘুরে বেড়ানার জন্য তার শরীর তৈরী হয়নি, তার চেহারা আর বেশবিন্যাস দরকার অন্য কাজের জন্য। অন্যের কাছে প্রশংসা আর স্তুতি শোনাই তার অভ্যাস, সকলেই তার কাছে মাথা নোয়াবে এও তার অভ্যাস—কাকে তুলবে আর কাকে ফেলবে সে বিচার তার ভুরুর ভঙ্গীতে আর ঠোঁটের ঠাটে। কতই তো যাচ্ছে সামনে দিয়ে, নোংরা ধুলোমাখা অর্ধনগ্ন বনের ছেলে সব, খালি থপাস্ থপাস্ চলন আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি। তার মন বেখিয়ে উঠছিল।

তার ঈর্ষাকে উসকে দিয়ে নিজেদের পথে চলে যায় তারা—বন দেশের ধাংড়া ধাংড়ী, তার তলদেশী চেকনাইয়ের নীচে মরমে গিয়ে পশে তাদের উত্তাল মনের চপল কথাগুলো। সে ভাবে সেও এদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে আঁধার জংলী হয়ে চলে যায়, কিন্তু তাই কি আর হয়। উচুঁ পাহাড়, বেলা পড়লে এই চৈত্রের দিনেও পাহাড়ী ঘাটের হিমেল বাতাস হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে যায়; না আছে শহর না আছে বস্তি, যে দিকে তাকাও শুধু তীক্ষ্ণ পাহাড়, কেবলি এক এক করে চোখের সামনে আসছে, দৃষ্টির সঙ্গে প্রাণকেও যেন শুষে নিতে চায়, গিলে ফেলতে চায়।

"উঃ, আর কত দূর মা?" মেয়েটি শুধাল।

কঠিন চেহারায় কোমল সহানুভূতি এনে পাথরের উপর পড়ন্ত বেলার ছায়ার মতো ম্লান হয়ে বুড়ী বলল, "কত কষ্ট পেলি মা, না? পাঁচ দিন পাঁচ রাত কম কথা নয়। তা এই শেষ হল বলে, আর একটু এগিয়ে গেলেই আমাদের ঘর—ঘর আর কোথায় পাব মা, ঘর নয় তো, আমাদের গাঁ।"

"এসেই পড়েছি তাহলে। একটু বসা যাক, কেমন?"

"বসবি যদি তো বস একটু—আহা, এত হেঁটে হেঁটে—। কিন্তু দেরি হয়ে গেলে—দেখিস আবার, গ্রাম কাছে হলে কি হবে, বনের জন্তুকে বিশ্বাস নেই তো—"।

"বনের জন্তু," মেয়েটি হাসল। "তাদের পেটেই যদি যেতাম তাহলে এত দূর প্রাণে বেঁচে আমরা আসতে পারতাম মা? এ কেমন দেশ মা গো, রাস্তা ঘাটই বা কেমন! আমাদের মরণ নেই বলেই না—"

"ছি ছি, এমন কথা কি বলতে আছে! ভয়কে ডাকলে ভয় কাছে আসে, মরণকে ডাকলে মরণ কাছে আসে, জানিস মা? এমন কথা বলতে নেই।"

বুড়ী চিন্তিত হল। কৌতুহলী হয়ে মেয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। দু'জনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মেয়েটি যেন কি ভাবছিল। শেষে বলল, "সত্যি মা? সত্যি ডাকলেই মরণ এমনি করে কাছে আসে? তুই তো জানিস মা, লোকে বলে তুই সব কিছু জানিস। সত্যি করে বল তো, ডাকলেই যদি মানুষের সব দুঃখ কষ্ট এমনি ঘুচে যায়, তাহলে তুই সব জেনে

শুনে নিজে না মরে, আমাকে না মেরে জঙ্গলে জঙ্গলে এতখানি পথ ছুটে এসেছিস কেন? আমাদের আর কি বাকী আছে যে প্রাণ বাঁচাবার জন্য এমন ভীষণ দেশে পথ করে করে এত দূরে নিয়ে এলি মা?"

বুড়ী এবার রাগ করল, বাইরে শুধু সামান্য বিরক্তি দেখিয়ে বলল, "দেখ পিওটি, তোকে নিয়ে আমি আর পারব না, যতই বারণ করি ঘুরে ফিরে তুই সেই এক কথা বলিস—মরে যাব, মরে যাব। কেন মরে যাবি? কি যা তা কথা সব সময়। কান্নাকাটি করলাম, কপালকে যত দুষবার দুষলাম, গাল দিলাম, আর কেন ঐ কথা সর্বক্ষণ? এমনি করে জ্বালাবি তুই চিরটা কাল?

"যেখানে যত দিন থাকা কপালের লিখন, তাতে দুঃখ করবার কি আছে? কেউ তো 'কুল খেয়ে কুলের আঁটি পোতে নি'[1] যে তারি জন্য হেদিয়ে মরতে হবে কেবল। যখন ভালো দিন এসেছিল এই বনের ভিতর থেকে তল দেশে চলে গিয়েছিলাম। আবার খারাপ দিন এসেছে তাই এই বনের ভিতর পালিয়ে আসা ছাড়া আর উপায় নেই। তা তাতে হয়েছে কি?

"বুঝলি পিওটি, যে বন পাহাড় দেখে তোর গায়ে জ্বর আসছে সেই বনেই তো তোর জন্ম, আবার সেইখানেই তোকে নিয়ে চলেছি, এখন আমার দায়িত্ব শেষ। সেও এই বলেই মরেছিল—ধরা গলায় বুড়ী বলে চলল—'মরতে ভয় কিসের? মরলে নিজের খুশিমতো আবার কারো না কারো পেটে জন্ম নেব। মরতে ভয় নেই। তবে যদি দেখিস যে এখানে দুর্দশায় পড়বি, অচল অবস্থা হবে, পথের কুকুরের মতো, তখন আর এখানে থাকিস না, চলে যাস আমার বাপ দাদার গাঁয়ে, সেখানেই কষ্ট করে মজুরি করিস, এখানে নয়, এখানে কেউ তোকে পুছবে না। তল-দেশে ধন আছে বটে কিন্তু মন নেই। তেমন তেমন যদি বুঝিস তাহলে তুই আমার গাঁয়ে ফিরে যাস, ঘর যদি ভেঙে গিয়ে থাকে নতুন ঘর তৈরি হয়ে যাবে। সেখানে তোকে শলপু চিনবে, লেম্বু চিনবে। আর যাই হোক, এইটুকু তারা মনে করবে যে বন্দিকার গ্রামে কোণ্ডাতাম্বেরু বংশের সংড্রংগা বলে কেউ ছিল।"

বুড়ী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মেয়েও কোনো কথা বলল না।

১ ওড়িয়া প্রবাদ। কোথাও কোনো সুখ-সুবিধা ভোগ করিয়া পরম্পরাক্রমে তাহা ভোগের ব্যবস্থা করা।

মায়ের এই কথা সে বারবার শোনে। এ সব তো যুক্তি নয়, মনগহনের রাগিণীর ধুয়ো, তা নিয়ে তর্ক চলে না। সে চুপ করে থাকে।

আবার বুড়ী হঠাৎ বলে উঠল, "দেখ তো পিওটি, ভালো লাগছে না? সত্যি বল তো? আমাদের ঘর এসে পড়েছে, সেখানে আমাদের নিজেদের লোক, নিজের গ্রাম। ফিরে আসতে ভালো লাগছে না? ওঃ, কি লম্বা ঘুমটাই দেব!"

কিছু না বলে শুধু হি-হি করে হেসে উঠল পিওটি। অস্ত সূর্য তখন পাহাড়ের আঁচলে সত্যিই যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। ঐ আগুন আর পিওটির মন এ দুয়ের মধ্যে মিল ছিল, আর উভয়ের মাঝখানে ছিল সম্পত্তিবাদী পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো বুড়ী, সে তার মা। মা তাকে ধরে ধরে নিজের সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকেই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

পিওটির হাসি বাধা মানল না। আবার দু'জনে হাঁটতে লাগল। মন্ত্র আওড়ানোর মতো বুড়ী বলতে লাগল—"হাসছিস মা, হেসে নে, হাসলে আয়ু বাড়ে। তুই এমনি হাসতে থাক আর তোর সামনে আমি শুয়ে পড়ি। তোর কি নিজের বুদ্ধি হয় নি যে আমি তোকে বলে দেব? চৈত্রে এসেছিস, এত বছর পরে এসেছিস, গাঁয়ের লোকে সাত রাজার ধনের মতো আদর করে নেবে, হাসিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলবে। তোর সুখেই আমার সুখ। তা আমার একটা ছোট কথা শুনবি? মেলা এক রাশ কথা বলিস না এখানে, লক্ষ্মী সোনা। আর যত খুশি গল্প করিস, যত খুশি নাচিস. আমাদের আগেকার কথা কাউকে বলিস না। সবাই নানান ছলে সেই কথা বার করতে চাইবে, শুধোবে, সব শুনে নেবে, তার পর তাই নিয়ে বিচার করবে, রকম রকমের অর্থ বার করবে, শত্তুর যারা—হাসবে। বুঝলি, সে সব কথা একেবারে ভুলে যা। এখন নতুন ঘরকরনা, নতুন কথা, সে সব আর নয়, ছি—"

হাসি গিলে ফেলে পিওটি এগিয়ে চলল। আঃ, কি তাড়াতাড়ি ছায়াগুলো লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, আর কত দূর? ছায়া আর মানুষে যেন পাল্লা চলেছে, কে হারে কে জেতে।

একটু দূরে অচেনা কন্ধ জোয়ানরা চৈতী গান গাইতে গাইতে চলেছে।

কি ফুর্তি! সারা গায়ে ফুল, কোমরে সুতো বাঁধা, তাতে কৌপীন গোঁজা। দেহের ভঙ্গীতে স্বাস্থ্য ঠিকরে পড়ছে। বনের পশুর মতো সবল দেহ, তেমনি উগ্র তাদের নেশা। গানের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাংসপেশীগুলি ফুলে ফুলে উঠছে। তীর ধনুক, বর্শা, আর ওড়িআ নলি নিয়ে বীরপুরুষের মতো বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলেছে।

কে যেন একজন সত্যি সত্যি তার নাম ধরে কিছু একটা বলল, দলের মধ্যে কোন্ জন সে? তাকে চিনল কেমন করে? তার সংশয় ঘুচিয়ে কন্ধ গোষ্ঠীর গান ছুটল—

"হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, বেড়ার বাইরে যাসনে রে—

"ওদিকে 'পিওটি' (বউ-কথা-কও) কাঁদছে, ওদিকে 'অণটি' কেঁদে উঠেছে, চইতের নেশা, বেড়ার বাইরে যাসনে রে!

"ওগো মামার বাড়ির মেয়ে, পায়ের মলের মতো কানের কুণ্ডলের মতো তুই আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে আছিস, 'পিওটি' কেঁদে উঠেছে, বেড়ার বাইরে তুই যাস্‌নে!"

পিওটি চমকে উঠল। থেমে থেমে বার বার চলতে লাগল সেই গান, দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে থেমে যাওয়ার মতো, আবার দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে থমকে থেমে যাওয়ার মতো তার সুর:

পিওটি লো ডিতে, লো অণটিলো ডিতে
লো সরু সোলমালি।
লো আন্দু জোড়ু, লো আলো পংগু জোড়ু
লো সরু সোলমালি।
আলো শালাবাড়া, লো আলো বিদাবাড়া
লো সরু সোলমালি।
যেই নিলস বাইলে, যেই তালস বাইলে
লো সরু সোলমালি।

পিওটি এগিয়ে চলে গেল, পিছন থেকে বুড়ী দেখতে লাগল, ইচ্ছে করেই সে আস্তে আস্তে থেমে থেমে চলতে লাগল, এইটুকুই তার ভর দেবার যষ্টি, আবার এই দায়িত্বটুকু সঁপে দেবার জন্যই সে ছুটে এসেছে এই সুদূর বনের ভিতর।

চৈতী পথে টুকরো টুকরো ঘূর্ণির মতো ঘুরছে ছোকরার দল, ওদের রক্তে আছে আগুন, কখন্ কি হয় সে বলতে পারে না।

বুড়ীর সব আশার গুড়ে বালি দিয়ে হঠাৎ গান থেমে গেল। পিওটি তখন তাদের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেছে। দূরে থাকতে আবছা আবছা কেবল বোঝা যাচ্ছিল যে সে মেয়ে, তাতেই উথলে উঠেছিল গানের উল্লাস, কিন্তু কাছে আসতে ছোকরারা দেখল সে-মেয়ে তো তাদের দলের নয়—যেন কোনো তেলেঙ্গা সাহুকারের ঘরের মেয়ে, শুটকী মাছ বেচে হাট থেকে ফিরছে। কে যেন বলল—"সাহুকারনী, সাহুকারনী!" ঐটুকুর মধ্যেই সব।

॥ তেতাল্লিশ ॥

সন্ধ্যার ছায়া হু হু করে নামছে। দূরে বন্দিকাব গাঁয়ের বস্তির ছাপ্পর দেখা যাচ্ছে, তবু পিওটির হাওয়া লেগে পিছনে পিছনে কন্ধ ধাংড়ারা ভদ্রলোক হয়েই চলেছে, আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যেই ফুটফাট কথাবার্তা, আর কিছু না।

দুই দিক থেকে অন্ধকারে ফুলে উঠে বন চেপে এসেছে সরু রাস্তার উপর, যেন একটা সরু গলি। পিওটির ইচ্ছে ছিল না যে এমন ভদ্রলোকের মতো পথ চলবে সে। এতগুলি হাসিতে উজ্জ্বল মুখ, এত রকমের প্রাণমাতানো গানের সুর, 'পিওটি'র আর 'অণটি'র কান্নার মতো গান আর তার মোহ, বেড়ার বাইরে অজানার আকর্ষণ, কোথায় গেল সে সব? কেবল নীরব মৌন বনপথ, ঘর দেখা গেলেও পথ যেন ফুরায় না।

পিওটি মনে মনে ভাবল এই বোধ হয় পথ চলার শেষ, তার মনে পড়ল কত কথা। ছেলেবেলা থেকেই তার বিচিত্র জীবন দেশের বিভিন্ন স্থানে। তার নিজের জাতির লোক, কন্ধভাই, সেখানে খুব কম। খোলামেলা দেশ, নরম মাটির দেশ, গ্রামে গ্রামে বড় পুকুর, জায়গায় জায়গায় বড় বড় গাছের জটলা। সেখানে পুকুরের জলে এখন হয়তো তারার আলো ঝিকমিক করছে, নারকেল গাছের পাতা দুলছে হাতীর কানের মতো। ত্যাগরাজের বিখ্যাত গানের তান ভাঁজতে ভাঁজতে হয়তো চলেছে গরুর গাড়ির সারি,

কাঠ আর বাঁশের বোঝা মাথায় নিয়ে বন থেকে ফিরছে গাঁয়ের লোক। আর এই ঝাপসা সাঁঝবেলাতে হয়তো বেণুগোপালম্ কিংবা ব্যঙ্কটেশ্বরলুর মন্দির থেকে ভেসে আসছে আরতির বাজনা। ম্লানমুখে পিওটি পথ চলছে। সে দেশ আর এই দেশ! সেখানে তার দাম ছিল, আর এখানে—

জন্মভূমি, জন্মভূমি—বুড়ী মা বলে এইখানে নাকি সে জন্মেছিল। সামনে ঐ বন্দিকার গ্রামেই তার বাপ কোণ্ডাতাম্বেরু সংড্রংগার ঘর ছিল। পরে ক্রমে ঋণের বোঝা বেড়ে চলল, শুঁড়ী ব্যবসায়ীরা তার জমি-জমা সব নিয়ে নিল, কুলিদের স্রোতের সঙ্গে সংড্রংগা বউ আর মেয়েকে নিয়ে চলল দক্ষিণ দেশে। সে সব পিওটির মনে নেই, তার জ্ঞান হওয়া অবধি সে দেখে আসছে অন্য এক দেশ, সেই দেশের জলে বাতাসে সে বড় হয়েছে, সেই তো তার জন্মভূমি, সেইখানে তার ছেলেবেলার বড বেলার সঙ্গীসাথীরা—সোমায়া, সংগন্না, প্যাড়িতাল্লিআম্মা। কবে কোন্ দেশে বারো আঙ্গুল মাটির উপরে তার পিঠটা লেগেছিল—মা বলে দেখেছে—সেই বারো আঙ্গুল মাটির দাগ তার গায়ে লেগে নেই।

মা বাবা ঘরে তাকে শেখাল এক ভাষা—সে নাকি মাল দেশের প্রাচীন কুভি ভাষা—আর বাইরে সোমায়া সংগন্নাদের দলে থেকে আর এক ভাষা, এই দুই ভাষাই তার আয়ত্ত হয়ে গেল। দু রকম বুলির মধ্যে কখনো বিরোধ হয়নি, ঘর তো তার আপনারই, বাহিরও তার আপনার হয়ে উঠেছিল।

সেইখানেই ঘরে বাইরে হেসে কেঁদে দুঃখে সুখে চলেছিল তার জীবনযাত্রা। কত সন্ধ্যার স্মৃতি, নির্জন বনপথের—যখন সারা দিন হাট-বাজারের পর প্রাণ চায় একটু আরাম, দেহ অলস হয়ে এলিয়ে পড়তে চায়। দুঃখের দিন এল, বাপ মরে গেল। আপনার বলে নিঃসংশয়ে আশ্রয় নেবার জন্য রাস্তার ধারে গাছের তলায়ও স্থান নেই। সব গেল, মনে হল যেন জীবন শেষ হয়ে এসেছে, তবু সেই বিগত দিনের সুখস্মৃতি যেন বলতে থাকে, ঘুর্ণিতে ঘুরপাক খেতে খেতে আবার ফিরে আসবে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি।

আজ এই বনপথ, তাও নেই।

বুড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার হাঁটতে লাগল। দেখল কিছুই ঘটল না, বনের শিশুকে বন চিনে নিতে পারল না, এই ভেবে তার মন খারাপ

হয়ে গেল। নাঃ, এমন তো হয় না! তবে হ্যাঁ, সত্তর বছর, ঘোর পরিবর্তন। দুই দিকের মূর্বা গাছের বেড়ার মাঝখানে গ্রামের গলি পথ, তার ওদিকে নানা জাতের গাছের বন, সেখানে কোথাও উঁচুতে কোথাও নিচুতে সারি সারি কন্ধ বস্তি।

এই গ্রাম থেকেই স্বামীর হাত ধরে সে একদিন বেরিয়ে পড়েছিল পেটের দায়ে, আজ সে ফিরছে। হাত দু'খানা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, তবু সে ফিরছে সুখে ঝলমলে গাঁয়ের সামনে তার তোবড়ানো মুখ দেখাবার জন্য। বুড়ী চেঁচিয়ে ডাকলে—"পিওটি—পিওটি।" কন্ধভাষায় অনর্গল বলে চলল, "ওলো পিওটি, এই আমাদের গাঁ এল, তোর বাপ দাদার কুলের গাঁ—দেখেছিস্ পিওটি, নমস্কার কর্, নমস্কার কর্ তোর গাঁয়ের মাটিকে--" বলে বুড়ী কাঁদতে লাগল।

মায়ের কান্না পিওটির কানে গেল না, অনেকখানি দূরে সে চুপচাপ পথ চলছে। বুড়ীর মুখে কন্ধ বুলি শুনল ধাংড়ারা, তারা চঞ্চল হয়ে উঠল, সংশয় খুচল। ঐ দূরে যেন পিওটির ছায়াটি মিলিয়ে যাচ্ছে। এক সঙ্গে সবাই হই হই করে উঠল—"মাপঃ কিড়ে—মাপঃ কিড়ে (আমাদের নাকি রে?)" আবার গান ছুটল, হাসি ছুটল। আবার শুরু হল ঠাট্টা-তামাশা করবার, কথাবার্তা বলবার আগ্রহ, শিটি, হাততালি, "ওরে ভাই, আমাদেরই নাকি এরা? আমাদেরই জাতির? ও নুনি, কোথায় গেলি, শোন শোন্—"

পিওটি প্রমাদ গুনল, একা সে। দৌড়ে পালাল পিওটি। তার পায়ের শব্দের পিছন পিছন এক সঙ্গে সব ধাংড়া 'বাইলে বাইলে' গান গেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। ঢোকবার পথে গ্রামের ধাংড়ীরা সব দাঁড়িয়ে ছিল। ঢোল, টমক জোগাড় করা ছিলঃ সব একসঙ্গে বেজে উঠল। দুই দলের গানের আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল। বহু কণ্ঠে গানের ধুয়ো ধরার হৈচৈ-এর মধ্যে অন্ধকারে ইঁদুরটির মতো পিওটি লুকিয়ে পড়ল। চইতের মজা!

ভিন গাঁয়ের ধাংড়া কি ধাংড়ী ঘুরতে ঘুরতে যে গাঁয়ে ইচ্ছা গিয়ে উঠতে পারে, তাতে কোনো বাধা নেই।

হই-হল্লা মানুষের ভিড়, তার পিছন পিছন নাচতে নাচতে ছুটতে ছুটতে ধাংড়ী, তার পিছন পিছন ধাংড়া। তাদের পিছন পিছন দর্শক গাঁয়ের লোক

গাঁয়ের খোলা জায়গার দিকে চলল। পিওটি জুলজুল করে তাকিয়ে দেখে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরের দিকে চোখ ঘোরায়। ছুটে চলা ঝড়ের মতো সব কিছুকে কাঁপিয়ে দুলিয়ে নাচ গানের হররা চলে গেল, পিওটি একলা পিছনে পড়ে রইল। মা বলছিল এই তাদের গাঁ। তা গাঁ তো এল, ঘর ? কোথায় তাদের আশ্রয় ?

দুই পা না যেতেই ঘেউ ঘেউ করে কন্ধ গ্রামের পাহারাদার কুকুর তেড়ে এল। একটা গাছের গায়ে লেপটে পিওটি আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলে। এবার মনে হল বড় ক্লান্ত সে, চোখে সরষের ফুল দেখছে, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, পা দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে, গায়ে আর জোর নেই। এই সময়ে 'পিওটি' 'পিওটি' বলে ডাকতে ডাকতে বুড়ী মা এসে উপস্থিত হল। উদাস গলায় পিওটি সাড়া দিল। মা আর মেয়ে একত্র হল। বুড়ী কেঁদে বলল— "অমন এক ধারে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন মা ? আয়,—আমাদের গাঁ এল যে। এমন আলগা হয়ে থাকলে কি চলবে মা ? আমরা হলাম বিদেশী ; কে আছে আমাদের ? আয়—আয়।"

পিওটির কান্না পেল না, কিন্তু কেমন উদাস লাগল। এত হৈচৈ, এত আনন্দ, পাখীটিরও নিজের বাসা আছে, তাদের কেউ নেই।

মাকে সে বাধা দিলে না। কোনো মতে পা টেনে টেনে চলল অচেনা গ্রামের ভিতরে যেখানে বারো আঙ্গুল মাটি কবে লেগেছিল তার ছোট্ট কচি গায়ে।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

"লেল্লু—লেল্লু—জিক্রু—", মরে হেজে যাওয়া কত লোকের নাম ধরে ডেকে ডেকে বুড়ী ঘুরে বেড়াল, কত দুয়ার থেকে নিরাশ হয়ে ফিরল, কোথাও কারো সাড়া নেই। "লেল্লু—লেল্লু—জিক্রু—", কেউ শুনল না। চইতের রাতে দুই গ্রামের লোক একত্র হয়েছে। গাঁয়ের মাঝখানে আগুন জ্বালা, নাচ, মদ খাওয়া। যারা এক কালে ছিল তারা মরেছে, কোথায় গেছে কেউ তার খবর রাখেনি। অনর্থক নিরর্থক ডাক।

আবার তেমনি ডাকতে ডাকতে বুড়ী ভিড়ের ভিতরে গেল। কত লোকে মদের নেশায় চুর হয়ে আছে, কে কার কথা শোনে?

শল্‌পু কন্ধ একটু মদ খেয়েই ঘরে ফিরে এল, দেখল দরজার কাছে দড়ির খাটে কে একজন বসে আছে। জিজ্ঞাসা করল—"কে?" কোনো উত্তর নেই। "কে? কে ওখানে?"

"আমরা।"

"কে তোমরা?"

এত ফলাও করে জবাব দেবার মতো জোর আর পিওটির ছিল না, কিছু না বলে সে খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। শল্‌পু কন্ধ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল, কিছু বুঝতে পারল না। এই গাঁয়ের মেয়ে তো কখনো নয়। বেশভূষা ধরন-ধারন মোটেই কন্ধনীর মতো নয়। অন্ততঃ তা হলেও সে বুঝত, কারণ ছোকরাদের সঙ্গে মেয়েরাও চলে আসে অন্য গাঁ থেকে চইতের মিছিলে। কন্ধ যা বুঝতে পারে না তাতে তার মনে সন্দেহ আসে, ভয় আসে। শল্‌পু ভাবল, তবে কি ফারষ্টি (ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক) এসেছে? ফারষ্টি এলে সঙ্গে এমন কাউকে নিয়ে আসে। হয় তো তাই, নইলে তার সামনে তারই খাটিয়ায় শুয়ে পড়বে এমন গুমর, এমন সাহস কার?

শল্‌পু কন্ধ বিপদ গুনল। ফারষ্টি! চইত পরবের মাঝে বনমারা[১] ধরা বিদেশী ফারষ্টির আগমন কেবল অমঙ্গলের চিহ্ন। কোথাও এক জায়গায় সে গদিয়ান হয়ে বসে পড়বে, তার সেবা যত্ন করতে হবে, তার সঙ্গের সকলকারই। তারপর ফারষ্টি থলের ভিতর থেকে কাঠের এক পুতুল বার করে তার মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে তাকে মাটির উপর বসাবে, বলবে, "এই তিরুপতি[২] ঠাকুর। তোরা সব নেয়ে ধুয়ে এসে এক এক করে ঠাকুরের মাথায় হাত রেখে বলে যা কে কোথায় বন মেরেছিস, আমি লিখে নেব।" না বলবার উপায় নেই. কারো বারান্দায় বসে ফারষ্টি সব খবর লিখে নেবে, তারপর—?

নয় তো বলবে "তোরা আমাদের জঙ্গলের সম্বর মেরেছিস, হরিণ

১ বনমারা বা চাষের জন্য বন কাটিয়া পুড়াইয়া সাফ করা সরকারের চক্ষে অপরাধ।

২ অন্ধ্রদেশের বিখ্যাত দেবতা।

মেরেছিস্, সে-সব আমাদের গরু, আমরা আমাদের জঙ্গলে ছেড়ে রেখেছি। যদিই বা তারা তোদের ফসল খেয়ে থাকে, তাহলে তোরা নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে দিলি না? মারবার তোদের কি অধিকার আছে? তোদের গরু আমাদের ফসল খেলে কি আমরা তাদের মেরে ফেলতাম?"

শল্‌পু ভাবল নিশ্চয়ই এ ফারষ্টির সঙ্গে এসেছে, কোনো তেলেঙ্গা কাম্প নয় তো ওড়িয়া পাইকের ঘরের মেয়ে হবে। ফারষ্টি আর অনষ্টি (অনিষ্ট) পদ মেলে। ফারষ্টি এল তাহলে।

বড় বড় চোখ করে মেয়েটিকে দেখতে দেখতে তার উপস্থিতিকে আসন্ন বিপদের সূচনা বলে যখন সে কল্পনা করছে তখন পিছন থেকে কে পাগলের মতো ডাকতে ডাকতে এসে উপস্থিত হল—

"লেম্বু সাঁওতা, ও লেম্বু সাঁওতা, কোথায় গেলি, আমরা এসেছি—"

লেম্বু সাঁওতা? সে তো কত বছর হয়ে গেল মরে গেছে, তবু সেই ডাক! মরা মানুষের সঙ্গে দেখা করতে এল কে? সাক্ষাৎ প্রেতাত্মা!

শল্‌পু কন্ধ ভাবল বার্ধক্য-হেতু তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। চেঁচিয়ে হেসে উঠল সে। তার বিকট হাসিতে মেয়েটি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বুড়ীও ডাকাডাকি বন্ধ করে শল্‌পুর কাছে এসে তাকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল।

শল্‌পু ভাবলে তার শুধু মতিচ্ছন্ন হয়নি, সে ভূত দেখছে, ভূতে পেয়েছে তাকে, এখন কোনো রকমেরই মন্ত্রবল বা জড়িবুটি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোবার আগেই বুড়ী চেঁচিয়ে ডেকে উঠল—"শল্‌পু ভাই!"

"কে তুই—কে—?"

"আমি এসেছি শল্‌পু ভাই।"

"কেন এসেছিস তুই? কে তোকে পাঠিয়েছে? আমি তো তোকে ডাকিনি, আমার তো এখনো সময় হয় নি—তবে তুই কেন এলি, অ্যাঁ? বল্—কে তুই?"

শল্‌পুর হকচকানি দেখে পিওটি হেসে গড়িয়ে পড়ল। শল্‌পু চমকে উঠল। এ কে? কে এরা?

যতদিন আগেকার কথা মনে পড়ে তখন থেকে পিওটি এদের চেনে।

বাবার কথায় মার কথায় দিন দিন এরা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার কাছে। কিন্তু মনের ভিতরের মানুষের কোনো বদল হয় না, বাড়েও না কমেও না, অথচ এই শল্‌পু কন্ধ এমন বুড়ো, মাথার চুল হয়েছে শণের নুড়ি!

হাসতে হাসতে পিওটির শেষে অরুচি ধরে গেল। উপস্থিত নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ল। কার খাটিয়া চেপে বসে আছে সে? কোথায় তার আশ্রয়?

মা এত বলে এরা আমাদের, তারা আমাদের! বুঝুক এখন! বেশ হয়েছে, কেউ না চিনুক!

"চিনতে পারলি না, শলপু ভাই? সংড্রংগাকে তোর মনে নেই? এত শিগগির তাকে ভুলে গেলি? একে না হয় চিনবি না, এ তো তখন দুধ খেত—যখন আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।"

"সংড্রংগা! সংড্রংগা! কোণ্ডাতাম্বেরু সংড্রংগা! কোথায় সে, বোন?"

"আর কোথায় সে। কে বলবে—শুধোচ্ছিস যে!" বুড়ী এবার কাঁদতে লাগল, দূর বিদেশের যত দুর্দশা অপমান উথলে উঠল কান্নার জোয়ারে। সেইখানে বসে পড়ে বুড়ী মড়া কান্না কাঁদতে লাগল:

আলো লো হাতেয়ুঁ হাতেয়ুঁ (মরে গেছে) পাপু
নিংগে ওইয়াতাণাকি নিংগে ভিঞ্জাতাণাকি পাপু

"ওঃ—" শলপুর বড় দুঃখ হল—"কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, থাক থাক।" তার হাড়সর্বস্ব হাতের তেলো বুড়ীর মুখে আর এক হাত বুড়ীর কাঁধে চেপে শল্‌পু তার ঘড়ঘড়ে গলায় শান্ত করতে লাগল—"চুপ কর, চুপ কর, এমন করে কাঁদলে লোকে কি বলবে বল দেখি? চইতের ধুম লেগেছে যে, এত লোকের হাসি-ভরা মুখে চোখের জল আনবি তুই?—আচ্ছা আচ্ছা, বেশ, গাঁয়ের মাটিতে ফিরে এলি, ভালোই হল।—আচ্ছা, কিছু খাওয়া-দাওয়া করেছিস? যা যা, হাত-পা ধুয়ে ফেল—ও মেয়ে, বসে রইলি কেন? হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে হয়তো, চল চল। নুন জল গরম করে তাতে পা ডুবিয়ে রাখ, যা। ওঠ ওঠ।"

তাড়াহুড়ো করে তাদের ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে শল্‌পু কন্ধ উঠল, বলতে লাগল—"সংড্রংগা—সংড্রংগা, ঘুমিয়ে গেলি, নুন কিনতে গেলি (মরলি)! কোন বিদেশে অচেনা ডুমাদের সঙ্গী হবার তোর ইচ্ছা হল, সংড্রংগা?

শুয়ে পড়তে গাঁয়ের মাটিতে কি জায়গা ছিল না ?—আহা !" শলপু কন্ধের আবেগের উচ্ছ্বাস এইটুকুই। সে অনেক জন্মমৃত্যু দেখেছে, আর আবেগে ফুলে ওঠার মতো বুকের নমনীয়তা নেই।

গাঁয়ের হট্টগোল থামেনি। পড়শী গ্রাম মিণিআপায়ুর কন্ধেরা এসেছে। সেখানকার সাঁওতা দিউড় আর তার দলবল এসেছে। সারা গাঁয়ে হাসি-তামাশা, এ ওকে ধরে টানাটানি চলেছে। চইতের আগে এ গাঁয়ের সাঁওতা ও গাঁয়ে গিয়েছিল সেখানকার বেজুণীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, এখন সে গাঁয়ের অতিথিরা এসেছে। অতিথি সৎকার কন্ধের প্রথম কর্তব্য, আভিজাত্যের প্রধান লক্ষণ। সকলেই অতিথিদের কাছে এসে জড় হয়েছে, নাচ চলছে। কাল দুই গাঁয়ের কন্ধেরা মিলে ওদিকে 'বাঘ-ডংগর'-এর বান শিকার করতে যাবে। কালই কেবল আর একটি দিন এক সঙ্গে মেলামেশা।

সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির ভোজের আয়োজন হয়ে গেল। গ্রামের ভেরামনে মদ আর নাচের পালা চলেছে, জনকয়েক একদিকে রান্না বসিয়ে দিল। আব কত জন গাছের ডালপালা কেটে কুড়ে ঘর তৈরি করতে লেগে গেল। অন্ধকারে এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। সবাই কাজে ব্যস্ত, মিণিআপায়ুর লোকেরা যেন এই অপবাদ দিতে না পারে যে বন্দিকার আতিথেয়তা জানে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বুড়ী শলপু কন্ধের ঘরের বারান্দায় শুয়ে পড়ল। মেয়ে গেল পাড়া বেড়াতে। লোকের ভিড় হৈহৈ তার ভাল লাগে, ধুলো আর হই-হুল্লোড় তার অভ্যাস, কিন্তু 'সভ্য' অঞ্চলের চোখে সে সমালোচনা করে করে দেখল—এর আর তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ একটু আছে, রক্তের টান, সেটুকু বাদ দিলে তার চোখে এ-সব নেহাত নিচু দরের, হাস্যকর, তার কাছে এ-সব যেন কিছু নয়।

বাগান বাগিচার শখ তার আছে, বাগান বলতে সে বোঝে সারি সারি এক রকমের এক ধাঁচের গাছ। জঙ্গলের এই সব আধাখেঁচড়া, সরু মোটা, সোজা বাঁকা, গাছপালার জড়াজড়ি, এই গোলমেলে সৃষ্টির খেয়াল খুশিমত কোথাও মিল কোথাও অমিল, প্রথমেই তার মনে খটকা লাগায়, এর মধ্যে যেই কোথায় যাতে সব কিছু গাঁথা তা দেখবার চোখ তার নেই, বোঝবার শক্তিও নেই, সব যেন অন্ধকার।

আর তেমনি এই বনদেশের ঘর-করনা। তার সমালোচকের দৃষ্টিতে এ বিচ্ছন্দ বেতালা বেসুরো ব্যাপারের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নেই।

কেউ তাকে নিমন্ত্রণ করতে এল না। তাতে স্বস্তি পাওয়ার বদলে বরং তার কেমন কেমন লাগতে লাগল। ভাবল—আজ এই পর্যন্তই থাক, কাল দেখা যাবে।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

সকালে পিওটির ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। অচেনা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে ঘুমভাঙা লাল লাল চোখে তাকিয়ে সে দেখল তাকে ঘিরে বসে আছে মেয়ে পুরুষ মেলা লোক। পরিষ্কার রোদ উঠেছে। অন্ধকার রাত্রির লুকোচুরির আশ্বাসের পরিবর্তে এখন কড়া আলোর নির্দয় চিত্র।

তারা ঘিরে বসে আছে, কবে সে তাদের দেখেছিল কিছু মনে পড়ে না। পুরুষদের মাথায় পরিপাটী খোঁপা অথচ মেয়েদের চুল ফর্‌ফর্‌ করছে, মুখের আর শরীরের গড়ন এমন এক অন্য ধরনের, আর এদের কাপড় পরা—বা না পরা!—সেও একেবারে আলাদা ঢঙের। যে তেলেগু দেশ থেকে সে এসেছে সেই দেশের লোকেদের সঙ্গে এদের কোনো মিলই নেই, একেবারে অন্য রকম।

এদের মুখে সহানুভূতির চিহ্ন নেই, কারো চোখে কৌতূহল কারো চোখে পরিহাস। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামলে নিল, চট্‌ করে উঠে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু পা উঠতে চায় না, মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করছে। পথের কষ্ট মনে পড়ল, এক সঙ্গে হঠাৎ তার মনে জেগে উঠল পরিবর্তনের সমস্ত স্মৃতি।

পিছন থেকে মা ডাকল, "পিওটি, ওঠ ওঠ, দেখ কত রোদ্দুর উঠেছে।" সবরকম অদলবদলের মধ্যে এইটুকুই যেন স্থির আর ধ্রুব, সকালের ঘুম-ভাঙানি গান—নিত্যিদিনের ঐ একটি কথা মায়ের। তারই উপরে ভর দিয়ে স্বপ্ন থেকে বাস্তবের দিকে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। কোলাহল বাড়ল, যে জন্য তারা অপেক্ষা করে বসে ছিল তা ঘটেছে। এক সঙ্গে অনেকগুলি মতামত ভীমরুলের কামড়ের মতো তার কানে এসে বিঁধল। ভোর

থেকেই খবর পেয়ে সবাই দেখতে ছুটে এসেছিল ওকে। দেখল যে ওর পোষাক, ওর গহনা, হাব-ভাব সব কিছুই তেলেঙ্গা মেয়েদের মতো। কত জনে কতরকমের কথা বলল, পিওটির মাকে দোষ দিল। সব সমালোচনার দিকে পিছন ফিরে বুড়ী বলল—"আচ্ছা আচ্ছা, থাক। পরে সব শুধরে যাবে।"

কি শুধরে যাবে পিওটি বুঝতে পারল না, কোনো কথা না বলে সে তার নিত্যকর্মে মন দিল। সেখানেও নিস্তার নেই, যেখানেই যায় সেখানেই গ্রামের-বাচ্ছারা আর মেয়েরা তার পিছনে পিছনে। তার দাঁত মাজা গা ধোয়া সব কিছুই লক্ষ্য করে দেখতে হবে। নূতন কিছু দেখতে পেলেই কন্ধেরা তা খুব নিরীক্ষণ করে দেখে। তার সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে না হলেও এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে কেউ কম নয়। পায়ে বাঁকা আঙট কই? গলায় হাঁসুলি কই? সার সার মালা কই? এ সব কি গহনা? এ সবের উপযোগিতা কি?—ইত্যাদি।

গা ধুয়ে ঘরে ফেরবার পথে মা তাকে ডেকে বলল, "শোন, কথা আছে।" মায়ে ঝিয়ে বসল। শল্পু কন্ধের বারান্দায় টাটির ঘেরা দিয়ে একটি খোপের মতো তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। আপাততঃ এই তাদের আশ্রয়। বুড়ী বলল, "শোন মা, সাত দিন ধরে পাহাড়ী পথ ভেঙে ভেঙে আমরা নিজের গাঁয়ে এসে পৌঁছেছি। এখানে লোকজন আছে, জ্ঞাতিকুটুম্ব আছে, এই গ্রামে নিজের বলতে আমদের কিছু নেই। এখানে এমনি অবস্থায় পড়তে হবে আমি আগে থেকেই জানতাম। যা হবার তা তো হবেই; আমাদের সেখানকার দুর্দশার মধ্যে আবার এ-সব কথা বলে তোর মন খারাপ করে দিতে আমি চাইনি। যাক গে, নীচে দরতনী উপরে দরমু, মহাপ্রভু ভরসা। বলে কয়ে মেগে যেচে যেমন তেমন করে আমাদের চলে যাবে। ধৈর্য দরকার, পরের কথায় দোষ ধরলে আমাদের চলবে না। দুঃখী লোকের দশা এমনিই হয়।

"সব চেয়ে বড় কথা এখন—আমাদের তলদেশী পোষাক-আসাক দেখে আমাদের নিজের দেশের লোকেরা ঠাট্টা করছে, এখানে ও-সব চলবে না। ওভাবে চললে কেউ আমাদের সঙ্গে মিশবে না, তফাতে তফাতে থাকবে। তুইতো এসব জানিস না মা, আমি জানি বদলাতে তোর একযুগ

কেটে যাবে। চৈত্রের পরব হচ্ছে, এই দেশের মেয়েদের মতো করে চুল বাঁধ, কাপড় পর, নাচ, দেখে দেখে শেখ, এখানে সবাই তোকে আপন করে নেবে। আর এমনি বেশ করে বসে থাকলে বসেই থাকবি। তাহলে তো চিরদিন বিদেশে থাকলেই হত।

"সেই জন্যই বলছি মা, সকাল সকাল আজ থেকেই তুই বদলে যা। না না, মন খারাপ করিস না। নে, এখন এসব খুলে ফেল দেখি।"

এবার পিওটি বুঝতে পারল। ওর মনে হল মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সত্যিই তো, বক কাক হয়ে যাওয়ার মতো তাকেও বদলে যেতে হবে, এখানেও সমাজ আছে, সমাজের নিয়ম-কানুন আছে কিভাবে চলতে হবে, জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সবাই তা মেনে নেয়, সেও তাই করবে। তিলের তেল না মেখে রেড়ির তেলই মাখবে, মাথায় চিরুনী গুঁজবে, কন্ধদেশের সব রঙঢঙ তাকে আয়ত্ত করতে হবে।

নাই যদি করে? হাসি পেল তার, আর যা হোক না হোক, মা বলবে বর জুটবে না! বর একটা দরকার, সেইজন্য সাজগোজ করা, কন্ধনী হওয়া, নাচা, গাওয়া সবই করতে হবে। আর এই যে চইত পরব, এই সময়েই বর আর কনেদের মেলা বসে এখানে।

ভাবতে ভাবতে সে মনের সব 'কিংবা' আর 'কিন্তু' এক এক করে বিদায় করতে লাগল। বুড়ী গিয়ে কোথা থেকে কতকগুলো কন্ধ গহনা নিয়ে এল—এক রাশ মালা, আংটি। নিজের হাতে সে সব মেয়েকে পরাতে বসল, মেয়ের চুল বাঁধতে বসল। চইতের চিহ্ন স্বরূপ তার গায়ে মুখে বাটা হলুদ মাখিয়ে দিল।

পিওটি আয়নায় মুখ দেখল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠে যেন কুয়াশায় মিলিয়ে গেল কত মুখ—কান্না, নান্না, মাধব রাও—এক-একটি মুখের সঙ্গে এক-একটি স্মৃতি জড়ানো। প্রত্যেকটি ছবি মনকে একবার করে ছুলিয়ে দিয়ে গেল যতই হোক না কেন ওদের মধ্যে দূরত্ব বা ব্যবধান। এবার সে-সব মুখ হারিয়ে গেল, এখন সে বনের কন্ধনী। গাঁয়ের খুঁটিতে তার গলার দড়ি বাঁধা, আর এসব চিন্তা কেন?

বাইরে গানের গর্জন শোনা গেল, ঘরে থাকা গেল না। পিওটি বাইরে বেরুল, অমনি আরও গর্জন।

লোকেরা আশ্চর্য হতে পারে, হোক তারা, এবার সে অচেনা হলেও গোষ্ঠীর এক জন, কারা সব মেয়েরা কোথেকে এসে তার হাতে হাত বেঁধে তাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। চইতের উত্তাল সমুদ্রে পিওটি ডুবে গেল পবিত্র হবার জন্য, আগুপিছু ভুলে গেল।

॥ ছেচল্লিশ ॥

সবাই শিকারে চলে গেছে, গাঁ শুনশান। তেলের তলানির মতো কেবল থেকে গেছে গাঁয়ের বুড়ীরা আর বাচ্ছারা। পিওটির মা গল্প করার সময় পেল। তার অফুরন্ত গল্পের শেষ নেই। অভাবে পড়ে সে আর তার বুড়ো সংড্রংগা কুলির কাজ করবার জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কতদিন কেটে গেল নীচের পাহাড়ে, তার পর ক্রমে তল দেশে নেমে গেল। এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে কুলির ঘর-করনা, চালের কলে চিনির কলে কাজ করার কথা, সাহুকারের কাছে তার জমিতে চাষের কাজ, হাটের চৌকিদারি—বদলাবদলির শেষ নেই। হঠাৎ অসুখে পড়ে বুড়ো মারা গেল। কলকারখানার বস্তির কুড়ে ঘরের অন্ন জল ঘুচে গেল। ঘূর্ণিপাক খাওয়া পাতার মতো এর দুয়ারে তার দুয়ারে শুঁড়ীর ঘরের বারান্দা ঘুরে ঘুরে বেড়াবার পর এখন তারা নিজেদের গাঁয়ে ফিরে এসেছে। অতি সাধারণ মজুর পরিবারের ইতিহাস, কিন্তু সব কথা বুড়ী বলে না, কথা লুকোয়, ভাবে তার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। পাহাড়ী জাতি আত্মসম্মানকে অতি মূল্যবান মনে করে।

লোকেরা তাকে ভোলেনি।

এই গ্রামেই এক জায়গায় তাদের ঘর ছিল। সংড্রংগা ছিল একজন প্রধান রায়ত। আজ আর সে-ঘর নেই। একটা গোয়ালমাত্র চিহ্নস্বরূপ অবশিষ্ট আছে, গ্রাম ছেড়ে যাবার আগেই একথা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল যে সংড্রংগার স্ত্রী 'পাংগিআণী', অর্থাৎ তন্ত্র-মন্ত্র, তুক-তাক জানে, তুক করে মেরে ফেলতে পর্যন্ত পারে। যে দু'-চার জনের সঙ্গে সংড্রংগার শত্রুতা ছিল, তারা সকলেই মারা গিয়েছিল। একজনকে বাঘে খেয়েছিল। সে বাঘের

লেজ নাকি কেউ দেখেনি, তাই সকলের বিশ্বাস যে সেটা আসলে বাঘ নয়, ঐ পাংগিআণী। বাঘের চলার পথে মানুষের পায়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, সেটা দ্বিতীয় প্রমাণ। আর সেই চিহ্নগুলি সংড্রংগার ঘরের কাছ থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়েছিল, অথচ সে সময়ে সংড্রংগা গ্রামে ছিল না। অতএব প্রমাণ হল যে তার স্ত্রী পাংগিআণীরই এ কাজ। আর দ্বিতীয়বার কখনো সে-জায়গায় অর্থাৎ গ্রামের ঠিক পিছনে পাথরের নীচে বাঘ কাউকে খায় নি, কারণ ডিসারী ওখানে মন্ত্র পড়ে খোঁটা পুঁতে দিয়েছিল আর সকলের সামনে বড় গলা করে বলেছিল যে এবার বাঘের দেখা পেলে সে-তার গায়ে হলুদ জল ছিটিয়ে দেবে, তাহলে বাঘ আবার মানুষ হয়ে যাবে। বড় কুক্ষণে বেরিয়েছিল সে ডম্‌রু কন্ধ, বাঘের মুখে প্রাণ গেল। সংড্রংগার সঙ্গে জমি নিয়ে তার বিবাদ ছিল। লোকেরা বলে মৃত্যুর পর তার প্রেতাত্মা অর্থাৎ বাঘ-ডুমা অনেক দিন পর্যন্ত বুড়ীর আঁচলের তলায় তলায় ঘুরে বেড়াত।

কচি ছেলের মতো আকার তার, মাথায় চুল নেই, মাথা ঠোঁট আর চোখ লাল দেখতে, একটু দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়, নানা রকম আওয়াজ করে ডাকে। বাঘডুমার স্থান বাঘের লেজে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেহেতু বাঘ স্বয়ং পাংগিআণী, তাই বাঘডুমা তাঁর আঁচলের তলায় ঘুরে বেড়াত, অতএব সংড্রংগার স্ত্রী তন্ত্রমন্ত্রসিদ্ধ। চম্‌রু ডোমের সঙ্গেও তার শত্রুতা ছিল। চম্‌রুর গরুগুলি দুই দিনের মধ্যে পটাপট মরে গোয়ালে পড়ে রইল। অতএব সে পাংগিআণী। এমনি ভাবে চক্রগতিতে কারণের সঙ্গে ফল, আর ফলের সঙ্গে কারণ দেখিয়ে দেখিয়ে অনেকে গ্রামে প্রচার করল যে সে পাংগিআণী। এমন লোককে গ্রামের লোকেরা মেরে ফেলে, অনেক খুন হয়। পাংগিআণী কপাল জোরে বেঁচেই ছিল, কারণ শলপু কন্ধ আর তার প্রতিবেশীরা এ-কথা বিশ্বাস করেনি যে ও আবার কোনো দিন এত বিদ্যা শিখেছে যে মানুষকে তুক করতে পারে। বিশ্বাস হোক অবিশ্বাস হোক, সেদিন থেকে তার নাম পাংগিআণী হয়ে গেল। লোকেদের সাহায্য পেয়ে সাহুকার শত্রুতা করে যে ওদের গ্রামছাড়া করল তার জন্য শত্রুদের এই অপবাদ রটনা কম দায়ী নয়।

বহু বৎসরে, কালের তরঙ্গাঘাতে সব অপবাদ সব বিবাদ ধুয়ে মুছে গেছে,

আজ সে নিরাশ্রয় কাজেই তার সঙ্গে এখন কারও বাদ নেই, যারা শত্রুতা করেছিল সবাই তারা এতদিনে মরে হেজে গেছে, বিরোধ করবার আর কেউ নেই। পুরাতন ঘরগুলি দাঁত বার করে পড়ে আছে। দেখলে দুঃখ হয়—কোথায় গেল তারা যারা এই সব ভিটের উপরে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে হাত নাচিয়ে বক্তৃতা করত তার উপরে শোধ তোলবার জন্য।

পাংগিআণী খুঁজে বেড়াচ্ছিল সতর বছর আগেকার হারিয়ে যাওয়া সময়কে, যে সময়ের সীমানার চিহ্ন আজ আর নেই। এইখানে সেই বেড়া ছিল, সেখানে আজ ঘর উঠেছে ; ওখানে সেই গাছটা ছিল সেখানে কার গোয়াল হয়েছে। নতুন পথ খুলেছে, পুরানো পথ মুছে গেছে ; ফলের গাছের বাগান নেড়া হয়ে গেছে, ফাঁকা জায়গা বাগান হয়েছে, সব জায়গার চেহারা উলটপালট হয়ে গেছে। শুধু যদি তাই হত—সতর বছরে সতর দল শিশু জন্মেছে বড হয়েছে, গৃহস্থ হয়েছে। চেনা লোকেরা কোথায় পিছনে পড়ে গেছে, কত জন মাটিতে মিশে গেছে, পুবানো দিনের উপর দাঁডিয়েছে সতর বাঁও জল, সব তাতে ডুবে গেছে।

কিন্তু খুঁজে বেডাতে বেড়াতে পাংগিআণী অনুভব করল আকাশে সেই রঙ, গাঁয়ের বাতাসে ঠিক সেই ছোঁয়া, আর চারিদিকের যে বিরাট ঢেউ-খেলানো পাহাড পর্বত তারা এখনো ঠিক তেমনি আছে। পাহাড় বদলায়নি, মাটি বদলায়নি। ঢালু জমি ঠিক তেমনি কখনো উঁচু, কখনো নিচু হয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে গেছে। বাইরের এই চেনা রূপ মনের ভিতরে কোথায় এক আলো জ্বালে, আলোর পর আলো জাগে, সব আলো একত্র হয়, জ্বল জ্বল করে ওঠে তার পুরাতন পরিচয়, এইটুকুই তার সান্ত্বনা।

বুড়ীর মুখে কথা নেই, জিজ্ঞাসা করবার সাহস নেই। তার সান্ত্বনা কেবল পথে, কারও ঘরে সে তো কেবল কোথাকার কে, যেন তার কোনো পরম্পরা নেই, পরিচয় নেই, কোন বিদেশ বিভুঁয়ের লোক। কিন্তু তার কৌতূহল হয়, চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়, মন চায় দেখতে যে সব ভুল, সব ভুল। এইটুকুই মুখ খুলে বলে ফেলে মনে মনে নিজেকে বাহবা দিয়ে মুচকে হেসে সে চলে যেত। ভাবতে চেষ্টা করে যে এসব ভুল, কিন্তু পারে না, মুখ শুকিয়ে নীরবে চলে যায়।

গ্রামের খোলা জায়গার মাঝখানে তার নজর পড়ল, লাল পাথর একখানি

সেই আগে যেমনটি ছিল তেমনিই পড়ে আছে, বরাবরকার মতো বারান্দার উপরে এক বুড়ী বসে শ্যামাধান কোটার গর্তের মধ্যে কাঠের মুষল দিয়ে শ্যামাধান কুটছে। গুম্‌সা কন্ধের ঘর না এটা? ঘরের সামনে একটি গোল সাগুর গাছ, পিছনে একটি সজনে গাছ। ঠিক, এটা গুম্‌সা কন্ধের ঘর। দোরগোড়ায় কতকগুলি অচেনা শিশু। দরজার ও পাশে একটি অচেনা বউ বসে কি কাজ করছে, তার খোলা বুকে একটি বাচ্ছা লেপটে রয়েছে। এরা সবাই অচেনা, কালকের সদ্য গজানো অঙ্কুর। অনেক বছর হল ভাঙা খাট একখানা একপাশে পড়ে আছে, উই লাগছে—সেইটুকুই অভাব।

গুম্‌সার বুড়ী হেসে বলল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন দিদি, কাউকে মন্তর করবার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?"

বুড়ী হেসে জবাব দিল, "হ্যাঁ, পাথরের মতো তুই অটল হয়ে বসে আছিস্, তোকেই তো মন্তর করব।"

গুম্‌সানী বলল, "ভুলিস্‌নি তাহলে? আয়, বস্।"

দুই বুড়ী একসঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল আর ধুঙ্গিয়া টানতে লাগল। সতর বছরের কথা এক দিনেই তো ফুরায় না।

"লেল্লু কবে মারা গেছে, নুনি?"

"লেল্লু?" গুম্‌সানী দুই হাতের সব আঙুল মেলে দেখালে। এক-জনের যেটা আশ্চর্য লাগে আর একজন তার অর্থও ধরতে পারে না, ভাব বোঝা তো দূরের কথা।

"ঐ ঘরটা কবে ভেঙে গেল, নুনি?"

"ঘর ছিল নাকি ওখানে? কই না তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্, কত কথাই মনে রেখেছিস্ লো তুই! এত বুদ্ধি তোর! তা না হলে মিথ্যেই কি আর পাংগিআণী বলে তোকে?"

আরও কয়েকজন বুড়ী এসে জুটল, দিব্য গল্প জমে উঠল, কেবল পুরাতন দৃষ্টিতে নূতনের সমালোচনা, কেবল সেই একটি কথার দ্রুত বিলম্বিত ধ্রুপদ খেয়ালের তান—"আর কি সে কাল আছে?" —তার যত রকম-ফের হতে পারে।

রান্না চড়ানো হয়নি, খাওয়া-দাওয়া কি হবে তার কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু কন্ধ গ্রামে তাতে কারও কিছু আটকায় না, শাকসবজির আদান-প্রদান তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। প্রাচীন সমাজের সংস্কার এখনো কিছু কিছু রয়েছে, সেকালে এক আড়ার বস্তিতে সকলে ছিল এক হাঁড়ির গোষ্ঠী। আজ আর এক হাঁড়ি নেই, কিন্তু আজও একজনের ভাত রাঁধা হলে আর একজন উপোস করে থাকে না। ঘর তোলবার ভিটে নেই তো সাঁওতা দেবে ভিটে। ঘর নেই তো গাঁয়ের ভাইরা ঘর তুলে দেবে, জমি দেবে, যতদিন তার দরকার তারা তাকে মাড়ুয়া ভাত বেড়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না। সমাজ সব দেবে, তার বদলে কেবল বলবে কাজ কর, সমাজের মধ্যে এক হয়ে থেকে তার ভিতরকার জোর বজায় রাখ, কেবল এইটুকুই।

সেই বিশ্বাসেই সভ্য সমতল ছেড়ে অসভ্য বনে ছুটে এসেছে পাংগিআণী, নিশ্চিন্ত, নির্ভয় সে। বেলা গড়িয়ে যেতে গুম্‌সানী ডাকলে, "আয় খেতে বসি।" বড় কোমল হয়ে এল পাংগিআণীর মন, কি ভেবে শুধোলে, "গুম্‌সা কবে মরেছে লুনি ?"

গুম্‌সার স্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেললে, কিছুই বললে না। পাংগিআণী আর এক বার জিজ্ঞাসা করলে। ভিতরের ঘরের চালের তলা থেকে ছোট এক গাছি দড়ি বার করে তার দিকে ফেলে দিয়ে গুম্‌সানী মুখটি ছোট করে দাঁড়িয়ে রইল, কিছু বলতে পারল না। পাংগিআণী দেখল দড়িতে তেরোটি গিরে বাঁধা। তেরো বছরের হিসাব। বছর গেলে একটি করে গিরে পড়ে। তেরো বছর হল গুম্‌সা মরেছে, তার স্ত্রী দড়িতে গিরে দিয়ে দিয়ে বছরের হিসেব রেখেছে। কোমল দৃষ্টি তুলে পাংগিআণী তার দিকে তাকাল। গুম্‌সানী কাঁদল না, মনের পুরানো দরজাটাতে দরদীর হাতের ছোঁয়া লেগে আবার টনটনিয়ে উঠল তার স্বামীর মৃত্যুর ব্যথা। মুখখানি তার শুকনো, চোখ দুটি ঝাপসা, বাইরে থেকে ভিতরে চলে আসছে কালো ছায়া, সেই অতীত ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ। দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। গুম্‌সা মরেছে, লেল্লু সাঁওতা মরেছে, জিক্রু মরেছে, মৃত্যুর এই অপরিমিত শৃঙ্খলের দুই প্রান্তে যেন এই দুটি বুড়ী, তাদের গিরে গোনা শেষ হয়নি।

গুম্‌সানী বলল, "এখন ওসব কথা আর কেন দিদি, আয় খেতে বস্।"

পাংগিআণী বলল, "মনে পড়ে লো লুনি, যাবার দিন তোর ঘরেই ভাত

খেয়ে গিয়েছিলাম। এগিয়ে দিতে গুম্‌সা গিয়েছিল সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত।
—থাকে থাকে, কোথায় গিয়ে লুকোয় লো! যত যন্ত্রণা আমাদেরই—"

গুম্‌সার স্ত্রী কাজে মন দিলে।

চারিদিক থেকে বাজনার শব্দ কানে আসছে, খুব আস্তে আস্তে। চীৎকার শোনা যাচ্ছে—জন্তু খেদাবার চেঁচামেচি। পাহাড়ের উপর থেকে শব্দ ছুটে আসছে গাঁয়ের ভিতরে। এতক্ষণ কোনো আওয়াজ ছিল না, হয়তো লোকেরা খাদে কিংবা ঢালু জায়গায় ছিল। এই, আবার সব চুপচাপ, এবার বোধ হয় শিকারীরা যে যার জায়গা বেছে নিল, ঘাঁটি আগলে বসল হয়তো। থেকে থেকে চীৎকার—"ঈহা—ঈহা," এখন বোধ হয় শিকারীরা ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে আর লাঠি দিয়ে ঝোপজঙ্গল পিটিয়ে পিটিয়ে বনের ভিতর থেকে জন্তুদের খেদিয়ে আনছে মাঝের দিকে।

শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঁচু পাহাড়ের উপরে খোলা জায়গায় যে-সব লোকেরা বেড়াচ্ছে তাদের দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে। তাদের চীৎকার স্পষ্ট শোনা যায়, জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকা লোকেদের আওয়াজ কয় প্রস্থ কম্বলের ভিতর থেকে আসার মতো লাগে।

যে কাজ করে যাচ্ছে সে কাজই করছে, কিন্তু যার কাজ নেই তার কেবল অপেক্ষা আর কল্পনা। পাহাড়ের তলার গ্রামের লোকেরা কেবল অপেক্ষা করে আছে। মাঝে মাঝে চীৎকার হয়, তারপর আবার সব চুপ, তখন কেমন অস্থির লাগে যেন, কান খাড়া করে মানুষ অপেক্ষা করে বন্দুকের শব্দের জন্য।

বন্দুকের আওয়াজের মতো একটা আওয়াজ শোনা গেল যেন? ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে লোকেরা পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকে। জন্তু মারা পড়লে পাহাড়ের উপরে হৈচৈ লেগে যেত। না, আবার অপেক্ষা।

"মেয়েগুলো কোন্ দিকে আছে, হ্যাঁ লো নুনি?"

"হ্যাঁ, ছেলেমানুষদের ব্যাপার তো। তাদের দলে আছে তারা, তারাই বুঝবে তাদের কথা, আমরা আর কেন—অ্যাঁ?" গুম্‌সানী প্রবোধ দিল।

গুম্‌সার বারান্দায় বসে গুম্‌সানীর সঙ্গে ধুঙ্গিআ টানতে টানতে পাংগিআনীর মনে হল যেন সে কোনো দিন গ্রাম থেকে কোথাও যায় নি।

পিওটি কোথায় গেল বলে সে আজকের মতো কখনো কি কাউকে জিজ্ঞাসা করেছে? তার মনে হল যেন আজকের এই কথা কেবল আজকের নয়, আর এই কথার সঙ্গে এই জায়গা আর এই সময় সব কিছু মিশে ঠিক যেন আবার সেই আগের মতোই। থেকে থেকে আগেকার দিন যেন ফিরে আসে, তবে আর নতুন কি?

নিঝুম দুপুর, রোদ একটু পড়ে এসেছে। গুম্‌সানী একলা গেছে জল আনতে। পিওটির মা বারান্দায় স্থির হয়ে বসে আছে। ঝিরঝিরে চৈত্রী হাওয়া যেন শিশুর মতো ধুলোখেলা খেলে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। তার পিছনে পিছনে যেন তাকে কেউ ধরতে আসছে আর চোখের সামনে পাহাড়ে গাছগুলি যেন তাড়াতাড়ি একটুখানি সরে দাঁড়াচ্ছে। পিওটির মা বোবার মতো বসে স্বপ্ন দেখতে থাকে। ঐ সংড্রংগা পাহাড়ের ডগায় উঠে গেছে। শিকার শুরু হলে তাকে আর ঘরে আটকে রাখা যায় না। কাঁধে টাঙ্গি আর হাতে বর্শা নিয়ে ঢেঙ্গা লেম্বু সাঁওতা, জিক্র, গুম্‌সা, একজনের পিছনে একজন। চইত পরব প্রত্যেক বছর এমনি ভাবেই হয়। আর একটু পরেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শোনা যাবে বুঝি, তারপর সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে একসঙ্গে সব বেজে উঠবে, শিকারীদের বেরবার সময়, গাঁ দুরদুর করে কাঁপবে।

"তুই কি করলি 'ডোক্রা'?"

হাসি উথলে উঠতে থাকবে তার মুখে। ঘাম-ঝরা গা চিকচিক করবে। "আমি? আমি না গেলে আর এরা জন্তু মারতে পারত? কোথায় লুকিয়ে ছিল, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করলুম, পাহাড়ের ঘাঁটির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে এলুম। তারপরে তো এরা গুড়ুম করে মারলে। হাত দিয়ে কেউ মারল নাকি? খালি বন্দুকটা তোলা, আর কিবা তাতে আছে? কেবল আমি জানোয়ার খেদিয়ে খেদিয়ে আধমরা। সাঁওতা কি বলল শুনেছিস্? বলল—সংড্রংগা না হলে শিকার পড়বে না।" বীরপুরুষের মতো বুক ফুলিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

পিওটির মা স্বপ্ন দেখছিল। গাঁয়ের মাটি থেকে দূরে তেলেগু দেশে ওদের সতরটা বছর যে কেটে গেছে তার মনে নেই। এক এক জায়গার এক এক রকম মন যেন। সেখানকার কথা অন্য এক স্বপ্ন, কেবল দুঃস্বপ্ন, দুঃখের অনুভূতিতে ভরা। সে সুতোয় গিঁঠ বাঁধা হয় নি।

পিওটির মা তার পরম্পরার সুতোর গিঁঠ খুঁজে পেয়েছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

॥ সাতচল্লিশ ॥

মিণিআকা দিউড়ু সাঁওতা তার দলবল নিয়ে চৈতী মজলিসে ফুর্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। তার কার্যসূচী সে আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেছিল। প্রথমে বন্দিকারে যাবে, সেখানে দু'দিন থাকবে। তারপর সেখান থেকে খাল্‌কনা, দরকার হলে চিলিশংকা পর্যন্ত যেতে সে প্রস্তুত। যেখানে বেশী ফুর্তি, বেশী মদ খাওয়া সেখানে সে থেকে যাবে। যেখানে ভালো শিকার জুটবে সেখান থেকে শিকার নিয়ে ফিরবে। এই বছর ভালো শিকার তার দরকার। সে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করেছে খালি হাতে কিছুতেই ফিরবে না, কাটুক কিছুদিন পথে পথেই। সাঁওতার বিচার সমস্ত গ্রামের বিচার, কাজেই তার দল-বল চলেছে তার পিছন পিছন।

পথের নেশা কন্ধের মনের ভিতরে। খুঁজতে খুঁজতে ঘুরতে ঘুরতে সে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। আজ যদি মনে হয় এ গ্রাম ভালো নয়, নতুন চাষের জন্য জঙ্গল কাটবাব মতো অন্য কোনো জঙ্গল নেই, অমনি কন্ধরা গ্রাম উঠিয়ে নেবে। নতুন পথের নেশা কন্ধের নতুন নয়। কিন্তু দিউড়ু সাঁওতা তার পূর্বপুরুষদের মতো কেবল অ-চলা পথে চলতে বার হয়নি।

কবে থেকেই সে মনে মনে বুঝেছে যে সে তার স্ত্রী পুয়ুকে আর ভালোবাসে না। পুয়ু তার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। সে পুরুষ, ফুর্তি চায়, কৃষক সে, মাটি কোপায়, পেট ভরে মদ খায়, তারপর চায় সঙ্গিনী। জীবনে একদিন এসেছিল যখন সে পুয়ুকে দেখে পাগল হয়েছিল, তাকে ঘরে আনতে তর সয়নি, আজ আর সে-কথা মনে নেই। নিজের কাছে নিজের সাফাই দেয় সেদিনকার পুয়ু আজ আর নেই। এর মুখে সেই হাসি নেই, এর দেহে সেই রূপ নেই, ভিতরে ভিতরে কি এর হয়েছে, দিনে দিনে বুড়ীর মতো হয়ে গেছে। আর পুয়ুর মন—সে মনও তার বদলে গেছে। স্বামীকে আকৃষ্ট

করবার, মাতাল করে দেবার প্রবৃত্তি আর তার মোটে নেই। বরং স্বামী এগিয়ে এলেও পিছিয়ে যাওয়াই তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

কেবল বুকে এক ট্যাঁ ট্যাঁ করা ছেলে, আর পুয়্যু সর্বদা বিনা কাজেও ঘরের কাজ করতে থাকে। ঘরটা একবার ঝাঁট দিলে হবে না, আরও সাত বার ঝাঁট দিতে হবে। ঘর একবার লেপে পুঁছে নিলে শুদ্ধ হবে না, গোবর-মাটি তার হাতে লেগেই আছে। কিন্তু দিউড়ু সাঁওতার মন তো মানুষেরই মন, সে মনে শেষ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়ে ওঠে না। কখনো বা স্থির বোঝে যে সে পুয়্যুকে ভালোবাসে না, আবার কখনো অজান্তে মনটা নরম হয়ে আসে, ভাবে সব শুধরে যাবে, আবার পুয়্যু তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নেচে গেয়ে বেড়াবে বনে বনে। এমনি কথা তার মনে খুব বেশী আসে না, অধিকাংশ সময়ে তো মনের ভিতর থেকে জেগে উঠতে থাকে বিদ্রোহ আর বিরাগ। ঘুম ভেঙে উঠে কেমন বিরক্ত বিরক্ত লাগে, খামকা পুয়্যুর দোষ ধরে, সমালোচনা করে। কখনো কখনো কোনো অজানা কারণে মনে উজাড় হয়ে পড়ে বিষাদ আর হাহাকার। ঘর-গেরস্থালিতে রুচি হয় না, দিউড়ু সাঁওতা মদের ভাঁড়ের মুখে মুখ দিয়েই শান্তি পায়। এই টানা-হেঁচড়াতে মন তার ঘর থেকে গিয়ে পরের উপর নজর দেয়। তার নজর অন্যের উপরে পড়ে। নিজের ছোট পরিসরের মধ্যে হাতের গোড়ায় যা-কিছু জোটে তাই দিয়েই সে নিজের মনকে ভোলায়; বালমুণ্ডার স্ত্রী সোনাদেঈয়ের ঘরের সামনে সে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। এমনি ভাবেই দিন কেটে যায়, শান্তি সে পায় না।

ঋতুর নিজস্ব ধারায় ফাগুন শেষের পাহাড়ী হাওয়া যত বাসন্তী মনোভাব সিঞ্চন করে যাচ্ছিল, দেহে রস সঞ্চার হচ্ছিল, দিউড়ুর বিকৃতিও তত বেড়ে চলেছিল। যতদিন ক্ষেত-খামারের কাজের ভিড় ছিল, পরিশ্রমের দাবি ছিল মাংসের উপরে, টপটপ করে ঝরত ঘাম, ততদিন মনের বিকারও শ্রম-স্বেদের পথে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত। তারপর চৈত্রের ধুমধাম এল, ক্ষেত-খামারের কাজ বন্ধ, চারিদিকে কেবল মদ আর দেহের উপচার। মনের বিকার দিউড়ু সাঁওতাকে পথ বাতলাতে লাগল—চল্ চল্, অ-চলা পথে চল্। বিপথের নির্জনতায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার নীরব আয়োজন। এই তাগিদেই দিউড়ু সাঁওতা গ্রামের পঞ্চায়েতে স্থির করেছিল চইতের নির্ঘণ্ট।

বন্দিকার। চইত পরবে মানুষ পশু। মদের নেশায় বিবেক বুঁদ হয়ে

ঘুমোয়। সেখানে ভালো মন্দ নেই। সেখানে অনুভূতি অনুভূতি নয়, কেবল নিজেকে ভোলাবার একটা নেশা, মোহ। পথ চলতে চলতে চৈতালী ঘূর্ণিতে চোখে পড়ে তিন গাঁয়ের কন্ধ মেয়ে, হালকা নেশায় চোখ ঢুলু ঢুলু। নানা প্রসঙ্গ তুলে তারা গান গায়। প্রথম চাঞ্চল্য নারীর, তারপর অপর পক্ষ হতে আপনি তার উত্তর ছোটে। জন্তু আপন আপন সময় খোঁজে। জ্যোৎস্না রাতে চারিদিক নিঝুম হলে ফিঙে পাখীর দাম্পত্যালাপ শুরু হয়, ডাহুকের সকাল আর সন্ধ্যা, ঘুঘু পাখীর উদাসী দ্বিপ্রহর, বাঘের মাঝরাত। মানুষ সময়ের অপেক্ষা রাখে না, আপন রুচি আর কল্পনা দিয়ে রচনা করে আপন পরিস্থিতি।

মনের উন্মত্ততায় ওরা ছুটে চলেছিল বন্দিকারের পথে, গানের জোড় মিলিয়ে মিলিয়ে। গান গাইতে গাইতে মনের তাতে দেহের তাতে, নেচে কুঁদে হৈ-হৈ করতে করতে কন্ধ মেয়েদের ধাওয়া করে যায়, মেয়েরা এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ে পালায়, আবার পাথরের আড়াল থেকে, জঙ্গলের ভিতর থেকে শোনা যায় তাদের ঠাট্টা তামাশার গান।

গানের দেশে ধাপে ধাপে এগিয়ে ছুটতে ছুটতে ওরা বন্দিকারে গিয়ে পৌঁছাল। রাত্রে সেখানে মহা সমারোহে ভোজ, নাচ-রঙ্গ হল, তার পরের দিন সেখানে শিকারে বেরুনো। দিউড়ু সাঁওতার মন খুশী ছিল, হাগুর্ণা সাঁওতা গাঁয়ের ইজ্জত রাখতে জানে, বড় উদার তার মন, ওর ভগ্নীপতি হবার পক্ষে হাগুর্ণা অনুপযুক্ত নয়। তার মদ প্রচুর পান করে যত খুশি ফুর্তি আনন্দ করে দিউড়ু সাঁওতা হাগুর্ণার প্রশস্তি গাইছিল।

কন্ধ দেশের রীতি অনুসারে শিকারে যাবার আগে শল্পু ডিসারীর পৌরহিত্যে 'চিতাগুড়ি' দেবতার পূজা দেওয়া হল। 'চিতাগুড়ি' বা 'চিতামা' বা 'সীতামা' সর্বপ্রকার অনিষ্ট আর ক্ষতির থেকে কন্ধ জাতিকে রক্ষা করে, তাই শিকারে বার হবার আগে চিতামা-র কাছে এক জোড়া মুরগীর ছানা মেরে আর একটু মদ ঢেলে বনের বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য মানত করে যেতে হয়। তিন হাত উঁচু ছোট্ট কুঁড়ের ভিতরে সিঁদুর-মাখানো খোলা পাথরের দেশে চিতামা দেবী। তার কাছে ডিসারী সকলের জন্য প্রার্থনা করল: "আমরা তোমার ছেলে। বিপত্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো। জঙ্গলে ঢুকব, আমাদের মাথায় লতা জড়িয়ে না যায়, পায়ে কাঁটা না ফোটে,

বাঘে না খায়।" পূজা সেরে সেখানে দীপ জ্বেলে রেখে সবাই শিকারে চলল।

এ ব্যাপারে কে মিণিআপায়ুর লোক আর কে বন্দিকারের লোক তা নিয়ে কোনো কথা নেই, আলাদা অস্তিত্ব নেই কারো। আগে আগে শিকারীরা গর্জন করে বাজনা বাজিয়ে চলেছে, পিছন পিছন নেচে গেয়ে চলেছে গাঁয়ের যুবতীরা। সামনেই লক্ষ্যস্থল। তার উপরে, আরো উপরে 'বাঘ ডংগর' পাহাড—সব মিলে মিশে একটি মূর্ছনা।

সেই মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া ঘূর্ণির টানে সকলের সঙ্গে চলছিল পিওটি। কলিংতল (তেলেগু) দেশের অভ্যাস অনুযায়ী সে সকলের উপর টেক্কা দেয়, কেবল মদ খাওয়ায়। গান গাইতে পারে না, কেবল তেলেগু দেশের গোষ্ঠীর গানের দু'-এক পদ সে জানে। গান জানে না বলে যখন আর সবাই গায় তখন কেবল গানের ধুয়োর সুরটি ধরে সে হঁা করে আর খুব হাসে। কাঁকুরে পাথুরে রাস্তা, আস্তে আস্তে ক্রমেই উপরে উঠে গেছে, যতদূর যাওয়া যায় ততই শরীরটা বোঝার মতো মনে হয়, মদের নেশাতেও দেহটা বোঝার মতোই ঠেকে। কখনো কখনো কেউ বা আশ্চর্য হয়ে তাদের সঙ্গিনী পিওটির দিকে তাকায়, তার কষ্টকর অবস্থা লক্ষ্য করে। কন্ধনীরা এত বেশী মদ খায় না, ডোম জাতির মেয়ে ছাড়া কেউ এত মদ খায় না। একটার পর একটা ঢেউয়ের মতো চড়াইয়ের উপব চডাই। সকলের সঙ্গে পিওটিও উপরে উঠে গেল।

আর আর মেয়েরা ওকে আপন করে নিয়েছে, কিন্তু ছেলেরা পারেনি। তার ভাব-ভঙ্গী তাদের অদ্ভুত লাগে, কন্ধনীর সাজ করলেও তার ধরন-ধারণ বিদেশী, অ-বনিয়াদী, তা ভেদ করে তার কাছে আসতে সময় দরকার, সময় দরকার জানতে যে কি তার পছন্দ, কতখানি মেশা যায় তার সঙ্গে, কি ধরনের মেয়ে সে। যে-কোনো কন্ধ তাকে একবার দেখলেই বুঝতে পারে যে সে এক বিচিত্র জীব, সেই বিচিত্রতা একটা নতুন চমক জাগায়, কিন্তু কেবল এই চমকে আনন্দ পাওয়ার জন্য চৈত পরবের অভিযান নয়, মেলা-মেশা করতে বাধ বাধ লাগে যেন, সবাই শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর শিকারের ধান্দায় চলে যায়।

পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটি খদ হঠাৎ যেন পাতালে নেমে

গেছে। কিছু দূরে আর একটি পাহাড। এদিককার পাহাড়ের খাড়া জায়গার পাশ দিয়ে দিয়ে পাথরের চাতালের মতো একটা জায়গা, তার গা ঘেঁষে পাহাড় উঠে গেছে, খানিক এগিয়ে তার গা গোল হয়ে ঘুরে গেছে। তার সামনেই জঙ্গলে ভরা সেই পাতাল। সামনের দিকে কত উঁচু থেকে এখানে-ওখানে সহস্র ধারায় নেমেছে কত ঝরনা, তাতে ঝুলছে কত জল-প্রপাত রামধনুর সাজ পরে, ধাপে ধাপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নীচের সেই পাতালে গিয়ে পডছে। চারিদিকে বন আর সামনে এই দৃশ্য। সেই পাতালে জায়গায় জায়গায় নীচেকার পাহাড দেখা যাচ্ছে, তার নীচে নীচে আরো আরো পাহাড যেন শুয়ে পডে আছে। দূরে কত নীচে সমতলের নীল চক্রবাল।

কয়েকটি মেয়ে সেইখানে বসে রইল। পুরুষরা সার বেঁধে উঠছে উপরের পাহাডে। যে যার চলে গেল, হৈচৈ চেঁচামেচি কমল। সেই ক'জন মেয়ে কেবল বসে আছে। শিকারের নিয়ম মেনে সবাই চুপচাপ, কথা বলছে কেবল পিওটি—সকলের বারণ সত্ত্বেও। গাছে গাছে ধোঁয়া ধোঁয়া রঙের নতুন কচি পাতা। বাতাসে বনফুলের সুবাস। বনফুল ফুটেছে নানা রঙের। যেখানে জল ঝিকিমিকি করছে সেখানে নানা জাতির 'ককোড়ি' (ফান) বন। তার পিছনের পাহাডের গায়ে কচি পাতায় ছাওয়া বাঁশ গাছের জাল বোনা, ভীষণ বাঁশ বন সেখান থেকে নেমে গেছে পাহাডের খাডা ধার বেয়ে নীচের ঝোরার দিকে। পাতালের ওপারের পাহাডে বুনো কলা গাছ রাশি রাশি। এই বনের দৃশ্য দেখে দেখে পিওটির চোখ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। সকলের সঙ্গে অপেক্ষা করে বসে থাকতে থাকতে তার আলিস্যি লেগে গিয়েছিল। ক্রমে তার নেশার ঝোঁকে জডানো কথাও বন্ধ হয়ে গেল, পিওটি ঘুমিয়ে পডল।

॥ আটচল্লিশ ॥

শিকারের প্রতীক্ষায় সময় আর কাটে না। যে কোনও প্রতীক্ষা দীর্ঘ কাল ধরে চলতে থাকলে তার ভার সহ্য হয় না, বোঝার মতো লাগে। সময় যেন কান পেতে পেতে চলতে থাকে। শিকারে পুরুষরা অকৃতকার্য হলে অবশ্য নোংরা চুল আর কাদা দিয়ে গুলি বানিয়ে তাদের গায়ে ছোঁড়বার অধিকার মেয়েদের আছে, ছেঁড়া নেকড়া গিঁঠ দিয়ে জুড়ে জুড়ে গ্রামের ঢোকবার পথে টাঙিয়ে তার তলা দিয়ে পুরুষদের মাথা নিচু করে যেতে বাধ্য করবার অধিকারও আছে। কিন্তু সে সব তো পরের কথা, শিকারে বেরুলে মানুষ ভাবে সাফল্য তার কাপড়ের খুঁটে বাঁধা।

তারা নিত্যদিনের পরিচিত প্রকৃতির দিকে চেয়ে চেয়ে সেই পুরানো বনের পাখিদের কিচির-মিচির শুনে শুনে অনেকক্ষণ গেল, সে সব চিরদিন তেমনি আছে। যতই দেখুক তারা, তাদের চোখে সে-সবের কোনো নতুন অর্থ নেই।

পিওটি তেমনি ঘুমোচ্ছিল। কতকগুলি মেয়ে আশ-পাশ থেকে ফুল পাতা তুলছিল। বেলা পড়ে এল, আলোয় উজ্জ্বল ছিল বন, এখন তার রঙ বদলাল, আধ-আলো আধ-ছায়া মিশে বনে যেন অসংখ্য কুঞ্জ দেখা দিল, কোথাও শিআরি লতা ছায়া করে আছে, কোথাও থোপা থোপা বুনো জুঁই আর চামেলি। মেয়েরা অধীর হয়ে উঠেছিল। এই সময় চেঁচাতে চেঁচাতে দিউড়ু সাঁওতা উপর থেকে এসে হাজির হল। মুখে অসংলগ্ন কথা, নেশায় চোখ লাল। পাহাড়ের ঢালুতে এক জায়গায় তেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে উপর থেকে সে মেয়েদের দিকে তাকাল। এতগুলি মেয়েকে এক সঙ্গে এক জায়গায় দেখে সে অবাক হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। ফুরফুরে বাতাস লাগছিল তার গায়ে, নীচে ডুডুমা জলপ্রপাতের ঝর ঝর ঝম ঝম শব্দ তার কানে বাজছিল। খাড়া পাহাড়ের গা, গভীর খদ, পাতাল, বন আর সারি সারি পাহাড়,—নীচে বিহ্বল হয়ে চেয়ে মেয়েরা, আর উপরে ঢালুতে উগ্র উদ্ধত পশুর মতো মূর্তিতে দিউড়ু সাঁওতা, তার লম্বা লম্বা চুল

বিছিয়ে পড়ে আছে, কাঁধে বন্দুক, হাতে বর্শা। সব কিছু মিলে যেন চলচ্চিত্রের ফাঁকে স্বল্প সময়ের মধ্যে গাঁথা একটি দৃশ্য। সে-দৃশ্যের একটি আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত ছিল হয় তো। কিন্তু মাটির মানুষের মোটা মোটা আঙুলের ভিতর দিয়ে তার সূক্ষ্ম ভাবগুলি ফসকে ফসকে পালিয়ে যায়, ধরা পড়ে কেবল তার এপাশে থেকে-যাওয়া অর্থটুকু, যা স্থূল, কর্কশ—কেবল উগ্র পাশবিকতা, নগ্ন প্রকৃতির ছবি যার পটভূমি, মদান্ধ তামসিক পশু মন, রূঢ় মৌলিক রঙ যার আধার। যেখানে ভয়, ক্রোধ, কাম, হিংসা।

দিউড়ু সাঁওতার মনের মধ্যে তার কর্মপন্থা স্থির হয়ে গেল। সে এসেছিল নীচে ঝোরায় একলা হরিণ মারবে ভেবে, এখন তার উদ্দিষ্ট সে-পথ ছেড়ে ধাংডীদের দিকে মোড নিল। একটা বিকট হাসি হেসে সে দৌড়তে দৌড়তে নীচে নামতে লাগল। তার উদ্দেশ্য অতিশয় স্পষ্ট।

তাকে দেখে ধাংডীরা সতর্ক হয়ে ছিল। তার হাবভাব যে সময়োপযোগী নয় তা নয়, চৈতী অভিযানের অঙ্গ সেটা, আরণ্যক পুরুষের উদ্দাম পাশবিকতার সঙ্গে বন্য নারীর উগ্র সহযোগিতা, কিন্তু ধাংডীরা ছিল গোষ্ঠীর মধ্যে, গোষ্ঠীতে এক সঙ্গে থাকলে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা পরস্পরকে বাধা দেয়, আপনিই আসে একটা শৃঙ্খলা যার অন্য নাম চক্ষুলজ্জা। রোখবার জন্য, ঠেলে দেবার জন্য সকলের উপর মনে ঐটুকুই সমাজের গড়া কটকেনা।

দিউড়ু সাঁওতা ছুটে এল, সকলের মনে এল ভয়, দশজনের সামনে আপন সম্ভ্রম বাঁচাবার লোক-দেখানো চেষ্টায় তারা চেঁচামেচি করতে করতে এদিকে ওদিকে ছিটকে পালাল। আলাদা আলাদা হয়ে যাবার পর আড়াল থেকে তাদের হাসি শোনা গেল। আবার তারা একত্র হল—আর এক জায়গায়। দিউড়ু সাঁওতা চাৎকার করতে করতে দু' পা এদিক তো দু' পা ওদিক দৌড়তে দৌড়তে শেষে ক্লান্ত হয়ে একটা চৌকোনা পাথরের উপরে বসে পড়ল। জন্তুর মুখ থেকে ফাঁকি দিয়ে শিকার পালালে তার যেমন ক্ষোভ হয় দিউড়ু সাঁওতারও তেমনি হচ্ছিল, বন্য জন্তুর মতো নীচের পাতালের মিশ কালো মাথার কাছে বসে সে হাঁপাতে লাগল। কত দূর থেকে, পিছন থেকে, কোন দল থেকে যেন ভেংচানোর মতো গান শোনা যায়। দিউড়ু সাঁওতা মাথা ঝাড়া দিয়ে রুক্ষ চুলগুলো পিছন দিকে উলটে দেয়, গাড়লের মতো চোখ করে সেই দিকে তাকাতে থাকে, ফোঁস ফোঁস করে

তাড়াতাড়ি নিশ্বাস নেয়, যেন কোনো বন্য জন্তু বাতাসে কোনো গন্ধের সন্ধান করছে।

এই পাথরের উপরে বসেই বুঝি বড় বাঘ সকালের রোদ পোহায়, সহস্রধার প্রপাতের রামধনু দেখে। লোকে বলে এই পাথরের উপরে বসে নাকি বাঘ সকালে নিজের হাত দেখে, নিজের গোটা দিনের ভাগ্যের ছবি দেখে তাতে সে, সে জন্য প্রস্তুত হয়। এই পাথরের কাছেই নীচে ডেলা ডেলা বড় বাঘের মল পড়ে ছিল। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দিউড়ু সেগুলিকে পা দিয়ে দিয়ে ভেঙে নীচের দিকে গড়িয়ে ফেলে দিলে। বাঘের সময় এখন গেছে, আবার গরম কাল গেলে আসবে বাঘের সময়। কাঁধের বন্দুক বুকে সাহস এনে দিচ্ছিল তার।

কিছুক্ষণ গেল। উপর থেকে শিকারীদের আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। নীচের খদের ভিতর থেকে ময়ূরের ডাক উপরে ভেসে আসছে। মড় মড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বন্দুক বাগিয়ে ধরে দিউড়ু নীচে লাফিয়ে পড়ল, ঝোপ ঝাড়ের নীচে, গাছপালার নীচে সে নজর করে করে দেখতে লাগল। তার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়ে সেই ঝোরার ঢালুর অন্ধকারের ভিতর থেকে অনেক রকমের বড় বড় জন্তুর চলার শব্দ এল। পাশের দিক থেকে জন্তু খেদানোর শব্দ শোনা গেল। দিউড়ু আবার পশু হয়ে গেল, শির আর মাংসের গাঁঠগুলি তার টান হয়ে উঠেছে, সর্বাঙ্গ ধনুকের মতা অল্প বেঁকে গেছে, যেন সে জন্তু হয়ে জন্তুর উপরে লাফ দিয়ে পড়বে, তার চলনে এসেছে আশ্চর্য এক চোরা সতর্কতা, আর তার চোখের চাউনি, মুখের ভঙ্গী—সে মানুষের নয়, রক্তলোলুপ বাঘের।

হঠাৎ পাহাড়ের কোন খোলের ভিতর থেকে বাজনা বেজে উঠল, হৈ হল্লা বাড়ল। ছুটে-আসা জন্তুদের পায়ের শব্দ উপরের দিকে উঠে না এসে এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল এক দিকে, ক্রমশঃ কমে গেল—শুকনো পাতার উপরে ছুটে পালিয়ে যাওয়া উড়ো মেঘের টপর টপরের মতো।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দিউড়ু সাঁওতা দেখলে একটা গাছের তলায় পাথরের ফাঁকের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল একটি মেয়ে, কেউ কোথাও নেই।

জন্তুরা পালিয়ে গেল, বাজনার শব্দের হট্টগোলও কোথায় যেন মিলিয়ে

গেছে কিন্তু সেজন্য দিউড়ু সাঁওতা দুঃখিত হল না। আস্তে আস্তে যেন কিসের টানে সে মেয়েটির কাছে গেল, তার সতর্ক গম্ভীর শিকারীর মুখে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল স্বাগতের মধুর হাসি। সব মধুর, কেবল চোখের চাহনিতে সেই বুভুক্ষা, ভিক্ষুকের দুর্বল ক্ষুধা নয়, শিকারীর বলিষ্ঠ ক্ষুধা—যাতে আহুতি হয় নিজের সমস্ত স্থূল ব্যক্তিত্ব, মেদ, মাংস, অস্থি, রক্ত, সব।

পিওটি চমকে উঠল। তার সঙ্গের মেয়েদের কেউই কোথাও নেই, নাম ধরে যে ডাকবে তা তাদের নামও মনে নেই তার। কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল? সকলে তাকে একলা ফেলে কে কোথায় চলে গেছে। বাজনার শব্দে আর গোলমালে ঘুম ভেঙে উঠে পিওটি দেখলে যে কে একটা বুনো লোক—শিকারী বুঝি বা—একটু একটু করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। নিজেকে সে যথাসাধ্য সংযত করে নিল। বাইরে তার মোটেই ভয় নেই, কলিংতল দেশে থেকে বড় হওয়ায় সে নিজেকে যথেষ্ট সভ্য করে নিতে পেরেছিল। চেনা না থাকলেও কোনো পুরুষের কাছে অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে এমন মেয়ে সে নয়।

কিন্তু একসঙ্গেই, পিওটির আর দিউড়ুর ভিতর-মন ও দেহ পরস্পরকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করল তাদের সাক্ষাতের বন্য পটভূমি: স্থান কাল পাত্র সবই অনুকূল একটি উদ্দেশ্যের জন্য যে-জন্য নারী নিজেকে বলি দেয়, পুরুষও নিজেকে বলি দেয়, বলি হয়েও সে অনুভব করে মত্ততার আনন্দ আর বলির উদ্দেশ্য বুঝে নেয় চিরন্তনী প্রকৃতি। প্রকৃতির এই উপায়কে নিয়ে কবি কবিতা লেখে, শিল্প রচনা হয়, স্ত্রীপুরুষ ভাবে এই তাদের শাশ্বত প্রেম। কিন্তু এ ভিতর-মনের কথা, তাকে চেপে রাখার মতো সংস্কারের বল দিউড়ু সাঁওতার নেই, পিওটির ছিল। বাইরের সেই তল দেশের সংস্কারে ঘামঝরা উলঙ্গ দেহের কোন স্থান নেই। দিউড়ু সাঁওতা দেখছিল অতি সুন্দরী নারী, তার শিথিল বেশভূষার ভিতর থেকে যা দেখা যায় তা অতি কাম্য নারী দেহ। দিউড়ু সাঁওতা মনে মনে সেই দেহকে বুঝে নিতে পারছিল তার গন্ধ ও স্বাদের ধারণার মধ্যে—যেমন করে সে বোঝে চিংড়ী মাছ, কাঠ পিঁপড়ে, হনুমানের মাংস, কাঁচা মৌচাক, কড়া মহুয়ার মদ। হাওয়ায় ভেসে আসা খাবারের গন্ধে তার খিদে বেড়ে যায়। তার স্মৃতির ভাণ্ডার দিয়ে যাচাই করে পিওটি দেখছিল এ কেবল একটি অর্ধনগ্ন কন্ধ। রামায়া, সংগন্না,

পেপ্টয়া, সোমায়া—না, এ তা নয়। ঢিলে পায়জামার উপরে কামিজ, খালি পা, জরি পাড় কাপড়, কাঁধে তোয়ালে, মাথায় পাগড়ি—খাটো ধুতি, গায়ে কোট, হাতে সোনার বালা, কানে কুণ্ডল, মাথায় জরিদার পাগড়ি, মুখে লম্বা কোকনাডার চুরুট,—না, এ তা নয়, হতে পারে সুস্থ সবল শিকারী, তার আপন জাত, কন্ধ—এ তা নয়—এ তা নয়। মনের বাহিরটা কেবল যেন একটা ধুয়ো ধরে আছে—এ তা নয়—'কুইঁ'—'কুইঁ' (আমার মত নেই)—কে এটা!

কিন্তু সেই মনেরই আর পিঠ—নিজের অজান্তে যে আরশিখানিতে পড়ে আপন ছায়া—সেখানে কেবল একটি চিন্তা: সব নির্জন, নিরালা, সব সুন্দর, পুরুষ আসছে, সে নারী।

দিউড়ু সাঁওতার এগিয়ে আসার বীরপনাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে সে নিজেই আগে কথা বলল, "আমাদের সঙ্গের লোকদের দেখেছ?"

"না, আমি তো দেখিনি।" একটু থেমে দিউড়ু বলল, "একা পড়ে গেছ?"

পিওটি হেসে বলল, "আর একা কই? তুমি তো আছ।"

"আমি তো শিকারে বেরিয়েছি। এখানে বসে তোমাকে আগলাব নাকি?"

না-পছন্দের হাসি হেসে পিওটি জবাব দিলে—"শিকার তো করবে, কিন্তু কোথাও এক জায়গায় না বসলে জন্তুরা কি সব তোমার পিছন পিছন আপনি এসে জুটবে নাকি?"

দিউড়ু বলল, "জায়গা বেছে নেবার জন্য ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে তো।"

পিওটি হো হো করে হেসে বলল, "ও হো, তুমি বোধ হয় দেরি করে এসেছ, সব জায়গায় লোকেরা বসে গিয়েছে। তা এই জায়গাটাই খালি দেখতে পেলে বুঝি! তা এইখানেই বসে থাক না, জন্তু বেরোবে নিশ্চয়।"

"তুমি কি শিকার কর?"

"আমি? দেখছ তো আমার বন্দুক নেই। যদি তোমার মতো এত বড় বন্দুক থাকত—" পিওটি হাসল। অবস্থাটা সহজ লাগল এবার।

দু'জনে এ-কথা সে-কথা বলাবলি করতে লাগল। দিউড়ু সাঁওতা ছটফট করছিল, পিওটি কথা বলে বলে দিউড়ুকে ঝেড়ে ফেলতে চায়, বিদায় করতে চায়। মনের ভিতরের কলরব লুকিয়ে রাখতে না পেরে দিউড়ু চোখ ঠেরে বলল, "আসবি আমার সঙ্গে?"

পিওটি দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসল। দিউড়ুর আশা বাড়ল, দু পা এগিয়ে বলল, "আসবি?"

পিওটি তেমনি হাসছিল। বলল, "তোমাদের দেশের রীতি এমনি বুঝি, বনের পথে কোনো মেয়েকে একলা পেলে এমনি কথা বল— আসবি আমার সঙ্গে? আসবি?" ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে পিওটি বলল, "আসবি? আসবি?" পিওটি হেসে গড়িয়ে গেল।

দিউড়ু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এবার তার দম শেষ। ভাবল, কিছু না বলে তো থাকা যায় না, কিন্তু কি বলবে কিছু মনে আসছে না। শেষে জিজ্ঞাসা করল, "ধুঙ্গিআ খাবে—ধুঙ্গিআ?"

পিওটি বলল, "আমি ধুঙ্গিআ খাই না।"

এবার দিউড়ু হার মানল। তার অভিমান হল—চৈতী শিকার পরবের আদর-সম্ভাষণ এ নয়, এ রুক্ষ শিষ্টাচারের বাইরে। ভাবল উঠে চলে যাবে সে, পৃথিবীতে কি আর লোক নেই? ভারী দেমাক দেখাচ্ছে এই ছুঁড়ী। কিন্তু মনে মনে যতই বিদ্বেষ ভাব এসে সে গর্ত থেকে লাফ দিয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা করে ততই নীচের দিকে নেমে যায়, যেন চোরাবালিতে পড়েছে। তার ইচ্ছে, অভিমান দেখিয়ে বন্দুক কাঁধে তুলে সেখান থেকে চলে যায়, কিন্তু ঐ যে পিওটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গুন গুন করে গান গাইছে, একটা পা তার কাঁপছে, মাটিতে দাপাচ্ছে, দুই হাত উঁচু করে মাথার চুল ঠিক করছে, তার শরীর দুলে দুলে উঠছে, তেমনি সাজানো রয়েছে তার যৌবন ঢল ঢল ভঙ্গী—ছল ছল নারী দেহ, যেতেও দেয় না, কাছেও আসে না, যেন সেই একই দূরত্ব বজায় রেখে আপনি তাকে আটকে রেখেছে—কেবল তাকে আরো অস্থির করে তুলতে।

পিওটি কেবল তার দিকে মুখ করে ছিল, কেবল আভাসে ইঙ্গিতে তার মনে আলোড়ন তুলেছিল। পিওটি কড়ে আঙুলটি দিয়ে কোথাও চুলকায় আর দিউড়ু সাঁওতার বুকে ঢেঁকির পাড় দিতে থাকে। পিওটি নিজের শরীর একটু বাঁকায়, দিউড়ুর মুখের উপরে চলে তপ্ত বাতাসের হলকা, মুখ শুকিয়ে ওঠে। পিওটি এক পাশে একটু সরে যায়, বিশ হাত দূরে কোণের মাপে ততখানি বেঁকে যায় দিউড়ু সাঁওতার ঘাড়।

এমনিভাবে কিছুক্ষণ গেল। মাথার উপরে গাছের ডালে কোত্থেকে উড়ে

এসে এক জোড়া পাখী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিল। সুন্দর ছোট ছোট পাখী দুটি, লাল লাল রঙ, পোড়া ইঁটের মতো। পাখী দুটির ডানার ফড়ফড়ানিতে যেন দুটি আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। পিওটি সেদিকে তাকিয়ে তাদের খেলা দেখতে দেখতে যেন নিজেকে ভুলে গেল, তার অন্যমনস্ক হাতের আঙুল কখন তার পিঠের উপরে মোটামুটি রকমের একটা তেলেঙ্গা বেণী ঝুলিয়ে দিল। ওদিকে সহস্রধার প্রপাতের ঝমঝম শব্দ, মুখের উপরে দুটি পাখীর ঘর-করনার খেলা। পিওটি বাস্তবিক অর্ধেক ডুবেই গিয়েছিল। দিউডু কেবল দেখছিল পিওটিকে। এর চালচলন সব যেন নতুন, কিন্তু হাতের নাগালের বেশী বাইরে নয় মনে হয়। এই নরম দেহটুকু, কতই বা এর প্রতিরোধ করবার শক্তি হতে পারে? নরম গরম দেহ, কোমল তার স্পর্শ। রুক্ষ কঠিন ঘামঝরা মানুষের আশ্রয়ের যোগ্য এ। এগোলে কি বলবে? কিন্তু না, সাহস তো হয় না।

শিকারের কথা দিউড়ুর আর মনে ছিল না, আপন জানা-মনের উদ্দেশ্য ভুলে সে অজানা-মনের কাঙালপনায় অস্থির হচ্ছিল। ভাবছিল কি করলে এই মেয়েটিকে খুশী করা যায়।

হঠাৎ বন্দুকের দুম্‌দাম্‌ আওয়াজ হল কয়েকটা, একসঙ্গে সব বাজনা বাজিয়ে হৈ হৈ করতে করতে এদিক-ওদিক থেকে লোকেরা ভিড করে ছুটে চলল। মেয়েদের উদ্দেশ্য ক'রে পুরুষদের আনন্দের চীৎকার ছুটল, তার সঙ্গে সঙ্গে নাচের বাজনা, গান, শিটি। হকচকিয়ে দিউডু সাঁওতা কাঁধে বন্দুক তুলে সেই দিকেই ছুটল। পিওটি হাসল।

দিউডু সাঁওতা চলে যাবার পর পিওটি দেখল দিউড়ু তার বর্শাটি ফেলে গেছে। পিওটি সেটাকে তুলে নিয়ে তার ওজনটা ঠাউরে দেখল, বেশ ভারী। বর্শাটাকে হাতে করে ধরল, কাঁধে ফেলল, নিজের গায়ের চামড়ায় বর্শার স্পর্শ পিওটির ভাল লাগল, যে এটাকে নিয়ে ঘোরে, যে এটা চালায় তার শক্তির পরিমাপ এটা। হাতে এটা থাকলে সে নির্ভয়। হাতে একটা ছড়ি থাকলেও সাহস আসে, হাতিয়ার থাকলে কেমন যেন গায়ের জোর বেড়ে গেছে মনে হয়, বুক আর ঘাড টান করে চাউনিতে সবাইকে 'নস্যাৎ' করে চলার ভাব আসে—ভাবছিল পিওটি।

লোকের ভিড়ের মধ্যে পিওটি মিশে গেল।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

সেদিনের শিকারে দু'টি হরিণ আর একটি কুট্‌রা মারা হয়েছে, মহা আনন্দ। বাঁশের খাটিয়া বানিয়ে মরা জন্তুগুলিকে ফুল দিয়ে ঢেকে মহা সমারোহে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে সবাই গ্রামে ফিরল। পিওটির খুব ভালো লাগছিল। গোষ্ঠী জীবন ওকে আপন করে ফেলেছিল, তার মনে হচ্ছিল শিকারের সাফল্যে তারও ভাগ আছে, সকলেরই ভাগ আছে। মনে হচ্ছিল, এই চাষ-বাস, শিকার, বন, আর ফূর্তির জীবনে একটা আনন্দ আছে যা তার ফেলে দিয়ে আসা জীবনযাত্রার মধ্যে ছিল না। পথে সকলেই আবার মদ খেল, আবার যুবক-যুবতীরা নাচল, পরস্পর ধরাধরি টানাটানি করল। গ্রামের কাছের ঝোরায় নামবার সরু ঢালু পথে যেখানে দুই পাশে দেয়ালের মতো খাড়া পাথর, ঘন ঝোপ জঙ্গল, সেখানে কে একজন পিছন থেকে তার কাঁধে ভারী হাতের চাপ দিল। পিওটি ফিরে দেখল—সেই সে,—দিউড়ু সাঁওতা।

“ভালো করেছিস নুনি, আমার বর্শাটা তুলে এনেছিস, কোথায় ফেলে এসেছিলাম। গোদ্‌রি গাঁয়ের আসল লোহার তৈরী আমার বর্শাটা। আর জানিস, একবার বাঘে আমায় ধরতে এসেছিল, মারলাম এই বর্শা দিয়ে তার মুখের ভিতরে এক ঘা, যতবার আমার দিকে ছুটে আসে তার দিকে বর্শাটা এগিয়ে ধরি, বাঘ হটে যায়। বর্শাটাকে সে কামড়ে দিয়েছিল, লোহার উপরে তার দাঁত বসাবার চিহ্ন আছে, এই দেখ্‌।”

তার নিজের অভিজ্ঞতা সেটা না আর কারো, পিওটি সে কথা ভাববার সময় পেল না, বর্শাটা তার দিকে এগিয়ে দিল। বহু লোকের গাদাগাদি ভিড়—দীপের তলায় অন্ধকার, সেই ঠেলাঠেলির মধ্যে তার গায়ে গা লাগিয়ে চলেছে সেই লোকটা, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। কখন তার কাঁধের উপর সেই হাত দুটো নীচের দিকে ঝুলে পড়ল। ভিড়ের ভিতরে মুশকিলে পড়ে পিওটি না জানার ভান করে চলতেই লাগল। তার গা কাঁপছিল। সেই রকম আনমনা হয়েই সে চলছিল। কতক্ষণ পরে তার খেয়াল হল আর সবাই কোথায় কত আগে এগিয়ে গেছে, ভিড় আর নেই। আসন্ন সন্ধ্যার

আলোয় বনের ঝোপঝাড়ে শান্তি নেমে এসেছে, ভিড় নেই, তবু তার পিছন পিছন সেই লোকটা তেমনি ভাবেই তাকে ধরে আছে। পিওটির দেহের মোহ ভেঙ্গে গেল, ছটফটিয়ে হাত ছাড়িয়ে সে পালাল। পিছন থেকে দিউড়ু সাঁওতার ডাক শুনতে পেল—"পালালি কেন ? ও মুনি, পালালি কেন ?"

দিউড়ু সাঁওতার দেহে আগুন জ্বলছিল। দলের মধ্যে আর একবার দেখাদেখি চাওয়া-চাওয়ি। পিওটি নিজেকে সামলে নিয়েছে। তার চোখে মুখে এখন আবার সেই রকম দূর দূর অচেনা চাউনি। দিউড়ু ভরসা করে কাছে এগিয়ে এল, যেন কিছু গোপন কথা বলার আছে তার। যেন কিছু জানেনা চেনেনা এমনি ভাব দিয়ে, কলিংতল দেশের ধরন দিয়ে চলন দিয়ে পিওটি তাকে অভিভূত করে দিল। তার চাউনিতে ধাক্কা খেয়ে মাথা নীচু করে দিউড়ু নীচের দিকে হটে গেল, ভাবল, সবই এই ছুঁড়িদের মর্জি। যতক্ষণ এদের খুশি ততক্ষণ খেলবে খেলাবে, তারপরে আর না, তখন পায়ে ঠেলে দেবে।

পিওটির ব্যক্তিত্বের ডাক কেবল মাংসের নয়, দিউড়ু সাঁওতা অভিভূত হয়েছিল।

"কোনো ত্রুটি হচ্ছে না তো দিউড়ু ভাই ? আমাদের গ্রাম কেমন লাগছে ?" হাগুর্ণা সাঁওতা জিজ্ঞাসা করল। দিউড়ু হেসে মাথা নাড়ল।

"তুমি একা এলে, মেয়েদের কেন সঙ্গে আনলে না ? আনলে মন্দ কিছু হত ? আমাদের এখানে কি তাদের তেমন অসুবিধা হত ? ঐ দেখ দিউড়ু ভাই, ঐ মেয়েটা কাপড-চোপড একরকম আমাদের মেয়েদের মতোই পরেছে কিন্তু ও একদম কলিঙ্গী, সতর বছর হল বিদেশেই বড় হয়েছে, কাল সন্ধ্যায় ফিরেছে ওর মায়ের সঙ্গে। ভালো করে কথা বলতে শেখেনি। আমাদের এখানকার সব তাতেই নাক সিটকাচ্ছে ও, সবাই বলছে। তা অমন হবার কথাই তো দিউড়ু ভাই, সে দেশের লোকেরা আমাদের চেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, অনেক জানে শোনে। নারণপাটণার পথে আমার মামার বাড়ি যেতে যেতে বারবার আমি তাই দেখি। আমাদের মতো ওখানে এত জঙ্গল নেই তো, কি এত শীতও নেই। সে দেশের মেয়ে আনতে গেলে না করে দেবে, বলবে—এত শীতের দেশে যাব না। ওদের দেশ

খোলা মেলা। ও দেশের জমিতে ফলন বেশী হয়। ওখানে 'রোটু' (ইংরাজী 'রোড্') আছে, গাড়ি আছে, অধিকারীরা আছে। এই জন্ম ওরা আমাদের চেয়ে উঁচুতে। ওদের দেখে হিংসা করে কি লাভ, না কি বলো ?"

দিউড়ু সাঁওতা দেখছিল ঐ ওদিকে পিওটি যাচ্ছে। এত গাঁয়ের মেয়েরা আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে ওকে কেমন বেছে নেওয়া যায়। কি সুন্দর ভেসে ভেসে যাওয়ার মতো চলন ওর, কি সুন্দর ওর কথাগুলি। সকলের মধ্যে পিওটিকে চিনে নেওয়া যাচ্ছে—দিউড়ু সাঁওতা ভাবছিল কি দুঃখে সে পুয়ুকে বিয়ে করেছিল, কি দেখে ? পুয়ু আর পিওটি ! সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। একজনের সাহচর্যে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য আসে, আবার মনে হয় সব উজাড় ক'রে দিয়ে বসতে ; আর অন্য জন—শুকতারার মতো জলজল করে দিগন্তে, উৎসাহ দেয়, বল দেয় অসাধ্য সাধন করে জীবনকে জীবনের মতো করে ভোগ করতে।

॥ পঞ্চাশ ॥

মিণিআপায়ু গাঁয়ে—

চারদিন ধরে শিকার মদ নাচ ফূর্তির পর চারিদিক নিঝুম হয়ে পড়ছে, নিঝুম আর খালি খালি। চার দিনের নাচের ক্লান্তি দূর করবার জন্য ধাংডীরা অনিদ্রায় লাল চোখের উপর পাতা ঢেকে দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। পুবুলি ঘরের ভিতর শুয়ে ছিল, পুয়ু হাকিনাকে কোলে করে বসে দুধ খাওয়াচ্ছিল। সন্ধ্যা না হতেই চারিদিক যেন মরা, নির্জীব। গাঁয়ের গরু ঘরে ফিরছে, ফিকে ধুলো উড়ছে। কোন গর্তের মধ্যে কুটুরা কাঁদছে, উদাস করুণ তার সুর। ঘড়ি-খানিক রাত হলে উজ্জ্বল চাঁদ উঠবে, তামাশা করে বলবে—করছ কি ? আছ কেমন ? মানুষের জন্ম পেয়ে মানুষের জীবনের আনন্দের কত ভোগ করলে, আর কত ভাগ বাকী ?

জামিরি কন্ধের বুড়ী গিন্নী তার স্বামীর কাপড় কাচছিল। বলল, "সাঁওতা কবে আসবে বলে গেছে, বউ ?"

"কই, আমি তো জানিনা।"

বুড়ী আশ্চর্য হয়ে বলল, "জানিস না কি? তোকে বলে যায় নি?" পুয়ু কোনো জবাব দিলে না। বুড়ী বলে চলল, "এক জাতের পুরুষ আছে তারা এমনিই, চলে যাবে অথচ বলে যাবে না যে কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরবে। এদিকে মানুষ ভেবে সারা হতে থাকবে, ওদিকে সে আপন খেয়ালে চলেছে। বড় খারাপ, ভারী খারাপ। আমার বুড়ো অমন নয়। এই দেখ না, এত লোক গেল, বুড়ো গেল না। বললাম, "যা মন খুশী করে আয়, বছরে একবারই তো।" বুড়ো বলল কি জানিস, বলল, "বছরে একবার সে যে আসে সে তো কেবল চলে যাবার জন্যই, তার পিছন পিছন ছুটে বেড়িয়ে কি হবে? খালি ব্যথা আর বেদনা। আর তুই না গেলে সে ভালোও লাগবে না। তার চেয়ে আমরা বুড়োবুড়ী এই গাঁয়েই চইত পরব পালব। তুই আমার কাছে থাকবি, আমি তোর কাছে থাকব।" বলতে বলতে বুড়ীর মুখের উপর হাসির ছোট ছোট ঢেউ খেলে যেতে লাগল, ডোবার মধ্যে বেঙ-লাফানো একটুখানি তরঙ্গ ওঠার মতো। বুড়ীর চোখ গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বুড়ীর কথা শুনতে শুনতে পুয়ু ছেলের গায়ে হাত বোলাচ্ছিল, ভবিষ্যতে কবে এ মানুষ হবে, কবে ঘুচবে পুয়ুর দুঃখ। অন্য কারও কোনো কাহিনী শুনে তার কি হবে?

পরবের বাজনার শব্দ আসে আস-পাশের গ্রাম থেকে, মনের সরু সরু খেইগুলিতে জট পাড়িয়ে দেয়। দূর থেকে আসে কার গান আর ফূর্তির হাঁক ডাকের আওয়াজ, কোন পথিক চৈতের মধুতে মন ভরে নিয়ে উড়ে চলেছে। পুয়ুর মন কেমন করে ওঠে তখন। মুখ গুঁজে শরীর মন কাঠ করে বাঁধাধরা পথে চলবার সব বোবা সহিষ্ণুতা কোথায় উবে যায়, যতই মনকে সামলাবার চেষ্টা করুক কেবলি মনে হয় মানুষ মানুষ, মানুষ হাসি-কান্না আলো-ছায়ার মানুষ, সে কেবল অবস্থার দাস নয়, গোষ্ঠীর ঘষামাজা মতবাদের দাস নয়, তার অনুভূতি আছে। পুয়ু হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মোছে, হাকিনা মায়ের বুকে মুখ লাগিয়ে দিয়ে জগৎসংসারের দিকে পিছন ফিরে নিশ্চিন্তে এলিয়ে পড়ে থাকে, মায়ের চোখের জল সে দেখে না।

পুয়ু ভাবছিল, সংসারের সাধারণ মানুষ যেমন্ ভাবে ; সে ভাবনার শেষ

নেই, তর্ক-বিচারের সুতো দিয়ে গাঁথা নয় তা, ধুলো-বালি ওড়ানো হু হু বাতাস শুধু। মনের ভিতরটা গুমরে গুমরে উঠতে থাকে, দেহের অণুতে অণুতে খেলে তার প্রক্রিয়ার প্রতিফলিত ছবি। মনের কত অর্ধস্ফুট কথা, কত স্মৃতি তার মধ্যে, সব মিলে মিশে একাকার হয় মনের একটি ভাবনা, চোখের চাউনির একটি রূপ, মুখের একটি ছবি, একটি অভ্যস্ত ভঙ্গী।

এমনি দিন কবে এসেছিল, পাড়ার মেয়ে—আপন বোনের মতো—সাধ করে চুল বেঁধে দিত, গালে চিকন করে লাগিয়ে দিত রেড়ির তেল আর হলুদ, আঙুল দিয়ে মেজে মেজে দেখত কাচের মতো মোলায়েম দেখতে হল কিনা। কোমর অবধি খোলা তার কঞ্চনীর দেহ চিকমিক করে উঠত এক ফালি রোদের চঞ্চল আলোয়। নীচে রাখা আছে এক রাশ ফুলের মালা, চুল বাঁধা গা মাজা সারা হলে সখী তার গলায় আর খোঁপায় মালা পরিয়ে দেবে। দুয়ারে বসে আছে কারা সব তার মুখের একটি কথা শোনবার জন্য, কেউ বা বার বার আসছে যাচ্ছে নানা ছলে, নানা রঙ্গে—আরশিতে তার ছায়া পড়ছে থেকে থেকে, ঠোঁট থেকে হাসি টেনে বার করছে যতই সে গম্ভীর হয়ে থাকুক। মা দাঁড়িয়ে রয়েছে পিছন দিকে, তার মুখে এক কথা—"না, তোর পেট ভরেনি, আর একখানা খেয়ে যা, খেয়ে যা।" দোর গোড়ায় কে ও? মোটা গলা নরম করে মোলায়েম করে ডেকে বলছে—"পুয়ু– পুয়ু—, এই নে, দুটো ভুট্টা এনেছি।" হাসি, আনন্দ, মানুষের অফুরন্ত আশা। কবে একদিন সে ছিল বাপের বাড়িতে আদরিনী মেয়ে, কোথায় গেল সেই সব দিন? কোথায় সেই যৌবন, কোথায় সেই স্বাস্থ্য, দেহ দিনে দিনে কি হয়ে যাচ্ছে, কোন্ চুলায় যাচ্ছে, হায় রে!

পুয়ু আশা ছেড়েছিল, বুঝেছিল সব গেছে, হাজার চেষ্টা করলেও তা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। পুরুষ আর তার আয়ত্তে নেই। কিন্তু এত কঠিন সত্যটা মাথায় যতই ঢোকাতে চায় মাঝপথে আটকে গিয়ে ভেঙে যায় যেন। পুরুষ তার আয়ত্তে নেই, তবে তার এই শিশু কিসের জন্য? এই হাকিনা, কে এ? সব নিষ্ঠুর কথা সব কঠোর কথার মূর্তিমান অবিশ্বাসের পিণ্ড। খোকা হাসে, দু হাত ছোঁড়ে, খামচায়। এতেই তার সংসার ভরতি, এই শিশুর মোলায়েম শীতল শরীরে হাত বোলালে সংসারের অন্য দিকটা ভোলা যায়। পুয়ু ছেলের এক একটা অবয়ব টেনে টেনে

তাকে হাসায়, মা হাসে, ছেলে হাসে, মায়ের আধভাঙা মন আবার জোড়া লাগে।

"কিসের এত হাসাহাসি লাগিয়েছিস লো পুয়ু? হল কি?" পুয়ু সামলে নিল। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে পুবুলি। পুবুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল। পুয়ুর চিন্তার গতি বদলে গেল। পুবুলি তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, ভারী ভারী মুখে হাসিতে যোগ দেবার চেষ্টায় এলোমেলো কথা বলতে লাগল, "আ মর্, চুপ করে গেলি কেন লো? কি হয়েছে বল্, বল্।"

কালকের মেয়ে পুবুলি এর মধ্যে কত বড় হয়ে গেছে। সুস্থ সবল মোটা সোটা, যেন একটি ফুল গাছ, লতাপাতায় ছাওয়া, চারখানি ডাল, বড় বড় চার থোকা ফল, চারটি চারটি ফুল, এই রকম হয়েছে সে। পা ফাঁক করে দু' হাত মেলে দাঁড়িয়ে আলিস্যি ভাঙে সে যখন, নজরে পড়ে সেই শক্ত লতার ডোর, শিআরি লতার হারের মতো, বনের 'পাএর মাল' ফুলের গুচ্ছের মতো যার দিকে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে পথিকজনের। পুয়ু তাকিয়ে তাকিয়ে যেন পুবুলির বল কষছিল, আর ভিতরে ভিতরে তার মন দমে যাচ্ছিল। ঐ স্বাস্থ্য, ঐ যৌবন, ঐ সব কিছু—আর সে? একটা কাঁপা খোলা কেবল। নিজের ভিতর থেকে আর একটি জীবনের জন্ম দিয়ে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে আছে মাটিতে মিশে যাবার পথ চেয়ে। তার মন মানতে চায় না পুবুলির সঙ্গে তার কোনো বাদ আছে বলে, পুবুলি তার স্নেহের পুবুলি—তাকেই বা এত ভালোবাসে কে, পুবুলি ছাড়া? অকারণে মুষড়ে পড়ে মন, মনের গহনের এইটুকুই ইঙ্গিত, এইটুকুই প্রকাশ তার।

"অমন করে মুখ গম্ভীর করে রইলি কেন পুয়ু? কেমন সুন্দর হাসছিলি। আজকাল তোর মুখে হাসি দেখতে পাওয়া তো স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, না লো পুয়ু?"

পুয়ু আবার আনমনা হয়ে রইল। এই একটি কথা—তা থেকে মনে পড়ে কত কথা—আর কেউ কবে যেন বলেছিল এমনি কথা, বলেছিল এমন কেউ যে তাকে ভালোবাসত, বলেছিল অভিমান করে—পুয়ুর জীবনের ইতিহাসের কোন্ যুগে সে—মনে নেই। কিন্তু বলেছিল। পুয়ুর মুখের উপর দিয়ে ত্বরিতে একটা ছায়া ভেসে গেল। তারপর পুয়ু আশ্বস্ত হল, জোর করে সে

নিজেকে সামলে নিল, বলল, "এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লি কেন লো পুবুলি? আর একটু ঘুমিয়ে নিলি না?"

পুবুলি যেন এবার ভরসা পেল। আবদারের সুরে বলল, "খিদে পেয়েছে, কি আছে দুটো দে।"

পুয়ু বলল, "একটু সবুর কর্, খোকা দুধ খেয়ে নিক।"

পুবুলি খেপার মতো ভাজের পিঠের উপর চটাস চটাস করে মারল, কাপড় ধরে টানাটানি করতে লাগল, বলল, "আবার সবুর সবুর কি, দে না খেতে—"

পুয়ু বলল, "এত তাড়া কিসের, একটু সবুর কর্। খেয়ে-দেয়ে কোথাও যাবি নাকি? কাউকে কথা দিয়ে এসেছিস্ নাকি?"

পুবুলি বলল, "তুই কথা দিয়েছিস্, তুই যাবি।"

"আমি যাব? তাহলে তোকে সামলাবে কে? হ্যাঁ লো পুবুলি, গেলি না কেন তোর দাদার সঙ্গে, ওরা না বন্দিকার যাবে বলছিল?"

"তুই গেলি না?"

"আমি যাব? আমার কি আর সেদিন আছে, বল্ দেখি তুই? আমার যে ছিরি হয়েছে, বাইরে বেরুলে মিথ্যে লোকে ভয় পাবে কেবল। আমরা 'ডোক্রী' (বিবাহিতা মধ্যবয়স্কা নারী) মানুষ, আমাদের উনুন-ধারই ভালো। না সত্যি, তুই গেলি না কেন? আমি তো কেবল তাই ভাবছি। কোথায় গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাববি। তা না নিশ্চিন্ত হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিস্। তুই আর খাবি কি, যা বসে বসে ভাব।"

পুবুলি ততক্ষণে হাসতে শুরু করেছে। বলল, "তুই খুব ভাবতিস আমার ভাইয়ের কথা, না লো?"

পুয়ু বলল, "তুই দেখিস নি বুঝি, তাই বলছিস। তোর ভাইয়ের কথা না ভাবলে তো তোর মতো ঘুমিয়েই থাকতাম, আর জেগে থাকত কে? নে ছেলেটাকে একটু ধর্ তো, আমি তোকে খেতে দিই।"

পুবুলি হাকিনাকে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। এই এক রত্তি ছেলে, এই নাকি তার বাবার আত্মা। কই, কোন্‌টা তার বাপের মতন, কিছুই তো দেখা যায় না। সে কোলে নিলে হাকিনা আজকাল আর কাঁদে না, বোঝে যে এরা তার সংসারের। ঘরের মধ্যে খুটখাট দুড়্‌দাড়্ শোনা

গেল। কোথায় ছিল দস্রু কুকুর, গা ঝাড়া দিয়ে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। তার গা থেকে ছাল উঠছে এই গরমে। সারা দিন শুয়ে থাকার জন্যই হয়তো পুবুলির মোটেই ভালো লাগছিল না। ভিতরে আবার খুটখাট হুড়দাড়, আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দস্রুর লেজ নাড়া। যত কাঁদুনে কথা, মনের যত কাঙালপনা মনের মধ্যে এসে জুটল পুবুলির। সে পরব থেকে এ পরব কত দিন, সে বসে বসে হিসাব করল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, এমনি করে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। কোথায় যেন কলে মরচে ধরেছে, পরবের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে কোথায় যেন বিচ্ছেদ বিদায়ের দুঃখ লুকিয়ে আছে। দিনের আলো যতই নিবে এল ততই পুবুলির মাথাটা ভার ভার লাগতে লাগল, রাত্রি আসছে, এতেই বোধ হয় সব শেষ। পুবুলির মনের সাধ নিবে গিয়েছিল!

রান্নাঘরে পুয়ু উনুন ধরিয়েছে, টাটকা কিছু না রেঁধে সে খেতে দেবে না। বরাবরই এমনি সে, খেটে মরতে ভালবাসে। পুবুলি ভাবছিল—"হ্যাঁ লো, কি এত ভোজের রান্না রাঁধছিস, এত করবার কি দরকার ছিল তোর?

রান্নাঘরের ছ্যাঁক-ছোঁক সোঁ-সোঁ শব্দ—সেই তার উত্তর। তার উড়ন্ত মন কোথাও নীড় বাঁধতে চাইছিল। পুবুলি ভাবছিল পুয়ুর দিন ভালো যাচ্ছে না।

॥ একান্ন ॥

সেই সন্ধ্যায় আবার গাঁয়ের ভেরামণে বটগাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। নিত্যি দিনের অভ্যাস অনুযায়ী তারই কণিকা কুড়িয়ে কুড়িয়ে আপন মনে ভরে রাখবার জন্য ঝাঁকড়া গাছের তলায় মানুষ এসে জমল। জ্যোৎস্না রাতে ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে নাচবার জন্য পা সুড়সুড় করছে, মন নেচে উঠছে, কিন্তু নাচাবে যারা সেই ছোকরারা নেই। তাদের পথ চেয়ে চেয়ে সময় যেন ঢেলে দেওয়া হচ্ছে মাটির উপর জলের মতো। নাচ রঙ্গ বন্ধ। শিকার বন্ধ। ছুকরীদের মন ছটফট

করছে। আজ গাঁয়ের ফাঁকায় বসে সেই কথাই হচ্ছিল—"আর কত দিন বসে থাকা যায়? নয় তো চল বুড়ো দু'-তিনজনকে নিয়েই কাল বেরিয়ে পড়া যাক। পরবের যাত্রা তো, সঙ্গে মেয়েরা একদল গেলেই চলবে, যে গাঁয়েই যাব আদর করে ডেকে নেবে। ফিরুক ছোঁড়ারা, এসে দেখবে নাচের জন্য কেউ নেই।"

বুড়োরা বলল, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

যুবক যুবতী না হলে নাচ অসম্ভব। বুড়োদের যত কাররবাই কেবল মদের ঝোঁকে। কারো পেটে পড়েছে গোল সাগুর হালকা মদ, কেবল গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর কারো বা মহুয়ার কড়া মদ খেয়ে কেবল নাচ পাচ্ছে। থেকে থেকে কত বুড়োই একে একে নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে কেবল মাতলামি, হাসাহাসি, লুটোপুটি।

দু'জন বুড়ো, লেতা আর আর্জু, পরস্পরকে যুবক-যুবতী ধরে নিয়ে দু'জন দু'রকমের নাচ দেখাচ্ছে। এক জন গাইছে ধাংড়ার গান আর জন ধাংড়ীর। "ও ব্বাবা, কত বড় বড় গোঁফ আমার ধাংড়ীর, বাহবা—" "আরও বড় ছিল গো. কাস্তে দিয়ে কেটে ফেললাম সেদিন।" এই বেতালা নাচের সঙ্গে এক দল ছোট ছোট ছেলে বেতালা বাজনা বাজাচ্ছে ঢোল নিয়ে। দু'জন বাঁশি বাজাচ্ছে, ছয় ছেঁদার দু'হাত লম্বা বাঁশি।

ঠিক এই সময়ে দূরে কাদের হৈ হৈ গোলমাল শোনা গেল। একদল লোকই অবশ্য. জ্যোৎস্না রাতে কোথায় মিশে গেছে ঠাহর করা যায় না। কে একজন বলল, "জুরিআ (ডাকাত)!" মদো মাতাল দু'জন চেঁচিয়ে উঠল—"জুরিআ—জুরিআ—"! "আচ্ছা, সত্যিই যদি এরা ডাকাতই হয় তাহলে কি করবি পাণ্ডু ডিসারী? গ্রামে তো জোয়ান কেউ নেই, আছে কেবল বুড়োরা। তোর নক্ষত্ররা কোনো সাহায্য করতে পারবে?"—কে একজন বলল।

"নক্ষত্র বলছে যে এই সময় এই রকম গোলমাল করতে করতে হেলতে দুলতে 'জুরিআ' আসে না। নক্ষত্র যোগ দিয়ে দিয়েছে—জুরিআ আসবে না।"

কে একজন হাঁকলে—"জুরিআ—ও জুরিআ!" যারা আসছিল সেই লোকেদের ভিড় থেকে তারই প্রতিধ্বনি হল "জুরিআ—জুরিআ"। হো

হো হাসি শোনা গেল। একজন হাঁক ছাড়ল—"আমরা তোমাদের গাঁ লুট করতে এলাম, সব লুটে নিয়ে যাব। কোথায় গেলি সব! ধাংড়ীরা আছিস নাকি রে?" তার পর গান শোনা গেল। ধাংড়ীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। জামিরি কন্ধ কুকুরদের সম্বোধন করে বলল—"ডুঃ—ডুঃ, চোঃ—চোঃ—" অর্থাৎ, কন্ধ দেশের কুকুরের ভাষায়—হে কুকুরগণ, যাও দেখো। ডুঃ ডুঃ শব্দে চার পাঁচটা কন্ধ কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে দৌড়ল। মেয়েরা উঠতে যাচ্ছিল, জামিরি কন্ধ বলল, "থাম্, ব'স।" পাণ্ডু কন্ধ হাঁকল—"কে যায়?"

"আমরা ডাকাত।"

"এই গ্রামে 'টেসিণি'র (থানা) লোকেরা রেঁদে এসেছে, ডাকাত হও তো পথ দেখো।" উত্তরে কেবল হাসি।

কে একজন বলল, "জোয়ানরা সকলে শিকার করতে গেছে নাকি? কেবল বুড়োদের গলা শোনা যাচ্ছে!" বন্দুকের আওয়াজ হল গুড়ুম করে, গাছের পাখীগুলো উড়ে গেল। কুকুরদের চেঁচানি ভীম গর্জন থেকে করুণ বিলাপে নেমে এল। জামিরি কন্ধ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। লেতা কন্ধ ধাংড়ীদের কানে কানে বলছিল—"তোরা শুয়ে পড়্, তোরা শুয়ে পড়্।" জামিরি কন্ধ চেঁচিয়ে বলল, "তোমাদের বাড়ি কোন্ গাঁয়ে হে?"

"আজ রাতে আমাদের বাড়ি তোমাদের গাঁয়ে!"

"দেখ অচেনা লোকেরা, হাসি ঠাট্টা পরে হবে। এত রাতে তোমরা আমাদের গাঁয়ে আসছ। ঐখানে দাঁড়াও, নিজেদের পরিচয় দাও। আর এক পা এগিয়েছ কি পরে পস্তাতে হবে। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, হুঁশিয়ার!"

তখন জ্যোৎস্নার ভিতর থেকে প্রতিধ্বনির মতো কাঁপা আওয়াজে শোনা গেল—"আরে বলে দে রে, বেশী হাসি-তামাশা করতে গিয়ে আবার মুশকিলে পড়ে যাবি শেষে।"

তার পরে মধুর কণ্ঠে সম্ভাষণ ভেসে এল—"ওড়ে সোই (হে বন্ধু), ওড়ে সোই, আমরা মিটিং গাঁয়ের হে, আসতে আসতে এত রাত হয়ে গেল, কি করব?" অচেনা স্বর আরো অনেক বিবরণ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার গলার আওয়াজ ছাপিয়ে এদিক থেকে মস্ত একটা 'হো—' শব্দ উঠল। ছেলে

পিলে আর মেয়েরা সবাই ছুটে গেল। গানে গানে সব গোলমাল হয়ে গেল। সব নিরুৎসাহ একঘেয়েমি কেটে গিয়ে মিণিআপায়ুর মাটি তুলে উঠতে লাগল, পরব চাগিয়ে উঠল।

হাত ধরাধরি করে পুলমে কাঠ্‌ক, টিট আর জঞ্জই পুবুলির খোঁজ করতে লাগল। এত গোলমালেও পুবুলির দেখা নেই।

অতিথিসৎকারের জন্য মিণিআপায়ু ব্যস্ত হয়ে উঠল। গ্রামের কুকুরগুলো পিছনে সরে গেল, লোকেরা এগিয়ে এল। পুয়ু ব্যাপার কি দেখবার জন্য এসে উপস্থিত হল। তার বাপের বাড়ির লোকেরা এসেছে। ঠিক সময়ে এসেছে, তার হতাশ মনকে ঠেকো দিয়ে বসতে। আজ কাক ডাকেনি, হাত ফসকে জিনিস পড়েনি।

কেউ ডাকতে যায়নি তবু তারা এসেছে, ভুলে যাওয়া মাটির খবর নিয়ে। পুয়ুর বুক এতখানি হয়ে উঠল। "ওরে হাকিনা মামাকে দেখবি আয়। ঐ দেখ তো—দেখ তো কারা এসেছে, এদিকে চেয়ে দেখ!" মায়ের কোলে হাকিনা মাথা তুলে চেয়ে দেখল। কেমন সুন্দর মায়ের কোলে সে এলিয়ে পড়েছিল। ঘুমোবার সময়। হাকিনা ডবডব করে তাকাতে লাগল। চারিদিক ঝিলমিল করছে, তার মধ্যে চিকমিকে দাঁত, অচেনা কতকগুলি মুখ ওর মুখের কাছে এগিয়ে আসছে। দুই হাতে মায়ের আঁচল মুঠো করে ধরে হাকিনা আবার মুখ লুকাল। পুয়ু বলল—"ঘুমুবার সময় তো—তাই। তোমাদের এত দেরি হল কেন? বনের পথ, সন্ধ্যার আগেই গাঁয়ে পৌঁছাতে হয়। রাতে কোথাও থেকে যেতে হবে তো?"

পুয়ুর সহানুভূতি একদিক হয়ে রইল, তার বুড়োটে সহানুভূতিতে ছোকরাদের আগ্রহ ছিল না। বাপের বাড়ির গাঁয়ের বাড়ির ডোম থেকে কন্ধ থেকে শুরু করে পবজা পর্যন্ত সকলের কথা একটি একটি করে তার জিজ্ঞাসা না করলেই নয়; খালি মানুষ নয়, গাঁয়ের গাছগুলির কথা, ঘরের পিছনকার বাগিচাখানির কথা সব তার জানা দরকার। কে তার সঙ্গে এত কথা বকবক করবে? এত ভিড়, তবু বেশু কন্ধ চেঁচাচ্ছে—"আর সবাই কোথায় গেল? আর সবাই কোথায় গেল?" বুড়োদের কুশল প্রশ্নের শিলাবৃষ্টির পাশ কাটিয়ে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে সেই অনুপস্থিত 'আর সবাই'কে খুঁজতে বেশু কন্ধের পিছনে পিছনে সুব্‌রি জাগিলি আর্জু লেতা

সবাই চলল। উত্তর দেবার জন্য বসে রইল কেবল যারা ক্লান্ত, আর যাদের এ-গাঁয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই।

যেন কিছুই জানে না এমনিভাবে পুবুলি ঘরের ওদিকে বড় পাথরটার ওপাশে একলা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল—সেই পাথর, যার ও-পাশে তার আর বেশু কন্ধের পরিচয় নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়েছিল। জেনে শুনে নিরালা জায়গা বেছে যে সে ওখানে বসেছিল তা নয়, কেবল মনের খেয়ালে। পা তার আপনা আপনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গাটিতে—যেন সেই জায়গা তার ইতিহাসের সন্ধিস্থল—উত্তাল মন আর অবসন্ন দেহের অবলম্বন পাবার জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে সে বসে ছিল। তার মনের আকাশের চাঁদ আরো উজ্জ্বল, তার জ্যোতির তেজে সৃষ্টি মনের ভিতরেই থেকে যায় বাইরে আসে না।

কতই সে ফুল গেঁথেছে, দিন গুনেছে, মনে মনে সে বেশু কন্ধকে বিয়ে করেই ফেলেছে, মনে মনে ঘর-করনা করেছে, কত কি মনে মনে ভেবে ভেবে অনুভূতির স্রোতে ভেসে চলেছে। ধাংড়ী পথ চেয়ে বসে থাকে। কপালগুণে মনের মানুষ যদি আসে ধাংডী একবার ভাবে, একবার ফেরায় তাকে। একবার নিজের মনের লাগাম টেনে ধরে। তার কিন্তু মনে হচ্ছিল যে বরমালা সে দিয়েই দিয়েছে। সেই বেশু কন্ধ এসে তাকে মাতিয়ে দিয়ে রাঙিয়ে দিয়ে চলে গেল, আর তার খোঁজ-খবর নেই। কি-ই বা হত এত দেখা-শোনা এত খোঁজ-খবরে—একদিন না একদিন যা হবার সব অবশ্যই হবে। এতে তার কোনো দুঃখ ছিল না, মনে মনে সে স্থির জেনেছিল বেশু তার, তার পায়ে বেড়ি নেই।

তাই বেশু তার দেহে, বেশু তার মনে। সে মনে বিরহের বেদনা ছিল না, কারণ সেখানে সন্দেহ ছিল না, ঈর্ষা ছিল না, অভাব ছিল না।

কিন্তু যেমন সে গাঁয়ে পা দিয়েছে শরীরটা কেমন যেন করে উঠল কেন?

পুবুলি একা বসে ছিল। কেউ ডাকতে এল না, খুঁজতে এল না। সময় চলে যেতে লাগল। গাঁয়ের হৈ হল্লা সব শোনা যাচ্ছে। সকলেই হয়তো ঐখানেই গেছে। সেও যাবে। কি বলবে বেশু তাকে? চইত পরবে গাঁ বেড়াতে বেরিয়ে মিটিং থেকে একেবারে মিণিআপায়ু? মানুষে

বেড়াতে বেরিয়ে কি সত্যি এত দূর চলে আসে? হ্যাঁ, পুয়ুর বাপের বাড়ির লোক, তা এমনই কি পুয়ুর চিন্তায় তাদের দিন কাটছে না? পুবুলি ভাবল, না, এ বাজে কথা, ছল-ছুতোর কথা। বেগু এসেছে তারি জন্য, বেগু সুযোগ খুঁজে এসেছে, গন্ধে গন্ধে কুকুরে যেমন করে চলে আসে বহুদূর থেকে অনাহূত।

এমনি ভাবতে ভাবতে মানুষ-পশু নিজেকে উসকে তুলছিল। একদৃষ্টে চাঁদের দিকে চেয়ে বসে থাকার ভাব তার কেটে গিয়েছিল। সে অস্থির হয়ে উঠল, বসে বসে পা নাচাতে লাগল, নখ দিয়ে ছিঁড়তে লাগল ছোট ছোট ডাল পাতা, পুবুলির ইচ্ছে হল এবার ওখানে যায়।

ওদিকে বেগু কন্ধ পুবুলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অচেনা গ্রামের যুবকের দল অচেনা বিদেশিনী বশীকরণের টীকা পরে ছুটে এসেছে। সেই তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবে এ গাঁয়ের মেয়েরা উসখুস করতে করতে নানা ছলে কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে আসছে। জ্যোৎস্নাব আলোয় ক্রমে নিঝুম হয়ে আসা রাত। সারা দিনের চড়াই ভাঙা আর উৎরাই নামাতে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে দেহ এখন চাইছে আরাম।

দেহের দিক থেকে এমনি রাতে একজনেব থেকে আর একজনের মধ্যে বেশী তফাত লাগেনা। কিন্তু বেগু কন্ধেব হল বিপরীত, পুবুলিকেই তার বেশী করে মনে হতে লাগল, তাকেই খুঁজে বেড়াতে লাগল। চারিদিকে খুঁজে তাকে না পেয়ে সেও অন্যমনস্ক হয়ে চলতে লাগল সেই বেরাস্তায়— এই গাঁয়ের ঐ একটি বেরাস্তাই সে চেনে। দূর থেকে কাব পায়ের শব্দ গলা খাঁকরানির শব্দ শুনে পুবুলি চমকে তাকাল। কি লম্বা লোকটা, লম্বা লম্বা পা ফেলে শরীর দুলিয়ে হাঁটছে। পুবুলির মনে কে যেন বলল এ বোধ হয় সেই। ভিতর-মন এ খবর ধরল, উপর মন ধরল না।

নিজের অস্তিত্ব জানাবার জন্য পুবুলি গান ধরল, প্রথমে গুন গুন করে, তারপরে ওদিককার গলা খাঁকরানি জোর হয়ে উঠতে—গলা ছেড়ে। তার দেহের প্রবৃত্তি সেই সরল গানে ঢেলে দিল মহুয়ার নেশা, নিজের উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য। পুবুলি গাইছে, বসুধা তার আঁচল টেনে ধরেছে, জ্যোৎস্নার আলো হয়েছে তার পিছনকার ছবি। বেগু কন্ধের অস্থিরতা চলে গেল। পাল্টা গান গাইবার কথা মনে পড়ল না, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে

এগিয়ে আসতে লাগল। সে যতই কাছে আসছে পুবুলির গানের সুর ততই চড়ছে। পুবুলি দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্রমে বেঙু কন্ধের মুখে কথা ফুটল। এক সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে কতই মধুর উপমা ভিড় করে বেরিয়ে এল তার মন থেকে গলার গভীর আওয়াজে তুফান তুলে—একটার পর একটা শব্দ ঘেঁষাঘেঁষি করে, যার অর্থ তারও বোঝবার সময় নেই। আস্তে আস্তে তারও গলা চড়া হয়ে উঠল—কত রকমের উপমা, কত রকমের রূপক, কত রকমের সম্বোধন। ভালোবেসে সাধ করে ধাংড়ীকে যে সব নাম দেওয়া হয়, যার অর্থ অভিধানে নেই—লেম্বর ডুম্বর জাম্বর নিলস তালস, শোনায় যেন ফলের নামের মতো—জোড়িদানা সংগদানা আন্দুজোড়ু পংগুজোড়ু বন্দরপানি, যার অর্থ কেবল কাঁধে কাঁধ মেলানোর মতো, আপনার জন যে নিজের মধ্যে মিশে আছে, বিরিবাড়া সালামবাড়া বিদাবাড়া, অর্থাৎ সেই মামার মেয়ে যার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে। সবই সরল শব্দ, কিন্তু আংশিক অর্থে বলীয়ান হয়ে ধাংডীর মনের ভিতর ছেয়ে যায় ধূপের ধোঁয়ার মতো। এর পর পুবুলি একটু এগিয়ে গেল, বেঙুও একটু এগিয়ে এল। মাঝখানে বড় বড় পাথরের ব্যবধানে দুজনে গলা মিলিয়ে পুরাতন কন্ধ-গীতি গাইতে লাগল—"দাদো পুইঁ বাড়ারে।" (পূর্বপুরুষদের এই মাটিতে বৃদ্ধি হওয়ার বয়সে আমরা মিলেছি)।

বেঙু পরিষ্কার গলায় ডাকল—"পুবুলি"!

পুবুলি ডাকল—"বেঙু!"

দেহের দিক থেকে ওদের ভালোবাসা এমন দুর্বল ভালোবাসা নয় যে কাছাকাছি হতে না হতেই মূক বধির নির্জীব হয়ে পরস্পরের গায়ে এলিয়ে পড়বে, হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হয়ে আসবে। কন্ধ চাষীর প্রেম বলিষ্ঠ দেহের। দেহের মূল্য দিয়ে তার জীবনের মাপ। স্ত্রী সন্তানের জননী হবে, পুরুষ হবে সন্তানের জনক। দুই জনে মিলে সন্ততি রেখে যাবে,—বাঘ রোগ পর্বত আর পাথরের এই দেশে মাটি চষে মানুষের জয়ধ্বজা ওড়াতে।

॥ বাহান্ন ॥

সকাল হয়ে এসেছে। লেঞ্জু কন্ধ গ্রামে উঠে আসছিল গুড়িআর দিক থেকে—যেখানে উপত্যকায় বাগানে আর ক্ষেতের মাঝে মাঝে কন্ধদের ভিন্ন ভিন্ন খামার। উপর থেকে রোদ নেমে আসছে নীচের নিম্নভূমিতে। পাতলা কুয়াশা হয়েছে, যেমন হয় এই পাহাড়ী দেশে—কি শীতে কি গ্রীষ্মে। গ্রামে ছোকরারা নেই, লেঞ্জু কন্ধের তাতে ভালোই হল, বুড়োদের মধ্যে যারা বয়সে ছোট অর্থাৎ আধ-বুড়োদের চাইতে একটু কম বয়স, তাদের দলে সে। ছোকরারা শিকারে গেছে, সে যায়নি, গাঁয়ের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে সে। মন্ত্রণাদাতা হল ভুর্‌সা মুণ্ডা বারিক। দিনরাত তার সঙ্গেই বসে ফুসুর ফুসুর করে তারই পরিপক্ক উপদেশ নিয়ে ছোকরা-না-থাকা গ্রাম চালাবে সে। এই দুজনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় গ্রামের ছোকরাদের চরিত্রের শিথিলতা, তারা বেআদব হয়ে উঠেছে, মুরুব্বিদের মানতে চায় না, এর ফলে কখন কি অনিষ্ট হয়ে পড়ে কে জানে। অশান্তি, অভাব, সুশৃঙ্খল জীবনের অভাবে ক্রমে বংশলোপ, মুরুব্বিদের অবাধ্য হওয়ার ফলে কখন কোন অধিকারীর কোপদৃষ্টিতে পড়বে, তাইতে গাঁ উজাড় হবে। আজ সকাল সকাল গুড়িআর দিককার কাজ সেরে তেমনি একবার গাঁয়ের বারিকের সঙ্গে একটু আলোচনা হলে ভালো হয়—এই ভেবে লেঞ্জু কন্ধ চলেছে। রোজকার মতো খানিকটা করে মদ খেয়ে ভুর্‌সা মুণ্ডা মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দেবে, মদ পাওয়া যাবে সেখানে। বারিক বার বার বলতে থাকবে, "গাঁ তো যেতে বসেছে, তুই সাঁওতা না হলে আর চলে না।" আর সেখানে আছে সোনাদেঈ, মদ আনতে, পরকে নিয়ে বিহিত আলোচনা করতে ভুর্‌সা মুণ্ডার দক্ষিণ হস্ত।

লেঞ্জু কন্ধ ঢালু পথের মাঝামাঝি উঠে এসেছে এমন সময় তার নজরে পড়ল নীচে বনের ধারে খোলা জায়গায় দুটো কুটরা দৌড়ে পালাল। লেঞ্জু কন্ধ নিজে শিকারী নয়, কিন্তু শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে হই হল্লা করতে তার ভালো লাগে। সে ভাবল, "যাঃ, লোকেরা শিকারের খোঁজে

যায় পাহাড়ের ডগায়, আর শিকার এদিকে নীচে গাঁয়ের তলের বনে আর ক্ষেতে বেড়িয়ে বেড়ায়।"

ছোকরাদের 'মনের বিদ্রোহের কারণ দর্শাবার জন্য যে-সব তর্ক সে সাজিয়ে রেখেছিল তার তূণীরে তার একটি হচ্ছে তাদের নির্বুদ্ধিতা। আজ ভুর্‌সা মুণ্ডার কাছে মদের বাটি নিয়ে বসে যে বক্তৃতা হবে তার বিষয়বস্তু সে ঠিক করে নিল। কিন্তু এ কি? কুটরাদের দিকে তাকাতে তাকাতে লেঞ্জু দেখতে পেল দু'টো ছোকরা ছুকরী—এ ওকে ধাওয়া করে ধরতে যাচ্ছে। এই গাঁয়েরই তারা দু'জন, বুড়ো গঁইয়া কন্ধের মেয়ে পুল্‌মে আর আত্‌রির ছেলে বাত্‌রি। ভালো করে দেখতে পাওয়া যায় এমন জায়গায় সরে গেল লেঞ্জু কন্ধ। পুল্‌মে বাত্‌রির গায়ে একরাশ ফুল ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়ে পালাল। ঐ বাত্‌রি একখানা তামাক পাতা দেখাচ্ছে—পুল্‌মেকে ভোলাবার জন্যই নিশ্চয়।

লেঞ্জু কন্ধের মনে পড়ে গেল তার তামাক পাতা রাখবার জায়গায় তামাক পাতা ফুরিয়ে গেছে। দিউড়ু সাঁওতা লেঞ্জুর ভালো-মন্দের কোনো খোঁজ করে না। ঐ, ঐখানে পুল্‌মে লুকিয়েছে, বাত্‌রি তাকে খুঁজছে। ঐ দেখে ফেলল, বড় আমগাছটার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে এ ওকে ধরবার চেষ্টা করছে। দেখে দেখে লেঞ্জু কন্ধের কেমন রাগ হল। সমাজপতি সে, এসব তার চোখে অসহ্য।

কে তার মতামতের ধার ধারে? লেঞ্জু কন্ধ বিড়বিড় করে তাদের উদ্দেশে গালি পাড়লে। কতবার এই গুড়িআতে ওদের এমনি ফুর্তি তার নজরে পড়েছে। দুজনে কেন বিয়ে করে নেয় না? লেঞ্জু ভাবল—বিয়ে করবার ওদের দরকারই নেই, এরা কেবল প্রজাপতি, দায়িত্ব নিতে চায় না, লেগেই থাকবে এদের একজনের পিছনে আর জন ধাওয়া করা।

গঁইয়া কন্ধ চোখে দেখতে পায় না। আর আত্‌রি, কবে ডুমা হয়ে নিস্তার পেয়ে গেছে সে। ঢালু পথে এক একটি করে ছোকরা ছুকরী নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। লেঞ্জু কন্ধ সেদিকে চেয়ে দেখে, যত মনকে তা থেকে ফিরিয়ে আনতে চায় কেবল সেই বাত্‌রি আর পুল্‌মে। খিল খিল করে হাসি, একটু লুকিয়ে পড়ে, আবার একটু বেরিয়ে পড়ে। ছ্যাঃ! লেঞ্জু কন্ধের আর সহ্য হল না। সকাল বেলাই মেজাজটা তার বিগড়ে গেল।

উপরে উঠে এসে গাছের আড়াল থেকে ঐ দিকে পর পর দু'টো ঢিল ছুঁড়ে মারলে।

তার পরে—বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হল। বাঘ-বাঘিনী জোড়া খেলা করছে, কেউ ব্যাঘাত করলে তারা নাকি মারতে ছুটে আসে। এই ছোঁড়াগুলো তো তেমনি অবাধ্য, কথা শোনে না। আপন মান বাঁচিয়ে লেঞ্জু কন্ধ বারিকের ঘরের সামনে এসে পৌঁছাল।

সোনাদেঈ!

লেঞ্জু কন্ধের গায়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তেতে-ওঠা মুখে একবার চারি-দিকে চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। কত দিন এমনি ধরনা দিয়ে থেকে কাটবে তার? বারিক জাতিতে ডোম, সোনাদেঈ ডোম। কন্ধের বিচারে এরা অ-জাত, লোকে বলে ডোমেরা চোরের জাত, ছলনায় ধুরন্ধর। কিন্তু লেঞ্জু কন্ধ সোনাদেঈকে দেখে আর ভাবে যে মানুষ জাতি একই, মানুষ জাতি সুন্দর, ছোকরাদের কাছ থেকে ধার করা বিচার দিয়ে সে মনকে পুষ্ট করে।

সোনাদেঈ কোথায় যেন যাচ্ছে। লেঞ্জু ডাকল "দাঁড়া, শুনে যা।"

বেড়ার আড়ালে দু'জনে দাঁড়িয়ে ছিল। সব সময় অমনি মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে সোনাদেঈ। সব দিন অমনি সে চুপ করেই থাকে, কথা বললে তবে কথা বলাই তার স্বভাব।

"সোনাদেঈ—"

তেমনি মুখ না তুলে দাঁত চেপে সে জবাব দিল, "উঁ"।

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ। সোনাদেঈকে এমনি একলা অসহায় অবস্থায় দেখলে লেঞ্জু কন্ধের মাথা গুলিয়ে যায়, কি বলবে ভেবে পায় না।

"হ্যাঁ সোনাদেঈ—"

"উঁ"

"বালমুণ্ডা ঘরে আছে তো?"

বরাবরের মতো করুণ মুখ করে সোনাদেঈ মাথা নাড়ল—বালমুণ্ডা নেই, বালমুণ্ডা থাকে না, বেরিয়ে যায় কোন দূর গ্রামে, চুরি করতে নয় তো মদ খেয়ে পড়ে থাকতে, তার জীবনের সুখ এইটুকুই, সবাই জানে।

"তুরুঞ্জা?"

"নেই।"

দিনটা ভালো। কি সুন্দর লাল সূর্য উঠেছে ঐ ওখানে। লেঞ্জু কন্ধের হঠাৎ বড় ভালো লাগল। "বারিক আছে?"

"হুঁ"

"আচ্ছা আয়, যা তো বারিককে গিয়ে বল্ আমি এসেছি।"

সোনাদেঈ একটু হাসল। আগে আগে ঘরে গিয়ে ঢুকল। পিছন পিছন লেঞ্জু আসতে ঘরের দরজা দিয়ে বারিক বেরিয়ে এল—রুখু চুল ফর-ফর করে উড়ছে, নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, গায়ে মাথায় ছাই। বারিক দু হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে সম্ভাষণ জানাল—"জুহার্ (প্রণাম) জুহার্, সাঁওতা। আমার সাঁওতা এসেছে, তুই আমার রাজা।"

বারিক সকালে উঠেই মদ খেয়ে চুর হয়েছিল। অনর্গল বকতে লাগল। পিছনে দাঁড়িয়ে সোনাদেঈ হাসছিল। শান্ত হয়ে বসে খোশগল্প করার মতো অবস্থা বারিকের ছিল না। বলল, "দেখ্ সাঁওতা, তুইই বিচার কর্। বাপ বুড়ো হয়ে গেলে এমনি কবে তাকে অমান্য করবে এই কি ছেলেদের কাজ? আমার উপর ঘর সামলাবার ভার দিয়ে যে যার সরে পড়েছে সব। মদ এক ফোঁটা রেখে যায়নি, খালি জল। জল খেয়ে খেয়ে তো আমি মরেই যাব, ওরা ধন-দৌলত বোঝাই করে ঘরে ফিরে কোন আমায় রাজা করে দেবে? স্রেফ জল, শুধু জল। আচ্ছা, আমাব রাজা, তুই একটু থাক্, আমি একটু জল খেয়ে আসি।—এই, তুই বসে থাক্, আমার রাজার সঙ্গে কথা বল্, আমি এই আসছি!"

লেঞ্জু কন্ধ বোকার মতো বসে রইল, বারিক চলে গেল। অন্য ঘরে গিয়ে মদ খেল, চেঁচিয়ে বকতে বকতে ঘরের পিছনের দিকে গেল। তার ফিরে আসার আর কোনো লক্ষণ নেই। তবু লেঞ্জু কন্ধ বসে আছে।

সোনাদেঈ রাস্তাব দিকে গেল, কাপড় শুখাতে দিয়ে এল। বাটিতে করে এক বাটি মদ এনে লেঞ্জু কন্ধের হাতে দিল। লেঞ্জু কন্ধ খেয়ে বলল, "আরো"—সোনাদেঈ কিছুক্ষণ পরে আরো মদ এনে লেঞ্জুকে দিল। মদ খেতে খেতে লেঞ্জু সোনাদেঈয়ের পিঠে হাত বুলোতে লাগল। সোনাদেঈ তেমনি সেখানে বসে রইল। সকালের সেই ছোকরা ছুকরীর জোড়া এ ওর পিছনে ছোটার দৃশ্যের দুঃসাহস স্মরণ করে লেঞ্জু কন্ধ আর

একটু বাড়াবাড়ি করলে। সোনাদেঈ মিনতির ভঙ্গীতে বলল, "ছি ছি, এমন কোরো না, এমন করে মাতামাতি করলে লোকে কি বলবে? ঐ বারিক আসছে।"

ছেলেদের গাল দিতে দিতে বারিক বুড়ো এসে উপস্থিত হল, বলল, "ছি ছি, কেবল জল, স্রেফ জল।"

লেঙ্গু কন্ধ আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। তার সারা শরীর কাঁপছিল।

এমনি করেই বলে সোনাদেঈ! নরম সুরে আপত্তি করে। ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে কাছটি দিয়ে দূরে সবে যায় আত্মরক্ষা করে। লেঙ্গু কন্ধ বুঝতে পারে যে সোনাদেঈয়েই বিশেষ আপত্তি নেই। মনে মনে সবই বোঝে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সে তার ভালোবাসাতেও কোনো রকমের স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। ও চায় এমনি ভাবেই সম্মানিত সমাজপতি হয়েই আপন বয়সের আসনে বসে থাকবে, কোনো দুর্নাম রটবে না, তাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না, অথচ মনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে। শুধুই ভোগ করতে চায় সে, ত্যাগের দিকে যায় না। দিনের পর দিন বিকৃত চিন্তায় পুড়ে পুড়ে তার মনের অধঃপতন ঘটেছে। খোলামেলা মন আর তার নেই। সেখানে এখন ভয়, সন্দেহ, সর্বদা আশঙ্কা। একটা কোনো ছল পেলে সে নিশ্চিন্ত হয়. কিন্তু যখন সে সোনাদেঈকে হাতের নাগালের মধ্যে পায়, ঠিক যখন ঈপ্সিত সাফল্যের জন্য তার প্রত্যেক রক্তকণা উদগ্রীব হয়ে ওঠে, তখনই কিছু একটা ঘটে, সময়ের অনুপযোগী এক গাম্ভীর্য এসে পড়ে তার, সে নিরস্ত হয়। এই নিরস্ত হওয়াতেই তার তফাত ছোকরাদের সঙ্গে, বাল্‌রি দিউড়ু এদের সঙ্গে—তার বয়সের চাপে, অবস্থার চাপে সে নেমে যায় নীচে ছোকরাদের স্তরে, উঠতে পারে না বলে তাদের প্রতি তার ঈর্ষা হয়, ঈর্ষা থেকে হয় রাগ, সেই রাগের উপরেই রয়েছে তার সমাজপতির আসন, কিন্তু এইটুকুতে সে শান্তি পায়না।

কখনো কখনো ভাবে এ আশা সে ছেড়েই দেবে। মনে মনে গুমরে গুমরে নিজের দেহের প্রতি তার বিরক্তি আসে, এ জন্ম গেলে তবে—। এত হাঁই পাঁই করে এত ছটফট করে কি লাভ আছে? জীবনের অধিকাংশ তো কেটেই গেছে, বাকীটুকু স্বপ্নের মতো কেটে যাবে। তার পরে আর তাকে ছলনার শরণ নিতে হবে না, তার পরে হয় তো সুখের মুখ দেখবে

সে। কিন্তু দেহটা তার আয়ত্তাধীন নয়। একটু মদ পেটে পড়লে, ক্রমাগত মাংস আর ডিম্ জুটলে, নয় তো নিরালা পথে অন্যের সুখ দেখলে কিংবা এই সোনাদেঈয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়লে লেঞ্জু কন্ধ অনুভব করে দেহ তার ফুলে ফুলে উঠছে, দেহের কত অজানা প্রক্রিয়া তার মনকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে, কন্ধ দেশের প্রাচীন দর্শন অথবা ত্যাগের পথ তখন আর মনকে প্রবোধ দিতে পারে না।

নিজের মনের বিকারের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে খেয়ে ও চায় পুরাতন সব সঙ্কোচের ডোর কেটে বেরিয়ে যেতে। দিউডুর থেকে সে পৃথক্ হয়ে যাবে, ঘর দুয়ার নতুন করে হবে—তার নিজের। আর এই গাঁ, এই গাঁয়ে রাজত্ব করার কপাল যদি তার নাই থাকে তবে এখানে তার কোনো স্থান নেই, ছেলে ছোকরাদের হাতের তেলোয় এই গাঁয়ে পড়ে থাকতে তার মন চায় না।

কে আছে তার? কে আছে? নিজের পড়তি বয়সের বিফলতা আনে কাঁদুনে ভাবনা, নিজের উপর দয়া হয়, নিজেকে যেন পর ভেবে নিয়ে সান্ত্বনা দেয়। বনের পশু যেমন ঘা খেয়ে এসে কোথাও বসে নিজের জিভ দিয়ে নিজের ঘা চাটে, ঠিক তেমনি।

লেঞ্জু কন্ধ এক জায়গায় ঠায় বসে রইল।

॥ তিপ্পান্ন ॥

রাতটা তার কেমন করে কেটে গেল পুবুলি জানে না। একটু কেবল চোখ লেগে আসে, তার পরেই পাশ ফেরা আর ঘুম ভেঙে যাওয়া। আবার চোখ বোজা আবার উঠে পড়া। তার ভালোবাসা যেন একটা বড় ফোঁড়ার মতো, টন টন করছো, যেন এবার ফাটবে। মানুষের জীবনই বুঝি এই, তার ভালোবাসাটাও যেন একটা রোগ, একটা যন্ত্রণা, আর তার সন্তানের জন্ম দেওয়াও—যা সেই ভালোবাসারই একটা ধাপ। কত বার পুবুলি উঠে উঠে বাইরে গেল আর কত বার বারান্দায় ফিরে এসে শুল। ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়ল, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল প্রকৃতি। উপর-মনের সব অস্থিরতা সব সংশয়ের উপরে গহন-মনের স্থির উদ্দেশ্য প্রতিজ্ঞা হয়ে

একাসনে বসে ছিল। সেই ঘুমন্ত দেহে কোনো অস্থিরতা ছিল না, ছিল না কোথাও তিলমাত্র বিচ্ছন্দতার করকরে বালি। পুবুলি ভেসে চলছিল।

সকালে পুয়ু উঠল, ভোরের আলো হতেই হাকিনার কলরব শুরু হয়। পুয়ু তার দিকে চেয়ে রইল। তার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি, কিন্তু তার মনের অশান্তির জন্য তার শরীরটা ভালো নেই, চোখ করকর করছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে।

ছেলে কোলে করে সে পুবুলির কাছে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অকারণে। গোল গোল হাত পা, বলিষ্ঠ বক্ষ, আর সেই মুখ—পুবুলির বয়সের। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য তেজ চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে দুর্বল ব্যক্তিত্বকে। পুয়ু গেল। আরও কত লোক এল গেল। মিটিং গাঁয়ের লোকেরা গাঁয়ের অন্য দিকে ছিল। গাঁয়ের কোলাহল বাড়তে পুবুলি জাগল। সকালেব ঘুম ভাঙায় আবার এল 'হাঁ' আর 'না'র বিচার-বিতর্ক। এই পুরাতন মাটি, এই পুরাতন জন্মস্থলী তার প্রতি মুহূর্তের সহচর। এই মাটি এই বাতাসে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড কত না স্বপ্ন এসে মনের কোটরে বাসা বেঁধেছে, নীড় তৈরি করেছে। একটু কিছু হলে এক সঙ্গে সারা জীবনের সমস্ত স্মৃতি ডানা ঝটপট করে উঠে তার সমগ্র অস্তিত্বকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে দেয়। যেমন ঘরের পিছনের ঝাঁকডা গাছে রাজ্যের ছোট ছোট পাখী রাত্রির অন্ধকারে ডালে পাতায় লেপটে থাকে, একটু ছুঁলেই গোটা গাছে ঝরঝর শব্দ, একসঙ্গে সব পাখী ধড়ফড করে ওঠে, শোরগোল পডে যায়, তেমনি করেই কাঁপছিল পুবুলি, তার চেতনার যত টুকরো টুকরো স্মৃতি কাঁপছিল তার গহন-মনের স্থির নিষ্পত্তির সূক্ষ্ম দ্যোতনায়।

ঐ ওখানে ঐ শাল গাছটার নীচে সরবু সাঁওতা তার বিশাল দেহটা ফেলে দিয়ে উড়ে চলে গেছে—এ ঘরের সব বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে আলগা করে দিয়ে চিরদিনের মত 'বাবা' বলে ডাকা শেষ করে দিয়ে। ঐখানে মা মরেছিল। মায়ের কথা মনে করে কাঁদতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মায়ের চেহারা মনে পড়ে না। মা ছিল সে,—জন্ম দিয়েছিল। এই মাটিতেই তারও সমাপ্তি হয়ে গেছে। এই পথ দিয়ে পুয়ু এসেছিল। ভাবতে বসলে স্মৃতির সিঁড়ি ধাপে ধাপে বেড়ে চলতে থাকে, প্রতিটি স্মৃতি যেন বলে, "আমি আছি—আমি আছি, আমায় একটু—আমায় একটু"। এই সকালে

পাড়ার সঙ্গী-সাথীর মতো কাছটিতে এসে বসল দস্রু কুকুর, পুবুলির মুখের দিকে মুখ তুলে জুল-জুল করে চেয়ে আছে—"আমিও স্মৃতি—তোমার কাছে আমারও কি স্থান নেই ?—দুটো মিষ্টি কথা—একটু হাত বোলানো—আমি দস্রু—"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পুবুলি উঠে গেল।

আজ !···আজ তার জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের শুরু। স্নানের ঘাটে পুয়ুর সঙ্গে দেখা। "কখন চান করতে চলে এলি হাঁ লো, আমি তো মোটে দেখতে পাইনি ?"

পুয়ু হাসল। শেষ ফোঁটাটুকু খেয়ে ফেলার আগে মানুষ সেটুকুর দিকে যেমন করে তাকায় পুবুলি তেমনি করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভালোবাসার জন পুয়ু, তার বন্ধু, তার মা, তার ভাজ—সব সে, পুরুষমানুষদের সঙ্গে কতই বা দেখা।

"তোর মতো নিডবিড়ে নাকি আমি ? তুই সে না ঘুম থেকে উঠবি না, আমার কি আর সে বয়স আছে ?" সকাল বেলাতেই ননদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা লাগাবার জন্য তার জলে-ভেজা মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল নানা ভঙ্গীতে। বলল, "এত বড় চইত পরব যাচ্ছে আর তুই একবার বন্দিকার গেলি না, কি আর করলি ? কেবল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেই পেট ভরবে ?"

পুবুলি ভাবল তেমনি করে ঠাট্টার সুরে তার জবাব দেয়, কিন্তু মুখে হাসি সে আনতে পারলে না, গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, "আজ আমরা যাচ্ছি, তুই যাবি ?"

"অ্যাঁ—বন্দিকার ?"

"আমরা আজ বনে ঘুরতে শিকার করে বেড়াতে বেরুচ্ছি লো। ওরা গেছে তো গেছেই, ওদের অপেক্ষায় বসে থাকলে চইত পরব কি আবার ফিরে আসবে ? এই দেখ্ না 'ভাই'কে (দাদাকে), ভারী স্বার্থপর। শিগগির করে আসবে বলে ইচ্ছে করে করে দেরি করছে—হিংসুটে কোথাকার—"

"দরকার কি, বোন ? সকলেই নিজের নিজের ধান্দায় আছো, নিজের মন যা চায় তাই কর, যে দিকে মন চায় যা, ঘুরে ফিরে আয়, ফুর্তি করে নে,

কারও জন্যে অপেক্ষা করার কি দরকার ?" এই বলে পুয়ু চুপ করে রইল। পুবুলির মনে হল এই কথার মধ্যে পুয়ু কি যেন চেপে গেল। কেন ? পুবুলির মনে হল পুয়ুর মন ভালো নেই। পুয়ু স্নান করে উঠে আসতে পুবুলি তার গলা জড়িয়ে ধরল, চোখ ছলছল করে বলল, "আমি যাচ্ছি, মনে কিছু করবি না তো পুয়ু ?" পুয়ু হাসল। পুবুলি আর সামলাতে পারল না, উঠে পালিয়ে গেল, তার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

কিছুক্ষণ পরে গাঁয়ের পথে লেঞ্জু কন্ধের সঙ্গে দেখা হল। তার কাছেও পুবুলি বেড়াতে যাবার অনুমতি চাইলে। এখানেও তার মুখ থমথমে হয়ে গেল। কাকা তার নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত, ভাইঝির সঙ্গে বেশী কথা বলবার সময় তার নেই।

তারপর জামিবি কন্ধের সঙ্গে দেখা। বুড়ো আশীর্বাদ করলে—"মা, ভালো শিকার জুটুক তোর, আপদ বিপদ না ঘটুক, মনের আনন্দে দিন কাটুক।"

সাজ সজ্জা করে সবাই বার হল। শিকারীর সাজে মিটিং গাঁয়ের ধাংড়ারা তাদের সঙ্গে মিনিআপায়ুর বুড়ো কয়জন, আর বাদবাকী সব ধাংড়ী। বাজনার শব্দে গ্রাম কাঁপতে লাগল। পুবুলি তাড়াতাড়ি ঘরে এসে হাকিনাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল, পুয়ুকে বলল, "আমি যাচ্ছি।"

গলাটা কাঁপছিল তার। ননদ-ভাজ এ ওর মুখের দিকে চাইল। পুবুলির মুখে কথা নেই, চোখে চাউনিতে অনেক কথা। পুয়ু ভাবছিল কবে যেন সে এমনি দেখেছিল, কোথায় দেখেছিল ? কি বলতে চাইছে পুবুলির চোখদুটি ? বার বার সে বলছে "আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি," পা যেন উঠছে না। গ্রামের খোলা জায়গা থেকে বড় বাজনা আর শিঙা ডাক দিল। বাঁশিতে সুর ভেঁজে কারা বাজাতে লাগল, "ওআমুডে ওআমুডে (আয় আয়)"। বিষণ্ণ চোখে উজ্জ্বল সংকল্পের তেজ ফুটিয়ে তুলে পুবুলি শেষবার আচমকা বলল, "আমি যাচ্ছি পুয়ু" আর অমনি বেরিয়ে পড়ল।

পথে নিজের ঘরের বারান্দায় বসে ছিল পাণ্ডু ডিসারী। সেই রকম স্থির হয়ে সে বসে ছিল যেমন সে থাকে। এত হই চই, এত লোকের মিছিল— কিন্তু সে-সব কিছুরই মধ্যে যেন সে নেই—দেখে দেখে চোখের রঙ কালো

থেকে লালচে, লালচে থেকে ক্রমে নীল হয়ে আসছে, কিন্তু তবু সকলের জন্যই তার সমান আশীর্বাদ, নিজে তার ভাগী না হলেও। সেখানেও পুবুলি থামল। বলল, "আমি যাচ্ছি।"

"যাচ্ছিস তুই সত্যি? তা যা মা, যোগ তো ভালোই আছে।"

পুবুলি চমকে উঠল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। না, সেই তেমনিই তার মুখ, সেই শান্ত প্রসন্ন হাসি, তার আড়ালে কি গণনা কি বিচার আছে ধরা যায় না। পুবুলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাণ্ডু-জানী নিজেই তাকে তাড়া দিয়ে বলল, "যা, যোগ চলে যাবে। ভালো যোগ আছে, এই বেলা যা। অমন থমকে রইলি কেন মা? ছেলে মানুষ, এখনই এত ভাবনা-চিন্তা কেন? যা, আনন্দ কর, খুশিমতো ঘুরে বেড়া।"

মিছিল বেরিয়ে গেল।

ছেলে কোলে নিয়ে পুয়ু দাঁড়িয়ে ছিল। পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকাতে পুবুলি পথের বাঁক ঘুরে গেল। লেঞ্জু কন্ধ নির্বোধের মতো চুরুট টানছিল। পাণ্ডু কন্ধ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল। আপন মনেই ভাবতে লাগল—"ঠিক ঠিক, রেদাসি যোগে দেখাশোনা, মেলামেশা। রেতি যোগে বিয়ের মরশুম। এটা তো রেতি যোগই পড়েছে, এতে কি আর ভুল হতে পারে? ধন্য ধন্য তোমরা আকাশের তারা, কি নাচই নাচাও মাটির মানুষকে! আজ রেতি যোগে মানুষকে করেছ আশ্বিন মাসের কুকুর!" বুড়ো নিজের খেয়ালে বকতে থাকে। ঘরের থেকে ওর বুড়ী বেরুলো। পাণ্ডু কন্ধ বলল, "এনেছিস?"

বুড়ী হাঁড়ি থেকে একটু মদ ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিল।

পাণ্ডু বলল, "দেখেছিস্, সরবু সাঁওতার মেয়ে গেল?"

বুড়ী বলল, "কোথায় গেল?"

"গেল—" বলে পাণ্ডু কন্ধ হাসল। বলল, "কত লোক তো যায় আসে এই পথে রেতি যোগ পড়ে যখন, এ আর নতুন কথা কি! তবে কিনা আমাদের সাঁওতার মেয়ে গেল—একবার দেখতিস তুই।"

॥ চুয়ান্ন ॥

গাঁয়ের পাহাড়ের ঢালু গায়ে, নীচে, তার নীচে—

বড় বড় খোলা জায়গায় যেখানে বন কেটে পুড়িয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে সেখানে কাত-করা থালার মতো মাড়ুয়ার ক্ষেত, অলসির ক্ষেত—গাঁয়ের ভাতের থালা। এই খোলা জায়গায় মানুষের প্রতিনিধির মতো দাঁড়িয়ে অসংখ্য মরা গাছের ঠুঁটো গোড়া, কুড়ুলের কোপ পড়বার আগে কবে এরা ছিল গাছ। এখন কেবল কালো কালো গুঁড়ি আর পাথরের চাঙ্গড়—এখানে ওখানে।

সেই ঢালু পথে তর তর করে সবাই নেমে পড়ল। গোটা দিন এখনো সামনে পড়ে আছে সত্যি, কিন্তু শিকারের তো ঠিক ঠিকানা নেই। ছোট ছোট গাছ শেষ হল, এখন জায়গায় জায়গায় বড় বড় গাছের জঙ্গল। জট পাকানো লতার রাশি শুকিয়ে গেছে, পাতলা হয়েছে। সবার নীচে এখানে সেখানে টুকরো টুকরো ধানের ক্ষেত, তাতে ধান নেই। সেখানে দাঁড়ালে শিকারের জায়গা কাছেই পড়ে। সেইখানে ঝোরার আসেপাশে হরিণ আর সম্বরের চরাভুঁই, পর্বতের গুহায় বাঘের বাসা। এ সময়টাতে মানুষের দাপট, আবার যখন গরমের দিন কোনো রকমে শেষ হয়ে যাবে তখন বাঘের ডাক শুরু হবে, আর মানুষ আসবে না সেখানে।

নীচ থেকে উপরের দিকে চেয়ে পুবুলি বসে রইল। ঐ উপরে কোন বাঁকে তাদের গ্রাম, আছে বলে কেউ টের পাবে না। পাহাড়ের বেড আর তার ঢালুতে উপরের কতখানি কোথায় লুকিয়ে থেকে যায়। নীচ থেকে দেখে মানুষ যেটাকে ভাবে পাহাড়ের চুড়ো সেটা তার নীচের একটা ধাপ মাত্র। না, গাঁ দেখা যাচ্ছে না। ঐ কত উঁচুতে তার বাপ-দাদাদের মাটি, সেইখানে তার ছেলেবেলা, এ-পর্যন্ত তার অস্তিত্বের চিহ্ন, আর সামনে—শিকার, ফুর্তি, মানুষের জীবনের নতুন অধ্যায়, নতুন সব।

সবাই মনের আনন্দে চলেছে। পুবুলি তার দলের মেয়েদের সঙ্গে। কত এগিয়ে ঝাড় জঙ্গল দেখে দেখে বন্দুক উঁচিয়ে চলেছে মিটিং গাঁয়ের ধাংড়ারা।

এবার বন, কেবল কুঞ্জ আর পর্বত-কন্দর, চারিদিকে অন্ধকারের বিস্ময়। সেখানে পাহাড়ের ফাটলে উপর থেকে নীচে যেন গাছের শিকড়ের নানা শাখা-প্রশাখার মতো চলে গেছে ঝরনা নদী। তারই ধার ধার দিয়ে উপরে উঠবার পথ। বনের ভিতর ঢুকে ধাংড়ারা আগে আগে যেতে যেতে গান ধরল। পিছন থেকে ধাংড়ীরা ধরল তার ধুয়ো। সামনে থেকে কে একজন সবাইকে চুপ করিয়ে দিল, হাতের ইশারায় বলল সবাইকে থেমে যেতে। সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল একটা চড়াইয়ের মুখে। সামনে চড়াই বেয়ে বেগু কন্ধ বন্দুক কাঁধে উপরে উঠে যাচ্ছে। পথের ধার দেয়ালের মতো খাড়া, সেখানে আলগা পাথর আর ঠুঁটো গাছের গুঁড়ি। শব্দ না করে পা ঠিক রেখে সেই পথ দিয়ে উঠতে শরীরের সব মাংসপেশী তার ফুলে ফুলে উঠেছে। কি চওড়া তার ছাতি, শরীরের গড়ন যেন কুঁদে তৈরি—কালো কুচকুচে লোহার ভীম যেন। বন্দুক উঁচিয়ে বেগু কন্ধ চড়াইয়ের মাথার ও পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। নীচ দিয়ে দিয়ে বাঁক ঘুরে চলল তার বন্ধু সুব্রি কন্ধ।

কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছে এত লোক? কি নীরবতা! শিকারী জাতির শিক্ষা, কেউ নড়বে চড়বে না, কেউ কাশবে না।

চুপচাপ।

এই অস্বাভাবিক নীরবতার মধ্যে পুবুলি একটা গাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতীক্ষার বিস্ময় তার বুকে, নিজের বুকের দুরমুশ পেটার শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছিল। বেলা যায়, রোদ মাথার উপরে, গহন বনস্থলীর ভিতর কোথাও খুট করে শব্দটিও হয় না। পুবুলির মনের মধ্যে আশঙ্কা দুলতে লাগল। এত বড় জোয়ান, হাতে হাতিয়ারও আছে বেগু কন্ধের সত্যি, কিন্তু যদি সে না ফেরে? একটু পরে যদি শুনতে পাওয়া যায় শুধু তার আর্ত চীৎকার? বন যতই আপনার হোক, বনকে কখনো বিশ্বাস নেই তো! চড়াইয়ের ওপাশে বাঘের আড্ডা। মানুষের মতো বাঘও শিকারের সন্ধানে ফেরে, মানুষ কোন ছার তার কাছে! ছোট একটি লাফ, একটি ক্ষীণ চীৎকার, একটি থাবড়া, তারপর টিকটিকির মুখে বর্ষাতী পোকার মতো বাঘের মুখে মানুষ—নিত্য দিনের চোখে-পড়া দৃশ্য।

প্রতীক্ষায় থেকে থেকে কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। পুবুলি

অপেক্ষা করে আছে বেণু কঙ্কের চীৎকার শুনবে। হু হু করে বাতাস উঠল। জঙ্গলের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। কোত্থেকে এল চাঁপাফুলের সুগন্ধ, বনমল্লিকার সুবাস। কুশ্রী প্রতীক্ষার মোহ কাটল, নিজের ভিতর ছেড়ে পুবুলি বাইরে তাকাল। চৈত্রের রোদ, বনের ভিতরটা ঝিলমিল করছে, সঙ্গের লোকেরা সবাই চুপচাপ বসে। উপরে চড়াইয়ে অর্ধেক পথ পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় গ্রামের বুড়োরা বসে আছে। কোথাও কিছু নেই।

হঠাৎ বজ্র গর্জনে বন্দুকের আওয়াজ হল। চমকে উঠে পুবুলি পড়ে গেল। কলরব করে সবাই সামনের দিকে ছুটল। দূর থেকে কার উল্লাসের সুর ভেসে এল—"শিকার পড়েছে—দৌড়ে এসো—দৌড়ে এসো—"

উঠে পড়ে যেতে সে কতখানি পথ। খদের ভিতর এক জায়গায় যেখানে ঢিবি আর ঢালু কাটাকাটি করেছে সেইখানে নেড়া জায়গায় গিলি ঝোপের কাছে বড় শিঙওয়ালা একটা সম্বর পড়ে আছে, তার পিঠের দিকে লম্বা বন্দুক-হাতে বেণু দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাসছে।

সবাই এসে ঘিরল। আনন্দে ধাংড়ীরা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। ধাংড়ারা বেণুকে কাঁধে তুলে নিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। সকলের মুখেই প্রশংসা। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে বাজ পাখীর মতো চোখে শিকার ঠাহর করে ওড়িআ নলিতে তাকে ফেলতে পারা কম বাহাদুরি নয়। অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বেণু কঙ্ক ঘেমে উঠল। "দেখতে পেলি কেমন করে?" "কেমন করে মারলি?" "আর কি কি মেরেছিস?" "ভালো তাক বটে জোয়ানের।" বেণু কেবল পুবুলির মুখের দিকে তাকাল, ছেলেমানুষের মতো একটি হাসি তার মুখে। যেন বলছে, "কথায় কি আছে, কাজে দেখলি তো?" পুবুলি চেয়ে চেয়ে হাসছে, কিছু বলছে না সে, তার মনের কথাটা এই—"লোকের জানায় কি আছে? আমি তো সব জানি। তাই তো পুরোপুরি আমি তোমার—"

আলোচনা শুরু হল—শিকার আরো হবে, না এতেই শেষ। দুই দলের দুই মত। বুড়োরা উপদেশ দিলে, "যাই হোক, একটা শিকার তো পড়েছে। এখন চল ফিরে যাই, আর কেন হয়রানি?" ছোকরারা পর-গাঁয়ের, তাদের মতামত নেই। মেয়েদের সামনে ক্লান্তি বা কাতরতা দেখাতে তারা আসেনি। কিন্তু তারা দু দিনের শিকারী নয় যে জন্তু মারার পাগলামিতে

যেতে একটার পর একটা মারতেই থাকবে। এই মতের বিপরীত মত যত মেয়েদের। শিকার বন্ধ হবে মনে হতেই নেচে চেঁচিয়ে তারা জেদ ধরেছে "এইটুকুতে কি হবে? এ তো কেবল শুরু। জঙ্গল ঘেরাও হয়নি, জন্তু খেদানো হয়নি, ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই শিকার শেষ!" হরিণীর পুরুষ, সম্বরীর পুরুষের নির্দোষ প্রাণের উপর কালবাক্য হেনে হেনে মেয়েরা এক ধুয়ো ধরে রইল—"আরো—আরো—!" শেষটা সকলেই রাজি হয়ে গেল, ঠিক হল একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে এখন একটু বিশ্রাম করা হবে, তার পর খেয়ে দেয়ে আবার শিকার, তার পর ঘরে ফেরা।

অল্প দূরেই ঝরনা—তার খাড়া পাড়ের নীচের ছায়ায় সমান জমি, তিন দিকে জঙ্গল। কাঁধের বোঝা নামানো হল, লাউয়ের খোল থেকে মাড়ুয়া, কান্দুল (বড় অড়হর), বনের কন্দ বেরুল। কন্দদের রান্নায় বেশী সময় লাগেনা। জঙ্গল থেকে কাঠ এল, পাতা এল। কাছাকাছি রান্না বসে গেল সকলের, তার আগে সঙ্গে আনা বাসী খাবারের জলযোগ। পাথরের উপরে গা এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে পাকানো তামাক পাতার চুরুট। এমনি এই বনের মানুষদের বিশ্রাম। সম্বরটা একদিকে পড়ে আছে। যতক্ষণ শিকার মারা না পড়ে ততক্ষণ সকলের চোখ তার উপরে, মারা হয়ে গেলে শিকার খেলা ফুরুল, তখন সেটা কেবল খাদ্য, কেউ আর দু'বার ভাবে না তার কথা।

রান্না বান্না সারা হয়েছে। চড়চড়ে রোদ। রোদটা একটু পড়লে আবার শিকার করা হবে। কাছেই ঝোপ-জঙ্গলে ভরা একটি টিপি, তিন দিকে ঝরনা ঘেরাও করে ঘাঁটি আগলে বসে থাকলে হরিণ পাওয়ার সম্ভাবনা। বুড়োরা ঝিমোতে লাগল। যুবক-যুবতীরা কাছাকাছি বসে গল্প করতে লাগল—কারো কাউকে ভয় নেই, নিজের রুচির বিরুদ্ধে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোনো কিছুতে বাধ্য নয়। এমনি গল্প-সল্পের মধ্যে ভবিষ্যতের বড় জীবন চোখের সামনে রেখে পরস্পরকে বুঝে নেবার, কষে নেবার চেষ্টা। উপস্থিত সময়ের মোহে পড়ে একজন আর একজনকে কত আদর-আপ্যায়ন করে, কত ফল ফুল উপহার দেয়। আদরের সুরে মিঠে চাউনির সুখে সময় কাটাতে দু'জনে রাজি।

এমনি পুটুর-পাটুর ফিসির-ফাসুরের মধ্যে বেশু কন্ধ প্রস্তাব করল, "চল ঝোরায় মাছ ধরি গিয়ে।"

অনেকে সাগ্রহে উঠে পড়ল। মাছ ধরায় কেবল শিকারের মজাই নেই, সকলে মিলে নদীর কোনো একটুখানি অংশে পাথরের বাঁধ দিয়ে জল ছেঁচে ফেলবে, তার পর হাত দিয়ে দিয়ে মাছ ধরা। কত এ-ওর গায়ে জল ছেটানো, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির সুবিধে এতে। মাছ মারা কেবল দুই দলের মিলে মিশে এক রকম খেলা। এ-ওর দিকে চেয়ে হাসাহাসি করতে করতে অনেকে জলে নেমে পড়ল। কাছের ঘাটে বাঁধ বেঁধে জল ছেঁচে ফেলা হল, এক গাদা কাজ।

সবাই যখন একসঙ্গে লেগে গেছে, উপরে গাছের তলায় বুড়োরা ঘুমে ঢুলছে, তখন বেশু কন্ধ পুবুলির কাছে এল। পুবুলি মাথা নিচু করল। পুবুলির কানের কাছে আগুন ছড়িয়ে দিয়ে, তার গায়ে বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়ে বেশু কন্ধ বলল, "চল, আমরা ঐ ভিতরের দিকে যাই. ওখানে ঝরনাটা সরু হয়ে গেছে, আমার মনে হচ্ছে ওখানে তাড়াতাড়ি মাছ পাওয়া যাবে।"

নিজেদের এই চালাকিতে দু'জনে হাসাহাসি করল। বেশু চেঁচিয়ে বললে, "থাম, ওখানটা অন্ধকার, বন্দুকটা নিয়ে যাওয়া ভালো।" বেশু তার বন্দুক আর সামান্য বোঝা তুলে নিলে। ওদিকে সবাই জল ছেঁচ্‌ছে। মিণিআপায়ুর পুবুলি আর মিটিং গাঁয়ের বেশু কন্ধ আগে পিছে হয়ে ঢুকল অন্ধকার ঝোরার ভিতরে।

দুই দিকে দুই দেয়াল দাঁড়িয়ে। একটু ছেড়ে, তারই ফাঁকের ভিতর দিয়ে ঝোরা বয়ে চলেছে। পাহাড়ী নদী, মাঝখানে সরু একটি ধারা, দুই পাশে জল-সরসরে ভিজে সরু বালি। জল পেয়ে এদিকে জঙ্গল বেড়ে উঠেছে। উপরে এ পারের বন ও পারের বন মিলে ঘন জাল বুনে রেখেছে। তার নীচে সুড়ঙ্গের মতো পথ—এই ঝোরা। যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে এমনি আরও কত ঝোরা এসে এসে মিশেছে, যেন পাতালের মধ্যে মায়া সুড়ঙ্গের মতো।

দু' পা গিয়েই পুবুলির হাতের বাজু ধরে ফেলে বেশু কন্ধ বলল, "সাবধান নুনি, সাবধান। ভয় লাগছে না কি?" সামনের সেই অনামিকাকে দেখলে বুক কেঁপে ওঠবারই কথা। কেবল অন্ধকারের স্রোত, গাছ লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে কোন আকস্মিক ফাঁক দিয়ে মাথার উপর থেকে চাকা

ঢাকা সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে গোল গোল হয়ে—তখন দুপুর বেলা বলে। তাকেও গিলে ফেলার জন্য পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল থেকে ঝুলে পড়েছে ঘন ককোড়ির ('ফার্ন) বন, হেলছে দুলছে সারাক্ষণ। মশার মেঘ ভন ভন করে উড়ছে মুখের সামনে। এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে। বড় বড় মাকড়সা পুঁজিপতির মতো জালের মাঝখানে বসে আছে, চোখে তীব্র কঠোর চাহনি। পাহাড়ের দেওয়াল যেন দুই দিক থেকে চেপে আসছে। আকাশ নেই। শক্ত করে বেঙ্গু কন্ধের হাত ধরে পুবুলি বলল, "না, ভয় কিসের।"

এমনি করে দুজনে এগিয়ে চলল। পিছন থেকে লোকদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে তাও আর শোনা গেল না। দুটো বাঁক ঘোরবার পরে বাহিরের মানুষের সব শব্দ সব স্পর্শ শেষ। পুবুলি বললে, "এবার কোন দিকে, বেঙ্গু?"

বেঙ্গু হাসল। বলল, "যাই তো আর একটু, ঝোরাটা এবার ক্রমে উপরের দিকে উঠেছে, আমরাও পাহাড়ের উপরের দিকেই উঠে চলেছি। ওদের কত নীচে ফেলে এসেছি। এবার সাবধান নুনি, বাঘ মামা থাকে এই উপরের ঝোরার কাছে। ভয় পেয়ে মাথা বিগড়াস না, কোনো কিছু বেরিয়ে পড়লে আমায় জড়িয়ে ধরিস না, আমার পিছনে আমার কাছে কাছে থাকবি, আমি সব সামলে নেব। আর একটু খানিই তো।"

অন্ধকার বাড়ল। ঝোরা সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। পাহাড়ের দেওয়ালে এখানে ওখানে গর্ত আর গুহা, তার ভিতরে তাল তাল অন্ধকার। উপরে জন্তুদের দৌড়ে পালাবার শব্দ হয়, এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে হরিণ সম্বর লাফ দেয়। পুবুলি হাত দিয়ে দেখায়, বেঙ্গু ইশারায় বলে, "থাম, থাম।" ঝোরার দু'দিকের দেওয়াল ক্রমে ছোট হয়ে আসছে, ঝোরার গতি-পথ খাড়া হয়ে উঠছে ধাপে ধাপে, জলের গর্জন বাড়ছে। এর পর খদের ভিতর থেকে উপর দিকে উঠেছে বহুতর বড় বড় গাছ। বেঙ্গু বলল, "সুবিধে মতো জায়গা দেখলে এবার আমরা উপরে উঠে যাব, খদের পথ আমাদের শেষ হয়ে এল।"

আর একটু উপরে ঝোরার খাড়া পাড়ে দলে দলে ময়ূর বসে আছে। আবার বেঙ্গু কন্ধ হাত ইশারা করে পুবুলিকে বারণ করল। একটু পরেই

আস্তে আস্তে মেয়াও মেয়াও করে এ দিকের পাড়ের বাঘ আর ও দিকের পাড়ের বাঘিনী পরস্পরকে সম্ভাষণ করলো। অতি কোমল সরস তার সুর। বাঘের যেন মিনতির "ওগো—ওগো" সুর, বাঘিনীর "না—না," ভদ্র, কোমল।

বেণু উপরের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "বড় বাঘ, আর বাঘিনী।"

পুবুলি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল, বেণুর কাছে ঘেঁষে এল। বন্দুক তৈরী রেখে বেণু পুবুলিকে নিয়ে দুই পা নীচের দিকে নেমে এল। বাঘের ভাষার মধুর স্বর-লহরী তবু কানে এসে বাজছে, গাছের পাতা ঝরে পড়ে যে-গর্জনে, গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়, শরীর অবশ হয়ে যায়—এতে তার আভাসও নেই, অতি মৃদু, অতি ভদ্র, চেনা লোকের সম্ভাষণের মতো। বেণু হাসছিল। বলল, "এমনি এদের আপসের মধ্যে ভাব চলেছে, শিকার দেখলে তখন এদের তোড় বেরুবে। বাঘের বাসা আছে ঐ উপরে। কোথায় হয়তো একটা বড গুহা, তার মাঝে দু-ফাঁক হয়ে ফেটে গিয়ে হয়তো ঝরনা বেরিয়েছে—কাছেই জল, রান্নার সুবিধে, সেই তো ভালো বাসা। এদিকে একজন গিয়েছে আর একজন ওদিকে, বলছে আমায় ছোঁ তো দেখি! বাঘ ভালো ময়ুর শিকার যাচছে, বলছে 'যতটা চাস এনে দেব, খালি কাছে আয়।' বাঘিনীর কেবল 'না, না'।—আচ্ছা, চল আমরা একটু নেমে যাই, জেনে শুনে বাঘ বাঘিনীর মাঝে পড়বার কোনো দরকার নেই, থাকলই বা বন্দুক।"

পুবুলির হাত ধরে খুব সাবধানে বেণু কন্ধ নীচের দিকে নামতে লাগল। উপরে ওঠা বরং সোজা ছিল, কিন্তু নীচে নামতে গেলে পা পিছলাবার ভয় বেজায়, একবার পা পিছলালেই পড়ে হাঁটু ভাঙবে। পুবুলি নীচের দিকে তাকাল—ওঠবার সময় বোঝা যায় নি। নীচে নেমে গেছে অন্ধকার পাতাল, ঝোরার ছল-ছল কল-কল শব্দে কান কালা হয়ে যায়, মনে হয় যেন সব কিছুই সড়সড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে নীচে, ভেসে যাচ্ছে ঝোরা বেয়ে বেয়ে।

পুবুলির মনের ভাব বেণু বুঝতে পারল: নীচে নামা কন্ধনীর সাহসেও কুলিয়ে উঠছে না। পুবুলিকে অপেক্ষা করতে বলে বেণু কন্ধ পাহাড়ের ধার বেয়ে বেয়ে উপরে উঠল। কোন দিক থেকে হাওয়া বইছে দেখে নিয়ে

নাক তুলে গন্ধ নিতে লাগল। গাছে পাতায় মাটিতে কান পেতে পেতে শব্দ শুনল, নুয়ে দাঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে লেপটে ঝোপে ঝাড়ে ঢিল ছুঁড়ে আসপাশের বনস্থলীকে একবার পরখ করে নিল। সব দেখে শুনে বেণু নিশ্চিন্ত হল, বিপদ নেই। উপর থেকে আশ্বাসের হাসি গাঁদি করে করে নীচের দিকে ছুঁড়তে লাগল। উপরে বেণু, নীচে ময়ূরীর মতো উপর দিকে মুখ তুলে পুবুলি। বেণু নেমে এল। পুবুলিকে তুলে ধরে শিআরি লতার মোটা মোটা ডালে বসিয়ে দিয়ে দিয়ে নিজেও খদের চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল পিছনে পিছনে।

পুবুলির মনে ভরসা ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর দুজনে উপরে লতার জালের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। তার পর খদের ধারে, তার পর পাহাড়েব উপরে।

নীচ থেকে উপরটা যত জঙ্গলে ভরা দেখায় বাস্তবিক এত জঙ্গল সেখানে নেই। সব জঙ্গল খদের ধার বরাবরই। অসংখ্য পাখীর বাস, নানা জাতের পাখী। নীচের ঝরনার সীমানা দেখাবার জন্য যেন খদের উপরে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে বনের ঢেউয়ের রেখা। দুদিকে অল্প ঢালু, ঝোপ ঝোপ টুকরো টুকরো জঙ্গল, পাথর বেশী। উপরে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের উপরে ওরা, সেখানে পরিষ্কার আকাশ। চারিদিক খোলা, মাঝখানে ছোট ঢিবির মতো পাথরে জঙ্গলে ভরতি পাহাড়ের চূড়া। বেণু বলল, "খদের কাছাকাছি মাটির পথ নিশ্চয়ই আছে, চলে আয়।"

কোথায় তারা মাছ ধরছিল? কোথায় তাদের বন্ধুবান্ধবরা তাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে? সে কেথায়, কোন খানে? সে পাহাড় কত নীচে রয়ে গেছে।

খদের তলা, পাহাড়ের গোড়া, যেন পাতাল। এত উপর থেকে দেখায় যেন পরত পরত মেঘের মতো। এই সব পাহাড-পর্বতের আড়ালে কোথায় ঢাকা পড়ে তারি মধ্যে লুকিয়ে আছে আর একখানি ছোট পাহাড় যার উপরে তাদের গাঁ মিণিআপায়ু। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর সহজ মনে উদাস চোখে পুবুলি সেদিকে চেয়ে রইল। কোথায়, তার কেনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তো! কেবল পাহাড়ের নীচে পাহাড়, দু' পাহাড়ের ফাঁকে গভীর খদে ঘন জঙ্গল। রোদ পড়ে এসেছে, পাহাড়ের উপরটা আরো

বেগনী দেখাচ্ছে, নীচের খদ থেকে কালো ছায়া লম্বা হয়ে চলেছে, যত দূর চোখ যায় কেবল ঢেউ-খেলানো পাহাড়, মানুষের স্থান নেই সেখানে। পুবুলির আকুল মনের কথা নিমেষে বুঝতে পেরে বেঙ্গু বলল, "তোর গ্রাম খুঁজছিস, পুবুলি? ঐ ওখানে পাহাড়ের আড়ালে রয়ে গেছে। ও-ই নীচ থেকে আমরা উঠতে উঠতে এসেছিলাম, আর কি ওখানে যাবার পথ পাবি? কেন আর মন খারাপ করছিস নুনি? যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এখন পা চালিয়ে চল, বেলা পড়ে যাবে। আজ যেমন করেই হোক কাকিরি ঘাটির কাছে লচাউণি গাঁ ধরতে হবে। রাতটা সেখানে থেকে কাল রান্না বসানোর সময় নাগাদ চম্পা-ঝরনা ধরতে পারলে সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছে যাব। এখানে কি দেখছিস্ নুনি? চল, ওখানে চল। দেখবি আমার গাঁয়ের মাটি কেমন, বন কেমন, দেখবি সেখানে কেমন শিকার হয়—খালি জন্তু-জানোয়ারের আড়ত। জঙ্গলে পথ, তা কিছু ভয় নেই, এই বন্দুক তো আছে। পথে আমাদের গ্রামের লোকদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে, তারা এতক্ষণে হয়তো গাঁয়ে ফেরবার জন্য বেরিয়েই পড়েছে।"

পুবুলির দোল-খাওয়া মনকে ঠেকো দিয়ে দাঁড় করানোর মতো করে বেঙ্গু কন্ধ নানা সাহসের কথা বলে আশ্বাস দিলে। আর ভাববার সময় নেই, পিছনে ফেলে আসা যা-কিছু তার কথা পিছনেই পড়ে রইল, বেঙ্গু কন্ধের হাত ধরে অজানা বনপথে পুবুলি ডানা মেলে দিলে।

আদিম কাল থেকে এমনি প্রথা, বনের হরিণীকে ধরার মতো বনের কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে কতক লোকে, তাকে বলে 'উদুলিআ' বিয়ে। যুবক-যুবতীর মনের মিলেই কন্ধ সমাজের বিয়ে। আগে থেকেই বলে রেখে, আগে থেকে পটিয়ে এক দিন বর এসে কন্যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ধরা পড়লে লড়াই করবার জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুত, মার খেয়ে মার দিয়ে সে বিয়ে করে। অবশ্য এ কেবল এক রকমের বিয়ে। যার পণ দেবার সঙ্গতি নেই, যেখানে মুরুব্বিদের অমতের আশঙ্কা, অথবা যেখানে ঘর-জামাই হয়ে শ্বশুর বাড়িতে খেটে পরিশ্রম করে পণের টাকা শোধ দিতে বরের অমত, সেখানে এই 'উদুলিআ' বিবাহের প্রচলন আছে। প্রাচীনকালের মানব সমাজে ধরে-আনা কন্যাকে বিবাহ করার স্মারক এটা।

এমনি করে একবার চেনা ভিন গাঁয়ের লোকের হাত ধরে পুবুলি চলে গেল। দুনিয়ার হাটে, যেখানে নিজের মনের গড়ন অনুযায়ী নিজের আদর্শের সঙ্গী বেছে নিতে মন চায়, সেখানে বারেকের চেনায় সে আপনার মন বুঝে নিয়েছিল, আর তার বাছাবাছি নেই। কোথায় কবে বেড়ে উঠেছিল সে, কোন বাড়ির মাড়ুয়ার ভাত আর কন্দ সিদ্ধ খেয়ে যৌবনের এই দুঃসাহসের জন্য দেহ তার গড়া হয়েছিল, কার সে, কোন্ গাঁয়ের—এত ভাবনা চিন্তা তার মনে আসেনি। সে যুবতী, তার মন বলল, তার রুচি বাছল, সে চলে গেল।

॥ পঞ্চান্ন ॥

ওদিকে পাহাড়ের খাড়া ধারের নীচের ঝোরায়—জল ছাঁচতে ছাঁচতে জল ফুরুল, পাথুরে ঝোরার ভিতরে কেবল ছোট ছোট মাছ গিজগিজ করছে। পাথর সরাতে বালিগরড়া মাছ মুখ লুকোচ্ছে, বালিতে মুখ গুঁজে ভাবছে যে সে নিস্তার পেল। অন্য ছোট ছোট মাছ ফুরুৎ ফুরুৎ করে এদিকে ওদিকে লাফালাফি করছে, সবাই ছুটোছুটি করে মাছ ধরছে, এ ওর গায়ে ও এর গায়ে গিয়ে পড়ছে। মাছ ধরার এই হুড়োহুড়ি গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলির মধ্যে কেউবা কাউকে খোঁচা মারছে, কাতুকুতু দিচ্ছে। খালি হাসির শব্দ, নকল রাগের চীৎকার। গোলমালে উঁচুতে খাড়া পাড়ের উপরে বুড়োদের ঘুম ভেঙে গেল। উপর থেকে দেখা যাচ্ছে কিছু দূরে এক জায়গায় দলে দলে ময়ূর নেমে পাহাড়ের খোলের সারাটা ঢালু ভরে বসে গেছে। মাছ ধরার আগ্রহ ছাপিয়ে ওঠে বুড়ো মুখে নরম ময়ূরের মাংসের স্বাদের কল্পনা।

বুড়োরা উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "মেলকা—মেল্‌কা (ময়ূরের পাল)! ওরে তোরা মাছ ধরতে এসেছিস না শিকার করতে এসেছিস? আয় আয়!" শিকারের আগ্রহ যাদের তারা সবাই মাছ ধরা ছেড়ে খাড়া পাড়ের উপর উঠে এল। বন্দুকে গুলি বারুদ ভরা হল, দূরত্ব দেখা হল। সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ শুরু হয়ে গেল কে কোন পথে যাবে, কারণ ময়ূর চট করে দেখে

ফেলে। এক একটি দলে এক একটি বড় পুরুষ ময়ূর, অনেকগুলি করে ময়ূরী। আরামে বসে আছে, এদিকে মানুষের রাহাজানি নেই।

সকালে আসবার সময়ে যে-লোকটি এত বড সেই শিংওয়ালা সম্বরটাকে একাই শিকার করেছিল, ময়ূর শিকারের অভিযান আরম্ভ হওয়াতে তার কথাই সকলের মুখে এল। মিণিআপায়ুর বুড়ো বাগী কন্ধ বলল, "সেই জোয়ানই এগিয়ে আসুক, সে বলুক।" মেয়েরা এক জায়গায় জড়ো হল। মাছ ধরার নেশা ছুটে যেতে মেয়েরা—কাঠ্‌ক, টিট, জঞ্জই—চেঁচাল, "পুবুলি? পুবুলি কই?"

মিটিং গাঁয়ের ধাংডাদের মধ্যে হইচই পডে গেল। লেতা আজুর্ আডালে গিয়ে পরামর্শ করতে বসল। আজুর্ বলল, "চুপ করে থাক, গাঁয়ে ফিরলে বলা যাবে।"

লেতা বলল, "পাগল হয়েছিস তুই? ওরা তো গেছে, এরা আজ না হোক কাল জানবেই, কিন্তু এখন ভেবে মরবে যে। বাঘে খেল কি সাপে কাটল ভাববে, কান্নাকাটি করবে।"

আজুর্ বলল, "করলেই বা কান্নাকাটি, কেবল নিজেদের মেয়ের জন্য কান্নাকাটি করবে, আর এমনিতে আমাদের ছেলের জন্যও দুঃখ করবে।"

"না না, এও কি একটা কথা, বিনা কারণে কাঁদানো—"

"মার খাবার জন্য পিঠ পেতে রাখবি তো ভাই?"

"তা তো রাখতেই হবে।" দুজনেই হাসল।

মিটিং গাঁয়ের লোকেরা ব্যাপারটা প্রকাশ করল—বেশু আর পুবুলি উদুলিআ পালিয়ে গেছে। এক মুহূর্ত—বাজ পডার মতো সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর তুফান ছুটল। বুডো, অল্পবয়সী মেয়ে সব এক জোট হয়ে গেল। এক সঙ্গে রাগের গালাগালির খই ফুটতে লাগল সকলের মুখে। কাঠ্‌ক, টিট, জঞ্জই—পুবুলির সখীরা—সত্যি সত্যিই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, অন্যেরা হাসল, বুড়োরা গর্জন করল, কেউ বা কারো হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—"বল বল, কোন পথে গেছে তারা—"। কেউ কিছু দূর দৌড়ে যায় আবার দৌড়তে দৌডতে ফিরে এসে হাত নেড়ে মাথা নেড়ে ছটফট করে। এমনি করে প্রথম ধুয়ো ধরা হয়ে গেলে পর দুই গাঁয়ের

লোকেরা দুই দলে ভাগ হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। পিঙ্গল জটা ঝাড়তে ঝাড়তে মিণিআপায়ুর বুড়োরা কুলপতির মতো দলের সামনে দাঁড়িয়ে মহাদর্পে গালিগালাজ আরম্ভ করলে।

"খংগার (ডাকাত), পটুকার (ঠক), গণ্ডা (মন্দ), তাঁত্রিআঁ (কুটিল) মিটিঙ্গেরা! চাইলে কি আমরা দিতাম না যে আমাদের মেয়েকে এসে চুরি করে নিয়ে গেলি বজ্জাত চোর কোথাকার? না পিরা বুড়্‌তাতি মি শুতিতা কাঞ্জাই (খারাপ গালি) গণ্ডা পটুকার নিস্তা পিস্তা (কুঁড়ে) শালারা, দে আমাদের পাওনা মদ দে, আমাদের ভোজের ভাত দে, আমাদের ঝোরা (পণ) দে, ভালো চাস যদি। আমাদের হক পাওনা না দিয়ে গেলে আগেকার কালের মতো মার ধর হবে জেনে রাখ।"

মিটিং-এর ছোকরারা হাততালি দিয়ে হাসছিল। তারা জবাব দিল—"আমাদের কোনো দোষ নেই। তোমাদের মেয়ে আপনি রাজি হয়ে আমাদের জল ঢেলে খেয়েছে, আপনি রাজি হয়ে ঘর করতে চলে গেছে। আমরা চুরি করিনি, ডাকাতিও করিনি। যার সঙ্গে যে রাজি হয় তাদের সঙ্গে উচুলিআ বিয়ে আমাদের দেশে নতুন নয়, কেন আমাদের গালমন্দ করছ? এখন থেকে তোমরা আমাদের শালা হলে, শ্বশুর হলে, এখন আর মন কষাকষি কেন শ্বশুরেরা? খুব জোর তোমাদের পাওনা তো একটা বুড়ো গরু, এক কেনেস্তারা মদ, একটা ভোজ। তোমরা তো বুড়ো গরুর আসল ব্যাপারী, হলুদের ব্যাপারী, নিজেদের পাওনা ছাড়বে কোত্থেকে শ্বশুরের দল!"

বলতে বলতেই মেয়েদের দল মিটিং-এর লোকেদের আক্রমণ করল। কিল চড় নখের আঁচড়—দুর্বলা অবলারা যেটুকু করতে পারে। এই মার-ধরও দেশাচার, এতে কোনো তিক্ততা ছিল না, কেবল সে-কালের ধরে-আনা কন্যা বিবাহের স্মারকমাত্র। ছোকরারা বিনা আপত্তিতে সব সহ্য করে গেল, উলটে হাসতে লাগল। যত ইচ্ছা তাদের উপর মার হল, তার পর দুই পক্ষ আলাদা হল। মিটিং-এর লোকেরা মিটিং-এ গেল, মিণআপায়ুর কুদা (দল) মিণিআপায়ু গেল।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

মদ, আরো মদ। লেঞ্জু কন্ধ হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকে, এতেই তার জীবনের আরাম। কত রকমের অভিনয় মনে মনে সে করে যায়, কিন্তু সব হার মানে সোনাদেঈয়ের কাছে, সেই মানুষটি তার হাতের ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়ে যায়। লেঞ্জু কন্ধ খালি ভেবাচাকা খেয়ে পিছন পানে তাকিয়ে থাকে। যত বার সে হারে ততবার সে নিজের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করতে বসে, ছোকরাদের উদ্দেশ্যে গাল-মন্দ করে, কি তাদের আছে যা তার নেই? সে ভেবে পায় না।

এই সেদিন—বারিক ছিল না, লেঞ্জু কন্ধও মদ খেয়ে জোয়ান মরদের মতো গিয়ে হাঁক ছাড়লে—"কোথায় পালাবি তুই ঘর খোলা রেখে? বস এখানে, এই নে—" কোনো উত্তর নেই। কেবল পিঠের খানিকটা দেখা যায়। এই—এই করতে করতে ক্রমশঃ সরু হয়ে পিঠটা কোথায় মিলিয়ে গেল। দু' ঢোক মদ খেয়ে মনটাকে সরস করে হাসতে হাসতে সে ডাকল, "আরে লুকোলি কোথায়? আয় আয়, গল্প করি, নাচি—"। ঘড়া কাঁখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল সোনাদেঈ, বলে দিয়ে গেল, "একটু নজর রাখিস সাঁওতা, বারিক আসবে এখনি, তুমি তো আছ, ঘর খোলাই থাক।"

আর একটু আর একটু করতে করতে গোটা হাঁড়িটাই উজাড় হয়ে গেল। এর পর বারিক সমস্ত ঘর খুঁজে পেতে দেখলেও পাবে স্রেফ্ জল। নাচ ফুরুল গান ফুরুল তবু তার দেখা নেই। হাঁ, লেঞ্জু খুঁজতে যেতেও পারত, কিন্তু যায় কেমন করে, কথা দিয়েছে ঘর আগলাবে। বারিকের ঘরে কিইবা আছে যে কেউ চুরি করবে তার নিজের ঘরের দল ছাড়া? কিন্তু না, যতই মদ খাক নেশাটা ভয়েই গিয়ে ধাক্কা খায়, আড়ালে, এই ঘরে, এই আঙিনায়, সে ইচ্ছামতো তার মূর্তি দেখাতে পারে—কিন্তু বাইরে নয়। কোন দিন কি বকতে বকতে মুখ দিয়ে কি বেরিয়ে যাবে তাই নিত্যদিনের চিন্তা, ভয়।

কোনো কিছুই করতে না পেরে, সব তাতে হেরে গিয়ে কেবল মাথায়

হাত দিয়ে সে বসে থাকে, বিশ্ব-সংসারের যত দুঃখ সব যেন তার মাথায় চেপেছে। মনের মধ্যে কিসে যেন কেবলি বলছে—সে পারে না, সে পারে না। আবার ভাবছে, তার কেউ নেই, কেউ তাকে চায় না। এমনি মন ভার করে, দুঃখের অবতার হয়ে, নিস্তেজ হয়ে পাথরের উপরে বসে থাকতে থাকতে তার মরে-যাওয়া স্ত্রী রুকুনার কথাও মনে পড়ে। যত যারা মরে হেজে গেছে, সব হালকা হয়ে উপরে ভেসে আসে, মদের রসের তলানির মতো নীচে গাঢ় হয়ে জমে যায়।

জেনেশুনেই নিজেকে বড দুঃখী করে তুলেছিল সে, পাণ্ডু কন্ধ কাছে এসে বলল, "তোর চেহারাটা বড শুকনো দেখাচ্ছে, সিঁটকানো দেখাচ্ছে, লেঞ্জু ভাই। সাবধানে থাকিস, জ্বর-জাডি হতে পারে তোর"—লেঞ্জু কন্ধের কান্নাব ধ্যান ভাঙল না। পাণ্ডু কন্ধ আরো উপদেশ দিল, "সময় থাকতে সাবধান হ, ওষুধ খা। এ-সময়ে বড খারাপ পাহাডী জ্বর হবে চারিদিকে। জ্বরে পড়বি, জ্বরে পডবি—"

কথাগুলো বড ভালো লাগল শুনতে লেঞ্জু কন্ধের, মদেব নেশা প্রায় ছুটে গেছে, তার নিজের প্রতি দয়া হল, ইচ্ছে হল পাণ্ডু কন্ধের গলা জডিয়ে খুব খানিকটা কাঁদে। এই ভালো, সে মরে যাবে. কেউ তার কথা ভাববে না, তার জন্য শোক করবে না, সংসারে অধম সে, নির্বিষ নির্দোষ ঢোঁডা সাপ।

পাণ্ডু জানী পর্যন্ত কাছে বসে গেল না খানিকক্ষণ।

দুনিয়াটা এমনি।

গ্রাম চুপ করে পডে আছে। নিশ্বাস বন্ধ করে রয়েছে যেন—কি একটা খবর শোনবার অপেক্ষায়। কি শুনসান—ভাবছিল লেঞ্জু কন্ধ—এমন নিরালাতেও সোনাদেঈ খালি তাকে মনে করিয়ে দেবে সাঁওতাই হোক আর যাই হোক সে নয় তার সাথের, তার শ্রেণীর।

এই ভালো, এই জীবন শেষ হয়ে যাক, তাডাতাডি যাক, এই জন্মের না-মেটা সাধ আর জন্মে যদি মেটানো যায়। কেউ তার নয়, অতএব কেউ কারও নয়, সংসার তুচ্ছ, মিথ্যে মায়া।

বেলা যায় যায়, গাঁয়ের মাথায় বাজনা বেজে উঠল। গান শোনা গেল। একটা সাডা পড়ে গেল, চারিদিক থেকে সবাই দৌড়ে এল।

একটা মরা সম্বরকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে বাঁশে বেঁধে বয়ে নিয়ে আসছে গাঁয়ের বুড়োরা। সাফল্যের হাসি মুখে আর ধরে না। তাদের ঘিরে হাতে হাত বেঁধে আগে পিছে হেলে দুলে নেচে নেচে আসছে গাঁয়ের মেয়েরা, গানে আর চীৎকারে গাঁ কাঁপছে। লেঞ্জু কন্ধের চোখ আগে পড়ল সেই সম্বরটার উপরে। তার মনে হল যে তার খিদে পেয়েছে। সম্বরের মাংস বাসী হলে ভালো লাগে, তবে টাটকাও মন্দ লাগে না—আগুনে একটু ঝলসে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে। খিদের সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অসহ্য ভাব—কে আছে তার, এত খিদে পেয়েছে, সে-খবর কে নেয়! এরা এমন করছে কেন? মনে হচ্ছে যেন সম্বরটার উপরে পড়ে অমনি চিবিয়ে খাবার ইচ্ছা তাদের। লেঞ্জু কন্ধ আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না, ভাবল এইবার উঠবে। উঠি উঠি করছে এমন সময় জঞ্জই দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, "লেঞ্জুকাকা, লেঞ্জুকাকা, পুবুলি উড়ুলিআ পালিয়েছে—মিটিং গাঁয়ের বেশু কন্ধের সঙ্গে।"

পুবুলি, মিটিং, বেশু কন্ধ, একসঙ্গে করা গেল না; লেঞ্জু কন্ধ বলল, "অ্যাঁ—?"

"আমরা সব ঝোরায় মাছ ধরছিলাম, বেশু—"

"বেশু—?"

"হ্যাঁ, সেই যে ঐ সম্বরটা মেরেছে—এমন শিকারী সে লেঞ্জুকাকা—"

আস্তে আস্তে সব ধারণা একসঙ্গে এসে মিলল। কপালের চামড়া আঁকাবাঁকা হয়ে কুঁচকে উঠল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল, নাকের পাতা ফুলে উঠল, রাগে ভয়ঙ্কর মুখ করে সরবু সাঁওতার ভাই লেঞ্জু কন্ধ চারদিক কাঁপিয়ে গর্জন করে লাফ দিয়ে উঠল। "কি? উড়ুলিআ নিয়ে পালিয়েছে! আমার পুবুলিকে বেশু কন্ধ নিয়ে পালিয়েছে!" বলতে বলতে চারিদিক থেকে লোকেরা ছুটে এল, বাজনা থেমে গেল, নাচ বন্ধ হল। শিকার-ফেরতা লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাল, কতগুলি বুড়ী কেঁদে ফেলল। লেঞ্জু কন্ধ তখনও গর্জন ছাড়ছে।

পুমু হাকিনাকে ভোলাতে কোলে নিয়ে ঘরের বাইরে আসছিল—"ঐ ত্যাখ, হাকিনা; চল্, সম্বর দেখে আসি চল্। দেখলি কেমন—" হঠাৎ বাজনা থেমে গেল, কানে এল কারা সব গর্জন ছাড়ছে, যেন মারপিট

লেগে গেছে গাঁয়ের খোলা জায়গায়। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল এক-দল মেয়ে: "বেগু পুবুলিকে উড়ুলিআ নিয়ে গেছে—"

হঠাৎ পুয়ুর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। পুয়ু ফিরে এল।

লেঞ্জু গর্জন করে চলেছে—"এহ্নাতকি—এহ্নাতকি (কেন, কেন)।" এর ওর হাত থেকে বর্শা বন্দুক টেনে নিচ্ছে। বলছে, "সে কোথাকার কে? তার বাড়ি কোথায়? পরের জন্য তুলে রাখা ধন চুরি করে নিয়ে গেল, আমাদের বলা নেই কওয়া নেই। হাগুর্ণা সাঁওতা কি মনে করবে? তোমরা এত লোক গিয়েছিলে, গাঁয়ের নাম ডুবিয়ে এলে? শিকার করতে গিয়েছিলে না হাতে হাতিয়ার নিয়ে? অপর লোকে তোমাদের মেয়েকে টেনে নিয়ে গেল, তোমাদের লজ্জা হল না? চলো, বেরিয়ে পড়ো। দেখি কতদূর গেছে, তাদের দফা শেষ করে দিয়ে আসি। নয় তো তাদের গাঁয়ে গিয়ে গাঁ উজাড় করে আসব। ওঠো, ওঠো, গাঁয়ে জোয়ানরা নেই তো তাতে কি হয়েছে, আমরা কি কোনো দিন জোয়ান ছিলাম না?" তার ওজস্বিনী বক্তৃতায় সে নিজেই কেবল তেতে উঠছিল, আর কেউ না। কারণ, রাজির উপর আর কারও কথা নেই। মেয়ের যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করেছে। আর এই কন্ধদেশে যেখানে দুখানি বলিষ্ঠ হাত মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেখানে একটা হাগুর্ণা সাঁওতা আর একটা বেগু কন্ধের মধ্যে তফাত বেশী নেই। লেঞ্জু কন্ধের রাগ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, সে রাগ করছিল। তার মনের অন্তরালে ছিল এই রাগের উপরে আর একটা প্রবল শক্তি, সে তার ভয়। ভয় দিউড়ুকে। দিউড়ু ফিরবে, দিউড়ু শুনবে। সে যে রকমের গোঁয়ার, সে কাকে দায়ী করবে কে জানে।

পাগলের মতো লেঞ্জু কন্ধ দৌড়ে গেল বাড়িতে, চেঁচিয়ে বলল, "বউ বউ, শুনেছিস? ও বউ!" পুয়ু কিছু না বলে কাঠ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। "আমরা কি তাকে হতাদর করেছি বউ? না বলে না কয়ে এমনি উড়ুলিআ হবার ইচ্ছে হল তার! এত তো সব বউ হয়ে এসেছে, তার মতো উড়ুলিআ কে এসেছে বল দেখি। সাঁওতার মেয়ে, সাঁওতার বোন, আর কেমন সুন্দর পাত্র অপেক্ষা করে রয়েছে—হাগুর্ণা সাঁওতা। আর তার এই কাণ্ড!"

লেঞ্জু কন্ধ চেঁচিয়ে চলেছে। কারো কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে তার রাগ আরো বেড়ে উঠছে। গোলমাল শুনে কয়েকটি বুড়ী এসে জড়ো

হয়েছে। ছোট ছেলেরা সবাই গিয়ে জুটেছে রাস্তায় সেই সহরের কাছে, যেখানে আবার নাচ চলেছে, শিকারের সাফল্যে মদ খাওয়া লেগে আছে। গোলমাল মেটাবার জন্য গম্ভীর মুখ করে পাণ্ডু কন্ধ এসে উপস্থিত হল। লেঞ্জুর কাঁধে হাত দিয়ে পিছন দিকে টেনে নিয়ে গেল। বলল, "পাগলামি ধরেছে লেঞ্জু, এমন করছিস। কি হয়েছে, যে যার সে তার হয়েছে, নিজেরা পছন্দ করে পরস্পরকে আদর করে নিয়েছে, তাতে আমাদের কি আসে যায়? আমাদের বয়স কি ওদের হয়েছে যে তোর আমার মতো বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে বসে সাত পাঁচ ভেবে হিসেব করে কাজ করবে? জোয়ান বয়স ওদের, যখন যা মনে আসবে করে বসবে, আমাদের কথা শোনবার জন্য ওরা কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? না, কি বলিস জামিরি ভাই?"

জামিরি বলল, "ঠিক ঠিক।"

ততক্ষণে লেঞ্জু কন্ধ সব রাগ খরচ করে ফেলেছে। বলল, "বেশ বেশ, তোমরা গ্রামের লোকেরা এত বড় অপবাদের কথা শুনে যদি ব্যস্ত না হও, একা আমি কেন চেঁচিয়ে মরি?"

পাণ্ডু কন্ধ বলল, "সেই ভালো, সেই ভালো। এত সাঁওতা সাঁওতা বলছিস যে, সাঁওতার ঘরের মেয়ে হলেও তো সে মানুষ। আরে বাপু, আমি তুমি কে? সব দিন ক্ষণ যোগ নক্ষত্রের কথা। আমি তো বলেই দিয়েছিলাম। হাগুর্ণা মাকৃড়ি যোগের ছেলে, হাগুর্ণা তাকে পায়নি, পাবেও না। নক্ষত্রের কাজ নক্ষত্র করেছে, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

পাণ্ডু কন্ধ তার উদাস প্রসন্ন হাসিটি হেসে চলে গেল। লেঞ্জুও গেল। তার ভয় ঘোচেনি, রগচটা লোক দিউড়ু, তাকে খবর পাঠাতে হবে। সবাই চলে গেল, পুয়ু একলা পড়ল। আর যে যেখানে যাক তার তো কোথাও যাবার নেই! সরল সম্ভাবিত ব্যাপার একবার ঘটে গেলে কতখানি বাজে মানুষের মনে! পুয়ু ভাবছিল, সত্যিই পুবুলি বর বিয়ে করে চলে গেল! পুবুলিও ঘর বাঁধতে পারে! কে তবে তার?

পুয়ু সেইখানেই বসে রইল। কখন সন্ধ্যা হয়ে গেল, জ্যোৎস্না রাত, গাঁয়ের খোলা জায়গায় আনন্দ-কোলাহল। তারপর কতক্ষণ পরে কখন

কন্ধ গাঁয়ে ঘরে ঘরে বারান্দার উপরে রান্নার আগুন ধিমিয়ে ধিমিয়ে জ্বলতে লাগল, রান্নাবান্নার কাজ, খোশগল্পের কাজ, মরা সম্বরকে ঘিরে নাচ, বুড়োদের মদ খাওয়া, মেয়েদের গান গাওয়া, জীবনের ধারার সহজ ছন্দ। পুয়ুর মোটে মনে নেই সে-সব, তেমনি ঠায় বসে আছে সে। একটার পর একটা কালো ছায়া নামছে, সব নিবে যাচ্ছে। চৈতের রাত নয় তো, শ্রাবণ অমাবস্যার মেঘ। তারাগ্রাসী মেঘ। আর আঁধার-করা হাহাকার। তার অনুভূতি এইটুকু, খোলা মাঠে বর্ষার কোলাহল, সেখানে গরম নেই, আরাম নেই।

জামিরির বুড়ী রান্না বসিয়ে দিয়ে পাশের বারান্দা থেকে পুয়ুর নাম ধরে ডাকলে। জবাব নেই। বুড়ী বলল, "আরে, বউটা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! উনুনে আগুন দেয়নি! এমনি উপোস করে পড়ে থাকলে দুধ হবে কোত্থেকে যে ছেলে খাবে।" বুড়ী এসে পুয়ুর গায়ে নাড়া দিলে। যেন স্বপ্ন দেখছিল এমনিভাবে উঠে পড়ে পুয়ু বলল, "অ্যাঁ—পুবুলি—পুবুলি—" তার গলা ভেঙে গেল। পুয়ু কাঁদল।

তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বুড়ী বলল, "কি হয়েছে, হয়েছে কি? ছেলেমানুষের মতো এমন করছিস? ওঠ ওঠ।"

পুয়ুর কোঁপানি বাধা মানল না।

॥ সাতান্ন ॥

সেদিন গল্পসল্প হচ্ছিল, দিউড়ু সাঁওতা শুনছিল, যে ডোরা-আঁকা বড় বাঘও নাকি রূপের কাছে মাথা নোয়ায়, এড়িয়ে যেতে পারে না। ঐ বন্দিকার গ্রামে কবে একটি সুন্দরী কন্ধ ধাংড়ীকে ডোরাকাটা মানুষখেকো বাঘ ধরে নিয়ে গিয়েছিল, নিয়ে পাথরের চাতালে তাকে রেখে দিয়েছিল। ধাংড়ীর জ্ঞান ছিল না। বাঘ একবার যায় আবার আসে, শোঁকে, চাটে, অতি যত্নের সঙ্গে নিজের মখমলের মতো থাবার নখগুলোকে ঢেকে রেখে ধাংড়ীর গায়ে হাত বোলায়, চাপড়ায়, কানের কাছে বলে ম্যাঁও ম্যাঁও। আবার চলে যায়। একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে

তার দেহ ফুলে ফুলে ওঠে, গোঁফ খাড়া হয়ে ওঠে, মাটিতে লেজ আছড়াতে আছড়াতে পাহাড় কাঁপিয়ে গর্জন ছাড়ে, যেন ঢেঁড়া পিটিয়ে জানাচ্ছে সে ডোরা আঁকা বড় বাঘ। কিন্তু ধাংড়ীকে খায় না। সেই সুন্দর দেহ নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতেই বাঘের বেলা গেল, কে একজন লাগিয়ে দিল দুড়ুম করে। বাঘ চলে পড়ল।

সেই কথা ভাবে দিউড়ু সাঁওতা, পিওটি সুন্দর। যতই যেখানে শিকার করতে যাক, তার পথ সেই বন্দিকারের পথে, বন্দিকার গ্রাম দিউড়ু সাঁওতার ভালো লাগে। শিকার ভোজ আর নাচের ফুর্তি করে ঘুরে ঘুরে আরো কত শিকারের খোঁজে বেরুনো, অন্যান্য গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়, জন্তু-জানোয়ার শিকার হয় আর শিকারীর নাম ছড়ায়।

সেই সুযোগে পিওটির সঙ্গে দেখা হয়, বার বার। পিওটি—নিত্য নতুন তার সাজ। নীচেকার দেশের, পাহাড়ের তলদেশের শিক্ষায় বেড়ে উঠেছে সে। উপরে পাহাড়ের দেশে এসে ক্রমে ক্রমে কঙ্কনী হতে হতে নিত্য তার রূপ বদলে যায়, তাকে সুন্দর দেখায়, সুন্দর লাগে—দিন দিন নতুন নতুন ভাষা শেখা আধ আধ কথা-কওয়া শিশুর মতো। দিউড়ু গায়ে পড়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এক জায়গায় দু'জনেই সমান—দুজনেই মদ খেতে জানে। অনেক বিষয়ে পিওটি অন্যান্য কঙ্কনীর মতো নয়। আপনি আগুয়ান হয়ে কাছে আসে, দিউড়ুর পশুমনকে চঞ্চল করে তোলে, কাছে এগোলে পিছিয়ে যায়, কন্দ কুল আর ফুল যত উপহার দিউড়ু দেয় সব তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে, "মোয়া দি‍ি? মদ দিবি? ধুঙ্গিআ দিবি?" দিউড়ুর ইচ্ছা হয় ঝরনার কাছে পাথরের উঁচু ঢিপির উপর বসে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে গর্জন করতে করতে সেও লেজ আছড়ায়, বুঝিয়ে দেয় মিণিআকা বংশের সরবু সাঁওতার ছেলে সে দিউড়ু সাঁওতা, সে কি এই বন্দিকারার পরোয়া করে? লেজ আছড়াত, কিন্তু তার লেজ নেই, বাকী সবই আছে।

পুয়ুকে ভুলে থাকতে পেরেছে, ভোলবার জন্য আছে চইত পরব, তাই সে ভুলেছে। কিন্তু তার দলের আর সকলে এত ভোগ আয়েস করে গেল, কত খেয়েছে আর হজম করেছে তার হিসেব দিয়েই তাদের সময়ের গণন।।

দিউড়ুর কেবল মদের হাঁড়ি আর পিওটি—পিওটি—আকাশ আর বাতাসের অনুভূতি। তেমনি করেই ভেসে চলেছিল সে—।

সেদিন সুন্দর সন্ধ্যা নেমে আসছিল তার সামনে। পিছন দিকে পাহাড়ের খোলের সমতলে ঘন শালবন, সামনে পাথর আর ছোট ছোট বালির চড়ার মধ্যে সরসর করে বইছে ঝোরা, সেখানেই সেদিন শিকারের কুঁড়ে ঘর, পাতায় তৈরী সারি সারি কুঁড়ে, ছোট কন্ধ বস্তি যেন একটি। সামনে সব কাঠের গুঁড়ি রাখা আছে, রাতের ধুনি হবে বলে। জায়গায় জায়গায় বর্শা পোঁতা রয়েছে, খোঁটায় ধনুক ঝুলছে, বন্দুকগুলি গায়ে গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা। লোকেরা ফুর্তির হইহল্লায় মেতে আছে। কোথাও গান চলেছে, কোথাও বাঁশির প্রতিযোগিতা, কোথাও বা বুড়োরা পাথরের উপরে বসে গেছে, ধুঙ্গিআ টানতে টানতে কন্ধ জগতের হালচালের কথা আলোচনা করছে। তারি উপরে কোলাব্ নদীর তীরের সোনার ধুলো ছড়াতে ছড়াতে স্বপ্নের ডানা ঝটপট করতে করতে পাহাড়ী দেশের সন্ধ্যা নেমে এল। দিউড়ু সাঁওতার মনটা খুশী ছিল, পিওটি আজ তার জন্য তামাক পাতা একখানি নিয়ে এই শিকারের ছাউনিতে এসেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছিল, তার সখীদের সেইখানে জামিন রাখার মতো রেখে, পিওটি দিউড়ুর কাছে দেখা করতে এসেছিল দুপুর বেলায়।

"সব দিনই তুই খালি দিবি সাঁওতা, আমি কিছু দেব না?…না না, আজ কিছু খাব না সাঁওতা। এত জেদাজেদি করছ যখন কাল তাহলে আমরা সবাই মিলে আসব, শিকার করতে যাব—যেদিকে হোক একদিকে, সেখান থেকে ফিরে এসে বরং খাব—"

চকচক করছিল তার মাথার চুল, তার থেকে কিসের একটা সুগন্ধ আসছিল। ফুল তো ছিল না মাথায়। দিউড়ু তার কড়া-পড়া হাতের তেলো দিয়ে তার খোঁপায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে হাতটা শুঁকেছিল, তার মাথায় নাক লাগিয়ে শুঁকেছিল। পিওটি সরে যায়নি। পিওটি বিরক্ত হয়নি। পিওটি কাল আবার আসবে। সেই স্মৃতি মনের মণিকোঠায় তুলে রাখবার জন্য এসেছে এই সন্ধ্যা। দিউড়ু সাঁওতার মন খুশী ছিল।

কত হরিয়াল পাখী এসে বসেছে ঐ ঝোড়ি গাছটাতে। এক গুলিতেই দুই গণ্ডা পড়তে পারে বুঝি। কিন্তু দিউড়ুর সে ইচ্ছে হল্ না। ওদিক দিয়ে

কাম্বেলা কঙ্ক আর এদিক থেকে চাচিরি কঙ্ক বন্দুক তুলে এগিয়ে গেল। দিউড়ু বসে রইল। না, সে মারবে না। বনের পাখী, কার কি করেছে তারা? বনের গাছের দুটো ফল খায় শুধু, এই তো? ' মরবার সময় কি করুণ চোখ, মনে হয় যেন ঐ চোখের তারার পিছনে মেঘ ঘনিয়ে আসছে—দূর থেকে কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে না। পরশু যে-পাখীটি জিয়ন্ত উপর থেকে পড়েছিল আজ সকালে একটি ফল বমি করে মরে গেল, চোখের চাউনিতে যেন বলে গেল—"এইটুকুই তোমাদের পৃথিবীর কাছে নিয়েছিলাম, এই নাও।"

বেঁচে থাকলে পিওটি নিত। কি ভাবতে ভাবতে কি ভাবতে শুরু করে মানুষ, দূর! চাচিরি কঙ্ক কত যে নিশানা করছে। কিন্তু দিউড়ু তাকে বারণ করবে না। হরিয়ালের মাংস খেতে বড় ভালো, এ আসল কাউআ (কাগা) হরিয়াল। কিন্তু মনে মনে সে বারণ করবে। দেখা যাক, ঝাকর-দেবতাকে ডাকা যাক, কত তার ক্ষমতা পরখ হোক। হে ঝাকর পেনু, যদি তুই সত্যি হ'স এই দুই শিকারীর নিশানা ছুটে যাক—ছুটে যাক—ছুটে যাক। গুড়ুম—গুড়ুম—ধন্য ঝাকর দেবতা, হে প্রভু তোমাকে প্রণাম। চাচিরি চেঁচাচ্ছে, "ধেৎ, আলো কমে গেল, কোনটা পাতা কোনটা পাখী চেনা গেল না।"

দিউড়ু বলল, "হাঁ হাঁ, এমনি হয়।"

কাম্বেলা জ্ঞানী নিজের বন্দুককেই গালি দিচ্ছে—"সেই শেয়াল মেরেই ছেলেটা আমার বন্দুক নষ্ট করে দিল। মানা করলাম—শেয়াল মারলে বন্দুকে আর ভালো মার হয় না বলে কথা আছে, তা কি শুনল? বন্দুকটা খালি হাঁচছে যেন, গুলি দূরে যাচ্ছে না, কিছু না।"

দিউড়ু উপদেশ দিল—"তামাক পাতা একখানা ঘষে ওটাকে মন্ত্র করিস না কেন?" কিন্তু মনে মনে ভারী খুশী—ঝাকর তার অন্তরের প্রার্থনা শুনেছে। যাঃ, দিনের আলো নিবল, চাঁদের আলো উঠল। কি নির্জন লাগবে এবার। হাকিনা কি করছে এখন? ছোট্ট বাচ্চা। বড় হয়ে সেও শিকারী হবে, ধাংড়ী চাইবে। আঃ—পিওটি! বন্দিকারে গেলে হয় না রাত্রে? পিওটির ঘর, ঘর। পুয়ু—ছিঃ। হাকিনা-পুয়ু, পিওটি-পুয়ু—ধেৎ, কোন দুঃখে সে তাকে বিয়ে করেছিল! মনটা উদাস লাগছিল। কি

তার অভাব ? কোন জায়গায় খালি খালি লাগছে ? হাঁ. রাত্রে বন্দিকার গেলে বেশ হয়।

"কিরে , যাবি নাকি ? এই কাছেই তো।"

"কেন হে পর গাঁয়ে যাওয়া ? ওরা ভাববে এদের ঘরে খাবার ফুরিয়েছে, মেগে খেতে এসেছে তাই। না না। এখানে অসুবিধেটা কি আমাদের ?"

"আরে, সাঁওতার একলা লাগছে রে, একলা থাকা তো তার অভ্যেস নেই।" হো হো হো হাসি—ধেৎ।

জঙ্গলের ফাঁকে আগুনের মতো ঢুটো কি যেন নড়ছে চড়ছে, পাহাড়ের উপরে—এই নীচে নেমে আসছে, একসঙ্গে ঘুরছে ফিরছে ডাইনে বাঁয়ে। "ওরে ভাই, দেখ তো ওটা কি। বাঘের চোখ না ?"

"হাঃ! আরে বাঘের চোখ কোথায়! বাঘের চোখ কি লাল দেখায় ?"

"দেখি তো—হুঁ, শেয়াল নয় তো নেকড়ে—তাদেরই চোখ লাল দেখায়। বাঘের চোখ তো সবুজ দেখায়, তারার আলোর মতো।"

"খুব তো জানিস! গয়াল বা বুনো মোষ না হবে কেন ?"

"আরে, তারা তো গাই গরু জাতের, তাদের চোখ তো কাচের মতো চকচকে দেখায়—বড় বড় জোনাকির মতো।"

"শেয়াল—"

"পাগল হয়েছিল ? এত বড় শেয়াল কোত্থেকে আসবে ? এত উঁচুতে আলোটা দেখা যাচ্ছে। এ নেকড়ে বাঘ নয় তো চিতা বাঘ, তাদেরই চোখ দেখায় একটু লালচে।"

"আচ্ছা, দেখা যাক তো।"

আলো ঢুটো কিছুক্ষণ পরে কাছে এল, তখন দেখা গেল দড়ির আগুন কেবল ঢুটো।

"কে হে ?"

"আমাদের মিশিআপামুর লোক নাকি হে ? সাঁওতা আছে ?"

ভারী হাসাহাসি পড়ে গেল। কেবল বুড়ো বারিক আর তার সঙ্গে বন্দিকারের লোকেরা। বারিক তার কর্তব্য কাজে এসেছে, বড় গম্ভীর।

"কিরে, বুড়ো বারিক যে? রাতে—একাই—?

"সেই কথাই তো। রাতের কাজ করতে এই বুড়ো বারিক। আমরা তো রাতে ঘোরবার লোক। দিনের কাজের জন্য জোয়ান সাঁওতা।"

"হয়েছে কিরে, বারিক?

"বলছি। এক চুমুক দেবে কিছু, গলাটা ভিজিয়ে নিই। বুড়ো হয়ে গেছি সাঁওতা,হাত পা টেনে ধরেছে, তায় আবার পুরো খোরাক জোটে না। দে এক চুমুক দে।"

"ওরে দে রে কার কাছে আছে, বুড়োকে দে।"

গলাটা গরম করে নিয়ে বারিক তার কাহিনী বললে। দিউডু সব শুনল। রাগে তার কথা আটকে এল, শরীর টান হয়ে উঠল। টাঙ্গি টেনে নিয়ে কাছের ঠুঁটো গাছের গুঁড়ির উপরে সে দু'চার কোপ মারল, দাঁত কড়-মড় করতে করতে দুম দুম করে মাটিতে পা দাপিয়ে দাপিয়ে বার দুয়েক ঘোরাফেরা করল। তারপর কেবল বললে, "মদ আন্, খাব।"

বেশ করে খানিকটা মদ খেয়ে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে একেবারে গর্জন করে উঠল। চোখ ঘুরছে, মুখে ফেনা উঠেছে, পাগলের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল দিউডু সাঁওতা, সবাই এসে সেখানে জড় হল।

"কি! বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে 'উদুলিআ' উড়িয়ে নিয়ে চম্পট! ওই পুয়ু, ওই পুয়ুর গাঁয়ের লোক, মিটিং গাঁয়ের লোক। এক-দিনে কখনও এমনটা হতে পারে? 'উদুলিআ' নিয়ে যাবার আগে পটাবার জন্য কুটনী একজন চাই তো, সেই কুটনীর কাজ করছে পুয়ু—মিটমিটে পাজী! যেই আমরা এদিকে বেরিয়ে এসেছি, অমনি ওদিকে হয়তো খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল এসো এবার, কেউ নেই। আচ্ছা দাঁড়া—দেখাচ্ছি! লেঞ্জু কাকা তো ছিল, কি যে তার হয়েছে, দিন দিন ছেলেমানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে। দেখ দেখি তার কাণ্ড! আচ্ছা, দাঁড়া, দাঁড়া, মন্নমু (সবুর) গাড়াকা (একটু)। কি ঘরই আগলাচ্ছে বুড়ো, খিড়কির দিক দিয়ে ফাঁকি দিয়ে চম্পট। মান ইজ্জত সব গেল। হাগুর্ণা কি ভাববে? নিক সে 'সগর্তা' (ক্ষতিপূরণ), মিটিং-এর লোক গুনুক টাকা। ভারী জোচ্চোর ওরা, কোন জঙ্গলে গিয়ে লুকোবে, আর পণ দেবে না ক্ষতিপূরণ দেবেনা, কিচ্ছুনা। কে

পারবে ওদের সঙ্গে ? চল্ সবাই, ওঠ্। আগে মিটিং-এর রাস্তা ধরা যাক্—ডিঙাঁসিল ডম্রিপদরের পথে। টুণু হায়মুঁ—টুণু হায়মুঁ—"

সাঁওতার গর্জন শুনে সবাই চুপ করে রইল। বারিক বুড়ো বালদো পাতার মতো কাঁপছিল। কন্ধের রাগ পাহাড়ের আগুন, হঠাৎ কখনো ছুটকে আসে যদি তো দফা শেষ। সবাই গুম হয়ে বসে ছিল। বারিক বুড়ো নজর করে দেখছিল, বোঝবার চেষ্টা করছিল কি আছে এতগুলি মনের ভিতর। এমনি এরা চুপ মেরে বসে সবাই একই ধরনে ভাবে, একজন যেমন ভাবে সবাই তেমনি ভাবে। হয়তো সকলে এমনি সাঁওতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে উঠবে—'টুণু হায়মুঁ', উঠে পড়ে বেরিয়ে পড়বে এই রাতেই। কন্ধের প্রতিজ্ঞা আর হাতীর দাঁত কখনো পিছু হটতে জানে না। কিন্তু না বারিকের আশঙ্কা অমূলক দেখা গেল। সে আশঙ্কার বিরোধী জ্যোৎস্না রাত, কাছের কোনো ছাউনি থেকে বাঁশি আর ডুগুডুগুার ঐকতান আর মেয়েদের গলায় তার জবাবী গান। সাঁওতার রাগ কিছুক্ষণ হু হু করে চড়ে গিয়ে পড়ে এল, তাকে ঠেকো দিয়ে রাখবার কেউ নেই তার পিছনে। দিউডুর গর্জন শেষ হল, দলের ভিতর থেকে কে একজন উঠে নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে লাগল : এহ্বাতকি (কেন) ?

বারিক বুড়োর ভয় টুটল।

"কেন আমাদের তাতাচ্ছিস্, সাঁওতা ? কি দোষ হয়েছে কার যে আমাদের যেতে হবে কাউকে মারতে ? তোর খুশি তুই রাগারাগি করছিস্। আমাদের তো রাগ হচ্ছে না। যার যাকে মনে ধরেছে তার সঙ্গে চলে গেছে। মানুষ বিয়ে আর কেমন করে করে ? আমাদের না বলে চলে গেছে—সে ওদের যেমন ইচ্ছে, যেমন ওরা ভালো বুঝেছে। হাণ্ডর্গা সাঁওতার জন্য মেয়ের অভাব হবে না, আমাদের দেশে যার যত চাই মেয়ে আছে। তবু যদি সে রাগে তো রাগুক, কারো রাগ তো আমরা বন্ধ করতে পারি না। কিসের 'সগর্তা' কে দেবে ? বিয়ে করা কনে নাকি যে 'সগর্তা' দেবে ? চইত পরবে এমনি ছোকরা ছুকরীর মনে দেয়া-নেয়ার পরব লেগেছে। এমন সুন্দর দিনে তিনিফোলিআ (অনর্থক, বৃথা) আমরা যাব মদ খেয়ে মারামারি কাটাকাটি করতে ? লোকে কি বলবে ? অধিকারীরা কি বলবে ? না না, মাথা ঠাণ্ডা কর্ সাঁওতা। বিনা দোষে কিসের শাস্তি, বিনা

কারণে কিসের কোপ ?" অনেকে চেঁচিয়ে উঠল—"হাদ্দিগো (সাবাস্)—হাদ্দিগো, ঠিক ঠিক ! এবার মৌজ কর্ ! কোন গাঁয়ে যাবার কথা বলছিলি না সাঁওতা ? চল্, বন্দিকারেই চল্। ওরে ভাই, 'খারি' 'ফেলেনি কেউ ? জ্যোৎস্না রাতে হরিণ সম্বর নামে। আচ্ছা, কোনো আপত্তি নেই, চল্ বন্দিকার—"। দিউড়ু আনন্দে যোগ দিতে পারল না। তার মন থেকে শখ সাধ উড়ে গেছে। ফাঁকা মনটা সে রাগ আর অভিমান দিয়ে ভরে নিয়েছিল—পুবুলি তার দখল থেকে বেরিয়ে গেছে, হোক সে বোন, সে এখন পরের। তার দখলের বাইরে চলে গেল। নারী—নিজের সুখেই সে কেবল—। ভাইয়ের অধীনতা স্বীকার করল না, ছেলেবেলার এত স্নেহ, সম্বন্ধ, সব কোথায় উবে গেল, দু'দিন দেখা পর-লোকের মুখের দিকে চেয়ে। একবার জিজ্ঞাসা করে গেল না, অমনি চলে গেল। তার বুঝি সন্দেহ হল ভাই তার সুখের পথে কাঁটা, আপনা আপনি 'উদুলিআ' সে পালিয়ে গেল। দিউড়ুর অভিমানে বাজল : সে কেবল তো ভাই না, সে কন্ধ সাঁওতা। কিন্তু কি করবে সে ? দলের মত আর তার মত আলাদা। এরা ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে, বোঝবার চেষ্টা পর্যন্ত করছে না। নিরুপায় সে। দিউড়ু গুম হয়ে বসে রইল। রাতটা কাটলে সকালে সে তার মনের গর্জনকে প্রকাশ করবে।

ঘুম হল না। একটানা মন ভাবতে লেগেছে, সেই এক কথাই ভাবছে। চলে যাওয়া আর মরে যাওয়া একই রকমের। বোনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনো সে আপনা-আপনি বসে ভাবেনি। ঘর আর জীবনের সঙ্গে সেও ছিল একটি সহজ উপকরণ, মন ধরে নিয়েছিল সেও চিরন্তনী। কিন্তু আজ সে বিশ্বাস ছুটে গেছে, সে আসন টান মেরে কে সরিয়ে নিয়েছে হঠাৎ। অবশ্যম্ভাবী শোককে স্বীকার করতে গিয়ে দিউড়ু রাগ করছিল, নিজের আগুনিতে নিজেই পুড়ছিল, বাইরে তার জন্য কারও সহানুভূতি নেই। এত বড় দুঃখকে ভুলিয়ে দেবার মতো, উড়িয়ে দেবার মতো তার কিছু নেই। কেবল মদ, মদ, আরো মদ। অতিরিক্ত মদ খেয়ে দিউড়ু শুয়ে পড়ল। তারপর সে সব ভুলে গেল।

রাত্রি। কেবল কতকগুলি নিদ্রায় অচেতন দেহ। কারো কেবল লম্বা লম্বা নিশ্বাস, কারো নাক ডাকানি। গাল ফুলে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে,

মুখ দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে হাওয়া বেরুচ্ছে। কারো মুখের কষ বেয়ে লালা বয়ে আসছে। সাড়া নেই শব্দ নেই কতকগুলি মানুষের শরীর। আশ্রয় তার মাটি—যে-মাটিতে গোবর গাছ পাথর, দুনিয়ার এত ছাপান্ন কোটি জীবজন্তু। দেহ, আধা উলঙ্গ দেহ, এলোমেলো চুল, বড় বড় লোম—হনুমানের গায়ের মতো। তারি মধ্যে শুয়ে আছে, জেগে রয়েছে অজানা শক্তি, লুকিয়ে নেই তা। আর, কত ভাব, কত ভাবনা, কত ধারণা। সেইটুকু ছাড়া এত বড় শরীরটিতে নিজের কোনো প্রকারের আলো নেই। নিস্তেজ সে, জড় মৃত্তিকা। ঐ- ওটা দিউড়ু সাঁওতার দেহ। লম্বা লম্বা কতকগুলি খোঁটা, কতকগুলি পিণ্ড ; তার মধ্যে মন আছে, জীবন আছে, ঘুমে সব চুপচাপ। তার পরিসর মাত্র এইটুকু, এর বেশী নয় ; কিন্তু তার ভিতরে আছে যে-ধারণা যে-স্বপ্ন তার পরিসর দেখা যায় না, কোন দূর দিগন্তের ওপারে, আরও কোন দিগন্তের তটে তার আলোকচ্ছটা, সেইটুকুই চোখে পড়ে, তার ওদিকে আর সব আঁধারে আঁধারে—।

মদো ঘুমে মুখের কমনীয়তা নেই, ভিতরের আলো বাইরে এসে পড়ছে না, বাইরে কেবল আবরণের কঠোরতা,—একটা মানুষের অবয়ব, তার উপরে মৃত্যুর ছবি। এই খোলসের নীচে পৌরুষের ঈর্ষা, ক্রোধ, অনুরাগ,—পুয়ু, খাওয়া-দাওয়ার শেষে এঁটো পাতা, মদের খালি হাঁড়ি,—আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কলার খোসা, ভুট্টার ঠুঁটো ভুতুড়ি, জন্তুর হাড়। মনের 'কাউঁরি কাঠি' হারিয়ে গেছে, আর নেই যে এই খোলসকে স্পর্শ করে আবার দেবে যৌবন, দেখলে বিতৃষ্ণা আসে। সেই হাকিনা,—হাকিনা কেবল বংশধর,মায়ের একচেটে, পুরুষের বার্ধক্যের স্মারক, প্রতিদ্বন্দ্বী। কেবল অধিকার সত্বের জন্যই তার কথা ভাবতে হয়। হাকিনা আর পুয়ু—সামাজিক দায়িত্ব। পুবুলি—বোন, আপন দেহের একখণ্ড, আপন দেহের। কিন্তু সে নেই। নিজের বাগানের কলার কাঁদি, বড় হয়ে তৈরী হয়ে এসেছিল, অধিকারী কেটে নিয়ে গেল। পিওটি—সে যৌবনের একটা মূর্তিমান্ রূপ, বহুবার শুনলেও তার মুখের কথা শুনতে ভালো লাগে ; রোচে দেহ-মনের আজকের অবস্থায়। সোনাদেঈ —বাঁধা পথ ছেড়ে আঁধার ঝোরাকে মনে করিয়ে দেয়—যেখানে সমাজবন্ধন নেই,যেখানে মনের প্রেত আপন খুশি মতো বেরিয়ে যেমন খুশি ঘুরে বেড়ায়।

সেখানে ইচ্ছা হয় এদিক-ওদিক তাকিয়ে অদ্ভুত বেয়াড়া কিছু করতে, পা দুটো উপরে তুলে মাথা দিয়ে হাঁটতে, নাক দিয়ে জল খেতে। ভিতরে এমনি সব চলচ্চিত্র, টুকরো টুকরো হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তারও আরম্ভ আছে, শেষ আছে, মাঝখান আছে। সেখানেও সমাধান হয়, ধারণা ক্রমে এগিয়ে চলে, জাগ্রত অবস্থায় বাধা-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে উছলে পড়ে তার প্রকাশ প্রতিদিনের জীবনে। ভিতরে ভিতরে মনের গভীর তলে তলে জোয়ার চলেছে, বাহিরে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বাহির আর ভিতরের মাঝখানে কবাট বন্ধ, এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে যাওয়া-আসা নেই। ভিতরে কেবল গোনা-গুনতি চলেছে, হিসাব-কেতাব চলেছে কবে বাইরে থেকে কি এসেছিল সেই সবের। বাইরে দিউড়ু সাঁওতার ঘুমন্ত দেহ, শুধু একটা গাছের মতো, পাথরের মতো, সেখানে পুষু নেই, পুবুলি নেই, পিওটি নেই। কেবল ভন ভন মশা, বসে বসে রক্ত চুষছে।

চাঁদ আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছে। শাল গাছের ছায়া পড়েছে নিত্যিদিনের মতো, সেখানে সহানুভূতি নেই।

॥ আটান্ন ॥

সকালে উঠে দিউড়ু সাঁওতা দলের লোকদের ডেকে হাঁকল—"আজ গ্রামে ফিরে যেতে হবে, আর এখানে বসে থাকলে চলবে না।" ধাংড়ারা রাজি হয়ে গেল, সত্যিই হয়তো ওদিকে কত গাল দিচ্ছে গাঁয়ের ধাংড়ীরা, শিকারে নিয়ে যেতে গাঁয়ের লোক না থাকতেই না ভিন গাঁয়ের লোকের ভরসায় বেরিয়ে পড়ে একটি মেয়ে 'উড়ুলিআ' পালাল। চইতকে বিশ্বাস নেই।

একবার যেই স্থির হয়ে গেল গাঁয়ে ফেরা হবে কন্ধ ভাইদের মনে আর চিন্তা নেই। কিছু একটা স্থির করতে তার কেবল যা দেরি হয়, একবার তা হয়ে গেলে সে একমুখো।

ছাউনি উঠল। বনের ভিতর দিয়ে দিয়ে পথ—ঘাট-পাহাড়-ডিঙিয়ে। বন্দিকার আর কিছুদূর থাকতে একটা দু-চৌমাথা-ওলা পথ পড়ে, একটা

পাহাড়ের উপরে, আর কিছুটা পাহাড়ের নীচে সমতলের উপরে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে বন্দিকারের দিকে গেছে। দিউড়ু বলল, "চল এই নীচের পথে।"

"এমন গাঁয়ে গাঁয়ে থেমে থেমে গেলে নিজেদের গাঁ ধরব কখন সাঁওতা?"

একজন বলল, "না চল্ সোজা উপরের পথে।"

তর্ক আরম্ভ হল। আর একজন বলল, "কেবল বন্দিকার বন্দিকার করে কি হবে হে? যত সাধ-আহ্লাদ করবার সব তো হল, আর কি?"

"সে গাঁয়ে সকালবেলা কে আমাদের জন্য বসে আছে? কে আবার যায় সেখানে, অ্যাঁ? সবাই হয়তো গেছে ঝোরার ধারে।"

"এইখানে এই সোজা ঘাটটুকু উঠে না পড়ে ঘুর পথের ঘাটের চড়াই ভেঙে ওঠায় কি লাভ? সকাল বেলা, ঘামতেও হবে না।"

বন্দিকাবে যাওয়া হল না, দশ জনের মতের কাছে একজনের মত। দিউড়ু রাগ কবছিল, আবার তার মনে পড়ল যে তার মত না নিয়েই তার বোনের 'উড়ুলিআ' বিয়ে হয়ে গেছে। রাগেব মাথায় জোবে জোরে হাঁটতে লাগল। সব রাগ চুইয়ে চুইয়ে গিয়ে পড়ছিল পুযুর উপব।

"হুঁ, চলে আয়, আর পিছিয়ে পড়িস্ কেন?"

"তোর সঙ্গে দৌড়তে পারব না, সাঁওতা। ছেলেপিলের বাপ হযেও তুই জোয়ান মরদ হয়ে বয়েছিস্।" পথ চলায় কন্ধদের মশলা হাসি মসকরা। দিউড়ুর সে-সবে মন নেই, কোনো কিছুতেই মন নেই, আজকের সকালটা কোথায় যেন বিগড়ে গেছে, মাথাটাব পিছন দিকে কে যেন কেন্দরা (গুপিযন্ত্র) নিয়ে বাজাতে লেগেছে এক কাঁদনভরা সুর, নিরাশার গান। সব কিছু যেন ওলট-পালট হযে গেছে, সব কিছুতে বিফল সে।

গাঁয়ে পৌঁছেই প্রথমে দেখা লেঞ্জু কন্ধের সঙ্গে। দূর থেকে ধাংড়ার দল দেখে লেঞ্জু কন্ধ দমে গিয়েছিল। কাঁধে টাঙ্গি নিযে সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। কে যেন মস্করা করল—"পাহারা দিচ্ছে। খাঁ খাঁ রোদ, চুরি ডাকাতি হবে না তো?"

একদিকে ঝোরার ধারে নুয়ে পড়ে বালমুণ্ডা ডোমের স্ত্রী সোনাদেঈ জলে কলসী ডোবাচ্ছিল। দলের ভিতর থেকে বুড়ো বারিক চেঁচিয়ে বলল, "ও সোনাদেঈ, সব ভালো তো?"

"তুই এমনি সময়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলি বারিক, যদি কোনো অনিষ্ট হয়ে যেত?"

"বউ আছে বারিক, পালায় নি, দেখছিস্ না কে আগলাচ্ছে?"

দিউড়ুর আরো রাগ হল। লেঞ্জু কন্ধের হুঁশ হল অনর্থক এদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার গৌরবের হানি হবে। পিছন ফিরে লেঞ্জু চলে যাচ্ছিল, দিউড়ু চেঁচিয়ে ডাকলে—"লেঞ্জু কাকা—"

"হো—"

"আমার পুবুলির কি করলি, লেঞ্জু কাকা? পট্‌কার নিস্তা পিস্তা, বুড়ো কোথাকার!"

"কি বললি?" চোখ রাঙিয়ে টাঙ্গি মুঠো করে ধরে লেঞ্জুকাকা দুই পা এগিয়ে এল। "কি বললি? আর একবার বল্ দেখি! আর একবার বল্!"

"কি বললি!—কি বললি!" দিউড়ু মুখ ভেঙিয়ে বলল। "বলবে না, একে ডরাবে! নিস্তা পিস্তা পাগলা বুড়ো কোথাকার। তোর মনুষ্যত্ব থাকলে গাঁয়ের মুখে জুতো মেরে মেয়েকে টেনে নিয়ে যেত ভিন গাঁয়ের লোক? বলব না ছেড়ে দেব? তুই আমার কি কববি?"

লেঞ্জু কন্ধ রাগে পাগলের মতো হয়ে টাঙ্গি উঁচিয়ে দৌড়ে এল। ওদিক থেকে দিউড়ু এগিয়ে আসছে, মাঝের ঝোরাটুকু পার হলেই লেগে যাবে লোহার সঙ্গে চকমকি। দিউড়ুর সঙ্গী-সাথীরা দিউড়ু আর লেঞ্জু কন্ধের মুখের ভঙ্গী লক্ষ্য করতে পারে নি। তারা জানে মনে দুঃখ হলে এ রকমের ঝগড়াঝাঁটি অনেক হয়, আবার বোঝাবুঝি হয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্য করছিল আর এক জন, সে ঝোরার ওপারের সোনাদেঈ। মানুষের চোখে বাঘের চাউনি, তার অর্থ কেবল একটিই। লেঞ্জু কন্ধ কখনও এমন রাগে না, আর দিউড়ু সাঁওতার হাসিখুশী নরম মুখে দেখা যায় না অসহিষ্ণুতার এমন বিকট ভঙ্গী।

দু'জন দু'দিক থেকে এগিয়ে এল, রাগে অন্ধ দুই মানুষ-পশুর চোখের বিদ্যুৎ-শিখার কাটাকাটি হতে হতে। সোনাদেঈ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ কি তার হল, একটা চীৎকার ছেড়ে কলসীশুদ্ধ সে ঝোরার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। মুখ ফিরে তাকিয়ে দেখেই লেঞ্জু কন্ধ সে দিকে ছুটে গেল। চোখের সামনে ঐখানে সোনাদেঈ মরছে—মরছেই নিশ্চয়, নইলে এমন হঠাৎ আর

কিছু তো আসে না। কাঁধের টাঙ্গি কাঁধে ফিরিয়ে এনে লেঞ্জু দৌড়ে গিয়ে সোনাদেঈকে ধরে তুলল। সোনাদেঈ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। "কি হয়েছে—কি হয়েছে" বলে ঝোরার ওপার থেকে সবাই দৌড়ে এল। বুড়ো বারিক পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে। সোনাদেঈকে ঘিরে সকলে কোলাহল করছে, হাত পা ছুঁড়ছে। কেউ হাওয়া করছে, কেউ বলছে বনের ভিতর থেকে শিকড়বাকড়ের ওষুধ আনতে। সোনাদেঈ আশ্বস্ত হল। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় সামলে নিলে, চোখে সেই অজানা ভয়, কিন্তু ভয়ের কারণ সেখানে কিছু নেই—অতি কোমল ভাবে, অতি সযত্নে সবাই লেগে গিয়েছিল তাকে আরাম দিতে। নীরবে সে বাড়ি চলে গেল। বকবক করতে করতে পিছন পিছন তাকে যেন এগিয়ে দিতে সবাই তার সঙ্গে চলে গেল। আগে আগে লেঞ্জু কন্ধ, তার পিছনে বুড়ো বারিক। তার মুখে অজস্র প্রশ্ন, সোনাদেঈয়ের জবাব দেবার প্রবৃত্তি নেই।

হৈ চৈ সেরে ঘরে ফিরে দিউড়ু দেখল লেঞ্জুকাকা নেই। ভাবল, এমনি নির্লিপ্ত এই লোকটা! পুবুলি চলে গেছে, কি হল সে-বিষয়ে নিজের মুখে দুটো কথা বলতেও সে চায় না। ভাবল, এ দায়িত্ব নেবে না, কেবল ভাগ নেবে; কষ্ট করবে না, সমালোচনা করবে; দস্রু কুকুরও এর চেয়ে ঢের ভালো। সত্যি সত্যিই পথে দস্রুর সঙ্গে দেখা। এতদিন অদর্শনের পর তার মনিব ফিরেছে। দুই পা তুলে লেজ নাড়তে নাড়তে জিভ চাটতে চাটতে হাসতে হাসতে দস্রু কাছে এগিয়ে এল, পুরস্কার পেল কানমলা আর গালে প্রকাণ্ড এক থাপ্পড়। দিউড়ুর মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল। সকলকেই ঘরের সামনে আগ বাড়িয়ে নেবার জন্য পাগলের মতো আসছে কারো বোন কারো স্ত্রী, তার বেলা কেবল বুড়ো কুকুর। এত আস্পর্ধা বেড়ে গেছে কুকুর থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলের।

ঐ তার বাড়ি। আবার দুই জন, ফুলকি ছাড়ছে তার মনের রাগ। আজ পুয়ুকে সে পেটাবে, লেঙটা করে পেটাবে, সব গোলমালের জন্য দায়ী ঐ পুয়ু, নইলে তার বাপের বাড়ির লোক ফুসলে পটিয়ে অজানা অচেনা ধাংড়ীকে তুলে নিয়ে যায় কেমন করে, কেমন করে সুযোগ বুঝে আসে, গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা যখন থাকে না ঠিক সেই সময়ে?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পুয়ু অপেক্ষায়। কি রোগা দেখাচ্ছে

ওকে। দিউড়ুর চোখ তার সরু সরু হাত-পায়ের উপর একবার ঘুরে এসে গলার নীচে আটকে গেল, কেবল হাড় কয়খানি, কি রোগা হয়ে গেছে সত্যি পুয়ু! দিউড়ুর রাগ ক্রমে ক্রমে বিবেচনায় ফিরে এল, ভাবল এমন অবস্থায় পুয়ুর গায়ে সে হাত তুলবে না, পুয়ু তার মার সইতে পারবে না।

ভিতরে গিয়ে হাকিনাকে নিয়ে পুয়ু আবার বাইরে এল। ছেলেকে দোলা দিয়ে দিয়ে আদর করছে, ছেলে বাপকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। হাকিনাকে নিয়ে দাঁড়ালে তার মুখের দারিদ্র্য কতকটা কম দেখায়, ভাবল দিউড়ু। পুবুলি গিয়ে পুয়ু আছে। পুবুলি পর-গোত্রী, পুয়ু তার নিজের, আপনার। কি ভাবতে ভাবতে মন চলে গেল কোন দিকে। দিউড়ু রাগ করতে পারল না। স্ত্রীর উপরে দয়া হল। যে যেখানে চলে যাক গালি অবহেলা সয়ে পুয়ু তেমনি পড়ে আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে সামলে নিয়ে দিউড়ু পুয়ুর কাছে গেল। বলল, "তামাক পাতা থাকে তো একটু দে।"—অচেনা কন্ধ কন্ধনীদের সাধারণ পরিচয়ের ভাষা। তার কথা শুনে পুয়ু চমকে উঠে তাকাল। ভাবল কাজের বন্ধন থেকে দিন কয়েক ছুটি পেয়ে দিউড়ু মাঝের সব গোলমেলে ব্যাপার, সব মনোমালিন্য মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলেছে। দিউড়ু আবার বলল, "ধুঙ্গিআ আছে? দিবি? না আমি দেব?" পুয়ু হেসে ফেলল।

॥ উনষাট ॥

নিশুতি রাত। নিজের ঘরের বারান্দার উপরে চুরুট ধরিয়ে দিউড়ু সাঁওতা বসে আছে। পুয়ু রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। যাচ্ছে আসছে, পায়ের দুপ দুপ, হাতের বালার ঝুন ঝুন, ভিতরে রান্নাব শব্দ, ধোঁয়া। সামনে সারি সারি এক আড়ার লাগাও ঘরের বারান্দাগুলিতে খোপে খোপে আগুনের আলো, মাঝে মাঝে পড়শীর ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ। বারান্দার নীচে দরজার মুখ জুড়ে বসে দসরু কুকুর পাহারা শুরু করেছে। থেকে থেকে আস্তে আস্তে ডাকে, খানিকক্ষণ অন্তর একবার তেড়ে মেড়ে উঠে কার পিছনে যেন ছুটে

যায়, ফিরে এসে লেজ আছড়ায়। তারপর আবার তেমনি অন্ধকারের শান্তি, ঘরের আরাম!

এই পুরানো ছবি।

নুয়ে আসা চালের নীচে সঙ্কীর্ণ অন্ধকার মতো বারান্দায় বসে পরিচিত এই অনুভূতি—পিতৃপুরুষদের দিন থেকে চেনা খোলসটির মতো ঘুরে ঘুরে বেদম ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে গায়ে এইটি ঢাকা দিয়ে বসতে ভালো লাগে।

দিউড়ু সাঁওতা স্থির হয়ে বসে ছিল। তার মন কোথায় সে জানে না। সেখানে রাগ-রোষ নেই, আফশোস নেই, কি উল্লাস নেই। কেবল ক্লান্তি, ধীরে সুস্থে ধুঙ্গিআ টানতে টানতে চোখের পাতার উপর বোঝা বোঝা শীতল ঘুম নেমে আসে। কি নিথর এই অন্ধকার, গাছপালা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, নড়ন নেই চড়ন নেই। আকাশে আজ অনেক তারা, কাল খুব রোদ হবে বোধ হয়।

পুবুলি চলে গেছে। লেঞ্জুকাকার এ-পর্যন্ত দেখা নেই। লেঞ্জুকাকা—কোথা থেকে কোথায় গড়িয়েছিল রাগ, লাল টকটকে রাগ। এতখানি কখনো হয় না। যাক, যা হবার হবে। তার জন্য দিউড়ুর মন অস্থির হচ্ছিল না। সবই সহজ, মনের ভিতর থেকে থেকে সবই পুরানো। তার আর লেঞ্জুকাকার মধ্যে বনিবনাও হবে না। চক্ষুর আগোচরে কবে তাদের সম্বন্ধে ঘুণ ধরে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল, আজ দেখা হতেই মট্—যাক্।

মনের ভিতর থেকে বাইরের জিনিস যা কিছু একটি একটি করে অন্ধকারে চলে যাচ্ছিল যখন, তখন পিওটির কথা মনে পড়ছিল না। মনের নীচের তলায় কত নীচে রয়েছে সে। করুণ ভাব আর অবসাদ এক হয়ে মিলে মিশে গেছে। চেতনা থেকে অনুভূতি কোথায় হারিয়ে গেছে। কবে সে শিকার করতে বেরিয়েছিল? কেন এত বনে জঙ্গলে ঘোরা, এত জ্বালা যন্ত্রণা? দিউড়ু ভাবছিল সব নিষ্ফল, সব বৃথা, অনর্থক।

হাইয়ের উপর হাই উঠতে লাগল। ইচ্ছে হল পুবুলিকে ডাকে। খুব দুর্বলভাবে যেন স্মরণ হল পুবুলি নেই। না, পুবুলিকে সে ডাকবে না, থাক্।

কতক্ষণে দিউড়ুর মনে হল মুখের কাছে যেন আলো, কে তাকে ঠেলে ঠেলে জাগাচ্ছে, যেন সকাল হয়েছে। ঘুমও নিষ্ফল, ঘুমও নিষ্প্রয়োজন।

তেমনিভাবে ঝিমন্ত মন পিছন পানে ঝুঁকে ভাবতে লাগল—কে আবার যায় —কে পারে এত—ঘুমের আরামটা—

মুখের কাছে আলো নিয়ে পুবুলি জাগাচ্ছে—না না, পুয়ু জাগাচ্ছে— "কি—খাবেনা না কি? মাগো, কি ঘুম—"

"অ্যাঁ—অ্যাঁ। লেঞ্জুকাকা?—" বারান্দার নীচে নিথর হয়ে একতাল অন্ধকার বসে আছে। দিউড়ু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"লেঞ্জুকাকার খাওয়া হয়েছে?"

পাথরের উপর থেকে দস্যু কুকুর আবার কাকে তাড়া করে গেল, দিউড়ু হতাশ হল। পুয়ু বলল, "ওঠো, তুমি খেয়ে নাও তো। লেঞ্জুকাকা তো কই এল না এখন পর্যন্ত।"—আবার ক্লান্তি। দিউড়ু চোখ বুজল, দেওয়ালের দিকে ঢুলে পড়ল। ঠেলা দিয়ে দিয়ে পুয়ু তুলতে লাগল—"আবার ঘুমুচ্ছ যে? ওঠো, ওঠো, ছেলে একলাটি শুয়ে আছে যে, ওঠো না!"

ওদিক থেকে জামিরি কন্ধ একটা বড ঢেকুর তুলে বলল, "কিরে দিউড়ু, খেয়ে নিয়েছিস্?"

চমকে গিয়ে দিউড়ু উঠে দাঁড়াল। ভালো লাগছে না তবু খেতে হবে। পুয়ু ভারী খুশী হয়ে খাবার বাড়তে চলে গেল। দিউড়ু গম্ভীর হয়ে পিছনে পিছনে ভিতরে গেল। মনে পডছে অনেক কথা, মনে পডছে কথা ছিল সে পুয়ুর উপর রাগ করবে। কিন্তু রাগের পুঁজি সব ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে লেঞ্জুকাকা অন্ধকারে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, বেশু কন্ধ সুখে ঘর গেরস্থালি করছে, কোনো কাজ করবাব কি রাগ করবার প্রবৃত্তি দিউড়ুর ছিল না।

সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞেস করে বসল—"মিটিং গায়ের লোক কখন এসেছিল? আসবে বলে আগে থেকে কিছু বলেছিল? পুবুলি কিছু বলেছিল? এমন হঠাৎ পুবুলি চলে গেল যে? আগে থেকে কিছু বলেছিল নাকি?" যতই সে জেগে উঠতে লাগল ততই তার মনের অবস্থা ফিরে আসছিল, সেই রাগ, সেই অভিমান, সেই তেমনি কষা তেতো চিন্তা। কিন্তু সামনে ঐ যে হাকিনা, নির্দোষ গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে আছে, ভাত খাওয়াতে, সেবা যত্ন করতে পুয়ুর এত আদর আগ্রহ, মাটিতে পা পড়ছে না, মুখে ঝরনার মতোই কল কল করে উঠছে কত শুভেচ্ছা, কুশল প্রশ্ন। দিউড়ু তার

উপর রাগ করতে পারল না, "আমার বোনকে কেন উড়িয়ে দিলি" বলে চেলা কাঠ দিয়ে সেই রোগা পাতলা মুখে কষে এক ঘা লাগাতে হাত উঠল না। শান্তি আর অশান্তির মাঝে দুলতে দুলতে মুখ বিকৃত করতে করতে দিউড়ু তার সেবা যত্ন সয়ে গেল,—বাইরে কাঠের মতন।

"শুনছ, আর দুটি মাড়ুয়া ভাত দিই? অ্যাঁ, আর খাবে না? এইটুকুতেই পেট ভরে গেল? আর একটা কন্দ, আর দুটো শিয়ারি বিচি পোড়া?··· এইটুকু খেয়েই উঠে যাবে?"

আজ পুয়ু গায়ে পড়ে. আগ্রহ দেখাচ্ছে। সে যতই ব্যস্ত হচ্ছে ততই দিউড়ুর কেমন কেমন ঠেকছে। পুয়ুর মুখ খুলে গেছে আজ, গায়ে পাখা উঠেছে। কি, হয়েছে কি?

"নুন জলে পা ডোবালে না যে—ব্যথা করছে না? জল বসিয়েছি, দেব? খারাপ লাগছে? পা টিপে দিই? না, আমি পরে খাব। পা টিপে দিই, তুমি শোও।"

নিথর রাত্রি, বিকৃত রাত্রি। দিউড়ু বাইরে এল। খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা হয়েছে। ঘুম ভেঙে গেছে। মুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে। দেহের দুর্বলতার মোহ মনে নেই। দেহের বল বাড়তে বাড়তে মনের তেজ বাড়ছে। সে মনের কাছে পুয়ুর মূল্য কমে আসছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। গ্রাম নিস্তব্ধ। সবাই শুয়ে পড়েছে। কোথাও থেকে আলোর একটু আভা আসছে না। আজ হয়েছে কি? কোথায় গেল তার প্রতিজ্ঞা? আবার সে পুয়ুকে গ্রহণ করে নিয়েছে আগের মতো!

সব মনে পড়ল। পুয়ু—শুকনো, সিটকে, হাড়-বেরুনো, রুগ্ন মানুষ। তার চোখে আলো নেই, মুখে লাবণ্য নেই। পুয়ুর এই চেহারা যেন তার চোখে চিরকাল আঁকা হয়ে আছে, চোখে খোঁচা দেবার জন্য। সেই পুয়ুর সঙ্গে আবার মেলামেশা, আবার সন্ধি? বেশী আদর দেখাতে দেখাতে তার মুখটা কেমন যেন বেঁকে যায়, বীভৎস দেখায়। গায়ে ফোটে ওর হাড়, ঠাণ্ডা হাড়, নিজের তাত নিজেকেই ঝলসায়। এতদিন তো পুয়ু অন্য রকমের ছিল, আজ যে এমন গায়ে পড়ে ভোলাতে চাইছে। দিউড়ু ভাবল— স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই, হেরে গেলে এমনিভাবে ছলনা করে, পেখনা করে। সব বিরোধী চিন্তা মনের মধ্যে গুলে ঘেঁটে তাদের বলবান করে তুলে দিউড়ু

পুয়ুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। যতখানি সে ভাবল, নির্জনে ততখানি সে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বসল, ততখানিই যেন তার বিশ্বাস এল। তার সিদ্ধান্ত এই, সে তার হয়নি, পোড়া তরকারি পোড়া অঙ্গার হয়ে গেছে, আর তাকে শোধরাবার চেষ্টা করে লাভ কি?

ঘুম ভেঙে গেল, অপ্রাকৃত অনুভূতি কেটে গেলে। খেয়ে দেয়ে ধুঙ্গিআ টেনে নিশ্চিন্তে বারান্দায় বসে যতই সারা গায়ে কেমন গরম গরম লাগতে লাগল, ততই পুয়ুকে ছেড়ে বাইরের দিকে তার মন টানতে লাগল। এই নির্জন রাত্রি। সোনাদেঈ হয়তো ঘুমচ্ছে। হঠাৎ তার কি হয়েছিল তখন? ঠিক সময়টিতে এমন এক চীৎকার দিয়ে সে জলের ভিতর পড়ে গেল। সোনাদেঈ তার রায়ত, তার প্রজা। শুধু প্রজা নয়, তার সেবক, নিজের লোক, বুড়ো বারিকের ছেলের বউ। দিউড়ু মনে মনে নিজের নিন্দা করল: কেন সে সোনাদেঈয়ের ভালোমন্দের খোঁজ-খবর নিতে যায় নি। আজ বেশী রাত হয়ে গেছে। পুয়ু পাহারাওয়ালীর মতো। দিউড়ু ভাবল যে কালকে নিশ্চয়ই সে যাবে। তার পরে পিওটি,—পিওটি, ভাবলে কেবল ভালো লাগে তা নয়, বুকের ভিতর কোথায় যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, মন কেমন করে। পিওটির কথা মনে হতে আবার রাগ হতে থাকে—পুবুলি—দায়িত্বসূত্রে লেঞ্জুকাকা। লেঞ্জুকাকা যেখানে ইচ্ছে যাক আসুক না তাতে কারও কিছু বলবার নেই। দিউড়ু ভাবল লেঞ্জুকাকা এমন অকর্মা হয়ে যাচ্ছে যে সে বুড়ো মানুষ হলেও তাকে শাসন করা, ধমক দেওয়া দরকার। নিজের আচরণের জন্য তার বিন্দুমাত্র দুঃখ হল না। পিওটির স্মৃতির দরুণ তার যে আনন্দ সেই আনন্দ নষ্ট হবার হেতু পুবুলির 'উদুলিআ' বিবাহ। অতএব দায়িত্ব পরের—দোষ পরের। ভাবতে ভাবতে বৈরাগ্য এল। এ সংসারে জন্মেছে সে, কিন্তু কেউ তার আপন নয়, কেউ তার সহায় নেই, কারু উপর ভরসা নেই, সকলেই বিরোধী, সকলেই আছে কেবল হাঙ্গামা বাধাতে, তার জীবনকে দুর্বহ করে তুলতে। কোথাও শান্তি নেই। এই অন্ধকার রাতে মনে পড়ল মাকে, মনে পড়ল বাপকে। থাকত যদি তারা, লেঞ্জুকাকার উপরে, পুয়ুর উপরে নির্ভর করতে হত না। তারা থাকলে হয়তো সব ঠিক থাকত।

কেবল রাশি রাশি তারা, কেবল ঝাপসা অন্ধকার, বিভিন্ন জাতের পর্

পর সাজানো মেঘের মতো, ধোঁয়ার মতো। সবাই হয়তো ঘুমচ্ছে। কেবল ভূত প্রেত, জন্ম না নেওয়া 'ডুমা' আর অন্ধকার—ভিতরে বাহিরে। দিউড়ু সাঁওতার অশান্ত মন গুমরে উঠছিল।

কাজকর্ম সেরে পুয়ু ডাকল, "বসে আছো যে—ঘুম পাচ্ছে না?" মস্করা করার মতো পাতলা অন্ধকারে তার দু' পাটি দাঁত দেখা গেল যেন। পুয়ু বলল, "শরীরে সইবে না, শুয়ে পড়ো!"

"হুঁ" বলে দিউড়ু কলে চলার মতো অন্যমনস্ক ভাবে গুটি গুটি ঘরের ভিতর শুতে চলে গেল।

সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল স্বপ্ন অনুভূতির জীবন—সঙ্কেতে, ইশারায়।

॥ ষাট ॥

সকালে ছেলেটার অপ্রীতিকর কান্নায় ঘুম ভাঙল। কেবল তার কান্না নয়, কানের কাছে কে যেন গোপনে কি বলছে। আধ ঘুমে মনে হচ্ছিল যেন কে খবর এনেছে রাত্রে সোনাদেঈ মারা গেছে—মারা গেছে—চমকে উঠে মনে মনেই আহা উহু করতে করতে এর জবাব কি দেবে ভাবছে, এমন সময় এই অপ্রীতিকর বাধা। দাড়ি গজিয়ে গেছে, চোখ দুটো লাল লাল, ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে দিউড়ু বলল, "অ্যাঁ, কি বলছিস?"

"পাড়ার লোকেরা সবাই বলাবলি করছে যে লেঞ্জুকাকা নাকি গাছতলায় বসে বসে কাঁদছেন. তুমি তাঁকে কি গালমন্দ করেছ। সবাই বলছে লেঞ্জুকাকা নাকি অভিশাপ দিচ্ছেন, বলছেন ভাই মরে যাওয়াতে তুমি তাঁকে হতাদর করেছ—" পুয়ু এমনি বলে চলেছে। আবার আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস করে বলল, "লেঞ্জুকাকা নাকি ভিন্ন হয়ে যাবেন বলছেন। ছি ছি এটা কি রকম হল—কি তাঁকে বলে এসেছ? শুয়ে আছো কি? ঘর জলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, শত্তুরে হাসাহাসি করছে। ওঠো, যাও, একটু দেখো—"

"অ্যাঁ, কি বললি ?"

"তুমি একটু যাও, তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে নিয়ে এসো। পরের কথা পরে। যাই হোক, তোমার কাকা তো। রাগের মাথায় কি বলে ফেলেছ হয়তো, তিনি রাগ করেছেন। যাও বাতি (ক্ষমা) চেয়ে তাঁকে নিয়ে এসো। যাচ্ছ— ?"

এ কি বলছে ? দিউডুর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। হারিয়ে যাওয়া রাত্রির সব কোমলতা মন থেকে মুছে গেল। দিনের আলো হয়েছে, সে কাল সকালে যে দিউডু ছিল আজ সকালে আবার সেই। এ যে পুয়ু ছিল সেই পুয়ু, পরিবর্তন নেই। কি বলছে এ ? হতশ্রী, অপ্রিয়-বাদিনী নরকঙ্কাল ! বাতি চাইতে যাবে সে—দিউডু সাঁওতা ? আবার সব কথা ঘুরপাক খেয়ে ফিরে এল, যেন এই এখনই সে আর লেঙ্গু কাকার মধ্যে ঝগড়া চলছে, লেঙ্গু কন্ধ তাকে গাল দিয়েছে আর তার পালটা শোধ তোলবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। গর্জে উঠে পুয়ুর দিকে এগিয়ে গিয়ে চীৎকার ছাড়লে—"কি বললি ? আমি যাব ক্ষমা চাইতে ? গণ্ডা পট্‌কার দুষ্টু লোক সব, তুই আর তোর লেঙ্গু কাকা মিলে আমি না থাকাতে আমার বোনকে ঘর থেকে ভাগিয়ে দিলি, উড়িয়ে দিলি। লজ্জা নেই, আবার কথা বলছিস্ ?"

পুয়ু কাঠ হয়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বলল, "তাহলে তুমি যাবে না ? তাহলে সত্যি সত্যি লেঙ্গু কাকা আমাদের থেকে ভিন্ন হয়ে যাবে ? তার দীর্ঘশ্বাস পড়বে আমার হাকিনার উপরে ? আমায় মারতে হয় মারো, তুমি যাও—যাও—"

"আবার—আবার— ?" দিউডু হাত উঁচিয়ে পুয়ুর দিকে ধেয়ে গেল। "ফের অমনি বলেছিস কি তোকে ঠিক বানিয়ে দেব বলে দিচ্ছি—" রাগে গজ গজ করতে করতে দিউডু গাঁয়ের ভিতর চলে গেল—গাল দিতে দিতে। পুয়ু সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, তার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। দিউডুর আজ এ কি ভীম মূর্তি ! এ এক দিনের নয়, কতদিন ধরে বেড়ে ওঠা 'সাঠি' সাপ যেন জলের ভিতর থেকে তার লেজ তুলেছে উপরে, তার কবলে যে পড়বে তাকে ঝাপটা মেরে টেনে নিয়ে চোখ ফুটো করে খেয়ে ফেলবে। সেই রকমই এর মনের চেহারা।

পুযুর মনে ধাঁধা লাগল, গতরাত্রির ব্যবহারের সঙ্গে এর একটুও মিল নেই। তাহলে কি তার বিশ্বাস ভুল? দিউড়ু আর তার হবে না। চোখের অশ্রুধারা বেড়ে চলে।

এই আজ সকাল হয়েছে, প্রথম থেকেই—

দিউড়ু সাঁওতা গর্জন করতে করতে গাঁয়ের ভিতরে গেল। ঘুমটা পুরো না হতে ভেঙেছে, সকাল বেলাই আবার এই খোঁচানি, সারাটা দিন তো পড়েই আছে। সত্যি সত্যি লেঞ্জুকাকা গোল-সাগুগাছের তলায় বসে আছে, গাঁয়ের বুড়োরা তাকে ঘিরে বসে আছে, কথাবার্তা হচ্ছে, সবাই গম্ভীর। দিউড়ু বকতে বকতে কাছে আসতে সবাই গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল, দু'পক্ষের চেঁচামেচি থেমে গেল। বুড়োদের স্থির দৃষ্টি আর আতঙ্কিত চেহারার সামনে দিউড়ু তার ঔদ্ধত্যের দম্ভ রক্ষা করতে পারল না, এতটুকু হয়ে গেল।

বুড়ো জাম্বা কন্ধ ধীরে ধীরে বলল, "এসেছিস ভালো করেছিস সাঁওতা। পঞ্চায়েত হবে কিনা, এখনি তোকে ডেকে পাঠাতাম আমরা।"

দিউড়ু বলল, "ভালোই ভালোই, পঞ্চায়েতে ফেল, কত কথা বলবার আছে। গাঁ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে মানুষের বাইরে একটু পা বাড়াবার উপায় নেই, পিছন ফিরলেই মানুষ যাদের উপর ভরসা করে ঘর আগলাতে দিয়ে গেছে, সে মদ খেয়ে গড়াগড়ি যাবে, সব উজাড়। ক্ষেতের কাজে পাঠাও, যা কিছুই আবাদ করতে দাও, নিজে না থাকলে সব তাতে ঢিলেমি। ভালোয় মন্দয় যদি একটা কথা বলে ফেলেছি আর যাব কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে হানব কাটব এমনি কথা। মিছামিছি রাগারাগি, মিছামিছি অভিমান। কে কত সহ্য করবে? কে কত একে চালাবে তোমরাই বলো। পঞ্চায়েত করে এর একটা নিস্পত্তি করেই দাও তোমরা, বরাবরই কেন অশান্তি লেগে থাকবে?"

লেঞ্জু বলল, "শুনছ? শুনছ?"

কেউ কিছু বলল না, তেমনি চুপ করে দিউড়ুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দিউড়ু দমে গেল; এখন তার মনে মনে একটু ভয় হল যে হয়তো বা সে কিসের থেকে কি বলে ফেলেছে, যা বলবার নয় তাই হয়তো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। মুখ শুকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

সকলের এই অস্বাভাবিক মৌন ভাব দেখে লেঞ্জু কন্ধও কিছু বলতে ভরসা পেল না। তার রাগ মিইয়ে এল।

জাম্বা কন্ধ আবার কথা শুরু করল, "তাহলে এখানে কেন? চলো গ্রামের 'ভেরামণে' যাই, সেইখানেই সব কথা হবে।"

হৈ হৈ করে সবাই উঠে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে লেঞ্জু আর দিউড়ু চুপচাপ মাথা নিচু করে চলল, কারও মুখে কথা নেই, দুজনেই যেন অনুভব করতে লাগল যে সেই দোষী, গাঁয়ের লোকের দলবলের সামনে কোন কথা কিসে এসে দাঁড়িয়েছে, 'ঝিমিটি (কপাটি) খেলতে মহাভারত'[১]। দুজনেই এখন ভাবছে, "পঞ্চায়েত বসবে? কেন বসবে? কে বসাচ্ছে পঞ্চায়েত, কার কি দোষ?"

পথে যেতে যেতে জাম্বা আবার কথা পাড়ল, "বাস্তবিক, খুড়ো-ভাইপো দুজনের এমনি মারামারি হয়ে অশান্তি অসন্তোষ, কারো সঙ্গে কারো মন মিলছে না, দিন দিন, দিন দিন ঝগড়া বেড়েই চলেছে। সরবু সাঁওতা যদি থাকত, তাও তো নেই। এমনি দুজন দুজনের ছায়া দেখলেই লাফিয়ে উঠবে আর আমরা গাঁয়ের লোকেরা কেবল দেখতে থাকব? না, এ হতে পারে না। আজ যখন বিষয়টা উঠেই পড়েছে তখন হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়াই ভালো, চির-কালের মতো মিটে যাবে। না, কি বলো ভাই?"

ক্রমে ক্রমে দিউড়ু রেগে উঠছিল। তার কাকা, তার ঘর, তার উপরে এত রকমের নালিশ চাপিয়ে, ঢোল বাজিয়ে বিচার করবার এরা কে? হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"গণ্ডা পট্টকার—খবরদার, হুঁশিয়ার, বড় বেশী বকে যাচ্ছিস তুই। ভারী ভালোমানুষি জাহির করছিস তুই জাম্বা কন্ধ, না? ইচ্ছে থাকে তো চুপটি করে বসে আমাদের শাসন মেনে এ গাঁয়ে থাক, নয় তো দূর করে দিচ্ছি—যা তোর যেখানে খুশি—"

হাঁ হাঁ করে সকলে দিউড়ুকে ঘিরে দাঁড়াল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে বুড়োদের মনে আশঙ্কাও হল: দু' ঘা বসিয়েই দেয় নাকি! কারও কথা শোনে না, মানে না, রাগী মানুষ, কি ঠিক আছে ওর।

"বেরিয়ে যা, জাম্বা কন্ধ। আমি সাঁওতা না তুই? এতই তোর বাড়

১ ওড়িআ প্রবাদ।

বেড়েছে যে আমার ঘরের কথা নিয়ে তুই পঞ্চায়েত করবি? কে তোকে পঞ্চায়েত মেনেছে—কে?"

"রাগিস্ কেন সাঁওতা? আমি তো আগে থাকতেই বলছিলুম, তাই নয় ভাই সব? বলিনি? আমাদের গ্রামের সাঁওতা সে, ছোকরা হোক কি বুড়োই হোক, আমরা তার অধীন রায়ত। যদি তার সম্বন্ধে পঞ্চায়েত ডাকতেই হয় তাহলে আমাদের রায়তদের দিয়ে হবে না, পাড়াপড়শী সাত-খানা গাঁয়ের সাঁওতা, বড় বড় রায়ত এদের ডাকো। আমাদের মাথায় এ--বোঝা কে চাপালে, কে বললে আমাদের গালাগালি খেতে না কি বলো হে?"

"পঞ্চায়েত করছে"—দিউড়ু খেঁকাচ্ছিল, "খুন হয়েছে না চুরি হয়েছে যে পঞ্চায়েত বসবে? সব এই লেঞ্জুকাকার ফিকির, বুড়ো হয়ে বুদ্ধি পাকছে—"

দিউড়ুর গর্জনে লেঞ্জুর গর্জন মিশে গেল। গালাগালি খেয়ে বুড়োরা এক পাশে সরে গেল। এই সময়ে ছেলে কোলে, চুল ফুরফুর করে উড়ছে কে দৌড়তে দৌড়তে সেখানে এল, লেঞ্জু কন্ধের হাত ধরে টেনে বলল, "ও তো অমনি, কেন ওর সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই অমনি হবে? চলো লেঞ্জুকাকা, ঘরে চলো।" সবাই চমকে উঠল—পুয়ু। হাকিনা ভ্যাঁ করে উঠল। লেঞ্জু-কাকাকে জবাব দেবার অবসর না দিয়েই পুয়ু তাকে টেনে নিয়ে চলল—"এসো, এসো, খোকা কাঁদছে। আগে তোমাকে খাইয়ে দিয়ে তারপর একে দেখব। কার উপর তুমি অভিমান করছ? ও কি মানুষ?" পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দিউড়ুকে বকুনি দিতে দিতে সামনের দিকে পা ফেলতে ফেলতে লেঞ্জু কন্ধ ঘরে চলল। এখন আর সে পঞ্চায়েতের জন্য খোশামোদ করবার লোক নয়, এবার সে লেঞ্জুকাকা। দিউড়ুর জবাব তার মুখেই আটকে রইল, লেঞ্জুকাকার মেজাজের সামনে মাথা নুইয়ে গর গর করতে করতে দিউড়ু পিছিয়ে পিছিয়ে রইল।

সমাধান আপনা আপনিই হয়ে গেছে, এখন আর মর্যাদাহানির ভয় নেই; কিন্তু দিউড়ু মনে মনে খুশী হল না, তেমনি অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল লেঞ্জু আর পুয়ুর চলে যাওয়ার পথের দিকে। সংসার—সংসার এমনিই বটে! সে কেবল হার মেনে মেনে পিছিয়ে পিছিয়ে যেতে থাকবে, আর সকলে জোট

বাঁধতে থাকবে, সুখে গেরস্থালি করতে থাকবে। সব কিছুতে সে থাকলেও কারো উপরে তার এখতিয়ার নেই। লেঙ্গুকাকা তার অভিমানকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে, তাকে হারিয়ে দিয়ে তার ভাইয়ের বাড়ি চলে গেল। লোকের দয়া তার উপরেই হবে, তাকেই সাহায্য করবে, দিউড়ু সাঁওতা হয়েও বাইরে বাইরেই। লেঙ্গুকাকা তাকে পরাজয় দিয়ে গেল, শেষে লেঙ্গুকাকাকে বল দিয়ে গেল তার নিজের স্ত্রী পুয়ু!

একই জায়গায় এদিক-ওদিক করতে সেই দুজনের উদ্দেশে দিউড়ু মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করছিল, এমন সময় পাণ্ড্রু জানী এল। দিউড়ুর কাঁধ চাপড়ে পিঠ চাপড়ে বলল, "বাঃ বাঃ!"

তেমন গরগরিয়ে উঠে মাথায় চুল ঝাড়া দিয়ে দিউড়ু পাণ্ড্রু কন্ধের দিকে মুখ ফেরালে। সে মুখে রাগ, বিকট মূর্তি রাগ, বিশ্বসংসার পোড়ানো রাগের আগুন। পাণ্ড্রু কন্ধ অন্যমনস্ক ছিল, দিউড়ুর রাগ তাকে ছুঁল না। মনের খুশিতেই সে কথা বলে যাচ্ছিল—"বাঃ বাঃ! আমি তাই দেখছি। রাগ কর্ ঝগড়া কর্ যাই কর্ ঠিক সরবু সাঁওতার বেটা তুই, আর সেও ঠিক তারই ভাই! এমনি সময়ে সাঁওতা যা করত, যেমন করে করত, তোরা ঠিক তেমনি করেছিস্। সত্যি কথাই, নিজের ঘর নিজেকেই সামলাতে হয়, মারামারিই কর কি গালাগালিই কর, নিজেদের ব্যাপার নিজেদেরই বোঝা উচিত, এর মধ্যে পর কেন? তাকে মুখ খুলতে দিলেই মুখ বেড়ে যাবে, তারা কেন?"

তার হিতোপদেশ দিউড়ুর কানে ঢুকল না, সে বলল, "দেখছিস্ তো এদের ব্যাপার—"

পাণ্ড্রু ডিসারী বলে চলল, "এমনি ভাবেই সেও রাগত—সরবু সাঁওতা, এমনিই দেখাত তার মুখ তখন। বাঃ বাঃ, কেমন একেবারে মিলে যায় সে মুখের আদল—"

শূন্যের দিকে তাকিয়ে পাণ্ড্রু ডিসারী বলে উঠল—"সরবু সাঁওতা—সরবু সাঁওতা—"

বাপের নাম শুনে দিউড়ুর তেরিয়া মেজাজ আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল। আস্তে আস্তে তার সাঁওতাপনার পিঠ কুঁজো হয়ে গেল। তার বাপ আজ নেই, কিন্তু তার নাম আছে, সেই নামেই আসে তার স্মৃতি, দিউড়ু নিজের আসনে নেমে যায়।

ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না, সেখানে আবার সেই অপ্রীতিকর তুফান। সেখানে লেঙ্গু, পুয়ু। জোর খাটালে অনর্থ ঘটবে। গ্রাম থেকে গুটি গুটি দিউড়ু জঙ্গলের দিকে চলল।

জঙ্গল শুকিয়ে খালি হয়ে গেছে, মুখের উপর রোদ।

জঙ্গল আগুন লাগানোর অপেক্ষায় রয়েছে। পরব শেষ হয়ে এল, এবার নতুন করে কাজ শুরু হবে। এ-বছর আগে এই বন কেটেই আগুন লাগানো হবে এমনি কথা ছিল। টিপির উপরে উঠে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল। সব চুপচাপ। দূরে কোথাও 'কুর্‌রি' পাখী ডেকে উঠল কুর্‌র্‌ কুর্‌র্‌, বারবার—বারবার।

কিছু হারিয়ে গেছে? কোথাও চলে গেছে? আত্মহারা হয়ে পাখী খুঁজছে—সেই এক ভাবে। শাল গাছের কাঁধে লম্বা মৌচাক ঝুলছে। গাছের ছায়া এখনও কিছু কিছু আছে। তলায় ঝোরা আর লুকিয়ে নেই কল কল করে বয়ে যাচ্ছে। আর কোনো জন্তু-জানোয়ারের শব্দ নেই, কেবল কত দূরে ঐ পাখাটা। একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা সুর ধরল। হঠাৎ দিউড়ু সাঁওতা ভাবল এত চাষ-বাস, এত বন মারা এ-সব দিয়ে কি হবে? কার জন্য এ-সব? কে কার? বলবার বেলা সবাই আছে, সইবার বেলা কেউ নেই। ভারী ক্লান্ত লাগল। সংসারের উপর অভিমান করে নিজের উপর তার দয়া হল, সেইখানে ছায়ার তলায় তার লেংটিপরা দেহকে এলিয়ে দিয়ে নিজের মনকে সে বলল, কেউ কারো নয়, তবে আর এত সব কার জন্য? বলবার জন্য তো সবাই মুখিয়ে আছে, সইবার কেউ নয়।

সব বৃথা।

আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়ল, শরীর ক্লান্ত ছিল তার।

॥ একষট্টি ॥

পরব শেষ হয়ে এসেছে। ক্ষণিক মোহ-আবেশের শেষে সৃজনের কল্পনা। সৃষ্টি আর স্থিতি। আমগাছে মুকুল ধরেছে, কচি কচি আমের গুটি হয়েছে। বনে বনে এখানে-ওখানে ফুলের বোঁটায় শক্ত শক্ত গুটি, রোদ বাতাস সয়ে সে-সব বড় হবে। দু'দিনের রঙিন কচি পাতার চমক-লাগানো শোভার পরিবর্তে নিত্যকার চেনা সবল সবুজ সবদিনের।

চইত 'ডোক্রী' (বিবাহিতা স্ত্রী) হয়েছে, এবার তার রূপ আর চইত নয়।

এক দিনের হাটবারের কুঞ্জসঙ্গিনী তার আপন পথে চলে যাওয়ার পর ঘরের সংস্থিতিবতী বিবাহিতা স্ত্রী স্মরণে আসার মতো পরবের আনন্দ ফুর্তির শেষ দিকে জমির চিন্তা। নাবাল জমি গভীর ঘুমে পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে, সেখানে ফালা ফালা ফাটল, সন্ সন্ বাতাস, যত এলো-থেলো ঘাস লতাপাতার জঙ্গল : বেনা, দ্রোণপুষ্প, টনকো লালচে কালো গুটি গুটি ফুল। নাবাল জমিতে লাঙ্গল চেপে ধরে চাষ করতে হবে।

তবু সে-দিন রাত্রে বন্দিকার গ্রামে পরব চলছিল। চাঁদের আলো নেই, আগুনের চারিদিকে নাচ, বাজনা, গান। মাঝে মাঝে থেমে যায়, মদ খাওয়া চলে। লোকের ভিড় নেই। আবার এক দল আসে, নাচ গান আবার একটু জমে ওঠে।

পিওটি বসে বসে নাচ দেখছিল। পিওটির মা বুড়ীদের সঙ্গে সমা-লোচনায় ব্যস্ত ছিল। বড় ঢোল বাজছে। শলপু কন্ধ তার বয়স ভুলে মদ খেয়ে যোদ্ধার নাচ নাচছে। হাতে বন্দুক নেই তলোয়ার নেই, তার বদলে কেবল একখানি কাঁচা ডাল। তাই নিয়েই প্রাচীন পদ্ধতি স্মরণ করে বুড়ো শলপু কন্ধ চোখের তারা ঘুরিয়ে তলোয়ারের কায়দা খেলাচ্ছে শূন্যে খোঁচা মারছে। তার প্রেরণা যোগাচ্ছে চারি পাশ থেকে গোষ্ঠীর কোলাহল, আর সামনে লাল আগুনের আঁচ।

সেই তিন হাজার ফুট উঁচু মালের উপরে কন্ধের যুদ্ধের নাচ। চারিদিকে গোল হয়ে গেছে পাহাড়, দৃষ্টি তার বেষ্টনে বন্দী, কন্ধের ধারণায় তার ঐ পাহাড়ী পাথুরে জায়গাটুকুতে যোদ্ধা সেই, মনুষ্য সমাজের সমাজ-পতি। বাহিরের জগতে এত কলরব, মানুষ মারবার এত রকম কারবাই, এত সাজ-সজ্জা, সে-সব তার গোষ্ঠীর ধারার মধ্যে ঢুকে তার বিশ্বাস আর স্বপ্নকে উড়িয়ে নেয় নি। শলপু কন্ধের মাথায়-ঘোর-লাগানো নাচে দর্শকদের রক্ত গরম হয়ে উঠছিল, বাজনার গতি বেড়ে উঠছিল, হৈ চৈ বেড়ে যাচ্ছিল।

পরিস্থিতির বশে মানুষের চিন্তা কেমন বাঁক ঘুরে উগ্র হয়ে ওঠে। বুড়ীদেব মহলে আলোচনা হচ্ছিল পরবের শেষ দিকে যে-সব ছোট ছোট অধিকারীরা এসেছিল তাদের সম্বন্ধে। আমিনের দল গেল, 'রিবিনি'র দল এল। তারা গেল, তখন আবার 'ফারস্টি'র দল। এ ছাড়া 'সালুটু গিলুটু', পেয়াদা চাপরাশী পালে পালে, কাউকে অসন্তুষ্ট করবার সাহস নেই মানুষের। চাষ-বাস হবে, সে-সব ফসল যাবে কোথায়, খাবে কে; ফলবে কলা, কাটবে কে। এত পরিশ্রম করে বনের মধ্যে উজাড় করা রাজ্যে এত রকমের যে ফসল পরকে খাইয়ে খুইয়ে কতটুকু তার বাঁচবে। মুরগী ডিম দিচ্ছে, কিন্তু কার জন্য? কার জন্য ছাগল বাচ্ছা বিয়োচ্ছে? ঝাঁপ মেরে এসে লোকেরা নিয়ে যাবার পর বুড়ীদের কেবল এক সঙ্গে বসে 'গেল গেল' ডাক ছাড়া।

সেই নাচের বাজনায় মনের ছাই চাপা আগুন জ্বলে থাকে—যত রকমের বিদ্রোহ, অভিমান। পুরুষদের দলে জমি নিয়ে ঝগড়ার আলোচনা হচ্ছে। কেমন কল কায়দা করে তাদের গ্রামের 'গুড়া' অন্য গাঁয়ের সামিল করে দেওয়া হয়েছে, নিষ্কর জমির উপরে কোন অধিকারী খাজনা আদায় করতে লেগেছে, ইত্যাদি।

এই গল্পগুজব আর গোলমালের মধ্যে বোঁচকা-বুঁচকি পিঠে বেঁধে কাছের এক গাঁয়ের এক দল ডোম সেখানে এসে বসল। সোভেনা শুধোলে—"এত রাত্রে কার মাথায় বাড়ি মেরে ফিরছিস্ রে তোরা?"

"কিসের বাড়ি মারা সাঁওতা,—মহা শনির দৃষ্টি পড়েছে আজ আমাদের উপর, আর বাড়ি মারব কি?"

"কি হয়েছে রে চুঞ্চেই? এতক্ষণ তোরা ছিলি কোথায়?"

"হাট থেকে নিজেদের পথ ধরে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলাম। তিতি ঝোলা গাঁয়ের কাছে আমিনের লোকেরা ধরল, বলল আমিন আসবে, এই ঝোরার কাছে 'বাল্‌সা' (পাতার কুড়ে) একখানা তৈরি করে দে, যা ডালপালা কেটে নিয়ে আয়, জায়গা চেঁচে সাফ কর্। বললাম, বাবু কাছে খাবার কিছু নেই, যেতে হবে দূরের পথ, আর কি লোক মিলবে না, আমাদের কেন? তা সেই যে গুঁফো, পাইকদের সর্দার, সে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এল, বলল—হট্ হট্, কাঁধের ও কাঠের গাঁঠরি নামা, রাখ্ ওখানে। কাজ না করে যাবি কোথায়? তা কাজে লাগলাম। কাজ-সারতে সূর্য মাথার উপব উঠল, খাওয়া নেই দাওয়া নেই। সেখান থেকে রেহাই পেয়ে অর্ধেক পথ এসেছি, ধরল এক অধিকারী, কি আর বলব। বলল—চল্, এই বোঝা নিয়ে চল্ অর্ধেক পথ, এই জঙ্গলের পথটা পার করিয়ে দে। আবার তার সঙ্গে গেলাম। সুয্যি পাটে বসল। তারপর মিণিআপায়ু গাঁয়ে একটু থেকে গেলাম বারিকের ঘরে। ভাবলাম আজ কার মুখ দেখে হাট থেকে বেরিয়েছিলাম যে দিকে যাই খালি অধিকারী, খালি বোঝা ব, 'বালসা' বাঁধ্ এমনি সব কাজ। তা সে বেলা থাকলে তবে তো। তাই ভাবলাম সন্ধ্যে হয়ে যাক্, আর লোক দেখতে পাওয়া যায় না এমনি হলে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে যাওয়া যাবে।"

"তাই নাকি, তোরা মিণিআপায়ু গিয়েছিলি? পথে অধিকারীদের সঙ্গে দেখা হল? কি খবর সব বল্ তো—।"

পাঁচ-সাত জন কাছে সরে এল। এই ঘোর বনের মধ্যেও লোকেদের খবর শোনবার আগ্রহ খুব। বাইরের খবর, অন্য মানুষের খবর, মানুষ—পরস্পরের সঙ্গে বাঁধাবাঁধি জড়াজড়ি এক সুতোয়।

কাক-বার্তার মতো বার্তা বয়ে বয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এ গাঁ ও গাঁ ছোট ছোট বেপারীরা ঘুরে বেড়ায়, যত পুরানো হোক, যত নতুন হোক তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে আলোচনা করে বনের মানুষ।

কথায় কথায় মিণিআপায়ুর কথা উঠল, খবর পাওয়া গেল সাঁওতার বোন মিটিং গাঁয়ের বেগু কন্ধের সঙ্গে 'উডুলিআ' পালিয়ে গেছে, সে জন্য সাঁওতার বাড়িতে ঝগড়া লেগেছে, দিউড়ু সাঁওতা সবাইকার উপরে খ্যাঁক খ্যাঁক করছে।

সাধারণ কৌতূহলী স্বভাবের জন্য স্ত্রীলোকেরা গল্পসল্পের মধ্যে খবরের জন্য কান খাড়া করে ছিল, ওদিকে শলপু কন্ধ নাচ করছিল। মিণিআপায়ুর একটি মেয়ে 'উড়ুলিআ' বিয়ে করে চলে গেছে—কিছু নতুন কথা নয়, এ-গাঁয়ের এত কন্ধ বউয়ের মধ্যে কয়েকজন কি 'উড়ুলিআ' নয়!

এই 'উড়ুলিআ' কথাটিতে কি মধু আছে, 'উড়ুলিআ' হয়ে আসা বুড়ীরা তাদের জীবনেও যে তেমনি এক দিন এসেছিল সেই কথা ভাবতে লাগল, আর যার বর জোটেনি তার মনে এই কথাটি কেবল একটি কাঁটার মতো বিঁধে আছে, ভাবলে কেবল দুঃখ হয়, কান্না পায়। বাধা নেই, মন যেদিকে চায় উড়ে উড়ে যায় চলে, কাছে আছে আপন খুশি মতো বেছে নেওয়া মনের মানুষ, সামনে বিস্তৃত পৃথিবী, বিপুল জীবন। 'উড়ুলিআ' তারই পরিচয়।

কে কত কথা ভাবছিল, আপন আপন স্বপ্ন আর অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালা আপন মন-মানানো ছবি। পিওটি ঠোঁটে আঙুল চেপে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখের সামনে মাল দেশের রাত্রিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে ভেসে উঠছিল তল দেশের ছবি! কত লোক এসেছিল, সবাই কোথায় পিছনে থেকে গেল, কত মেয়ে কোথায় 'উড়ুলিআ' হয়ে চলে গেছে; সেই ছাড়তে পারেনি মায়ের আঁচল, কেমন তাতে বাঁধাই আছে আজও।

এর সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধ ছিল না সে ভাবছিল, যার সম্বন্ধ ছিল সে খবরটা জারি করছিল। ক্রমে ক্রমে দলের ভিতর খবর পৌঁছাল যে পুবুলি আর হাণ্ডর্ণার অপেক্ষায় বসে নেই, পুবুলি ঘর করতে চলে গেছে।

পুটুর-পাটুর হতে হতে আওয়াজ ক্রমে বাড়ল, তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হল, সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। শলপু কন্ধ যোদ্ধার নাচ ছেড়ে চীৎকার করে উঠল —"অ্যাঁ, ছুঁড়ি পালিয়ে গেছে!"

নাচের জায়গাতেই পঞ্চায়েত বসে গেল। সবাই গম্ভীর।

"আগেকার কাল যদি হত হে ছোকরারা, তাহলে আমরা যেতাম মিটিং গাঁয়ে যুদ্ধ করতে। মেরে কেটে পুড়িয়ে ওদের ছাই না করে কেউ বাড়ি ফিরত না। মনে আছে, আমার ছেলেবেলায় এই জন্য কত মারামারি কাটাকাটি করে কত লোক মরেছে—"

সোভেনা বলল, "হ্যাঁ, মরেছে, তাই আমরাও মরব? তোকে একলা

ছেড়ে দিলে তুই তো গিয়ে তাদের মেরে কেটে আসতিস্, এত লোককে আর খোশামোদ করা কেন, না কি বলিস্ দাদু ?"

"মস্করা হচ্ছে, না ? তুই বউ আন্, আর কেউ তাকে কেড়ে নিয়ে যাক্, বুঝবি তখন—"

"বউ হাণ্ডা সাঁওতা আনেনি। বিয়ে করে আনা বউ বন্দিকার থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে এমন সাধ্য কার ?"

"ঠিক ঠিক"—শলপু কন্ধ ছোকরাদের বকলে—"তোরাই না গিয়েছিলি মিণিআপায়ু, ছেড়ে দিয়ে এসেছিলি ? এখন নে। পাখী উড়ে গেছে, চেচিয়ে ফুঁসিয়ে এখন খালি ঢিল ছুঁড়বি তো, আর করবি কি ?"

অনেকক্ষণ ধরে পঞ্চায়েত চলল। সবাই কেবল মিণিআপায়ুর লোকেদের গাল দিলে, কোনো পাকাপাকি কথা দেওয়া হয়নি বলে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা অসম্ভব, প্রচলিত কন্ধা আইন অনুসারে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু বন্দিকার রেগে উঠেছিল। এ যেন বন্দিকার গাঁয়ের ঘোর অপমান।

পিওটির মা বুড়ো পিওটিকে উদ্দেশ করে আর সকলকে বুঝিয়ে বলল, নানা ছলে এক রাশ বকে গেল—"দেখেছিস্, মানুষ মানুষের সঙ্গে কেমন করে দাগাবাজি করে ? সাঁওতা বাছা কি সুন্দর ছেলে. কি ঠাণ্ডা স্বভাব। তুই গাঁয়ের মধ্যে কথাবার্তা হত মেয়েটিকে বউ করে আনবে, আর লেজ তুলে সে চম্পট্! এর কি বউ জুটবে না ?—তা নয়, কিন্তু তার কাণ্ড দেখ! কি এমন ভালো ঘর বর পাবে যার জন্য এমন করে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল সে! তা গেছে তো গেছে, তার জন্য এত পঞ্চায়েত কিসের ?"

গুমসার স্ত্রী মাথা নেড়ে বলল, "ভালো মেয়েটা ছিল সে, দিদি। তুই তাকে দেখেছিস্ ?"

পিওটির মা বলল, "কি ভালো লা ? ভালো হলে এমন করে চলে যায় ? ভিন গায়ের উপর ভরসা করে রইলে এমনি হয়। বরং নিজে দেখে শুনে নিজের গাঁ কি নিজের এখতিয়ারের ভিতর থেকে একটিকে আনলে এমন বিপদ হয় না।"

মা বলে যাচ্ছে, মনে মনে আর দুটো কথা জুড়ে দিয়ে পিওটি ভেবে

যাচ্ছে। ভাবতে মন্দ লাগছে না, মায়ের কথার উদ্দেশ্য সে কিছু কিছু বোঝে। অজানতেই স্নেহ ঢেলে দিয়ে পিওটির মা মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, "নাচ তো হয়ে গেছে, আর রাত জাগিস্ কেন মা? যা, ঘরে যা। দেখ, কেমন খেপা মেয়েটা, নিজের শরীরের দিকে একটুও নজর নেই। গালে তেল-হলুদ কই? মাথায় সিঁথি কই?—এমন করে বাইরে বেরোয়?"

গুম্সার স্ত্রী বলল, "কি হবে দিদি, যে নিজেই সুন্দর, বাইরের সুন্দর তার মোটেও দরকার নেই।"

পিওটিকে 'যা যা' বলে মা হাগুর্ণার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালে। পঞ্চায়েতের জায়গায় একটা উঁচু পাথরের উপর সে বসে আছে। বুড়ী বলল, "দেখ দেখ, বাছা কেমন কুঁকড়ি মুকড়ি হয়ে বসে আছে। ছেলেমানুষের মন তো। সত্যি কি আর সে গাঁয়ের সাঁওতার বোনকে সে এমন ভালো বাসত তা নয়। তবে কিনা লোকেদের কথায় ওর মনে অভিমান হয়েছে, মনে বেজেছে। তা যা হবার হয়ে গেছে, একটা কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে ফাঁপিয়ে এত বাড়ানো কেন? আহা বেচারা, মা নেই বলেই না।"

হাগুর্ণা সাঁওতা চুপ করে বসেছিল। হাগুর্ণা, জটায়ু পক্ষী সে। ডানা মুড়ে মুখ নিচু করে পাথরের উপরে বসে সে ভাবছে। এত বড় চৈতী পরব তার পিঠের উপর দিয়ে ঢেউ ভেঙে গেছে, তার পাখা ভেজেনি। তার সামনে দিয়ে গা হাত দুলিয়ে নানা ভঙ্গিমা দেখিয়ে পিওটি গেল, হাগুর্ণা মুখ তুলল না। পুবুলি চলে গেছে, তাই সে তার ধ্যান করছে।

অনেক রাতে কোলাহল থামল, সভা ভঙ্গ হল। কিছুই স্থির হল না। কেবল বন্দিকার রাগ করছিল।

॥ বাষট্টি ॥

কত তাড়াতাড়ি রোদের তাত বেড়ে যেতে থাকে। মাল দেশে গরম শিগগির পড়ে যায়, শিগগির চলেও যায়, যেতে যেতেই নামে বর্ষার ধারা,—চলে শীত পর্যন্ত।

যেমনটি আগে তেমনি এখনো কলের মতন হাগুর্গা কাজ করে যাচ্ছে। সে বিষয়ী লোক, তার কাজ অনেক। অনেকে থাকে যাদের মনের বয়স দেহের বয়সের চেয়ে অনেক এগিয়ে, তেমনি সে—হিকোদ্রকো হাগুর্গা, কাজ পেলে তার ভালো লাগে, সে কাজ করে।

চইত শেষ হতেই গাঁয়ে পঞ্চায়েত হয়ে পোড়ু (জঙ্গল পুড়িয়ে নতুন জমি ভেঙে চাষ) করার জায়গা স্থির হয়ে গিয়েছিল। ভালো দিন দেখে গ্রামের ডিসারী শলপু কন্ধ সবাইকে নিয়ে পোড়ুর শুভ মানত করতে গেল। বন্দিকার থেকে মিণিআপায়ুর দিকে যেতে যে পাহাড় পড়ে, এ বছর সেই পাহাড়ের ঢালু জমিতে জঙ্গল কেটে আগুন জেলে পোড়ু চাষ করার ব্যবস্থা হয়েছে। আইন-আদালত একদিকে, গাঁয়ের পঞ্চায়েতের নিষ্পত্তি একদিকে। নিজেদের ছোট্ট পৃথিবীর সুবিধার হিসেব করে গোষ্ঠীর নিষ্পত্তি কর্তব্যের বিধান দেয়, সকলে সেই বিধান অনুসারে এগিয়ে চলে। পোড়ু চাষ করলে বন নষ্ট হয়, অসংকোচে এত রকমের এত বড় বড় গাছ নির্মূল করে দিয়ে কন্ধ আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রথম বছরে মাড়ুয়া, দ্বিতীয় বছরে অলসি তৃতীয় বছরে শ্যামাধান—তারপর জমির কপাল, ভালো জমি হলে চাষ চলতে থাকবে, না হয় তো সে গেল।

নতুন জায়গা ঠিক করা হয়েছে, বনের সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে, ডিসারীর মতামত নিয়ে একদিন সেখানে পূজাও দেওয়া হল। তেমনি বেজুণীর নাচ, আতপ চাল, মদ, মুরগীর ছানা মিলিয়ে মিশিয়ে পূজা। বনের ভিতর থাকে যে পোড়ু চাষের অধিদেবতা বান্দুণু পেনু তারই উদ্দেশে। পূজা শেষ হলে মহা সমারোহে গাঁয়ের লোকেরা গিয়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিচিত একটি গাছ কেটে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। শুভ কর্মের আরম্ভ এইভাবে—কন্ধ ডিসারীর গণনা অনুসারে বিখ্যাত উত্রা যোগে এই পোড়ুর আরম্ভ, জঙ্গল পোড়ানো থেকেই পোড়ু চাষের উপক্রম।

এর পর 'ফারস্টি গারড' (ফরেস্ট গার্ড)-এর ট্যাঁক-গোঁজা মাসুল, তারপর 'ফারস্টি' নিজে। সে সময়ে ঘরে ফসল থাকে, বাগানে কলা থাকে, সাহুকারদের দেওয়া দাদনের কাঁচা টাকাও কিছু থাকতে পারে। নিতান্তই যদি মামলা-মোকদ্দমা হয়, তাহলে পঁচিশ জনের পোড়ু চাষের অঞ্চল দুই

জনের নামে যাবে, জরিমানা হলে সারা গাঁয়ের লোক চাঁদা করে দিয়ে দেবে, যার যা হোক সব কিছুর জন্য দায়ী সমগ্র গোষ্ঠী।

সেদিন সন্ধ্যায় বন্দিকারের লোকেরা একত্র হয়ে পোড়ু চাষের শুভ পূজা দিচ্ছিল। পূজা সারা হতে হতে সন্ধ্যা গিয়ে রাত এসে পড়ল। মহানিম গাছ কাটা হয়েছে, পাহাড়ের উপর পড়ে আছে। কাটা গুঁড়িটা দেখাচ্ছে টকটকে লাল, কালো গাছের লাল ঘায়ের মতো। আগুন ধরানো হল। এখন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এ-গাছ পুড়ে, পুড়ে অঙ্গার হতে থাকবে। আজকের মতো কাজ শেষ হল। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করার পর ঘরে ফেরা। সবাই খুশী।

চড়্ চড়্ করে জ্বলতে জ্বলতে আগুনের শিখা উপর দিকে উঠছে, কত রকমের তার রঙ।

পাহাড়ের উপর ঠাণ্ডা পড়েছে, সব শান্ত। উঁচু জায়গার উপর একটি আগুনের আলো। দূরের পাহাড়গুলিতে আগুনের রেখা মিটমিট করে ফুটে উঠছে। দূরের আগুন চিরদিন সুন্দর, আঁধারের মুখের বিস্ময় আর কিমিয়া।

হার্গুণা সেই আগুনের দিকে চেয়ে ভাবছিল। এর পর যে-কাজ আসছে তার সূচনা স্বরূপ ঐ আগুন। বনের ভিতরে কুড়ুলের ঘা পড়বে। বন কাটতেই কষ্টের জন্ম। আজকের বন একমাস পরে কোথায় চলে যাবে। নতুন ক্ষেতে নতুন জমি, এবার তাতে চাষ, ফসল, নিত্যিদিনের কাজ। হার্গুণা ভাবছিল এবার যে গরুর গাড়ি করবার চেষ্টা করবে, নতুন ধারণা আনবার জন্য সে নারণপাটণায় যাবে—মামার বাড়ির পথে। সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির হিসাব অনুযায়ী তার জীবনের কবিতা, সে বেড়ে উঠতে চায়।

গাঁয়ে কে যেন তার একক বাঁশিটি বাজাচ্ছে, সামনে পোড়ুর আগুন জ্বলছে, আসে-পাশে গাঁয়ের ভাইরা, আস্তে আস্তে গল্পসল্প চলছে। বাঁশি তার বড় ভালো লাগে, সেই একক বাঁশির চেনা সুর শুনতে শুনতে প্রগতির ধারণা আর বর্তমানের বাস্তব চিন্তাকে ছেড়ে কোন শূন্যে উধাও হয়ে উড়ে চলল তার মন। সেখানে কেবল নিস্তব্ধ রাত্রি। ছড়িয়ে পড়ে আছে অগুনতি তারা, তার আলোর নীচে পরতে পরতে অন্ধকার উপর থেকে হালকা হয়ে নেমে এসে নীচে জমেছে। বাঁশির সুরের পিছন পিছন

সেইখানে ছুটে চলে মন। চেনা যা কিছু দু'পাশ দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে পিছনের দিকে, সামনের দিকে নির্জন—একলা—উদাস।

তার নিঃসঙ্গ মন কখন পুবুলির স্মৃতিকে পথের সঙ্গী করে নিয়েছিল তার খেয়াল ছিল না। পাশে বসে লোকেরা যখন তারি বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করল তখন সে একবার উঁকি মেরে দেখল সে ডুবেছে। এতদিন কাছে কাছে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও সে বুঝতে পারেনি, আজ যখন পুবুলি চলে গেছে তখন বড় দেরিতে তার বুদ্ধি হয়েছে, মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি—কারণ পুবুলি আর তার হবে না।

এমন সুন্দরী ছিল সে, এমন তার গড়ন, তার মুখ, চোখ—

আজ না পাওয়ার ঝলকানি লেগে আরো লক্ষগুণ বেড়ে গেছে তার রূপের বৈচিত্র্য—পুবুলি সকলের চেয়ে উপযুক্ত ছিল, সকলের চেয়ে সুন্দরী, জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। গুণেও কেউ তার সমান হবে না, সব তাতে সকলের উপরে সে। পাবার আত্মপ্রসাদের মধ্যে এখন আর তাকে বাঁধতে পারা যাবে না বলেই সে আজ সব—সব।

চেনা হওয়ার দিন থেকে বড হয়ে ওঠা পর্যন্ত সব কথা একে একে মনে পড়তে লাগল। হাগুর্ণার মনে এল হতাশা। আজ সে নিজেকেই দোষ দিচ্ছে, মনে মনে নিশ্চয় বলছে ধরে নিয়ে পুবুলিকে পোষ মানানোর চেষ্টা সে নিজে থেকে কোনো দিন করেনি। দিনের পর দিন তার বিরুদ্ধে মনের ভিতর থেকে মতামত সংগ্রহ করে ক্রমে ক্রমে তার মূর্তিতে সে কালি লেপে দেবে. তার বিপদের কথা শুনলে খুশী হবে, কঠিন হয়ে নির্দয়ভাবে রোষতাণ্ডবে সব ধ্বংস করবার মতো সে সমস্ত শৌখিন স্মৃতিকে ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু সে দিনের সূর্যোদয় হয়নি, আজ সব গুমসো কালো।

দিউড়ু সাঁওতা নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য গ্রামের সকলের উপরে বিরক্ত হয়েছে, ঘরে তার ঝগড়াঝাঁটি—হাগুর্ণার কানে খবর পৌঁছেছে। দিউড়ুকে সে দোষ দিতে পারে না, বিশ্বাস হয় না জেনে শুনে দিউড়ু শঠতা করেছে।

কিন্তু দোষ দেওয়া না দেওয়ায় আর কি যায় আসে? পুবুলি তো চলে গেছে, পুবুলি এখন পরের।

জলন্ত মহানিম গাছ পিছনে ফেলে রেখে সবাই ফিরল। কোলাহলের

মধ্যে সেই একক বাঁশির স্বর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচের বন্দিকার গাঁয়ের বস্তির আলোর চকমকি দেখা যাচ্ছে। পায়ের তলায় তার গ্রাম বসে আছে, এই গ্রামে তার ভবিষ্যতের কাজ। কিন্তু গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে গাঁ-খানির দিকে চেয়ে আরোই তার নির্জন বোধ হতে লাগল। নিত্যি দিন এত পরিশ্রম, এত কাজ —কার জন্য ?

উদাস দুঃখের পসরা মাথায় নিয়ে সাধারণ মানুষের লোকদেখানো সহজ ভঙ্গীতে হাগুর্ণা সাঁওতা গাঁয়ের ভিতর নেমে এল। নিত্যদিনের ঘষা চলাপথের নিত্যদিনের জীবন, তাতে নূতনত্ব নেই, কোনো নূতন অনুভূতি নেই, স্বপ্নের স্থান নেই। মনের ভিতরের চিন্তার ঠিক বিপরীত ছবি বাইরে, আপন মনের নিজস্ব তৃপ্তি ছাড়া আর তৃপ্তি নেই।

না পাওয়ার বেদনায় প্রাণ টনটনিয়ে ওঠে, হাগুর্ণা ভাবতে থাকে জীবন নিয়ে কেবল খেলাই করেছে সে, সে বাসা বাঁধেনি, সে অঘোরী। অল্প বয়সে, প্রথম যৌবনে রঙিন মনের উপরে গেরুয়া ঢেকে সে বৈরাগ্যের কথা ভাবত, কখনও সে জানতে পারেনি যে পুবুলি তার মনের এতখানি জুড়ে আছে। পুবুলি—যার সঙ্গে উপরে উপরে ভাসা ভাসা দুটো কথাবার্তা, ঘনিষ্ঠতা যার সঙ্গে হতে হতে মাঝপথেই থেমে গেছে। আজ তারই চিন্তা হাগুর্ণার মনের ঘুণ, ঘুণধরা বাঁশ থেকে বেরুনো সুরের মতো তার ঝাঁজরা হয়ে যাওয়া মনের রাগিণীতে তার মনের কবিতা—সবই দুঃখের।

অন্ধকারের ভিতর গ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের উপর মহানিম গাছ জ্বলছে। চারিদিকে অন্ধকারের পাহাড়ের মধ্যে ঐ একটি বড় আগুন— বনভূমিতে মানুষের নিশান। গ্রামের বাতাসে কাজের গন্ধ, পাহাড়ের খোলের ভিতরে গাদাগাদি মানুষের বসতি। পেটের আর মনের দরকার অদরকার অনুযায়ী এত লোকের হাত ছোঁড়া পা ছোঁড়া, পাহাড় জঙ্গল ডুবিয়ে মাল দেশের যত হিংস্র প্রতিকূল অবস্থা পরাভূত করে অন্ধকারের ভিতর সেই মহানিমের ধুনির আগুনের মতো মানুষের একটি প্রবল আকৃতি —সে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে, যাই যাক যাই আসুক সে কাঁধের টাঙ্গি নামাবে না, হাত থেকে হালের মুঠি ছাড়বে না। এই বীর্যের সঙ্কেত দেয় গহন বনের ভিতরে গাঁয়ের বস্তির এই বাতাস।

ধীরে ধীরে হাগুর্ণার মনে কাজের কল্পনার অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে, তার সঙ্গে সঙ্গে জাগে পুবুলির জন্য তার মনে করাত-চালানো দুর্বলতার প্রতি সবল প্রতিরোধ। পুবুলি—প্রজাপতি, প্রজাপতির মতোই তার বাহিরের রঙে চোখ ধাঁধিয়েছে মিটিং গাঁয়ের লোকের, যার ফুসলানিতে ভুলে সে চলে গেছে। সে যতই উপযুক্ত হোক সেই শেষ নয়, কারো জন্যই কিছু অচল হয়ে যায় না পৃথিবীতে। পুবুলির দেওয়া আঘাতকে সে জয় করতে পারে।

কেবল অপমানটাই বাজে। পুবুলি তার হল না সে একটা অপমান। পুবুলি তাকে যোগ্য মনে করল না, মিণিআপায়ু মনে করল না সে যোগ্য —সে, লেল্লু সাঁওতার ছেলে হিকোকা হাগুর্ণা। তার মনুষ্যত্ব, তার সাঁওতার মর্যাদাকে যেন উপহাস করে তার জন্য ঠিক করে রাখা বউ আর এক-জনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপমান বোধ হলে সে রাগে কাঁপতে থাকে, তার রাগ কোনো বাধা-বন্ধ মানে না।

"কি হয়েছে তোর, সাঁওতা, এত মনমরা হয়ে আছিস্ কেন? একটা গেছে দশটা মিলবে মন করলে, সে জন্য এত দুঃখ কেন?" বললে সোভেনা কন্ধ।

"কে দুঃখ করছে যে এত সান্ত্বনা দিচ্ছিস্ তুইরে? কে তোকে ডেকেছে ভালোমানুষি করতে?"

"আমার উপর রাগ করতে হয় তো কর্, তা বলে এমন গুম হয়ে বসে থাকিস্ না। তুই লুকোবি বটে, কিন্তু আমি কি জানি না?"

হাগুর্ণা কিছু বলল না।

সোভেনা বলল, "ওরা ভালো লোক নয় সাঁওতা, ঠক, জুয়াচোর। ওদের কথার ঠিক নেই। এমন গাঁয়ের মেয়ে এনে কি বা হত, এক দিন না এক দিন ফাঁকি দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছি বলে চলে যেত, তারপর কারো সঙ্গে পালিয়ে যেত। তখন কেমন লাগত তোর? সেই ঝাড়েরই তো সে। ভালোই হয়েছে সে আগেই চলে গেছে। আমি জানি যে— মেয়েটাকে প্রথম দেখা অবধি।"

এর চাইতে মন্দ কথা বলে গালি দিতে পারে না কন্ধ। সোভেনার নাক সিঁটকানি হাগুর্ণাকে তিলমাত্র বিচলিত করতে পারল না। ছোট

ছেলের মতো করে সে বলল, "ওসব কিসের জন্য বলছিস্, সোভেনা? আমি ওসব কিছু ভাবিনি, ও নিয়ে আমার মনে অভিমান নেই। সারা রাজ্যের কাজ পড়ে আছে আমার, কে কার সঙ্গে 'উদ্ধুলিআ' গেল কে তার খোঁজ নেয়? এবার একটা গাড়ি করব ভাবছি, না কি বলিস্? ভালো ছুতোর একটি দেখ্তো।"

সোভেনা নীরবে চলে গেল।

॥ তেষট্টি ॥

মিণিআপায়ু আর বন্দিকার দুই গাঁয়ের অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে যে দুটি যুবক-যুবতী ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুল তাদের অনুতাপ করবার কোনো কারণ ঘটল না। পরের জন্য লোকে চিন্তা করে, অধিকাংশ মন্দ চিন্তা, অল্প কিছু ভালো, কিন্তু কোনোটাই ফলে না। সমাজকে উপেক্ষা করে, মুখ ভেংচে, বিবাহ-বন্ধনের বাইরে জন্মানো ছেলে ভুষির ঝুড়িতে পড়েও শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে ওঠে, অঘটনও সুখের হয়, পরের মুখের অনর্থক কথায় কিছু হয় না, গরম জলে ঘর পোড়ে না।

বেণ্ডর বাপ মিটিং গাঁয়ের বুড়ো রঘু সাঁওতা ছেলের বউ পেয়ে বড় খুশী হল। তার স্ত্রী বহুদিন মারা গেছে। প্রথম যৌবনে স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে বুড়ো মনকে আরাম দিতে ঘরে এসেছে পুবুলি। রঘু সাঁওতা ছেলে-বউয়ের জন্য আলাদা ঘর তুলে দিলে, যেমন কন্ধকুলের প্রথা। বউয়ের মন মানল আপন ঘর বলে।

নতুন বিয়ে, ছায়ার মতো মিলে মিশে দু'জনে ঘুরে বেড়ায়, বেণ্ড আর পুবুলি। বেণ্ড জমিতে লাঙল দেয়, পুবুলি পাথর বাছে। পাহাড়ে বেণ্ড যায় কাঠ কাটতে, পুবুলি যায় কন্দ খুঁড়তে, পাতা পাড়তে। ঘুরে ঘুরে পরস্পরকে ভালোবাসতে তাদের গায়ে রোদ লাগে না, কাজে কষ্ট হয় না, ঝাঁ ঝাঁ রোদেও এ ওর মুখের দিকে চাইলে ঠাণ্ডা লাগে, চোখ ঢুলে আসে। বেণ্ডর শখ শিকারের সন্ধানে ঘোরা। সম্বর হরিণ ভুলিয়ে এনে এক জায়গায় জড়

করবার জন্য মাটির কাছে জায়গা দেখে 'খারি' ফেলে। এই খারির গন্ধে জন্তুরা এসে রোজ একটু করে চেখে চেখে যায়। তারপর এক দিন শিকারী ওত পেতে বসে থেকে গুড়ুম করে বন্দুক ছোঁড়ে। ঘন বনে ঢাকা দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়ের উপরে এক এক জায়গা নেড়া, 'খারি' দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এমনি জায়গার কাছে গাছের ডালে ডালপাতার বাসা বেঁধে মানুষ ওত পেতে বসে থাকে। 'খারি' ফেলা ছাড়া আরো অনেক উপায়ে শিকারী শিকারের সন্ধান করে। ঘুরে ঘুরে জন্তু-জানোয়ারের প্রিয় গাছ-পালায় খেয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখে, নীচে মাটিতে জন্তুদের পায়ের দাগ দেখে শিকারী বোঝে কোথায় জন্তু রোদের ঝাঁজে তেষ্টা পেলে জল খেতে নামে, কোথায় চরতে আসে। তাতেও পুবুলি বেগুর ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে। স্বামীর নিশানার বাহাদুরি, স্বামীর শক্তি সে কাছে কাছে থেকে অনুভব করে সুখী হতে চায়। যেদিকেই যাওয়া যায় উন্মুক্ত প্রকৃতি, বনের দেওয়াল, চড়াই সুড়ঙ্গ। যতই খরা হোক, গাছপালা শুকিয়ে গেলেও মাল দেশের শোভার হ্রাস হয় না, চিরদিন রয়েছে সে, যৌবনের শ্যাম পটভূমি।

চম্পা ঝরনার কাছে 'খারি' ফেলে মাচা বেঁধে বেগু কন্ধ জন্তুর অপেক্ষায় থাকে, গাছের ডালের উপরে স্বামীর গায়ে হেলান দিয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে পুবুলি বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকে। চাঁদ ওঠে, ছায়ায় আলোয় মাখামাখি লেপালেপিতে পাথর আর গাছের উপরে কত বিচিত্র রূপ এঁকে এঁকে যায়, দু'জনে শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকে। বাইরের দৃশ্য ভিতরের সঙ্গীতের আধার হয় কেবল, কন্ধ-কন্ধনীর ভালোবাসা চলে নির্জন বনের ভিতরে, খোলে খালে, পাহাড়ের খাঁজে, পাথরের ফাঁকে, গাছের ডালে। 'ঝাম্‌কি নলি' তৈরী আছে : হাতে বর্শা, তলোয়ার, ছুরি, টাঙ্গি, তীর-ধনুক সব হাতিয়ার নিয়ে দুজনে শিকার করে বেড়ায়। এদিক দিয়ে গেলে ওদিক দিয়ে গেলে পথের সহস্র বাঁকে আবার দেখাদেখি। যতদূর চোখ যায় কেবল গহন বন। এদিকে ওদিকে ঢালু ঢালু পর্বতের গা কত উপরে উঠে গেছে, দুই ঢালুর বিকট সংযোগ-স্থলে গভীর পাতালের উপত্যকায় পাথরে ভরা অন্ধকার ঝরনা, সেই কন্ধ-কন্ধনীর মিলনস্থান। পাহাড়ের খাড়া পাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে যাবার পথ, পিছলালে হাড়ও গুড়ো হয়ে যাবে, নীচের

খদের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। গাছের ঠুটো গোড়া, গাছের শিকড় আর পাথর জড়াজড়ি, হাজার হাজার ফুট উপরে রাস্তা। সেখানে গাড়ি যাবে না, ঘোড়া যাবে না, কেবল আপন ভাগ্য সঙ্গে নিয়ে প্রাণ হাতে করে কন্ধ-কন্ধনীর সেখানে যাওয়া-আসা। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ে 'দমকে' গিঁঠ পড়ার মতো পর্বতের স্তূপ। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় কত নীচে হঠাৎ কোনো গ্রাম নজরে পড়ে যায়, বনের ভিতরে এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে বাইরে থেকে চোখে পড়ে না। তেমনি হঠাৎ আসে সব গ্রাম, আগে থেকে তাদের অস্তিত্বের কোনো হদিশ দেয় না। তেমনিই আবার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। পর্বতের ফাটলে, খাঁজে, ঝরনা গড়িয়ে নেমে আসার পথে কোথাও দেখা যায় নীচ থেকে উপরের দিকে একটা জঙ্গলের সুড়ঙ্গ, এই সুড়ঙ্গ পথে পায়ে পায়ে কিছু দূর উপরে উঠে গেলে হঠাৎ জঙ্গল যেন একটু সরে গিয়ে দেখা যায় এবড়ো-খেবড়ো বড় বড় পাথরের উপরে বসে পড়া সারি সারি কন্ধ বস্তি। কোথাও সেই রকম ঘন বনের মধ্যে চারিদিকের পাঁচিলের মতো পাহাড়ের উপরে হঠাৎ শোনা যায় কাঠ কাটার ঠক ঠক শব্দ। সেই পাহাড়ের আরও উপরে আরও উঁচুতে হয়তো কোথাও কোনো গ্রাম আছে, সেখানে ছেলেপিলেরা নাচে কোঁদে, ধাংড়া-ধাংড়ী গান গায়, বাইরে তার পরিচয় নেই। কেবল রোদের তেজে ফিকে হয়ে যাওয়া মেঘবরণ জঙ্গল, গাদা গাদা পাহাড়, আকাশের পানে তাদের চূড়া—কারো ছুঁচালো, কারো চেপটা। কোনো পাহাড় সম্পূর্ণ, গোটা দেখতে, কোনোটার খানিক খানিক যেন খাওয়া খাওয়া মতো, কোনোটা নীচের দিকে সরু থেকে উপর দিকে ক্রমে মাথাভারী হয়ে উঠেছে, এমনভাবে রয়েছে যেন এখনি ভেঙে পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচেকার ঝরনা নদীতে পড়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করবে।

শিকারের সন্ধানে, কন্দ, ফল এই সব তুলতে এই বনে দলে দলে কন্ধ কন্ধনী ঘুরে বেড়ায়, নিসর্গ দৃশ্য দেখে। ঘুরতে ঘুরতে কোনো চূড়ার উপর থেকে পাহাড়ের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে পূর্বের দিগ্বলয় পর্যন্ত দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়ে যায়, দেখা যায় পত্তন ক্রমে নেমে গেছে নীচে, আরো নীচে, নির্দেশ দিচ্ছে দূরে সেই ঋষ্যাবতী নদীর গতিপথের।

বেণু কথা বলে, পুবুলি শোনে।

ঘর থেকে পালিয়ে এসেও পালাবার নেশা তাদের ছুটে যায়নি, এখনও লোকের চোখে এড়িয়ে আড়ালে আবডালে চলতে তাদের মন, বনের গহন গভীরতায় নিজেদের হারিয়ে ফেলতে—যাতে মনে হয়'এ সংসারে তারা ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই—কেবল তারা দুজন—আলো আর তার প্রতিবিম্ব, আর কেউ নেই। সেখানে নেই সমাজের শাসন আর আইন, পরের মন বুঝে চলার বাধ্যবাধকতা, দুনিয়ার লোকদেখানো নীতি অনুসারে আপন মনের রুচির সমস্ত নিজস্বতা ভেঙে চুরে ভদ্র হয়ে গুনে গুনে দিন বাঁচার সাধ। তাদের পুরোপুরি স্বার্থপর জীবন, একে অন্যের সঙ্গে জোড়া, তার বাইরে কাউকে শুধোবার তাদের ইচ্ছে নেই কি সময় নেই।

সেই আড়ালভরা বনের মধ্যে যেখানে গাছ-গাছড়া আর পাথরে পাহাড়ে ঘেরা এক একটি ছোট খোল এক একটি নিরালা জগৎ, সেখানেও আলো ছায়া চলন্ত ছবিতে রং বদলায়, তার সরু লাল সুড়ঙ্গে ঢোকবার মুখে প্রতীক্ষাও আসে—কে জানে কি আছে ভেবে ছেলেমানুষী প্রতীক্ষা, আর সেই প্রতীক্ষার জবাব মেলে আপন মনের ভিতরকার ছবির অদল-বদলে।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ঝোরার ধারে ছায়ায় ছায়ায় ময়ূরেরা দলে দলে বসে ঝিমোয়, গাছের ঘন পাতার আড়ালে শোনা যায় ময়নাদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, হঠাৎ 'কুট্‌রা' হরিণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, হরিণ সম্বর এক একবার দেখা দিয়ে আবার মুখ লুকায়, গন্ধগোকুল লাফ দিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। বনের আড়ালে একটু ঘুরে এলেই এত রকমের জন্তুর দেখা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কেউ চমক লাগায় মানুষের চোখে, কেউ চমক জাগায় মানুষের পেটে, আর কেউ মানুষের মনে। শিকারী অনেক দেখে, মারে যত তার চেয়ে অভিজ্ঞতা হয় ঢের বেশী। গায়ে ঘাম বয়, গরম ছুঁচালো পাথর আর কাঁটা পায়ে ফোটে, কিন্তু বনের মানুষ বনের পথে কিছুতে পিছপাও হয় না বা ক্লান্ত হয় না। খেতে হয় ঝোরার জল আর লাউয়ের খোলে রাখা মাড়ুয়ার ভাত আর তারই ফেন। বিশ্রাম গাছের তলায়।

বেগু কন্ধ আর পুবুলি মিটিং গাঁয়ের কাছের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো শিকার জোটে, একটা দিনের চাগিয়ে উঠতে থাকা উচ্ছ্বাসের শেষ হয় সেইখানেই। শিকার যদি নাও জোটে তাহলে গ্রীষ্মের এক একটা গোটা দিনের সমস্ত রোদ হজম করে ফিরে আসতে কিছু খারাপ লাগে না।

যে সহজ সরস গুণে স্ত্রী দু'দিনেই পরকে আপন এবং আপনকে পর করে দিতে পারে তারই কুহকে পুবুলি মিণিআপায়ুকে ভুলেছিল। কত দিন গেল, মিণিআপায়ুর লোকেরা তার ভালোমন্দের খবর নিতে এল, দিউড়ু এল। এ গাঁয়ে এসে প্রথা অনুসারে তারা বেণ্ড কন্ধকে ধরে মারলে। নিচু হয়ে আসা চালের নীচে কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে পুবুলি দেখছিল— এরা বেশী মার মারবে না তো, বেশী মারে যদি তাহলে কি হবে? মারতে মারতে অনেক সময়ে রাগ চড়ে যায়, রক্তারক্তি কাণ্ড হয়।

. কিন্তু তার দিকেই ঘাড় ফিরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেণ্ড হাসছিল। বলছিল, "হল? না আরো আছে? তাড়াতাড়ি সারো, যত মারবে মারো।" তাড়াতাড়িই শেষ হল, তার হাসিখুশী মুখের দিকে চেয়ে অপ্রীতিকর কিছু করবার ইচ্ছে কারও হল না—কেবল নামমাত্রই, রীতিরক্ষার জন্য। দু'পক্ষের লোকেরা একসঙ্গে বসে ধুঙ্গিআ টানলে, কথাবার্তা মিটল। সঙ্গে সঙ্গে পণ বাবত বেণ্ডর বাপ রঘু সাঁওতা দশটি টাকা তাদের সামনে রাখল, একটা বলদও এনে তাদের সামনে বেঁধে দিল, এক টিন ঘরে তৈরী মদ রেখে দিল। বলল, "ছেলে মানুষের মন তো, মন গেল আর অমনি উড়ে পালাল। তা, তাতে আর কি হয়েছে, বিয়ে হলে আমাদের বংশে যা দেবার যা করবার তা আমরা করব, করব না এমন দোষ কেউ দিতে পারবে না।"

দিউড়ু তার দলের লোকেদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শিব জানী বলল, "এসব তো দিলি সাঁওতা, কিন্তু আর একটা কথা রয়ে গেল যে। বন্দিকারের হাণ্ডা সাঁওতাকে 'সগর্তা' (ক্ষতি-পূরণ) দিতে হবে। কন্যে তো তার, তোমরাই না 'উড়ুলিআ' নিয়ে এলে।"

রঘু সাঁওতার শান্তিপ্রিয় মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

"কি বলিস্ সাঁওতা? 'সগর্তা'র কথাটাও এখনই চুকে যাক্, একটা ঝঞ্ঝাট কেনই বা বাকী থাকে—"

চোখ লাল করে মাথার জটা ঝাঁকিয়ে রঘু সাঁওতা বলল, "এ কি কারো ছেড়ে দেওয়া 'ফাদ্রি' (দুশ্চরিত্রা) কন্যে যে তার জন্য 'সগর্তা' দিতে হবে? কেউ তো কারো ঘরের বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে আসেনি যে 'সগর্তা' দিতে হবে। কেন এমন অপমানের কথা তুলছ তোমরা? ভালো ভাবে এই কুটুম্বিতার সম্পর্ক করব আমরা, না অনর্থক মারামারি করে মরব?"

পুবুলি ঠায় দাঁড়িয়ে চালা আঁকড়ে ধরে সব কথা শুনছিল। অল্প দূরেই ঐখানে তারই সম্বন্ধে পঞ্চায়েত বসেছে। বাপের বাড়ির গাঁয়ের প্রতি তার অশ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু পঞ্চায়েতের কথা ভাবলে মনে মনে বাপের বাড়ির বিপক্ষে দাঁড়ায় সে। খালি ভাবে কোনো মতে তাড়াতাড়ি এ খিটিমিটি মিটে যাক, ওদের কথা বজায় না থাক।

কি পাষাণ মন এদের! কেবল ব্যবসাদারি, খালি ব্যবসাই বোঝে!

এরা কখনো ভালোবাসেনি? বিয়ে করেনি? কেন এত কঠিন এরা? না, না, ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে আসছে। রঘু সাঁওতা সকলকে দাবড়ানি দিয়ে বলল—"ছোকরা মানুষ তোমরা, বুড়োবুড়োরা তো নেই, কি জানো তোমরা? পণের পর আবার ক্ষতিপূরণ নেবে—ক্ষতিপূরণ! নাও ওঠো এবার, পঞ্চায়েত শেষ হল।"

এই গ্রামের প্রতি পুবুলির শ্রদ্ধা বেড়ে উঠছিল।

সভা ভাঙতে ভাঙতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল, পুবুলি জানত এবার দিউড়ু আসবে। সকলেই যেন কথা বলছে, দিউড়ু বেশী কিছু বলেনি; এমন চুপ করে থাকে না, তার মনের ভিতর বুঝি কিছু হচ্ছে। লেঞ্জুকাকাও আসেনি।

অপেক্ষায় অপেক্ষায় অনেকক্ষণ গেল। দিউড়ু তার সঙ্গীদের সঙ্গে কি-সব কথাবার্তা বলছে, অপেক্ষা করাই সার, দিউড়ু এল না। তার একটি মাত্র ভাই কেবল দূর দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এদিক-ওদিক করছে। পুবুলি নিজের মনকে যাচাই করে দেখল, অপরাধের কোনো চিহ্ন সে দেখতে পেল না কিন্তু মনকে এত ঠেকো দিয়ে তুলে রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও দিউড়ুর এমনি ধরনে তার মনটা ভার হয়ে পড়তে লাগল। যেন এমনিই পুবুলি বাইরে আসে, ডাকব ডাকব করে দু'পা এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। অকারণে ঝাঁটা নিয়ে বার বার বারান্দা ঝাঁট দেয়। এমনি করে সময় বয়ে যায়। ছল করে একবার এদিকে তাকিয়ে আবার দিউড়ু মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পুবুলি আরও ছটফট করতে থাকে। মনে কি ভেবেছে দিউড়ু?

রঘু সাঁওতা ডেকে বলল, "কি বউ, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

পুবুলি মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "বেলা হয়ে গেল, জল আনতে যাই।" তিনবার গিয়ে ঝোরা থেকে জল নিয়ে নিয়ে এল। বারান্দায় পা

ছড়িয়ে বসে গহনা ঝনঝনিয়ে চুল বাঁধল। দিউড়ু গাল দিলে বরং সে হেসে দিতে পারত, কিন্তু এই চুপচাপ ভাব বড় মনে বাজে।

সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরি নেই। পূর্ব ঘাটের পাহাড়ের উপরে সাঁঝের আগের ফিকে আলো যাচ্ছি যাব করে। এক সঙ্গে কাছের আর দূরের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় নানা আকৃতির আগুনের রেখা ঝকমকিয়ে উঠল। সারা দিন তারা জ্বলে, রাত্রে ঝকমক করে ওঠে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। গোটা গ্রাম কেবল ধুলো আর গোলমাল, সকলেই যে যার ঘরের সামনে গাদাগাদি। ক্রমে যাওয়া-আসার চেঁচামেচি কমে এল। তারপর সন্ধ্যার আগের নিরালা নির্জনতা। দিউড়ু যেন বাইরের লোকের মতো বারান্দার সামনে একলাটি দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভিতর পুবুলি কাজে ব্যস্ত।

দিউড়ু ডাকল—"পুবুলি!"

কলরব করে পুবুলি ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এল, বাইরে এসে ইতস্ততঃ করতে লাগল, বুক ঢুপ ঢুপ করছে। জেনে শুনে এমনি সময়ে এল এই ক্ষণ?

দিউড়ু আবার ডাকল—"পুবুলি—"

পুবুলি কথা বলতে পারল না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু থেমে দিউড়ু বলল, "আমার দিকে তাকা পুবুলি—" তার গলার সুরে কোথায় আর কোনো চেনা সুরের খানিক মিশেছে যেন—সরবু সাঁওতা এমনি সুরে কথা বলত।

পুবুলি মাথা তুলল, আবার মাথা নিচু করল। কাঠের মতন দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে। দিউড়ুর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কেবল পুবুলিকে অস্থির করছিল। দিউড়ু আপন মনেই বলল, "নাঃ—থাক—"। পুবুলির মুখ কালী হয়ে গেছে, ভিতরের কান্না বাইরে বেরুবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তাই দেখতে দেখতে দিউড়ুর মন কোমল হয়ে উঠল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে দিউড়ু বলল, "কিছু বলছিস্ না যে, এর মধ্যেই ভুলে গেলি আমাদের?"

অকারণে পুবুলির চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

দিউড়ু বলল, "কাঁদছিস কেন?" তারপর হেসে বলল, "তোর শিকারী বর কি তোর বীরপুরুষ শ্বশুর যদি আবার দেখে ফেলে তো বলবে কে এই লোকটা, অনর্থক এসে আমাদের ঘরের বউকে কাঁদাচ্ছে, এর দফা শেষ করে দিই। না লো পুবুলি?"

তেঁতুলের ডালের ছড়ি দিয়ে কে যেন পুবুলির মুখে এক ঘা মারল, পুবুলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দিউড়ুর মন সত্যিই গলে গেল, কাছে এসে পুবুলির কাঁধে হাত রেখে মুখখানি তুলে ধরল, মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাল। অত্যন্ত দুঃখে তার চোখ ভারি হয়ে নুয়ে পড়ল বোনের মুখের উপর।

দিউড়ু বলল, "কাঁদিস্ না ছি,—কাঁদছিস্ কেন? এই একটা কথায় আমার উপর এমন করে রাগ করলি তুই, পুবুলি? কই বাড়িতে তো এমন অভিমান করতিস্ না!"

পুবুলির চোখের জল পড়তেই থাকল, সেই চোখের জলের ধারায় ভেসে চলেছিল ছেলেবেলার সব স্মৃতি, বাপের বাড়িতে বেড়ে বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত। বিচ্ছেদের সব দুঃখের উপরে যবনিকার মতো ভাইয়ের সামনে বোনের এই কান্না। দিউড়ু বলল, "তুই কাঁদিস্ না, কখনো আমি তোর চোখের জল দেখেছি? বল তো। কাঁদবার কি আছে বোনটি? তুই সুখে থাকলেই আমার যথেষ্ট। বিয়ে তো একদিন তোর হতই, তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিত না তো, যে ঘরে তোর মন হল সেই ঘরেই এসেছিস্ তুই। এ জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তুই কাঁদিস্ না।"

মাতাল দিউড়ু কবে থেকে এমন উদার হল? কবে তার মন এত ঠাণ্ডা, এত স্নেহশীল হল? কার মুখের এই সব কথা, এই আশ্বাস? পুবুলি ভেবে পেল না, কিন্তু মনে ভরসা পেল।

দূর গাঁয়ে সেই উদাস সন্ধ্যায় যেন আজ ভাইবোন পরস্পরকে নতুনভাবে চিনছে। পুবুলির নিজের সংসার হয়েছে, এখন আর সে ভাইয়ের হাত তোলায় নেই, আজ দুজনে সমান সমান, কেউ কারো উপরে নির্ভর করে না, তাই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিকোণ আজ তাদের আলাদা আলাদা।

"পুয়ু ভালো আছে তো ভাই[1]?"

অন্যমনস্ক হয়ে দিউড়ু বললে, "হাঁ।"

"কি বলে পাঠিয়েছে আমায়?" দিউড়ুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই

[1] ওড়িশায় দাদাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করা হয়; ছোট ভাইকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

পুবুলি বলে চলল, "এবার ওর খাটুনি বাড়বে। বড় অসুখ করেছে ওর, তুই তাকে গালমন্দ করিস্ না যেন ভাই।"

দিউড়ুর মুখখানা ভয়ংকর হয়ে উঠল, মনে হচ্ছিল যেন কি একটা তার মনের কথা বাইরে বেরুবার জন্য উস্‌খুস্ করছে : অভিনয় বড় বেশী হয়ে গেছে, এখন আর সে সামলে উঠতে পারছে না। পুযুর প্রসঙ্গ ইতি হল, কোথায় পিছু হটতে হয় নারী মনের সহজ সতর্কতায় পুবুলি তা বুঝতে পেরেছিল। হাকিনার কথা থেকে আরম্ভ করে বেজুণী পর্যন্ত সকলের কথা একটি একটি করে পুবুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। আলো জ্বালার সময় হল।

ভরসা করে দিউড়ু জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর, এ জায়গা কেমন? ভালো মনে হচ্ছে তো? তোর কি রকম লাগছে?"

পুবুলির মুখ খুলে গেল। ভরসা পেয়ে সে বলতে লাগল, "কি ভালো জায়গা! চাষ করতে ভালো, শিকার করতে ভালো।" দিউড়ু চুপ করে আছে দেখে পুবুলি প্রাণ খুলে কত বলে যেতে লাগল, ভাবল ভাই খুব খুশী হচ্ছে। রাত হল। রঘু সাঁওতা এল, বেশু কন্ধও এল।

রঘু সাঁওতা বলল, "খালি বসিয়ে রেখে গল্প করছিস্ কি লো বউ? ভাইকে খেতে দিবি, না খালি গল্পই করবি?

দিউড়ু দেখল পুবুলির চোখে হাসি উছলে পড়ছে, মুখে চোখে এক নতুন আলো। অল্প কয়টা দিনের মধ্যেই পুবুলি বদলে গেছে, যা ছিল তা আজ সে নেই।

নিজের ভাঙা মনের সঙ্গে যাচাই করে দেখল, তুলনা হতে পারে না।

তার দুঃখে, তার অতৃপ্তিতে তিলমাত্রও ভাগ নেবে না এ—মায়ের পেটের বোন হলেও। আর এর নিজের আনন্দ—কি স্বার্থপর, আসপাশের কারো মুখ চেয়ে কারো উপরোধ সে রাখেনি।

ভাবল, মেয়ে জাতটাই এমনি, আপন সুখেই ডুবে থাকে অন্যের সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ।

ফোঁস ফোঁস করতে করতে দিউড়ু উঠে পড়ে চলল। বেশু কন্ধ ধুঙ্গিআ টানছিল, তার ধুঙ্গিআটাই দিউড়ুর হাতে দিয়ে বলল, "শিকার করবার ইচ্ছে হলে চলে আসবে আমাদের গাঁয়ে। চারিদিকের পাহাড় আমাদের এই

অঞ্চলেই ঢালু হয়ে হয়ে নেমে গেছে, দশ ক্রোশের মধ্যে যত জন্তু-জানোয়ার তাদের আডত যেন আমাদের গ্রামের জঙ্গলের ভিতরেই। যখনি আসো খালি হাতে কখনো ফিরবে না। এই জঙ্গলে বুনো মোষ আছে, তোমাদের জঙ্গলে আছে?"

দিউড়ু বলল, "না—"

বেণ্ড বলল, "এই জঙ্গলে বারো-শিঙা হরিণ আছে, কালো বাঘ আছে, ভৃঙ্গরাজ পাখীও আছে। একবার এসো এর মধ্যে এক দিন, খেদা করা যাবে।"

রঘু সাঁওতা হাসল। বলল, "যখনই শোনো এর মুখে কেবল শিকারের কথা। তাই তো আমি বলি মানুষের মেয়ে বিয়ে করলি কেন? বন-বরা একটা বিয়ে করলেই তো হত, সে বনে বনে দৌড়ে বেড়াত আর তুই তার পিছনে পিছনে ছুটতিস্। পাগল এক—শোনো কেন ওর কথা? বিয়ে করেও কি ঘরে থাকে? ধাংড়ীটাকে নিয়ে কেবল বনে বনেই ঘুরে বেড়ায়। আজ এখানে খেদা তো কাল সেখানে গাছে ওত পেতে বসে থাকা—"

ছেলের সম্বন্ধে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে গর্বের ভাব দেখিয়ে বলল, "পাগল হোক ক্ষেপা হোক মারে ভালো, হাতের টিক আছে। দেখছ তো কি জঙ্গলের দেশ আমাদের, তোমাদের দেশের চাইতে বেশী, আমরা বাঁদরের মতোই থাকি। থাকতে থাকতে সয়ে গেছে, তোমাদের কষ্ট হবে। তা তোমাদের ঘরের মেয়েকে দিয়েছ, সয়ে যাও দু'দিন, কি আর করবে বলো?"

॥ চৌষট্টি ॥

এই না তার শ্বশুর-বাড়ি মিটিং গাঁ—ভাবছিল দিউড়ু সাঁওতা।

জোর করে কেউ তাকে বিদায় করে দেয়নি, আপন খুশিতেও এ গাঁয়ের আকাশ আর মাটির দিকে পিছন ফিরিয়ে পুয়ু এখান থেকে গিয়ে দিউড়ুর ঘরে এসে ঢোকেনি, পুয়ুকে সে ডেকে নিয়েছিল, আপনা থেকে নিয়েছিল। সে দিনের আলোর রঙে পরীর মতো দেখাচ্ছিল পুয়ুকে আর বিজেতার মতো

দিউড়ু তার মন জয় করে তাকে নিয়ে গিয়েছিল—সরবু সাঁওতার পুত্রবধূ করে তার পায়ের তলায়।

কবে—সে কবে তার বিয়ে হয়েছিল!

সেদিনের সে জায়গা আজও পড়ে আছে, সেই মানুষ সে কত বদলেছে, সেদিনের সেই স্মৃতি—আজ তা ব্যথা দেয়, সেদিন যা গৌরবের টীকার মতো মাথায় পরে গর্ব করতে মন চাইছিল, আজ তাতে ছেঁকা লাগে যেন। আজ তা চুনকালি, লুকোতে পারলে প্রাণ বাঁচে।

সেই ঘর, সেই দুয়ার, সে মানুষ নেই। নিজের বলতে এখানে পুয়ুর কেউ নেই, তবু এ গাঁয়ের জামাই বলে লোকে তার সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করে। বুড়ীরাও বাঁকা কোমরে হাতের ভর দিয়ে থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের পুয়ু কেমন আছে? আমাদের মনে করে? তার ছেলে কেমন আছে? ছেলে কার মতো হয়েছে?"

তার এ রাজ্য, তারই জন্মভূমি। কি ভীষণ অরণ্য! গভীর ঝোরার উপরে, উপত্যকার উপরে নানা ধাঁজের নানা আকারের পাহাড—যেন পাতালের উপরে ঝুলছে, কোন আঁধারের তলায় তাদের মূল, কত উঁচুতে তাদের চূড়া, অসুরদের প্রাচীরের মতো সারি সারি আকাশ-আড়াল-করা পর্বতশ্রেণী। লম্বা লম্বা 'মালি'র উপর চেপটা মাথা 'দমক', নিবিড় বন, কোন সরু ফাঁকের ভিতর দিয়ে তার পথ। তবু পুয়ু এইখানেই বড় হয়েছিল, লোকের চোখের আড়ালে পাহাড়ী ফুলের মতো এই পথে সাড়া তুলে হয়তো সে ধুলোখেলা করছে, এরা সব তাকে চেনে—এই প্রকৃতি, এই দেশের ময়ূর হরিণ।

ইচ্ছে না করলেও সেই দিনগুলি মনে পড়ে, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধেও দিউড়ু এখানে পায় যেন একরকম দখলী স্বত্ব। মিটিং ভালো লাগে, পৃথিবীর সে এক অজানা দেশ, এত বিপদ মাথায় করে ভিতরে কেউ আসে না, পরের চোখ কন্ধের শত্রু।

সব ভালো লাগে, আবার সবই খারাপ হয়ে যায়, পরের ঘরে চোর হয়ে ঢোকার মতো লাগে, পুয়ুর স্মৃতি যেন হাঁক দিচ্ছে চোর চোর বলে! যে দিক দিয়েই ভাবুক আগে তার নিজের প্রতি দয়া হয়, তার পরে পুয়ুর প্রতি। আবার উদাস লাগে।

এখানে পুয়ুর বাপের বাড়ির বস্তিতে স্পষ্ট মনে হয় পুয়ুকে সে

ভালোবাসে না, কোনো দিন তারা কেউ কাউকে ভালোবাসেনি, আগা-গোড়া একটা ভুল—প্রতিকার নেই।

এই মিটিং গাঁ, তার ভালোবাসার সমাধিস্থল। কবে কোন ভুলে যাওয়া অতীতে রক্তের নেশায় তরল যৌবনের উন্মাদনায় এই গাঁয়ে সে ধরা পড়েছিল, ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে ঝোরার জলে ভাসিয়েছিল তার ঘরকরনার ছোট নৌকাখানি। মানুষ ছুটে বেড়ায়, ভাবলে বোঝে সব বৃথা। দিউড়ু সাঁওতা তাই বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ধরা পড়ে গেল—পুয়ু হল তার স্ত্রী। তারপর বিশাল জীবনে দিনে দিনে কত মেয়ে সে দেখেছে, মনে হয়েছে যে তারা সকলেই পুয়ুর চেয়ে সুন্দরী, সকলেই পুয়ুর চাইতে বেশী উপযুক্ত। চোখ দিয়ে দেখে, অনুভূতি দিয়ে মেপে, বাছতে বাছতে মন তার এগিয়ে গেছে অনেক দূর। 'পুয়ু, পুরানো সিটকে শুকনো পুয়ু, কত নীচে পড়ে রইল তার স্থান। আজ ভাবতে বসলে এক জনের পিছনে আর একজন—অসংখ্য পুলুমে, পিণ্টি, সোনাদেঈ আড়াল করে রেখেছে পুয়ুর ছায়াকে। কর্তব্যের কঠোর পথে হুঁশিয়ার থেকে, মেকীকে আসল বলে এগিয়ে না যায় সে জন্য চেতিয়ে দিতে সবরু সাঁওতার শুকনো কাশি আর নেই। বাধ্যবাধকতায় পড়ে, লজ্জা ভয়ের খাতিরে পরের হাতে লাগাম থাকা মনের গতি একরকমের, বনের মধ্যে বেপরোয়া ছুটে চলা মনের গতি আর এক রকমের, একটা আর একটার সঙ্গে ঠিক মতো মিশ খায় না।

পুয়ু অনেক নীচে, অথচ লোক-দেখানোভাবে দেখাতে হবে পুয়ু আর তার হৃদয় অভিন্ন, সব সময় তার মনে কেবল পুয়ু। কাজেই বাধ্য হয়ে হাসতে হবে, বাধ্য হয়ে মাথা নাড়তে হবে। কন্ধ যতই সরল সোজা বনের মানুষ হোক না কেন, সে মানুষ, এবং মানুষের নিজস্ব গুণ আত্মগোপনের জন্য প্রতারণা।

পুয়ুর সঙ্গে তার সম্পর্ক এমনি বলে, আবার সেই গাঁয়ে বিয়ে করেছে বলে, পুবুলির মনের উপরে রাগ মনের ভিতরে গুমরে রেখে বাধ্য হয়ে বাইরে লোকলজ্জার খাতিরে তাকে মুখোশ পরতে হয়, কারণ পুবুলি তার বোন হলেও পুবুলি এক জনের ঘরনী। দু'জন স্বাধীন মানুষের মধ্যে রেষা-রিষি হলে সম্পর্কই যা টুটে যায় কেবল, কারও হার জিতের কথা ওঠে না।

দিউড়ু ভাবছিল এইবারেই শেষ, সমাজ-বন্ধনের খাতিরে এই শেষ বারের মতো মিটিং গাঁয়ে তার কাজ চুকিয়ে দিয়ে সে মুখ ফেরাবে, তারপর পুবুলির ভাগ্য, তার আর কি কাজ এখানে ?

কিন্তু জায়গাটা ভালো। মনের ভিতরকার হাজার তর্ক-বিতর্ক মনের উদাসীন গেরুয়া রঙ ছাপিয়ে আজও সে দিনের স্মৃতি বার বার জেগে ওঠে—ঐ ওখানে ঐ সব জায়গাতেই হবে বুঝি, বন মিটিং পেরিয়ে সমুঝা গ্রামের পথ দিয়ে ঝঞ্ঝাবতী নদী পার হয়ে নারণপাটণা যাবার রাস্তা। এ-দিকে একটার পিছনে একটা পাহাড়ের পর পাহাড় : বিখ্যাত লাউমাল মুঠা—পুজারি পর্বত পর্যন্ত যার ধাপ, ও পাশে সোড়াবিশি মুঠার পথে রায়গড়ের কন্ধমালে গিয়ে ঠেকেছে। সমতলে নেমে আসার ঘাটের ঢালুর মাথায় এই মিটিং গা, কিন্তু কি দুর্ভেদ্য! কন্ধ এখানে নিশ্চিন্ত, নির্ভয়। পাহাড়ের গোলক ধাঁধার ভিতর কোথাও এখানে ঢোকবার পথ কেউ টের পাবে না। বনের বিপদ এড়িয়ে কেউ এখানে আসবে না কন্ধের হাঁড়ির খবর নিতে।

এই ভুলে যাওয়া পৃথিবীতে সে নিরঙ্কুশ ছত্রপতি।

কেবল নিরাশার দীর্ঘশ্বাস। এখানে তার স্বত্ব থেকেও কোন স্বত্ব নেই, কিছুই নেই, এখানে সে যেন কোথাকার কে।

পুবুলি আর বেশুর বিবাহ হবে।

ক্ষতি কি যদি বিবাহের অনেক আগে হতেই স্বামী স্ত্রীর মতো এক সঙ্গে ওরা ঘর সংসার শুরু করে থাকে ? কন্ধের আনন্দপূজার সংস্কারের ভিতরে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরকে চেনাজানার পরিসর আছে। কত খোঁজাখুঁজি, কত যাচাইয়ের পর এই সংসার-জঙ্গলে উপযুক্ত পুরুষের উপযুক্ত স্ত্রী জোটে, কিন্তু সে সব পূর্বরাগ বিবাহ পিঞ্জরের বাহিরে। বিবাহ না হলেও ক্ষতি ছিল না, বিবাহ অনুষ্ঠানেই বা বেশী আর কি হয় ? কিন্তু মানুষের শেষ দুর্বলতা আত্মাভিমান আত্মসম্মান কোন জাতির মধ্যে থেকেই লোপ পায়নি, সেই গুণকে পরিপুষ্ট করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার জন্যই কন্ধ বিবাহ করে, গদবা বিবাহ করে, পরজা বিবাহ করে—তার মনে মনে জোড় লাগার যে বিবাহ আগেই হয়ে গেছে তারি কেবল একটা শস্তা বিজ্ঞাপন।

রঘু সাঁওতা হয়তো মাথা নেড়ে বলবে, "একটি মাত্র ছেলে আমার তার কি বিয়ে আটকাবে নাকি ?" দিউড়ু চোখ লাল করে গর্জে

উঠে বলবে, "কি? আমার বোন কি 'ফাদ্রি' (দুশ্চরিত্রা) নাকি যে আমার বংশের নাম ডুবিয়ে তল দেশের লোকদের মতো রক্ষিতা হয়ে থাকবে?"

কিন্তু একই কথা। একদিনেই ফুঁ দিয়ে বিবাহের সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে পুবুলি বলে দিতে পারে—"আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে না, আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি না, আজ থেকে বিবাহ ভেঙে গেল, আমি চললাম।" সন্তান থাকলেও পালনের কোনো অসুবিধা হত না। সন্তান বাপের, চুরি করে নিয়ে যেতে পারলে মায়েরও। বাঁচবার সরঞ্জাম যেখানে অতি সরল, ছ' বছর বয়সে কাঁধে কোদাল কুড়ুল নিয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, মুখে ধুঙ্গিআ লাগিয়ে শিশু সংসারের উপার্জনক্ষম মানুষ হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে প্রাণ ধারণের উপকরণ জোটায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েই, যেখানে কাদা-মাটি দুখ-মড়কের বিকট বাস্তবের সামনে সকলেই সমান, সেখানকার সমাজ হয় আলাদা, অর্থনীতির পরিবর্তিত সংস্করণ যে সমাজের মূলভিত্তি, হাতে পায়ে পরে ঝম ঝম করে বাজানোর মতো কোনো শৌখিন শৃঙ্খল নেই সেখানে।

যাই হোক, পুবুলি আর বেণ্ডর বিবাহ হবে। গাঁয়ের খোলা জায়গায় সেই গ্রামের লোকেদের পঞ্চায়েত বসে কন্যার জন্য পণ দেওয়া-নেওয়াতেই তার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। ধরতনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্ধ, গুহামানবের উষাময় পদ্ধতিতে তার বিবাহ আচরণ। প্রথমে ভঞ্জ[1] কবির অনুরাগ, তারপর যুদ্ধে কন্যাহরণ একরকম কাঞ্চীবিজয়ের[2] মতো, তারপর শুভ বিবাহ। সমস্ত হট্টগোলের মধ্যে মেরুদণ্ডের মতো থাকে থাকে সাজানো ঘর করনার জন্য মানুষের উদ্বেগ ও উদ্যম। সেদিন রাত্রে একটা ছোট ভোজ হল, কন্ধ ভোজ ভালোবাসে। উঙ্গা (মাংস) আর কুচা (শাক), ওগু (ভাত) আর তম্পা (মাড়ুয়ার ভাত) সব একসঙ্গে মেশানো, শেষে মিটিং-এর গুপ্ত ঝরনার এক টিন মদ। উভয় পক্ষই খুশী হল। মাঝরাতে চারিদিকে তাকিয়ে সব নিঝুম নিস্তব্ধ

১ ওড়িশার সপ্তদশ শতাব্দীর মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ, অলোকসামান্য শব্দালঙ্কারসমন্বিত আদিরসপ্রধান বহু প্রসিদ্ধ কাব্যের রচয়িতা।

২ ওড়িশার রাজা পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দেখে বেশু কন্ধ আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঢুকল। পাড়ায় কেবল নিশ্বাসের শব্দ আর থেকে থেকে পাহারাদার কুকুরদের অস্তিত্বের পরিচয়। খেয়ে দেয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই। অন্ধকার ঘরে ঠিক দরজার পাশে সাদা সাদা কি যেন। বেশু কন্ধ দাঁড়িয়ে রইল। কোনো শব্দ নেই। বেশু পিছন ফিরল, ভাবল ফিরে যাই। শরীরে শক্তি থাকায় সংযম তার যথেষ্ট, পুবুলি ঘুমিয়ে পড়ে থাকলে সে তাকে বিরক্ত করবে না। সে পিছন ফিরতে ফিরতে পুবুলি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, বেশু ফিরে এল তার কাছে। চাপা গলায় মিষ্টি করে পুবুলি বলল, "ভারী ঘুম পাচ্ছে।" বেশু হাসল। এত রাত হয়ে গেছে, চোখ লাল হয়নি, দরজার পাশে কবাট ঘেঁষে গুটিসুটি হয়ে তেমনি বসে পুবুলি অপেক্ষা করে রয়েছে। সেই পুবুলি তার, পুরোপুরি তার।

"ঘুম পেয়েছে তো শুস্‌নি কেন নুনি ?"

"দরজা খোলা, ঘরে কেউ নেই।"

"ঘর পাহারা দিচ্ছিস্ তুই ?" বেশু হাসল। "উঃ কি ঘাম হচ্ছে। ঘর নিজেই নিজের পাহারা দেবে। বড় গরম লাগছে, চল্ আমরা বাইরে যাই।"

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। ঘাম-ধুলো-ময়লা ভরা লেংটি পরা একটি পুরুষ, তার দাড়ি শতমূলী লতার কাঁটার মতো, মুখে মহুয়ার মদের তীব্র গন্ধ, দেহ পাথরের মতো। আর মেয়েটি হলুদ রেড়ির তেল আর ঘামের আস্তর লাগিয়েছে, খোলা বুকের উপরে গোছা গোছা কাচের মালা কোমরে একখানি মোটা কাপড়।

বাইরে বেরিয়ে পড়ল তারা—ডানায় ডানায় লাগা আকাশের দুটি পাখীর মতো। এরা চোর ডাকাত নয়—নিশাচর প্রাণী ; কেবল মাটি আর বিদ্যুৎ মেলানো মেশানো মানুষ দুইটি, বন্ধ ঘরের কোণে সময় কাটানো যাদের পক্ষে কষ্টকর। আর মনের কথা খুলে ধরে, বুকের ধুকধুকি শুনতে শুনতে প্রায় বুজে আসা চোখে মিলনের একই তালে তাল মেলাতে চায় খোলা আকাশ, তাতে তারা থাক বা না থাক, আর খোলা মাটি, প্রকৃতি, ঝিঁঝি একটি দুটি, আর রাতের পাখী।

পথে বেশু বলল,"আর দেরি নেই নুনি, ডিসারি খুব শিগগির করেই যোগ

দিয়েছে, কালকেই আমাদের বিয়ে হবে। জিনিষপত্র জোগাড় করা, বাজনা আর ভোজের ব্যবস্থা করা—কাজ কি কম। তাই তো এত দেরি হল। যাই হোক মুনি, সব মনের মতনই হচ্ছে, তোর গাঁয়ের লোকেরা আর আমাকে দোষ দেবে না।" পুবুলি কিছু বলল না, কেবল বেণুর হাত চেপে ধরে চলতে লাগল।

অন্ধকার রাত্রিতে বনে আগুন জ্বলছে, দূরের দিগ্বলয় আলোয় উজ্জ্বল। কালো বিস্তৃতির ভিতরে উপর নীচ করে আলোর ছক কাটা, সারি সারি ঝুলছে আলোর রেখা, লতার মতন লতিয়ে লতিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফলের মতো ঝুলছে—বনদেশের গরম কালের হাউই বাজি। আঁধারের ভিতরে আগুন কি ভালো লাগে—অজানার ভিতরে জানার আলোর মতো। পর্বতের অবয়ব দেখা যাচ্ছে না, কেবল শূন্যে আগুন দুলছে। কেবল বিস্ময়ের দ্যোতক।

আশে পাশের বনের গাছগুলি যেন অন্ধকারেব কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে পাতলা অন্ধকার, উপরে নীচে লম্বা হয়ে চলে গেছে দূরে দূরে, কোথাও গাঢ় কোথাও পাতলা একই কালো অন্ধকারের ভিন্ন রূপ। উপরে ঝক ঝক করছে তারা, জলজ্বলে আলোর মতো ছায়াপথ।

রাত দুপুর গডিয়ে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। দলছাডা এক একটি জোনাকি ছোট মশাল জেলে দূর পথে তীর্থযাত্রা করেছে। উপর থেকে সর সর করে কখনও নেমে আসছে খ'সে পড়া টুকরো টুকরো তারা—আগুনের ফুলকি পডার মতো উল্কা পড়ে মাঝপথেই নিবে যাচ্ছে।

এমনি রাতে পাথরের উপরে বেণু আর পুবুলি বসে ছিল। একদিকে গাঁয়ের চাঁদের নির্ভরময় ছবি, আর একদিকে মাটি ঢালু হয়ে নামতে নামতে চলে গেছে পাহাড়তলির পাতালের পেটের ভিতরে।

ঢালুতে অল্প দূরে চিতা বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেণু বলল, "রোজ এমনি সময়ে আসছে কুকুর চোর 'ডুর্কা'। একটা সাদা কুকুর কি সাদা ছাগল চারে রেখে মাচানে বসলে হত একটা রাত।" পুবুলির চোখ ঢুলে আসছিল, চমকে তাকিয়ে সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল, "ওঃ এইটে—" গলার আওয়াজে 'ডুর্কা' পালিয়ে গেল, আর এল না।

কতক্ষণ পরে দূরের বন থেকে মড় মড় সাঁই সাঁই করে একটা শব্দ আসতে লাগল। বেশু বলল, "ঝড় আসছে, চল্ এবার যাই।" ঝড় কাছে আসছে। আগে আগে এসে গায়ে লাগে দমকা বাতাসের পুলক স্পর্শ। নিঝুম অন্ধকার রাতে ঝড়ের শব্দে মনের ভিতরে উড়ে উড়ে আসে দুর্বলতা, আগে ঠাকুরমার বলা কত আধশোনা কাহিনীর কিম্ভূত কল্পনা। পুবুলির মন ভরা ছিল। পরিপূর্ণ শান্তির আলস্য ধীরে সরিয়ে দিয়ে হাই তুলে পুবুলি উঠে দাঁড়াল।

ঝড়ের শব্দ কাছিয়ে এল। পুবুলি বলল, "এমনি আঁধার রাতে ঝড়ের সঙ্গে জুটে ভূত প্রেতও বেরিয়ে পড়েছে হয়তো"।

বেশু বলল, "বেরিয়েছে তো বেরোক, আমাদের কি করবে?"

ঘরের কাছে আসতে পুবুলি বলল, "ভাবছিলাম একটা কথা। ভাবছিলান আমি যখন মরে যাব তখন এমনি আঁধার রাতে ঝড়ের সঙ্গে এসে তোমার ঘর-করনা দেখে দেখে যাব। তুমি কি চিনতে পারবে?" বেশুর কাছে হাত মোচড়ানি খেয়ে পুবুলি বলল, "উ—না না, আর বলব না। জানি তুমি রাগ করবে!"

ঘরের মধ্যে ঢুকে বেশু বলল, "চুপটি করে শুয়ে পড়্। কাল যে আমাদের বিয়ে।"

॥ পঁয়ষট্টি ॥

সেই নিশীথ রাত্রে, আঁধার করা ঝড়ের সামনে যখন চারিদিকে কড় কড় শব্দ, সকলেই নিরাপদে লুকোবার জায়গা খুঁজছে, গর্ত খুঁজছে, প্রকৃতির ভ্রূকুটিতে খেলছে অজানা ভয়, সেই রাত্রে চলেছিল আর একটি লোক, শুকনো হাড়-বেরুনো বুড়ো একটি, কাঁধে টাঙ্গি, এক হাতে জ্বলছে মোটা দড়ির আগুন জ্বল জ্বল করে, আর এক হাতে মাটির একটি কলসী। অন্ধকারের অংশ সেও, আঁধারের দেবতার উপাসক। গাছের তলায় খালি পাতার খড় খড় শব্দ, বাইরে খোলা জায়গায় তারার আলোয় সে কেবল একটি ছায়া,

পিঠের মাঝখানে বন্ধনীচিহ্নের মতন একটি শুকনো, ঝড়ে জলে কালো হয়ে যাওয়া বাঁশের ধনুক, তার নীচে দুইখানি লাঠি, চাটুর মতো চেপটা চেপটা পাছা দুখানা, ব্যস্তসমস্ত হয়ে আগে পিছনে যাচ্ছে আসছে, লাঠি দুটি চলেছে ঠুক ঠুক করে ক্রমাগত—সমান ব্যবধান, সমান গতি।

সেই এ-গাঁয়ের ডিসারী বুড়ো, পুন্নুর বংশেরই কেউ একজন, সেবার হাগু'ণার সঙ্গে মিণিআপায়ু গিয়েছিল ছেলেকে আশীর্বাদ করতে।

সামনের আকাশে অন্ধকার পাল উড়িয়ে আসছে বছরের প্রথম আঁধি। বাতাসের বেগে গাছপালা দুলতে লেগেছে, বুড়ো কলসীটি নিয়ে চলেছে। এই রাতের পর কাল দুই যুবক যুবতীর বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছে সে, কালকের যোগে বিবাহ হবে—বুড়োর দায়িত্ব, পুজো ভালোভাবে হবে, দেবতা প্রসন্ন হবে, যে-দুজনকে সে এক সঙ্গে বাঁধবে তার পূজা-মন্ত্রের শক্ত আঠায়, সে-দুজনের প্রেম হবে অটল, সৌভাগ্য আসবে, একের কল্যাণ হলে গোষ্ঠীর মঙ্গল হবে। এই দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তার চোখে ঘুম নেই, ভুল হোক আর ঠিক হোক, তর্কের গোলক ধাঁধায় পা ফসকে পড়েনি সে, কেবল তার বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসে তার অন্তরের নিষ্ঠা।

কাল পূজা হবে। কন্ধের শাস্ত্রে আছে যে বিবাহের জন্য শুদ্ধ পূত এক কলসী জল আগের রাত থেকেই এনে রেখে দেওয়া চাই। রাত্রির অন্ধকারে, কেউ না দেখতে পায়, কেউ না টের পায় এমনিভাবে চুপিচুপি কলসীতে জল ভরে এনে সাজো রাখতে হয়। কারও দৃষ্টি পড়লে সে জল অপবিত্র হয়ে যাবে। পশু তো পশু, ছোট্ট পাখীটিও যদি সেই ঘাটে সেই সময়ে ঠোঁট ডুবিয়ে থাকে তাহলে সে ঘাটের জল অশুদ্ধ হয়ে গেল। তাই নির্জনে নিরালায় তার অভিযান। 'আস্তা', 'উত্‌রা' অথবা 'লদা' যোগ পড়া চাই—কন্ধের গণনায় সাতাশটি যোগের মধ্যে শুদ্ধ যোগ—বনের পাখী জল খাবে না এমনি সময়ে নতুন কলসী নিয়ে ডিসারী জলে নামবে। সেই জলে হবে বিয়ে বাড়ির কাজ।

ঝড়ের মধ্যে বাঘের গর্জনের মতো শোনা যাচ্ছে না? ঝড় তাকে চোখ টিপে বলছে এই তো তোর সুযোগ। ঐ জোড়া বটে অশ্বত্থের নীচেই সে-বছর বাঘে মানুষ খেয়েছিল। আর ঐ দিকে ভুট্টার ক্ষেতে, আবার ঐ মাড়ুয়ার ক্ষেতের টিপির উপরে লম্বা পাথরটার গোড়ায় পদে পদেই বিপদের ইতিহাস।

ঝোরার ঐ বাঁকে—এই তো সেদিনের কথা—'ষাঠি' সাপ জলের ভিতর থেকে লেজের ঝাপটা মেরে গাঁয়ের একটি বুড়ীকে পাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল, অপমৃত্যু!

গ্রাম থেকে দূরে এই অন্ধকারে পায়ের কাছে কত রকমের শব্দ, কি যেন সব চলাফেরা করছে, কেউ থাপ পেতে আছে, কেউ লাফ দিচ্ছে, কেউ লুকোচ্ছে। দেবতার সময় এটা—আর পশুর, মানুষ অচেতন অঘোর ঘুমে, বুড়ো চলেছে। কাল বাদে পরশুই হয় তো তার কাল পূর্ণ হবে, তারপর 'ডুমা' হয়ে এই ঝড় আর অন্ধকারের সঙ্গে মিশে সে ঘুরে বেড়াবে যত দিন না আবার নূতন জন্ম হয়। সে-দিকে বুড়োর ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কন্ধ, সে সংসারকে যেমনটি পায় তেমনটিই মেনে নেয়, ভয় থাকলেও কর্তব্য থেকে তাকে নড়াতে পারে না। বুড়োরই দেখতা এই ঝরনা নদীর খাড়া ধারের উপরে কে জানে কত লোকের ছায়া অস্ত গেছে, এই নির্জনতার মধ্যে সব মনে পড়ে। তারাই তার কষ্টিপাথর, ফাঁকা আকাশেরও চোখ আছে, দর্মু ঘুমোয় না, দর্তনী ঘুমোয় না, আর কায়া ছায়া হয়েছে যত পূর্বপুরুষের 'ডুমা' তারা সকলেই সর্বদা দেখতে থাকে কন্ধ তার আদর্শ রেখেছে না হারিয়ে ফেলেছে।

ঐ শুকনো ডিসারী, লোক গন্‌তিতে একজন মাত্র সে, দলের গন্‌তিতে কোথায় কোন পিছনে ভিড়ের আড়ালে থেকে যায় তার দেহটুকু। 'অধিকারী'র চোখে লেংটি-পরা ধুঙ্গিআ-টানা কন্ধ একটা, রুক্ষ ফুরফুরে চুল, চোখ নিচু করেই থাকে, কোনো বৈশিষ্ট্য নেই—রোগাপাতলা বুড়ো একটি, ভার বইতে পারবে না, গাছের ডাল কাটতে দিলে তাও পারবে না, থকে যাবে।

কিন্তু রাত দুপুরে সে চলেছে, দিনে যে মৌন, অন্ধকারে সে ত্যাগের দীপ্তিতে হাসি মুখে চলেছে। তারই এই শুকনো দুখানি হাতের দৌলতে কত ঘরের অনিষ্ট কেটে গেছে, কত বিবাহ সুখময় হয়েছে, মোটাসোটা কালোকোলো ধুলোময়লা ভরা গা সবলসুস্থ কন্ধ শিশু এত এত,—সবই তার কেরামতি তার নিষ্ঠার প্রমাণ বলে সে ভাবে, সমাজের উপকারে লেগেছে বলে ভালো লাগে, খুশী হয়।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঝোরার খাড়া কালো পাড় বেয়ে

অন্ধকারের ভিতরে নেমে গেল। গাছের ঠুঁটো গোড়া আর পাথরের টুকরো। নীচেকার কর্কশ মাটির স্পর্শেই পথ চেনে ডিসারী, চেনে দুনিয়াকে। জলের কলসী নিয়ে সে উঠে এল। বাতাসের জোর বেড়েছে, দড়ির আগুনের ঝুরি ছিটকে ছিটকে উড়ে যাচ্ছে, অর্ধেকটা আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে, দূরে অনবরত মেঘ ডাকছে, বাজ পড়ছে। দড়ির আগুনটুকু সে শক্ত করে ধরে ছিল, জলের কলসী সাবধানে সামলে রেখেছিল। পৃথিবীর এই বিকট ভয়ঙ্কর রূপ দেখে শুকনো বুকের ভিতরটা যেন ছমছম করছিল, কারণ কর্তব্য শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসতে আসতে ডিসারী মন্ত্র জপ করে চলেছে—

সাপে না কাটে—
বাঘে না খায়—
পায়ে কাঁটা না ফোটে—
মাথায় ডাল না লাগে—
কারো দৃষ্টি না লাগে, সব সুখের হয়।

বাতাসে মন্ত্রের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল না, শুনছিল মনে মনে।

কন্ধ গোষ্ঠীর এক জন নগণ্য কর্মী সে, তার কাজ নিজের জন্য নয়, তার দলের জন্য।

॥ ছেষট্টি ॥

রাতের ঝড় রাতেই কোথায় গেল চলে। সকালে পূর্বদিক উজ্জ্বল হয়ে সিঁদুরে রঙ ফুটে উঠল। ঘরের মোরগের ডাক, বন মোরগের হাঁক, ময়ূরের কেকারব, বনের পাখীর কলরব, সব মিলে রাজার ঘুম ভাঙাবার নহবতের বাজনাকে ছাড়িয়ে যায়, পৃথিবীর কাজের মানুষদের উদ্দেশে সৃষ্টির আনন্দ-বিশ্বাসের স্বাগতম্—।

পুবুলি উঠল, উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে একই চিন্তায় মগ্ন হয়ে এ ভর কথা শোনবার অপেক্ষায় আছে, আজ তাদের বিবাহ।

এক সঙ্গে ঘর করছে বলে নূতনত্ব তাদের কমে যায়নি। বিবাহের

আনন্দ গোষ্ঠীর আনন্দ, একক মানুষ তার ভাগ নিতে বাধ্য। আজ দলের সঙ্গে ওদের অঙ্গীকার হবে, সকলের মতোই ওরাও পরস্পরকে নিয়ে পরস্পরের জন্য সংসার করবে, আজ ভবিষ্যতের স্বপ্নকে দলের দৃষ্টি দিয়ে ওরা দেখবে। সব আনন্দ আর বিস্ময়। শুভদিন।

বেশু চলে গেল, আয়োজন করতে হবে। বেজুণী আর ডিসান্নীর সঙ্গে পরামর্শ, ঘরের সামনে ছায়ামণ্ডপ তৈরি। বুড়ো বাপ, পরের মতো গা-ছাড়া দিয়ে থাকলে তার কাজ হবে না। পুবুলিও গেল। ঘরদোর নিকিয়ে সব ঠিকঠাক করার দায় তারই। সব সেরে সে নিজে প্রস্তুত হবে। রঘু সাঁওতা সকালে উঠেই কোথায় গেছে, তার দেখা নেই। মিণিআপায়ুর লোকেরা তো বাইরে বাইরেই।

এক রাশ কাজ সেরে ঘেমে ঝোল হয়ে বেশু গিয়ে জাগিলি কন্কের কাছে হাজির হল। জাগিলি তার বন্ধু, আর জাগিলি খেউরি করে। জাগিলি হাসতে হাসতে তামাক পাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, "বস্।" বেশু কেন এসেছে জাগিলির বুঝতে বাকী নেই, তবু শুধোল, "কি, শিকারে যাবি বলে ডাকতে এসেছিস্? ভালো করেছিস্, ময়ূর নেমেছে হয়তো।"

"না, আজ শিকার না।"

"শিকার আছে, কিন্তু তুই একাই যাবি, আমি গেলে ভাগ দিতে হবে, আজ তুই ভাগ দিবি না—এই কথা তো?"

"না সত্যি, শিকারে যাব না। এই দেখ্ তো আমার দাড়ি কেমন বেড়ে গেছে, ভালুকের মতন হয়েছে। আর মাথায় যা চুল হয়েছে—আহা হা। গরম বাড়ছে কিনা, চুল গুলো বড় অসুবিধে লাগছে, একটু কামিয়ে দিবি না?"

"হাঁ হাঁ দেব, দেব না কেন। গরম তো বাডছেই, এবার আরও বাড়বে, না কি রে?" দুজনেই হাসল। বেশু হাটু মুড়ে বসে রইল, জাগিলি তার কাজ আরম্ভ করল। ঘরের চাল থেকে তার হিণিপ্পা (ক্ষুর) বার করল। মস্ত বড় হাতিয়ার, ঐ একটা ছুরিতে দুই কাজ হয়—খেউরি আর চুল কাটা। বেশুর মুখ সাফ হল, দু-এক জায়গায় আঁচড়ে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। কপাল থেকে সোজা উপর দিকে মাথার অর্ধেক অবধি পরিষ্কার করে চুল ছাঁটা হল। মাড়ুয়ার ফসল কাটার মতো মাথার চুল মজবুত করে ধরে সেই

'ছিপিপ্পার ধারে ছোট করে কাটতে কাটতে জাগিলি এগুল, বেগু কেবল থেকেথেকে বলে "সমান হচ্ছে তো?"

মাথার পিছনের দিকে এক গোছা লম্বা চুল রইল—জন্মাবধি সে রয়েছে, মাথার চুলেরও যে লম্বা ইতিহাস আছে এটুকু তারই প্রমাণ। কামানো শেষ হল। চারিদিকে নেড়া করে করে মাঝখানে নারকেল কাতার মতন রয়ে গেল এক গোছা চুল, সেই তার শোভা, সেই তার সৌন্দর্য। মাথার সম্ভ কামানো অংশ সাদা সাদা দেখাচ্ছে—মাঝের জঙ্গলের চারিদিকে সাদা পোড়ুর ছাইয়ের মতো। এত বড হাতিয়ারে কোথাও ঘাস চাঁচার মতো কোথাও জঙ্গল কাটার মতন। অতক্ষণ ধৈর্য ধরে খেউরি হওয়া একটা গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করার সমান। সব সয়ে বেগু গম্ভীর ভাবে তার কর্তব্য করে যাচ্ছিল, কেবল ঘেমে উঠছিল।

সেখান থেকে গিয়ে নদীর ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করল। সরু বালি আর চিলি পাতা দিয়ে গা হাত বগডাল, সর্বাঙ্গ তামার মতো রঙ হয়ে গেল। তারপর একখানা ফরসা কৌপীন পরল। মাথায় রেড়ির তেল মেখে চুলের গোছাটুকু আঁচডে তাতে একটা গিঁঠ দিল মন্দিরের চূড়োর মতো করে, তাতে একটি ছোট কাঠের চিরুনি গুঁজে নিল।

শুচিতা ও নিষ্ঠায় মনের ভিতর পবিত্র। নদীর ধার থেকে প্রস্তুত হয়ে গ্রামে আসতে আসতে মনে মনে বেগু কন্ধ দেবতাদের ডাকতে লাগল— দর্মু, দর্তনী, ঝাকর দেবতা, বন-দেবতা, ঘর-দেবতা। আজ তার এত বড একটি দিন, আজ তার সকলের সাহায্য দরকার। কত না-দেখা বিপদ, অজানা অমঙ্গল, মানুষের জীবন জলের বুদ্‌বুদের মতো। যতই মনে বল থাক, সাহস থাক, গম্ভীরভাবে জীবনের নিষ্পত্তির সম্মুখে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যায়, তখন সূর্যের দিকে চেয়ে মানুষ তেজ ভিক্ষা করে, পবনের কাছে বল, মাটির কাছে সইবার শক্তি।

ওদিকের বনে ময়ূর ডাকছে।

ময়ূরের মাংসের সুস্বাদের কথা মনে পড়ল, বনে বনে ঘোরার নেশা মাথা চাড়া দিলে। বেগু সে-সব রুখে নিলে, শিকারীর ধনুর্বাণ একপাশে সরিয়ে দিয়ে মাংসের প্রতি প্রবৃত্তি নিরোধ করে সে তপস্যা করবে, সব দিকেই মঙ্গল চাই তার।

সারা জীবনের মধ্যে আজকের এই দিনটিই তো—। জন্মের দিনের কথা মনে নেই, মৃত্যুর দিনে জ্ঞান থাকবে না, দুই শিখরের মাঝে আজকের দিনই তার মনের মতো ঘাট (পাহাড়ের ঘাট)—অনুভূতির তরঙ্গ দুলছে সামনে পিছনে।

॥ সাতষট্টি ॥

পুবুলিকে হলুদবাটা রেড়ির তেল জবজবে করে মাখিয়ে মিটিং গাঁয়ের মেয়েরা স্নানের ঘাটে নিয়ে গেল। গুটি পঞ্চাশ মেয়ের সার লেগে গেছে। কোন গাঁয়ের সে, আর কোন গাঁয়ের তারা। কিন্তু উৎসাহ তাদেরি। পঞ্চাশটি মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আনন্দে, পঞ্চাশটি কণ্ঠে এক সঙ্গে গান। পুবুলি তার নিজের নয়, সে গোষ্ঠীর। গাঁয়ের খোলা জায়গায় বাজনা বসেছে, সারা গাঁয়ের লোক উৎসবের জন্য প্রস্তুত, গাঁয়ের বউ-ঝিরা নতুন কনের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। কন্ধের এক আড়ার গাঁয়ের রীতি এই, এক জনের যা সকলেরই তা।

পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো দেশে বিয়েবাড়ির ধুমধাম কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে চলেছিল। পথের পথিক কাঁধের বোঝা নামিয়ে কান পাতে। ভিন গাঁয়ের স্ত্রীলোক এ পথে যেতে যেতে এ গাঁয়ের বিয়ের গানের ধুয়ো ধরে কণ্ঠ মেলায়।

শান্ত স্নিগ্ধ বনের কোলে পাথর ভরা চপলা নদী। চারিদিকে সাড়া তুলে সকলে জলে নামল, কনের গায়ে আঁজলা আঁজলা জল দিতে দিতে জল ছিটানোর গান গাইতে লাগল।

সকলে আনন্দে মেতে উঠেছে। পুবুলি তাদের খেলবার পুতুলটি কেবল। কেউ তার গায়ে মুখে চিলি পাতা বাটা মাখিয়ে গায়ের ময়লা তুলে দিল, কেউ গা ডলে দিল, কেউ মুছিয়ে দিল। আবার পুবুলিকে স্নানের ঘাট থেকে তুলে নিয়ে তারা চলল। সমস্বরে গান চলেইছে। পুবুলির নিজের আয়ত্তে কিছুই ছিলনা, কেবল একটি প্রতীক সে, সেই প্রতীককে উপলক্ষ করে ভালোবেসে ঘর করবার শক্তির সামনে এত লোকের গান আর নাচ। মাথায় রেড়ির তেল লাগিয়ে চুল আঁচড়ে দেওয়া হল, গায়ে মুখে

হলুদ আর রেড়ির তেলের প্রলেপ, সারা গায়ে গোছা গোছা বনফুলের মালা। কন্ধদেশের বিচিত্র অলঙ্কার হাতে পায়ে ঝম ঝম করে বাজছে। রঘু সাঁওতা একটি নতুন কাপড় আর একটি টাকা উপহার দিলে। পুবুলিও প্রস্তুত হল।

বেলা দুই লাঠি হতে রঘু সাঁওতার বাইরের উঠোন বাজনার আওয়াজে কেঁপে উঠল। গাঁয়ের লোক এসে জড় হল। ছায়ামণ্ডপ তৈরী হয়ে গেছে, তিন দিক ডাল পাতায় ঘেরা অন্ধকার মতো ঘর একখানি। ডিসারী বুড়ো তার ভিতরে মঙ্গল কলস রেখে দিল, গত রাত্রে এত কষ্ট করে আনা জলের কলসীটি। ভেলার ফল, রঙীন খড়ি-পাথরের গুঁড়ো, হলুদমাখানো আতপ চাল সব ছড়াল, প্রদীপ লাগাল, ধূপ জ্বালল। একলা সেই আঁধার ঘরে বসে গাঁয়ের পুরোহিত—জানী—অবোধ্য মন্ত্রের মেঘের বাষ্প উড়িয়ে দেবতার প্রতিষ্ঠা করল। বাইরে গ্রামের বেজুণীর সঙ্গে বুড়ীরা গানের ধুয়ো ধরল। মশার গুনগুন থেকে আরম্ভ করে ঢোলের আওয়াজ পর্যন্ত মন্ত্রের শব্দ ক্রমে ক্রমে চড়ল, বেজুণীর উপরে দেবতার ভর হল, পুজো আরম্ভ হল।

বেজুণী লাফ ঝাঁপ শুরু করল। পাড়া-পড়শী স্ত্রীলোকেরা পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগল, মদ ঢালা হল, মুরগীর ডিম রাখা হল, এমনি করে কাজ এগতে লাগল।

ডিসারী লগ্ন ধরতে কনেকে নিয়ে সবাই নদীর ধারে গেল। সেখানে আগে রাহু পূজা অর্থাৎ ঘাট পূজা, তারপর বনের ভিতরে ঝাকর দেবতার পূজা, অন্যান্য দেবতাদের স্তব। গাঁয়ের চারিদিকে দেবতার আস্থানগুলিতে নকশা করা ছোট ছোট কাঠের বর্শা, কাঠের তলোয়ার রেখে দেওয়া হল, মুরগীর ডিম, ফুল, তাও রাখা হল। তখন বেলা দুপুর। কনের পিছনে পিছনে দুই সারি হয়ে স্ত্রীপুরুষেরা কাছের জঙ্গলে গেল, মুখে বাইলে বাইলে ধুয়োর গান। জঙ্গলের মধ্যে কন্দ খোঁড়া পর্ব। কন্যা একটি কন্দ খুঁড়ে নিয়ে ফিরে এল, তার পিছনে পিছনে কলা, কন্দ আর অন্যান্য সবজি নিয়ে মিছিল করে ধাংড়ারা চলল। বাকী স্ত্রী পুরুষেরা তাদের পিছনে পিছনে চলল। গ্রামের চারিদিকে ঘুরে আসা হল। ধাংড়ারা কন্দ খোঁড়ার গান গাইছিল, সবাই মিলে ধুয়ো ধরছিল—ডুম্বরা মালিঙ্গা আদর করে ধাংড়ীদের ডুম্বর লেম্বর বলে ডেকে আপনি বাহাদুরি নেবার ফন্দি—

হেঁ হেঁ ডুম্বরা মালিঙ্গা (ওগো ডুম্বররা, মালিরা)
তাড়িঙ্গা তাচ্চামান্না মেল (আমরা কলা এনেছি)
কুন্নাঞা তাচ্চামান্না মেল (আমরা কন্দ এনেছি)
বিরিবাডাতি লেহেঁ তত্তি
মেএণা হারা লেহেঁ তত্তি
ডুম্বরা মালিঙ্গা (ও মামার বাড়ির মেয়েরা, আনো আনো)

কেবল হেঁ হেঁ ডুম্বরা মালিঙ্গা। সব কিছুতে কন্ধের পরম্পরার অভিনয়। কন্যা মঙ্গলবতী হল, ঘর গেরস্তালি করতে বসল। কন্ধের সহজ জীবনযাত্রার আদিম কাজ হল বন থেকে কন্দ খুঁড়ে আনা, তাতে সে যোগ দিল। তারপর স্বামীস্ত্রী মিলেমিশে সুখে লেন-দেনের ঘর-করনা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে যে করে হোক কিছু কুড়িয়েবাড়িয়ে স্বামী ঘরে আনবে, স্ত্রী 'পেজ্' রেঁধে বেড়ে দেবে, তামাক পাতা পাকিয়ে চুরুট করে দেবে, আদর দেবে, সোহাগ করবে।

একজনের শুভ বিবাহ,—অন্যদের মনে পড়ে নিজের নিজের অতীতের কথা। দিউড়ু সাঁওতা একটি উঁচু পাথরের উপরে বসে বিয়ে-বাড়ি দেখছিল—সারা গাঁ হলুদ জলে সপসপে জবজবে, মানুষের ভিড়ে ঢেউ খেলছে, সকলের গলায় একই গান, সকলের মুখে একই আবেশ। গ্রাম যেন তোলপাড় হচ্ছে। আজ দুটি মানুষের বিয়ে।

দিউড়ু ভাবছিল, একদিন তারও বিয়ে হয়েছিল।

সেদিনও এমনি ছায়ামণ্ডপ হয়েছিল, বাজনা বাজছিল, বাজনায় আর গানে পাড়া কাঁপছিল। কোনো শ্লোক কোনো পূজার কমতি হয়নি তার বিয়েতে। আজ সে-কথা ভাবলে রাগ ধরে, উদাস লাগে। বিয়ে—ছ্যাঃ! বিয়েতে তার আর আস্থা নেই। যত মিছে কথা। দড়ি দিয়ে বাঁধলেই দুটো মনে জোড় ধরে না কখনো। কেবল লোক দেখানো—।

দুটি প্রাণী বালির ঘর তুলে মিছিমিছি খেলাঘরের গেরস্তালি পাততে ব্যস্ত। তাদের পুতুল করে সমাজ বিয়ে-বিয়ে খেলবে। লোকেরা শিঙা বাজাবে, ঢোল পিটবে, সেটা একটা উপলক্ষ হবে হৈ চৈ করবার, নাচবার, মদ খাবার। সংসার তৃপ্ত, গোষ্ঠীর খেলাও শেষ। দুটি জন্তু দুদিক থেকে এসে ঢুকবে অন্ধকারের মধ্যে, বেয়াড়াপনা বেজোড়পনা লুকিয়ে রেখে যেতে

যাবে দু'দিন কাঁচা মাংসের মূল্য যাচাইয়ে। তারপর আঠা শুকিয়ে যাবে, গাঁট খুলে যাবে, তখন সব কেবল বেয়াড়া বেখাপ, পরস্পর মুখোমুখি—লেগে যাবে দাঁতে দাঁতে, ঠোঁটে ঠোঁটে, ঠুঁটো গোড়া আর পাথুরে ডেলার সঙ্গে ঠুঁটো গোড়া আর পাথুরে ডেলা। তবু সেই সংঘর্ষের মধ্যে খিটিরমিটির করতে করতে ঘরকরনা চালিয়ে নিতে হবে বাইরের দশ জনকে দেখানোর জন্য, শুভ বিবাহের বন্ধকী তমসুক আর কখনও রেয়াত হবে না।

সেই উঁচু পাথরের উপরে বসে দিউড়ু সাঁওতা চারিদিক দেখতে দেখতে পায়েয় উপবে পা তুলে ধোঁয়া খেতে খেতে দিউড়ু সাঁওতা জখমী মন নিয়ে সমাজের রীতি আলোচনা করছিল। হাসি পায় তাব। থেকে থেকে এক চোট সমালোচনা করে ঠাট্টার ছলে : "আরো চেঁচিয়ে গাও," "কোমর দুলছে না," "নাচ হ'ল না"। অকারণে তার মুখ বিকৃত হযে ওঠে, এমনি করেই শান্তি পায় সে, এমনি করেই তার মনের বিষ বার হয়ে যায়।

কে তাকে পোছে ? আজ লোকেরা মদ খায়, সাধারণ দৃশ্য।

রোদের ঝাঁজ বেড়ে উঠেছে। বনের ভাপসা নিশ্বাসের মতো থেকে থেকে এক রাশ নদীর হাওয়া আসছে। বর বেশু কন্ধ অপেক্ষা কবতে করতে ছটফট করছিল। মণ্ডপের সামনে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে অসংযত কোলাহল। শুটকো বুড়ো ডিসারী মাটিতে একটি সোজা কাঠি পুঁতে অপেক্ষা করে আছে। ডিসারী ছায়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, সকলকে চমকিয়ে দিয়ে বলল, "এইবার বিয়ে লাগল।" তার সরু হাতটি তুলতে না তুলতে সব গোলমাল থেমে গেল। বেজুনী নিজের পেটে তলোয়ার ফুঁড়তে লাগল, মুখ হাঁ করে ধূপদানির উপরে ঝুঁকে পড়ে ধূপের ধোঁয়া খেতে লাগল। সিঁদুর মাখানো তলোয়ার উঁচিয়ে ঘুমের ঘোরে চলার মতন সে পায়ে পায়ে ডিসারীর দিকে চলে এল। ডিসারী কেবল বলল "হুঁ"।

এর বেশী আর কিছু বলতে হল না। বরকে নিয়ে বরপক্ষের দু'জন প্রতিনিধি রঘু সাঁওতা আর মুর্জু কন্ধ এল। কনেকে নিয়ে কন্যাপক্ষের দুজন প্রতিনিধি আর দিউড়ু সাঁওতা এল। ডিসারী আর এক হাতে আবার ইশারা করল। বাজনার আওয়াজে পাড়া কেঁপে উঠল। বনের সব জন্তু যেন সন্ত্রস্ত হয়ে এক সঙ্গে ডাক ছাড়ছে। ডিসারী গিয়ে জলের কলসীটি আনল। কলাপাতায় কলসীর মুখ বেঁধে সেটা কনের মাথায় তুলে দিল।

জলের কলসী মাথায় নিয়ে গুরু দায়িত্ব মাথায় করার মতো গম্ভীর হয়ে পুবুলি বেশু কন্ধের চারিদিকে ঘুরতে লাগল। ঘোরা শেষ হলে ডিসারী পুবুলিকে নিয়ে বেশু কন্ধের কাছে এনে বলল, "পা চেপে ধর।" সমগ্র গোষ্ঠীর জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে-থাকা চোখের সামনে বেশু তার ডান পা দিয়ে পুবুলির বাঁ পা চেপে ধরলে। কানে তালা ধরিয়ে বাজনা বাজছে। বর-কন্যা তেমনি দাঁড়িয়ে রইল আর তাদের চারপাশে উভয়পক্ষের দুই দুই জন এবং তাদের পিছন পিছন দু'জন বেজুণী বরকন্যাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল, মণ্ডপের কাছে জানী বসে মন্ত্র পড়তে লাগল। বারান্দার উপর থেকে, পাথরের উপর থেকে ভিড করে ঝুঁকে পড়ে গৃহিণীরা ছেলেপিলেরা সবাই বিয়ে দেখছিল। ডিসারী বলল, "লগ্ন হল"। ডিসারী জলের কলসী তুলে দিল, বেজুণী বরকন্যাকে পাশাপাশি দাঁড করিয়ে দুজনের মাথা দুজনের মাথায় ঠেকিয়ে সেই জোড়া মাথার উপরে জলের কলসী রাখল। দুজনে একসঙ্গে ডিসারীর মন্ত্র করা জল মাথায় নিয়ে দাঁডিযে রইল। তারপব বেজুণী জলের কলসীটি তুলে দুইজনের মাথায় ঢেলে দিল। বিয়ে শেষ হল।

জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে সারা গাঁয়ের লোক দৌডে এল। স্ত্রীলোকেরা পুবুলিকে মাথার উপরে তুলে নিলে। পুরুষেরাও বেশু কন্ধকে কাঁধে তুলে নিল। বরকন্যাকে কাঁধে নিয়ে মুখোমুখী হয়ে দুই দল নাচতে লাগল।

এই সময়ে সকলেরই মুখে প্রাচীন পদ্ধতিতে কন্যা নামানোর সাধ আহ্লাদের গান, আবার সেই লেম্বর ডুম্বর তালস নিলস প্রভৃতি ধাংড়ীদের আদরের নাম ধরে গান, সেইরকম তাতেও মামার মেয়ের প্রতিশব্দ 'বিরি-বাডা', 'মেহেণাতাঙ্গি', প্রভৃতি লাগানো, 'সংগরগোড়ি' 'বন্দরপাণি' অর্থাৎ 'সঙ্গের লোক'-এর প্রতিশব্দ সব রযেছে, সেই রকম হৈ হৈ-এর মধ্যেই তারও শেষ। রোদগ্রীষ্ম ভুলে, ধুলো ধোঁয়া ভুলে বিশৃঙ্খল হয়ে সবাই নাচল। কত শিটি, কত হাঁক ডাক, গড়াগড়ি, ধরাধরি। ভিতরে যা বাইরেও তা।

যেইকে ডুম্বর ডুম্বর হে
যেইকে লেম্বর লেম্বর হে
যেমুনি বিরিঙ্গা বাড়ারে হে
যেমুনি মেহেনা হারারে হৈ

সঙ্গর গোড়িতি লেকানি হে
বন্দর পানিতি লেকানি হে…

গোলমাল থেমে এল, আনন্দ-কোলাহলে সবাই ক্লান্ত। এই পর্যায়ে যবনিকার মতো এবার আরম্ভ হবে বুড়োদের গান, কারণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া কন্ধ সংস্কৃতিতে অভিনয় চাতুর্যটুকুই কেবল এখনও আছে। মানুষ জন্মায়, বড় হয়, বিয়ে করে, কিন্তু তারপর? তারপর বুড়ো হয়। এই বিয়ে বাড়ির দুয়ারে বুড়োদেরও বলবার কথা আছে, হোক না বুড়োদের গান দুঃখের।

সব বুড়ো একত্র হল, দুলে দুলে গাইতে শুরু করলে "বুড়োদের কৌতুক" গান—

জীওন মন্নে মাল (জীবন আছে তাই না)
পারাণা মন্নে মাল (প্রাণ আছে তাই না)
ইঞ্চিরে সোড়াগা মাল (এমন আনন্দ হল)
ইঞ্চিরে ওএড়েকা মাল (এমন সাধ আহ্লাদ হল)

কিন্তু কি হবে? দিন ফুরিয়েই যাবে। কুটরার গায়ে মাংস খুব অল্প, বুড়োর নাচও অল্পক্ষণের। সংসারে দুঃখের ভাগ বেশী। যে কটা দিন আয়ু আছে হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো :

বুঁড়রে নাট ডেঁ ডেঁ কা (বুড়োর নাচ অল্পক্ষণের)
কোটর মাঁস কাঁড়ে কা (কুটরার মাংস একটুখানি)
ইঞ্চিরে মোচি পুরুতা (এই মর্ত্যপুরেতে)
কাকুলি গাটা কোনে তা (অতি দুঃখী লোক বেশী)
কোকৃকারি ওএড়া কাকুলি (ছেলেবেলা থেকে মানুষের দুঃখ)
কুমাঁডা কুচা কাকুলি (কুমড়ো গাছ শাক হওয়া থেকে দুঃখী)
বাউঁশি জুলি মরে মা (বাঁশ গাছ দুলে দুলে মরে)
পরজা বুলি মরে মা (প্রজা ঘুরে ঘুরে মরে)
ডিতিরে নহ কনা তা (ভাঙা লোহা ঘরের কোণে ফেলা হয়)
কাকুলি গাটা জাডা তা (দুঃখী লোক ঢোকে ঘোর বনে)
টোটোতা বরঁ আসাঁ হাঁ (কাঁধে শাবল বয়ে)
ত্রায়ুঁতা কলি আসাঁ হাঁ (মাথায় ঝুড়ি বয়ে কষ্টের ঘর-করনা)

অতীতের কোন ধ্বংস-নিপাতের ইতিহাসের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে যে

এই করুণ গান চারণের মতো স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এই শুভক্ষণে, আজকের কন্ধের তা মনে নেই। সে গায় কারণ তার বাপ-ঠাকুরদাদা এমনি গেয়েছিল। প্রাচীনতাকে মাথা পেতে নিয়ে সে গৌরব অনুভব করে। সংস্কৃতি—সে তার জীবনের চেয়েও বড়। জীবন একটি মানুষের, সংস্কৃতি লক্ষ জীবনের ইতিহাস, তা গোষ্ঠীর, তার গঠনের পিছনে একটা জাতির গোষ্ঠীগত চরিত্র। আগে সেই।

এমনি নেচে গেয়ে সারা দিনের রোদটা পিঠের উপর দিয়ে গেল। ওদিকে কর্মকর্তারা ভোজের আয়োজন করছিল। বলদ মেরে তার মাংস রান্না চলেছিল। বেলা দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর কাক শকুনের মতো কিল কিল করতে করতে লোকেরা ভোজ খেতে বসে গেল। ভোজের পর মদ খাওয়া, যার যত ইচ্ছে। সন্ধ্যার বাতাসে মদের উৎকট গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঘুরতে লাগল, গ্রামের বাইরে থেকেই জানা যাবে এখানে বিয়েবাড়ি লেগেছে। দিউড়ু অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তার সঙ্গীসাথীরা গাঁয়ের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, রাতে বাসী ভোজ আছে, নাচ আছে।

বেণ্ড কন্ধ ঘুরে ঘুরে দেখল, পুবুলির দেখা পাওয়া অসম্ভব। আজ সে গাঁয়ের নতুন বউ, কত প্রস্ত স্ত্রীলোকের ব্যূহের মাঝখানে সে। তাকে কত রকমে সাজিয়েও, কত রকমের সুস্বাদু জিনিষ খাইয়েও তাদের সাধ মিটছে না। তাকে নিয়ে ঘর ঘর ঘুরবে তারা, সবখান থেকেই সে উপহার পাবে, কোথাও রঙিন কাপড, কোথাও রঙিন কাচের মালা। আজ তার ছুটি নেই।

বেণ্ড কন্ধ মনে মনে স্থির করল যে আজ একটা নতুন কিছু সে নিশ্চয় করবে, কেউ টের পাবে না, তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

তখন সন্ধ্যা শেষ হয়ে আসছিল। পাহাড়ের মাথার উপরে একের পর এক সিঁদুরের রেখা। বেণ্ড আগুনের পলতে নিয়ে টাঙ্গি আর দেশী বন্দুক কাঁধে করে বনের ভিতরে ঢুকল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলমিলে অন্ধকার, ভিতরে ঘুটঘুটে কালো, বনস্থলীর উপর ধীরে ধীরে রাত্রি নামছে।

এই সময়ে বাঘ বেরোয়, 'লতা' ঘুরে বেড়ায়।

লাফ দিতে দিতে বেণ্ড সরু হয়ে যাওয়া পাহাড়ের উপর উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে তেমনি তরতরিয়ে সে নেমে এল।

রাত হল, কিন্তু সন্ধ্যার সিঁদুর নিবল না। সকলে দেখল, আশ্চর্য হয়ে দেখল, গাঁয়ের ওপাশের ছুঁচালো পাহাড়ের চূড়া দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বুড়ো ডিসারী বেণুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "দেখ দেখ—তোর বিয়ে সুখের হবে, কি ভাগ্যবান তুই—ঐ দেখ দেবতার ইশারা।"

বেণু সেই দিকে চেয়ে রইল।

॥ আটষট্টি ॥

পাঁচ মাস,—মিণিআকা হাকিনা বড় হয়েছে।

পাঁচটি মাস শিখিয়েছে তাকে কন্ধ ঘরের ছেলের সরল সুন্দর প্রাণখোলা হাসি, সে-হাসিতে পাথর ডিঙিয়ে চলা ঝরণার ছবি, মাল দেশের চারিদিক খোলা ঢেউ খেলানো ঘুমন্ত পৃথিবীর স্পর্শ, চোখ অর্ধেক বুজে যায়, মুখ কুঁচকে ওঠে, ঝড়-বাতাস দুঃখ-দুর্দিনকে উপহাস করে জন্মান্তরবাদী কন্ধ আশা ভরা হাসি হাসে।

মা ভাবে, "কি সুন্দর!"

পাঁচ মাসেই মিণিআকা হাকিনা হাত মুঠো করে ধরতে শিখেছে—যা হাতের কাছে পায়, তাতে বাছাবাছি নেই, আফসোস নেই, কেবল উজ্জ্বল চোখ, তৃপ্তি। মায়ের ফুর ফুর করে ওড়া তামাটে চুলেব এক গোছা, মায়ের রাশ রাশ ময়লা হারের যতগুলি হাতে পড়ে, আর মায়ের স্তন। মুঠো বন্ধ হয়ে যায়, দেখে দেখে হাকিনার মুখে লালা বেরিয়ে পড়ে, হাসি ফোটে।

পাঁচ মাসে সে তার ভবিষ্যতের লীলাক্ষেত্র চিনে নিয়েছিল। এই বৈশাখের রোদে লুকিয়ে লুকিয়ে গরম হাওয়া যখন হালকা শুকনো জিভ বাড়িয়ে শুষে নিয়ে যায় পাহাড়ী দেশের শ্রী, সেই কাঠফাটা রোদে মায়ের বুকে বাঁধা অবস্থায় হাকিনা গাঁ থেকে মাঠে, মাঠ থেকে জঙ্গলে ঘুরতে থাকে। যেদিকেই যায় সেই পরিচিত দৃশ্য—সেই, কেবল মানুষ। তার একাংশ তার মায়ের দুটি স্তনের মতো হাকিনার খাদ্যের ভাণ্ডার বইছে, সেই দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে হাকিনার ভালো লাগে। তাদের হাতেও পিতলের

বালা, গলায় মালা, সবাইকেই দেখায় যেন মায়েরই জাত,—কিন্তু না, মায়ের চেয়ে কম তারা, যতই হোক মায়ের মতো হতে পারে কি? তারা যত বার হাত বাড়ায় হাকিনা মায়ের বুকে হাত পিটতে থাকে, হাসতে হাসতে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে দুধ খায়, একটা চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। মা তার ঘর, সেইটুকুর মধ্যে থেকে পৃথিবীকে সে বুড়ো আঙুল দেখাবে এমনিই তার অভিপ্রায়।

অন্য জাতের যারা বিধাতা তাদের গড়েছে যেন শাল গাছের গায়ে পুরানো গুলঞ্চলতা পাকিয়ে পাকিয়ে জড়ানো। বড় কর্কশ তারা, মুখে সেই কালো কালো লম্বা লম্বা চুরুট, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কাছে এসে তারা তাকায়, বড বড় চোখ দিয়ে যেন গিলে খাবে। ঘন ঝাঁকড়া ভ্রূ, সারা গায়ে লোম, পাথরের ফাটল থেকে চোয়ানো জলের মতো অবিরাম ঘাম, ভালুকের মতো বুকে ভোর বেলার মাড়ুয়ার ক্ষেতে জমে থাকা শিশিরবিন্দুর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম। বড় আগ্রহে তারা কাছে চলে আসে, মুখ কাছে নিয়ে আসে। সেই এক রকমের গন্ধ, হাকিনার নাক বন্ধ হয়ে যায়, ধুঙ্গিআর ধোঁয়ায় কাশি আসে। হাকিনা মাকে জড়িয়ে ধরে, যেন কেউ তার মাকে নিয়ে যেতে এসেছে—সংসারে তার একমাত্র সম্পত্তিকে। সন্দেহে ভয়ে হাকিনা তাদের দিকে চায়। ভালবাসে না সে তাদের।

বৈশাখের রোদে মাঠে ছোট ছোট বলদ জুতে লোকেরা লাঙ্গল দিচ্ছে। পাহাড়ের উপরেও চাষের কাজ চলেছে—কেবল হাতে খুঁড়ে খুঁড়ে, জঙ্গলের ভিতরে কেবল ঠক্ ঠক্ কুড়ুল মারার শব্দ। খাল নাবাল জমির ভিতর থেকে উঁচু জমির দিক দিয়ে পাহাড়ের ঢালু জায়গা বেয়ে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল মানুষ, যত উপরে তত ছোট হতে হতে একেবারে উপরে তারা কেবল খেলনার পুতুল। হাকিনার ইচ্ছে হয় তাদের সঙ্গে খেলা করতে, এক একটিকে মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে সে মুখের ভিতর পুরত। সব কিছুই তার করতে ইচ্ছে হয়, সব কিছুতেই সে আশ্চর্য হয়। কিন্তু তাকে দেখে তার মা ছাড়া আর কেউ আশ্চর্য হয় না, সে কেবল একটি মানবশিশু—ঐটুকুই।

সে আর তার মা। বাপের স্নেহ কি সে জানে না, অথচ সেই বাপের নামের বনিয়াদের উপরেই তাকে ঘর বানাতে হবে। বাপকে সে ভালোবাসে

না, বাপকে দেখলে তার ইচ্ছে হয় মাকে আরো শক্ত করে ধরে আটকে রাখতে, যাতে মা আর কোথাও যেতে না পারে, তার কাছ থেকে কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। সেই ছায়াটা মাঝে মাঝে এসে এদিক-ওদিকে করতে থাকে, তার মুখের দিকে তাকালে নাহক একটা অজানা ভয় লাগে তার, সে এলে কোনো দিন শান্তিতে কাটে না। সে ভয় লাগায়, চেঁচামেচি করে ; মায়ের মুখের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে হাকিনা দেখে মায়ের মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে—আর এক রকম, যা দেখতে ভালো লাগে না। তার পরে সে-বিপদ চলে যায়—লোকে যাকে বলে বাপ। তার মাকে কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারে না, হাকিনা খুশিতে প্রস্রাব করে ফেলে, প্রশংসা পাবার জন্য সে নিজের মুখ মায়ের মুখের কাছে তুলে ধরে, সেই তার সব।

মন যখন শান্ত থাকে,—উদ্বেগ নেই, অভাব নেই,—হাকিনার তখন বাইরের দিকে তাকাতে ভালো লাগে। তার মনের সব দুয়ার খুলে যায়, তাই দিয়ে ভিতরে ঢোকে আলোর যত রকম-ফের, প্রকৃতির যত ছবি, রোদ, ধুলো, বাতাস—সব। মায়ের দুধের মতো সেও তার খাদ্য, কিন্তু এ হয় অজানতে, এখানে হাকিনা আপনাআপনিই বাড়তে থাকে খোলায় মেলায়। এমনি খোলামেলাতেই কত ধারণা এসে বাসা বাঁধে তার বাড়ন্ত মনে সামনের বড় জীবনের জন্য।

হাকিনা বাড়ে।

॥ উনসত্তর ॥

দিউডু সাঁওতা বাড়ি ফিরে এল।

সেই ভোরে উঠে—মোরগ ডাকার সময়, যে-সময়ে কন্ধ যাত্রা শুরু করে —পিছন থেকে যেন কারো ঠেলা খেয়ে উঠে দিউডু সাঁওতা বেরিয়ে পড়েছিল। মানুষ চলতেই থাকে, কোনোদিন কখনো কেবল স্মৃতির ভিতরে সেঁধিয়ে বসে থাকে। দিউডু সাঁওতা মনে রেখেছিল। পুবুলির বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আর সে তার কেউ নয়, আগে বর পরে ভাই ; পুবুলি নিজের সুখের কথাই ভাবছে, কয়টা দিনেই এত দিনের রক্তের টান সে ভুলেছে।

সে গাঁয়ে দিউড়ুর কোনো কাজ নেই। মদের নেশা গেছে, ঘুমের নেশা গেছে, ভোরে ঘুম ভেঙে দিউড়ু ভাবল, আরে তাই তো। দল বল নিয়ে পথ চলে পাহাড়ের ঘাটিতে গায়ের ঘাম মারবার জন্য বসে দিউড়ু দেখল রোদ উঠেছে, পাহাড় গুলো দেখাচ্ছে সাদা নীল আর বেগুনী। পিছনের পাহাড় মিটিং গাঁকে আড়ালে ফেলেছে।

মিটিং,—পুবুলির শ্বশুর বাড়ি, দিউড়ু তাকে ঘৃণা করে।

সেই মিটিং থেকেই সে পুয়ুকে এনেছিল, তার সব বিপত্তির, সকল হীন-মানের কারণ এই মিটিং,—কেন? কখনো কোনো জন্মে বাঘ হয়ে সে কি এই মিটিং গাঁ ধ্বংস করেছিল? কি করেছিল সে এই গাঁয়ের যে সে গাঁ তার কাল হল? নাক ফুলিয়ে চোখ লাল করে দিউড়ু সাঁওতা চেয়ে রইল সেইদিকে, হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে উঠল—"মিটিং—এই মিটিং"—আচ্ছা বেশ, সেখানে আর তার কেউ নেই, যার যাবার সে যাক, তার কি। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে তার দিকে পিছন ফিরল। বোঝা নামিয়ে ফেলার মতো হালকা লাগল তার মন।

দিউড়ু সাঁওতা ফিরে এল।

আবার সেই গাঁ, আবার তার সেই ঘরদোর সব। কিন্তু মনে হল যেন সেখানে ভাঙা ঘরের চালের বাতাগুলো খোঁচের মতো বেরিয়ে আছে, তার গায়ে খোঁচা মারবার জন্য, সেই তার আগ-বাড়ানো অভ্যর্থনা। মাথার ভিতর ফাঁকা, এখানে তার কিছু নেই,কেবল তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবার জন্য সবাই একজোট, এখানে শান্তি নেই। কারণ তার মনের ভিতরে ঢুকেছে অশান্তির কীট। বিরক্ত লাগছিল। মনে পড়ে ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল পুয়ু, ছেলে কোলে নিয়ে। "দেখ্ তো খোকা, কে আসছে? অ—ই দেখ্। কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না।"

বারান্দার সামনে পাথরের উপরে বসে লেঞ্জু কন্ধ চুরুট টানছিল, পায়ের কাছে দস্রু কুকুরটা। পুয়ু হেসে জিজ্ঞেস করলে—"কেমন হল? বিয়ে হয়ে গেল? পুবুলি কি বলল?" লেঞ্জু কাকা মুখ হাঁ করে হাসছিল, তার বড় বড় খয়েরী রঙের দাঁতে বিকট বিদ্রূপ।

"কি, বলছ না যে? নেমতন্নের পিঠে সব তো খেলে, আমাদের সে-কথা কিছু বলবেও না?" পুয়ু বলল।

আবার কোথাকার ঢিল কোথায় গিয়ে লাগল, দিউড়ুর মাথার পোকা নড়ে উঠল। পুয়ুর চেহারাটা দেখতে লাগল কেমন যেন সরু আর ছেলে-মানুষের মতো, ঘাড় আর গলাটা যেন ডাক ছেড়ে বলছে—"আমায় টিপে দাও, ভেঙে ফেলো, হাতে নরম লাগবে।" রেগে এগিয়ে এল দিউড়ু, কি কতকগুলো বকে গেল। একটা কাণ্ডই হয়ে যেত হয়তো, লেঞ্জুকাকা মাঝে পড়ে দিউড়ুকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলল, "নেশাখোর, মাতাল কোথাকার, নেশা ঝাড়বার আর জায়গা পায়নি, কেবল নিজের বউয়ের উপরে—"

পোঁতা খুটির মতো দাঁড়িয়ে ছিল পুয়ু, মুখে রক্ত নেই। যেন কত কিছু সাজিয়ে রেখেছিল, কেউ এসে লাথি মেরে সব ফেলে দিল, কত কষ্টে মরুভূমির দেশে ঊষর ভূমিতে অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শুকিয়ে গিয়ে আবার সেই মাটির ঢেলা। গর গর করতে করতে দিউড়ু চলে গেল এক দিকে, গাল দিতে দিতে লেঞ্জুকাকা আর একদিকে। পুয়ু তেমনি সেখানে শূন্যে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই শূন্যে তার আধপোড়া মাটির ঢেলা ভরা ভুঁই, সব শুকিয়ে গেছে—সব। এমন করে কতদিন চলবে? কেন তার স্বামী তাকে ভালোবাসে না, কোথায় গেল তার আদর ভালোবাসা? কে আবার তাকে তুক করলে? গাঁয়ের লোকেরা জঙ্গলে গেছে কাঠ-কুটো আনতে, সকালবেলাকার সোরগোল গিয়ে এখন সব শুনসান। পুয়ু এসে বারান্দায় বসল। দু' চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল দরদর করে। সমাধান নেই।

দিউড়ু হয়তো আবার গেছে মদ খেয়ে কারো পিছু ধাওয়া করে গোলমাল বাধাতে। লেঞ্জুকাকাও বেরিয়ে গেছে। আর একজন-- হাকিনা মুখ লাগিয়ে চুষতে লেগেছে তার খাদ্যের ভাণ্ডার। কে কার জন্য ভাবে? পুয়ু কাঁদতে থাকে। মনের ভিতরে সুর ধরেছে চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে সেই এক কথা—কেন? কেন? নীচে ধর্তনী, উপরে ধর্মু। এই সংসারে এত জীবজন্তুর বাস, সবাই আছে, সবাই ঘর করছে, কেন বার বার তার একজনেরই কেবল এ-বিড়ম্বনা?

সমাধান ক্রমে ক্রমে যেন মাথায় আসে। তলদেশের লোকের মতো আত্মহত্যার সমাধান নয়, কন্ধ তা বোঝে না, তার সমাধান অন্য রকম। চোখে আগুন জ্বলে ওঠে, আবার নিবে যায়। মুখের কঠিনতা ধারালো হয়ে

উঠতে উঠতে আবার অশ্রু হয়ে গলে যায়। বার বার মন বলে সে কেবল একটি দুর্বল স্ত্রীলোক। পুয়ু কাঁদে।

না, তার ধরন নয় জীবনকে ভয় করে সস্তা সোজা পথ কেটে সে মুক্তি খুঁজবে, বরং দিউড়ুর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে সে। ভাবতে ভাবতে তার হাতটা আপনা আপনি বুলিয়ে যায় হাকিনার পিঠে, সব প্রতিজ্ঞা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় কেবল দীর্ঘশ্বাসে।

এই একটি ছোট মাংসপিণ্ড কেবল, ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। একদিন সে মানুষ হবে, তার পর তার ঘর, তার দুয়ার। কেউ কারও সঙ্গে তো বাঁধা নয়, যার যার জীবন তার নিজের সম্পত্তি। তবু এই মাংসপিণ্ডটি—হাত বোলালে মনে স্বপ্ন ভেসে ওঠে, এই পিণ্ডের গড়নে কত স্বপ্ন মাখামাখি, অতীতের কত সুখ দুঃখ ঘর-করনার পরশ, জল বাতাসের ছিটের মতো তাতে ঘরের স্মৃতি; আজ সে ঘর ভেঙে পড়ছে, কিন্তু হাকিনা চেতিয়ে দেয় ঘর ছিল, ঘর আছে। নিরালায় যতবার পুয়ু ভাবে তার দোষটা কি, দেখে দোষ নেই, দিউড়ুই বদলে গেছে। তাকে যেতে হবে, ভাবলে তার মন কেঁপে ওঠে, দেখে স্নেহের ভাণ্ডার তার এখনো শেষ হয়নি, সোয়াস্তির মোহের ঝঙ্কার আজো আছে বাতাসে, বুকের ভিতরকার সুখ, উনুন ধারের আরাম, বাঁধা গতের চলা-পথে নিশ্চিত পা ফেলা। সেখানে প্রত্যেকটি উঁচু নিচু তার চেনা জানা।

না, পুয়ু ভাবে বটে, কিন্তু সে যেখানকার সেইখানেই।

তেমনি করেই বড় বড় ছলছলে চোখে তাকায়, খোকার গায়ে হাত বোলায়।

দুর্বল মানুষ আপন নিগড়ের মধ্যে বসে আশা করে, আর ভাবে একটা কিছু ঘটবে যাতে তার আশা পূর্ণ হবে স্বপ্ন সত্যি হবে; একটা কিছু ঘটবে যা তার বিচার-বুদ্ধির বাইরে, যা প্রতিদিনের কারণ আর ফল, ওজন আর দরকষার চেনা হিসাবকে মানবে না, ঘটবে তা, একদিনে দীন দরিদ্র হবে রাজা, রোগী হবে ভীম, দিনের ছায়া উজানে চলবে।

সেই একটা কিছু ঘটে না। চলতে চলতে গাড়ি ভেঙে পড়ে থাকে বদলানো না হওয়া অবধি, প্রতিদিনের মরচে আর ময়লা তেমনি লেগে থাকে, দিনের পর দিন জীবনের রস শুকিয়ে আসে, কলসী আর ভরে না।

আশ্চর্য এবং অদ্ভুত সম্ভাবনার আশায় থেকে থেকে আপনি হেসে আপনি কেঁদে মনে মনেই কানী বেড়াল দুধ খায়, সে দিন আর আসে না।

দিউড়ু ভাবে সে মুক্ত হবে। পুয়ু ভাবে সব ঠিক হয়ে যাবে। সোনাদেঈ তার ক্লীব স্বামী বালমুণ্ডার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ভাবে কবে তার স্বপ্নের পুরুষ আসবে, ভাঙা কপাল জোড়া লাগবে, তার পাথরবাটি হবে সোনার। লেঞ্জু কন্ধ গেরস্থালির স্বপ্ন দেখে। জলের মতো দিন গড়িয়ে যায় তবু আশ্চর্য ঘটে না। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বুড়ো চাষী মাটিতে মেশে, হালের বলদ ঘায়েল হয়ে কাঠির মতো ক'খানি হাড় নিয়ে খাটতে খাটতে এক দিন শুয়ে পড়ে, আর ওঠে না।

সংসার!

সব জল্পনা-কল্পনাকে উপহাস করে ঘরের সামনে পাথরের উপরে বসে ডিসারী পাণ্ডু কন্ধ প্রতিদিনের মতো তারার দিকে চেয়ে চেয়ে যোগ বিচার করে, ভাবে সে জানে, সে জানে, কারণ আর ফল, যোগ আর ঘটনা, সে সব জানে, অন্যেরা মূর্খ।

॥ সত্তর ॥

ঝাঁ ঝাঁ রোদ। বাতাসে কমলা ফুলের গন্ধ, চারিদিক ঘুম ঘুম। সেই শান্ত অলস তন্দ্রায় কাঁটাল গাছে বড় বড় কাঁটাল ঝুলছে। আম গাছের ডাঁসা আমে রঙ ধরেছে, ক্ষেতে চাষা মজুর মানুষ, খোঁড়াখুঁড়ি, হাল চষা, দূরে দূরে পোড়ু ক্ষেতের ধোঁয়া।

লেঞ্জু কন্ধের কাজে মন বসে না। কার জন্য সে কাজ করবে? কে তার আছে?

সে বাগানের ছায়া থেকে দিউড়ুর ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিউড়ু কাজে ব্যস্ত। দরদর করে ঘাম ঝরছে, মুখ শুকিয়ে গেছে, এক গাদা কাজ বাকী। দুপুর রোদে গাছের ছায়ার শান্তির মধ্যে বনের পাখীর কাকলি যখন লেঞ্জু কাকাকে যৌবনের পরশ দিয়ে যায়, ধুঙ্গিআর ধোঁয়ার উপরে একটা প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে দিয়ে দিড়ুউর হিমসিম খাওয়া খাটুনির

দিকে একবার চেয়ে লেঞ্জু কন্ধ নির্বিকার হয়ে বসে পড়ে। তার তো লেংটি আছে, সে বাবাজী।

পুরানো কাজে পুরানো ক্ষেতের দিকে চেয়ে মনে মনে সে হাসে এই ভেবে যে দিউড়ু মজাটা এবার বুঝছে। এত খেটে এত কষ্ট করে ভাইয়ের ছেলেকে নিজের মনে করে যে এত দিন ধরে অকাতরে সাহায্য করে এসেছে দিউড়ু তার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানায়নি। এবার লেঞ্জু হাত গুটিয়ে নিয়েছে ; এখন দিউড়ু খাটুক, লেঞ্জু খাবে। সেও এখন দিউড়ুর উপায় অবলম্বন করে হুঁশিয়ার হয়ে আছে, দিউড়ু চেঁচামেচি করতে গেলেই সেও চোখ লাল করে তেড়ে যাবে। বেজায় রেগে গিয়ে দিউড়ু আর তার সঙ্গে কথা বলছে না। ভালো তার মান অভিমান তারই থাকুক, লেঞ্জু কাকার কাজ শুধু হাসা।

ভালো লাগছিল, দিউড়ুর অসুবিধার কথা ভেবে। হাতে গড়া জিনিষ ভেঙে ফেলার আনন্দ এখন তার। কে আসছে ? পাণ্ডু ডিসারী না ?

"খালি বসে আছিস, লেঞ্জু ভাই ?"

"বসে থাকব না তো কি নাচব ?"

"ভালো ভালো, যার সুবিধে আছে সে বসুক ; তোর তো অমনি ধুরন্ধর ছেলে আছে তাই না। ছোকরারা খাটবে, বুড়োরা বসে থাকবে এই তো ব্যবস্থা।"

পাণ্ডু ডিসারী রাত্রে তারা গোনে আর দিনে চাষ করে।

লেঞ্জু মুখ বেঁকালে। ক্ষেতের উপর নুয়ে পড়েছে মানুষ, কাজের মধ্যে গল্প চলেছে, গান চলেছে। দিউড়ু মুখটা পাথরের মতো করে খুঁড়তে লেগেছে চষতে লেগেছে, অন্য দিকে তার দৃষ্টি নেই। একলা। যখনই তার দিকে তাকায় লেঞ্জুর কেবল বিরক্তি আসে। ভাবল সে, যতদিন এমনি চলে চলুক, তারপর সে ভিন্ন হয়ে যাবে। ভাবলে মনে শান্তি লাগে, চোখ আধবোজা হয়ে আসে স্বপ্ন দেখতে। ভিন্ন হয়ে যাবে। তার ঘর, তার জমি, সম্ভবতঃ তার স্ত্রীও। তারও সন্তান হবে, তাকে বাবা বলে ডাকবে। মনের ভিতরটা চীৎকার করে উঠল—সে বাবা ডাক শুনবে, সে বুড়ো নয়, সেও যুবা, এখনো অনেক আয়ু আছে।

চোখ খুলে গেল, রোদ ঢলে পড়েছে, হলুদ-গোলা হয়ে গেছে, উপরের পাহাড়ে গাঢ় নীল, তবু বেলা বাকী। চোখ মেলে লেঞ্জু কন্ধ দেখল সে

তেমনি গাছের তলায় বসে আছে; তেমনি মাঠে চাষ হচ্ছে, অদল-বদল নেই। একটু ঠাণ্ডা পড়ে আসছে, তাতে আসে রাতের ভাবনা, উদাস লাগল তার।

না, সব মিথ্যে, সব ফাঁকি। দিন গুনতে গুনতে জীবন ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে; নতুন বলে কিছু নেই, আশ্চর্য বলে কিছু নেই, সে যেখানকার সেইখানেই। তার রাগ করায় অভিমান করায় কারো কিছু আসে যায় না, তার দুঃখে কেউ দুঃখী নয়। সে শুধু দেখেই যাবে—কেউ নয় সে—।

পাশেই জাম্বা কন্ধের ক্ষেত। বুড়ো জাম্বা কন্ধও হাল চালাচ্ছে। "কোথায় চললে লেঞ্জু ভাই? দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু ধোঁয়া খাওয়া যাক।" জাম্বা কন্ধ দিউড়ুর কথা তুলল। দিউড়ুকে সে ভয় করে তাই আড়ালে তার সমালোচনা করে। "তোয়াপুটের কাছে রাস্তা খুলবে শোনা যাচ্ছে।—বুঝলি লেঞ্জু ভাই, রাস্তা খুললে অনেক অধিকারী আসতে থাকবে। না, না, মিছে নয়, হাটে কথা হচ্ছিল।" এতেও দিউড়ুর ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের কথা,—অধিকারীরা এলে তাদের দিউড়ু সামলাবে কেমন করে, ফলে—। "ভাল করেছিস, সরে দাঁড়িয়েছিস লেঞ্জু ভাই। বাপ আর কাকা কি আলাদা? কাকাকে সে খাতির করে না—কি আর বলব। ভালো করেছিস, বেশ করেছিস। কুটোটি নাড়িস না। জমি তো তার একার নয়, তোকে পুষবে না কেন?" লেঞ্জুর মুখ খুলে গেল, এক রাশ বকে গেল সে। দিউড়ু এমন কি তার স্ত্রীর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে। "আজ দুপুর বেলায় খাবার নিয়ে মাঠে এসেছিল সে লেঞ্জু ভাই। আহা তাকে দেখলে দুঃখ হয়, কি হয়ে গেছে সে! একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। মাথার চুল ফুর ফুর করে উড়ছে, মুখখানি যেন কাঠ মেরে গেছে। কেমন করে গালি-গালাজ মারধর সয়ে সে পড়ে আছে, অবাক্ হয়ে যাই! আচ্ছা, তুই কোথায় যাচ্ছিলি যা লেঞ্জু ভাই। যাই, আর একটু হাল দিয়ে নিই। রোদ বেড়ে গেলে মাটির রস শুকিয়ে গেলে তখন আবার হয়রানি। বুড়ো মানুষ, আর কি সে দিন আছে?"

লেঞ্জু কন্ধের মন খুশী হয়ে উঠেছিল। সে গা-ছাড়া দেওয়াতে দিউড়ুর কেবল যে বল কমে গেছে তাই নয়, সমাজেও নিন্দে অপবাদ হচ্ছে। মজাটা

বোঝ্ এবার, ভাল করে বোঝ্। লেঞ্জু খুশী। গুড়িআর কাছের পাহাড়ের ঢালুতে বারিকের ছেলে তুরুঞ্জা গরু নিয়ে চলেছে। অন্য দিকে ফাওড়া নিয়ে বারিক বুড়ো আর বালমুণ্ডা দু'জনে উঁচু জমিতে গোড় দিচ্ছে। গোটা গাঁয়ের সমস্ত লোক আছে মাঠে। গাঁয়ে এখন কয়টা কুকুরই কেবল আছে। কেবল কুকুর কি? লেঞ্জু কন্ধ এত দিকে ঘুরে এল সোনাদেঈকে তো কোথাও দেখতে পায় নি। ভাবল গাঁয়ে যায়। পডন্ত রোদ, পাহাড়ের উপর দিকে বেগুনী। গ্রামে যাবার পথে ঢালুর নীচে ঝরনার কাছে একদল যুবতী। কাজের ফাঁকে আম পাডা চলেছে। অনেকে বসে চুল বাঁধছে, মাথায় ফুল গুঁজছে, পরনের কাপড ঠিক করছে। কাজের ফাঁকে খানিকক্ষণ করে জিরিয়ে নেয়। কতবার এদের দেখে লেঞ্জু কন্ধ ভেবেছে অনেক কথা। এদের কেবল হাসি, ঝরনার কল কল জলের স্রোতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো গায়ের চামডা এদের, কোথাও এইটুকু কোঁচকানি নেই। এদের চারিদিকে আয়ু আর আশা।

কার জন্য? লেঞ্জু কন্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন খালি? আম খাবিতো আয়।"

"কেমন করে তাকাচ্ছে গো। গুঁতোবে নাকি লেঞ্জু দাদু?"

ধেৎ, শুধুই ঠাট্টা। দাদুর টীকা—দাদুর শিং—পরিয়ে দিয়ে গেছে তার বয়স, যতই মাথা ঝাড়ুক সে এ শিং খসবার নয়। লেঞ্জু কন্ধ তাড়া করে গেল, মেয়েরা হাসতে হাসতে পালাল।

কত আবেগভরে, চোখে কত মিনতি নিয়ে এত করে সে তাকায়, কখনো বা কারো হাত ধরে বলে, "আমার সাথে ঘর করবি?" "সত্যি বলছি লেঞ্জু দাদু আমি গান গাইব তুই নাচবি, আমি পিঠে তৈরি করব তুই খাবি।"

দাদু—দাদু—দাদু! কত তাড়াতাড়ি সে দাদু হয়ে পড়েছে। অথচ সেই হাত পা আছে, সেই মন আছে, সেই মানুষ। এই সেদিন রূপ্নি মারা গেছে আর আজ সে দাদু। না, তার মনের কথা কেউ বুঝবে না। লেঞ্জু কন্ধ উপরে উঠে গেল, আবার ইচ্ছে হল পাথরের উপরে বসে থেকে এদের চেয়ে চেয়ে দেখে। ধুঙ্গিআ ধরালে। কি সুন্দর আলো, কি সুন্দর দৃশ্য! কিছু দূর অন্তর বড় গাছের কুঞ্জ, তার মাঝখানে মাঝখানে

ক্ষেত। এই নিচু জায়গায় চারিদিকে পাহাড় উঠেছে। এত কাজে দিনের বেলাতেও সব খালি পড়ে গেছে। সেই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে লেঞ্জু কন্ধ বসে রইল। ওদের কতক আবার কাজে ফিরে গেছে, অল্প জনকয়েক আছে। লেঞ্জুর চোখে ধক্ করে আগুন জলে উঠল। সরবু সাঁওতা নেই যে তার স্মৃতিতে সে বাঁধা পড়ে থাকবে। পুবুলি নেই যে এদের চির দিন ভাববে পুবুলির সঙ্গী সাথী বলে। সে মানুষ, সে অঘোরী, তার ঘর চাই।

নীচে কে চেঁচিয়ে বলল, "খালি বসে আছিস্ নাকি রে তোরা?" সে কয়জনও কাজে ফিরে গেল। লেঞ্জুর মনে হল ধুঙ্গিআয় আর শানাচ্ছে না, এবার আর কিছু দরকার। সে উপরের দিকে চলল। যেতে যেতে ফিরে ফিরে আবার সেই কথা—দিউড়ুর ঘর তার ভাল লাগছে না, সে ভিন্ন হবে। সে সাঁওতা হবে। গাঁ থেকে তফাতে গিয়ে এই কন্ধ গুড়িআর মাথায় কোথাও একখানি ছোট ঘর তৈরি করবে, চারিদিকে থাকবে পাথরের বেড়া। গোয়ালে গরু হাম্বা হাম্বা করবে। উঠোনে মুরগীর পাল চরবে। কাজ কর্মের জন্য কৃষাণ মজুর দু'জন। আসেপাশে ঘোরাঘুরি করবে আর একজন—সেই যার জন্য এই ঘর এই দুয়ার—সে জন তার স্ত্রী, তার নতুন স্ত্রী। কিন্তু কোথায়? হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার মতন কেবল ফাঁকা কল্পনা। নিজের সঙ্গে বাঁধবার জন্য যার স্বামীকে বাঘে খেয়েছে এমন স্ত্রী কোত্থেকে পাবে সে? পেলেও সে তার মনের মতো হবে কি না কিংবা লেঞ্জুকে তার মনে ধরবে কি না তারই বা ঠিক কি? শীতের সময় বাঘের উৎপাত হয়, সেই শীতের দিনেই সে খুঁজে দেখবে। কত লোকের সঙ্গেই তো তার চেনা, তাদের স্ত্রীদের কথা মনে করে করে লেঞ্জু ভাবতে লাগল কোন লোকটিকে বাঘে খেলে সে পছন্দমত স্ত্রী পাবে। বর্ষার আগে আত্রির ছেলে বাত্রির যদি বিয়ে হয় তবে তাকে বাঘে খেলে শীতের পরে পুলমেঁ তার হতে পারে।

বাত্রির এমনি শুভকামনা করতে করতে লেঞ্জু কন্ধ আরও উপরে উঠে গেল। পুলমেঁ—ভালো হত, বেশ হত। "কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না, পুলমেঁ। আমি আছি, ভয় কি? বাঘ-ডুমা হয়ে সে চলে গেছে, তাকে মনে করলে আবার তোকে বিপদে ফেলবে। তার চেয়ে আমার দিকে চা, আমি তোকে যত্ন করে রাখব।"

বৃথা কল্পনা, পাগল সে।

বারিকের ঘরে যাবার পথ। সোনাদেঈ যদি থাকে তবে একাই আছে। গাঁয়ে সবাই ফিরতে এখনো দুই ঘড়ির মতো। বারিকের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে লেঞ্জু কন্ধ ভাবল সব মানুষ সমান, হলেই বা ডোম, সোনাদেঈও তো মানুষ। কত দিন হল সোনাদেঈয়ের সঙ্গে তার খোশগল্প হয় নি। মনে হল যেন এক যুগ। কত দূর এগিয়ে আসে দু'জনে, আবার যেখানকার সেইখানেই, ঘটনা ঘটে না। আজ অবসর মিলেছে দুটো সুখ দুঃখের কথা বলবার। দিনের লোকজনের ভিড় নেই, এই বটে নিরালা।

আশায় আশায় পা বাড়িয়ে নিঃশব্দে বারিকের আঙিনায় সে ঢুকল, ঘরের ভিতরে কাজ কর্মের আওয়াজ শোনা যায়।

"বারিক—"

সোনাদেঈ বেরিয়ে এল। বলল, "বারিক নেই।"

"বারিক নেই তা জানি" বলে লেঞ্জু কন্ধ হাসল।

সোনাদেঈ অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

লেঞ্জু বলল, "ভিতরে চল, বলছি।" সেয়ানার মতো হাসতে হাসতে লেঞ্জু ঘরে ঢুকল, পিছন পিছন সোনাদেঈ। লেঞ্জু কন্ধ মদ খায় নি।

॥ একাত্তর ॥

সোনাদেঈ রোদ দেখে না, দেখে বাতাস। বেশী কাজ তার থাকে না। মনের মধ্যে যার চিন্তা প্রবল, তার কাজ সে কখন আপনা আপনি করে ফেলে, কাজ কখন সে আরম্ভ করল আর কখন তা শেষ হল তার খেয়াল থাকে না। বাইরের কাজ কলের মতন, আপনি ঘোরে, আপনি চলে, সব সময়ে সজাগ যে সে তার চিন্তা।

বাতাস দেখে সে, বাতাসের সঙ্গে তার মনের ছন্দ মেলে। পাক খেয়ে খেয়ে ঘূর্ণি হাওয়া যায়, কেবল খানিকটা শুকনো ধুলো, শুকনো পাতা। সন্ সন্ করে গরম হাওয়া বয়ে আসে। ঈশান থেকে মেঘ ঘনিয়ে তুফান উঠে আসে, আবার মেঘ উড়ে যায় বাতাসের ঊর্ধ্বশ্বাসে। এই দিনে, যখন

পাহাড়ের দেশ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ে, আম গাছ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে উজাড় করে দেয় ফলের বোঝা, একলাটি সোনাদেঈ সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। নাক-কান বন্ধ করা ধুলোর মেঘ থেকে থেকে কার জানি ফুঁ খেয়ে উড়ে উড়ে চলে, ধূসর আকাশ, পাহাড়ের সারির উপরে নিরাশার ছায়া। সোনাদেঈয়ের ভিতর-মন তার থেকে সহানুভূতি পায়। সোনাদেঈ চেয়ে চেয়ে দেখে, ভারি হাসতে ইচ্ছে করে, ঘরের খুঁটির গায়ে হাতের মুঠো বন্ধ হয়ে যায়।

জল ঝড়ের ভয়ে পাহাড়ী দেশের ঘর হয় শেয়ালের গর্তের মতো, তাতে জানালা নেই, দরজা ছোট, খড়ের চাল বাইরের বারান্দার উপর ঝুঁকে পড়েছে, মাথা নিচু করে নুয়ে নুয়ে ঘরের ভিতরে যাওয়া আসা। কন্ধ ছেলেরা ঝড় আসতে দেখলে বাইরে লাফালাফি করে, তাদের আনন্দ হয়। গোটা গ্রামের ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করতে করতে আম কুড়োতে যায়। সেও এক খেলা, চোখে মুখে ধুলো বালির চোট, বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে উলট পালট খাওয়া, গাছের তলায় আম—যত ইচ্ছে।

তাতে সোনাদেঈয়ের কি?

জিভের স্বাদ, গৃহস্থালির নেশা, শরীরের ভাল-মন্দ, এ সব কবে ভুলেছে সে। কবে সে বাপের বাড়ির মেয়ে ছিল, সেদিনের স্মৃতি কেবল ভয়ের—পুলিস, ধর-পাকড়, খানাতল্লাশি, চোট পাট, বাঁধা বাঁধি—না, সে বাপের বাড়ির মেয়ে হতে চায় না।

শ্বশুর ঘরের বউ হল। মাল দেশের মেয়ে পছন্দমত বর বেছে নিয়ে বিয়ে করার যে সুযোগ পায় তা থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেছে। মনে আছে সেদিনের কথা। দুপুর বেলা স্নান সেরে বাড়ির আঙিনার দিকে আসতে অচেনা লোকের গলার আওয়াজ। কোর্তা, জাঙ্গিয়া, টুপি, পাগড়ি—প্রভু অধিকারী নিশ্চয়। সোনাদেঈয়ের পরনে ছেঁড়া কাপড়, সারা গা কাঁপতে লাগল। কে একজন প্রভু অধিকারী বলল, "ওকে ধর, তল্লাশি কর, ওর কাছে থেকেই কথা বেরোবে।" দু চার জন এগিয়ে এল, বড় বড় গোঁফ। ওদিক থেকে গর্জন ডোমের মিনতি শোনা যাচ্ছে—"মহাপ্রভু, —আমার মেয়ে, মহাপ্রভু। ও কিছু জানে না, ওকে কিছু কোরো না মহাপ্রভু—"

সোনাদেঈ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আঙিনার ও পাশে কয়েক জন বসে আছে। তারা অধিকারী নয় বা মহাপ্রভু নয়, তেমন পোশাক নেই, তেমন চেহারা নেই। চেহারা আর কাপড় পরা দেখে বোঝা যায় তারা ডোম, ভিন গাঁয়ের। একজন বুড়ো বসে আছে, কোনো কারণে এসেছে হয়তো তারা।

বাপের করুণ অনুনয় কানে বাজছিল, আশ্বাস দিচ্ছিল গাঁয়ের মোড়ল আর বড বড় রায়তরা, গাঁয়ের মাথা মাথা লোকেরা। থেকে থেকে অধিকারীর কী বিকট "চুপ্—চুপ" গর্জন! সেই কথাবার্তার গোলমাল থেকে সোনাদেঈ মনে ভরসা পাচ্ছিল যে সে একা নেই, গাঁয়ের লোকেরা আছে—

"অমন করিস্ কেন গর্জন? অধিকারী মা বাপ, ওঁদের কাজ ওঁরা করুন। তোর মেয়ের কিসের ডর?"

"কিছু জানেনা নায়েক, ও কিছুই জানে না…"

সোনাদেঈ ওদিকে যাচ্ছিল। কি চলেছে ওখানে—খিডকিব দিকে? একজন কে অধিকারী তাকে ধরে ফেললেন—"দাঁড়া, যাস্ কোথায়?" জোয়ান অধিকারী। হাঁডির মতো গোল মুখ. দাডি নেই। এক অদ্ভুত গোঁফ, ঠিক নাকের নীচে ভালুকের লোমের মতন এক গোছা, বাকী জায়গা উইয়ে খাওয়ার মতো আধখামচা আধখামচা। কপালটা আবের মতো ঢিপ হয়ে উঠেছে। সোনাদেঈয়ের হাতের বাজুর উপর সেই অচেনা মানুষের মুঠো, গায়ে মুখে তার জলন্ত দৃষ্টি। ক্ষণিকের জন্য সেই মুঠো কেঁপে উঠল, সে মুখ বদলে গেল, চাউনিতে কি যেন বদলে গেল, ছোট ছেলেদের মতো একটু জড়িয়ে জড়িয়ে একটু আটকে আটকে অধিকারী বললেন, "তল্লাশি করব, হাত তোল্।"

সেই জলন্ত চাউনির সামনে সোনাদেঈয়ের হাত দুটো সোজা উপরে উঠে গেল। তল্লাশি করবার বাহানায় এত লোকের চোখের সামনে পরপুরুষের হাত তার সারা গায়ে ঘুরে ফিরে চলতে লাগল। ওঃ—ওঃ—ওঃ—
ভয়ের মধ্যে সুখ দেবার মতন সেই হাত দুটো তল্লাশি করতে করতে থেমে যায়, একবার বুলিয়ে যায়।

অধিকারী বললেন, "চল্ ঐ ঘরে, সওয়াল করব।"

গাঁয়ের মোড়ল প্রবোধ দিয়ে বললেন, "ভয় পাস্‌নে মা, মা-বাপ যা জিগ্যেস করবেন বলিস্‌।"

আস্তে গর্জন করে মা-বাপ বললেন, "তোরা সব কেন্‌ এলি রে, দাঁড়া, এক এক জন করে সওয়াল করব।"

মুখ নিচু করে বুক শুকিয়ে চোরের মতো নিজের ঘরের ভিতর সোনাদেঈ ঢুকল, পিছন পিছন সেই মহাপ্রভু অধিকারী। এ কে? কি খুঁজে বেড়াচ্ছে? কি জিগ্যেস করবে? আস্তে কানের কাছে—"চল্‌, ঐ কোণের দিকে।" পালাবার পথ আটকে রয়েছেন মহাপ্রভু অধিকারী। পিছন থেকে তুই ঠেলা। কাঁধের উপরে সেই সাঁড়াশির মতো হাতের চাপ, অধিকারীর ইঙ্গিত—ভিতরে রান্নাঘরের অন্ধকারের কোণের দিকে যেখানে চোরাই বলদের মাংস শুকিয়ে রাখা হয়, চোরাই মাল মাটিতে পুতে রাখা হয়। "আঃ—উঃ—" "চুপ"—মুখের উপর সেই সাঁড়াশির মতো হাত। এগিয়ে—আরো এগিয়ে—সেই অন্ধকারের দিকে।

একটু পরে সোনাদেঈ বেরিয়ে এল। গিয়েছিল একরকমের হয়ে, এল আর একরকমের হয়ে, মুখ গম্ভীর, চোখে জলের ধারা, এবার ঘর করবে সে। আগে আগে অধিকারী তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন। "কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু সাবধান গরুজন ডোম, এবার ছেড়ে দিলাম।"

প্রভু অধিকারী চলে গেলেন। বাপ গরুজন ডোম দৌড়ে এল ঘরের দরজার কাছে, তার মুখে নতুন কথা: "মিণিআপায়ুর লোক কন্যা মাগন করতে এসেছে, দেখবি আয় নুনি। কুড়ি টাকা পণ দিয়েছে, তোকে তাদের দিয়ে দিয়েছি, বারিকের ঘরের বউ হবি, যা নুনি—"

বাইরে লোকের গোলমাল। এ কি নতুন কথা! না, সে চোখের জল থামাবে। ভয় থেকে আনন্দে। গরুজন ডোম রাফাএল খ্রীষ্টান হয়েছিল বটে, কিন্তু তার তর সইল না। কখন কোন অধিকারী আসে—পুলিস তো আছেই। যার জীবনে রোদ বৃষ্টির ধরাবাঁধা ধারা নেই, সব আচমকা, হঠাৎ, তার সময় অসময় বলে কিছু নেই। রাফাএল খ্রীষ্টান মেয়েকে বিক্রি করে পনের টাকা গুণে নেবার সময় হয়েছিল গরুজন ডোম। কৈফিয়ত নিতে আর কোন পাদরী সাহেব ছুটে আসছে জঙ্গলের ভিতর।

এক দিনেই সোনাদেঈ বেড়ে উঠে কুঁড়ি থেকে আধ-শুকনো ছেঁড়া ফুল

হয়ে উড়ে এসেছিল কেলার গ্রাম থেকে মিনিআপায়ু। সেদিন সন্ধ্যায়ও এমনি ঝড় উঠেছিল।

সস্তায় বউ পেয়ে, সস্তার ভোজ খাইয়ে জ্ঞাতি কুটুম্ব দু'চার জনকে বিদায় করে ভুর্সামুণ্ডা বারিক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সোনাদেঈকে বলল, "এই তোর বর।"

অন্ধকার রাত্রি। ঝড়ো বাতাস হু হু করে বইছে। পথ চলে চলে পায়ে ফোসকা, উরু দু'টো ব্যাথায় টন টন করছে। ঘুম ধরে, ঘুম ভাঙে। একটু তফাতেই আসনপিড়ি হয়ে বর বসে আছে, তার চুরুটের আগুন বাড়ছে কমছে নিবে আসছে আবার জ্বলছে। বর বসে বসে ঢুলতে লাগল। সোনাদেঈ স্বপ্ন দেখল বরকে। অন্ধকারে চুরুট জ্বল জ্বল করছে। একটা উইঢিপি, তার উপরে জ্বলন্ত আগুন—দুটো জ্বলন্ত আগুন—দুটো চোখ— প্রভু অধিকারী, যাঁর গোলমুখ, আবের মতো কপাল, নাকের নীচে উইয়ে-খাওয়া গোঁফ। ভোর রাতে কি একটা অলক্ষণে চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ঝড় থেমে গেছে। বর নেই।

সেই তার প্রথম রাত্রি।

এক মাস পরে ভয়ে ভয়ে সে শ্বশুরকে বলল, "আমি বাপের বাড়ি যাব।" শ্বশুর শুনে হেসে উড়িয়ে দিলে। আবার সে বায়না ধরল—দিন দিন, মুখ ফুটে বলল, "নিচু নিচু, আমার ইচ্ছে নেই।" বারিক ছেলেকে বকল। বউকে বকল, বলল "তুই পালাবি আর আমার পনের টাকা—? আমার ঘর কে সামলাবে? কে আমাকে রেঁধে দেবে?" খবর এল একবার যে গর্জন ডোমকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে সোনাদেঈ রইল। ওদিকের পথ বন্ধ। সেদিন থেকে বন্দিনী।

ইচ্ছে হয় কিন্তু পারে না। বোঝে, জানে, জোর করে বলতে পারে না। কেন ভগবান তাকে এমনি বোবা করল, শক্তি কেন দিল না? সে ভগবানের নিন্দে করে। বালমুণ্ডা তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। বাইরের কাজে সে বীর, নিজের ঘরে তার ভয়। কোথাও না কোথাও দিগ্বিজয়ে যায় সে। ঘরে থাকে মদখোর বুড়ো বারিক। কাজের সময় সেও ঘরে থাকে না। গাঁয়ের এক টেরে নিরালায় ঘর, সোনাদেঈয়ের ছন্নছাড়া জীবনের প্রতীক যেন।

সেই জীবনে আজ বুড়ো লেঞ্জু কন্ধ নেমেছিল। পতিত না হলে কন্ধ কখনো ডোম সমাজে আসে না। সেই ভাঙা ঘরের চারিদিকে নিজের মনের রোগের জ্বালায় ঘোরে দিউড়ু সাঁওতা; ঘোরে, ভরসা করে আসে না। লেঞ্জু কন্ধ এসেছিল। তার মুখে সোনাদেঈ মদের বাটি তুলে ধরে, কটাসে চুলের জটের ফাঁকে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টানে আর ভাবে। যে বোবা, ভাবতেই তার জন্ম।

বুড়ো বারিক তাকে ভালোবাসে। বুড়ো লেঞ্জু কন্ধ তাকে ভালোবাসে; কিন্তু বুড়ো বারিক লাঠিগাছটি নিয়ে দোর গোড়ায় জেগে বসে থাকে, খক খক করে কাশে—"কিসের ডর, মুই জাগছি যে।··· ও বউ, ও সোনাদেঈ, কোথায় যাস্, কোথায় যাবি এত রাতে? যা, ঘরকে যা।" সব দিনই সন্ধ্যায় ঠিক সেই সময়ে বালমুণ্ডা যায় কোথায়? তুরুঞ্জা যায় কোথায়? সোনাদেঈ সে খোঁজ করে না। ঠিক সেই সময়ে তার নেশা লাগে, সব ভয় সব সঙ্কোচকে আড়াল করে দোরগোড়ায় স্বয়ং তার শ্বশুর, সেখান থেকে জানান দেওয়ার মতো করে খক্ খক্ কাশি···

ঝড়ে গাছ যেমন করে মাথা ঝাঁকিয়ে ছট্‌ফট করে তেমনি করে লেঞ্জু কন্ধ কাঠের গুড়ির মতো ঢলে পড়ে। দিনের বেলায় তাকে দেখলে সোনা-দেঈয়ের ঘৃণা আসে। রোদ, বাতাস, ঝরনা, উন্মুক্ত প্রকৃতি বার বার তার সেই ভাবকে বাড়িয়ে তোলে, জিবে যেন লাগে কাদার বিস্বাদ। কিন্তু যত-বার দেখে বালমুণ্ডাকে, তার মনের বিদ্রোহ জেগে ওঠে। লেঞ্জু কন্ধ তারি বিদ্রোহের ছোট প্রতিমূর্তি।

স্বামীকে দেখলে তার মন গলে না। বালমুণ্ডা কাজের ফরমাশ করে, সোনাদেঈ তর্ক করে না, পিছন ফিরে চলে যায়। বালমুণ্ডা রাগলে সোনাদেঈ সোজা তার মুখের দিকে চায়, সেই চাউনির তিরস্কারের কাছে বালমুণ্ডা মাথা নিচু করে, ভরসা পায় না। দমে যায়। আশ্বিন মাস হবে বোধ হয়, কপালে তিলক পরে, হাতে আর কোমরে এক রাশ জড়ি বুটির মাদুলি ঝুলিয়ে হাসতে হাসতে বালমুণ্ডা একবার এল। কোন ডিসারীর কাছ থেকে ওষুধ এনেছিল সে। তার হাসি দেখে সোনাদেঈ হকচকিয়ে গিয়ে ভাবল কিছু একটা ঘটবে। বালমুণ্ডা তার কাছে ছুটে এল, একটুখানি রইল, তার পর দুই হাতে মুখ ঢেকে কুকুর ছানার মতো কুঁই কুঁই

করে কেঁদে উঠে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। সোনাদেঈ ভাবল, "এ কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?"

আর বালমুণ্ডার ওষুধ নেই, আর আসেনি সে।

কতবার কত কিছু নিয়ে ভাব করতে এসেছে বালমুণ্ডা, তার হতশ্রী চোখমুখে অসংখ্য দণ্ডবতের সম্বোধন। তার কথাবার্তা সহ্য হয়, কিন্তু তার ভালোবাসা—বেড়ালের মতো সোনাদেঈ ফোঁস করে ওঠে, কোথায় যায় তার মূকতা, তার মৌন স্থিরতা, বালমুণ্ডা চোট খেয়ে পালায়।

এই তার মন আসলে। বাইরে বড় ঠাণ্ডা, ধীর, শান্ত, বারিকের ঘরের বউ। মুখটি না তুলে পথ হাঁটে। মুখে কেবল গায়ের চামড়া ঝলসানো চিন্তার দাগ। লোকে তার দুঃখ অনুমানে বোঝে, যেখানেই যায় সকলের সহানুভূতি পায়, কেবল আহা আহা। কোথাও চলে যাবে তারও এখানে পথ নেই। জলে যাওয়া জীবনের বোঝা বয়ে, কাতব হয়ে, সোনাদেঈ কেবল আশায় আশায় বেঁচে থাকে। এই তার জীবন- কেবল মরুভূমি, জীবন কি সে জানেনা। কেবল অনুভূতির ভিতর থেকে যাচাই হয়ে বেরিয়ে আসে বাপের বাড়িতে সেদিনের সেই মহাপ্রভু অধিকারী, কেবল দুটি মুহূর্ত। আব কিছু নেই, জীবনটা ফাঁকা। সংসারে কত মহাপ্রভু অধিকারী, কিন্তু কেউ কখনো আসেন না তো।

॥ বাহাত্তর ॥

রোদের তেজে বন শুকিয়েছে, মানুষের তাপে কাছের বন পুড়ে চাষের জমি হয়েছে। গ্রীষ্মে বনের শ্রী চলে গেছে। এক ক্রোশ চললেই পা থকে যায়, বাইরে বেরুলে শরীর সিদ্ধ হয়ে যায়, হাতের কোদাল কাঁধের কুড়ুল তেতে ওঠে, যে মাটিতে কাজ হয় সেখানকার চেনা পাথরের ঢেলা ঘরের শত্রু হয়ে ওঠে, গরম হয়ে পায়ে বিঁধতে থাকে। এ সময়ে ময়ূর মোরগেরাও ভোর বেলাতেই নেমে পড়ে এক প্রহর বেলা হতেই বনের ভিতর ঢুকে পড়ে। বেলা দু' ঘড়ি হলে চারিদিকের নেড়া মাটি তেতে লাল দেখাতে থাকে, উঁচু নিচু মালদেশের পর্বত-তরঙ্গের উপরে বাতাসের তাত ঝল ঝল করে নাচে।

কেবল কুঁড়েমি করে দিন কাটাবার সময় এটা। চলা বন্ধ করে দিয়ে সব যেন ঝিমোতে থাকে, আজও যা কালও তাই।

সব যখন পেকে শুকিয়ে ঝরে পড়ে—ডুমুর, আম, কাঁটাল, হলদে হলদে পাতা, তখন বেজুণী তার একলা কুঁড়ে ছেড়ে গাঁয়ের পাহাড়ের শিঙের উপর চড়ে বসে ভাবে। সাধারণ মানুষের কাজ তার হাতে, বেজুণীর কাজ তার মাথার ভিতরে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে এখানেই তার গুপ্ত আশ্রম, পাথরের খোলের ভিতরে কঠিন সবুজ সিআরির পাতায় বোঝাই জোয়ান শাল গাছের পায়ের তলায়, গাঁয়ের বস্তি থেকে অনেক উঁচুতে, সেখান থেকে চারি দিকের জায়গা কেবল যেন পাতালের মতো মনে হয়। উঁচু গাছগুলিতে দলে দলে শকুন, দুপুর বেলাতে পূর্ব ঘাটের ঈগল (ময়ুরমারু পাখী) দেবদারু গাছের আগায় বসে মাথার ঝুঁটি নাড়ে, বিজ্ঞের মতো চারিদিকে তাকায়।

নীচের ঢালুর বাঁশবন থেকে রোদের তাতে কেমন একটা ভাপসা বাতাস আসে, দমবন্ধ হয়ে আসে। আর শুধু সাঁই সাঁই শব্দ। আর থেকে থেকে প্রহরে প্রহরে ফাঁপা প্রতিধ্বনির মতো দূর থেকে কার কথার আওয়াজ, কুড়ুলের চোটের শব্দ আর ক্ষীণভাবে কানে আসা বনের জন্তুর ডাক।

তপ্ত মধ্যাহ্নকে চিরে চিরে ছুটে আসে নানা জাতের গন্ধ, অতি তীব্র চাঁপা, শালগাছের ঘাম, মাটির গন্ধ, বনের সুবাসের অদল বদল।

দিনের গতিতে ছবির পরিবর্তন।

সব কিছুর মধ্যেই গ্রীষ্মের জরতী রূপ, কেবল একজন বেজুণী নয়, সবই সেই এক রকম। দরমু দেবতাকে চাষীর অর্ঘ্যের মতন গাঢ় ধোঁয়া ওঠে পোড়ু চাষের। পাহাড়ের ঢালুতে ঝোপ ঝাপ আগাছা আর ঘাসের ঘন চুল শুকিয়ে কটাসে হয়ে উঠেছে, এক এক জায়গায় একেবারে নেড়া। ঝোরার খদের বন ধ্বংস হয়ে গিয়ে বসুধার গুমর ভেঙে সব দুর্বলতা করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত লম্বা লম্বা ফাটল এঁকে বেঁকে চলে গেছে ক্রোশের পর ক্রোশ, বড় বড় ফাটল, শুকনো।

রূপ গন্ধ শব্দ থেকে মুঠো মুঠো ধুলো ছাই ছেঁড়া ফুল, মরা গাছের বাকল কুড়িয়ে বাড়িয়ে বুড়ী বেজুণী নির্জনে তার ভাবনার তার ধারণার মালা গাঁথে, অলঙ্কার গড়ে। সব কিছুতেই দেবতাদের পরিচয় পায়—এমনিই তাদের অশরীরী রূপ, বেজুণীই চেনে, আর কেউ না। তাই এই রোদ খাঁ খাঁ করা

শুকনো চিমড়ে ওঠা দুপুরে জবা ফুলের মালা পরে আর কত রকমের পুঁতির মালার বোঝা গলায় ঝুলিয়ে, পা মেলে দিয়ে বসে ভাবতে তার সুবিধে হয়। বেজুণী ভাবে তাদের সে দেখতে পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলছে, তাই রোজ দুপুরে বনের চূড়ায় একলা বসে বিড়বিড় করে সে আপন মনেই কথা বলে, কোন ব্যাঘাত পায় না। কুড়ি কুড়ি করে কত বছর না গেছে তার চোখের উপর দিয়ে, কত মানুষ পাকল, ঝরে পড়ল, কারও বা কোমল কলিতে লেগেছে অকালের ঝাঁজের দাহ। আজ তারা নেই। কতই তো এসেছিল, তারা চলে গেছে। সকলকে এগিয়ে দেবার জন্য, সকলের হিসাব রাখার জন্য বসে আছে কেবল সে, কিন্তু তার দুঃখ নেই।

মরে আবার জন্ম নিয়ে এসেছে কত, কিন্তু যার ঘটের ঠিকানা হয়নি সে উড়ে বেড়াচ্ছে, কেবল হাওয়ার শরীর, গুণের রঙে ছায়া রূপের বর্ণ। আসক্তিতে লাল হয়ে উঠে ছোট্ট লাল লাল পাখীদের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় তারা, ধূমল চোখে আশার আকুলি-বিকুলি, আশা করবার দেহ নেই ভোগ করবার অনুভূতি নেই। বেজুণী ভাবে তাদের সে দেখতে পায় —ভাসছে, দোল খাচ্ছে, যুগ যুগের আত্মা। যা সব তারা করেছিল তা আর তাদের নেই, যা করতে চেয়েছিল করতে পারেনি, কেবল না মেটা আশা রাশি রাশি। সেই কামনার লাল জালি কাপড় নেড়ে তারা উড়ে যায়। বেজুণী আপন মনে বকতে থাকে—"কেমন আছ? কোথায় চলেছ? কত কাল ভেসে বেড়াবে এমন করে?"—চোখে চোখেই কথা বলে বলে মরে যাওয়া লোকের ডুমা ভেসে চলে যায়, হাওয়ায় শিমুল তুলোর মতো, আগাছা ঘাসের আঁটির মতো। "যাও ডুমা, যাও। তোমরা না সৈনিকের দল, অনেক লড়েছিলে, অনেক বীরত্ব দেখিয়েছিলে, শত্রু যাতে গুপ্ত কথা জেনে নিতে না পারে সে জন্য নিজের জিভ কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে, হাত পা বাঁধা হয়ে যখন পড়েছিলে তখন মাথা কুটে কুটে মরে ডুমা হয়েছ। তোমরা তো ছাউনি পুড়িয়ে দিয়েছিলে, না? আর, তোমরা মানুষ কেটে ফেলেছিলে।

"মেরেছিলে দলকে দল, মেরেছিলে গাদা গাদা, ধরে রাখবে ভেবেছিলে। তোমাদের ভস্মের উপর জন্মানো ধান মাড়ুয়া পর্যন্ত সাহুকারেরা

নিয়ে চলে গেছে। যা গড়বার জন্য তোমরা প্রাণ দিলে এখন তা ধুলোয় মিশে গেছে। তোমরা মরে ভূত হয়েছ, এখানে তোমাদের কেউ চেনে না ; তোমাদের সন্ততি বনের পশু, গাছের বানর। যাও। জ্বলে উঠছে চোখ ? ঝনঝনিয়ে উঠছে খড়্গ ? হাঃ হাঃ, একটা ঢিলও কি ছুঁড়ে মারতে পারবে ? কেন আরো জ্বালাবে পোড়াবে নিজেকে ? যাও, যাও,—

"এই যে আসছে প্রসিদ্ধ ডিসারী, তুকতাকের অবতার। স্ত্রীর আঁচলে নক্ষত্রদের বেঁধে ফেলেছিলি, তাই না ? আকাশটাকে পুরেছিলি তোর কাঁধের লাউতুম্বায়, মানুষকে ভেড়া বানিয়েছিলি, দিন দিয়েছিলি ক্ষণ দিয়েছিলি, তবু অতৃপ্ত। যা, ভেসে যা—"

সেই লোকে যেতে তার ইচ্ছে নেই। জীবন মরণের মাঝামাঝি যেন সে লোক। সেখানে আছে শুধু চেয়ে থাকা, আকুলি-বিকুলি, পরেরটা দেখে নিজের জ্বালা পোড়া, নিজের ভাবনায় বিফল হতাশায় ঝরে পড়া। রাশি রাশি কামনা বিঁধে আছে সেখানে, বুনো কাঁটার চেয়েও বেশী বিষ তাতে।

আকাশে তারই সূচনা, রোদের ঝাঁজে তারই ছায়া। চেয়ে থাকতে থাকতে বেজুণী আপন ভোলা হয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে। কপালের লাঙ্গলের দাগ আরো গভীর, মুখ হাঁ করে আছে, বিকট দেখতে একটি মাত্র হলদে দাঁত আকাশের দিকে নিশানা করে, গায়ের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে, শরীর শিথিল হয়ে পড়ে আছে, সব আলগা, সব হলদে, নির্জন আকাশ, পাহাড়ের উপর একলা বুড়ী। স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন। বাতাসে স্বপ্নের ভার, ফাঁপা বাঁশের ভিতর থেকে স্বপ্নের ডাক। মানুষ সে, কত আর সইবে—।

সে বেঁচে নেই, সে মরেনি, মরাবাঁচার মাঝখানে সে। এইটাকে ছুতো করে তার মন তাকে বোঝায় যে সে আর সকলের থেকে আলাদা, অসাধারণ, কারণ প্রেত তো প্রেত, দেবতাদের সঙ্গেও তার পরিচয় আছে। কেউ না থাকা দুপুরে, এই নির্জনে বনের আত্মা হোক্রু-পেনু কি এসে তার সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের কথা বলে না ? এই সব বুনো অঞ্চল, সারা কন্ধ দেশে যত বন আছে সবেরই ঠাকুর তো সেই। বলে, "দেখ্ বেজুণী, কিরকম রোদ, ঠিক আগুনের মতো তেজ, তবু এত কষ্ট সয়ে ছায়ায় ঢেকে রেখেছি মানুষদের, ঝরনায় জল রেখেছি, দেশে ঠাণ্ডা রেখেছি। কিন্তু কি হবে ?

এত করেও মানুষের কৃতজ্ঞতা পাওয়া যায় না, পোড়ুর উপর পোড়ু বেড়ে চলেছে, বন ছারখার হয়ে যাচ্ছে। বরাবর তো এমন থাকবে না, বেজুণী। রোদ্দুর চলে যাবে, মেঘের ডাকে চারিদিক কাঁপবে, বাঘে খেলে লোকে আমায় স্মরণ করবে।" রোদের তাতে আগুনের হলকার ভিতর দিয়ে দেখা যায় মেঘ দেবতা বীমারজার মুকুট, অত উপর থেকে এই হেনস্তার মধ্যেও তার আশাভরা হাসি, হেঁকে বলছে—"আসছি বেজুণী, সবুর। আর একটুখানি তো।"

হাঁ করে পাগলীর মতো বুড়ী গাছের তলায় পড়ে আছে—মরার মতো। রাখাল ছেলেরা একবার দেখে আর দু'বার তাকায় না, ভয়ে ভয়ে গরু বাছুর হাঁকিয়ে নীচে নেমে যায়। চিল আর শকুন ঘুরে ঘুরে ওড়ে, শেয়াল এসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বট ফল খেয়ে চলে যায়। বেজুণীর তা ভালো লাগে, সে ভাবে তাদের সে চিনেছে, তারা ছদ্মবেশী দেবতা, সবাই মিলে তাকে পাহারা দিচ্ছে।

কিন্তু কখনো কখনো এত পাহারাদার এত দেহরক্ষী থাকা সত্ত্বেও বেজুণীর মনে শঙ্কা জাগে। সূর্যটা হয়তো দুই লাঠি নীচে চলে পড়েছে, লম্বা লম্বা ছায়া। একের পিছনে এক লাফাতে লাফাতে বাতাসের নাচ। বেজুণীর প্রবল কাশি ওঠে, কাশতে কাশতে দুমড়ে মুচড়ে যায় তার শরীর। এমন সময়ে হাওয়ার দোলায় তাকে ছুঁয়ে দিয়ে ডুমারা দৌড়ে পালায়, ডেকে দিকে যায় "আয়—আয়—আয়" বলে। গলার সুরে দরদ ঢেলে কানে কানে কে যেন বলে, "আর কত দিন বুড়ী? ঐ এক মাটি এক গাঁ, কতদিন আর এখানে পড়ে থাকবি? চল্, যাবি চল্।" তরতরিয়ে উড়ে এসে কে আবার তাড়া লাগিয়ে যায়—"চল্ চল্ চল্!" বেজুণী ভয় পায়, কাতর হয়। চোখ খোলে, দেখে সেই মাটি আছে, সেই বন আছে, সে আছে।

হাতের এক কোষ বছর মোটে, এক আঁজলাও হয়নি। এখনি যাবার কি গরজ পড়েছে? গাঁ সামলাবে কে? কে রোগ সারাবে, দেবতাদের তুষ্ট করবে, ভালো মন্দ বুঝে নেবে? ভবিষ্যৎও ভালো নয়, আরো হেনস্তা আরো দুর্ভোগ আছে এদের কপালে। কিন্তু তার কেউ নেই, এরাই সকলে তার, এত তাড়াতাড়ি নিজের ঘাড় থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে সে চায় না।

কত কাজ, কত দায়িত্ব। না সে যাবে না। দেবতা প্রেত এ সব সে ভুলে যায়, শরীরটা ঠাণ্ডা হিম হয়ে গিয়ে আবার ভাল হয়ে যায়, থুর থুর করতে করতে সে গাঁয়ে ফেরে। তার সঙ্গী দরকার, ফেরার সময়ে উপর থেকে যতবার সে গাঁয়ের দিকে তাকায়, তার ফাঁপা শরীরে ওজন ঢোকে, পা আরো শক্ত করে ফেলে মাটির উপরে, হাতের লাঠি শক্ত করে ধরে। এই তার জীবন, বেঁচে থাকার সুখ, গৌরব।

একদিন এমনি ভাবেই বেজুণী পড়ে ছিল। চোখ আকাশপানে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে বাহিরের চেতনা নেই। স্বপ্নে কেবল রোগ শোক অজন্মা মড়ক। দূরে ধুলোয় আকাশ ছাইছে, আগে আগে বাতাস সন্ সন্ করে ছুটে আসছে। কেবল "ওআ—ওআ (আয় আয়)" ডাক। সেই ডাকের তীব্র নিষ্ঠুরতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় মোচড় খাচ্ছে বেজুণী। ঠাট্টার মতো সেই উচ্চ অট্টহাসি "আয়—আয়—"

জঙ্গলের মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কাছে আসছে। "কই, এদিকে নেই তো, গেল কোথায় ?" "ঝাকর-এর কাছে দেখে এলাম আমরা—নেই, ঘরে নেই,গাঁয়ে নেই,এই বনেও নেই, গেল কোথায় ?" "এমনি করে একদিন সে বাঘের পেটে যাবে, দেখিস্। কোথাও নেই, কোথায় যে যায়—" "খুঁজে দেখি তো। লেঞ্জু, চল্ এগিয়ে দেখি।" "ওদিকে আর কি বন আছে লেম্লু ভাই ? পাহাড় শেষ হল, ঐ তো ডগা দেখা যাচ্ছে, ওখানে কোথায় থাকবে ? তার নীচে বাঘের গুহা, তার ওদিকে তো পাতাল—"

কথা বলতে বলতে লেম্লু আর লেঞ্জু দু'জনে সেইখানে এসে হাজির হল। লেম্লু বুড়ো দিউড়ুর প্রতিবেশী। বেজুণী তেমনি মুখ ভেঙানোর মতো করে পড়ে ছিল, গায়ে হাতে নড়ন চড়ন নেই। দুই বন্ধু যেন ভূত দেখে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। তারা জীবন্ত বেজুণীকে খুঁজতে এসেছিল, এভাবে তাকে দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। চারিদিক নির্জন, আর কেউ কোথাও নেই। লেম্লু বুড়ো দু'পা এগতেই পিছন থেকে লেঞ্জু তাকে টেনে ধরল, কানে কানে চুপি চুপি বলল, "চল্ গাঁয়ে ফিরি। একি কাণ্ড!" লেম্লু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে, বাধা না মেনে এগিয়ে গেল। লেঞ্জু মুখটা কেমন একরকম করে ব্যাপারটা যত অপ্রিয়ই হোক মুখ বুজে সয়ে গেল। এই দু'টি মুহূর্তের নীরবতা—লেঞ্জু ভাবছিল সে কেন এল। তার

পরে লেল্লু কন্ধ নিজেকে টেনে হেঁচড়ে কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ডাকল—"বেজুণী—ও বেজুণী!"

সবাইকে চমকে দিয়ে বেজুণীর দেহ ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। লেঞ্জু কন্ধ লেল্লু বুড়োর হাত শক্ত করে ধরেছিল। মহা বিরক্ত হয়ে বেজুণী অনর্গল বলে চলল—"কেন এলি তোরা? এখানে কেন এলি বল্ দেখি? যেখানে যাব পিছু পিছু কুকুরের মতন—! ওঃ—ছিঃ—!" বেজুণীর দুই হাত তার কাপড় সামলাতে ব্যস্ত থাকে।

বেজুণীর বকুনি শুনে লেঞ্জুর হাসি বেরুল। বলল, "চল্ চল্ বেজুণী, বকাবকি করিস্ পরে। খুঁজে খুঁজে মানুষ হয়রান, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াস্, কোনো দিন বাঘে খেয়ে ফেললে কি করবি বেজুণী?"

"বেজুণীকে বাঘে খাবে! কি পেয়েছিস রে বেজুণীকে, অ্যা? বেজুণীকেই যদি বাঘে খাবে তা হলে কাকে না খাবে এ সংসারে? আরে তুই যে না অনাচারী, বুড়ো হয়েও দোষে পাপে ডুবে আছিস্, আগুপাছু কিছুই দেখিস্ না। তোকেই না আগে বাঘে খাবে রে, বেজুণী কি দোষ করেছে যে বাঘে খাবে? ভেবেছিস্ বেজুণী বুড়ী হয়ে গেছে, বেজুণীর চোখ নেই, না রে? তুই না সরবু সাঁওতার ভাই? মনে মনে ফন্দি আঁটিস্ নিজে সাঁওতা হবি বলে—কেন তুই এলি দেবতার থানে,—বেজুণীর সামনে? বল্ দেখি লেঞ্জু বাঁদর, তোর ভয় নেই?"

লেঞ্জু কন্ধের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল—"দোষ করেছি—সাঁওতা হবার মন করেছি—সোনাদেঈ—সর্বজ্ঞা বেজুণী।"

লেল্লু বাধা দিয়ে বলল, "অনর্থক বকছিস্, বেজুণী—যদি তোর উপর এখন দেবতা ভর করে থাকে তাহলে আমাদের মাথা তোর পায়ে লাগুক, তোর পাদুকা শীতল থাক্।"

"দেবতা ভর করেছে! কখন বেজুণীকে দেবতা ভর করে না থাকে রে, পাগল কোথাকার—"

দুই বুড়ো নুয়ে পড়ে তাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করল—"তোর দয়া—তুই রক্ষা কর—তুই কোপ করলে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাব।"

বেজুণী হাসল।

এই সে চায়, সে যেদিকে যাবে দুনিয়ার সবাই মাথা হেঁট করে লুটিয়ে

পড়তে থাকবে, পাথরের পর্বতের উপরে দমুর্ দর্তনীর একক পূজারী সে, তার প্রতাপের কাছে সকলের মাথা নুয়ে নুয়ে পড়তে থাকবে ঢেউ ভাঙার মতো—সে তার পথে চলে যেতে থাকবে। এই মুরুব্বিয়ানাটুকুর জন্যই তার বেঁচে থাকা, স্বামী নেই, সন্তান নেই, সংসারের আর কোনো বন্ধনের সুখ নেই, সে নিঃস্ব, ফতুর, সব গিয়ে আছে এইটুকুই।

"আচ্ছা, ওঠ্ বাছারা। এই অবেলায় বেজুণীর কাছে কিসের প্রয়োজনে এলি ?"

"সাঁওতার স্ত্রী—জ্বরে ধরেছে কাল রাত থেকেই। কি তাত গায়ে, কি কাঁপুনি। খালি বমি হচ্ছে। কেমন করছে যেন। কোন দেবতা ভর করেছে বুঝি বা, আবোল-তাবোল বকছে, চোখদুটো কি বড় বড় হয়ে উঠেছে, মাথা কুটছে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে সারা, কে তাকে দেখে—"

বেজুণী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অফুরন্ত দুঃখ ঘনিয়ে এল তার দুই চোখে।

॥ তিয়াত্তর ॥

পুয়ুর জ্বর হয়েছে। দুয়ারে ডিসারী, বেজুণী, পাড়া-পড়শি। পৃথিবী পুরানো হয়েছে, ইতিহাস নতুন হয়েছে, তবু পাহাড়ের উপরে কন্ধ সমাজে আজও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই দুজন—এক ডিসারী, আর বেজুণী, ধর্মের পাণ্ডা পুরোহিত, সংস্কৃতির ভাণ্ডারী। পূজা 'খেয়ে খেয়ে' দেবতা মোটা হয়েছেন, ভয়ে ভয়ে তাঁকে মেনে মেনে মানুষ হয়েছে সুবোধ সুশীল। তবু রোগ সন্তাপ পিছু ছাড়েনি, দেবতার প্রতি ভয়-ভরসাও যায়নি, বাঁচবার নীতি এই পৃথিবীতে না খুঁজে মানুষ চেয়ে আছে উপরের দিকে।

মালদেশে সব যেমন অনাহূত হঠাৎ, রোগও তেমনি, সব যেমন অনিশ্চিত পরমায়ুও তেমনি। পাহাড়ী জ্বর ঢাক পিটিয়ে আসে না। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাত এমন বেড়ে যায় যে ধান দিলে খই ফোটে। তারপর কেউ ভুগে ভুগে আবার একদিন উঠে বসে, কেউ বা আর ওঠে না। কেউ দুটি বেলা যেতেই শেষ নিশ্বাস ফেলে, কারও বা মাস মাস লাগে। তাই কন্ধ জ্বরকে ডরায়, জ্বর হলে বলে "জ্বরে ধরেছে"। জ্বর ছাড়াতে বেজুণী পাগলীর মতো চুল এলো করে

নাচে, ধুনোর ধোঁয়া খায়, আগুনের উপর হাঁটে, পেটে খাঁড়ার ঘা মারে, বসে বসে মুখস্থ পদ আওড়াতে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। গোষ্ঠীর মানুষের জন্য কষ্ট সয়, নানান ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে। ডিসারী উপায় দেখে, ওষুধ দেয়, বলে, ডঙ্গর রাত্রির মূল খাও, সেরে উঠবে। এত করেও দলে দলে মানুষ শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে, আর ওঠে না। সেই বেজুণী আবার তাদের প্রেতাত্মা তাড়াবার জন্য নাচে, সেই ডিসারী ক্রিয়া-কর্ম করে প্রেত তাড়ায়। তারাই আবার বুঝিয়ে বলে যে এটা খারাপ লোকের ডুমা পুনর্জন্ম নিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল, এ সংসারের যোগ্য ছিল না। এ, গেছে—সমাজের ভালোই হয়েছে। এও মানুষ বিশ্বাস করে, বিষকে অমৃত মনে করে দুই হাতে তুলে পান করে, এমনিই এখানে তার জীবন।

পুয়ুকে জ্বরে ধরেছে। শেষ রাতে ভারী শীতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মালদেশে কখনো বনের ভিতর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসে, হাকিনার সর্দি না লাগে। পুয়ু উঠে বাইরে গিয়ে দেখলে দিউড়ু ঘুমোচ্ছে, লেঞ্জু ঘুমোচ্ছে, অন্ধকার রাত, আকাশে তারা ঝলমল করছে। থেকে থেকে শীত করে উঠছে তার, গা ম্যাজম্যাজ করছে, হাই উঠছে। পুয়ু দাঁড়িয়ে রইল। রাত্রির উদাস ভাবের সঙ্গে তার মন মিলিয়ে নিল। গোয়ালে গরু ফোঁস ফোঁস করে উঠল। দস্রু উঠে পড়ে 'আমি আছি—আমি আছি' বলার মতো করে লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এল। পুয়ুর মনে হল যেন সে লুকিয়ে লুকিয়ে আনন্দ কুড়োবার সময় কেউ দেখে ফেলল। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল সে, বাইরে দিউড়ু। পুয়ুর শীত বেড়ে উঠছে। গ্রীষ্মকালের রাত পুয়ুর তা মনে ছিল না। এত শীতে ঘরে আগুন নেই, হাকিনার ঠাণ্ডা লাগবে। বড় আশঙ্কায় সে নিজে শীতে থুর থুর করতে করতে কাঁথাটি এনে হাকিনার গায়েই চাপা দিয়ে দিল। কিছুক্ষণ না যেতেই দারুণ কাঁপুনিতে সে কুকড়ি-মুকড়ি হয়ে গেল, মাথার ভিতরে একেবারে যেন বিছে কামড়াচ্ছে, চোখের পাতার কাছে যেন কেউ আগুন জেলে রেখেছে। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে ছটফট করতে করতে পুয়ু ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল, বমি আসতে লাগল তার। পুয়ু বুঝতে পারল তাকে জ্বরে ধরেছে। পাহাড়ী জ্বর ঝড়ের মতন আসে, দেখতে দেখতে

তাত চড়ে যায় হু হু করে, জ্বরে বেহুঁশ হয় মানুষ। সব যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে চিন্তা ভাবনা,—কি চীৎকার করছে—কি বলছে—ঘণ্টা খানেক পরে পুয়ু আর সে পুয়ু নয়।

দিউড়ু উঠল। দেখলে পুয়ুর গায়ে জ্বরে খই ফুটছে, চোখদুটো হয়েছে খঞ্জনা পাখীর চোখের মতো লাল। পুয়ুর জ্বর হয়েছে—এ এক নতুন ব্যাপার, নতুন বিপদ। দিউড়ুর খারাপ লাগল।

শুয়ে আছে। কেবল ঘষটাচ্ছে, কিছু বললে সাড়া নেই। খানিক কাঁপে, বমি করে, দেখতে দেখতে তাত আরো বেড়ে যায়। দিউড়ু চুপ করে বসে রইল। মায়ের জ্বরো গায়ে লেপটে থেকে হাকিনার ঘুম ভেঙে গেল। দিউড়ু আরো ব্যস্ত হয়ে উঠল। এমন বেয়াড়া ব্যাপার তার জানা নেই, দিউড়ুর জ্ঞানে এমন বেহাল অবস্থা পুয়ুর কখনও হয়নি।

হাকিনা গড়াগড়ি দিতে দিতে চীৎকার শুরু করল। দিউড়ু নানারকম করে তাকে ভোলাতে লাগল, হাকিনা তার কথা কিছুই শোনে না, ধরলে আরো কাঁদে।

রোদ উঠল। গ্রামের লোকেরা কাঁধে জোয়াল নিয়ে কোদাল নিয়ে নিজের নিজের বলদ হাঁকিয়ে মাঠে চলেছে। গাঁয়ের ঘরনীরা বাসী পাট সেরে দলে দলে ঝোরায় যাওয়া আসা করছে। দিউড়ুর ঘর অচল, তেমনি সে বসে আছে, পুয়ু শুয়ে আছে। লেঞ্জু কাকা অনুমানে বুঝল পুয়ুর অসুখ করেছে হয়তো, কিন্তু দিউড়ুর সঙ্গে তার কথাবার্তা নেই, তার সহানুভূতি কেউ চাইছে না, নিজেই নিজেকে ওজর দেখিয়ে লেঞ্জু কাকা বেরিয়ে গেল।

সবাই আপন আপন কাজে মেতে আছে আর এই বাড়িতে সব চুপচাপ। পুয়ু কখনও কিছু বলত না, কিন্তু এ বাড়ির কলের চাকার মতো সে ঘুরত। কল আজ বন্ধ, কেউ থাকলেও না থাকার মতো সেখানে, সবখানেই সব কাজ চলেছে, এখানে কিছু চলছে না। এ ব্যাপারের মর্ম দিউড়ু এবার হৃদয়ঙ্গম করল, বড় খারাপ লাগল তার। ঘর ঝাঁট দেবে কে? উনন ধরাবে কে? জল আনবে কে? সব তাতে বরাবর পুয়ুর সেবা আর কাজ নিয়েছে দিউড়ু, নিয়ে নিয়ে ভেবেছে সব তার ন্যায্য পাওনা।

আজ দেবার কেউ নেই।

এক লাঠি বেলা হয়েছে; এক দৃষ্টিতে পুয়ুর দিকে চেয়ে তেমনি বসে

আছে দিউড়ু। জীবনের এ এক নতুন দিক, তার অজানা। ঘর-কন্না জানা নেই, সইতে সে শেখেনি, সেবা শুশ্রূষা সে ভাবে স্ত্রীর কাজ, তার তা জানা নেই। পুয়ু বমি করে স্থির হয়ে শুল, চোখ তার কথা বলছে, মুখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। হাকিনা কাঁদল।

অতি দুঃখে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দিউড়ু তার কপালে হাত দিল; ভারী গরম। হু হু করে পুয়ু কেঁদে উঠল। কান্নাকাটিতে গলার আওয়াজ চড়ল, লম্বা বক্তৃতা দিল যা দিউড়ু বোঝে না। নানা কুকথা বলে দিউড়ুকে গাল দিয়ে দিউড়ুকে বলল, "তুই কে? এখানে কেন বসে আছিস্? এখানে তোর কে আছে? তুই কার কি? বেরো বেরো! আজ ভারী সোহাগ উথলে উঠেছে স্ত্রীর উপরে, না? আমি বেরিয়ে যাব—বেরিয়ে যাব, এক দণ্ড থাকব না তোর ছাঁচতলায়—।" সারা শরীর কাঁপছে, রাগে নিশ্বাস আটকে যাচ্ছে, দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, উঠে পড়ে গাল দিচ্ছে বীভৎসভাবে।

এত সহানুভূতির এই প্রতিদান? দিউড়ু রেগে গেল। বাসী মুখে জল পর্যন্ত দেয় নি, ঠায় বসে আছে সে, আজ পুয়ু শোনাচ্ছে নতুন কথা—সে বাঁধন কেটে চলে যাবে, সে স্বাধীন হবে, সে তার কেউ নয়!

এত ঘৃণা ছিল তার মনে? দিউড়ুর ইচ্ছে হচ্ছিল হাতে হাতে তার ফল দিয়ে দেয় শুঁটকোমুখীকে, কিন্তু পুয়ুর জ্বর যে, মারতে মারতে যদি মরে যায় তাহলে সংসারের লোকে দোষ দেবে। থেকে থেকে পুয়ু চেঁচিয়ে ওঠে, কথা বলতে বলতে দুর্বল হাতে আর শুকনো মুখে অঙ্গ ভঙ্গী করে। বিরক্ত হয়ে দিউড়ু উঠে চলে গেল। পুয়ুর যা হয় হোক, সে বাইরে বাইরে নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াবে।

দিউড়ু চলে যাবার পর পুয়ুর রাগ হল কান্না। মা আর ছেলে দুজনকার কান্নায় ঘর ভরে উঠল, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা এসে জড় হল। কান্নার মাঝে জলন্ত চোখ করে আবোলতাবোল কত কি সে বলে যেতে লাগল। জামিরির বুড়ী খোকাকে নিয়ে গেল। লেম্বুর স্ত্রী লেম্বুকে পাঠাল লেঙ্গুকে ডাকতে। ঘরে ধূপ ধুনো দেওয়া হল। আগুন জেলে পুয়ুকে সেঁকলে। গাঁয়ে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে সাঁওতার স্ত্রীর জ্বর হয়েছে। বুড়ীরা ওষুধ বলে দিল ডঙ্গর বাত্রি গাছের মূলের সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে অনুপান। গোষ্ঠীর লোকে পুয়ুর চিকিৎসার ভার নিলে।

বেলা গেল, পুষুর গায়ের তাত কমল না।

রোদ থাকতে থাকতে বেজুণী এল। আপদ-বিপদের সময়ে লোকেরা চিতাগুড়ি দেবতার শরণ নেয়। চিতাগুড়ির পূজা শুরু হল। ডিসারী শুভ মুহূর্ত বলে দিল। বেজুণী নাচল। দরজার কাছে বসে ধুনোর ধোঁয়ার সামনে পাগলের মতো বেজুণী মন্ত্র পড়তে লাগল—

তলে ধরৃতি উপ্‌রে দমুঁ।
কালি গাই পেতা গাই।
দিকিরাই পাইকরাই।
হীলিহালা জালাজালা
ঘোড় শিংঘা ঘোড় সজা
নিডিবিরু পাটুনেরু
সাকি মাসুত্‌ রাই।
আড়ুতিরা মুউঁতিরা
হিঞ্জাতিহিঁ (বলছি)।
জোড়াসাকি জোড়াগাদি
দেউপুরু লেরিকগাডা
সরুসুতা পাটুডোরু।
লেকা গাড়্‌তি এঙ্গা গাড়্‌তি।
থিলে লেকা মলে হেজা।
মাঙ্গ্‌ডুগুরু আগ্‌ডুগুরু
কাটিহিমাইঁ লুলিহিমাইঁ
রেপু পিঞ্জ্‌ণি পাটু পিঞ্জ্‌ণি
কুলাদারা মাণামেজ—

সবাই তাকিয়ে রয়েছে। নাচতে নাচতে দোরগোড়ায় বসে আগে পাছে দুলে দুলে অতি গম্ভীরভাবে বেজুণী কন্ধদেশের এই জ্বর ছাড়াবার মন্ত্র আওড়াতে থাকে, সরল বিশ্বাসে গাইতে থাকে "মাঙ্গডুগুরু আগডুগুরু…… দিকিরাই পাইকরাই"। কি তার অর্থ সে নিজেও জানে না। কত অজানা মানুষ অজানা জায়গার নাম তার মধ্যে, কিন্তু সকলের বিশ্বাস এতেই জ্বর-দেবতা কাবু হবে, বেজুণীর মুখ থেকে দেবতাদের নিজের ভাষায়

জীবন্ত মন্ত্র, আশান্বিত হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই এই ক্রিয়ানুষ্ঠান দেখতে থাকে, কারও মুখে হাসি নেই কি কথা নেই।

পুজো শেষ হতে প্রহর খানিক রাত হল। চাঁদ উঠেছে, বাতাস বইছে। বেজুণীর মন্ত্রপাঠ বন্ধ হল। ঘরের ভিতর থেকে কাঁপা কাঁপা দুর্বল স্বরে পুয়ু জিজ্ঞেস করল, "খোকা কই? আমার খোকাকে এনে দে।" বেজুণী হাসল। সকলে জানল যে দেবতা ছেড়েছে, এখন সাধারণ জর, আর ভয় নেই। জামিরির বুড়ী হাকিনাকে পুয়ুর কোলে বাড়িয়ে দিলে। হাকিনা ঘুম থেকে উঠে মাকে দেখল, চোখটি বুজে নিজের চেনা জায়গাটিতে নিজের সম্পত্তি চিনে নিয়ে মায়ের বুকে মুখটি লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেজুণী বলল, "এবার ঘুমাবে, চল যাই।"

ব্যক্তিকে নিরাপদ জেনে গোষ্ঠীর লোকে এবার উঠল, ব্যক্তির সুখেই কন্ধ গোষ্ঠীর সুখ।

॥ চুয়াত্তর ॥

কিন্তু পুয়ুর জর এত তাড়াতাড়ি ছাড়ল না। দু'দিন থেকে ছাড়ল, কিন্তু পালা করে একদিন অন্তর একদিন আবার আসে। বেজুণী রোজ নাচে না, কিন্তু রোজ মন্ত্র গেয়ে যায়। ঘরের দুয়ার জুড়ে চলন্ত ছায়ার মতো তার মূর্তি দেখে দেখে আর প্রতিদিন তার সেই 'মাঙ্গড়ুগুরু আগ্‌ড়ুগুরু' বিড়ির বিড়ির শুনতে শুনতে পুয়ুর হতাশা বাড়ে যে সে মরবে না, জীবনের যত দুর্ভোগ ভোগবার জন্য ঘষটে ঘষটে আরো বেঁচে থাকতে হবে। না, তার মরণ নেই। কি দুর্বল,—পাশ ফিরতেও কষ্ট, মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে, হাত-পা যেন কষ্ট দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ছিঁড়ে পড়ছে, মাথাটা এক মণ ভারী। এক দিন এই পাহাড়ী মাল জর হলে এক বছরের শক্তি সাহস চলে যায়।

দিনের পর দিন যায়, পুয়ু কেবল ভুগতে থাকে। হুড়মুড়িয়ে কাঁপুনি দিয়ে জর আসে, প্রাণ যেন যায় যায় মনে হয়, মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যায়, কোনো কথা মাথায় ঢোকে না। মাঝে জর যখন থাকে না সে কেবল বসে কাতরায়। বাপের কথা মনে পড়ে, মায়ের কথা মনে পড়ে,

যত কাঁদনভরা অনুভূতি সব চোখের সামনে রেখে কাঁদতে ইচ্ছে করে। দিনের পর দিন জ্বরে ভুগে কাহিল হবার পর আবার যখন বুড়ী রাক্ষসীর মতো জ্বর আসে তখন বাঁচবার আশা চলে যায়, ভারী দুঃখ হয়। মনের সেই উদাস দুঃখে সকলকেই ক্ষমা করা যায়। পুয়ু দিউডুকে খোঁজে, দিউডু নেই।

ভাবে, দিউডুর কি আসে যায়? দিউডু তো শুধু পথ চেয়ে বসে আছে সে মরে গেলে আর কাউকে বিয়ে করবে, সুখে থাকবে। তার শুকনো জ্বরো হাড়-সর্বস্ব বুকে হাকিনা যখন লেপটে পড়ে থাকে, পুয়ু তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কত কথা ভাবে, ছেলেকে আদর করতে করতে সংসার অন্ধকার দেখে, পুয়ু কাঁদে। জ্বরে ধরেছে, দিন দিন দুর্বল করে ফেলছে। ডিসারীর এত যোগ, এত দিনক্ষণ দেখা, বেজুণীর মাঙ্‌ডুগুরু আগ্‌ডুগুরু কালিগাই পেতাগাই বুলি অনর্গল ঝরেও ফল কিছুই হচ্ছে না। তাতেও বিশ্বাস কমছে। যদি সে মরে যায় কারও কিছু ক্ষতি হবে না, দিউডু নতুন বউ আনবে,—সর্বস্ব হারাবে কেবল এই শিশুটি।

খোঁজ নিতে গাঁয়ের লোকেরা আসে, এটা সেটা জিজ্ঞাসা করে, ধুঙ্গিআ টানে, চলে যায়। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো একই সদর রাস্তার উপরে দুই সারি ঘরের এই গ্রাম, কষ্টেসৃষ্টে বারান্দায় বেরুলে গোটা গ্রাম চোখে পড়ে। সারা দিন শুনসান, যে যার কাজে বেরিয়ে যায়। আবার সন্ধ্যার সময় গরুর পিছনে পিছনে লোকেরা ফেরে, ভরসা আসে, কেউ না এলেও এত লোকের মুখ দেখলে রোগী মনে সাহস পায়।

সংবাদ নেয় লেঞ্জুকাকা। দিউডুকে সে ভালোবাসে না, তাই পুয়ুকে বেশী ভালোবাসে। মা আর ছেলেকে দেখলে লেঞ্জুর মনে পড়ে সে একজন মুরুব্বি লোক, সে চায় সকলে তার উপরে নির্ভর করুক। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই লেঞ্জু কাকা উধাও হয়ে যায়। রীতিমত মাতাল হয়ে ফেরে কেবল শুয়ে গড়িয়ে পড়তে।

মাঝে মাঝে দিউডু আসে। পুয়ুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে সে অপ্রস্তুত হয়, পুয়ুর চোখ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মোটা গলায় একবার জিজ্ঞাসা করে যায়—"কেমন আছিস? কেমন লাগছে?" জ্বর কমে না।

ডঙ্গর বাত্রির মূল আর গোলমরিচ খেয়ে খেয়ে পনের দিন পরে একদিন

পুয়ু দেখলে আর শীত করল না, গা তাতল না। চিতাগুড়ি ঠাকরুন দয়া করলেন, জ্বর ছেড়ে গেল। লেঞ্জুকন্ধ ডিসারীকে ডেকে আনল। নাড়ী দেখে মুখ হাত দেখে শুনে ডিসারী বলল, "জ্বর নেই।" ওষুধ দিয়ে গেল, খেলে আর জ্বর আসবে না।

দু'দিন গেল, তিন দিন গেল, জ্বর আর এল না। পুয়ু নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু গায়ে জুত পেল না, হাত পায়ের ভিতর যেন খালি খালি লাগছে, মনে হয় যেন ছিঁড়ে পড়বে। কানে যেন ঝড়ের শব্দ, চোখে দেখা যায় গোল গোল আলোর বিন্দুর মতো চাকা চাকা অন্ধকার, সব উড়ছে। বসে থাকলেও শির টন টন করে। হাকিনা একেবারে রোগা হয়ে গেছে, দিউড়ুর কেমন শুকনো শ্রীহীন চেহারা, কত দিন বুঝি সে ভালো করে এক মুঠো খায়নি। চারিদিক নোংরা, অপরিষ্কার, অনেক কাজ জমে রয়েছে। কোনো রকমে ঘষটে ঘষটে পুয়ু কাজ করে।

সেদিন জামিরির বুড়ী এসে চুল বেঁধে দিচ্ছে, শুকনো মুখে তেল হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছে। সে বর্ণনা করছিল পুয়ুর শরীরের অবস্থা। তার মুখ থেকে এই সহানুভূতির কথা শুনতে পুয়ুর হাসি পায়। কাজ সারবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পুয়ু তাড়াতাড়ি বলল, "হয়েছে, হয়েছে লো আঙ্গী, তেল মাখা হয়ে গেছে।" বলে হাতড়ে হাতড়ে পুয়ু তার ছোট্ট আয়না খুঁজে বার করল। কিন্তু একবার আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে পুয়ুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কি হয়েছে তার? কার এ মুখ? হাত থর থর করে কাঁপতে লাগল, সেই হাতে বার বার আয়না মুছে মুছে পুয়ু দেখতে লাগল। আয়না পুরানো কত দিনের। হাটে যাবার শক্তি হলে একটা নতুন আয়না কিনবে। বলে নাকি ঝরনার জলে মুখ ভালো দেখায়। আয়নাতে সেই এক মুখ, যতবারই দেখ। হাকিনা হবার পরে তলপেটে ঝলসে যাওয়ার মতো দাগ দাগ হয়ে গিয়েছিল, জ্বরের পরে তো এখন তার সারা মুখ মেচেতা পড়ে গেছে, কেবল হাড় আর গর্ত, তার উপরে আবলুস কাঠের মতন চামড়া। রুক্ষ চুল ফুর ফুর করছে, তাও গেছে পাতলা হয়ে, জামিরির বুড়ী আঁচড়ে আঁচড়ে কত চুল জড় করেছে।

এ কি অন্য কারু শরীর? নিজের শরীর দেখে নিজেরই লজ্জা করছে, নিজের সম্পত্তি বলতে কেবল আবলুসের মতো চামড়ার ভিতরে এবড়ো-

খেবড়ো কতকগুলি হাড়ের পোটলা। দাঁড়ালে মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। অসহায় অবস্থা।

যৌবন গেছে, অকালে বিনা দোষে সে বুড়ী হয়ে গেছে, এই নির্দয় পৃথিবীতে সহায় সম্বল শূন্য থুরথুরে বুড়ী একটি। হাইয়ের উপর হাই, দীর্ঘশ্বাসের উপরে দীর্ঘশ্বাস, নিজের টলটলে দুর্বল ফ্যাকাশে চোখের মধ্যে চক্ষুগোলক স্থির রেখে পুয়ু মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ভাবল আবার শরীরটাকে সে আগের মতো গড়ে নেবে, জীবন তার চাই, নিজের জন্য নয়, হাকিনার জন্য।

কখন থেকে দিউড়ু এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে। ঝাঁ ঝাঁ রোদে কাজ করে সে ফিরেছে, মুখখানা কালো। তবু ধুলোয় ঘামে ভরা কঠিন মাংসপেশী তাকে চিনিয়ে দেয় জোয়ান বলে। বাঁকা হাসিটি টানা রয়েছে ঠোঁটের উপরে, হাততালি দেবার মতো পরিহাসের হাসিতে পুয়ুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিউড়ু দেখছে। নীচের পাহাড়ের গুহার ভিতরে কোনও মতে বেলা শেষের হলদে রঙ ভরছে জামিরির স্ত্রী, পেতনীর মতো বসে বসে পুয়ু দেখছে নিজের মুখের ছিরি।

এই তার স্ত্রী, একেই ঘরে আনবার জন্য তার তর সয়নি।

দিউড়ু ভুলে গেল যে পুয়ু জরো রুগী। সে ক্ষেত থেকে ফিরেছে, কাজ থেকে ছুটির স্বপ্ন নিয়ে ফিরেছে, তার চোখে কেবল সে নিজে, আর কেউ নেই।

"খুব সাজগোজ হচ্ছে যে! কোথাও যাওয়া হবে নাকি?" পুয়ু চমকে উঠে তাকাল। জামিরির বুড়ী গিন্নী সে কথায় কানও দিলে না।

দিউড়ু বলল, "শুকনো সিঁটকে মুখ মাজতে মাজতে সারা দিন কেটে যায়, আর মাঠে খাবার তৈরি করে পাঠাবার বেলায় সাত বাহানা। এত সাজ গোজ কিসের, রাঙ্গার (কয়লা) উপর হাঙ্গা (হলুদ) ঘষে ঘষে কি হবে? তাতে আবার আয়নাতে মুখ দেখা হচ্ছে!"

পুয়ু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, পুরানো ছোট্ট আয়নাটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

"ওঃ, এই টুকুতেই অভিমান হয়ে গেল বুঝি! কথায় কথায় কান্না!" জামিরির স্ত্রী রেগে বলল, "কেন রে বাছা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাস্?

এই কি তোর ভাল লাগে ? দেখছিস্ অয়ো মানুষটা, তোর একটু দয়া মায়া নেই ?"

তেমনি কাঁদতে কাঁদতে পুয়ু বলল, "ইচ্ছে হয় তো আর কোথাও থেকে সোনামুখী কন্যে বিয়ে করে আনিস্ না কেন ? আমি কি বারণ করেছি না আমি পথ আগলে বসে আছি ? তুমি তো জোয়ান আছ, আমিই না হয় বুড়ী হয়ে গেছি। শুকনো মুখ আর কয়লাতে তোমার কি দরকার, কে তোমায় ডেকেছে সে সব দেখে মন খারাপ করতে ?"

দিউড়ুর মন নরম হল না, নিত্যই মনে মনে এই রকম কত দৃশ্য সে কল্পনা করেছে, কত কান্নাকাটি দেখে দেখে তার মন পাথর হয়ে গেছে। পুয়ুর রোগ সেরে গেছে, তার মাথা থেকে দায়িত্ব নেমে গেছে ! এখন বাকী পুয়ুর মন, তার প্রতি তার খাতির কম।

তবে জামিরির গিন্নীর মুখের উপর কথা বলে সে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চায় না, মনের বিরক্তি মনেই চেপে দিউড়ু দুম দুম করে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

এই রকম সময়ে পুবুলির কথা তার মনে পড়ে। পুবুলি থাকলে হয়তো ঘরে মন বসত। এক দিকে সে নিজে, এক দিকে লেঞ্জু কাকা, কেবল খেয়ে উড়িয়ে দিতে জানে আর কিছু জানে না, আর এক দিকে পুয়ু। একজন থেকে দু'জন হলেই ঝগড়াঝাঁটির সম্ভাবনা। সকলেই যেন আপন ঘরে পর হয়ে রয়েছে।

অলস মনে এমনি ভাবে দিউড়ু। সবাইকে যদি তাড়িয়ে দিতে পারত, লাঠি উঁচিয়ে খেদিয়ে দিতে পারত, তাহলে জীবনের সঙ্গে নতুন পথে নতুন করে জানাশোনা হতে পারত। এ না হলে পিওটি শুধু আশামাত্র, তার সার্থকতা নেই।

আস্তে আস্তে পুয়ু উঠে দাঁড়াল, আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর করা থেকে খালি হাত পর্যন্ত অভ্যাস করে গাঁয়ের রাস্তায় হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল। কিন্তু পাহাড়ী জ্বর তাকে মচকে দিয়ে গেছে ; তাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেছে। দিনের পর দিন আরও একলা, আরও হতাশ হয়ে উঠেছে সে। সে আর সে পুয়ু নেই।

॥ পঁচাত্তর ॥

বালি পূজার অল্প দিন আছে। নতুন ক্ষেত তৈরির জন্য এক একটা গোটা পাহাড় জ্বলে গেছে। 'ফারস্টির' ঘুম ভাঙলে সে খোঁজ করতে বেরুবে কোথায় কে জঙ্গল পুড়িয়ে কত ক্ষতি করেছে! বিশ ক্রোশ বন তার এলাকায়, প্রতি চার ক্রোশে এক জন করে পাহারাদার 'গারড' (গার্ড)। তারা সকলেই দেখল শালবন কেটে জ্বালিয়ে দেওয়া হল, মূল্যবান বাঁশবন পুড়ে ছাই হল, কিন্তু তখন গিয়ে কি হবে? পাহাড়ী দেশে পথ চলা সহজ নয়, জঙ্গলে কাঁটা আছে, সাপ আছে, বাঘ আছে। গারড যদি তার চার ক্রোশের মধ্যে কোনো মাঝামাঝি জায়গায় বসে থাকে তাহলে তো ফারস্টির অচল অবস্থা হয়ে পড়ে, কাজেই তারা প্রায় ফারস্টির কাছেই থাকে। একজন গারড রাঁধে, একজন কফি বানায় আর ছেলে পিলে কোলে করে, একজন থাকে শিকারের খোঁজ করে বেড়াতে আর ফারস্টির শিকারের জন্য ভাল জায়গা দেখে মাচান বাঁধতে, আর এক জন বন্দুক পরিষ্কার করে—সে ফারস্টির সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। গারড যদিই বার হয় তাহলে সে নিজের জানাশোনা লোকদের খোঁজ খবর নিতে যায়, মদ খায়, গাঁজা টানে, নয় তো আফিম খেয়ে নিজের এলাকার গাছের স্বপ্ন দেখে। জ্বরে আর ব্যভিচারে পচে পচে সকলের চেহারা যেন বুড়ো ঘোড়ার মতন, এক এক ফাল আধ আধখানা মানুষ—চোপসানো গাল, পাকা চুল। দরবারী বেশ পরে যখন বেরিয়ে পড়ে, পুরানো পোশাক ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে, বাদুড়ের ডানার মত লটপট করে। বিশ ক্রোশ পাহাড় পর্বত মালি আর দমক-এর বনে সে একমাত্র ফারস্টি, সহকারী পাঁচটি গারড, তার মধ্যে তিনটি বুড়ো, একজন কানা, আর একজন কালা। ফারস্টির মাইনে ত্রিশ টাকা, গারড-এর সাত। কখনো কখনো চার-পাঁচ মাসের মাইনে বাকী পড়ে যায় তবুও 'ফারস্টি লেঞ্জার' (ফরেষ্ট রেঞ্জার) হাত থেকে খরচ করে খেয়ে মুটেদের মজুরি দিয়ে মাসে কুড়ি দিন গস্ত করতে থাকে। পাহাড়ী হাওয়া বড় মিঠে, নিজের ঘাঁটির আসপাশের গ্রাম তার উত্তম চারণভূমি। সে

শিকার করে, ছাগল পেলেই পোলাও পার্টি হয়, পুরানো রেকর্ড বাজিয়ে 'পালাওআড়ে মালাওআড়ে' গান শোনে, বাড়ির কথা ভাবে, আর গারড সচিবদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজের বনের রোশনাই দেখে।

"ওরে সাহু—"

"মহাপ্রু—?"

"ওটা সগি ঘাট জ্বলছে না রে? মিণিআপাম্বুর খেন্দা?"

"চিতং চিতং, মহাপ্রু।" (যে আজ্ঞে)

"আর ঐটে?"

"ডোম ব্যাটারা আগুন ধরিয়ে থাকবে, মহাপ্রু, মাছপুট ডংগর মনে হয়—"

"বেরুবে নাকি রে সাহু?"

"তমর ইষ্টং (তোমার অভিরুচি) চিতং মহাপ্রভু। ব্যাটা পয়সাওলা ডোমেরা—"

বড় 'লেঞ্জার'-সাহেব পোশাক পরে। মাঝবয়সী হলেও সে বিয়ে করেনি। ঘরের কবাটে খিল দিয়ে সাহেবী গতের অনুকরণে বেহালা বাজায় আর নাচে। বড় মাথা তার, মন্ত্রণা দিতে, জঙ্গল-সংক্রান্ত মোকদ্দমায় হাজির থাকতে, বড বড় পরিকল্পনা তৈরি করতে তাকে মাসের বেশীর ভাগ দিন 'হুজুর'-এর কাজে শহরে যেতে হয়। জঙ্গলে এলে তার কাজ লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট পোড়ানো, সভ্য জগতের পোশাক দেখানো, ইংরাজী ভাষায় ফারস্টিকে গাল দেওয়া এবং তার নামে 'হুজুরে' রিপোর্ট করা। সময় সুযোগ বুঝে ডালি ভেট নিয়ে ফারস্টি হুজুরের সকাশে যায়। লেঞ্জার এদিকে বেহালা বাজায় আর নাচে, ওদিকে হুজুরের আপিসে তার কাগজ পত্র হারিয়ে যায়। ফারস্টি পোলাও-পার্টি খায়, দুর্নাম গায়। বন যখন পুড়তে থাকে তখন কতবার ফারস্টি গারডের অনুপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয়। বার বার জ্বরের জন্য ওযুধ খেতে বাইরে যাওয়া তো লেগেই আছে, তা ছাড়া আরো বড় বড় কাজ আছে।

'অডর' (অর্ডার) এল অমুক জায়গায় সেগুন গাছ লাগাতে হবে। লঙ্কামরিচ বেঁধে গাঁয়ে খবর পাঠানো হল। লোকেরা এল। চার মাস ধরে কাজ চলল। চিহ্ন করা খুঁটি পোঁতা হল, খুঁটিগুলির গা ঘেঁষে গাছ

লাগানো হল। বছর ঘুরতে খুঁটি সব বেড়ে উঠে বড় বড় উইঢিপি হয়ে গেছে, গাছেরও মোক্ষলাভ হয়ে গেছে। এবার রিপোর্ট লেখার পালা। তার পর অন্যান্য অনেক কাজ। পাঁচ বছর ধরে বাংলো একখানা তৈরি হচ্ছে, ইঁট পোড়ানো হচ্ছে, এমনি অনেক কাজ। কখনো বা কোনো আরও বড় অধিকারী রাস্তাঘাট থাকা অঞ্চলে পদার্পণ করেছেন, তাঁর খোঁজখবর নিতে যেতে হবে, না গেলে মাথার ছেণ্ডি (চুল) থাকবে না। বাঘ শিকার হবে, অতএব সন্ধান করতে হবে কোন বনে বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে, কত লম্বা সে, কোন বনে বাঘের লেণ্ডি পড়ে আছে, আকারে কত বড়। চিরাচরিত রীতিতে বাঘ মামাকে তিন দিনে একটি করে মোষ খেতে দিয়ে, ক্রমে ক্রমে রাস্তার কাছাকাছি মোষ বেঁধে বাঘকে ভুলিয়ে রাস্তার কাছে নিয়ে এলে একদিন বড় মানুষ বড় গাছের উপরে মই বেয়ে উঠে বড় বন্দুক দিয়ে বড় বাঘ মারবে, ফারষ্টি ধন্য হবে। জঙ্গল মুর্গী শুট্ হয় অর্থাৎ বন-মোরগকে বন্দুকে মারা হয়। বন-মোরগ হুঁশিয়ার হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। যেখানে বন্দুক ফোটানো হবে সেখানে তাকে নিয়ে আসার জন্য ফারষ্টি মাসের পর মাস পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিদিন মনখানিক করে মাড়ুয়া আর চাল ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাদের এক জায়গায় জড় করবে, নির্ধারিত দিনে খেদা হবে, মেঘের মতো বন-মোরগ উড়বে, বন্দুক ফুটবে, হীনকপালে বন-মোরগ আট-দশটি পড়বে, ফারষ্টির ব্রত উদযাপন হবে। একটা মানুষের এত কাজ, তাতে আবার এত বড় এলাকা, কোন দিকে যায় সে। জ্বর মশা দুঃখ কষ্ট। বেহাল হয়ে ফারষ্টি জঙ্গলের রোশনাই দেখে, পুরানো রেকর্ড শুনে শুনে মনের বেদনা ঘোচায়, কালি-কাগজে রিপোর্ট লিখে লঙ্কা-মরিচ বেঁধে পাঠায়। লেজ্ঞার বেহালা বাজায়, মাথা ধরার ছুতো করে গারড ঘরে বসে গাঁজায় দম লাগায়। বন জ্বলতে থাকে।

মিণিআপায়ুর পথের গারড এমনি, ফারষ্টি এমনি।

সকলের এক অবস্থা নয়। যার ভাগ্য ভালো সে বাঘের বাসা জ্বরের আড়ত এই বনে আসবে কেন? এখানে এসে যতই ফাঁকি দিক, জঙ্গলে জঙ্গলে না ঘুরলে কাজ হবে না। আর জঙ্গলে ঘুরলে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাওয়া অনিবার্য। কোনদিন গারড বেচারা ফারষ্টির কফি নিয়ে যাচ্ছে মাচানের দিকে, পথে বাঘে তাকে তুলে নিয়ে চম্পট। মাঠে পায়খানা করতে বসলে

বাঘে খেয়ে ফেলবে, পথ চললে বাঘে ধরে নিয়ে যাবে, ঘর থেকে বাইরে পা বাড়ালে ভগবান ভরসা। মাল-জ্বরে ভুগে ভুগে কারও দাঁত পড়ে গেছে, কারও পেটে সেরখানিক ওজনের পিলে। হাতে গলায় যতই মাদুলি বাঁধুক মাল-জ্বরে পরিবারের দু'এক জন যাবেই, গারডও মরে, ফারষ্টিও মৃত্যুর অধীন। গস্তে গেলে কোথায় যে আশ্রয় নিতে হবে তার কোনো স্থিরতা নেই, কার গোয়ালে, কার বারন্দায়, কোথায় কোন গাছতলায়। চার ভাগের তিন ভাগ দিন এখানে শীত আর বর্ষা, কুয়াশা, অন্ধকার। জলে ভিজে, শীতে কেঁপে খাঁট পাহাড়ের অপথে পায়ে হেঁটে গস্ত, রাস্তা নেই, যানবাহন নেই, মরে গেলে খোঁজ নেবার কেউ নেই, কন্ধ কেবল বলবে "মন্দ ডুমা ছিল, তাডাতাড়ি মরল, এতে দুঃখ কি?" এই রকম জীবনের জন্য গারডেব মাইনে সাত টাকা, ফারষ্টির ত্রিশ, তাও আবার চার-পাঁচ মাস বাকী পডে থাকে। এত বড বিশ ক্রোশ এলাকার বন রক্ষা করবার জন্য মোটে একটি ফারষ্টি, পাঁচটি গারড। তাদের মরা-বাঁচার খোঁজ-খবর নেবার গরজ কারও নেই। তাদের জন্য ডাক্তারখানা নেই, ডাকঘর নেই, সভ্য জীবনের কোনো রকম আনন্দ নেই বা সুবিধা নেই, তারা নির্বাসিত। আশা নেই, সুখস্বপ্ন নেই, জীবন বন্য, নির্দয়। মানুষ শিখিয়েছে অমানুষ হতে, জীবন শিখিয়েছে সুবিধাবাদী হতে, তাই ফারষ্টি এমনি, গারড এমনি।

তারা আসছে, খবর এসেছে। আগে আগে বাজনার শব্দে খবর চলেছে। এ গাঁয়ের কন্ধ গাঁয়ে বসে ঢোল পিটিয়ে দিল, সে বাজনার সঙ্কেত বুঝবে ও গাঁয়ের কন্ধ—যে ফারষ্টি আসছে। ও গাঁয়ের ঢোলের আওয়াজে তার ওদিকের গাঁয়ে খবর চলে গেল। হাটে সেই আলোচনা, এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে আত্মীয়কুটুম্বের বাডি যাচ্ছে যারা, তাদের মুখে মুখেও সেই খবর। কন্ধ প্রস্তুত। চাঁদা করে পয়সা তোলা হচ্ছে। যোগাড চলেছে মধু, পালো, খাম আলু, কাঁচা লঙ্কা, তেঁতুল আর ক্ষেতের পুরাতন শস্যের। এক জনই তো ফারষ্টি, একটা গাঁয়ে সে ক'বার আসতে পারে? তাকে সন্তুষ্ট করে বিদায় করতে না পারলে ফেসাদ বাধাবে। নিজে কেবল কৌপীন পরে রুখু মাথায় অতিথি সৎকারের জন্য এত রকম আয়োজন ভালোবাসায় নয়, ভয়ে। পঞ্চায়েত বসে সব ঠিক ঠিক হল। পোড়ু করা অঞ্চল সব যত

পারল হাল চালিয়ে দিল, ফারষ্টি গোলে পড়ুক এর মধ্যে কোনটাই বা নতুন পোড়ু আর কোনটাই বা পুরানো। গাঁয়ে লোকেরা সলা করেছে কেউ কারো নাম করবে না, ফারষ্টি যা ঠিক করে দেবে সবাই মিলে তাই দিয়ে নিষ্কৃতি পাবে। নেহাত যদি জেদ ধরে তাহলে ওদের মধ্যে দু'জন সামনে এগিয়ে আসবে, বলবে—আমরা করেছি। যাই শাস্তি হোক জরিমানা হোক সকলে চাঁদা করে তুলে দেবে।

ফারষ্টি কোথায় থাকবে তাও ঠিক হয়ে গেছে,—তার মোট কে বইবে, মোরগ কোথা থেকে যোগাড় করা হবে, কোন ছাগল কাটা হবে। সবাই প্রস্তুত, এখন ফারষ্টি এলেই হয়।

একটা রাত ডিসারী তারা দেখে দেখেই কাটাল। সকাল হতে তার গোষ্ঠীর লোক এসে জড় হল: "বল্ ডিসারী, ফারষ্টি যে আসছে, যোগ কেমন পড়েছে, ফল কি হবে।" সারা রাত বসে বসে ডিসারী এই প্রশ্নের জবাব পেয়েছে,—কেবল তার দলের লোকের জন্য তার এই পরিশ্রম। ডিসারী বলে যায়, অর্ধেক ভালো, অর্ধেক মন্দ। সেই অনুসারে প্রস্তাবিত ছাগল ছোট থেকে বড় হয়, অন্যান্য সামগ্রীও কম বেশী হয়। সব অধিকারীই মহাপ্রভু। ফারষ্টি পোড়ু করলে ধরবে, জন্তু মারলেও ধরবে, গরু চরানোর জন্যও সে পানু (ট্যাক্স) ধরে, প্রতি লাঙ্গল পিছু পানু ধরে। এ সব ছাড়া তার অন্য ক্ষমতাও আছে—সে গিয়ে অন্যান্য অধিকারীদের নানা বিষয়ে সংবাদ দেয়—কে মদ চোলাই করে, কার দরজার সামনে নোংরা জিনিস পড়ে আছে, কারণ সব অধিকারী এক জাত, বনের কন্ধ থেকে ভিন্ন।

ডিসারীর পালা শেষ হল, এইবার বেজুণীর পালা। ঝাকর্ দেবতা, ঘর দেবতা ও বিপত্তারিণী 'চিতাগুড়ি' ঠাকুরানীর স্তবনা করা হল। অধিকারী আসছে, সে এ কুলের লোক নয়, দলের লোক নয়, সে এলে যেন কোনো বিপদ না ঘটে। কন্ধদের হাত পা বাঁধা, নতুন জগৎকে সে প্রাণে ভয় করে, বেশী ভয় তার কাগজের লেখাকে। ভয় অবিশ্বাস আশঙ্কায় দোদুল্যমান হয়ে তার কাজ কেবল দেবতার পূজা করে মাটিতে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বর প্রার্থনা করা: বিপদ না আসুক, বিনাশ না হোক, ঠাকুর রক্ষা করুন।'

রোদ থাকতে থাকতেই ফারষ্টি এল। আগে আগে দিউড়ু সাঁওতা, তার পিছনে বারিক ভুর্সা মুণ্ডা আর গাঁয়ের বড বড় রায়তরা, সকলে দল বেঁধে মাঝ পথে তাকে আগ বাড়িয়ে নিয়ে আসতে গেল। সাঁওতা নিজে বইছে পাতায় মুখ বাঁধা দড়িতে ঝোলানো একটা কেঁড়েতে কিছু দুধ আর এক ছড়া পাকা কলা। আগে পথে বরণ, পাদ-পূজা। অধিকারী এত দূর থেকে হেঁটে আসছে, শরীর ক্লান্ত হয়ে থাকবে, মাঝপথে বসে কফি খেয়ে নিয়ে তার পর গাঁয়ে এলেই ভালো।

- ঐ আসছে সে। আগে আগে কন্ধ মুটেরা চলেছে, তাদের পিছনে হাতে বেত নিয়ে চলেছে একজন গারড। সকলের পিছনে ফাবষ্টি, সঙ্গে কানা গারড বন্দুক কাঁধে। মিণিআপায়ুর লোকেরা থাটের উপর থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে নীচে নেমে এল। সেখানে একটা পাথুরে চাতালের মতো জায়গা আছে, গাছের ছায়াও আছে, যত অধিকারী আসে সেইখানেই তাদের সঙ্গে সবাই দেখা সাক্ষাৎ করে। "মহাপ্রভু—মহাপ্রভু" বলতে বলতে ঝড়ের মুখে বাঁশ-বনের মতো সবাই নুয়ে পড়ল। ফারষ্টি বিরক্ত হয়ে মুখের দক্ষিণী চুরুট ছুঁড়ে মারল। তার সারা গা ঘামে জব জব করছে। বলল, "কি রে বেজন্মারা— শালারা জঙ্গল পোড়াবি আর এই রোদে আমাকে দৌড় করাবি। দাঁড়া, তোদের দফা নিকেশ করছি।···কিরে শালা সাঁওতা, নতুন সাঁওতা হয়েছিস্ বলে গোটা জঙ্গল পুড়িয়ে কেরামতি দেখাচ্ছিস্, না? দাঁড়া, ডোমকে তোর মাথার উপরে সাঁওতা করে বসাচ্ছি, দেখবি।" চারিদিকে কেবল "মহাপ্রভু— মহাপ্রভু" শব্দ। ফারষ্টির ধমক শুনতে শুনতে সবাই গারডদের ঘিরে ফিস্‌ফাস্ করতে করতে আসা যাওয়া করায় ব্যস্ত। বনের মানুষ ফারষ্টির ধম-কানির অর্থ বোঝে অন্য রকম, সে অর্থ—'সব বন্দোবস্ত হয়েছে তো? খাওয়া দাওয়া থাকা নেওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না তো? মিহি চাল, সুগন্ধি ঘি, ছাগল, মুরগী সব ঠিক রেখেছ কি না?'

বারদুয়েক শালা বেজন্মা বলে দফা নিকেশ আর জব্দ কবার ভয় দেখিয়ে দিলেই বুনো লোকেরা অমনি যাবে অধিকারীর নীচের অধিকারীর কাছে—"তুই একটু বুঝিয়ে দে মহাপ্রভু, কিছু তো নেই, বনের বানরের মতো থাকি আমরা, যেখানে যা কিছু পেয়েছি আনিয়ে রেখেছি—অমন কথা বোলো না মহাপ্রভু, মরে যাব না আমরা? তুমি অধিকারী, কোপ করলে

আমরা কোথায় যাব ? আমরা দেশিআ লোক, ঘর থেকে পা বাড়ালেই কোনো না কোনো আইন অমান্য হয়ে যাবে, দোষ হয়ে যাবে, তুমি রক্ষে না করলে কে রক্ষে করবে ?…আমাদের দিকু (দশা) দেখ মহাপ্রু, বড় মহাপ্রুকে একটু বুঝিয়ে বলো—"

ফারস্টি ততক্ষণে বসেছে, কন্ধেরা পাখার বাতাস করছে। এক দিকে আগুন জ্বালা হয়েছে। কোমরের কাপড়ে মুরগীর ডিম আর অন্যান্য জিনিস লুকিয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে চোরের মতো আগুনের কাছে কন্ধেরা যাওয়া-আসা করছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে, "কিছু না, কিছু না, কি দেব ? বনের মানুষ, কি বা আমাদের আছে, কি বা আমরা দেব।—না, না, উত্তম লোক সে, মহাপ্রভু অধিকারীর বিরুদ্ধে কিছু বলবার মতো মাথা আছে আমাদের ? কোনো কষ্ট দেয় নি, কোনো অত্যাচার করেনি, ঠাকুরের মতো মানুষ।"

পাথরের চাতালের মতো জায়গাটাতে মহাপ্রভু বসে আছে। বলল, "ওরে সাত্নু, এই শালার ব্যাটারা বাল্‌সা (পাতার কুঁড়ে) বেঁধেছে না এমনি এইখানেই বসিয়ে রাখবে ?" ওদিকে "হট্‌ হট্‌—যা যা" চীৎকার—"ওরে শালারা, যা গাঁয়ে গিয়ে ব্যবস্থা কর ! কফি খেয়ে আমরা গাঁয়ে যাব, না এইখানেই বসে থাকব ? যা—যা—"

গ্রামের লোকেরা এসে পাহাড়ের উপর থেকে দেখে যাচ্ছে—এরই নাম অধিকারী, এরই জন্য এত আয়োজন, এরই কথা নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা, সত্যিই এল সে।

জলযোগ শেষ করে প্রভু অধিকারী উঠলেন। তাঁর মোটবাহক কন্ধদের কাছ থেকে রাস্তার সব হাল চাল এ গাঁয়ের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিল। আগে আগে এলোমেলোভাবে লোকেরা দৌড়ে দৌড়ে চলেছে, স্ত্রীলোকেরা লুকোচ্ছে, ছোট ছেলেরা পালাচ্ছে। পিছনে পিছনে লাঠি হাতে জুতো খটখটিয়ে অধিকারী, তাঁর পিছনে এ গাঁয়ের মাতব্বররা। আগে আগে 'মহাপ্রভু—মহাপ্রভু' নাদ, 'দণ্ডবৎ' 'নমস্কার' পিছন পিছন—"শালা বেজন্মা—'লাঞ্জিকোড়াকা' 'লম্‌ড়াকোড়কা' (বেশ্যাপুত্র, তেলেগু ভাষায়)—কিরে ব্যাটা জঙ্গল কেটেছিস্‌ ?—কিরে ব্যাটা জন্তু মেরেছিস ?"

পাতার কুঁড়ে বাঁধা হয়েছে, গাঁয়ের বস্তি থেকে একটু তফাতে। সেখানে কাঠ আছে, জল আছে, ষোড়শোপচার প্রস্তুত। মহাপ্রভু উপস্থিত হলেন। ভাঁজ করা খাট্ আর চেয়ার পাতা হল। মহাপ্রভু চুরুট টানতে লাগলেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করে ধুলো মাথায় কন্ধেরা তাঁর দিকে মুখ করে বসে পড়ল। এখন থেকে আরম্ভ করে মহাপ্রভু ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এই ছাউনির চারিদিকে তারা ঘিরে বসে থাকবে। চুপচাপ বসে থাকলে আশঙ্কার সেই মন্দ ক্ষণটি এসে পড়তে পারে যখন অধিকারী জিগ্যেস করে বসবে পোড়ু করার কথা, গাঁয়ের লোকেরা তাই বকবক করে কথা বলেই যাচ্ছে, সাঁওতা আর মাতব্বর লোকেরা ডালায় করে রসদ নিয়ে মাথা নুইয়ে এসে অধিকারীর পায়ের কাছে ভেট দিতে থাকে। ছাগলের ম্যা ম্যা শোনা গেল, মোরগের কোঁকর-কোঁ শোনা গেল, নানা রকম শব্দে আর নানা রকম জিনিসে ছাউনিটা হয়ে দাঁড়াল একটা নতুন জায়গা—যা গ্রাম থেকে আলাদা ঠেকে চোখে।

এমনি করে প্রথম দফা শান্তিস্বস্ত্যয়নের পর বিকাল বেলা অধিকারী চললেন জঙ্গল ঘুরে দেখতে। গ্রামের পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে তাব চূড়া পর্যন্ত গেলেন। উঁচু জায়গা থেকে দূরের জঙ্গল পাহাড় সব দেখা যাবে। "ওরে ও সাহু, ঐ ওখানে এক খাবলা গেছে—নিসার গাঁয়ের পাহাড় থেকে।" "মহাপ্রু, আরো গেছে, ঐ দিকে হাসুর্পদর 'খেন্দা', ডেঙ্গণাগুডার নীচের পাহাড়, চিকুগুড়ার 'দমক'।" গারড বলে যাচ্ছে আর ফারষ্টি লিখে লিখে নিচ্ছে, কন্ধেরা ভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে—নিজেদের জন্য নয়, অন্য গ্রামের লোকেদের জন্য। ফারষ্টি একবার তাকিয়ে নিয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরের পাহাড়ের উপরে পোড়ুর পরিমাণ হিসাব করে লিখে নিচ্ছে—"নিসার মালি—৩০·৭৩ একর, সার্গি জঙ্গল—এক একটি গাছের বেড় ৬ ফুট থেকে ১৬ ফুট পর্যন্ত। হাসুর্পদর খেন্দার নীচে ৪·০৯ একর, সাড়ে সাতাশ গাড়ি ডাল পালা, উপরে ২৯·৫৮ একর। সর্গি, দামাপা, বিঞ্জা ও মহানিম গাছ, বেড় ৭ ফুট থেকে ১৩ ফুট ৪ ইঞ্চি।"

বেজুণীর দিব্য দৃষ্টি আর ডিসারীর তারা গোনার চাইতে আরো সূক্ষ্ম আরো পরিষ্কার গণনা জুড়ে দিয়ে, কন্ধ ভাইদের তাক লাগিয়ে দিয়ে, সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ফারষ্টি টুকে নিল দশ মাইল এগার মাইল থেকে আরম্ভ

করে এক মাইল দূর পর্যন্ত পো ড়ু করা অঞ্চলের ক্ষেত্রফল, গাছের জাত, তাদের বেড়, সব কিছু। কোন দুর্ভেদ্য পাহাড় জঙ্গলের ভিতরের কথা, গিয়ে দেখে লিখে ফিরে আসতে লাগত একটি মাস, একটা যুগ—চেন ঘষটানো হল না, ছক কেটে কেটে সার্ভে করা হল না, বিকালবেলা মিণিআপায়ুর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ফারষ্টি পেয়ে গেল দশমিক বিন্দুসহ ক্ষেত্রফল, পৌনঃপুনিক বিন্দুও ছাড়ল না। এক মাসের কাজ পাঁচ মিনিটে করে ফেলাই তার কেরামতি, তার বাহাদুরি, কাজ ফয়সালা করে ফেলা তার চাই।

সন্ধ্যা হল। অন্ধকার হতেই লেঞ্জুকন্ধ গেল সোনাদেঈয়ের বাড়ি। আজ বাড়িতে তুরুঞ্জা আছে, বালমুণ্ডা আছে। বারিক আর লেঞ্জু কন্ধ দুজনে বারান্দায় বসে মদ খেল। "বেশী খাস্‌নে বারিক, গন্ধ লাগলে অধিকারী ধরে মারবে। আন, দে আমাকে।" "আর তুই বা বেশী খেলে কেমন করে চলবে সাঁওতা—আমরাও যাব তো।"

"গ্রামের লোকেরা কি ভাববে বারিক, দিউড়ুটা সর্বক্ষণ সেখানে লেগে আছে জোঁকের মতন।"

"আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব, তুই আমার উপরে ছেড়ে দে তো সাঁওতা। আগে বলতে হবে গারড মহাপ্রভুকে। আমরা দুজনে গিয়ে গারডকে ঘরে ডেকে নিয়ে আসব। গারড বলবে ফারস্টিকে, ফারষ্টি ফিরে গিয়ে বলবে রিবিণিকে (রেভিনিউ অফিসার), আর রিবিণি বলবে নিংগামনকে (আমিন)। এমনি করেই কাজ হয়। সব অধিকারী ভাই ভাই। একজন জানলে সবাই জানবে। শেষে যেদিন তোরই মাথায় শিরোপা বাঁধা হবে, তোকেই দেওয়া হবে নায়কের পদ, তখন তুই বুঝবি আমার কথা সত্যি না মিথ্যে। গায়ের সাঁওতা হবি তুই। আমাকে ভাল করে ক্ষেতখামার দিবি তো সাঁওতা ? না তখন সব ভুলে যাবি ?"

ঘরের ভিতরে জ্বলন্ত উনুনের সামনে সোনাদেঈয়ের মুখখানি লাল দেখাচ্ছিল, উৎসাহ দিচ্ছিল, লেঞ্জুকন্ধ ভাবছিল সত্যি সত্যি সে সাঁওতা হবে।

"কিছু রেখেছিস্‌ তো সাঁওতা ? না সব খালি মুখেই ?"

সোনাদেঈ আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে আছে, লেঞ্জু কন্ধ কি জবাব দেয়। কাপড় ছিঁড়ে গেছে, হাত খালি, মুখ ফুটে বলতে পারে না।

"আছে কিছু বারিক্। না যদি কুলায় ধারে কি কেউ দেবে না?"

বারিক্ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। মানুষের চরিত্রে তার বিশ্বাস খুব কম, এমনি সবাই এত মেলামেশা করবে, পয়সার কথা উঠলেই মুখে যেন তালা পড়ে যায়। কাছে কত পয়সা আছে বলে লেঞ্জু কন্ধ ধরা দিতে রাজি নয়।

রাত এক ঘড়ি বিতে গেল। দুই বন্ধু বেরুল। আঁধারে আঁধারে ফিস ফিস করে কথাবার্তা। বুড়োদের বিদ্রোহ। গলা খাঁকরে কাশতে কাশতে আরও চার পাঁচ জন বুড়ো এসে জুটল, জাম্বা কন্ধ এল। কথা হচ্ছিল কি উপায়ে দিউড়ুকে সরিয়ে লেঞ্জুকন্ধকে সাঁওতা করা যেতে পারে। ভাবছে সকলেই, মুখে বলতে ভয়—দিউড়ু টের পেলে নির্ঘাত মার লাগাবে। প্রথমেই এক দুর্ঘটনা ফারষ্টির ছাউনির সামনে। রান্নাব জায়গার কাছ থেকে দিউড়ু সাঁওতা হঠাৎ এসে বারিকের উপরেই আগে চডাও হল, এই মারে আর কি—"কোথায় ছিলি এতক্ষণ, মাতাল কোথাকার? তোকে দিয়ে কার কি উপকার হবে? অধিকারী এসেছেন, কোথায় খোঁজ খবর নিয়ে ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্য বারিক্-জমি খাচ্ছিস্ না ঘরে বসে মদ খাবার জন্য? চল্ তোকে গারডের কাছে নিয়ে যাচ্ছি—"

গারড এক জায়গায় আরাম করে বসে অপেক্ষা করছিল। "শালা বেজন্মা—"বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে কষিয়ে দিলে প্রকাণ্ড এক থাপ্পড। "শালা বারিক্ হয়েছে—ডেকে ডেকে সাড়া মেলে না। আয় নে, গাড়্ (নদী) গিয়ে নোকি তাবলা (বাসন কোসন) মেজে আন্, নয় তো মর্ পড়ে রাস্তায় কোথাও।" বারিক ঘাবড়ে গিয়েছিল। যেতে যেতে কাঁদো কাঁদো সুরে বলে গেল, "বিনা দোষে আমায় মার খাওয়ালি, ধর্ম বুঝবে তোর আর আমার কথা দিউড়ু সাঁওতা, আমি বুড়ো মানুষ।" গারড নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। ফারষ্টি ঘরের ভিতরেই শুয়ে আছে; ছেলেপিলেরা তার পা টিপে দিচ্ছে। ফারষ্টি শুনেছে হয়তো, ভাবছে গার্ড বুড়ো হলেও অপারগ হয়নি।

গাঁয়ের বুড়োরা দিউড়ুকে ঘিরে বসল। "অকারণ বারিক্‌কে মার খাওয়ালি সাঁওতা—"

"কি দোষ করেছিল সে? বিকেল পর্যন্ত তো এইখানেই ছিল, একটি বার

ঘরে গিয়ে ফিরে আসতে তর সইল না? এত লোক আছে, এইটুকু নোকিতাবলা মাজার জন্য বুড়ো বারিক না হলে চলবে না?"

"বুড়ো সাঁওতা বেঁচে থাকলে এমনটি হতনা, দিউড়ু।"

আর ঝগড়া বাধাতে দিউড়ুর ইচ্ছে ছিলনা। অপরের হাতে মার খাওয়ানোও তার উদ্দেশ্য ছিল না। এখন এই কথা গ্রামে নানানখানা হবে, লোকে দোষ দেবে তাকেই।

মুখে তেজ দেখিয়ে দিউড়ু বলল, "বারিকের পক্ষ নেবার ইচ্ছে হয় তো যা ঐ ঘরে, ফারষ্টি শুয়ে আছে তাকে জিগেস কর্। বারিক্ বারিক্ বলে ডেকে ডেকে তার সাড়া নেই। সে খাবে বারিক্ জমি আর ফারষ্টি খাবে আমাকে। যদি না পারে তো কাজ ছেড়ে দিক, আর কাউকে বারিক করা যাবে।"

অধিকারী কোপ করেছে, তার কারণ থাক আর না থাক, তাতেই বুড়োরা চুপ। লেঞ্জুর মনটা দমে গেল, বড় আশা করে সে এসেছিল। হাটে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো সে কেবল এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। গারডকে জিজ্ঞেস করবার জন্য সে ট্যাঁকে পয়সাও এনেছে, কিন্তু বারিক্ নেই। তার হয়ে দু' কথা বলবার কেউ একজনও নেই। ফারষ্টি ঐ ওখানে কার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। ভিতরে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে জুটে তার পায়ে হাত বোলালে যদি—।

অনেক ভেবে চিন্তে সে ভিতরে গেল। একটি ছেলে কখন থেকে সেবায় লেগে আছে, লেঞ্জু তার জায়গা নিলে। কিছুক্ষণ চুপচাপ পা টেপার পর হঠাৎ ফারষ্টি পায়ে লাথি ছুঁড়ে খেঁকিয়ে উঠে বলল, "কবে তুই পা টিপতে শিখেছিস্ রে শালা! হাতে কেবল কাঁটা গজিয়ে রেখেছে, পা টিপে দিচ্ছে না ফুঁড়ে দিচ্ছে—" তবু লেঞ্জু কাকা সরে গিয়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল। অধীর হয়ে ফারষ্টি হাঁক দিলে—"ওরে সাদু, ঐ ছেলেটাকে ডেকে দে তো। এ বুড়োটা কোত্থেকে এসে জুটল আমায় জ্বালাতে!" লেঞ্জু কাকা ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে এল। মহাপ্রভুর পায়ে হাত দেবার আর তার অধিকার নেই। দরজার কাছে বসে রইল। কতক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে বলল, "মহাপ্রভু আমাদের গাঁয়ে বড় দুর্দিন পড়েছে মহাপ্রভু, আর কোনো সুখ নেই, আর কারো মঙ্গল নেই। গ্রাম উচ্ছন্নে যাচ্ছে।" এক বার বলতে আরম্ভ করে ইচ্ছামত বলে যেতে পারত লেঞ্জু কাকা, কিন্তু মহাপ্রভু চটে উঠে বলল—"তোকে

কে জিজ্ঞেস করছে রে, ব্যাটা পট্‌কার্, কেই বা তোর কাছে ন'শ পঞ্চাশ চাইছে যে তুই গায়ে পড়ে বলছিস্ গ্রাম উচ্ছন্নে যাচ্ছে, অন্ন জোটেনা, মরে যাচ্ছি। চোর বেজন্মা ব্যাটারা, সকালে উঠলেই অমনি চললি বন মারতে, আর যাচাই করতে এলে কেবল কথা বানায়—দিকু: (দশা) দেখ মহাপ্রু, কিছু নেই মহাপ্রু।—ও রে সাহু—"

বাইরে থেকে দিউড়ু দৌড়ে এল। বলল, "কথা তো বলতে জানিস্ না, কেন প্রভু অধিকারীর সামনে মুখ খুলিস্ লেঞ্জু কাকা?" বলে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল। মনে মনে হাসছিল সে, কিন্তু বারিকের মতো তার কাকাও মার খেলে সেটা ভাল দেখাবে না, তাই বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে তাকে মাঝে এসে পড়তে হল। লেঞ্জু কাকার সারা শরীর কাঁপছে। সাহু গারড ভিতরে গেছে, ফারষ্টির চীৎকার শোনা যাচ্ছে—"দেখছিস্ এই বেজন্মা ব্যাটাদের? চোরের মতো নুং নুং করতে করতে এল বুড়োটা, মতলব কি না বসে বসে আমায় ভজাবে, ঠকাবে, আমি যেন ছেলে মানুষ।"

মিষ্টি মিষ্টি গাল দিয়ে লেঞ্জুকে জব্দ করে দিউড়ু বলল, "বললে তো শুনিস্ না ইচাবা (কাকা), উলটে আমার উপর রাগ করিস্। দেখ্ দেখি, তুই কি বললি আর সে কি বুঝল? তুই যা, আমি তাকে বোঝাই গিয়ে।"

দিউড়্ু গেল ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে, তোষামোদ করতে। "বুড়োটার কথা ধরো না মহাপ্রু। তুমি বাপ, আমরা তোমার ছেলে। আমাদের দুঃখের কথা তোমায় না বললে আর কাকে বলব, আর কে শুনবে, মহাপ্রু—"

পাকশাল থেকে ভাজা মাংসের গন্ধ এল, ফারষ্টির মন সেই দিকে। "ওরে সাহু, আগে দু'টুকরো এনে দে অমনি—। হ্যাঁ, কি বললি সাঁওতা? কাল সকালে যাব, সব পোড়্ু আমাকে দেখিয়ে দিস্ তো। আর দোষ তো করেইছিস্, এখন লুকোলে কি আর চাপা পড়বে?"

॥ ছিয়াত্তর ॥

সেবা করতে করতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল, গাঁয়ের লোকেরা ফারস্টির ছাউনির কাছেই রইল। ঐখানেই শোয়া বসা, সেইখানেই মশার কামড় খেতে খেতে ফুট-ফাট কথাবার্তা—কি উপায় করলে মানুষ উদ্ধার পাবে এই ফারষ্টির ফেসাদ থেকে। কন্ধ মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু কথা লুকোতে আপত্তি নেই। সারা রাত দুশ্চিন্তা, ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করা। "হে মা চিতাগুড়ি, পায়রা দেব, মোরগ দেব, উদ্ধার কর, নিঃসম্বল গ্রাম। হে মা ঝাকর্ দেবতা, মদে তোকে স্নান করিয়ে দেব, ছাগল বলি দেব, শুওর বলি দেব, এই ফারষ্টি এই গারডদের কণ্ঠে বিরাজ কর, রক্ষা কর।" বনের দেবতা আবির্ভূত হয় না, আশ্বাস দেয়। প্রাণে ভরসা এনে ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুম। উপরে তারা, নীচে খোলা আকাশের তলায় মানুষ।

সকাল হতে ফারষ্টির অভিষেক হল। আবার ভারে ভারে জিনিস এল—যত রকম সামগ্রী, যা সে বলেছিল যা না বলেছিল—সব। ফারষ্টি নিত্যকর্ম সারল। শোনা যাচ্ছে নাকি সে এ গাঁ ছেড়ে যাবে। সকলের বুক ঢিপ ঢিপ করছে, বিপদের সময় এগিয়ে আসছে, এই বার ফারষ্টি আসল কাজের কথা পাড়বে।

সবাইকে সে জড় করল। চুপটি করে সকলে বসল। হুকুম হল—"যাও সকলে স্নান করে এস।" যদি সে বলত যাও মরে এস তাও সই হত, বড়লোকদের খেয়াল ওঠে ছোট ছেলেদের মতো খেলা করতে। স্নান-ধ্যান সেরে চুলের ঝুঁটিতে তেল দিয়ে আবার সবাই এসে জড় হল। লুঙ্গি পরে মোটা চুরুট ধরিয়ে ফারষ্টি মহাপ্রভু বসে আছেন, তাঁর অনুচরেরা দাঁড়িয়ে আছে হুকুমের অপেক্ষায়। মহাপ্রভু বললেন, "ওরে সাদু, ঠাকুরের ঝুলিটা আন্ দেখি একবার।" একটা থলে এল, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে। ঝুলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে ফারষ্টি একটি কাঠের পুতুল বার করলেন। পুতুলের মাথায় সিঁদুর মাখানো। কন্ধদের সামনে পুতুলটি দু'বার নাচিয়ে

একটা পাথরের উপর সেটিকে স্থাপন করলেন, গম্ভীর গলায় বললেন, "এই দেখ্, তিরুপতি ঠাকুর[১], নমস্কার কর্, নমস্কার কর্।"

চারিদিক্ থেকে রব উঠল, "নমস্কার মা, নমস্কার, নমস্কার।"

ফারষ্টি বললেন, "আরে, মা নয়রে, বাবা।"

"ঠাকুর যে সে মাও বটে বাপও বটে, মহাপ্রু।"

ফারষ্টি কিছু বললেন না, লোকেদের মন বুঝবার জন্য তাকিয়ে রইলেন, সকলের চোখ সেই পুতুলের দিকে। যারা ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করে যে কোনো ঠাকুর দেখলেই তার মাথা নুয়ে পড়ে। তিরুপতি ঠাকুরকে তারা জানেনা, কিন্তু তার সম্মান কম নয় কারু চোখে।

"তাকিয়ে এত দেখছিস্ কি? ঠাকুর ইচ্ছে করলে তোদের খেয়ে ফেলতে পারে।"

"মহাপ্রু—মহাপ্রু—এমন কথা বললে আমরা মরে যাব না মহাপ্রু?—'

"শোন্ কন্ধেরা, তোরা সবাই স্নান করে এসেছিস্, এখন এক এক করে এসে তিরুপতি ঠাকুরের মাথায় হাত রেখে সাফ সাফ বলে যা কে কোথায় কত জঙ্গল পুড়িয়েছিস।"

সবাই চুপ। একটু খস্ খস্ শব্দও নেই কোথাও। এত বড় প্রস্তাবের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। কারও আর নড়ন চড়ন নেই।

গারডরা ঘুরে ফিরে ধমক দিতে লাগল—"কি রে, অধিকারী মা-বাপ, যা বললেন তা করছিস্ না কেন রে? কিরে শুনতে পাস্ না?" কন্ধেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, কেউ জবাব দিলনা।

গারড মহাপ্রভুরা উঠল, লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কন্ধদের তুলে বলল, "আরে যা যা, তিরুপতি ঠাকুরকে ছুঁয়ে বলে আয়। আমাদের কি বসিয়েই রাখবি না কি?"

বিপদ এসেই পড়ল। এক সঙ্গে সবাই হো হো করে উঠে পড়ল, সকলের এক রা—"না না"। ফারষ্টি বসে রইল। এমন কত সে দেখেছে, সে এদের চেনে। সব তর্ক বৃথা হল, অধিকারীর হুকুম মানতেই

১ মাদ্রাজ হইতে প্রায় ৬৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশে অবস্থিত তিরুপতি নামক তীর্থস্থানের প্রসিদ্ধ দেবতা ব্যাঙ্কটেশ্বর (বিষ্ণু); মন্দিরের আয় হইতে ব্যাঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়।

হবে। নিজেদের মধ্যে খুব একচোট চেঁচামেচি করে লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবু অধিকারীরা তাদের পিছনে লেগেই আছে—"হুঁ হুঁ, ওঠ্ ওঠ্।" "মহাপুরুকে কেমন করে ছুঁই, মহাপুরু? ওঁকে ছুঁয়ে কেমন করে 'পরমাণ' (শপথ) করব? পাপ লাগবে মহাপুরু—"

"আসছিস্ কি না?"

এই মহাপ্রভু হুঙ্কার দিচ্ছে ঐ মহাপ্রভুকে স্পর্শ করতে হবে। দুই বিপদের মাঝখানে পড়ে সকলের ভয়বিহ্বল দৃষ্টি, অনাগতের আশঙ্কা। ক্রমে তর্কে মন্দা পড়ল, অধিকারীর সতর্কবাণী বড় হয়ে উঠল। শপথ করতে কন্ধ ভয় পায়, তার বিশ্বাস তার ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে আছে। গোষ্ঠীর এই বিপদের সময়ে ডিসারী গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। কন্ধের দেবতা আকাশের ধর্মুর দিকে হাত তুলে, তার পর নুয়ে পড়ে ধর্তনীকে ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালে। বলল, "আমাদের পাপ লাগবে না, আমাদের দোষ লাগবেনা। অধিকারী বলছেন, যা।" কিন্তু কে আগে যাবে? সাঁওতা পিছনের দিকে সরে সরে আছে। অন্য সকলে মাথা নোয়াতে লেগেছে। বিরক্ত হয়ে ফারষ্টি হাঁকল, "ওরে সাহু, তুই ব্যাটা কোনো কাজের না—"

সাহু গারড তৎপর হল। সামনের এক বুড়োকে হাতে ধরে হিঁচড়ে এনে বলল, "চোঁ, চোঁ—বল্, বল্—" সে বুড়ো জাম্বা কন্ধ। আকুল হয়ে সে চেঁচাতে লাগল—"মহাপ্রু, তোর গু মুত খাই মহাপ্রু—" সাহু জোর করে জাম্বার হাত কাঠের পুতুলের দিকে টেনে নিলে। জাম্বার আপাদমস্তক থর থর করে কাঁপছে। তার হাত কাঠের পুতুলের থেকে সুতো পরিমাণ দূরে রয়েছে আর জাম্বা কাঁপা গলায় চেঁচাচ্ছে—"আমি না মহাপ্রু—আমি না মহাপ্রু—" গারড জাম্বা কন্ধের হাত কাঠের পুতুলের উপর চেপে ধরলে। জাম্বার গায়ে ঘাম ছুটতে লাগল।

ফারষ্টি জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় বন মেরেছিস্, বল।" বড় বড় চোখ করে জাম্বা পুতুলটার দিকে চেয়ে রইল। বলতে লাগল, "চম্পাগছ খেন্দায়—দুই 'মোড়া'র[1] মতো হবে—" এক এক করে সব বলে গেল। ফারষ্টি কাগজ বার করে লিখে নেবার উদ্যোগ করল। ভয় পাওয়া ছেলের মতো জাম্বা চেঁচিয়ে উঠে ছট ফট করে লাফাতে লাগল। "লিখিস্ না মহাপ্রু,

১ কন্ধের 'মোড়া' প্রায় এক একর।

তোর পায়ে পড়ি মহাপ্রু—" ফারষ্টি লিখতে লাগল। জাম্বাকন্ধ হাঁ করে তাকিয়ে রইল, সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। কেউ কিছু লিখলে কন্ধ প্রমাদ গোনে, তার অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে ওঠে। "সব তাতে আমরা রাজি মহাপ্রু, কোনো কথায় আমরা 'মেড়ুআর্' (অবাধ্য) নই, তোর এঁটো খেয়ে বনের মধ্যে আমরা পড়ে আছি, কি দোষে লিখে নিচ্ছিস্, মহাপ্রু।"

মহাপ্রভু শুনলেন না। এক জন তো গিয়ে শপথ করে এল। বন ঘিরে জন্তু খেদার সময়ে বুনো শুওরের পাল যেমন তৈরী গর্তের ভিতর একের পিছনে আর হুড়মুড় করে এসে পড়তে থাকে এবার তেমনি একের পিছনে এক সকলেই গিয়ে বলে বলে এল পুতুলের গায়ে হাত রেখে। ফারষ্টি সব লিখে নিলে। পুতুল নাচিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় বসে সে সব খবর যোগাড় করে নিলে। সব জমিনে যায়নি, কোন জঙ্গলে পোড়ু হয়েছে তা সে চোখেও দেখেনি, তবু রিপোর্টে ফাঁক নেই।

তিরুপতি মহাপ্রভু আবার ঝুলির ভিতর প্রবেশ করলেন। এখানে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, আবার তাঁর আবির্ভাব হবে অন্য কোনো গাঁয়ে। ফারষ্টি হিসাব কষতে লাগল, তারপর চলল বক্তৃতা। সেই জঙ্গলের ভিতরেও বক্তৃতার স্থান আছে, উপাদেয়তা আছে। বৃষ্টির আগে ঝড়ের মতন অধিকারীর কথার ঝড় সয়ে সয়ে সবাই অপেক্ষা করে রইল কখন তাদের কপাল ফাটে। সেই ঝড়ে পানের পিকের কণা উড়তে লাগল, কাকানাডা[১] চুরুটের ধোঁয়া ঘুরে বেড়াতে লাগল, মোটা ভারী গলায় বজ্রপাতের সূচনা, সব মিলিয়ে অনাগত ভবিষ্যের একটা ভয়ঙ্কর চিত্র যার কথা ভাবলে চামুণ্ডার লকলকে জিহ্বার নীচে দেখা যায় জেলখানা, জরিমানা, সর্বস্বান্ত অবস্থা, প্রহার, গালিগালাজ, ঘরভাঙা, গ্রাম উচ্ছেদ,—ভয়ানক!

"শালার ব্যাটা শালা, তোরা এ কি করেছিস্ বল্ তো? লেঙ্গার আমার গলায় ফাঁসি দেবে, তোরা ব্যাটারা আমায় ডুবিয়ে মারবি। কেমন সুন্দর জঙ্গল ছিল, কত বড় বড় গাছ—"

"মহাপ্রু, লতাপাতার ঝোপ মহাপ্রু, সরুআ ডংগর' (একবার কেটে সাফ করা জায়গায় যে ঝোপঝাড় গজায়) মেরেছি—"

১ অন্ধ্র রাজ্যের স্থানবিশেষ, চুরুট তৈয়ারি হয়।

"আবার আমার কথার উপর কথা বলিস্, লাঙ্গিকোড়কা! ওরে সাহু, একে শায়েস্তা কর্ তো।—হাঁ, কি সুন্দর বন, বাঘের বাসা, তাও তোরা কেটে সাফ করে ফেললি! সব জঙ্গল শেষ করে দিবি তোরা, বাঘের থাকবার জায়গা নেই—আসবে, খাবে তোদের। যাক, যা করেছিস্ করেছিস্, এখন দে, খেসারত দে, মর্ শালারা।"

ক্ষতি পূরণের হিসাব হল। কন্ধরা বলল, "এখন কোত্থেকে দেব মহাপ্রু?" আবার ভারে ভারে জিনিস আসছে, চোরের মতন চুপি চুপি পাছ দোর দিয়ে ছাউনির ভিতর চলেছে পা বাঁধা মোরগের কোঁকর কোঁকর, ছাগলের ম্যা ম্যা, ফারষ্টি সেই দিকে আড় চোখে চাইছে, এদিকে ক্ষতি পূরণের হিসাব বলছে। "না দিস্ যদি তো আমার কি; আমি লিখে দিচ্ছি, এই দেখ্। কোর্ট কাছারি যাস্, সেইখানেই যা বলবার বলিস্, তারপর আমায় দোষ দিস্ না। ওরে সাহু—"

ফারষ্টি কাগজের উপর কলম-ধরা হাত রাখল। অমনি এদের এক সঙ্গে আর্ত চীৎকার: "হেই মহাপ্রু—হেই মহাপ্রু, তোর পায়ে পড়ি অমন কথা বলিস্ না—"

"তাহলে দে, রাখ ওখানে।"

"আরো কিছু কম না করলেই হবে না মহাপ্রু, অত দিতে পারব না মহাপ্রু—

"বেশ, লিখে দিচ্ছি। তোরা মেড়ুআররা (অবাধ্য) কথা শুনবি না—"

আবার ব্যগ্র আকুল চীৎকার—"এক কুড়ি কমিয়ে দে মহাপ্রু, তোর পা ধরছি—"

ঘণ্টা খানিক এমনি চলল। লুকিয়ে লুকিয়ে দূর থেকে গাঁয়ের ঘরনীরা শুনছিল। কথাবার্তা চুকল। মুখ শুকিয়ে কন্ধেরা চলে গেল। ফারষ্টি হাঁকল—"ওরে সাহু, কাফি আন্।"

গ্রামে টাকা সংগ্রহের পর্ব শুরু হল। সাঁওতা, বারিক্, বড় বড় রায়তরা গাঁয়ের খোলা জায়গায় জড় হল। অধিকারী রায় দিয়ে দিয়েছে, তাই মেনে নিয়ে সবাই নিস্তার পেয়েছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে, দেরি সইবে না, দিলে সে উঠবে। বহু বাদানুবাদ চলেছে, কে কত

দেবে, যে যত পোড়ু করেছে সেই অনুপাতে হিসাব হবে। মাঝে মাঝে ছাউনি থেকে গারড় এসে "জলদি!—জলদি!" করে তাদের ঘাবড়িয়ে দেয়, তাদের মাথা গুলিয়ে যায়,—ভীরু প্রজা। হিসাব শেষ হল। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে বুড়ো বারিক্ ঘরে ঘরে গিয়ে চেঁচাল—"দে, দে, দেরি হচ্ছে।"

দু'খানি করে ঘর প্রত্যেকের বাড়িতে। ভিতরের ঘর অন্ধকার, সেখানে দেবতার আস্থান, পিতৃপুরুষদের স্মৃতি। সেইখানে কোথায় ঠাসাঠাসি করে রাখা মাড়ুয়ার মরাইয়ের ফাঁকে দেওয়ালের গায়ে একটা করে গর্ত থাকে। তার ভিতরে ঢোকানো মোটা বাঁশের চোঙার মধ্যে বাড়ির খাজাঞ্চিখানা। তারি মধ্যে কন্ধের সর্বস্ব—দানাবাঁধা গায়ের ঘাম, হৃৎপিণ্ডের রক্ত—কয়টি টাকা। কাঁকর পাথরের সঙ্গে যুঝে যুঝে রোদ বৃষ্টি সয়ে অতি কষ্টে মানুষ উৎপাদন করে শস্য। পেট চালানোর জন্য অগ্রিম নেওয়া সাহুকারের দাদন, 'শিস্ত' 'দাস্ত' 'পানু' ইত্যাদি কত রকম দেয়, এই সব মিলে শস্তায় ফসল উড়ে গিয়ে আসে সামান্য টাকা।

তাও রাখতে পারা যায় না, নিরাশার অন্ধকারে সব ঢেকে দিয়ে চোঙ শূন্য করে সেও উড়ে যায়।

দিউড়ু মাথায় হাত দিয়ে তার বাঁশের চোঙার কাছে বসে বসে দোমনা হচ্ছিল। চোঙাটার দিকে চেয়ে চেয়েই উদাসভাবে সে কি ভাবছিল—বাইরে থেকে বারিক্ ডাকল, "আনলি সাঁওতা? বেলা যায়। গারড মহাপ্রভু অপেক্ষা করছে যে।" দিউড়ু জবাব দিলনা। অন্ধকারেই দু' ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল। তার পর চোঙা থেকে ঝেড়ে ঝুড়ে টাকা নিয়ে দিউড়ু বাইরে এল।

লেন-দেন শেষ হল। কাগজের উপর কি বা কলমের আঁচড় কেটে স্কারষ্টি বলল, "নে, রসিদ নে, রেখে দিস্।" এক ঘণ্টা ধরে সবাই নিজের নিজের কাগজ উলটিয়ে পালটিয়ে দেখল। কি এর অর্থ? কি আছে এতে? মুরগী? ছাগল? বোঝা বোঝা শস্য? টাকা? এত জিনিষের সমতুল্য এই এক ফালি কাগজ? গন্ধ নেই, স্বাদ নেই, ওজন নেই। হাতে খসখসে লাগে, চার আঙ্গুল পরিমাণ কাগজ একখানি।

কন্ধ পড়তে জানে না।

গ্রাম থেকে মুটেরা এল। বারিকের কাজ বেগার খাটার লোক যোগাড়

করা। মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা হল। যাবার সময় একটা ডবল পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ফারষ্টি বলল 'নে শালা সাঁওতা, নে ইনাম নে, নইলে আমরা চলে গেলে পর যে আসবে তাকেই বলবি আমরা এ দিলাম তা দিলাম, আমাদের পয়সা না দিয়ে অমনি চলে গেল। 'লাজ্জি কোড়্কা'।"

॥ সাতাত্তর ॥

ফারষ্টি গেল।

ভয় গেল। ঐ সে যাচ্ছে অধিকারীর মূর্তিতে, মাল মুটে সঙ্গে নিয়ে, পাহাড় বেয়ে বেয়ে তরতরিয়ে নেমে, চলে যাচ্ছে ; দূর হয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের ছাগল পিছন বাগে টান দিতে দিতে ম্যা ম্যা করতে করতে চলেছে, চলেছে মুরগী—পা বাঁধা, মাথা নীচের দিকে করে লাঠিতে ঝুলছে। যা যাবার যাক, চাকা ঘুরে ফারষ্টি আবার আসতে যায় কিছু দিন।

খালি সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে এঁটো পড়ে আছে, নোংরা ছড়িয়ে আছে—, পালক ছাড়ানো মুরগীর পাখনা, 'খালি'[১] পাতা। কোমরের জোর গেছে, পয়সা গেছে, মানুষের মুখ হয়েছে পোড়া কাঠ।

কিন্তু কন্ধ হতাশ হয় না, হতাশ হলে মাল দেশে বাঁচা অসম্ভব। আপদ বিপদ অকারণ আসে, তার সময় অসময় নেই, দিনক্ষণ নেই। ফারষ্টি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মদ খাওয়া শুরু হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা দলে দলে রাস্তায় চলাফেরা আরম্ভ করল, ছোট ছেলেরা হাসল, লোকেরা ধুঙ্গিআ টানতে টানতে বসে বসে বলাবলি করতে লাগল যে এত টাকা দিয়েও তাদের লোকসান হবে না। জঙ্গল কেটে সাফ করা পর্বত অঞ্চলের জমিতে খুব বেশী ফসল হবে। সেই হিসাবের মধ্যে শরীরের মেহনত ধরা হল না, বাঘে খাওয়ার আশঙ্কা উপদ্রব ধরা হল না, আগে থেকে নুনের ছিটের মতো সামান্য সামান্য দাদন দিয়ে ফসলের যে শস্তা দর ধরে দেবে সাহুকার তাও সে হিসাবে কষা হল না। কেবল খুশী থাকার জন্য একটা কারণ গড়ে নেয় কন্ধ, সেই তার কেরামতি।

১ শাল ইত্যাদি গাছের পাতা কয়েকটি করিয়া একত্র সেলাই করা।

এত বড় দুঃখের কথা দ্বিতীয়বার মনে না ভেবে লোকেরা আবার চাষের কাজে বেরিয়ে পড়ল, এখনো অর্ধেক বেলা আছে সারা দিনের মধ্যে। কত অধিকারীই তো আসছে, কত লোকসান হতে থাকবে সারা বছর ধরে, তার ভাবনা ভেবে দুঃখ করতে বসলে পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। আবার প্রতিদিনের মতো পাহাড়ের খাঁজের ভিতর গাঁয়ের গৎ চলল, যেন কিছুই হয়নি, সব যেমন ছিল তেমনি।

কিন্তু দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে ভাববার যখন সময় হল, সব ভাবনাচিন্তা এক সঙ্গে ঘাড়ে চেপে বসল। ভাগ্যবাদী পাণ্ডু ডিসারী পর্যন্ত তারা দেখার কথা ভুলে গিয়ে ডেকে উঠল, "ভগবান্ এ কি করলি ভগবান্! কোথায় আমরা, কোথায় বা ফারষ্টি কোথায় বা গারড, কেন সে নেবে আমাদের টাকা? জঙ্গল কি কেউ লাগিয়েছিল?" বেজুণী বলবে, ঠাকুর দেবতারা দুঃখ দেন মানুষকে চেতিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তাতে অবুঝ মন বোঝে না, সাধারণ মানুষ ভাবে।

দিউড়ু আর লেঞ্জুর এক চোট লেগে গেল। দিউড়ু দোষ দিয়ে বলল যে লেঞ্জু কাকা ফারষ্টিকে রাগিয়ে দেওয়াতেই এত টাকা দিতে হল। লেঞ্জু বললে যে দিউড়ু অধিকারী চালাতে জানে না, নয় তো অল্পতেই মিটে যেত। তাদের তর্কাতর্কি দেখতে অনেকে এসে জড় হল। ঘরের মান বজায় রাখবার জন্য পুয়ু আপনি মাঝে পড়ে শ্বশুরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে আটকাল। ফলে খুড়ো-ভাইপোর ঝগড়া মিটল অসুস্থ পুয়ুর উপর দিয়ে। দিউড়ু গর্জন করে উঠল, পুয়ু কাঁদল, হাকিনা কাঁদল, জামিরি বুড়ো ছুটে এল তাল সামলাতে।

কত ঘরে কত অশান্তি আজ এই সন্ধ্যায়, ফারষ্টি তার খবর রাখে না। সে তো বিদেশী। তার ঝুলির তিরুপতি ঠাকুর তার কাজ সোজা করে দিয়েছে, সে খুশী, তার কাজ শেষ। আবার নতুন গাঁয়ে তার নতুন খেলা। কতই অধিকারী এমনি আসে, চলে যায়। যার কিছু বলবার ক্ষমতা নেই, রুখবার শক্তি নেই, নতুন পৃথিবীতে থেকেও সে অতীতের প্রেতের পূজারী। পেছিয়ে পড়ে আছে যে, নিচু হয়ে আছে যে তার অধিকারী সকলেই, হাঁ-কে না বলে সাহস করে চোখ পাকিয়ে দাঁড়াবার তার ব্যক্তিত্বের বল নেই। মুখ ফুটে বলতে পারে না। ঢোড়া সাপের মতো সে নিজেই নিজের লেজ কামড়ে খায়, সেইটুকুই তার সান্ত্বনা। তাই গরিবদের পাড়ায় সন্ধ্যা হতেই

ঝগড়াঝাঁটি, গালিগালাজ, সমস্ত দিনের অপমান, যত মার গালি সেই সময়ে মনের উপর ভেসে ওঠে, মানুষের পশু মনে আসে প্রতিহিংসার ঝোঁক। যে মারধর করেছে সে নাগালের বাইরে সরে পড়েছে, কোনো অছিলা করে ঘরের লোকের উপরে মানুষ ঝাল ঝাড়ে, কান্নার রোল ওঠে। নিজের ঘর পুড়িয়ে, ঘরের লোককে শত্রুর প্রতীক রূপে মনের মধ্যে খাড়া করে, সংকেতের ছলে মানুষ দেখে শত্রুর দুর্দশা।

বৃথা হাত-পা ছুঁড়ে গাল দিয়ে মূল্যস্বরূপে কান্না আদায় করে, মদ খেয়ে দিউডু সাঁওতা নিশ্চিন্ত হল। নেশার অন্ধকার বেড়ে চলল, গাঁয়ের উননের আগুন নিবতে লাগল। রাত্রির আশ্বাসনায় ভুলে-যাওয়া নেশার অনুভূতি হল সত্যি, দিনের কথা, রুক্ষ জীবন, মিছে সে, কেবল মিছে স্বপ্ন।

কিন্তু দিন হতে আবার সে আসে, ক্ষতির স্মৃতি, অভাবের তাড়না। বলদ বুড়ো হয়ে গেছে, এই বেলাই আর এক জোড়া কিনে রাখলে ভালো হত। গামছা পুরানো হয়ে গেছে। চার হাত কাপড় একখানা হলে তিনটে পোশাক হতে পারত। বর্ষা আসছে, কাশি, বুকের ব্যথা, কম্পজ্বরের দিন, মোটা চাদর একখানা না কিনলে নয়। স্ত্রীর জন্য পুঁতির মালা, আংটি, ছেলের জন্য খাজা, নিজের জন্য টাঙি একখানা, সেলাই করা পাতার বর্ষাতি। আবার তখন অর্ধেক খালি বাঁশের চোঙার কাছে বসে কন্ধ তপস্যা করে, ভাবে কোন দেবতার আশীর্বাদে তার ভিতরটা ভরে উঠত যদি, সব ভালো হয়ে যেত। জমিতে বীজ বোনা হয় নি, কবে ফসল পাকবে, বিক্রি হবে, টাকা আসবে? তার মধ্যে আরও কত অধিকারীর আসা যাওয়া একের পর এক, নিংগামন (আমিন) রিবিনি আসবে শিস্ত (খাজনা) আদায় করতে, সবই কোনমতে বেরুবে ঘর-দেবতা থাকা ঘরের সেই বাঁশের চোঙের ভিতর থেকে। সেইখানে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে চুপটি করে দিউডু ভাবে।

দিনে দিনে পুয়ুর কপাল ফাটে। দিউডু নিজের মনের অশান্তির বিষ তার উপরেই ঝাড়ে। গ্রীষ্মের শেষ, দিন দিন বিকাল বেলা ঝড়ো বাতাস মেশানো হালকা বৃষ্টি হতে শুরু করেছে। প্রথম যৌবনের মতো প্রথম বর্ষা, তাতে গতি আছে, ভার নেই; বিস্তৃতি আছে দায়িত্ব নেই। মানুষের মনে তারই হালকা ছায়া পড়ে, ভিজে মাটির গন্ধে পুরানো ভাবনার অঙ্কুর

বেরোয় নূতন প্রকাশের জন্য, মানুষ চাষী ব্যাকুল হয় তার খেয়ালের বীজ বুনতে, উর্বর ঊষর বিচার না করে।

দিউড়ু পুয়ুর দিকে চায়, তার স্বপ্নে পিওটি খিলখিলিয়ে হাসে। আকাশের কালো পাহাড়ের কালো মিশে গিয়ে বাতাসে উড়ে চলা সাদা মেঘের ধোঁয়াকে আড়াল করে গম্ভীর হয়ে যখন ভাসতে থাকে নিরবলম্ব কল্পনায়, তখন সোঁ সোঁ বাতাসে দিউড়ুর কানে বাজে পিওটির ডাক। পুয়ুকে কষ্ট দেয় আর চেয়ে দেখে। শুকনো হাড় বার করা পিঠটা গিয়ে মিশেছে মাথার রুক্ষ চুলের নীচে, গাঁট গাঁট শিরদাঁড়ার হাড়। মুখ গুঁজে পড়ে আছে, থরথর করে কাঁপছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, চাপা অভিমান। রোগা পিঠটা নড়ে উঠছে, আলুথালু চুল বিশ্রী বেমানান—মাটিতে লোটাচ্ছে। কি বকে যাচ্ছে সে, ভাঙা মনের কান্নাভরা কাহিনী, তাতে কত বজ্র, কত ঝড় তুফান। দিউড়ু তাচ্ছিল্য করে: দোলন ফুলের মালা গলার ফাঁস হয়েছে। করুণা নেই। ধুঙ্গিআ ধরিয়ে স্থির হয়ে খুঁটোর মতন বসে এক এক সময়ে দিউড়ু তার দিকে তাকায়। খোঁটা দিয়ে আরো দু' একটা কথা বলে। ভালো লাগে।

পুয়ু হারে দিউড়ুর কাছে, হারে না হাকিনা, স্থির নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে বাপের দিকে চেয়ে থাকে আর খেলা করে। নির্বিকার ভাবে মায়ের কাছে ঘেঁষে গিয়ে স্তনটি মুখে ভরে নিয়ে চুষতে থাকে। মিণিআকা হাকিনা সরবু সাঁওতার বংশধর, মানুষের সন্তান। দুঃখ দৈন্য রোগ পরাধীনতা সকল গরল মিশিয়ে তৈরী অমৃত সে, সব সে গ্রহণ করবে, পরিপাক করবে।

দিউড়ু সাঁওতার পশু-বল তাকে অভিভূত করে না। আলো তার খেলার সাথী, বাতাস তার জীবন, অন্ধকার তার বিশ্রাম, সে মানবশিশু, সে বিচিত্র।

দিউড়ু তার দিকে হাত বাড়ায়, সে আসে না। পরিপূর্ণ সমালোচনা তার দুই চোখে। তেমনি সে ধ্বংসের উপরে অক্ষত হয়ে জেগে থাকে, সে শাসনের বাইরে, দিউড়ু তার কিছু করতে পারবে না।

উজ্জ্বল আলোর দিন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে। ঝড় বৃষ্টিতে হাকিনার ভয় করে। যে দেহ দিউড়ুর চোখে মূল্যহীন, হাকিনার সে দুর্গ। তারি নির্ভয় কোলে শুয়ে ঝড় তুফানের সঙ্গে চেনা পরিচয় করে সে। হঠাৎ

গরম গিয়ে আসে ঠাণ্ডার স্রোত, সব স্থির শান্ত ছিল, দেখতে দেখতে সব ভুলতে শুরু করে, চেনা জানা ধারণা সব যায় উলটে। মা দোরে খিল দিয়ে দেয়, ছেঁড়া নেকড়া পাট করে করে ঢেকেঢুকে দেয়, কানের কাছে গান গাইতে গাইতে তার গা থাপড়ায়। গরম পেয়ে ঘুম এসে যায়। ঘরে আর কেউ নেই, এক রত্তি ছেলে, এক ফালি মা, দু জন দু জনের আশ্রয়, আর কেউ নেই।

একদিন খুব ঝগড়া করে দিউড়ু সন্ধ্যে থেকেই চলে গিয়েছিল। ভারী ঝড় বইছে, পাশের বাড়ি থেকে জামিরির বুড়ীর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ঝড়ের পিছন পিছন অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি এল। সকালের বাসী ফেন ছিল, রান্না বন্ধ। হাকিনা ঘুমিয়ে আছে। ক্লান্তির ঘুম থেকে এক প্রহর রাতে উঠে পুয়ু বাইরে এল। গাঢ় অন্ধকার। দিউড়ুও নেই, লেঙ্কুকাকাও নেই। কন্ধ গ্রামে ঘরেঘরে কবাট বন্ধ। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

বাইরে বসে পুয়ু ভাবতে লাগল সে চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে তার রাগ যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন সে ভাবে কেন এই যন্ত্রণা, এই বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে যাওয়া বরং ঢের ভালো। সেই সময়ে আবার অন্ধকারের দিকে তাকায়, ঝড়ের দিকে তাকায়, ভাবনার গতি বদলে যায়, বার বার ভিতরে গিয়ে হাকিনাকে মশা কামড়াবে বলে ঢাকাঢুকি দিয়ে আসে।

মন বলে ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগবে না। অন্ধকার আশ্বাস দেয় না।

সেদিন সে ঠাকুরদেবতা স্মরণ করছিল। তাঁরা নাকি সর্বত্রই আছেন, সবখানেই তাঁদের দৃষ্টি, সকলের উপরেই তাঁদের আশীর্বাদ। কত পূজা, কত ভক্তি তাঁরা পাচ্ছেন, কোথায় তাঁদের দয়া?

নিজের জন্য তার কিছু চাই না, সবই তার ছেলের জন্য।

এত দুর্ভোগ, এত অনাদর, সত্যি মানুষ হবে হাকিনা?

তার বিহ্বল চিন্তাকে চিরে চিরে দেবতার উজ্জ্বল রূপের আবির্ভাব হয় তার কল্পনায়। কন্ধনীর অভিজ্ঞতা কল্পনায় গড়া। ক্ষেপা মন শুধোয়— "কেন এমন? আর কত দিন—?" মনের গভীর অন্তস্তল থেকে দেবতার মুখে জবাব মেলে: আঁধারের পর আলো; মানুষের বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক প্রকৃতি পরাজয় স্বীকার করে না, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সে অজেয়।

আর সব রাতের মতো একটি রাত সেও। কোনো ঘটনা ঘটে নি,

কোনো কাহিনী নেই তার ; কিন্তু মনে মনে সে জবাব পেয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। তপস্যা সিদ্ধির জন্য ঢাক পেটানো আদেশের প্রয়োজন নেই।

পুয়্ শান্ত হল। হাকিনাকে কোলের মধ্যে নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ আটাত্তর ॥

বন্দিকার।

সাঁঝ বেলায় পিওটি তার ঘরের বারান্দায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল।

এখানে গতর খাটাতে হয় তাকে, মায়ের সঙ্গে গিয়ে গাঁয়ের ক্ষেতে কাজ করে সে। পরিবর্তে একটি কুঁড়ে ঘর তাদের নিজের, খাবার জন্য মাড়ুয়ার ভাত, লেংটি পরা বুনো কন্ধ সমাজে একটু স্থান। কিন্তু কন্ধ হলেও নিজেকে সাজাতে মানা নেই। পিওটি কন্ধনী বেশেও নিজেকে সুন্দর করে সাজায়, ফুল পরে।

বিনা কারণে নিত্য এমনি সন্ধ্যায় সেজে-গুজে সে বেড়াতে বেরোয়। নইলে ভালো লাগে না, অভ্যাস হয়ে গেছে। বিনা প্রয়োজনের প্রতীক্ষার পসরা মাথায় নিয়ে উৎসুক মনে এ-দুয়ার ও-দুয়ার করে বেড়ায় সে। ছেড়ে আসা সেই তল দেশ নেই এখানে, তার বেশবাসের মূল্য নেই, কেবল বাসনাই সার। তবু এই বনবাসেই নাকি তাকে জীবন কাটাতে হবে, এরই কথা বলতে গেলে তার মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেমন হয়ে যায় মা।

পাথর পাথরই তার কাছে, ধুলো কেবল ধুলো, তামাকপাতার পিক পিকই শুধু, আর এখানকার লোক—রক্তে যাদের মধ্যে একজন নাকি সে—এরা বর্বর। যেটুকু দু চোখ দিয়ে দেখে সে তার বাইরে লুকানো আর কোনো গোপন অর্থ সে দেখতে পায় না। বিরক্ত লাগে তার, সে মুক্তি খোঁজে।

চুল আঁচড়ে দিতে দিতে মা শুধালে—"সাঁওতা বাছা দুপুর বেলা কি বললে, পিওটি ?"

"কাজ ছিল।"

"কিছু বলে নি?"

"কাজ ছিল বলে ডাকিয়েছিল, বললাম তো—"

"তার দয়াতেই আমাদের বেঁচে থাকা, জানিস্ তো পিওটি? কাজ যদি থাকে তো সাঁজের বেলা তার বাড়ি গিয়ে করে দিয়ে আয় না কেন? গাঁয়ের মধ্যে মানুষ তো সেই। আর কাকে বলব, কাকে ধরব? গেলি আর এলি, এমন ছটফটিয়ে পালিয়ে এলে তার কাজ কেমন করে হবে বল্ তো?"

"কাজ করার লোকের কি অভাব আছে মা?"

"না রে, সত্যি বলছি। চুল বাঁধা তো হয়েই গেছে, যা না. তার কাজটা সেরে দিয়ে আয়।"

"এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তিন সন্ধ্যায় গোবরের সার মাথায় নিয়ে মাঠে যাব?"

"সার মাথায় করে?"

"নয় তো আর কিসের জন্য ডেকেছিল সে? বললই তো—এমনি কুঁড়েমি করলে আমার কাজ চলবে না, আজ থেকে ক্ষেতে গোবর সার ছাই এসব না দিলে ফসল কি হবে, খাব কি?"

"আর কিছু বলল না?"

পিওটি খুব হাসল, তার মনের সব অভিমান মায়ের উপরে ছুঁড়ে মারল সেই হাসিতে। মা বিরক্ত হল, বলল, "তার কাজটা ভাল করে কর্, পিওটি। আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিস্?"

"সার মাটি গোবর চাষ যা বলে সবই তো করছি মা, কোনো কিছুতে হেলা করি?"

"বেশ, তোর যেমন ভালো লাগে লো—"

দুজনে চুপচাপ। রাগ হচ্ছিল পিওটির। যে না বুঝে সুঝে রাগ করে তাকে আর কি বলা যাবে?—ভাবছিল সে। মা চায় সে হাগুর্ণাকে বাগে আনুক, তাকে বিয়ে করুক, গাঁয়ের মাটিতে শিকড় তাতে আরো ভাল করে বসবে, মা দেখবে। নিজের রুচির অবমাননা করে কিছুদূর সে নেমে গেছে, তার বেশী—সবই কপাল।

"বুঝলি পিওটি, হাগুর্ণার মতো মানুষ ভাগ্যে থাকলে মেলে। আমি মা,

তুই মেয়ে, আর বেশী তোকে কি বলব ? আমাদের কেউ নেই, পরের দয়ার উপর আমাদের নির্ভর। তোর বিয়ে হয়ে গেলে আমার বোঝা নেমে যেত, আমি নিশ্চিন্ত হতাম। কিসের জন্য আর আমি এত দূরে দৌড়ে এলাম, আমার তো একটা পেট—"

"আর আমার কি দুটো পেট মা ?"

"বেশ, তোর যেমন ইচ্ছে—"

একটু থামে, আবার বলে। নিত্যি বলে, উসকায়, খোঁচায়। মা কি ভাবে ? মা বোঝে না, বোঝবার চেষ্টা করে না। ভাবে বুঝি, সে নিজে যেমন পাংগিআণী, মানুষকে বাঘ বানাবার দুঃসাহস রাখে, সকলেই তেমনি।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পিওটি উঠল। আজ ঝড় বৃষ্টি নেই, সুন্দর সাঁঝের বেলাটি। এমনি সন্ধ্যায় মনে হয় সে কে এক জন যদি আসত।

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস্ লো ? এত কি ভাবিস্ ? যা না, ঘুরে ফিরে আয়, যা—"

"হুঁ—"

আনমনা হয়ে পিওটি বেরিয়ে পড়ল। দূরে পাহাড়ের উপর থেকে চোখ ফেরানো যায় না। ক্রমশঃ নিবে আসা মলিন ছায়া সেখানে, কারও গভীর দুঃখের মূক চাহনির মতো।

এমনি সাঁঝে মনে পড়ে যা তাকে আনন্দ দিত তা থেকে সে নির্বাসিত। এই পৃথিবী তার নয়, এখানকার এই মানুষ তার নয়। সে ধরে রাখতে পারে নি, জীবন তাকে ফাঁকি দিয়েছে।

বাইরে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে, দলে দলে লোক। ছোট ছেলেরা ঢোল পিটছে, ধাংড়ারা ফুঁ দিচ্ছে কন্ধ বাঁশিতে। অন্ধকারে ছায়ার মতন নীরবে গৃহিণীরা ঝরনা-নদীতে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে দিয়েছে। এত মানুষ, তার বলতে কে ?

সে অচেনা।

শুমসানী বুড়ীর ঘরের সামনে ছোট্ট একটি আড্ডা বসেছে—যুবতী আর বুড়ীরা মিলে। তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে ফিস ফিস করে কয়েকজন কি বলছে। এমনি বলে ওরা, শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে। শুমসানী বুড়ী

ডাকল—"আয় লো মেয়ে, কোথায় চলেছিস্?" পিওটি গিয়ে বসল। কথায় কথায় সে দেশের গল্প—সেই তল দেশের। তারা জিজ্ঞাসা করে, সে বাড়িয়ে বলে। এমনি সাঁঝ বেলায় এখন কি হচ্ছে সে দেশে? ঘরে ঘরে বাজনা বাজছে, কি সুন্দর সে বাজনা। লোকেরা হয়তো মদ খাচ্ছে, গান গাইছে, নাচছে। কোঠা বাড়ির কথা, গাড়ির কথা, সেখানকার লোকদের কথা। এইখানেই তার জিত, ভাবে পিওটি। শুনতে শুনতে কেউ হয়তো হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তার হাঁ আর বন্ধ হয় না, কারও বা মুখে কেবল "আ—হা, চু—চু"। কেউ বা ভাবে সব মিছে কথা, তর্ক করে, হাসে, হাসায়। কত কি পিওটি গল্প করে যায়, শুনে শুনে সবাই অবাক হয়ে বাড়ি যায়।

যত সে ভাবে সে তাদেরই একজন হবে, তার গল্প তাকে করে পর। এক জন মানুষ আর একজনের গরিমার কাছে হয় মাথা নিচু করে, নয়তো উঠে চলে যায়। নিজেকে ছোট করে পরকে বড় করে চোখের সামনে ধরে রাখতে বনের মানুষের মনটা ছোট হয়ে যায়।

কতদিন এমনি গল্প করতে থাকবে সে? কথায় কথায় সেই অশোভন কৌতূহল: "অমন ভাল দেশ ছেড়ে কেন এখানে চলে এলি, নুনি? কি হয়েছিল?" হাগুর্ণা বসে বসে তার কথা শোনে, মতামত দেয় না। বুড়োরাও মতামত দেয় না, কেবল মাথা নাড়ে যে তারাও জানে। গল্পে গল্পেই এক ঘড়ি রাত হয়ে গেছে, যুবতীরা কখন চলে গেছে, আছে কেবল গুমসানী আর সে।

"আমাদের গাঁ তোর ভাল লাগে, নুনি?"

"লাগে—"

"এত কথা জানলি; এত দেশ দেখলি, বিয়ে করবি না, এমনি থাকবি নুনি?" কি জবাব দেবে সে? "আমাদের গ্রামের সাঁওতা হিকোকা হাগুর্ণা—"আরম্ভ হল! যেখানে তার মায়ের বন্ধু সেখানেই হিকোকা হাগুর্ণার কথা। চারিদিক থেকে সেই কথা যেন তাকে গিলে খেতে আসে। পাত্রী দেখলে পাত্র, আর পাত্র দেখলে পাত্রী মনে মনে বাছতে থাকে সবাই —পরের জন্য। অস্থির হয়ে পিওটি উঠে পড়ে বলল, "আমি যাচ্ছি।"

বিয়ে না করে বড় হয়ে উঠতে থাকলে সমাজের লোকে খোঁচা দেয়, ষড়যন্ত্র করে।

পাড়ার শেষ মুড়োয় হাগুর্ণার বাড়ি কাছিয়ে আসছে, সেইখান দিয়ে পিওটি নিজের কুঁড়ে ঘরে ফিরে যাবে। আর একটা দিন গেল। মা বলেছিল সন্ধ্যাবেলা সাঁওতার বাড়ি যাস। মা জানে না যে সে কত লোকের সঙ্গে আপনি যেচে আলাপ করতে যায়। কত সাজা, কত সুযোগ-সুবিধা খোঁজা। সব ছেলের মনের মতো মেয়ে আছে, যার যেখানে সুবিধা হয়। তার বেলায় সকলের অসুবিধা। 'বাউরী পাড়ায় মানিক'। কি বুঝবে তার মুল্য এরা ?

হাগুর্ণা তার বারন্দায় একলা বসে বসে চুরুট টানছে। পিওটি কাছে এল, গলা খাঁকরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হাগুর্ণা নড়ল চড়ল না।

জেনে শুনে কতবার হাগুর্ণার সঙ্গে সে একলা থেকেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কন্ধের বিশেষ দৃষ্টিতে একবার তাকে চেয়ে দেখা ছাড়া হাগুর্ণার অন্য ধরন কিছু দেখেনি। লেংটি পরা কন্ধ জোয়ান, সারা গাঁয়ের সকলের মান্য করা এই একেই ?

মজুরের বাড়া খাটে। বাকী সব তাতে এত বোকা!

ঝোরার ধারে হাগুর্ণা যেখানে কাঠ কাটছে সেইখানে ইচ্ছে করে পিওটি স্নান করেছে, চুল শুকিয়েছে। কাজ করবার সময়ে ইচ্ছে করে বিচিত্র চাউনি ছিটিয়ে হাগুর্ণার মাথায় সে বোঝা তুলে দিয়েছে। কতবার গায়ে গা লেগেছে। তবু হাগুর্ণা চেঁচাবে "কাজ কর্, বসে থাকিস্ না।" কেবল লেংটা কন্ধ নয়, পাথরের তৈরী মানুষটা, স্নেহ সহানুভুতি সে জানে না। মা এসব জানে না, জানলেই বা কি।

হাগুর্ণার বাড়ির ছাঁচতলায় এসে—

"বসে আছিস্, সাঁওতা ?"

"কে ও—পিওটি ?"

হাগুর্ণাকে সে ঘৃণা করে। নিজেকে উঁচু পাহাড়ের মতো মনে করে যে সব পুরুষ, পিওটি তাদের সবাইকে ঘৃণা করে। উঃ কি তাচ্ছিল্য তার মুখে, চেনেই না যেন সত্যি। একটা মেয়ে লাথি মেরে অন্য কার সঙ্গে চলে গেছে, ঠিক করেছে। তবু এত দেমাক এই পুরুষের!

"কার কথা ভাবছিস্, সাঁওতা ?"

"কার কথা ভাবব নুনি, আপন মনেই বসে আছি, কারও কথা ভেবে আমার কি হবে ?"

অন্ধকার হয়েছে, লোক চলাচল নেই। পিওটির মাথায় খেয়াল চাপল। বারন্দার কাছে ঘেঁষে গিয়ে হাগুর্ণার মুখের কাছে মুখ এগিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "আমি জানি, সাঁওতা ভাবছে সাঁওতার মেয়ের কথা, মিণি-আপায়ুর কথা মনে পড়ছে সাঁওতা, সত্যি করে বল্, তাই না ?" এই বলে পিওটি চাপা গলায় হাসল, হেসে গড়িয়ে পড়ল।

হাগুর্ণা চমকে উঠল। বলল, "কোথাও থেকে টেনে এসেছিস্ নাকি, নুনি ? যা বাড়ি গিয়ে চুপটি করে শুয়ে পড়, এই সময়ে বেশী টানলে মাথা ধরে।"

কেবল পাথর নয় ধারালো পাথর, তলোয়ারের মতো পাথর, এমন খোঁচা মারে যে কেটে বসে যায়। "মদ খেলে গন্ধ পেতিস না, সাঁওতা ? তুই ভাবছিস্ কিনা, তাই অমন লাগছে।" এই বলে পিওটি হাসল। মুখ শুঁকবি সাঁওতা ? এই দেখ্—এই—এই।" বারান্দার উপরে দুই হাতের ভর দিয়ে হাগুর্ণার দিকে ঝুঁকে পড়েছে পিওটি, গরম নিশ্বাসে হাগুর্ণার মুখ যেন ঝলসে যাচ্ছে।

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই। আমায় তুক করতে এসেছিস্, যোবতী ? পারবি না। ঘরে যা।"

পিওটি আরো হাসল। হাগুর্ণা বলল, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বাড়ি যা, মা হয়তো খুঁজছে।" জটায়ুর (হাগুর্ণা) আসন টলছে। আশ্চর্য লাগছে তার। অন্ধকার রাত্রিতে নিজের ঘরের বারান্দায় বসে এমনিভাবে তল দেশের পাখীর সঙ্গে ভাব আলাপ করার কথা সে সপ্নেও কখনো ভাবে নি। পিওটি বাড়ির দিকে চলল, হাগুর্ণা আশ্বস্ত হল। কিছু দূর গিয়েই পিওটি চেঁচিয়ে উঠল—"উঃ—সাঁওতা—ওঃ—" বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁওতা ছুটে গেল। টলতে টলতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিওটি ফিরে আসছে, মুখে সেই কাতর চীৎকার—"ওঃ—"।

"কি হয়েছে নুনি, কি হয়েছে ?"

হাগুর্ণার গায়ের উপর ঢলে পড়ে সাপের মতো তার গলায় দুই হাত জড়িয়ে দিয়ে পিওটি বলল, "কি যেন কামড়ে দিল মনে হচ্ছে, শীত করছে। নিয়ে চল্ আগে দেখি।"

হাণ্ড'ণার মাথা গুলিয়ে গেল। তাকে তুলে নিয়ে বারন্দায় উঠে গেল। বারান্দায় আলো নেই, পিওটি ডাক ছাড়ছে "আলোর কাছে—আলোর কাছে।" থেকে থেকে পিওটির সর্বাঙ্গ ছটফট করে ওঠে, আরো জোরে আঁকড়ে ধরে তার আশ্রয়কে। উলটে হাণ্ড'ণার শরীরে কাঁপুনি ধরে।

তেমনি ভাবে পিওটির বোঝা নিয়ে ধাক্কা দিয়ে হাণ্ড'ণা ঘরের দরজা খুলল। ভিতরে উনুনে একটু জলন্ত অঙ্গার ছিল। অন্ধকারে উনুনের কাছে পিওটিকে নামিয়ে শুইয়ে দিল, ব্যস্ত হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগল। পিওটির "ওঃ—ওঃ" বন্ধ হয় নি। "কোথায় গেলি সাঁওতা? আমার ভয় করছে! বড্ড জ্বালা করছে গো।" অস্থির হয়ে ছট ফট করছে। হাণ্ড'ণা আশ্বাস দিচ্ছে, "দাঁড়া, আমি দেখছি, নুনি—কোনো ভয় নেই—কিছু হবে না।" চুলোয় ফুঁ দিচ্ছে। আগুন জলল। একটু করে আগুন নিয়ে হাণ্ড'ণা তল্লাশ করে দেখতে লাগল।

"কোথায় কামড়েছে?"

"এইখানে—"

"এখানে?"

"না না, ওখানে নয়, এখানে—এখানে—"

"এখানে?"

"না।"

হাণ্ড'ণা ঘেমে উঠেছিল—"পেলাম না, নুনি।"

কানের কাছে ভারী ভারী নিশ্বাস, শক্ত করে তাকে ধরে আছে পিওটি, আগুন জলতে জলতে হাণ্ড'ণার হাত পর্যন্ত এসে পড়েছে। পিওটি ফুঁ দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার। বুক ঢিপ ঢিপ করতে করতে হাণ্ড'ণা শুনতে পেল পিওটি আস্তে আস্তে হাসছে। কে তাকে বেঁধে ফেলছে, পিষে ফেলছে। কেবল আঁধার আর স্বপ্ন। সে নেই, পিওটি নেই, কেউ নেই, কেবল স্বপ্ন।

রাত এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। ঘেমে নেয়ে হাণ্ড'ণা বারান্দায় এসে বসল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। মাথা ভার ভার লাগছিল, হাই উঠছিল। খুব ভাবছিল হাণ্ড'ণা সাঁওতা। কিছু সে বুঝতে পারছে না, অথচ সব এখন বাস্তব। মনের ভিতরে দ্বন্দ্ব—স্বপ্ন না সত্যি, সত্যি না স্বপ্ন। অলস

দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা বাতাস বইল। হাগুর্ণা ঘুমিয়ে পড়ল।

পিওটি ঘরে ফিরে গিয়েছিল। হাগুর্ণাকে সে বিয়ে করতে পারবে কিনা তা সে জানে না, ক্ষণেকের জন্য সারা দিনের জন্য নয়। হাগুর্ণার অচল অটল ভাব তার মনে জাগিয়েছিল বিষ, তার সংযমে পিওটির মনে জ্বলেছিল দ্বেষ, তার সে জ্বলুনি এখন গেছে, কিন্তু মনের ভিতরটা শূন্য, ফাঁকা, সেখানে দ্বেষও আর নেই, আনন্দও নেই। সব বিজয়ের মতো তার বিজয়ও উদাস পরাজয়। সমাপ্তির পর দুঃখ।

মা জিজ্ঞেস করল, "সাঁওতার বাড়ি গিয়েছিলি ?"

'হাঁ' বলবার মতো জোর পেল না বুকে, ভয়ে ভয়ে পিওটি বলল, "না।"

"গেলি না ?"

"কেন যাব ? কেন আমায় বিরক্ত করিস ?" কান্না আসছিল, পিওটি ঘরের বাইরে চলে গেল।

অবাক হয়ে বুড়ী চেয়ে রইল।

॥ উনআশি ॥

সকালে হাগুর্ণার সঙ্গে আবার দেখা। রাত্রির ছলনার কথা ভেবে পিওটির লজ্জা করছিল। সম্পর্ক ঢেলে সেজে যে সান্নিধ্য সে আশা করছিল, কোথায় তা ? হাগুর্ণা সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিন্তু না, রক্ত মাংসের শরীর তারও। মাঠে চাষের কাজের মধ্যে কাছের বনের ছায়ায় জিরোবার সময় হাগুর্ণা হেসে শুধোলে, "কোথায় কামড়েছিল কই দেখালি না ?" কেমন ভাল আছে তো ?" তার পরিহাস পিওটির গায়ে কেটে বসল। হাসতে হাসতে কাছে এসে হাগুর্ণা বলল, "এত বিদ্যে শেখানো হয় নাকি তল দেশে ?" পিওটি ছুটে পালাল, কেবল লজ্জায় নয়, ভয়ে। হাগুর্ণা আবার কাজে মন দিল।

কাছাকাছি কাজ করতে করতে পিওটি ভাবছিল এ চাকা গড়াতে গড়াতে কোথায় গিয়ে থামবে। অনুমান করতে পারছিল হাগুর্ণা তার পিছু নেবে, হয়তো ক্ষণেকের খেলার জন্য হাগুর্ণার পায়ে বাঁধা পড়ে যেতে হবে

চিরদিনের মতো, মা খুশী হবে, গুমসানী খুশী হবে। কিন্তু তার নিজের দুরন্ত মন? হাগু´ণা সে মনে একটা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয় তো। ভাবে, হাগু´ণাকে ভয় করে তার, যোদ্ধার মতো বলবান মানুষ, বয়স বেশী নয়, কিন্তু পুরুষ মানুষ। সেই ভয়ের ছলে যেন সতর্ক থাকার জন্য সে আড় চোখে হাগু´ণার দিকে বার বার তাকায়, দূর থেকে তার দৃষ্টি হাগু´ণার দেহে মুখে ঘুরতে থাকে ফিরতে থাকে। নেড়া পাহাড়ের উপরে চাষের কাজ; কেজো মেয়ে সেই একা নয়, আর পুরুষ কেবল হাগু´ণা নয়। দুপুরের সময় এসে কান্নের কাছে বলে গেল, "কাল যে চমকে উঠেছিলি কি কামড়ে দিল বলে, তাই বুঝি গড়িমসি করছিস্, কাজ করার জুত পাচ্ছিস্ না গায়ে?"

"যাঃ—" বলে পিওটি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে হাগু´ণা আর সেখানে নেই, দূরে গিয়ে আর কোনো দলকে কাজ বাতলাচ্ছে। সারাটা রোদ মাথার উপর দিয়ে গেল, কই হাগু´ণা তো অস্থির হয় না, চঞ্চল হয় না। লেংটি-পরা লোহার মানুষের মতো কন্ধ জোয়ান, কাজ করছে তো কাজই করছে, পাথরের উপর কোদাল কুপিয়ে চলেছে—এক মনে। কি আছে তার স্বপ্নে? পিওটি? আর কোনো মেয়ে? না, তার কামের খিদে নেই, তার ভাবনার মধ্যে নেই সভ্য মানুষের মতো দুর্বল ভিজে নোংরা চিন্তা, শাড়ীর পাড়, মাথার তেলের গন্ধ, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। বিকার সেখানে হৃদয়ের ফল্গুধারা বলে সম্মান পায় না, তেমন লোককে এক নাকসিটকানিতে সোজা করে দিয়ে কুভী কন্ধ বলে "দুনিআঃ"।

হাগু´ণা লেগে পড়েছে। পাহাড়ের উপরে তার ফসল ফলাবে—শ্যামা, ধান, মাড়ুয়া, অলসি। জঙ্গলের মতো তার চাষ বেড়ে যাবে, কাঁকর থেকে জন্মাবে মানুষের খাদ্য। পরিশ্রম তার ঔষধ। পরিশ্রমের মূল্য তার ধ্যেয় বস্তু। কিন্তু পিওটি থেকে থেকে তার মাথার ভিতরটা খুলে দেখতে চাওয়ার মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দেখে সকলেই তেমনি কলের মতো কাজে লেগে আছে। কেমন অশিক্ষিত বর্বর জাতি, কাজের মধ্যে সোহাগ নেই, কবিতা নেই, শুধুই কাজ। পিছন থেকে ঠাট্টা শুনতে পায়—"দেখ তল দেশের মেয়ে কত কাজ করে ফেলেছে।" "তল দেশের লোক দেখতে মোটাসোটা, এক কড়ার জোর নেই!" "কাজ করলে হাতে পায়ে ঘাঁটা পড়ে যে গো, নয়তো কেন কুঁড়েমি ধরত?" "খেলে কিন্তু পেটের অসুখ করে না, তখন কুঁড়েমি

থাকে না।" পিওটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, লোকেরা দাঁত বার করে হাসে। তার সুগোল বাহু ও বঙ্কিম চাহনির মূল্য নেই এদের কাছে। কি বিকট হাসি! পড়ি মরি করে পিওটি কাজ করে। অভ্যাস নেই, কষ্ট হয়।

এই মজুরের জীবন বরণ করার জন্য তার মা এত দূর পথ দৌড়ে এসেছে। প্রতিদিনের মতো শুকনো সিটকে হয়ে আধসিদ্ধ বেগুনের মতো চেহারা নিয়ে পিওটি ঘরে ফিরল। মা আবার সেদিন বলল, "যাস্ না কেন কোথাও? মানুষ কি তুই সইতে পারিস্ না?"

কোথাও যাবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু রাত হয়েছে, কালকের সময় আসতে আবার এল কালকের চিন্তা। বুক ঢিপ ঢিপ করতে করতে সাঁওতার বাড়ির ছাঁচতলায় অন্ধকারে পিওটি গিয়ে দাঁড়াল।

বারান্দায় কেউ নেই, সাঁওতা নেই।

সময় কাটাবার জন্য কাছে অন্ধকারে পিওটি বসল। অনেকক্ষণ বসে রইল—কোনো শব্দ শোনা যায় কি না। কি নিথর রাত্রি, খুট শব্দটিও নেই।

বারান্দায় তার কোনো কাজ নেই, বারান্দার উপরে সে উঠবে না, ঘরে কেউ থাক আর না থাক। দু বার কাশল, কোথাও কোনো সাড়া নেই। পিওটি ঘরমুখো হল। কিছুদূর গিয়েছে, পিছন থেকে হার্গুণা সাঁওতা আর সোভেনা কন্কের গলা শুনতে পেল। ফিরে তাকাল। অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে দুটো চুরুটের আগা, একটু তফাতে তফাতে পাশাপাশি আসছে। বড় গলা করে কথা বলছে, দুজনে, কি নিয়ে তর্ক বুঝি বা।

কালকের সময় আজ বদলে গেছে, "উঃ উঃ" করে চেঁচালে কেউ শুনবে না। এত জেনে এত বুঝেও মনের বৃথা কৌতূহল কেবল আঘাত পাবার জন্য বার বার আগু হয়ে যায় বুঝি। না, তার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে না। হার্গুণা বলছে, "'বিলেই ঝোলা'র (কোনও একটা ঝরনা নদী) ভিতরে ভিতরে সিধে পথ কেটে চলে গেলেই গরুর গাড়ি লছমিপুর পৌঁছে যাবে, তুই অন্য পথে যাবার কথা কেন বলছিস্?" সোভেনা বলছে, "'খালকণা' ছেলে 'বিলেই ঝোলার' বাঁকা পথে কেন ঘুরবি? তবে কি চম্পি গাঁ যাবি?" "আচ্ছা, তুই আয়, বলছি শোন্।" এবার সেই বারান্দা থেকে কথা শোনা যাচ্ছে।

কালকের স্বরের অনুকরণে মনে মনে "উঃ উঃ" করতে করতে

পিওটি ঘরে ফিরল। সেই তার মনের সঙ্গীত। আজকের রাতে তার জবাব নেই।

দিনের পর দিন লেগে থাকে কন্ধভাইদের কাজ। ধীরে ধীরে বৃষ্টির দিন আসছে, তার আগেই ক্ষেত চষা শেষ হবে। দিনের পর দিন কাজে যেতে থাকে হাগুর্ণা সাঁওতা। কতবার তার সঙ্গে একত্রে পিওটি কাজ করে, হাগুর্ণা যেন জানেও না সে পুরুষ কি স্ত্রীলোক। কাজের ঘানিতে সকলে কেবল দু খানি করে হাত, তার বেশী নয় কেউ। কেবলই এটা কর ওটা কর, এটা হল না ওটা হল না। বাইরের নয়া শিক্ষায় শিক্ষিত পিওটির নারীত্ব কেজো পুরুষের সরল নির্ভরতাকে মনে করে শুধু অবহেলা, দাঁতে ঠোঁট চেপে নিজেকে খিল দিয়ে বন্ধ করে রেখে পিওটি কাজ করে যায়। বিতৃষ্ণার ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে রুগ্ন কৌতূহল—কেমন মানুষ এরা—এরা কি—।

রোদ মাথার উপর, বেলা দুপুর।

যে যেমন পারে জিরিয়ে নিচ্ছে। মাঠে কতক আছে, যারা জিরোচ্ছে আবার তারা মাঠে যাবে। নেড়া পাহাড়ের উপরকার ক্ষেতের ধারের ছায়া-ভরা বনের ভিতরে পিওটি ঢুকল। অজায়গায় কাঁটা গাছে বুনো কুল হয়েছে। কানে আসছে নীচে বয়ে চলা ঝরনার ঝুরু-ঝুরু। ঝির ঝির করে একটু বাতাস বয়ে এল। গাছে হেলান দিয়ে পিওটি বসে আছে, ঢালুর দিকে চোখ। সোজা সোজা শাল গাছের বন, সবুজ চাঁদোয়ার নীচেকার থাম যেন সব—খানিক খানিক অন্তর। ঢালুর দিকে ঝরনা, সেই নীচের দিকে ঝোপ ঝাড় ক্রমে বেড়ে বেড়ে গেছে, গাছের গায়ের গাঁঠে লুকিয়ে লুকিয়ে সবুজ শেওলা উঠেছে, আগাছা জড়িয়ে আছে। গাছের উপর হাতীর কানের মতন বড় বড় ছাতা গজিয়ে আছে; তারও সবুজ গুঁড়ো ঝরছে।

একটি হরিণ এল, পিছু পিছু হরিণী। দুটিতে নেমে গেল ঢালু বেয়ে নীচে। পিওটি অপেক্ষা করছে। ছন্দে ছন্দে কেবল ঝরনার শব্দ। অবিরাম। সময়ের বুকের ধুকধুকির মতো। দেহে মাটির আকর্ষণ। কতক্ষণ পরে, তার মনে নেই, সেই ঢালুর দিকে নেবে গেল হাগুর্ণা সাঁওতা, পিছনে পিছনে একটি যুবতী। পিওটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পথ অপথ ভুলে তাদের পিছন পিছন ছুটে গেল। নীচের দিকে বন ক্রমশঃ বেশী হয়েছে।

কি যেন তাকে ঠেলা মারছে, চলেছে সে। আচ্ছন্নের মতো তার কানে আসছে পাহাড়ের কোন খাঁজ থেকে দু জনের কথাবার্তার টুকরো টুকরো শব্দ, কখন কাছে, কখন দূরে। তার পর সব চুপচাপ। মরিয়া হয়ে পিওটি এগিয়ে চলল। সামনের ঢালু হঠাৎ শেষ হয়ে পাহাড়ের ধার খাড়া নেমে গেছে নীচের সরু ঝরণা-নদীতে, সেই অতটে পথ নেই। তার ওদিকে জঙ্গলে ভরা সারি সারি পর্বত শ্রেণী, একের পিছনে এক, উপরে আকাশ।

তাকে উসকে দিতে যেন মানুষের গলার মতো শব্দ আসে, আবার থেমে যায়। হাণ্ডর্ণার দেখা নেই, তার সঙ্গের মানুষের দেখা নেই। পিওটি পথ হারিয়ে ফেলেছে।

ছায়া পড়ে এল। দুঃখ আর ঔৎসুক্যের উপর ঘনিয়ে এল ভয়। সে একা।

দৌড়ে দৌড়ে চারিদিক ঘুরে আবার সেই জায়গাতেই সে ফিরে আসে, একটু থেমে আবার আর এক দিকে সে ঢুকে পড়ে। সবখানেই একই রকম শাল গাছ, সব জায়গাই একই রকম উঁচু নিচু, তাতে চিহ্ন নেই। একটা ছোট টিলা সামনে পড়ল, বড় বড পাথরের স্তূপের উপরে আগাছা আর জঙ্গলে গাছের স্বচ্ছন্দ বিহার। এ কোন রাজ্য? উপরের দিকে তাকাল, সেই সবুজ পাতার ঠেলা ঠেলি। কোথাও কোন ফাঁক দিয়ে আকাশ থেকে ছায়া নেমে আসছে। স্তব্ধ বাতাসে বৃষ্টির আগের গন্ধ।

পিওটি আশা ছেড়ে দিল।

খেঁকাচ্ছে কে? কে কাশছে, কষ্ট পাচ্ছে? এই বনে মৌমাছি ভন্ ভন্ করছে। জোরে দুম দুম আওয়াজ করতে করতে টাকরা ফোটাতে ফোটাতে কি একটা দৌড়ে যাচ্ছে।

পিওটি প্রাণপণে দৌডতে লাগল। কাঁটার আঁচড় লেগে রক্ত পড়ছে, তার উপরেই আবার কাঁটা লেগে চিরে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, পড়ছে, উঠছে, আবার ছুটছে, চোখের জল ঝরে পড়েছে, চেঁচিয়ে কাঁদবার সাহস নেই, গলার কাছে ভয়। পিওটি ছুটছে।

হঠাৎ বন শেষ হয়ে গেল। সামনের খোলা ক্ষেত। সেখানেও লোকেরা মাথা নিচু করে কাজ করছে, কিন্তু এটা তার কাজের জায়গা নয়। ঘুরতে ঘুরতে সে পুরানো ক্ষেতে ফিরে এল। হাণ্ডর্ণা বসে কোদাল চালাচ্ছে,

নির্বিকার। কোনো পরিবর্তন নেই। চোখ মুখ একটু বসে গেছে বুঝি, পিওটির মনে হল।

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে হাগুর্ণা বলল, "আরে! আমাদের তল দেশের মেয়ে যে, কোথায় চলে গিয়েছিলি নুনি? এ কি হয়েছে?"

কোথায় সেই মেয়েটা? ঐ যে ওখানে কোদাল চালাচ্ছে। এদেরই জন্য এত? সেই শুধু দাঁড়িয়ে আছে, কেউ তার দিকে চেয়ে দেখছে না। মেঘ করে আসছে। ঝড় উঠবে, ক্ষেপে মানুষ-জন্তু মুখ গুঁজে কাজ করে যাচ্ছে।

শুধু শুধু বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অপ্রস্তুত লাগল, পিওটিও কাজে লেগে গেল।

হাতে মুখে মাটি, ভিতরে মাটি, অমনি মুখ নিচু করে মাটিতে মিশে কেবলি কাজ করে যেতে হবে। তার বেশী কিছু বড় জীবন এখানে নেই। পিওটি ভাবল। ভাববার সময় নেই, এক সঙ্গে সব ক্ষেতে সকলে মিলে লেগে পড়েছে। গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে। চারা নেই।

॥ আশি ॥

রুগ্ন মনে ছুটে আসছিল দিউড়ু সাঁওতা। অসুস্থ মন, ঘরের জিনিষ ভালো লাগে না, পরের দিকে টান। তাড়াতাড়ি পথ ভেঙে যায় সে, দেখা না যেতেই দেখতে পায় বন্দিকার, মনে জাগে পিওটি। যেতে যেতে আসন্ন অনুভূতির কথা কল্পনা করতে থাকে, পাপ হোক কি পুণ্য হোক, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় তার ভবিষ্যৎ দেখবার দিব্য দৃষ্টি হয়। সে ভেবে চলে। একটি জীবনে অসংখ্য জীবন এমনি করে বাঁচে মানুষ, চলচ্চিত্রের মতো সে সব আসে যায়। কত অতীত কত ভবিষ্যৎ। যা তার স্থূল দিনগণনায় ঘটেনি, ঘটবে কি না কেউ জানে না। ভাবের উগ্রতায় কল্পনার চাপে টলতে টলতে কত বার সোজা পথ থেকে উলটে পড়ে গড়িয়ে পড়ে নিত্যদিনের ব্যক্তিত্বের গাড়ি। স্বস্তি তার নেই, আকাঙ্ক্ষা দেয় না তা, অথচ জড়াজড়ি ধরাধরি আকাঙ্ক্ষার জালে এত বড় দৃশ্যমান সৃষ্টি। দিনে কতবার পাগল হয় মানুষ,

তাতেও সুখ পায়, গৃহস্থালি সাজিয়ে রেখে সুখ পায়, আবার উলটে পালটে দিয়ে সুখ পায়। অস্থির মানুষ, আবার স্থাণু সে মানুষ,—জীবনের গতি, মরণের স্থিতি। কি বিচিত্র সে।

সেই ছায়াটি,—পিওটি।

কেবল নারী—একই রকম দেহ, পুয়ুর যা পিওটির তা। সেই দেহ—মায়ের যেমন স্ত্রীর তেমন।

নিত্য পরিচয় সেই দেহের সঙ্গে, তার থেকেই জন্ম হয়েছিল, স্তন থেকে হাতে ধরে দুধ খেয়েছিল, সেই স্তনই আবার ভোগ করল, সন্তান হয়ে এসে সন্তানের জন্ম দেবার জন্য সেই ভূমিতেই বীজ বপন করল।

তবু পিওটি—পিওটি পুয়ু নয়, দিউড়ু সাঁওতার অস্থির মনে পিওটি পুয়ু থেকে ভিন্ন। পুয়ু কোন অতীত জীবনের, পিওটি আজকের। দেহের অণু বদলে বদলে বাহ্য রূপের ভিতরে নূতন কলেবর হয়েছে; মনের অণু নেই, সে পরিব্যাপ্ত শক্তি, সে স্বাধীন, সে খেয়ালী। আজকের মন নিয়ে পুয়ুকে সে ভুলে গেছে, বিকিয়ে গেছে পুয়ু, হাটে বিক্রি হয়ে যাওয়া পসরার মতো (আটাংগা হাংগুড়া), বাটে বিকানো পসরার মতো (মাটাংগ বাচুলা) - আজ পুয়ু নেই।

লাউয়ের খোলের মধ্যে বাসী খাবার আর ঠোঙায় করে পুঁটুলির ভিতর একদিনের পাথেয় স্বরূপ মাড়ুয়া, কন্দ আর হাঁড়ি সব বেঁধে লাঠিতে ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে সে বেরিয়েছে। কোমরে কৌপীন। শোবার জন্য মাটিই যথেষ্ট। পথে যেতে যেতে কোথাও শুকনো কাঠি কুটি ভেঙে সিআরি লতায় বেঁধে সেই লাঠিতেই ঝুলিয়ে নেবে, কাঁধে টাঙ্গি আছে। বলিষ্ঠ দেহে রোগের চিহ্ন নেই। পথ ও প্রবাসের জন্য সে নিশ্চিন্ত।

মোরগ ডাকতে সে বেরিয়ে পড়েছিল। কোথাও যেতে হলে কন্ধের ঐ মোরগের ডাক। আঁধার কেটে যাচ্ছে, মনে ক্রমেই উৎসাহ আসছে। পথে ঝোরার কাছে দিউড়ু নিত্যকর্ম সারল। উঁচু নিচু মাটির উপরে দিনের আলো ঢেউ খেলতে শুরু করেছে। 'ধাংড়ী-আম খেন্দা'র ছোট ঘাটের উপরে যখন উঠল তখন পৃথিবী নতুন আলোর রঙে লাল হয়ে উঠেছে। সবুজ নীল সূর্য উঠল, মিণিআপায়ু দেখা যাচ্ছে—ঝাপসা ঝাপসা, ক্ষেতের চাষের ধুলো যেন কেবল আবীর।

কিন্তু দিউড়ু সাঁওতার পক্ষে এ সকাল নয়, তার অনুভূতিতে কিছু থাকা দেখার পরশ নেই।

প্রকৃতির এত আলোকময় কলরব, এত বিপ্লব, সে সব যেন একটি পাশে পড়ে আছে কেবল—দিউড়ুর মনের ভিতরে জাগছিল অপরাহ্ণ বেলার বন, নির্জন নিস্তব্ধ, চইত পরবে শিকার করতে গিয়ে নতুন জন্তুর সামনে পড়ার মতো পিওটিকে এই প্রথম দেখছে। তার পা লেগে লেগে পথ সরে সরে পিছন দিকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দৃশ্য বদলে যাচ্ছে, শালবনকে আড়াল করে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝোরার ধারে মিণিআপায়ুর লোকেদের সেই শিকারের ছাউনি—সেখানে বার বার পিওটি আসছে, পিওটি আসছে—তারি সম্পর্কে সময়ের ঘড়ি, সেই ঘড়িতে স্থানের দৃশ্য। বাহির কিছু নয়, ভিতর সব।

শুধু পিওটি।

শুধু মনের একটি অবস্থা।

মিণিআপায়ু আর বন্দিকার এই দুই গাঁয়ের মাঝে সরহদ্দ হয়ে দাঁড়িয়ে এক পর্বতশ্রেণী, তারই ঘাট ধাংড়ী গ্রাম। পাহাড়ের উপরটা চেপটা, সেই দমক-এর উপর দিয়ে দিয়ে চলা পথ পড়ে আছে এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে। ধাংড়ী গ্রামে আর এক দল কন্ধের সঙ্গে দেখা, চিলিশংকা গাঁয়ের লোক তারা, ডুম্বাগুড়া হাটে যাচ্ছে। আরে, তাই তো, আজ যে হাটের দিন। বন্দিকারে আজ হয় তো পুরুষ কেউ নেই। জেনে শুনেই কি এই দিনটি বেছে সে বন্দিকার চলেছে? মন গহনের নির্দেশ হয়তো। কিন্তু দিউড়ু সাঁওতা বুঝতে পারলে না যে আপনা আপনিই সে নিজের জন্য এই সুযোগ করে নিয়েছে। লোকেরা হাটে যাচ্ছে দেখে সে কথা মনে পড়ল। মন খুশী লাগল।

"কোথায় যাচ্ছিস্ সাঁওতা?"

"বন্দিকার যাচ্ছি। সামনে 'বালি' পূজা তাই পায়রা কিনতে যাচ্ছি।" মুখ থেকে কথাটা বেরোতে দিউড়ু ভাবল, ঠিক কথা, এবার সে পায়রা কিনে গাঁয়ে ফিরবে, সব গাঁয়ে তো পায়রা পাওয়া যায় না, খোঁজ করে এনে না রাখলে কাজের সময় পাওয়া যায় না।

চিলিশংকার লোকেরা চলে গেল। অন্য গাঁয়ের আর কত লোক এল,

গেল। দিউড়ু সাঁওতা সেই পাথুরে দমকের উপরে টহল দিতে লাগল। কেন তার গড়িমসি করতে ইচ্ছে হচ্ছে সে জানে না। লোকেরা যাচ্ছে, হাটের পসরা চলেছে, পিছু পিছু কুকুর চলেছে।

দিউড়ু সাঁওতা আমলকি পেড়ে পেড়ে খাচ্ছে। দমকের উপরে খানিক অন্তর বড় বড় গাছ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই গাঁ মিনিআপায়ু আর বন্দিকারের মধ্যে এই হল সংযোগস্থল। দুই গাঁয়ের লোক এই টাক পড়া পাহাড়ের মাথায় শেষ ক'গাছি চুলের মতো এই গাছগুলি দেখতে পায়। এইগুলি যতদিন দাঁড়িয়ে আছে ততদিন দুই গাঁয়ের সোয়াস্তি, উভয়ের এলাকার তফাত আছে, গোলমাল নেই।

এক পসরা মোয়া যাচ্ছে, মালি গাঁর মুড়ি আর গুড়ে তৈরী ছোট ছোট মোয়া। দিউড়ুর মনে হল চড়াই ওঠার পর যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। দুই পয়সায় চব্বিশ গণ্ডা মোয়া কিনে তুম্বায় ভরে নিলে, পিওটিকে দেওয়া যাবে পরে। ঢালু পথে নেমে চলল বন্দিকারের দিকে। মোয়া কেনবার জন্যই সে দেরি করছিল একথা বললে দিউড়ু তা অবিশ্বাস করত।

'গদবা-গুড়া' গেল। কন্ধ বস্তির দিকে সদর রাস্তা ছেড়ে ইচ্ছে মতো সে সোজা পথ কেটে চলল কন্ধনীদের স্নানের ঘাটের দিক দিয়ে। রোদ উঠে গেছে, স্নান করা শুরু হয়ে গেছে হয়তো। তার জানা-মনে সে ভাবে নি তা।

ঝোরায় জলের ছপর ছপর শোনা যাচ্ছে, গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নদীর বাঁকে কাপড় সিদ্ধ করার চুলোর ধোঁয়া উঠছে।

একটু উপরের দিক দিয়ে দিউড়ু সাঁওতা ঝোরা পার হল, তারপর ঘুরে গেল ওদিককার স্নানের ঘাটের পিছনের দিকে। দেখল পিওটি আসছে। হঠাৎ সামনাসামনি পড়ায় দুজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠল। পিওটির কাঁধে কাপড় চোপড়, মুখে দাঁতন। তেমনি সে দাঁড়িয়ে রইল। আগে দিউড়ু কথা বলল, "কিরে নুনি, ভাল আছিস ?" লোকেরা যাওয়া আসা করছে, পিওটি কেবল একটু হেসে গা ঘুরিয়ে দুলিয়ে ঝোরার দিকে চলে গেল। দিউড়ুও গাঁয়ের দিকে চলল। পিছন ফিরে দেখল পিওটি পথ ধরে চলেই যাচ্ছে, কই থামছে না তো। না, আবার দেখা হবে। কত কথা ভাবতে ভাবতে সে এসেছিল! কত মিষ্টি মিষ্টি কথা। তুম্বার মধ্যে তার জন্য মোয়া রয়েছে, মনের মধ্যে রয়েছে কত কথা। পিওটি চলে গেল।

স্বপ্ন ভেঙে গেল। কত বেলা হয়েছে। কোথায় এসেছে সে? দিউড়ু সাঁওতা বোকার মতন তাকাতে লাগল। কোথায় সে এসেছে, কোথায় সে যাবে? প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ হে, তোমাদের গ্রামে পায়রা আছে?"

"অনেক আছে।"

"কে বিক্রি করে?"

"বিক্রি করবে কে বনের পায়রা?"

দিউড়ু গ্রামে ঢুকল। কন্ধ গ্রামে ভিন গাঁয়ের লোক এলে সকলে আগে সন্দেহের চোখে তাকায়। সে ঠিকই ভেবেছিল, গ্রামের অধিকাংশ লোক হাটে গেছে, ফিরতে ফিরতে রাত নয় তো কাল সকাল। কেবল বুড়ো হাবড়া, ছোট ছেলে—পুরুষ বলতে এমনি কয়জন। বাকী সবাই স্ত্রীলোক, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। সেই স্ত্রীলোকদের চোখ দিউড়ুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে, তার বোনের বিয়ে দিতে না সে এই গ্রামকে উপযুক্ত মনে করেনি, আবার কোন মুখে এখানে এসেছে?

অনাহূত টিংগু কন্ধের বারান্দায় গিয়ে দিউড়ু বসে পড়ল। কার ঘর কার বারান্দা জিজ্ঞাসা করে ইতস্তত: করবার গরজ কন্ধের থাকে না। বসে পড়ল, শুকনো কাঠ কয়খানি নামিয়ে রাখল, পাথর কুড়িয়ে এনে উনুন তৈরি করে নিল। এখন সে গাঁয়ের অতিথি। ছোট ছেলেরা এসে ঘুর ঘুর করতে লাগল। ঘরনীরা কথা না বলে চুপচাপ দোর গোড়ায় চাল আনাজ মুরগীর ডিম রেখে দিয়ে গেল। দিউড়ু সাঁওতা রান্না বসাল। এই গাঁয়ে যেন তার নেমন্তন্ন, কারণ রান্নার জন্য ভোজের সামগ্রীই পাওয়া গেছে।

রান্না চলেছে। সেই মেঠো পথ দিয়ে পিওটি এল। তামাশা করে বলল, "তুমি রান্না করতেও পার?"

দিউড়ু বলল, "কি আর করা, তুমি তো এক মুঠো ভাতও দিলে না।"

"এসে চাইলে না?" বললে পিওটি।

"চাইলে পাব?"

"চাইলে না তো, এখন জিগ্যেস করে কি লাভ?"

আড় চোখে একবার তাকিয়ে দিউড়ুর বুকের ভিতর আগুন ধরিয়ে দিয়ে

পিওটি চলে যাচ্ছিল, দিউড়ু ডেকে ফেরাল, "শুনি, শুনে যা—" পিওটি আসতে বলল, "কোথায় থাকিস্ ?"

"ঐ মোড়টা ঘুরে গেলে যে ঘর সেইটে আমাদের ঘর।"

"আর কে কে আছে ?"

"মা আছে। ডাকলে কেন, কিছু দেবে নাকি ?" এই বলে পিওটি হাসল।

দিউড়ু লাউয়ের খোল তুলল। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেপিলে অনেক দাঁড়িয়ে আছে, সবাইকে মোয়া দিলে পিওটির জন্য কি থাকবে ? কত কথাই সে বলতে পারত, কিন্তু প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে ছেলেপিলেগুলো। অপর গাঁয়ের ছেলে, ধমক দেওয়া যায় না। দিউড়ু চোখ পাকিয়ে তাদের দিকে তাকাল, কিন্তু বোকা ছেলে তারা, তাদের সরল চাউনির সামনে দিউড়ুর দৃষ্টি হার মেনে গেল। দিউড়ুর হাত উসখুস করছে, কিন্তু মোয়া বার করতে পারছে না। ছেলেগুলোর দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করল এব থেকে একটি মোয়াও সে তাদের দেবে না, সব পিওটি খাবে, সব !

তারপর কাজ সারবার তাড়া। রান্না শেষ হচ্ছে না, কাঁচা কাঠ, ভিজে। হাঁড়ির জল মরছে না, কাজ বাকী। দিউড়ু ব্যস্ত হয়ে উনুনে কাঠ গুঁজতে লাগল, ধোঁয়ায় চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। ওদিক থেকে কার বা ঠাট্টা শোনা গেল—"কেমন মানুষ গো, হাতে রান্নাটি পর্যন্ত করতে শেখেনি ! বোনটিও তেমনি বোকা হবে, নয়তো আমাদের গাঁয়ে দিলে না তাকে।"

সব সহ্য করতে হবে, কেবল পিওটির জন্য।

যে যাই ভাবুক তার কি ?

লোকে কথা বলবেই. মানুষের মুখের আগল নেই।

হাঁড়িতে মাড়ুয়া ফুটছে, তরকারি মুরগীর ডিম, কন্দ, সব এক সঙ্গে। এ সব হয়ে গেলে সে গাঁয়ে ঘুরতে বেরোবে, পায়রার খোঁজে। সেই সুযোগে —পিওটি—।

রান্না বারো আনা হয়ে এসেছে, ধীরে ধীরে মেঘ ঘিরে দূর থেকে সোঁ সোঁ বাতাস। দেখতে দেখতে গাছপালা মুচড়ে বেঁকিয়ে হৈ হৈ করে ঝড় এসে পড়ল, চারিদিক আঁধার করে এল। ভীষণ ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন।

বারান্দায় ভারী জোরে হাওয়ার ঝাপটা আসতে লাগল, উনুনের আগুন এদিকে ওদিকে উড়তে উড়তে উনুন নিবে গেল। শীতে জড়সড় হয়ে দেওয়ালের কাছে ঘেঁষে গিয়ে দিউডু বসে রইল। আঁধার বাড়তে লাগল, ঘরে ঘরে কবাট পড়ল। হাটের দিন বলে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, পর গাঁয়ের অতিথি, কোন ঘরে গিয়ে বলবে জায়গা দাও? টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়তে লাগল, ঝড়-জলের ঝাপটা হু—হু সোঁ—সোঁ করে সারা বারান্দায় খেলে বেড়াতে লাগল, ঘরের চালের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দিল, চাল উড়িয়ে নেবার যোগাড়। দিউডুর মনটা দমে গিয়েছিল, খানিকক্ষণ নিজের ঘর মনে পড়তে লাগল, এমনি যদি লেগেই থাকে তাহলে কেমন করে সে ঘরে ফিরবে তাই ভাবতে লাগল। মেঘ গর্জনের উপর মেঘ গর্জন, ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস কাঁটার চাবুকের মতন গায়ে লাগতে লাগল। আশ্রয় চাই। দিউডু আধ-সিদ্ধ, রান্না তুম্বায় ঢেলে নিয়ে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল। দুরবস্থার সঙ্গে মুখোমুখী হওয়াতে ধৈর্য এল, দিউডু দেখল সুবিধেই হয়েছে। বাদলার অন্ধকারের প্রতিধ্বনির মতো তার আঁধার কালো উগ্র চিন্তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নির্দেশ দিয়ে দিলে—এই তার সুযোগ, শুভক্ষণ। তর তর করে সে চলল।

সারি সারি এক আড়ার ঘর, দুই সারি ঘরের গাঁ। ডাইনে বাঁয়ে কেবল নানা রকমের দরজা দেখা যাচ্ছে—দরমার কবাট, কাঠের কবাট, কেবল কবাট, বারান্দায় কুকুরটিও দেখতে পাওয়া যায় না। একটু আগে আগে কি ছিল, কি হল। মাল দেশে আবহাওয়া এমনিই, স্থিরতা নেই, নিশ্চয়তা নেই; স্থির কেবল বনের মায়া, পর্বতের আসন। তাড়াতাড়ি চলেছে দিউডু। পথের বাঁক ঘুরতেই ঐ যে ঐটে পিওটির ঘর। দিউডু দরজায় ধাক্কা দিলে। জবাব নেই। চেঁচিয়ে ডাকল, কে শুনছে? বার বার, বার বার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এতটুকুও কুণ্ঠা হচ্ছিল না তার, মনে মনে ভেবে ভেবেই পিওটিকে সে যেন অধিকার করে ফেলেছে, তার দখল এসেছে, তাই তার লজ্জা নেই। পিওটি দরজা খুলে দিলে, সাত জন্মের চেনা লোকের মতন দিউডু অভিমান করে বললে, "এত দরজা ধাক্কাচ্ছি, জবাব নেই?"

অন্ধকার ঘর। মাঝখানে জড় করা কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে, ধোঁয়া।

পিওটির পিছন থেকে তার বুড়ী মাও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে হিমেল হাওয়া হা হা করে হেসে ঘরে ঢুকছিল, পিওটি দরজা বন্ধ করে দিলে। সস্নেহে আস্তে আস্তে বলল, "আমি তো বসে আছি, ঝড় উঠল, ভাবলাম কোথায় গেল। তুমি তো মিণিআপায়ু গাঁয়ের সাঁওতা, তা ভাবলাম সাঁওতা সাঁওতার ঘরে না গিয়ে আমাদের এই গরিবের ঘরে কেন আসবে।" পিওটি তার মায়ের দিকে চাইল, দিউড়ু সাঁওতার পরিচয় তো সে দিয়ে দিয়েছে।

দিউড়ুর গায়ে হাত দিয়ে পিওটি বলল, "আহা, ভিজে গেছ। আমরা তো তোমাদের মতো সাঁওতা নই, গরিব মানুষ, আমাদের ঘরে অতিথি মানুষের মতো করলে আমরা কি যত্ন করে উঠতে পারি? নাও, পোঁটলা পুঁটলি নামিয়ে রাখ। এস, আগুনে গা সেঁকে নাও।"

বলে পিওটি হাসল। দিউড়ুর হাত ধরে আগুনের কাছে টেনে নিয়ে গেল। বলল, "এখানে লজ্জা করো না।"

মা মেয়ে দিউড়ু তিন জনেই বসল আগুনের কাছে। পিওটির মায়ের সঙ্গে দিউড়ুর পরিচয় নেই, বাধ বাধ লাগছিল। পিওটি বলল, "এই আমার মা। আমরা দু'জন মেয়ে মানুষ কেবল এই ঘরে।"

কথা বলবার একটা বিষয় পেল মা। বলল "হ্যাঁ বাবা, দুটি মানুষ মোটে, আর আমাদের কেউ নেই। বললাম, পিওটি, তোর বাবা তো গেছে, আর বিদেশে পড়ে থাকা কেন, চল যাই। এলাম চলে। কত আদরে আবদারে ছোট্টটি থেকে এত বড়টি করেছি, তা এত দুঃখ কষ্ট এর কপালে। তা যাই হোক পরের দেশে রাজা হওয়ার চেয়ে নিজের দেশে ভিখারী হওয়াও ভালো। না কি বল বাবা?" পিওটির মা অনর্গল বলে যেতে লাগল। সে কত কথা। দিউড়ুকে ছেলেবেলায় সে দেখেছিল, সরবু সাঁওতা কত ভালো লোক ছিল, ইত্যাদি। পিওটি বলল, "খাবার কথা তো জিগ্যেস করলি না মা, আগে না সেই কথা।...হ্যাঁ, কি খেয়েছ?"

পিওটির সহজ ব্যবহার দেখে দিউড়ুর লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু পিওটি সহজে ছাড়বে না। বাইরে বাতাসের হুঙ্কার, কবাট ঝাঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সব লজ্জা সঙ্কোচের বিরোধী সে।

অন্ধকার চারিদিক থেকে ঘিরে আসে, মানুষকে এক সঙ্গে মেলায়।

দিউড়ুর লাউয়ের খোলের আধসিদ্ধ খাবার তৈরি করে নিতে পিওটির মা গেল। এ ঘরের আগুন মন্দা পড়ে গেছে। ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, অন্ধকার বেড়ে চলেছে।

কাঠের গুঁড়ির আগুনের ক্ষীণ আলোয় পিওটি আর দিউড়ু বসে আছে।

পিওটি শুধালে, "কি মনে করে এসেছিলে?"

"পায়রা কিনতে।"

"পায়রা এখানে পাওয়া যায়?"

"সে কথা আমার চেয়ে তুই বেশী জানিস।"

পিওটি হাসল। বলল, "বাড়িতে ছেলেপিলে সব ভালো আছে তো?" দিউড়ু সে পরিহাস বুঝতে পারলে না। পিওটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "স্ত্রী ভালো আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে তাকে একলা ফেলে রেখে এমন ঝড় বাদলে তুমি পায়রা কিনতে এলে?"

দিউড়ু বয়ান করতে লাগল। তার স্ত্রীর যত দোষের কথা বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল। পিওটি হাসে আর ঠাট্টার ছলে সহানুভূতি দেখায় "আহা—আহা—"। দিউড়ুর হাড় জ্বলে যায়, আরো তেতে উঠে সে পুয়ুর উদ্দেশে গাল দিতে থাকে; হাজার বার দিব্যি দেয় যে সে পুয়ুকে ত্যাগ করবে, আর দুর্ভোগ পোহাতে মোটে সে চায় না। দিউড়ুর সেই অপ্রগলভ প্রলাপের মধ্যে দিয়েই পিওটি তাকে বাজিয়ে নিচ্ছিল। ও ঘর থেকে পিওটির মায়ের সাড়া নেই, হাঁড়িতে মাড়ুয়ার ফেনের গদ্‌ গদ্‌ শব্দ শোনা যায় কেবল। দিউড়ু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল সঙ্কোচ করার কিছু নেই। বলল, "মোয়া খাবি নুনি, মোয়া?" তুম্বা থেকে মোয়াগুলি বার করে পিওটির দিকে এগিয়ে দিল। পিওটি বলল, "তোমারই তো খিদে পেয়েছে, এস আমি খাইয়ে দিই—"

"আর আমি খাইয়ে দেব না, নুনি?"

দুজনে মিলে যখন এ ওকে মোয়া খাওয়াচ্ছে পিওটির মা ধীরে ধীরে এসে আবার ফিরে গেল। দিউড়ুর সব কথা সে কান পেতে শুনেছিল। ও ঘরে

ফিরে বুড়ী আপন মনে কাকে যেন দণ্ডবৎ প্রণাম করল, আস্তে আস্তে বলল, "ওর কপাল আর তোমার দয়া।"

দু'জনে এ ঘরে চমকে উঠল। পিওটি ডাকল—"মা—"

"হ্যাঁ, রান্না হয়ে গেছে।"

॥ একাশি ॥

আবার শেষ রাত্রে দিউড়ু সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। মোরগ ডাকছে, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঝিরঝিরে আলো, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, দূর থেকে আসছে উড়ে যাওয়া ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ। সকাল হওয়া পর্যন্ত সে থাকবে না, কাজ কি আছে বন্দিকারের লোকেদের সঙ্গে যে দেখা সাক্ষাৎ করবে।

রাস্তার মুখে দু পা এগিয়ে এসে তার কানের কাছে ফিস ফিস করে পিওটি বলল, "পায়রা কিনলি না তো সাঁওতা—" দিউড়ু ফিরে তাকাল। হাসতে হাসতে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে পিওটি বলল, "এবার যখন আসবি পয়সা আনবি একটা ছাগল কেনবার জন্য!"

"আসল দুধেল গাই কিনতে আসব, নুনি! আচ্ছা, চললাম—"

অন্ধকার পুরো কাটে নি। পথে ঝোপ জঙ্গল পাহাড় 'ডঙ্গর'। পিওটির মনে পড়ল মা বলছিল এই ভোর রাতেই নাকি জন্তু জানোয়ার ফিরতে থাকে বাসায়, পথে লোক পড়ে তাদের সামনে। মনটা দমে গেল। দোলন লাগা জলের মতন তার তরল মনটাও এই আশ্চর্য মানুষের কাছে অজানতে বাঁধা পড়ে গেছে। তল দেশের লোকেদের মতো এর কুণ্ডল না থাক, সে দেশের জোয়ানদের মতো নাই থাক কোট কামিজ, পরিষ্কার পাজামা, তবু এও অসামান্য। পোষাক খুলে ফেলে দিলে থাকে যে শরীর, শক্তিতে বপুতে গড়নের ডৌলে নিটোল স্বাস্থ্যে যা মানুষ হিসাবে বড়ত্বের নিদর্শন, তাতে এ বড়। কেবল দেহখানি। সরল মনটি তার আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখা যায়, পুরুষের এমনি মনই ঘরনীর কামনার বস্তু। দিউড়ু সাঁওতা, উচ্চ বংশে জন্ম তার, পিওটির লোভ লাগল। এমন ভোর রাতে যাবে এ।

"চলে যাচ্ছিস, মার সঙ্গে দেখা করলি না? মা কম্বল ঢাকা দিয়ে সেই রান্না ঘরে উনুনের কাছে শুয়ে আছে।"

"মা উঠলে বলে দিস্ নুনি, আমি যাচ্ছি।"

"তোর ভয় ডর নেই? জঙ্গলে পথ, এমন অন্ধকারে একলা যাবি?"

"বাঘ বেরুনোর মতোই হাওয়া বাতাসের রকমটা সত্যি, নুনি। বাদলা করলেই বাঘে খায়। ঐ ধাংড়ী আম খেন্দার ঘাট, সেইখানে একটু ভয়। আমার কে কি করবে, নুনি? কাঁধে টাঙ্গি আছে। নিত্যি দিনের যাওয়া-আসার পথ, আমাদের কি ভয়? তুই আমার জন্য ভাবিস না নুনি, আমায় যেতে দে। হাট-বারে হাট-বারে আসব, অ্যাঁ? ঐখানে দেখা সাক্ষাৎ করব। আর অল্প দিন তো। আচ্ছা, আমি যাই।"

শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল। পিওটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। দূরের বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। দুটি ফিঙে পাখী কোথায় যেন ডাকছে। আকাশে ধোঁয়ার মতো মেঘ চলেছে। ভারী শীত।

অবসাদের উপর চোখও ঘুমে কর কর করছিল। তবু চলে যাওয়া এই আশ্চর্য মানুষের মোহ—। কি নির্ভীক সে, কত বলিষ্ঠ, তবু বালকের মতো সরল সুবোধ, নিজের শক্তি আর সাহসের বড়াই করতে শেখেনি তল দেশের লোকেদের মতো।

পিওটি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল—সুখস্বপ্ন ঢাকা দিয়ে।

বড জীবনের উল্লাসের আহ্বান বেজে উঠেছিল কানে, দিউড়ু চলেছে। সেখানে ক্ষতির হিসাব নেই, নেই দুঃখের ক্ষতের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার কবিতা, সেখানে চিরস্থায়ী কিছুই নয়, খেলনা গড়া হয় কেবল ভাঙবার জন্য। আর, যদি থাকে কোনো শক্তি, কোনো আত্মা, যার একটি নিদ্রায় কল্পান্ত কেটে যায়, যার স্বভাবে জল হয় বুদ্বুদ অথবা বাষ্প, যে পিছনে থেকে নিজের বিচিত্র সৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখে, সে তার ক্ষণভঙ্গুর পুতুলের সংসারকে দেয় অমর হবার আশা, যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক তবু ঘুরে ফিরে নতুন বেশে মাটির ভিতরে শিকড় চালিয়ে ধরে রাখবার প্রবৃত্তি। তাই সে পুরাতনকে ছেড়ে নতুনকে ধরে, দুঃখকে ভুলে আনন্দকে ধরে, চিরন্তন মরণের সঙ্গে আমরণ যুঝে যুঝে এক দিন শেষ হয় সেই পুতুল, তার মন অজেয়।

আজকের সকালের সৌন্দর্য নেই। চারিদিক মেঘে ঢাকা। দূরের পাহাড় দেখা যায় না, কাছের পাহাড় উদাস, নিষ্প্রভ। ঢালু ঢালু নেড়া নেড়া ক্ষেতের উপরে বর্ষার ধোঁয়া ছুটছে। চারিদিক ভিজে, সেঁত-সেঁতে, হিমেল।

কিন্তু দিউডু সাঁওতার মন খারাপ ছিল না। তার অশান্ত মনে শান্তি এসেছে। আজ জোরের সঙ্গেই সে হাতের মুঠোয় কষে ধরতে পারে তার নতুন ঘর নতুন সংসার, আজ সে পিওটিকে পেয়েছে। আজ তার মনে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, এমন কি পুয়ুর বিরুদ্ধেও নয়। পুয়ুও আজ তাকে বিরক্ত করছে না, পুয়ুকে সে তুচ্ছ বলে কেবল অবজ্ঞার যোগ্য মনে করছে, রাগ নেই।

গ্রাম কাছে এল। অভ্যাস অনুযায়ী ভাবনা এল। আবার চেনা ভিটে মাটির চেনা চিন্তা। পুয়ুর প্রতি রাগ না থাকলেও যে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে চলে যেতে বসেছে তার মধ্যে এত দিনের বন্ধন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে পুরানো হোক পোকাধরা হোক, পুয়ু এখনও রয়েছে, যায় নি। অস্বস্তি লাগছিল, কাউকে কিছু না বলেই সে চলে গিয়েছিল। ওরা জিজ্ঞাসা করবে, ওদের উত্তর দিতে হবে। মনে হচ্ছিল যেন সে চুরি করে ঘরে ফিরছে। পিওটির মোহ এই গুণেতেই তফাত।

গাঁয়ে পৌঁছাতেই পাণ্ডু ডিসারীর সঙ্গে দেখা। "বাআলি পূজা এসে পড়ল, সাঁওতা, কোথাও কিছু যোগাড যন্ত্র হল না যে—। কোথায় গিয়েছিলি, অনেক দূর থেকে ফিরছিস্—?"

"বাআলি পূজা? কবে যোগ পড়ছে?"

"আর সময় কই?"

"এমন হঠাৎ?"

ডিসারী হাসল। আকাশের দিকে হাত তুলে বলল, "সবই ওঁদের বিধান সাঁওতা, সবই তাঁদের ইচ্ছে। তাঁরা তো আর আমাদের জিজ্ঞাসা-বাদ করে যোগ দেবেন না যে আমরা জানব। কাল সন্ধ্যায় বসে তারাদের দেখছিলাম, ভাবছিলাম কবে বাআলি পূজা পড়বে। দেখতে পেলাম তাঁরা সব একত্র হলেন, বাআলি পূজার সব নক্ষত্রই সমান ভাগে তাঁদের তেজ মিশিয়ে দিলেন। ভাবলাম একবার বলে দিই, সময় তো নেই।"

"তাহলে তো ভালো কথাই ডিসারী, জমিতে 'কাসিরি' (হাল দেওয়া) হয়ে গেছে, আমরা সারা গাঁয়ের লোক ভাবছিলাম শিগগির বাআলি পূজা হয়ে গেলে বীজ বুনব। কবে পূজা হবে?"

"কবে হবে? কেন এ বছর তো নতুন কিছু নয়, যেমন বুধবার দিন পূজা লাগে এ বছরও তেমনি লাগবে। 'সমৃজা' নক্ষত্রের যোগে বুধবারে বাআলি পূজা আরম্ভ, বৃহস্পতিবারে শেষ প্রতি বছরের মতো। দেবতার চার ধরম্ থাক্, কিছু বেগড়ালেই না সুদিন গিয়ে দুর্দিন আসে—"

দিউড়ুর মনে অন্য চিন্তা। এখন ঘরে গিয়ে পৌঁছাবে, পুয়ু হয় তো রাঁধছে। পুয়ুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করে সে বাড়ি ফিরছে, আর তাকেই আবার গিয়ে বলতে হবে—ভাত দে, জল দে। ডিসারী সাঁওতার গম্ভীর মুখই কেবল দেখল, আপনার মনেই তার এক নতুন সিদ্ধান্ত করে নিয়ে দুঃখিত হল। বলল, "বুঝতে পারছি সাঁওতা তুই কি ভাবছিস। পৃথিবীর বড় লোক কেউ ঘুমিয়ে পড়লে (মরে গেলে), কি যুদ্ধ লাগলে দেশ নষ্ট হলে আকাশের নক্ষত্রদের যোগও অসময়ে অদিনে পড়ে, পূজা-পরবও পড়ে অদিনে, অকালে, তা সত্যি। তোর বাপ সরবু সাঁওতা বড় লোক ছিল, সরবু সাঁওতা মরেছে, তুই ভাবছিস্ বাআলি পূজার যোগ অদিনে পড়ল না কেমন করে, কম লোক ছিল তোর বাপ? কিন্তু সে কেবল তো মরেনি, আবার হাকিনা হয়ে জন্মেছে তোর ঘরে। সে বুড়ো মানুষ ছিল, কচি ছেলে হয়েছে, তাতে আর কি? সব যেমন ছিল তেমনিই আছে, যোগ বদলাবার কোনো কারণ নেই।"

দিউড়ু ডিসারীর কাছ থেকে বিদায় হল। হাকিনা,—ঠিক কথা, হাকিনাও তো আছে, তার বংশধর। হাকিনা তার অনিষ্ট করে নি। ছেলে বাপের; পুয়ু যাবে, হাকিনা থাকবে, সেও এক সমস্যা। হাকিনাকে ছেড়ে পুয়ু থাকবে কেমন করে? দুর্বল পুয়ু, নিরাশ্রয় পুয়ু, সংসারে তার নিজের বলতে কেউ নেই। দিউড়ুর মনের নিষ্পত্তি আজ স্থির, স্থির বলেই পুয়ুর প্রতি সহানুভূতিও হয়। মনের ভিতর থেকে তাকে ঠেলে তুলে সে পর করে দিয়েছে, তাই বাইরের লোকের মতো সম্পর্কহীন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দিউড়ু তাকে দেখে আর ভাবে।

সে আর তাকে গাল দেবে না, কষ্ট দেবে না, থাক্ যতদিন আছে সুখেই

কিন্তু তাকে যেতে হবে, ভালোয় ভালোয় না গেলে বাধ্য হয়ে যেতে হবে, সম্পর্ক যখন অচল হয়েছে, সব জেনে শুনে জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে কি ফল ?

ঐ বসে আছে পুয়ু, যে একদিন তার ধাংড়ী ছিল, আজ নেই। তাড়াতাড়ি পা ধোবার জল এনে দিল। মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করল, "কিছু খেয়েছ ? এস খেয়ে নাও।" মুখের চেহারায় স্নেহ ভালোবাসার ভাব নেই। মার খাবার অপেক্ষায় সে আছে যেন এমনি তার চোখের চাউনি। এত ভয় ? কেন ? দিউড়ু কোমল হবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কত ঘৃণা করে সেই চাউনি দিউড়ুকে। বাইরে ভয়, অন্তরে ঘৃণা, অথচ চোখে তার চিহ্ন নেই, লুকিয়ে রেখেছে। দিউড়ু ভাবছিল।

বলল, "কত দূর থেকে এলাম হাঁটতে হাঁটতে, অমন বোবার মতন দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ? মুখটা কেন অমন করে আছিস্ ? আমি কি তোকে মারব ?"

তেমনি শান্তভাবে পুয়ু বলল, "এস, খেয়ে নাও। সব হয়ে গেছে।"

কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞেস করছে না কেন পুয়ু ? একটি কথাও কেন জিজ্ঞেস করছে না ? যেন তার জানতে কিছুই বাকি নেই। সেই পুয়ুই খাবার বেড়ে দিলে। চিন্তিত মনে দিউড়ু খেতে বসল।

অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, ভাবল এইবার বলে দেয়, বলে দেয়—"আর কেন পুয়ু। আমার মন তোতে নেই, আর কেন এই মিছিমিছি ঘরকরনা ? আমার ঘরে কেন তুই পরের মেয়ে ঝঞ্ঝাট পুহিয়ে মরবি ? তুই তোর পথ দেখ্—"

ক্লান্ত শরীরে চারটি গরম গরম মাড়ুয়ার ভাত ভালো লাগে। পেট ভরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনটা নরম হয়ে আসে। অন্য দিকটার টুকরো টুকরো কথাও দিউড়ুর মনে পড়ছিল। এই দুর্বল মানুষটা, একটা লোকের গোটা সংসারের ভার কোনোমতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছিল এতদিন। কাজ করেছে, না করুক আর কিছু। একটি ছেলেও দিয়েছে। তার উপকারে লেগেছে বই কি।

না, তবু তাকে চলে যেতে হবে।

আকাশের মাঝে মেঘের ধোঁয়ার ঢেউ খেলছে। দূর দিগন্ত থেকে লাফিয়ে উঠে আসছে ঘন কালো মেঘ। ঠাণ্ডা বাতাস সন্ সন্ করে বইছে।

কি নির্জন। প্রকৃতির এই হতাদরের মধ্যে মানুষ উষ্ণতা খোঁজে। আঁধার ঘর। দরজা বন্ধ। জলন্ত কাঠের গুঁড়ির আগুনের কাছে মুখোমুখী বসে মাত্র দু'জন। এই তার প্রতিবাদ। স্বাস্থ্যবান্ সবল পুরুষ স্বাস্থ্য খোঁজে, সৌন্দর্য খোঁজে। হাড় আর চামড়ার কঙ্কালের প্রয়োজন নেই তার। পিওটি আসবে।

চুপচাপ খেয়ে যায়। পুরুষের দম্ভ উসকে উসকে উঠে গলা পর্যন্ত আসে—দুটি কথা: পিওটি আসবে, তুই যা। এই দুটি কথায় এক বারে সব নিষ্পত্তি শেষ। বলতে পারে না।

স্বাদ হয়েছে পুয়ুর রান্নায়।

সে কিছু না বললেও তার অজানতে তাকে ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল পুয়ু। এই মানুষটির প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী সে চেনে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রচার করতে যায় না, কিন্তু ছায়ার মতন সে সব বুঝতে পারে, সব সে চেনে।

নীরব মানুষটিকে চোখে চেয়ে চেয়েই সে বুঝছিল। এক এক দিনের ঘটনা মনে পড়ে এক এক রকম চাউনি থেকে ভঙ্গী থেকে অনুভূতির মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে তেমনি এক একটি রূপ। অনুভূতির শব্দহীন বোধ দিয়ে পুয়ু বসে বসে করুণ রসের অভিনয় দেখছে তার স্বামীর সম্পর্কে। বাইরে বৃষ্টি, পৃথিবীর কাঁদনভরা রূপ, তারই অনুরূপ এই নতুন অনুভূতি। দুয়ে সমান।

কত দূর—কত দূর—

স্বামী ভেসে চলে গেছে। সংসার ভেসে চলে গেছে। হু হু ঝড়ের মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে ঘূর্ণিপাক খেয়ে চলেছে যত পরিচিত আশ্রয়, যা কিছু আপনার—সব। কথাও বলে না, একটু নরমও হয় না স্বামীর পাষাণ মন।

মুখে কাপড় দিয়ে পুয়ু কাঁদল। দিউড়ু সাঁওতা ধাতস্থ হল, এইবার দেখা দিয়েছে পুয়ুর চেনা রূপ। রাগে জলে উঠে খাওয়া হয়ে যাওয়া খালি পাতের উপরে হাতটাকে আছড়ে বলল, "এই—বেরুল—বেরুল—আমি ঘরে পা দিলেই এর কান্না—" ভেবে রাখা নরম কথাগুলো সব সে ভুলে গেল। পুয়ু, আবার সেই পুয়ু তারই চোখে—যাকে ছাড়তে তার ইচ্ছে, যার উপর তার কোনো দয়া মায়া নেই।

॥ বিরাশি ॥

পাঁচ দিন ঝড় বৃষ্টি হয়ে হঠাৎ সব থেমেছে। দু'দিন গেল, তিন দিন গেল, আর বৃষ্টির দেখা নেই। ধোঁয়াটে কুয়াশা রোদে জ্বলছে। দুপুর বেলায় বনের ভিতর থেকে ওঠে গরম ভাপ। মাটি ভিজে নরম হয়েছে, লাঙ্গল দিয়ে বীজ বোনা হবে।

ঠিক এই সময়েই ডিসারীর যোগ পড়েছে। বুধবার। বাআলি পূজার দিন। সকালে উঠে পাণ্ডু ডিসারীর মনে একটা নতুন ভাব এল। সব পূজারই কর্তা সে, আজ তার বীজ বপনের পূজা। তার বুড়ী কতক্ষণ হল উঠে উনুনে আগুন ধবিয়ে নদীর দিকে গেছে। সংসারে ডিসারীর সমগ্র সম্পত্তি তার বুড়ী আর তার জমি। বাআলি পূজা করে জমিতে বীজ বুনে দিলে কত ফসল ফলবে। আর তার বুড়ী—সেও ফল দিয়েছিল, সবাই চলে গেছে, আজ শুধু বুড়ো-বুড়ী। ঠাকুরের ডুমার কেনা চাকর সে, আকাশেব তারাদের সঙ্গে তার কথাবার্তা। কিন্তু সে জ্বর, বুক ব্যথার জ্বর, বসন্ত, কাউকেই ঠেকাতে পারে নি, মরণকে আটকাতে পারেনি, তবু ডিসারী সে, গ্রামেব সর্বজ্ঞ সিদ্ধান্তী।

দেবতাদের বিশ্বাসের বোঝা অকারণ পিঠে বয়ে, সকলের সব কথায় কেবল একটু হেসে, তাকে পূজার ধারা বজায় রেখে যেতে হবে। আজ বাআলি পূজা, কাল টাকু পূজা, পরশু দশরা পূজা। এসবের জন্য সে কিছু পয়সা পায় না, পুরোহিতদের মতো দক্ষিনা মেলে না তার, গোষ্ঠীগত ঘর-করনার মধ্যে একটা দায়িত্ব সে নিজের মাথায় নিয়েছে। সকলের মঙ্গলের জন্য, সমাজেব জন্য এটুকু করতে সে বাধ্য।

আজকের সকাল অন্যান্য সকালের চেয়ে তেমন ভিন্ন নয়। ডিসারীর চোখে আজকের দিনের বিশেষত্ব আছে। ঝাঁক বেঁধে ময়না পাখী গাঁয়ের গাছের উপর থেকে নানা সুরে গান গাইছে। আজ ময়ূরের ডাক পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। রোদে আজ কেমন রঙ। কেমন শোভা দিগন্তের। প্রকৃতি প্রতীক্ষায় রয়েছে আজ মানুষ বীজ বুনবে।

কিন্তু আজ ডিসারীর মন কেবল বলছে আজকের মতো এমনি সকালে

ঘরের সবাই মিলে আনন্দ করবার জন্য ছেলেপুলে কয়েকটি তার থাকা দরকার ছিল। সকাল থেকেই চারিদিকে ধুমধাম লেগে গেছে, ছোট ছোট ছেলেরা মুড়ি চিড়ে খাচ্ছে, ঢোল বাজাচ্ছে। সব মনে পড়ে যাচ্ছে আজ।

ডিসারী উঠে পূজার আয়োজন করতে গেল। গ্রামের লোকেরা সবাই জানে, তবু দলের লোকেদের স্বভাব এমন যে জেনেশুনেও তারা গড়িমসি করতে থাকে, কেউ এসে তাদের ডাকাডাকি করবে, চেঁচিয়ে দেবে—সেই অপেক্ষায়। সর্দারকে বলতে যেতে হবে—গাঁয়ের সাঁওতাকে। সাঁওতা,—পাণ্ডু ডিসারী একটু হেসে মুখ বাঁকালে—এই মানুষের উপরে পুরানো মানুষ সরবু সাঁওতা এত আশা ভরসা রেখেছিল। না, বুড়োরাই করবে আয়োজন, সরবুর ভাই লেঞ্জু কন্ধ, লেতা, আর্জু, বাগি, জাম্বা; আর ছোঁড়ারা—তারা ফুর্তি আমোদের অংশীদার। ছোঁড়াদের ছুঁড়ী আছে, বুড়োদের কেবল ধুঙ্গিআ আর কর্তব্য।

বাআলি পূজা বলে সকাল থেকেই ঘরদোর লেপাপোছা শুরু হয়ে গেছে। লাল মাটি সাদা মাটি হলদে মাটি কালো মাটির ছড়াছড়ি লেপালেপি। ঐখানে কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগে গেছে স্ত্রীলোকেরা, কাজের দায়িত্বের বারো আনা ভাগী স্ত্রীলোকেরাই, তাদেরই কেবল আগ্রহ :

"কখন যোগ লাগবে ডিসারী--"

"বলে যা ডিসারী, বলে যা ডিসারী—"

ছোট ছোট ছেলেরা ডিসারীর পায়ে লটকে যায়, শুধোয় আজ ভোজ হবে কিনা। জবাব পাওয়া মাত্র লাফাতে লাফাতে চলে যায়। সকাল থেকেই নাওয়াধোয়া সেরে কলর-বলর করতে করতে যুবতীরা আসছে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—"সারা রাত ধরে পুজো, বেশী দেরি হলে অত ঠাণ্ডায় আমরা আর নাচতে পারব না বলে দিচ্ছি। রাতে ভয় লাগে, ঠাণ্ডা লাগে। সন্ধ্যে থাকতে থাকতে তোমার মন্তর সায় কোরো।"

যেদিকে যায় কেবল 'ডিসারী—ডিসারী', সব তাতে সকলের অবলম্বন সে। তেমনি তার ব্যবস্থা হবে যাতে দেবতার কাছে খুঁত না থাকে, মানুষের কাজে বাধা না পড়ে। কাজ করতে করতেই সে বাঁধা পড়ে গেছে, সমাজের দিকে চেয়ে সে শোক ভোলে। সকলে তার. সে সকলের।

বারিকের ঘরের গলির মোড়ে কয়েকজন বুড়ো একসঙ্গে বসে তর্ক

করছে, পূজোর আয়োজন নিয়ে কথা। লেঞ্জু কন্ধ বললে, "দেখ তো ডিসারী, আমায় দিয়েছে মদ যোগাড় করবার ভার, তা সে ভার তো নিলাম, বললাম দিউড়ুকে বল্ শাগ্ (মাংস) আনবার ভার সে নিক। তা এরা শুনছে না; জাম্বা লেতা এরা আমাকেই ধরেছে।"

"আমরা তাকে জানি না, ছেলেছোকরা মানুষ, তার উপরে ভরসা কি? তোকে না ধরব তো—, যাক, গাঁয়ের ভোজ মাটি হোক। সাঁওতা ছিল, সরবু সাঁওতা, তুই হলি তার ভাই।"

"শাগ্-এর জন্য এত তর্কাতর্কি কেন?" ডিসারী বললে, "গাঁয়ে কি কি কারো বলদ কিংবা পাঁঠা নেই? চাঁদা তুলেছ, হক পয়সা দেবে কিনে আনবে, এতে আর কথা কি?"

"না, গোলমাল তো তা নিয়ে নয়। বীমা কন্ধের একটা অকেজো বলদ আছে, চাইলে দিচ্ছে না। বলছে ডুড়ুমাগুড়ার হাটে নিয়ে বেচবে। এই জন্যেই তো এত তর্কাতর্কি।"

ডিসারী হেসে বললে, "একেই বলে বারিক-এর বুদ্ধি। তোরা হাত থেকে পয়সা খসাবি না, অন্যকে বলবি মাল ছাড়। বাইরের ধারার সামিল কর না, গাঁয়েরই তো লোক, কি আর হয়েছে তোদের হিসেবের চেয়ে যদি এক আধ টাকা বেশী নেয় তো নিক। দেখা যাবে। তবু যদি না দেয় তাহলে পঞ্চায়েত বসানো যাবে।"

"কেন? আমাদের কি আসে যায়? সাঁওতাকে বলে দাও। যেখান থেকে হোক সে আনুক। বীমা তাকে 'না' করুক, সাঁওতার তাকে গাঁ থেকে তাড়াক—" লেঞ্জু কন্ধ বললে।

ডিসারী বিরক্ত হল—"না না, এ সব ছেলেমানুষী কথা। তুই যা বারিক্, আমি যেমন বললাম তেমনি কর্। বীমা দেবে। আজ পরব করব, না ঝগড়া করব? তার পর—এ তো গেল পেটের চিন্তা। পূজার বেদী কই? ছায়া-মণ্ডপ কে তৈরী করবে? পূজার ব্যবস্থা কে করবে? না সে সবও সাঁওতার উপরে ছেড়ে দেবে? খালি ভোজই খা তোরা।"

সবাই উঠে পড়ল, এই চাবুকটুকুর জন্যই সবাই অপেক্ষা করছিল। সব চেয়ে বড় কাজ এখন গাঁয়ের মাঝখানে।

ঘর ঘর থেকে লোকেদের টেনে নিয়ে সবাই মিলে কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে

জঙ্গলের দিকে চলল। ডিসারী গেল বেজুণী বুড়ীর কাছে। বেজুণী জানে, তবু আগের থেকে তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

রোদ মাথার উপরে, ততক্ষণে গাঁয়ের খোলা জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গেছে। গর্ত খোঁড়া, খুঁটি পোঁতা, ছায়ামণ্ডপ তৈরি, ঘর বানানো। সেখানে ঢোল বাজছে, একটি ঢোল, তার তালে তালে লোকেরা কাজ করছে, এই তো উৎসবের সূচনা।

দুপুর রোদে মাঠ থেকে ফিরে মাথার জট ফড়কিয়ে হাতে বর্শা নিয়ে দিউড়ু সাঁওতা সেইখানে এসে উপস্থিত হল। দেখলে লেঞ্জু কন্ধ ছায়াতে পাথরের উপরে বসে ধুঙ্গিআ টানতে টানতে দেবতার মণ্ডপ তৈরি দেখছে, বুড়োরা কয়েকজন বসে বসে ভোজের কথা আলোচনা করছে। কাউকে উদ্দেশ না করে দিউড়ু ভারী গলায় বলে উঠল—"এখানে কেন হল? এই জায়গা কে বাছলে? এ কার বুদ্ধি—একেবারে বারিকের ঘরের কাছে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে, অ্যাঁ?"

লেঞ্জু কন্ধ যেন শুনেও শোনেনি এইভাবে ধুঙ্গিয়া পোড়াতে থাকল। জাম্বার মুখটা গোঁজ হয়ে উঠল, ঘাড়ের রগ উঁচু হয়ে উঠল। কাছে ছিল লেতা, সে জাম্বার হাতের বাজু চেপে ধরে তার মুখের সামনে হাত তুললে শান্ত করবার ভঙ্গীতে। দিউড়ু সাঁওতা ঝগড়া করবার মত উপযুক্ত পাত্র পেলে না। ক্লান্ত বিরক্তির ভাব দেখিয়ে হাঁকলে—"বারিক্—। গেল কোথা বুড়ো!"

"আছি—আছি সাঁওতা—" বুড়ো বারিক রোদে ঘামতে ঘামতে একটা ডাল তুলে ধরছিল, পাশের লোকের হাতে সেটা দিয়ে আজ্ঞাধীন ভৃত্যের মতই কাছে এসে দাঁড়াল তোষামোদের ভঙ্গীতে।

"কে এই জায়গা বাছলে বারিক্? গেল বছর আর একটু নীচে কুঁড়ে তোলা হয়েছিল বোধ হয়—"

একবার সাঁওতার দিকে একবার বুড়োদের দিকে করুণ বিচলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বারিক্ বললে, "ডিসারী এই জায়গা দেখিয়ে দিল, বেজুণী বলল এইখানেই ঠিক হবে। তুই তো আর অন্যায় কিছু বলতিস্ না সাঁওতা, এই ভেবেই আমরা এখানে কাজ আরম্ভ করেছি।"

এমনি নরম কথা দিয়ে ডোম পরের মনকে বাগিয়ে নিজের বশ করে।

নরম হল। চেঁচিয়ে বললে, "আরে তাড়াতাড়ি কর্—তাড়াতাড়ি কুঁড়েটা বেঁধে ফেল্। ঐ ওখানটায় আরও পাতা গুঁজে দে। ভিতরের গুমর বাইরে ফাঁক হয়ে গেলে আর পূজো কি হবে।—আরে, এই দিকে বেঁকা হয়ে যাচ্ছে।"

বুড়োরা তাও চঞ্চল হল না, কাজের গতি বাড়লও না কমলও না। বুড়োদের দিকে রাগের ভরে তাকিয়ে থ্যাপ্ করে থুতু ফেলে মাটিতে লাথি মেরে দিউড়ু সাঁওতা ঘরে ফিরল। সে না দেখলে খারাপ হয়ে যেত, তার এই ধারণায় আঁচড় পড়ল না।

ঘর তৈরী হয়ে গেল, ডাল পাতা দিয়ে ঘন করে ছাওয়া কুঁড়ে একখানি। তার ভিতরে বালির বেদী তৈরী হল। বেলা পড়বার সময় সকলে সেই পূজোর ঘরের কাছে জড় হল। বাজনা আর কোলাহলের মধ্যে বালিতে গজানো এক এক হাত উঁচু মাড়ুয়া আর ভুট্টার চারা একটা ডালায় করে নিয়ে নতুন গামছায় ঢেকে লোকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে তরতরিয়ে পাণ্ডু ডিসারী সেই ঘরে ঢুকল। বালির বেদীতে নতুন শস্যের এই চারা গাছগুলিকে পুঁতে দিল। ফুল, মূরুজ, হলুদ মাখানো আতপ চাল ছড়িয়ে দিল, ধুনো জ্বালিয়ে ধূপদানিতে রাখল, দোরগোড়ায় ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এইভাবে প্রসিদ্ধ বাআলি পূজার শুভানুষ্ঠান হল।

কোনো দেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর বালিযাত্রা হয়, কোথাও বালুকা পূজা। জয়পুরের * রাজার বাড়িতে কন্ধের বালিপূজা ও তল দেশের তামাশা মেশানো পালাগাইনের মতো পোশাক পরে বাঁশি বাজিয়ে প্রেমের অভিনয় করে যে কান ঝালাপালা করা গোলমাল হয় সেও বালিযাত্রা। কিন্তু কন্ধের বাআলি পূজা এ সব থেকে আলাদা, তার অর্থ ভিন্ন, তার বিধি-বিধান স্বতন্ত্র, অতি গম্ভীর অতি পবিত্র ধরিত্রীমাতার পূজা সে, সে তামাশা নয়।

পূজা আরম্ভ হল। সকলে সার বেঁধে পূজার ঘরের সামনে বসে আছে। দরজার সামনে বসে বেজুণী বুড়ী মন্ত্র বলছে। দুই হাতে দুটি মুরগীর ছানা নিয়ে তাদের চাল খাওয়াচ্ছে। তার সঙ্গে আরও দু'জন বুড়ী বসে মাথা নেড়ে নেড়ে মন্ত্রের গানের সুর ধরেছে। দরজার কাছেই বাজনা বাজছে। বাআলি পূজা হচ্ছে।

* এই জয়পুর দক্ষিণ ওড়িশার একটি বড় জমিদারি ছিল।

সে মন্ত্রের শেষ নেই, যতই গাওয়া হোক ফুরাতে চায় না। যত দেব-দেবী আছেন একটি একটি করে সকলের নাম নিয়ে নিয়ে মন্ত্র আওড়াতে হল। কন্ধদেশের যত প্রধান প্রধান স্থানের নাম সব গাইতে হল। যত রকমের শুভ হতে পারে তার ফর্দ দেবতার কাছে বয়ান করতে হল, মানুষের ঘর-করনা, শরীরের ভালো মন্দ, শস্য, ভাগ্য, সব কিছুর সম্বন্ধে। সেই পুরাতন পূজাগুলিতে যেমন বলা হয়—বনে গেলে যেন পায়ে কাঁটা না ফোটে, বাঘে না খায়, রোগ না ধরে, গরু না মরে ইত্যাদি। পর্বতের উপরে মেঘ আর শকুনের সাথে মিলে মিশে যাদের ঘর করনা তাদের বিপদের ফর্দ লম্বা হয়। শুভ মানত করতে করতে, যত বার মাস নক্ষত্র যোগ আছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বেজুণী গেয়ে চলে, যাতে প্রত্যেকটি মুহূর্ত কন্ধজাতির পক্ষে ভালো হয়। বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক সঙ্গে এত কথা গাইবার সময় কোথায়?

ধীরে ধীরে বেজুণী মেতে উঠছে, নাচের দেবতা ধীরে ধীরে বুড়ীদের উপরে ভর করছে। ধূপের ধোঁয়া মুখে চোখে লাগছে, বাজনা বাজছে, হেলেদুলে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, দেবতার ভর হচ্ছে। বসে থাকতে থাকতে তিন জন দাঁড়িয়ে ওঠে, নাচে, স্তোত্র গাইতে গাইতে লড়ায়ে ভেড়ার মতো লাফ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার লাফিয়ে এগিয়ে এসে তিন মাথা এক সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে। তিনজনেই পরস্পরের মাথা খামচাখামচি করে! বড় স্তোত্র সারা হয়ে এল। মদ আর মুরগীর ছানার রক্ত মাটিতে ঢালা হল। বেজুণীর উপর দেবতার ভর হল। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই বুড়ীও অসামাল হয়ে উঠল। ঢোল জোরে জোরে বাজতে লাগল। পূজোর ঘরের সামনে বেজুণী ধূপের ধোঁয়া গিলল, পেটে তলোয়ার মারল, কাঁটার উপর হাঁটল, কাঁটার দোলায় বসে দোল খেল, দেবতা আপনাকে প্রকট করল। বেজুণীর কাছে কাছে ঐ দুই বুড়ীও নাচছে। নাচের ঢেউ দলে গিয়ে লাগল। আরো কত বুড়ী আধবুড়ী উঠে এসে বেজুণীর সঙ্গে নাচতে লাগল। ঢেউয়ের মতো সার বেঁধে গা দুলিয়ে এগিয়ে যায়, আবার সারি ভেঙে দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছিটিয়ে যাওয়ার মতো দলের মধ্যে আলাদা আলাদা হয়ে এদিকে ওদিকে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে, যে যেদিকে যায় সকলের মাথায় মুখে খামচে দেয়, এ এক খামচাখামচির পর্ব, লোকেরা কেবল হাসে। চারিদিকে হই হল্লোড়।

ওদিকে পূজা কুটীরের সামনে কাম্বেলা জানী আর পাণ্ডু ডিসারী মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। পৃথিবী কেমন করে তৈরী হল, কন্ধরা কেমন করে জন্মাল, বংশবৃদ্ধি করল, ক্রমশঃ কেমন করে মানুষের সমাজের প্রসার হল, নানা বৃত্তি হল। এদিকে এই পাঠ হয় আর অন্যদিকে বেজুণী আর তার সাথীরা পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সেই সেই কাহিনীর অভিনয় করে। অর্ধনগ্ন কন্ধ দর্শকদের সামনে সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়।

প্রথমে বন থেকে কন্দ আর ফল এনেই মানুষের গেরস্থালি। বেজুণী দৌড়ে দৌড়ে গ্রামের কাছাকাছি বনে গিয়ে আমের আঁটি কুড়ায়, তেঁতুলের বিচি কুড়ায়, লতা পাতা ছিঁড়ে আনে। তারপর শিকারী মানুষ, কাঁধে ধনুক হাতে বর্শা নিয়ে শিকারের অভিনয় তরে। ক্রমশঃ চাষী মানুষ, হাতে খুরপি নিয়ে বাজনার তালে তালে বেজুণী মাটি খোঁড়ে, বীজ বোনে। ধীরে ধীরে মানুষের সমাজ বাড়ে। বেজুণী পাড়ায় আরো দূর পর্যন্ত যায়। চীৎকার করে—"আয়, লাঙ্গল তৈরি করে দিই, আমার পাওনা মেপে দাও।" তেমনি সে কামারের অবতার হয়: "লাঙ্গলের ফাল ভেঙে গেছে? দা চাই?" পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেজুণী কামার কুমোর তেলী তাঁতী ময়রা মজুর একটার পর একটা অভিনয় করে দেখাতে থাকে, গাঁয়ের লোকেরা তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে বুড়ীদের নাচের নেশায় পায়, নাচতে নাচতে তারা যাকে তাকে খামচায়। এই এত রকম বৃত্তিধারীরা গ্রাম গোষ্ঠীর সেবাইত, সকলের কাজ করবে, সকলে তাদের পুষবে। গ্রাম কেবল একটি দলের শিবির, মানুষের কাছে আগে তার গোষ্ঠী, পরে সে নিজে। বেজুণী গ্রামের বড় প্রজা হয়ে মাঝ রাস্তায় বসে পঞ্চায়ত করল। গাঁয়ের হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাজনার তাগাদা করল। প্রত্যেক ঘরের দরজায় দরজায় লাঠি ঠক্ ঠক্ করে প্রত্যেক বাড়ি থেকে তার পাওনা চেয়ে নিল। গ্রামের মোড়ল সাঁওন্তা হয়ে সে গ্রাম পালন করল, লোকের লাভ লোকসানের খবর নিল। পোশাক নেই, রঙ্গমঞ্চ নেই, রঙিন আলো নেই, কেবল গাঁয়ের রাস্তার মাঝখানে ঠাকুরের সামনে সব বছরের মতন সেই পুরাতন অভিনয়, সঙ্কেত ও রূপকের ছলে। এই দেখতে এত লোক। বাজনায় গ্রাম কাঁপছে। মদ খাওয়া শুরু হয়েছে, কেউ কেউ মাতাল হয়েছে। সমাজের এই অবস্থা পর্যন্ত এসে বাঝালি পূজার অভিনয়

আবৃত্তি শেষ। এখানে লাল রাস্তা এখনও ঢোকেনি, নূতন সভ্যতা ঢোকেনি, নূতন সমস্যা প্রবল হয়নি।

আরও কত অভিনয় বাকী থেকে গেল যে—কেউ মজলিসে মাতাল হচ্ছে, বিনা পরিশ্রমের ধনদৌলত তারই ঘরে যাচ্ছে, কেউ তারই ঘরের কাছেই রাতদিন পরিশ্রম করেও উপোস করছে, কত রকম জালজুয়াচুরি ধাপ্পাবাজি চুরি সে সব কন্ধ সমাজে ঢোকেনি, সেখানে একজন উপবাসী থাকে না। কন্ধ বেজুণী নূতন নাচ জানে না। তার সবই পুরাতন।

- গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এমনি সব একটির পর একটি দেখিয়ে গেলে বাআলি পূজা সারা হল। মানুষ বন থেকে এসে সভ্য হয়ে হয়েছে চাষী, জলে শুয়ে থাকা প্রাণী লাঙ্গল ধরেছে। বসুমতীর পূজা হল, এইবার বীজ বোনা হবে। কন্ধদেশের একটা বড় পরব সমাপ্ত হল।

সারা রাত ভোজ আর নাচ। বাজনা বাজছে, নিস্তব্ধ রাতে ভেসে আসে দূর গ্রাম থেকে তার উত্তর। কতক্ষণ ধরে ঢোল টমক জুড়ী বাঁশির সুরের একে অন্যের পিছু ধাওয়া করা—যে ভূমি অন্ন দেয়, কৃতজ্ঞতায় তারই বন্দনার এই উৎসব।

॥ তিরাশি ॥

বুধবার পূজা নাচ। বৃহস্পতিবার কেবল নাচ। সেই বৃহস্পতিবার দিন পুজোর ঘরের ভিতরের চারাগুলি আর পূজার ফুল জলে ভাসিয়ে দিয়ে গাঁয়ের লোকেরা চালের কাজে লেগে গেল। রোদ খুব চড়া, গায়ে লাগে, কিন্তু বর্ষাকালের রোদে কিসের ভরসা? আকাশের পারে মেঘ কুঁচি দেওয়া পাড়ের মত উড়ছে। 'আজ খুব কাজের ভিড়, মাটি শুকিয়ে যাবে, বসে থাকার সময় নেই।

যে সময় কাজের নেশা মাথায় চাপে তখন পুরুষ চায় মাঝে মাঝে লাউয়ের খোলের মাড়ুয়ার ফেন আর মাড়ুয়ার ভাত, আর মাঝে মাঝে ধুঙ্গিআ। স্ত্রী নেয় যোগান বিভাগের ভার। হাল চালিয়ে চালিয়ে গায়ে ব্যথা হয়ে গেলে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এক পেট মদ। তার পর মুড়ি মিছরির এক দর, বাছ-

বিচার নেই, নিক্তিতে ওজন করা হিসাব নিকাশ নেই, কাজের শেষে প্রাকৃতিক পশুর জীবনযাত্রা, গভীর ঘুম।

পুয়ু ভাবে তার সুদিন এসেছে, দিউডু তার সঙ্গে কলহ করবার সময় পায় না, তাকে বেখাতির করে না, বরং তার সঙ্গে কাজের পরামর্শ করে—"কাল গুণ্‌পুরী সরু ধান দিস্ তো, অশ্বত্থ গাছের নীচের ক্ষেতে বুনব। আর, কিছু ঠাকুর-ভোগ রাখিস্, এ বছর বুনব। কখন কোন প্রভু অধিকারী গাঁয়ে এসে পড়েন, সিধে দেবার জন্য ঘরে কিছু ভালো ধান নেই।"

পুয়ু মন প্রাণ দিয়ে কাজ করে। দিনে তিন বার ক্ষেতে গিয়ে খাবার দিয়ে দিয়ে আসে। দিউডু ফিরে এসে বিশ্রাম করা পর্যন্ত জগন্নাথের ছত্রিশ নিয়োগের মতো সব সাজিয়ে রাখে, ছেলে মানুষ করে, ঘর সামলায়। সন্ধ্যাবেলা নির্জনে বনের ভিতর ঝাকর দেবতার কাছে দুটি জ্বলন্ত সলতে একটি ফুল রেখে দিয়ে নমস্কার করে পুয়ু বলে, "মহাপ্রভু, নির্ভরসা দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনেছ, গরীব হাকিনার প্রার্থনা শুনেছ, তোমায় ধন্যবাদ। এমনি দয়াই যেন থাকে মহাপ্রভু। যা বলবে তাই দেব, রোজ সলতে জ্বেলে দেব।"

দিউডু সাঁওতা তার প্রাণের কথা মনের ভিতরে তোলপাড় করে না, দেখে তার চাষ, ভাবে কবে বীজ বোনার কাজ শেষ হবে, সে নিশ্চিন্ত হবে। খেতে বসে খাবারের স্বাদ সে খেয়াল করে না, পুয়ুর স্বাদও তার মনে আসে না। তার চোখে কেবল একটি দৃশ্য—বাপদাদার আমলের এই মাটি, এতে বীজ বোনার কাজ কবে সারা হবে। চাষীর চোখে কেবল আবহাওয়াই বড়, একটা দিন নষ্ট হলে ফসল পাকার সময় বহু ধান নষ্ট হয়ে যাবে, কোনো গাছ ছোট হয়ে যাবে, কোনো গাছে পোকা ধরে যাবে। দিউডু সাঁওতা নিজের হাল চালানো চাকর মজুরদের পিছন পিছন ঘোরে, বলদগুলির সঙ্গে কথা বলে। মাটি, বলদ, চাষী।

একটা কথা তার মনে খোঁচা দেয়—লেঞ্জুকাকার কি হয়েছে, না সে ভালোয় না মন্দয়, এক কড়ার সাহায্যের আশা নেই তার কাছে। কেবল যত ইচ্ছা মদ খেয়ে ধুঙ্গিআ টানতে টানতে কোথায় না কোথায় সে ঘুরে বেড়ায়। দিউডুর বুঝতে বাকি ছিল না যে লেঞ্জুকাকা ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে, বেশী তর্ক করলে সে অনর্থ বাধাবে, তাকে গাল দিলে গাঁয়ের বুড়োরা তারই পক্ষ নেবে। এখন নয়, পরে সে শোধ তুলবে লেঞ্জু কাকার উপরে।

"দেখেছিস পুয়ু লেঞ্জু কাকার ধরন ? কেন এত তুই রেঁধে বেড়ে তাকে দিস্ ? তার এত যত্ন আত্তি না করলে কি হয় না ?"

পুয়ু খুশী হয়। সে এর মর্ম এই বোঝে যে স্বামী আগের মতো ঘর-করনার কথা তার সঙ্গে আলোচনা করছে। পুয়ু কোনো প্রতিবাদ করে না, কিন্তু তবু লেঞ্জুকাকা যাই হোক, তাকে খেতে না দেবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

সুযোগ মতো সে লেঞ্জুকাকার কাছে আবদার করতে বসে—"কাকা, এত বড় ক্ষেত, ও একলা মানুষ, বীজ বোনার সব কাজ কি করে উঠতে পারবে ? তুমিও একটু দেখাশোনা করলে হত না ?"

লেঞ্জুকাকা হাসে। পুয়ুকে সে স্নেহ করে, তাকে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছে তার নেই, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় তার জখম সে কেমন করে বোঝাবে সরবু সাঁওতার ছেলের বউকে ?

"কালকে যাবে কাকা ?"

"হাঁ, হাঁ,—"

কাল আর লেঞ্জু কাকা যায় না। বারিকের ঘরের তলার ঢালু জায়গায় বসে বসে নীচের মাঠের গুড়িআগুলির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

সেখানে কাজ চলেছে। মানুষের ঘাম বলদের ঘাম মাটির ঘাম মিলে মিশে যাচ্ছে। মানুষ চষে যাচ্ছে, বীজ বুনে যাচ্ছে। কন্ধনী মেয়ে ডালায় ঝুড়িতে করে বীজ তুলে ধরে আছে, কন্ধ আঁজলা করে নিয়ে ফেলছে। হালের গরু জোতা নিয়ে কোনো বাছবিচার নেই, গাইয়ের সঙ্গে বলদ, বলদের সঙ্গে ষাঁড়, বলদের সঙ্গে বলদ, গাইয়ের সঙ্গে গাই—যে যেমন পেয়েছে জুতে দিয়েছে। হালকা করে হালের মুঠোয় চাপ দেওয়া হচ্ছে, সেই যথেষ্ট। নাবাল জায়গায় ধান, ঢিপি জায়গায় মাড়ুয়া, আরও উপরে শ্যামা ধান, পাহাড়ের ঢালুতে বড় অড়হর (কান্দুল), আর এক এক জায়গায় রেড়ি। মেঘ দেবতা জল দেবতা জল দেবে, ভেসে বেড়াবে পচা পাতার কালো সার। "ওটামাড়া লেহেঁ পোড়ু পাঁয়াপে, পাএর মাড়া লেহেঁ কাড়্লা ধাঁযাপে"। বনের গাছ লতাপাতার মতো চাষ বেড়ে বেড়ে যাবে, জঙ্গলের মতো চাষ, বনে ক্ষেতে চাষ, অগনতি—অফুরন্ত। লোকদের হাঁকডাক শোনা

যায়, লোকেদের পরিশ্রম দেখা যায়, গাঁয়ে কেউ নেই, সকলেই ক্ষেতে। লেঙ্গু কন্ধ অলস ভাবে বসে বসে ভাবে, পুয়ু না বলেছিল— !

বলেছিল,—কিন্তু ছেলেমানুষ, কি সে বুঝবে ? দিউড়ুর মাথার ঠিক নেই, এই এক রকম, এই আর এক রকম। দিউড়ু ভেবেছে বুঝি যে সরবু সাঁওতার ছোট ভাই তার আশ্রিত। পর, পরের বাড়া সে। এই সংসারে যখন তার ভাই ছিল তার সব ছিল, আজ কিছু নেই। কার জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মরবে ? একটা পেট কি তার ভরবে না ?

অভিমান করতে করতে মন উদাস হয়ে যায়, মনের সেই পুরাতন রোগ চাগাড় দেয়, তার কিছু নেই, তার কেউ নেই। বসে থাকে, ধোঁয়া খায়, চুপটি করে বারিকের বাড়ির ভিতর গিয়ে মোলায়েম সুরে ডাকে—"সোনাদেঈ আছিস্ ?"

বীজ বোনাবুনি চলল সাত আট দিন, মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হয়, শীত বাড়ে, বর্ষা বাদলের ভিজে দিন বাড়ে। দিউড়ু সাঁওতা কাজের দিকে লক্ষ্য রেখে গতানুগতিক পন্থায় কাজ করে চলে, জল কাদার স্পর্শ লেগে অলস মনের ছটফটানি ভোলে সে।

বর্ষার জল ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তার জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে। যে যার বাড়ির বারান্দায় স্তূপ পরিমাণে শিআরির পাতা গাদা করে, যে যার পাতার বর্ষাতি ('তলৃরা-তলৃরি') বুনছে, পাতার ছাতা বুনছে—স্ত্রীপুরুষ উভয়ে। কুসুম্বীর তেল তৈরি করা হচ্ছে, বর্ষার সময় এই তেল না মাখলে গায়ের চামড়ার ভিতর দিয়ে সর্দি কাশি ঢুকবে শরীরে। মেলা কাজ। হাকিনাকে কোলে নিয়ে পুয়ু বসে বসে তার স্বামীর যাবতীয় সুবিধার ব্যবস্থা করছে। নিজের ঘরের দুয়ারে পা মেলে বসে যে যার ঘরের ঘরণী।

রই রই করে বৃষ্টি এসে পড়ল, চারিদিক অন্ধকার। দিনের আলো নিবিয়ে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি। পুয়ু দোর-গোড়ায় বসে 'তলৃরা-তলৃরি' বুনছে। ঘন ঘন মেঘের গর্জন। বৃষ্টি আর বাতাস মিলে মিশে একাকার হয়ে পাহাড়ের উপরে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়েছে। পুয়ু ভাবছে দিউড়ু কোথায় আশ্রয় নিল।

বেলা দুপুর, মেঘের ফাঁকে সূর্য কেবল একখানি আমাজা থালা। ভিজে

চুপচুপে হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে দিউডু বাড়ি এল। পুয়ু বললে, "ভিজে এলে কেন? যাক এসো, আগুন করি একটু, গা সেঁকে নাও।"

ঘরে পা দিতে না দিতেই দিউডুর মহা রাগ। মাটিতে পা দাপিয়ে চোখ রাঙিয়ে গাল দিতে লাগল। মানুষ খেটে খেটে মরছে তবু সাহায্য করবার কেউ নেই। ছাতি বর্ষাতি দু'খানা এ অবধি তৈরী হল না। সে জন্য দায়ী পুয়ু। ক্ষেতের কাজ শেষ হতে এত দেরি হচ্ছে সে জন্য দায়ী লেঞ্জু কন্ধ। কে না জানে সব সময় সে ডোমের ঘরে ঢুকে বসে থাকে, সঙ্গে জুটে কাজও করবে না, ভাগ করে ভিন্নও হবে না। লেঞ্জু কন্ধ থেকে পুয়ু. পুয়ু থেকে লেঞ্জু কন্ধ গালি চলতে থাকল।

শুধোলে, "মদ আছে?"

"যা ছিল সকালে তো খেয়ে গিয়েছিলে, আর কোত্থেকে আসবে?"

না, কিছু নেই—পুবুলি ছিল বলে না সব গুছিয়ে রাখত, এখন আর কেই বা করে, কেই বা খোঁজ রাখে! আবার আজ উঠে পড়ল পুবুলির কথা, সে বিয়ে করে চলে গেল, সে জন্যও পুয়ুই দায়ী। রাগে গর্জন করে দিউডু বলল —"দাঁড়া, তোকে বার করে দেব, লেঞ্জু বুড়োকে বার করে দেব, বারিকের ঘর উপড়ে ফেলে দেব, তবে গিয়ে আমার মন শান্ত হবে।" ভিজতে ভিজতে দিউডু গাঁয়ের ভিতরে চলে গেল।

পুয়ু কাঁপছিল। এতদিন তো হাওয়া ভালোই ছিল, আজ আবার— কি কঠিন কথা সব এ বলে, বজ্রের মতো মানুষের বুকে বাজে, গুঁড়ো করে ফেলে মানুষকে। মাঝের কয় দিনের সুখ আর আনন্দ পুয়ু ভুলে গেল, সে আবার যেখানে সেইখানেই।

আঁধার বেড়ে চলেছে। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বৃষ্টির সমুদ্র, আরাম নেই গরম নেই। পাহাড়ের উপরে মেঘের বাষ্প উড়ে উড়ে আসছে, দূরের পাহাড় ডংগর যেন কুয়াশায় ভাসছে, তারও উপরে চাপানো মেঘের পর্বত-চূড়া আকাশে মাথা তুলেছে, কোনটা মেঘ আর কোনটা পাহাড় বোঝা যাচ্ছে না। না, এই হাওয়ায় কোনো ভরসা নেই, এতে ভাঙা দেওয়াল আরো ধসে, পড়ে, ভাঙা মন আরো ভেঙে পড়ে যায়।

কেন সে এখানে মাথা গুঁজে পড়ে আছে ভাবছিল পুয়ু, কেন, কিসের

আশায় ? দিউড়ু আবার সেই ভীম অবতার, কোথাও এক পেট মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সে ফিরবে, তুষবে, গালিগালাজ করবে।

দু'ঘা লাগিয়েও দেবে হয় তো।

মেঘ কেটে গেলে সুযোগ বুঝে-চলে যাবে ধাংড়ীর খোঁজে, আর কোথাও ফুর্তি করতে।

হাতের উপর গাল রেখে মেঘের দিকে তাকিয়ে পুযু বসে রইল। মনে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ ধুঁইয়ে ওঠে, বৃষ্টি দেখে দেখে মনে কোন আশ্বাস পায় না। তার ভাগ্য আবার উলটে গেছে, আবার কিছু দিন অশান্তি ঘটাতে থাকবে দিউড়ু, সোজা পথ কেটে চলে যাবার বল নেই তার কোমরে।

বাজ পড়ার আওয়াজ হল, অন্ধকার ঘরে হাকিনা কেঁদে উঠল। পুযু ভিতরে দৌড়ে গেল। মন উড়ে পালাতে চায় বার বার, আর বার বার হেঁচকা টান মেরে ধরে রাখে এই হাকিনা, কোনো উপায় নেই। ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে, দিউড়ু আর এল না। ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সেই এক জায়গায় বসে রইল পুযু। জামিরির ঘরে দরজা বন্ধ। শীত বর্ষা সয় না বুড়ো হাড়ে। সুখ দুঃখের কথা বলবার এক জনও কেউ নেই।

কেবল মেঘের দৃশ্য দেখে, স্বামী থেকেও স্বামী নেই। পাহাড়ের উপর থেকে উড়ে উড়ে চারিদিকে বিছিয়ে যাচ্ছে মেঘের বাষ্প, সগর্জনে মেঘের তীর এঁকে বেঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাপটা মারছে, বিঁধে যাচ্ছে। আঁধার দুলছে, আঁধার কমছে না। দরজার সামনে জলের স্রোত চলেছে।

কেবল আতঙ্ক, প্রলয়ের গর্জন, সব কিছু ভেঙে চুরে ধসে ভেঙে চলে যাওয়ার দৃশ্য, মেঘের ঠাকুর 'বীমা' রাজা মেতে উঠেছে, মানুষের সব আশা ভরসা ভেসে চলে যাচ্ছে সেই অভিযানের বেগে। আলো'নেই।

সেই বিপদের সামনে মাথা নুইয়ে শীতে গুটিসুটি হয়ে গায়ে গায়ে লাগিয়ে যেন বসে আছে কতকগুলি খালি কন্ধ কুঁড়ে ঘর। বনের ভিতর পাহাড়ের খাঁজে তাদের অস্তিত্বের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। গাদা গাদা পাহাড়, রাশি রাশি জঙ্গল, প্রকৃতির এই দেশে মানুষের বস্তিগুলি পিঁপড়ের গর্তের মতন। এখানে মানুষের অভিমান নেই, সে শুধু ভাগ্যবাদী। পুযু সেই দৃশ্যেই আত্মহারা হয়ে ছিল। চেতন মনে চিন্তার লেশমাত্র নেই, অ-চেতন মনের গহনে বাজছে মেঘের গর্জন। সেখানে চিত্র জাগছে, অনুভূতির বৈচিত্র্য

আছে, কিন্তু সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে আছে করুণ রসের ঘন মেঘ, কেবল প্রতিচ্ছবি সে।

বাইরে একটি কুকুরছানাও নেই। বেলা গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা বেড়ে চলেছে। ভিজে নেয়ে একজন এল, দৌড়াতে দৌড়াতে, জটা ঝাড়তে ঝাড়তে। সে দিউড়ু নয়, লেঞ্জু কাকা। তাকে দেখে পুয়ু চমকে উঠল। তার মুখের ভঙ্গীতে, চোখের চাউনিতে এ কি ঝড়! এসেই লেঞ্জু কন্ধ গর্জন করে বলল, "পুয়ু, আমার ছেলে হয়ে দিউড়ু আমাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে। আমি চললাম।"

কি বলছে লেঞ্জু কাকা! পুয়ুর বুকের ভিতরটাতে কেমন করে উঠল। কেন লেঞ্জুকাকা এমন কাঁপছে, পাগলের মতো চোখ পাকাচ্ছে? "লেঞ্জুকাকা তোমার শরীর ভালো নেই, বসো, ধুঙ্গিআ খাও, খাবার কিছু দিই।"

"আর এখানে বসব? এটা তো তার বাড়ি। এই ঘর দোর ক্ষেত-খামার সব নাকি তারই—সে বলছে, আর এখানে আমার কি কাজ? আমায় ঘর থেকে ধাক্কা মেরে বার করে দিয়েছে, আমার গায়ে হাত তুলেছে, দেখলে যে আমি অক্ষম বুড়ো। আরে, তুই কালকের ছেলে, মদে আর মেয়ে মানুষে এতই তোর মাথা বিগড়ে গেছে? তুই বলবি আমাকে বেরিয়ে যেতে! আজ আমার ভাই নেই, তাই না? কোন কোনায় কুকুরের মতন লুকিয়ে বেড়াতিস্ তুই, আজ তোর এত বাড় বেড়েছে। সব 'আমার আমার' বলে তুই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস্। বদমায়েস কোথাকার! পটকার গণ্ডা নিস্তা পিস্তা, আজও টাঙ্গির ঘায়ে তোর মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে পারতাম, তা তোকে তো খুন করতে পারি না, তুই আমার ভাইয়ের ছেলে, নয়তো তোকে টুকরো টুকরো করে কেটে কাক শকুনকে দিয়ে দিতাম। তোকে ঐ দর্মু শাস্তি দিক, এই দর্তনী শাস্তি দিক, তোর ঘর ধ্বংস হোক, তোর শরীর ধ্বংস হোক, তার কুলের সবাই—"

পুয়ু তার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে লোটাল। বলল, "কি তুমি বলে যাচ্ছ লেঞ্জুকাকা? এমন তো তুমি কখনো হও না!"

রাগে কাঁদ কাঁদ হয়ে লেঞ্জু কন্ধ বলল, "এই ঝড় বৃষ্টি, বারিকের ঘরে বসে আগুন পোয়াচ্ছিলাম। কার কি ক্ষতি করেছি, কার কি খেয়েছি, কি উজাড় করেছি? তার ঘাড়ে যেন ভূত চাপল, যা মুখে এল তাই বলল, বাপ

ঠাকুরদাদার দিন থেকে কখনো শুনিনি এমন কথা। হিড় হিড় করে আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঠেলে বের করে দিয়ে বলল কিনা 'যা আমার গ্রাম থেকে চলে যা, পালা, আর এখানকার ছায়া মাড়াস না।' সে আমার মান সম্মান ভুলল, বাপ খুড়োকে খেদাল। সব সময়ে চাকরকে যেমন করে বলে তেমনি আমার সঙ্গে লেগে থাকে, আর থাকব এখানে? যাবার আগে তোকে বলতে এলাম, সাবধানে থাকিস, এমন ভালো মেয়ে হয়েও তুই যখন পটকারের হাতে পড়েছিস। আমাকে এখন আর বারণ করিস্ না মা, বিষ বেশী বেড়ে গেলে শেষে আবার খুনোখুনি হয়ে যাবে, আমি সামলাতে পারব না। ছাড়্, আমি যাই—"

লেঞ্জুকাকা খুব বেশী খেপেনি, ওদিকে দিউড়ু কি প্রলয় কাণ্ড করছে কে জানে। পুয়ু লেঞ্জুকাকাকে ছেড়ে দিলে। দরজার বাইরে গিয়ে বর্ষার জলে ভিজতে ভিজতে লেঞ্জু রুদ্ধ বিকট চীৎকার করে কেঁদে বলল—"ওরে আমার ভাই সরবু সাঁওতা। তুই-ই দেখ্, তুই-ই শোন্। আমার স্ত্রী মরে গেছে, আমার কপাল ভেঙে গেছে, তবু আমি কোনো দিন তোর থেকে আলাদা হইনি, তোর সব কিছুকে নিজের মতন মনে করেছি, তোর ঘর সামলেছি। তুই আমার মাথায় সব ভার দিয়ে চলে গেলি, এই ভিটের উপর বাস্তু সাপের মত আমি পড়েছিলাম, আজ তোর ছেলে আমাকে তাড়িয়ে দিলে, আমি যাচ্ছি।"

বৃষ্টির বেগ বাড়ল, পাশের দিকের উঁচু দেওয়ালের একটা কোনা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। ঐ লেঞ্জুকাকা চলে যাচ্ছে, কান্নার সঙ্গে সঙ্গে পুয়ুর মনে ভয়ও হল। কি দেখছে সে? এসব কি ঘটে যাচ্ছে? তার মাথা ঘুরে উঠল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মেঘের অন্ধকার গুমরে উঠে বেড়ে চলেছে, যেন আকাশ জোড়া একটা প্রকাণ্ড ভালুক নীচে নেমে আসছে, চেপে বসছে, চারিদিকের কালো মিশমিশে অবয়ব তার একত্র হয়ে আসছে, মাঝখানে তার সাদা বুকটা, ক্রমেই চেপে আসছে, চেপে আসছে, কি ভয়ঙ্কর! লেঞ্জু-কাকা কি সত্যিই চলে গেল? আর ফিরে আসবে না? এই তুমুল ঝড়-বৃষ্টিতে কোথায় সে যাবে? বাতাসের ঝাপটায় শীতে হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। খেয়ে যায় নি। এ কি হল?

পুযুর অস্থির লাগল, ভাবল দিউড়ুকে খুঁজতে যাবে। কি করবে দিউড়ু তার? হোক না সে বলবান্, মাতাল, দশ জনের সামনে বিয়ে করেছে সে বউকে, বিয়ে করা বউ, রক্ষিতা নয়। কিন্তু হাকিনাকে একা ফেলে বাইরে পা বাড়াতে ভয় করে। পুযু সেইখানেই বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মদ খেয়ে চীৎকার করতে করতে দিউড়ু এল—"ওরে পুযু, ওরে বুড়ো বলদ, কোথায় গেল সে বুড়োটা? এদিকে এসেছিল নাকি? শাঃ—খুড়ো—লেঞ্জুকাকা—গণ্ডা পট্‌কার্ নিস্তা পিস্তা ডুর্নিআ কোথাকার! মদখোর ডোম পট্‌কার ডোমের বাড়ি খায়, ডোমনী মেয়েমানুষ রাখে, ওটা কেন আমার ইচাবা (কাকা) হতে যাবে? বলে আমার হিতৈষী উপকারী আহা হা। ক্ষেতে লাঙ্গল দিলাম, বীজ বুনলাম, একদিনও জমির উপর দেখা নেই। যখনি দেখা চোরের মত গিয়ে ডোমবারিকের ঘরের ভিতরের কুঠরিতে উনুনের কাছে বসে আছে, কলসীতে বাটি ডুবিয়ে সব সময় মদ খাচ্ছে, সোনাদেঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, কাজ নেই কর্ম নেই। ডুবে ডুবে জল খাবি তুই আর আমি জানতে পারব না? আমি সাঁওতা, তুই আমার প্রজা। তুই কন্ধ হয়ে ডোমের সঙ্গে আত্মীয়তা করবি, লোকের নিন্দে কুড়োবি, আর আমার গ্রামে বাস করবি? তুই কে রে? তুই আমার কাকা? আমার কাকা তো মেয়েমানুষের দিকে মুখ তুলে চাইত না, 'বেজু'র মতো নপুংসকের মতো থাকত। আমার কাকা নেই, কেউ নেই, আমার কাকা মরেছে, বনের মধ্যে কোথাও মরেছে। তুই কার খারাপ ডুমা।" দিউড়ু ব'কে চলল, "'ইচাবা' মরে গেছে। 'অলো অলো হাতেয়ুঁ হাতেয়ুঁ' (হায় হায়, মরে গেছে)—"

বেশী মদ খেয়ে পাগলপারা সে। পুযু এসে তাকে ধরলে, দিউড়ু টলছে, কোনও রকমে নিজের উপরে ভর দিয়ে পুযু তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। একটি কথাও বলল না। দিউড়ু কান্নার সুরে মরণের বিলাপ শুরু করেছে—"হায় ইচাবা, আমার 'বেজু'র মতো 'ইচাবা' মরে গেছে—অলো অলো হাতেয়ুঁ হাতেয়ুঁ—" শুয়ে পড়ে মাটিতে মাথা কুটলে মৃত কাকার শোকে। তার পর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধকারে সব ঢাকা পড়েছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে যেন হাজার মাদল বাজছে, হা হা করে বাতাস বইছে। পুযু কবাটে খিল দিলে। উনুন

ধরিয়ে রাতের ভাত রাঁধতে বসল। ভাববার কথা অনেক আছে, কিছু বিশ্বাস করতে মন যায় না, যখন যা হবার তা হবে—এইটুকুই সে ভাবতে পারে।

বর্ষা নেমেছে, ঘোর বর্ষা।

॥ চুরাশি ॥

সারা রাত পুয়ুর ঘুম নেই, জেগে বসে আছে, কান খাড়া করে আছে, ঐ, লেঞ্জুকাকা এল নাকি? কে আস্তে আস্তে ডাকছে "পুয়ু, ঘুমুলি নাকি?—" দিউড়ু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার আর কি চিন্তা। তার জ্বালায় অন্যেরা কষ্ট পাবে আর সে ঘুমিয়ে থাকবে। পুয়ু বার বার উঁকি দেয়, বাইরে গিয়ে মেঘের অন্ধকার দেখে ফিরে ফিরে আসে। লেঞ্জুকাকার কুঠরির দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে, বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে দুড়দাড়। নির্জন রাত্রি, দারুণ বৃষ্টি, লেঞ্জুকাকা নেই।

নিজের মন কাতর হয়ে জবাব দেয়: সে আর ফিরবে না, প্রাণে ব্যথা পেয়ে সে চলে গেছে। নিজের মন বলে, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে উছলে পড়েছে, এবার ঘর ভেঙে যাবে, সব গেল, সব ছিন্ন ভিন্ন—।

সরবু সাঁওতা তুলেছিল এই ঘর, থাম, কাঠ, দেওয়াল, চালা।

শালগাছের মতো বিশাল মানুষ, প্রাচীন কন্ধ সমাজের, কন্ধ সংস্কারের প্রতীকের মতো—হায় কুলবৃদ্ধ, সংস্কৃতির রক্ষক, নিজের দল নিজের গোষ্ঠীর খবরদারি করতে করতে এই পৃথিবীতে একটা যুগ পার করে চলে গেছে সে। ঘরের সামনের ঐ চেটালো পাথরের উপরে ছিল তার আসন। তার উপরে বসেই ছিল তার রাজত্ব।

আজ সে নেই, সমাজের উপরে তার প্রভাব নেই, বাতাসে তার স্পর্শ নেই। ধরে রাখার, গেঁথে রাখার শক্তি চলে গিয়ে সব হয়েছে শুধু গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো, সেই ধুলোও কক্ষচ্যুত, বাতাসে উড়িয়ে নিচ্ছে, বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে, সব কে কোথায়, স্থিতি নেই, বিচ্যুতি। কালের গরল, যুগান্তর, মন্বন্তর।

পুয়ু ভাবছিল।

পুয়ু ভাবছিল না, তার গহন মনের দর্পণের উপরে ছায়া পড়েছিল এই পাহাড়ী দেশের মেঘের। অন্ধকার। ঠাণ্ডা। কানে কত কি যেন হুই-রই শব্দে ভেঙে পড়ছে, উলটে পালটে পড়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে বসুধার ফাটলের অন্ধকার পাতালে। যা পুরাতন, যা সংস্কৃতিবান তা আর থাকছে না। কোথায় সেই অভ্যস্ত পটভূমি, কি প্রলয় কাণ্ড এ? ভবিষ্যতের রূপ কি?

হাকিনা ঘুমোচ্ছে, দিউড়ু ঘুমোচ্ছে, ঘরের ভিতরে নড়ন নেই, চড়ন নেই, তবু- পুয়ুর মনে লাগছে কোন অজানা কালো ভয়ের হিমেল ছোঁয়া, ভাবতে ভয়, হাত দিতে ভয়।

শ্মশানে জেগে বসে আছে নাকি সে?

ওঃ, কি ভয়! কেন এই ভয়, বর্ষা, অন্ধকার।

সকালে দেরী করে দিউড়ু উঠল। চোখ লাল লাল, কপালে লাঙ্গলের রেখার মতো দাগ। তামাশা করার মতো করে একটু আলো দেখা দিয়েছে, একটু দূরে ঝাপসা দেখাচ্ছে। সেই অন্ধকার, শীত, তেমনি ঝর ঝর বৃষ্টি, সময়ের হিসেব নেই। উইটিবির মতো দিউড়ু বারান্দায় বসে রইল গায়ে চাদর ঢেকে। পুয়ুকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না, কিছু চাইল না। পুয়ু তার কাজ করে যাচ্ছে, আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখছে, পাশ থেকে পা টিপে টিপে এসে তার কাছে এক বিড়ে তামাকপাতা রেখে দিয়ে গেল। হাকিনা পুয়ুর গায়ে এঁটুলির মতন লেগে রয়েছে।

কতক্ষণ পরে—গাঁয়ের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে—কাছে এসে পুয়ু আস্তে আস্তে বললে, "খাবে না?" উত্তরে একটা বিকট হুঙ্কার, তার কোন অর্থ নেই। চমকে উঠে পুয়ু দু'পা পিছিয়ে গেল। আবার আস্তে আ[illegible] বলল, "শরীর খারাপ লাগছে? ডিসারীকে ডাকব?" দিউড়ু চেঁচিয়ে উঠল —"কেন পিছনে লেগেছিস্, দেখবি?—"

পুয়ু নিজের কাজে গেল। পড়ন্ত জলের দিকে চেয়ে দিউড়ু সেইখানে বসে রইল, একবার গর্জন করলে—"মদ আন।"

আবার——"শুনছিস্? মদ দে।"

নরম সুরে অপরাধীর মত পুয়ু বলল, "কোথা থেকে পাব, ঘরে নেই তো।"

"যা, বারিকের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়।"

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কুঁজো হয়ে ভিজে ভিজে দৌড়তে দৌড়তে পুয়ু চলল বারিকের বাড়ি। গলা অবধি কান্না উঠে আসে, আবার উপর থেকে নীচে নেমে যায় অন্ধ ভয়ের ভারে। এই সকাল আজ তার নতুনতর বটে। সাঁওতার ঘরের বউ সাঁওতার স্ত্রী হয়ে কখনো সে হাত পেতে চাইতে ডোম বারিকের দ্বারস্থ হয়নি।

ভালো হোক মন্দ হোক কোনো কিছুতেই সে বাধা দেবে না, গত রাত্রির সূচনা ভয় আজও আছে, এই লালচে ঘোলাটে হিমেল সকালে। কপাল ফাটে তো আপনিই ফাটুক, নিজে জেনে শুনে সে ফাটাবে না।

"বৃষ্টির মধ্যে কোথায় চললি নুনি? ওলো–ওলো—শুনে যা—" "ও নুনি, ভিজছিস্, তলরা-তলরিটাও তো নিয়ে যা, ওলো—ওলো হাকিনার মা—" পাড়ার ভিতরে দুই দিকে নিজের নিজের ঘরে আগুনের উপর গা মেলে দিয়ে সকলে বসে আছে, ডেকে ডেকে শুধোচ্ছে। চেপে বৃষ্টি পড়ছে। না, সে সময় নষ্ট করবে না, যাতে ঝগড়াঝাঁটি হয় এমন কিছু করবে না, যে যাই ভাবুক। এই বারিকের ঘর। বাইরে কেউ থাকলে তাকেই বলে দিত। কিন্তু কেউ নেই। আজ ডোমের ঘরের ভিতরে তাকে ঢুকতে হবে। কুলের বউ, শ্বশুর বেঁচে থাকলে কি বলত—

"অসময়ে এই বৃষ্টিতে কি মনে করে এলি সাঁওতানী? আয় আয়, উঠে আয়, উঠে আয়। ওলো ছেলেটাকেও ভিজিয়ে ফেললি। ও বউ, ওলো বউ, সাঁওতার বাড়ির লোকেরা এসেছে, খাট পেতে দে লো। উঃ কি দুর্যোগ! বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্চেই। বস্ বস্, আগুন পোয়া নুনি, সেঁকে নে, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কি মনে করে এলি?"

বুড়ো বারিক ভুর্ষামুণ্ডা ডোম ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মনে তার বড় কৌতূহল, কোনো দিন কোনো কালে আসে না, আজ হঠাৎ কেন এল সাঁওতার গিন্নী। কাল রাতে এই বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, তার পর থেকে লেঞ্জুকঞ্চের দেখা নেই। এখন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে দিউড়ুর স্ত্রী এসে হাজির। খাটের উপর বসেছে, কেমন মুখ করে চারিদিকে তাকাচ্ছে, কিছু বলছে না।

"বল্, বল্ নুনি, মন খুলে সব বলে যা। আমি তোর শ্বশুরের কুকুর। আমার কাছে লজ্জা কিসের ?"

পুয়্ু সোনাদেঈকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বারিকের ছেলের বউ। মুখে কথা নেই, মুখটি নিচু করে যেমন বলা হচ্ছে করে যাচ্ছে। এর এমন কি আছে যার জন্য গাঁয়ে একখানি হয়েছে, হাট বসেছে। বারিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুয়ুর হাবভাব লক্ষ্য করছিল। অনুমান ঠিকই বুঝি তার। পুয়ু সোনাদেঈয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, চোখের পাতা পড়ছে না। হাঁ, লোকে তার ছেলের বউকেই দায়ী করবে, তার ছেলেকেই দায়ী করবে—সে কি জানে না ? পাপের শাস্তি খুনোখুনি। ভগবান জানেন তার কোনো দোষ নেই।

পুয়ু কেন এসেছিল ভুলে গেছে। এই বাড়ি, এই নোংরা—এ বাড়ির নোংরা ইতিহাসের দুর্গন্ধ যেন লেগে আছে এখানকার বাতাসে। তুরুঙ্গা বালমুণ্ডা চুরি করে, বারিক মদ চোলাই করে, সোনাদেঈ বুঝি দরজার কোথায় জাল পেতে মাকড়সার মতো ওত পেতে থাকে। এই সেই সোনাদেঈ !

"কি মনে করে এসেছিলি বললি না নুনি ?"—একি শুনতে পাচ্ছে না ? ভাবল বারিক। মেয়েমানুষের বুকে কতই বা বল, এমনি ভেকা হয়ে বসে পড়ে কিছু একটা দেখলে।

সমাজ দুষবে নিশ্চয়। খুব বেশী কিছু যদি হয় তো তার বারিকের কাজ-খানা ছাড়িয়ে নেবে, বারিক্ জমি থেকে তাকে বার করে দেবে। দিক। কিন্তু তারপর ? নিজে খেটে খেতে তো ডোম কখনও শেখেনি, বরং খেটে খাওয়াকে সে ঘৃণা করে। সে অস্থির হয়ে উঠল।

আপনি ছোট হয়ে একটু মদ চাইতে পুয়ুর বাধ বাধ লাগছিল। কি বলে সে কথা আরম্ভ করবে ? তারপর এই সোনাদেঈ, তার সামনে কেমন করে নিজেকে খাটো করবে সে !

অনেক ইতস্তত করে ঢোক গিলতে গিলতে পুয়ু বললে, "সাঁওতা তোকে ডাকছে।"

"ডাকছে ? এই জন্য তুই দৌড়ে এলি ? কি হয়েছে তার ?"

"কিছু হয়নি। বর্ষার দিন, শীত করছে। বললে, নেশার কিছু কোথাও কিনতেও পাওয়া যায় না, যা বারিক বুড়োকে ডেকে দিবি—"

"আমার রাজা ডেকেছে রে, ওরে সোনাদেঈ, আমার লাঠিটা দে।" এই লাঠিই বারিকের চিহ্ন, তার অভিজ্ঞান, একটা লাঠি ঠাকুরদাদা থেকে নাতির হাতে চলে আসে। বারিক চঞ্চল হল, তাড়াহুড়ো করতে লাগল—"দে রে, দে রে, এই বর্ষার দিনে আমার মালিক আমাকে স্মরণ করেছে। আহা, তার পাদুকা শীতল থাক, কি দয়া! ওরে ও, মদ নাই বলেছে রে। ও সোনাদেঈ, ঐ ঘর থেকে কলসীটা এনে দে তো, আমার রাজা খাবে! খাঁটি চোলাই করা মদ, এক ফোঁটাও জল নেই। হাড় কাঁপানো বর্ষার শীতে শরীর গরম হয়ে উঠবে।—তাড়াতাড়ি কর্, তাড়াতাড়ি কর্—" চেঁচাতে চেঁচাতে বারিক ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ঘরে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। হাঁ, চালাক লোক সে, কালকের রাতের কাণ্ডের পর সকলের সামনে সাঁওতার খোশামোদ করা তার পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছে।

সোনাদেঈ লাঠিগাছটা এগিয়ে দিল, মদের কলসী এনে দিল। বুড়ো বারিক তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে গাল দিতে লাগল—"দেখ্ তো এই ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় গিয়েছে দুই ভাই তার ঠিকানা নেই, থাকলে এটা নিয়ে যেতে পারত তো, কি ভারী—"

সোনাদেঈ তল্‌রা-তল্‌রি এগিয়ে দিল। বারিক বললে, "তুই একটা নে নুনি, বৃষ্টিতে ভিজে কেমন করে যাবি?"

পুয়ু নাক সেটকালে। না, ঐটুকু সম্মান তার এখনও বাকী আছে। বলল—"না।"

"এমন বর্ষায় কেমন করে যাবি নুনি?"

"তুই আগে যা, আমি পরে যাব।"

"আচ্ছা আচ্ছা, বসে থাক্ মা। আহা, কি ভাগ্য, কি পুন্যি! ওরে সোনাদেঈ, সাঁওতানীর পা টিপে দে, দেখিস্ একটুও হেলা করিস্ যদি, আমি ফিরে এসে তোকে লাঠিপেটা করব। আচ্ছা, আমি চললাম।"

সোনাদেঈ মুখে কাপড় দিয়ে হাসছিল। বারিক সব তাতে মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তা সে জানে। আগে আগে মদ নিয়ে বারিক আর পিছনে পিছনে সাঁওতার গৃহিণী—এই দৃশ্য কল্পনা করতে পুয়ুর ভাল লাগল না, বরং এই ভালো। দিউড়ুর মন বুঝবে, সে আর রাগ করবে না।

নির্জন ঘরে দুটি স্ত্রীলোক, কাছাকাছি।

সোনাদেঈ মুখ থেকে কাপড় সরায় নি, পুয়ুর দিকে তাকিয়ে হাসছে, তেমনি হাসছে। বাইরে ওঃ কি বৃষ্টি, খালি ক্ষেতের ওদিকের আধখানা দেখাচ্ছে যেন ধোঁয়াটে বাষ্পের সমুদ্র। পৃথিবী গর্জাচ্ছে। সোনাদেঈ হাসছে।

কত রকম সন্দেহ হতে লাগল দিউডু সাঁওতার স্ত্রীর মনে। কি হয়ে গেল তার সংসার যে হীনের হীন ডোমনীও হাসতে পারে। নারী মনের সহজ কৌতূহল উঁকি মারল, পুয়ু ভাবলে, ক্ষতি কি, এখানে আর কেউ তো নেই যে কটাক্ষ করবে। কি রহস্য আছে এ বাড়িতে? বালমুণ্ডার মতো স্বামী পেয়ে সোনাদেঈ কখনো সতীসাধ্বী হয়ে থাকতে পারে? হোক না ডোমনী, কিন্তু কি স্বাস্থ্য, কি শরীর, মিটমিটে শয়তান। চোখ নীচের দিকে, অসতর্ক হলেই অমনি চোখ তুলে সাপের মতো করে দেখবে। পুরুষকে ঠকাতে পারে সে, কিন্তু মেয়েমানুষকে নয়। এই মৌন মূক হাবভাব এতে গম্ভীব গর্ব নেই কি? কত গোপন ঘটনার নীরব টিপ্পনী নয় কি এ? পুয়ুর আগ্রহ হল জানতে সোনাদেঈ কি জানে, কতখানি জানে। কাঁপা গলায় ডাকলে- "সোনাদেঈ—"

"শীত করছে না সাঁওতানী? ছোট ছেলেটা আছে, ঘরের ভিতরে এসো।"

"ঘরের ভিতরে যাব সোনাদেঈ?" পুয়ু আশ্চর্য হ'ল। কি অদ্ভুত অনুরোধ!

সোনাদেঈ কিছু না বলে ভিতরে চলে গেল। কেমন খুক্ খুক্ শুনতে পেল পুয়ু সে যাবার সময়ে, সে কি হেসে দিয়ে গেল না তার সর্দি লেগেছে? একটু পরে সোনাদেঈ আগুনে ফুঁ দিতে লাগল, ও কুঠরিতে আগুন জ্বলল। পুয়ুয় কাছে এসে বলল, "গরম জল মিশিয়ে একটু মদ এনে দেব? হালকা মদ?"

পুয়ু বলল, "কি বললি? কথাবার্তা না হয় নেই, আমাকে তুই চিনিস না নাকি লো—"

সোনাদেঈ এবার মুখ খুলে হাসল, লজ্জা করবার তার গরজ নেই মোটে। বললে, "সাত্রা (শ্বশুর) বুড়ো না বলে দিয়ে গেল, তুমি শুনলে— আমি তোমার সেবা করব? আমরা হলাম তোমার চাকর, আমাদের

বাড়ি কি তোমার বাড়ি নয়? ভিতরে আসতে, আগুনের কাছে বসতে, একটু আরাম করতে। এমনি যারা করে তাদের কি জাত যায়, না লোকে তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না?"

পুয়ু মনে মনে কি যেন বুঝলে, আর জবাব দিলে না। ভেবেচিন্তে জিজ্ঞাসা করল, "সোনাদেঈ, কাল এখানে লেঞ্জুকাকা এসেছিলেন কি?"

ফোঁস করে যেন ফণা তুলে সোনাদেঈ বললে, "সে কথা আমায় কেন, সাঁওতানী? আমার সে গোলমালে কাজ কি? ঐ বুড়োকে জিজ্ঞেস করলি না, ঐ মদখোর বুড়োকে—যে বারো রকমের লোক এনে ঘরে ঢোকায়? আমি তো মাথা বিকিয়েছি, বুড়ো মদ খেয়ে হুকুম করতে থাকবে, আর আমি বসে পা টিপতে থাকব। এই জন্যেই বুঝি আমার জন্ম, নয় তো আজ কেউ যখন ঘবে নেই, আমার বর ঘরে নেই, তখন তুমি আমায় এমনি কথা জিজ্ঞেস করতে কেন? আমার কপাল।"

সোনাদেঈ কাঁদল। পুয়ু বলল, "সত্যি করে বল্, তোর বর এখানে থাকলে তুই বল পেতিস্?"

"পেতাম না?" সোনাদেঈ বলে যেতে লাগল, "কোথায় আমি বোকা হাবা ছেলেমানুষের মতো লোক, আর কোথায় কোন গোলমাল, গালাগালি, ঝগড়া—" ঢোক গিলে সে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "ঐ বুড়োকেই ধরো, মারো, সব অনর্থের গোড়া সেই, সব নাটের গুরু, আর ঝগড়াঝাঁটিতে আমাকে টানবে। আমরা ভীতু মানুষ, অসহায় মানুষ। এই দেখে তুমি আগে থাকতে তৈরী হয়ে এসেছ, ছেলেটা শীতে কাঁপছে, তা'ও একটু আগুন পোয়ালে না, আমি যেচেছি বলে। মারো কাটো যাই করো এই মেঘ দেবতাকে সাক্ষী রেখে বলছি, যে দিব্যি করতে বলবে সেই দিব্যি করে বলব, বাঘছাল ছুঁয়ে বলব, সিকৃসন্ পুঁথি (আইনের বই) মাথায় নিয়ে বলতে বল তাও বলব, আমি নির্দোষ, আমি নির্দোষ—"

সোনাদেঈ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। তার কান্না দেখে হাকিনাও কাঁদতে লাগল। পুয়ু আশ্চর্য হল, কবে থেকে এই মেয়েমানুষটি তার জন্য তৈরী হয়ে বসে ছিল! বা রে বা, সোজা মেয়ে নয় তো!

"কি লো, তুই অমন ক'রে কাঁদছিস্ কেন, আমি কি তোকে কিছু বলেছি?"

সোনাদেঈ রা ধরেছে—"আমি নির্দোষ, আমি নির্দোষ। তুমি কোপ

করবে, বুড়োকে গাঁ থেকে খেদিয়ে দেবে, গাঁয়ের লোকে এই কুঁড়ে ঘর উপড়ে ফেলে দেবে, তোমার ইচ্ছে, আমি আর কি বলব, যেদিকে হয় একদিকে চলে যাব, কিন্তু জেনে রাখো আমি নির্দোষ, আমি নির্দোষ—"

"জানি জানি সোনাদেঈ, কে তোকে কিসের দোষ দিচ্ছে। আমি কি মানুষ নই যে জানব না বুঝব না ?—আচ্ছা, এ বৃষ্টি আর ধরবে না দেখছি, যাই। ওদিকে আবাব দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

সোনাদেঈয়ের দিকে মুখ ফিরে না তাকিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই পুযু বাড়ির দিকে চলল।

এর পর সেখানে থাকা অসম্ভব।

॥ পঁচাশি ॥

রই রই করতে করতে বর্ষার দিনগুলি চলে যায় এমনভাবে। দিন আর গোনা যায় না। সেই মেঘ জমে আছে, বৃষ্টি ঢালছে তো ঢালছেই, দিন রাত্রির প্রভেদ কেবল অন্ধকারের তারতম্যে রাতে ঘন কালো, দিনে খয়েরী কালো। যদি দিনের বেলা কখনো আলোটা একটু ভালো করে ফোটে তখন দেখা যায় আগাছা বেড়ে উঠেছে, পাহাড়ের নেড়া গা হয়েছে ভালুকের মতো লোমশ, জঙ্গলের ভিতর দৃষ্টি চলে না, এত ঘন।

মালদেশের বর্ষা কেবল বর্ষণ করে না, সপাসপ চাবুক লাগিয়ে দিয়ে যায়। একটার পিছনে একটা পর পর লেগেই থাকে। কুলের মতো বড় বড় ফোঁটা, কি ঠাণ্ডা হিম ফোঁটাগুলি। সর্বক্ষণ সোঁ সোঁ বাতাস, তার গতি বেগ নিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটে চলতে থাকে মেঘ, মানুষের চোখে দেখা যাচ্ছে, গা ছুঁয়ে যাচ্ছে, গাঁয়ের গলিপথ দিয়ে এসে ঘরে ভরতি করে চলেছে মেঘের বাষ্প তিন হাজার ফুট পাহাড়ের উপরে। সর্বদা কানে যেন উড়োজাহাজ ওড়বার শব্দ, কান ঝালাপালা। বনের ভিতর হই হই চলেছে, প্রকৃতিতে তুমুল আলোড়ন, থেকে থেকে মেঘ ডাকার আওয়াজ, তাতে আশার বাণী নেই, যুদ্ধের প্রবৃত্তি নেই, এক পা চলতে গেলে বৃষ্টি বাতাস ঠেলে ফেলে দেয়। প্রবল শীত।

এইভাবেই কত দিন,—কেবল সহ্য করে যেতে হয়, মেনে নিতে হয়।

অন্ধকার পাতায় ছাওয়া ঘরের ভিতর নাক বন্ধ করা ধোঁয়া, জলন্ত কাঠের গুঁড়ি। দোরের সামনে ছোট্ট বারান্দা, জল সর সর, পায়ের কাদা, 'তল্‌রা-তল্‌রি' আর পাতার ছাতা থেকে দর দর করে পড়ে জল, ভিজে দুর্গন্ধ লোমে গা ঢেকে কুকুর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে, মুরগী ঠোকরায়। শুওরের সনর সনর শব্দ। গাঁয়ের গলিপথে এক হাঁটু কাদায় ঘোরাঘুরি করে এসে পিঠের উপরে ঢেউ খেলিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে গরু বাছুর মাথা তুলে চেয়ে থাকে উদাস চোখে। ঘরে ঘরে কাশির শব্দ, জ্বরের কোঁকানি, বমি। সর্দি সড সড় ছোট ছেলেরা ছেঁড়া চট পিঠে বেঁধে দোরগোড়ায় বসে ঢোল পিটতে থাকে, গান গায়, মেঘের দেবতা বাঁমা রাজার বন্দনা করে।

এমনি দিনেও পাহাড়ের উপর থেকে পিছল খাড়া ধার বেয়ে আঁচল থেকে ধানের তুষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পা ফেলতে ফেলতে গাছের খুঁটো শক্ত লতা ধরে ধরে গাঁয়ের মেয়েরা ঝোরায় নামে জল আনতে, বনে কন্দ খুঁড়তে বাঁশের কোঁড় আনতে যায়। পুরুষেরা পাহাড়ের নীচে পাহাড়ের উপরে আবাদী ক্ষেত দেখতে যায়। কোথায় ফসল কতটা হল, কোথায় মাটি ধুয়ে যাচ্ছে নালা কেটে দিতে হবে, পাথর গাদা করে করে বাঁধ দিতে হবে। এই দুরন্ত বর্ষাতেও মেঘের সঙ্গে কুড়ুলের তাল দিয়ে পোড়ু-করা পাহাড়ের ডগায় গাঁইতি মেরে পাথর উপড়ে ফেলে কন্ধ জমি তৈরী করে। বাঁশের ডোঙ্গা তৈরী করে ঝোরার মধ্যে রাখে, ডোঙ্গার মুখ জলের উপরের দিকে আর পিঠ নীচের দিকে করে তার তলায় পাথর রেখে দেয় পায়ার মত করে। ডোঙ্গার খোলের মধ্যে ডালপালা ভরে রাখে—এই আশায় যে বান আসার পর জল নেমে গেল এই ডোঙ্গার মধ্যে মাছ আটকে থেকে যাবে, এরই নাম 'বিসর্'। এই রকম দুর্যোগ তো এক দিনের নয় যে মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে বসে আগুন পোয়াবে কেবল। কাজকর্ম চলতে থাকে। হাটেবাটে না গেলে একটু নুনও পাওয়া যাবে না। তল্‌রা-তল্‌রি গায়ে বেঁধে শিআরি পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে, কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে মেঘের বাষ্পে মিশে মানুষ চলে ফেরে। ঘাঁটি আগলে মানুষ-খেকো বাঘ ওত পেতে বসে থাকে, ক্ষেতের আলে ঘাপটি মেরে থাকে ডংগর চিতি সাপ, মিশমিশে কালো কালনাগ—আর চারিদিকে ঘনিয়ে ওঠা আঁধার, বৃষ্টি, বাতাস, ঝোরার

পিছল পথ, গাছ উপড়ে পড়ছে, পাহাড়ের বড় বড় চাঁই হড়হড় করে ধসে পড়ছে, পথ বন্ধ করে রয়েছে কখনো-না-দেখা নতুন নতুন পাথরের চাঙ। যেদিকে যাও জঙ্গল আর জঙ্গল, সামান্য 'পিরি' ঘাসও মানুষের দেড় গুণ উঁচু হয়ে উঠেছে, তার ভিতরে সর্বদা লুকিয়ে আছে অজানা ভয়।

এমনি মাল দেশের বর্ষা,—কেবল অন্ধকার, শব্দ, জলের ঝাপটা, আর ঠাণ্ডা।

পাহাড়ের পর পাহাড় লেগে আছে সে কত দূর,—গভীর দরি, বৃাহ, শিখর, শিলাময় সমতল। রাস্তা নেই. গরুর গাড়ির চাকার দাগ নেই। মরাবাঁচার হিসাব নেই, গনতি নেই। কেবল গাছ, পাথর, জল। মানুষ সেখানে নগণ্য।

তবু ধীরে ধীরে নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চলেছে মানব সংস্কৃতির পরিচয়, ফসল বাড়ছে, চাষের জমি বাড়ছে, কত বর্ষাতি তৈরী হচ্ছে, কত সংগ্রহ কত আহরণ! রক্ত বইছে, মাংস বাড়ছে, এমন দুর্দিনে প্রকৃতির এত শত্রুতা সত্ত্বেও জাগরূক রয়েছে মানুষের অজেয় মন, তার কল্পনা, তার প্রাণ। ঋষি সে, স্থিতপ্রজ্ঞ।

সেই কালবেলার পরে—

অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে নীরবে গাঁয়ের ভিতরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে লেঞ্জু কন্ধ চলে গেল।

আগে কোনো দিন তারও চাষ ছিল, তার স্ত্রী রুপ্‌নী মরার পর সব শেষ হয়ে গেল। সে ইচ্ছে করলে দিউড়ুর কাছ থেকে নিজের অংশ নিয়ে ভিন্ন হয়ে যেতে পারত। সেবার পুবুলি চলে যাবার পর সামান্য কথায় রাগারাগি করে দিউড়ুর বিরুদ্ধে সে পঞ্চায়েত বসিয়েছিল, এবারেও পঞ্চায়েত করতে পারত। দিউড়ুকে অবজ্ঞা করে এই গাঁয়েই স্বতন্ত্র ঘর করে সে বাস করতে পারত।

সেসব কিছুই সে করলে না। এক ধাক্কায় হঠাৎ তার চোখ খুলে গেল, নিজেকে সে দেখতে পেল : কেবল এক অকেজো নিরুপায় বৃদ্ধ। সোনাদেঈয়ের কাছ থেকে, বর্ষার রাতের সুখের ভিতর থেকে. আবামের ভিতর থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি করে যখন তার ভাইপো তাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল, তার মাতলামি আর কুঁড়েমি—এই সামান্য কথা থেকে আরম্ভ করে একেবারে চড়ে উঠে সোনাদেঈ ডোমনীর সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা তুলে বীভৎস ভাবে

গাল দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে তার টুঁটি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঠেলে দিল বাইরে, তখন বিহ্বল চোখে লেঞ্জু কন্ধ দেখল সে নিজে অপরাধী, সামনে দাঁড়িয়ে তার সাঁওতা, কন্ধ গোষ্ঠীর সর্দার, যে চলে আগে আগে পিছনে পিছনে বাহিয়ে নিয়ে যায় কন্ধ গোষ্ঠীকে রণাঙ্গনের দিকে, যে মাথায় রাজার শিরোপা বাঁধে, দলের বিচারপতি হয়ে পাথরের উপরে বসে দোষীকে শাস্তি দেয়, ডোম সম্পর্ক করে আপন আভিজাত্য খুইয়ে দলের মানহানি করে যে কন্ধ, তার মাথা মুড়িয়ে লাথি মেরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেয় গ্রামের বাইরে। এই অপরাধের নাম 'দোষ্,' এমন অপরাধীর নাম 'ডুর্নিআঃ'। প্রাচীন জাতি অতি সন্তর্পণে নিজের রক্তের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, ভাবে তার জাতির মনোভাব, জাতির বৈশিষ্ট্য, অটুট থাকবে, ভাবে তার সংস্কৃতি অন্য সব জাতির শিক্ষা সভ্যতাকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে হিমালয়ের মতো। আর, এই নীতি যে লঙ্ঘন করে প্রাচীন গোষ্ঠী তাকে শাস্তি দেয়। সে জাতিভ্রষ্ট হয়েছে, ত্রিশঙ্কু সে।

গোষ্ঠী যা চায় না তাই পাপ। মানুষের মনে সেই পাপের দর্শক তারই হাতের বা মনের তৈরী তার গোষ্ঠীর ঠাকুর-দেবতারা। দর্ত্তনী দেখেছে, দর্মু দেখেছে, ঝড়ের দেবতা জানে, দেবতার নিজের লোক বেজুণী বুড়ীও জানে, সামনে আবার সাঁওতা। নয়তো কেবল ভাইপোর সাধ্য কি যে তাকে এমন পরাভব দেয়।

অন্য সময় হলে কে জানে হয়তো সে টাঙ্গিতে হাত দিত। তুরুঞ্জা উর্ধ্ব-শ্বাসে কোথায় ছুটে পালিয়েছে, বারিক লম্বা হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, সোনাদেঈ কোথায় কোন অন্ধকারে গিয়ে ঢুকেছে। লেঞ্জু কন্ধ বাধা দিতে পারল না। কি যেন সে বলল, সে তার উপর মনের কথা, তার সব নেশা ঘুচে গিয়ে তখন ছিল কেবল একটি চিন্তা—কেমন করে দিউড়ুর আর তার মাঝে দূরত্ব আরো বাড়বে—আরো বাড়বে, সে চলে যাবে, হলই বা বর্ষার অন্ধকার।

একবার বাইরে চলে আসার পর পিছন ফিরে চেয়ে তাকিয়েই সে ছুটল, জলে ভিজল, ঠাণ্ডায় কাঁপল, তারপর দাঁড়িয়ে তার হুশ হল, এ কি হল?

মাথার চুল ঠিক করে নিলে, নিজেকে রাগিয়ে রাগিয়ে ফোলালে, চলে না গিয়ে সে ভাবতে লাগল যে দিউড়ু বার হলে তাকে তাড়া করবে। দিউড়ু

তার গায়ে হাত তুলেছে, সেই তো কন্ধের চরম অপমান। দর্মু আছে দর্তনী আছে, নিজে সাঁওতা হওয়ার যোগ্য যে, সে পেল সামান্য একটা ছোকরার কাছে অপমান।

এই যে পাড়া দেখা যাচ্ছে, কত ঘরে দরজা বন্ধ, কত ঘরের ভিতর দেখা যাচ্ছে, দিউড়ু আসছে না কেন? বারিকের বাড়িতে শাস্তি দিচ্ছে হয়তো। পাড়া দেখা যাচ্ছে, লেঞ্জু কন্ধের রাগ দপ করে নিবে গেল। পাড়ার লোকেরাও জানতে পারবে, তারাও তাকে খেদাবে, কিসের জোরে সে ডাকবে? পা আপনিই তাকে নিয়ে চলেছে তার ঘরখানির দিকে, ঘা খাওয়া মন সেইখানেই বিশ্রাম চায়।

এই তার ঘর। পুয়ু বসে আছে। আবার লেঞ্জুর মনের ভেক বদলে গেল, সে আধবুড়ো লোক, এই বাড়ির মুরুব্বী, সরবু সাঁওতার ভাই, সে অপমানিত হয়েছে। মনে পড়ে গেল ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে দিউড়ুর সব অবহেলা সব অধঃপতন, এই পুয়ু তার প্রমাণ। নরম হতে হতে লেঞ্জুকন্ধ আবার তেতে উঠল, পুয়ুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিছন ফিরে চলে গেল।

মনের ভিতরে এত দিনের চেপে-রাখা বিদ্বেষ আর অভিমান অনুকূল পরিস্থিতি পেয়ে এক সঙ্গে জ্বলে উঠল। অপমান আর ভয়ও রাগেপরিণত হয়ে ভিতর মনকে একরকম তৃপ্তি দিতে লাগল। লেঞ্জু কন্ধ ঠিক করল আর মমতা নয় উপরোধ নয়, আগে এই গ্রাম থেকে চলে যাবে সে, রাত আসছে, দেরি সইবে না।

পাড়ায় সন্ধ্যার আগের কলরব। দিউড়ুর গলা কোথা থেকে শোনা যাচ্ছে, লেঞ্জু কন্ধ তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটতে লাগল, আপনাআপনি তার পা পড়তে লাগল নীচের ক্ষেতের দিকে। পাড়ার শেষ মুড়োয় বারিকের ঘরের কাছে এসে সে থেমে গেল। জনশূন্য পথ। ঠিক তখনই তার মনে হল এইভাবে বাব বার বৃষ্টিতে স্নান করে শীতে কেঁপে কতটা পথ সে যেতে পারবে। অন্ধকার আসছে, প্রবল বৃষ্টি আর বাতাস, দশ হাত দূরে ভালো করে নজর চলে না, ঝর ঝর করে জল পড়ছে, উপর নীচ সব জল, আশ্রয় কোথায়?

ভাবল বারিকের বাড়ি গিয়ে একটা পাতার ছাতা আর একখানা বর্ষাতি চেয়ে নেবে, আর আশ্রয় থাকি না থাক এই গ্রাম ছেড়ে সে চলে যাবে।

বারিকের আঙিনায় ঢোকবার আগে আবার ইতস্তত: করতে করতে সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে। সন্ধ্যার অন্ধকার দূরের মেঘের মতো ঘিরে আসছে, বৃষ্টির মধ্যে দূর দূরান্তরের পাহাড়ের ঝাপসা চূড়া ক্রমে কালো মেঘের সঙ্গে মিশে এসেছে, ধীরে ধীরে মুছে যাবে। যাক গে, আবার সে ঘরের বারান্দায় উঠে লেঙ্কুকন্ধ ডাকল—"বারিক—", কাশল, দাঁড়িয়ে রইল।

কতক্ষণই বা হবে এই জায়গাতেই তার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিল, তার মনের তুফান যে আজ তাকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, এইখানেই না তার শুরু। অথচ এই জায়গাতেই আবার এসে দাঁড়াতে উপরের নুয়ে আসা আঁধার চালা থেকে ঝরে পড়ছে যেন সে কি মায়াজাল, ভুলবার, আপনাকে ভোলাবার কিমিয়া। মাথার ভিতরে যেন কে পাখা লাগনো ছোট পরীটি বসে সোনার কাঠিটি দিয়ে রূপোর ইটের উপর ঘা মেরে চলেছে—সোনাদেঈ—ওগো সোনাদেঈ—ওগো—। সেই আঁধার কুল-ভাসানো জ্ঞান-হারানো মায়া, পায়ে বন্ধন, মুখে বন্ধন। কোথায় যাবে সে এই সাঁঝের পহরে? কি গরজ পড়েছে?

"বারিক—বারিক—"

"ঘরে নেই—"

"সোনাদেঈ—"

উত্তর নেই।

টলতে টলতে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকল লেঞ্জু কন্ধ। সেই কাঠের গুঁড়ি এখনো জ্বলছে। চুপ করে সোনাদেঈ দাঁড়িয়ে আছে এক কোনায়। লেঞ্জু কন্ধ তার গায়ে হাত বোলাতে লাগল। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল আবার।

"আঃ ছাড়ো, সরো, কেন জল লাগিয়ে দিচ্ছ বলো তো? উঃ—" সোনাদেঈ কাঁপতে কাঁপতে সরে গেল। লেঞ্জু কন্ধের পাগল মনে এর কোনো অর্থ বোধ হল না। আগুসার হয়ে ধরা গলায় প্রলাপের মতো বলতে লাগল—"চল্ বেরিয়ে যাই তুই আর আমি—বেরিয়ে যাই—কে কি করবে আমাদের? ভয় কাকে?' ডর কাকে? আয়—" সোনাদেঈয়ের কাছে গিয়ে তার হাত ধরলে। সোনাদেঈ ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গিয়ে তীব্র সুরে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ছি—একটুও লাজ-লজ্জা নেই তোমার? ভয়-ডর

নেই ? আমার বর আমার শ্বশুর এসে পড়লে কি হবে বলো তো তোমার দশা ? কি করো—ছি—তোমার মুখে—"

কথা বেরুচ্ছেনা মুখ দিয়ে, ফুলছে কাঁপছে তার সারা গা। জলন্ত গুঁড়ির আগুনের আলো পড়ছে তার লাল কাপড় পরা জন্তু-দেহের উপর। লেঞ্জু কন্ধ থমকে গিয়ে বললে—"অ্যাঁ—" তার কাশি উঠতে লাগল।

"কি অ্যাঁ—অ্যাঁ খ্যাঁ—খ্যাঁ করছিস্ ওখানে দাঁড়িয়ে বুড়ো বাঁদর! যা বুড়ো—বাঁদরমুখো বুড়ো হাড় মদ খেয়ে ধাংড়ার নাচ নাচছিস্ মনে মনেই। কেন দাঁড়িয়ে আছিস্ ওখানে ? আবার আগুন লাগাবি ? যাচ্ছিস্ কি না ?—"

বুড়ো! ধাংড়ার নাচ নাচছে! বুড়ো বাঁদর! কে যেন লেঞ্জু কন্ধের ব্রহ্মতালুতে নির্ঘাত এক ঘা লাঠি কষিয়ে দিল। টলতে টলতে সে বাইরে বেরিয়ে গেল। সে কেন এসেছিল ? ছাতা বর্ষাতি চাই, মদ চাই, সেকথা সে ভুলে গিয়েছিল। ঐ অনর্গল বৃষ্টির মধ্যে আরো মেঘ ছুটে আসছে, গা ভিজে চুপচুপে, নীচে জল উপরে জল। ছুঁচালো পাথর পিছল পাথরের উপর দিয়েই পথ চলে গেছে নীচে কন্ধগুড়িআর দিকে।

সোনাদেঈ দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ঘরের লোক চুরি করতে বেরিয়ে গেছে, এদিকে ঘরে উৎপাত। কি ঘর! স্ত্রীলোকের চরিত্র থাক আর নাই থাক, তার আত্মসম্মান আছে।

মাথা হেঁট করে টলতে টলতে লেঞ্জু কন্ধ যাচ্ছে। চোখে জল, থেকে থেকে দাঁড়াচ্ছে। বাতাস তাকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে তার জন্মভূমির দিকে। বৃষ্টির বিরাম নেই। অন্ধকার আসছে। কোথায় কুট্‌রা ডাকছে, কুব্‌রী পাখী ডাকছে, প্রাণ কাঁপানো ডাক "কুবৃর্—কুবৃর্—"। এর পর অন্ধকার, মালের উপর বর্ষার রাত্রির অন্ধকার। ঢালু পথ বেয়ে গাঁয়ের লোক কারা চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে উঠে আসছে। ক্ষেতে আর কেউ হয়তো নেই এখন। বাতাসে কথা বোঝা যাচ্ছে না। কত উঁচু হয়ে বেড়ে উঠেছে পিরি ঘাস, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না।

কেবল কন্ধ বলেই জঙ্গলের খাঁজেখোঁজে পাথরে ফাটলে অপথে অরাস্তায় অজানতেই মচকে না গিয়ে পিছলে না গিয়ে পা ঠিক ঠিক পড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত নীচের দিকে। জলো ঠাণ্ডায় শরীর থর থর করে কাঁপছে, নাকের জল

ঝরছে। আজ কোথায় বাস? লেঞ্জু কন্ধ দোমনা হল। একটা বড় 'ঝোড়ি' গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকাল সে। গাঁ দেখা যায় না, দেখা যায় গাঁয়ের পাহাড়ের খাড়া ধার। ধীরে ধীরে অতিশয় বুড়ো হয়ে গেল সে, অকেজো অসহায় বুড়ো মানুষ, তার কেউ নেই, এই গাঁয়ে তার সব ছিল এক দিন। আজ কেউ তাকে চায় না, কেউ তাকে খোঁজে না, আজকের এই মরণযাত্রার মতো ভয়ঙ্কর পথ চলায় তার শুকনো হাড়গুলোর জন্য একটু গরম নেই কোথাও, কোথাও নেই মাথার উপর একটুখানি চাল।

বর্ষা আর অন্ধকারের এক এক কণিকা, মিশে মিশে ফিরে এল ছবি। তার রুপনী। রুপনী যদি থাকত। ছেলেপিলেরা থাকত। এই গ্রামে সেও হত একজন মানুষ।

আর আজ এই গ্রাম থেকে তাড়া খেয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সমস্ত বল একত্র করে বুকের উপর হাত বেঁধে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকা গ্রামের দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়াল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। গাঁয়ের তলাকার পাথরের ধার দেখা যাচ্ছে নিশ্চল নিষ্ঠুর, বুকের রক্ত দেহের শিরায় শিরায় চলকিয়ে, নিশ্বাসে ঝঞ্ঝা বইয়ে, লেঞ্জু কন্ধ প্রতিজ্ঞা করল—"চললাম, মরলে তো চুকে গেল, ভূত হয়ে আসব, গ্রাম উজাড় করতে। যদি বাঁচি, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব এই গাঁ, এই সোনাদেঈ ডোমনীকে, দিউড়ু কন্ধকে।"

দাঁত চেপে চেপে ফিস্ ফিস্ করে বলে চলল, "জন্মভূমি, জন্মভূমি, আজ থেকে তোর সাথে আমার শত্রুতা—"

হাউমাউ করে বাদলের হাওয়া তাড়িয়ে নিচ্ছে, উড়িয়ে নিচ্ছে, গালে ঘাড়ে চটাস্ চটাস্ করে ঝাপটা মারছে। চাষের খাতের চারি দিকে গোল হয়ে ঘিরে জঙ্গলে ঢাকা বিকট পাহাড়, উপরের অন্ধকার আকাশ অবধি মাথা উঁচিয়েছে, নীচে নেবে এসেছে তার লম্বা লম্বা শিরা, তার অবয়ব, অন্ধকারের মধ্যে খাতের ভিতরে চলে আসছে, ঢুকে যাচ্ছে। অন্ধকার যেন পাঁচ হাত দূরে। চাষের জমির আলে আলে মানুষ প্রমাণ উঁচু বেনা আর পিরি ঘাসের জঙ্গল, কোথাও কোথাও ঠুঁটো গাছের গুড়ি, উইঢিপি, পা পিছলে ক্ষেতের কাদায় বসে যাচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত। যে দিকে যাও ডাঁশ মশার দল ভন ভন করে উড়ছে, কানে তালা ধরিয়ে বেঙের একটানা গ্যাঙর গ্যাং।

সেই কাদাভরা ক্ষেতের মধ্যে কি যেন সব সরসরিয়ে চলেছে, আলের উপরে নানা রকম খস্ খস্ শব্দ। আলের বাঁকে বাঁকে ঘাসের ঝোপে ঝোপে জ্বল জ্বল করছে জোনাকি। যত পথই যাওয়া যায় সামনে একই রকম চৌকোনা ক্ষেতের আল, সেখানে ক্রমেই অন্ধকার ঘন হচ্ছে, পাঁশুটে মেঘ থেকে চারি দিকে এসে বিধঁছে রাশি রাশি বৃষ্টির তীর, একটার পর একটা। ঠাণ্ডায় হাত পা বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে, গাছের ডালের খোঁচা লাগছে ছুরির মতো, পাথর বিঁধছে ছুঁচালো কাঁটার মতো। জায়গায় জায়গায় তালগোল পাকানো অন্ধকারের মতো খানিক অন্তর বড় গাছের কুঞ্জ, কোথাও কোথাও অকস্মাৎ গভীর ঝোরার কালো বিস্তৃতি, সোঁ সোঁ করে ছুটেছে জল। লেঞ্জু পেরোচ্ছে উঠছে, আবার চলেছে, একা একটি মানুষ—টলে, পড়ে, উঠে।

ঐ ঝোলার হাঁটুভর জলে মুণ্ডহীন নাগিনীর মতো স্রোতের তোড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, সামনে পিছনে কালো কালো দুটো দেওয়াল, মানুষের বসতি নেই এখানে। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বলছে শুয়ে পড়—শুয়ে পড়, টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সোজা চলতে দিচ্ছে না। এ কি ঝড় ঝঞ্ঝার শব্দ! নদী গর্জন করতে করতে পুরে উঠছে ভরে উঠছে, উছলে উঠে পিষে দলে আছড়ে চুরমার করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোথায় কোন দেশে। কাছে এসে গেছে শব্দ, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

ঐ এল, এল বুঝি, কানে মৃত্যুর করাল শব্দ, চিরে ফেলছে ফাটিয়ে দিচ্ছে। ঘরের মতন উঁচু হয়ে জল আসছে হয়তো, তুলে আছাড় মেরে গড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে বড় বড় পাথর, ঘুর্ণিতে পাক খাইয়ে নিয়ে আসছে হয়তো শিকড়-উপড়ানো বড় বড় গাছ। এই বুঝি সব শেষ, ভাবল লেঞ্জু কন্ধ, পা ধরে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—সে চোখ বুজল। ঠিক সেই সময়ে কড় কড় করে বাজ পড়ল, দিনের মতো আলো হয়ে গেল চারি দিক মুহূর্তের জন্য। লেঞ্জু কন্ধ দেখল সে পাড়ের কাছেই অল্প জলে পা পেছলাতে পেছলাতে পাড়ের দিকে চলেছে, উপরে হাওয়ায় দোল খাওয়া চাঁদোয়ার মতো ঝুলছে মেঘ, বৃষ্টি পড়ছে। বাঁচবার আগ্রহ বাড়ল, ঠাণ্ডায় কালিয়ে যাওয়া অসাড় পা দুটোকে ঘষটে ঘষটে নিয়ে সে খাড়া পাড়ের উপর উঠে পড়ল। মানুষের পা যেখানে কখনো পড়েনি সেই পথে অর্ধেক উপরে উঠেছে, এমনি সময়ে পুলের উপরে রেলগাড়ি চলে যাওয়ার মতো করে নদীতে বান এসে

পড়ল। আর একটুখানিই তো, শরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে যেতে যেতেও লেঞ্জু কন্ধ আবার চাষের জমির উপর উঠে গেল। নদী কত মানুষকেই তো নেয়, আজ তাকেও নিত।

বর্ষার ঝমঝম কমে এসেছে, ঝোরার গর্জন কানে আসছে, বাতাসের ঝাপটানি কমছে, বৃষ্টি এখন ঝুপুরঝুপুর, থেকে থেকে বিদ্যুৎ নিঃশব্দে ঝিলিক দিচ্ছে। একটা এবড়ো খেবড়ো ঢিবি জায়গা এটা, আবাদী জমি, একটু এগিয়ে কমলার বাগান দেখা যাচ্ছে, তার সামনে ফাটল ধরা খাড়া উঁচু পাথর একটা গাছের মতো দাঁড়িয়ে। ভিতরে চাষ ঘর আছে হয়তো।

লেঞ্জু কন্ধ সেই দিকে চলল। এমনি একটা আশ্রয়ের কথাই তার মনের মধ্যে ছিল।

কিন্তু কি বা আশ্রয় সে—পায়ের নীচে প্যাচপ্যাচে কাদা, আন্দাজে পথ ঠাউরে যেতে হয় কমলা আর কলা বনের দিকে, বুক-সমান উঁচু গান্টিআ ফসলের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে। ডান দিকে দেখা যায় পাহাড়ের ঢালু, সেখানে বন জঙ্গল, নানা জাতের জন্তু জানোয়ারের বাস। বর্ষার অন্ধকারে কমলার বাগানের ভিতরে উঁকি দিলে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে—কে জানে কিসের সামনে পড়বে, হয়তো কোনো জন্তু লুকিয়ে বসে আছে, তার উপর লাফ মারবে, আলোর আভাসটুকুও নেই। শেষ ভরসা : দিনের বেলা যারা কাজ করে গিয়েছে তারা কুঁড়ের ভিতরে যদি কিছু ফেলে গিয়ে থাকে, নিরাশায় আশা এইটুকুই।

গান্টিআর ক্ষেতের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলল লেঞ্জু কন্ধ, পথ নেই, কেবল মচ্ মচ্, সাঁই সাঁই। কত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে মাড়ুয়ার বড় ভাই এই গান্টিআ। বড় বড় চওড়া শক্ত পাতায় গাদা খানিক করে জল জমেআছে, পাতার রোঁয়ায় গায়ের চামড়া আঁচড়ে যাচ্ছে। পায়ে আর জোর নেই, দেহে আর প্রাণ না থাকার মতো, খক খক করে কাশতে কাশতে যেন কাউকে গুঁতোবার জন্য এগিয়ে চলেছে কোনো বুনো জন্তু, জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলেছে অন্ধকারে। গান্টিআর ক্ষেত শেষ হয়ে গেল, ফাটা পাথরের পাশ দিয়ে চেনা পথে কন্ধ গুড়িআর অন্ধকারের সমুদ্রে সে ডুব দিল। নির্জন, ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ। বৃষ্টি এখন সরু বালির মত গুঁড়ি গুঁড়ি, এতক্ষণের পথের সঙ্গীর অস্তিত্ব ঘুচে গিয়ে হঠাৎ সব শুনশান, হাট ভেঙে যাওয়ার পর হাট-

খোলার মতন। লেঞ্জু কন্ধের বুকের ভিতর পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর হাঁটতে পারে না।

ভয়, ভয়, মরবার ভয়, বাঘে কাঁচা চিবিয়ে খাবার ভয়। ঘুমন্ত বনকে চমকে দিয়ে থেকে থেকে শব্দ হচ্ছে নানা রকমের, মাথার উপরে পাখীর ডানার ফড় ফড়। আর কত দূর? পথ ভুল হল নাকি? লেঞ্জু কন্ধ নিজেকে শুধালো, জবাব পেল না। বার বার ভয়ে চমকে উঠতে উঠতে, ঝোপের সামনে গাছের সামনে পড়তে পড়তে, প্রতি মুহূর্তে মরে প্রতি মুহূর্তে ধুক্ ধুক্ প্রাণটি হাতে করে সে নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলল। ওটা কি বসে ছিল, লাফিয়ে পালাল? ঝপঝপ করে শব্দ হল, কি ওটা ছুটে গেল এদিক থেকে ওদিকে? পিছনে কি ছুটে আসছে, দুমদুম শব্দ? কত সন্দেহ, কত ভয়। ডাকলে শুনবে কেবল অরণ্য, মরলে দেখবে কেবল অন্ধকার, মানুষের ছায়াও নেই এখানে।

কমলা বন শেষ হল, মাঝে খানিকটা খোলা জায়গা। একটা ছোট কুঁড়ে ঘর দাঁড়িয়ে, গুড়িআর মধ্যেকার চাষ ঘর। লেঞ্জু কন্ধের মনে সাহস এল। এই বার হঠাৎ মনে হল সর্বাঙ্গে ব্যথা, ব্যথায় ছিঁড়ে পড়েছে, ভেঙে পড়ছে। কুঁড়ে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটতে লাগল, ভিতরে যদি কিছু থাকে? মানুষ এখানে কখনো আসে, কখনো আসে না। মৌমাছি চাক বাঁধে, ভালুক বাচ্ছা দেয়, বাঘ থাকে, সাপ থাকে।

বাইরে ভিজে জায়গায় দাঁড়িয়ে কুঁড়ের চালা ধরে দেওয়ালের উপরে গা ঢেলে দিতে লেঞ্জুর মনে পড়ল রাত বেশী হয়নি, মিণিআপায়ুতে বারিকের ঘরে সোনাদেঈ হয়তো উনুন ধরিয়ে রান্না করছে, উনুনের কাছে বারিক বসে আগুন পোয়াচ্ছে, মদ খাচ্ছে। আবার তার রাগ জ্বলে উঠে চোখ দুটোকে যেন অন্ধ করে দিল। গা বেয়ে দর দর করে জল ঝরছে, লেঞ্জু কন্ধ কুঁড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।

পায়ের তলায় শুকনো খড়কুটোর খস্‌খস্ শব্দ। মাথার উপরে ছাত আছে। এখানেই তার আশ্রয়! কি শীত! লেঞ্জু কন্ধ ভিজে কাপড় চোপড় ছেড়ে দরজার কাছে ফেলে দিয়ে পা ঘষড়ে ঘষড়ে ভিতরে গেল। খানিকটা খড়কুটো তুলে নিয়ে গায়ের উপর চাপিয়ে চারিদিকে তাকাল।

তার সন্ধানী কন্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঘরের এক কোণে, অন্ধকারে কি জল জল করছে ওখানে? জোনাকি? বন বেড়াল? লেঞ্জু হাত তালি দিলে, প্রতিধ্বনি হল। ঘষটে ঘষটে সেই দিকে গেল। নিচু হয়ে চেয়ে দেখল। আগুন!—আগুন!—তার নিস্তেজ বুকে আনন্দের ঢেউ লাফিয়ে উঠল। এক মুঠো খড় জড় করে প্রাণপণে ফুঁ দিতে লাগল। আগুন জ্বলল।

ছোট কুঁড়ে ঘরখানি। চাল ছাওয়ার পর বিচালির গাদা কে রেখে দিয়ে গেছে, সারাটা ঘরে পায়ে পায়ে বিচালি ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর এক কোণায় দু'খানা পাথরের ফাঁকে আধ পোড়া কাঠ, আর কাছেই মোটা মোটা আধ পোড়া কাঠের গুঁড়ি। এমনি করে বনের মধ্যে মোষের গোঠ-জাগা মানুষ রেঁধে বেড়ে খেয়ে চলে যায়, পথের পথিক বাসা নেয়, চোরে ভোজ খায়।

লেঞ্জু কন্ধ কাঠের গুঁড়ি দুটো আগুনের দিকে ধরল। চাগিয়ে ওঠা আগুনে গা হাত পা সেঁকতে লাগল। ধীরে ধীরে স্পর্শ ফিরে আসছে, বোধ জাগছে দেহের ক্ষতির—কি কষ্ট। আগুনের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে সাহস আসছে, বনের অন্ধকার আর বৃষ্টি ভুলে মন এখন আগুনের আঁচের দিকে। এই বিভুঁই জায়গায় যে রেখে গিয়েছে আগুনের ছোট এই ধুনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে এল। সে কে হতে পারে? সত্যি কি কোনো পথিক না কোনো উপকারী ডুমা? সে কি রূপনী? ভাবতে লাগল লেঞ্জু।

এমনও শোনা যায় যে মরে যাওয়া মানুষের আত্মা নিজের ভালোবাসার লোককে বিপদে সাহায্য করে, অদৃশ্যভাবে কত রকমের সুবিধা করে দিয়ে যায়। সত্যি সত্যি কি তার মরে হেজে যাওয়া স্ত্রী রূপনীই এই বিপদের মধ্যে বর্ষার অন্ধকারে তাকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে? কোথায় জঙ্গল, কোথায় পাথুরে পথ, কোথায় নদীর বানে আছাড়পিছাড় খেয়ে খেয়ে মরার আশু আশঙ্কার সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া, আর কোথায় এই কুঁড়ে ঘরে বিচালির গাদা আর এই আগুনটুকু! প্রতি পদেই তার মরবার সম্ভাবনা ছিল। সে মরে নি।

রূপনী—সে কোন হারানো অতীতের সাথী কেন সে আজ বার বার মনের কবাটে ঘা মেরে যাচ্ছে? লেঞ্জু কন্ধ কাঁদল। আগুনের তাতে কেন্দু

কাঠ থেকে জল ঝরার মতন কেঁদে কেঁদে সে গলতে লাগল। যেন কাল মরেছে রূপ্‌নী, সবে কাল তাকে বাঘে খেয়েছে।

কত লোকের ধাংড়ী তেমনি আছে, তারই ধাংড়ী মরে গেল! কি সুদৃঢ় ছিল তার ভালোবাসা, ভালোবেসেই বিপদের মধ্যে এসে বাঘের মুখে পড়ে চলে গেল সে। রূপ্‌নী—রূপ্‌নী—এমন করে অনেক দিন লেঞ্জু কন্ধ কাঁদেনি। আর বিয়ে না করে জীবনটাকে উজাড় করতে করতে পাগলের মতো কেটেছে বাকী দিনগুলো। প্রেম নেই, কি জীবন সে? কখনও বা মাংস টনটনিয়ে উঠেছে, দেহের নিয়ম মেনে সে ছুটেছে কোনো নারীর পিছনে, ক্ষণিকের নেশা, জন্তু দেহের বিকারের সুখ, সে তো আর প্রেম নয়। তাতে নেই লাউয়ের খোলে গরম জল ঢেলে ডলে ডলে স্নান করিয়ে দেওয়া, গা মুছিয়ে দেওয়া, তাতে নেই সাধ করে পাঁচটা রেঁধে বেড়েদেওয়া, বসে বসে জোর করে খাওয়ানো, ঝড়ে জলে ভিজে লাউয়ের খোলে গরম খাবার ভরে ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া,—তাতে নেই বাঘ-লাগা দিনে স্বামীকে আগলাবার জন্য মাঝরাতে পাহাড়ের নীচে চাষবাড়িতে গিয়ে বাঘের মুখে ঝাঁপ দেওয়া। প্রাণে আঘাত পেয়ে স্ত্রীকে মনে পড়ছিল, তাকে স্মরণ করে করে লেঞ্জু কন্ধ কাঁদছিল।

কেঁদে, গা সেঁকে ধীরে ধীরে শরীরে বল এল, ভাবল চলে আসা ছাড়া তার আর উপায় ছিল না। কাঁধে টাঙ্গি আর দেহে বল থাকলে কন্ধ আর কিছুকেই ভয় করে না, ভয় করে লজ্জা আর অপমানকে। এমনও তো হয়েছে যে গহন বনের ভিতরে কাছে জলের সুবিধা দেখে কন্ধ একলা কুঁড়ে ঘর একখানি তৈরি করে নিয়েছে, জঙ্গল খানিকটা পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে তার শ্যামা ধান তার মাড়ুয়ার চাষের কাজ শুরু করেছে, হলুদ লাগিয়েছে, মধু পালো করেছে। টাঙ্গির জোরে কাঠ আর বাঁশ, নিজের হাতে তৈরি করা ধনুক কি ওড়িআ নলি হলে শিকার, মহুয়া কুড়িয়ে নিজে তৈরী করা মদ একটু রাত্রে, আর বাঁশি বাজিয়ে একলা আগুনের কাছে নাচ। কিন্তু মানুষ দলের মধ্যে থাকতে চায়, একলা সে থাকতে পারে না, সেজন্য চিন্তা নেই, একজন ভালো বাসা একখানি বাঁধলে অন্যেরা আপনি এসে সেখানে বাসা বাঁধে, বসতি থেকে 'গুড়া', 'গুড়া' বাড়তে বাড়তে গ্রাম। গ্রাম উঠিয়ে নিয়ে কত কন্ধ তো বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অন্য কোথাও নতুন

গ্রাম বসায়। বেঁচে থাকলেই পেট চালানো যায়, ভাগ্যে থাকলে আপনিই হবে।

অনেকক্ষণ গেল। লেঞ্জু কন্ধ উঠল, ভিজে কাপড় নিংড়ে দরজার মুখে পথ বন্ধ করে টাঙিয়ে দিল। বিচালি বিছিয়ে বিছানা করল, বিচালি গায়ে দিয়ে আগুনের কাছে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বাতাস বইছে, কুঁড়ে ঘর দুলছে, চারিদিকে অন্ধকার আর জঙ্গল, মানুষ নেই। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল, বাঘের ডাক শুনতে পেল মনে হল, গালে হাত দিয়ে কান পেতে রইল কিছুক্ষণ বনের শব্দ ঠাওরাবার জন্য, আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আর এক বার ঘুম ভাঙল শেষ রাত্রে। প্রবল কম্প আসছে, সারা শরীর কাঁপছে। মনের ভুলে নিজের ঘরে শুয়ে আছে ভেবে তার মোটা কাঁথাটা গায়ে দেবার জন্য হাতড়াতে লাগল। বড় বেদনা। বড শীত। জ্বলন্ত কাঠের আগুন মিইয়ে গেছে। ফুঁ দিতে গলা বাড়িয়ে কাঁপুনিতে আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল, কাঁপতে কাঁপতে চিংড়ি মাছের মতন ছটফট করতে লাগল, আর ঘুম নেই। কখনো রাগে কখনো কাঁদে, কাঁপুনিতে দাঁতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করে লাগে, পেটে হাঁটু গুঁজে সে শুয়ে রইল, শরীরের শক্তি বন্যার জল নেমে যাওয়ার মতো ক্রমশঃ কমে আসছে, মাথার ভিতরে যেন ডাঁশ মাছি কামড়াচ্ছে, পুরোপুরি জ্ঞান নেই।

লেঞ্জু কন্ধকে মাল জ্বরে ধরেছে।

আলো হয়েছে। বৃষ্টি লেগে রয়েছে। লেঞ্জু কন্ধ বিচালির মধ্যে তেমনি পড়ে আছে কন্ধগুড়িআর সেই নির্জন কুঁড়ে ঘরের মধ্যে। কম্প আর নেই, গায়ে ভরে আছে জ্বর। কেবল একবার এ পাশ একবার ওপাশ ফিরছে, অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। কেউ এল না। বেলা দুপুর হয়ে গেল। মাঝে মাঝে আধ হুঁশের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। কাছের পাহাড়ে বাঁশের কোঁড় আর শিআরি পাতা নিতে লোকেরা এসেছে হয়তো। পিছন দিকে চাষের ক্ষেতে হয়তো এসেছে চাষ দেখতে, মাছ ধরতে। সংসার তার নিজের কাজে ব্যস্ত। লেঞ্জু কন্ধ বাঁচল কি মরল সে খোঁজ করার গরজ নেই কারো। জ্বরের ঘোরে কাঁদতে কাঁদতে ভাবে সকলেই তাকে পর করে দিল, কেউ চায় না সে বাঁচুক, মরুক সে। কিন্তু

মরতে তার আদৌ ইচ্ছা নেই। দুনিয়ার চোখে আগুনের খুঁটো গোঁজার মতো সে বেঁচে থাকবে, পড়ে থাকবে। আবার জ্ঞান হারায়, জ্বরের মধ্যে তেমনি পড়ে থাকে।

তিন দিন, তিন রাত! পেটে একটি দানা পড়েনি, খাড়া উপোস।

জ্বরের ঘোর কমতে সে কুঁড়ের থেকে ঘষটে ঘষটে বেরিয়ে দরজার ও পাশের সরু নালা থেকে এক আঁজলা জল খায়, কত বার পড়ে, কোথায় কি অবস্থা হয় তার ঠিকঠিকানা নেই। রাত্রে আর আগুন নেই, আগুন নিবে গেছে। কোথা থেকে সে অশ্বত্থ আর কুরূহেই-এর শুকনো ডাল খুঁজে আনবে, একটার উপর একটা রেখে দু'হাতে মউনি করার মতো করে আগুন বার করবে। শীত, এক নাগাড়ে বৃষ্টি, শরীরে অতিশয় কষ্ট, সর্বাঙ্গ ফেটে পড়ছে. টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, মাথা কত মণ বোঝায় যেন ভেঙে পড়ছে, কি সে করছে জানে না, বোঝে না।

তিন দিন, তিন রাত। জ্বর কাশি বমি কষ্ট, হাত পা সব কেমন শুকিয়ে সিটকে যাচ্ছে, শরীরের শক্তি চলে যাচ্ছে। লেঞ্জু কঙ্কের মনে হল সে মরছে, এমনি করে সে মাটিতে মিশে যাবে, কারও মুখ দেখতে পাবে না। মৃত্যু, সে কি ভয়ঙ্কর!

খিদেয় অনাহারে জ্বরে তাপে সিদ্ধ হয়ে হয়ে একদিন সে উঠল। জ্বর আর নেই, কিন্তু কি দুর্বল। কুঁড়ে ঘরের দরজায় গুটিসুটি হয়ে বসে হতাশ চোখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। মনে পড়ল—খিদে, মদ, ধুঙ্গিআ। কই? কোথায় কি? অরণ্যের ভিতরে একা সে। নিজের গায়ে মুখে হাত বোলাল, কি সব ছিল যেন, আজ নেই; কেবল খালি খালি, সব হাড় হাড়। গালে শক্ত জট বাঁধা দাড়ি গজিয়েছে। কত রকম গন্ধ, গন্ধ ডোবাতে মদ নেই ধুঙ্গিআ নেই। ইচ্ছে হল আবার বেরিয়ে পড়ে পথে, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গেলে ঝাঁই করে মাথা ঘুরে যায়। কোথায় একলা যাবে সে জ্বরো মানুষ, রোগা মানুষ?

আজ গায়ে জোর পেয়েছে, সে আগুন করে নিতে পারবে। কাঠে কাঠ ঘষে একটু আগুন সে করলে বহু কষ্টে। বৃষ্টি আজ কমেছে। বেলা ঠিক মাথার উপর। ছাড়া ছাড়া কেন্দু গাছের বন। ও দিকে পাহাড়ের ঢালুতে বাঁশ বন বেড়ে উঠেছে ঘন হয়ে। ঢালু ক্রমে উঁচু হয়ে চলে গেছে পর্বতের

উপর দিকে—ঘোর অরণ্য। মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু আলো বেরিয়েছে। কত জাতের পাখী আনন্দ করছে। এই, ভৃঙ্গরাজ পাখীর শিস। মোরগ ডাকছে। ময়ূর রব করছে, উপরে চক্কর দিয়ে উড়ছে পূর্ব ঘাটের ঈগল পাখী 'ময়ুরমারু'। লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে কাছের বনে গেল। গাছে বুনো আম ধরেছে, ঐদিকে লতায় কাঁকরোল গোছা গোছা, বুনো তেলাকুচা, বুনো পান। লেঞ্জু কন্ধের বড় খিদে পেয়েছিল, জঙ্গল থেকে ফল মূল সংগ্রহ করে আনলে, আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেলে। 'ডংগর বাত্রি' গাছের মূল এনে ওষুধ তৈরি করে খেলে—সে দিনটাও ঐখানেই কাটল। একটু জোর পেল গায়ে। জ্বর নেই, কাশি কমে গেছে। বেঁচে থাকবার প্রবল আগ্রহ। যে কোনো রকমে কাছের গ্রাম বন্দিকারে গিয়ে পৌছাতে হবে। গায়ে জুত না পাওয়া অবধি সেখানেই থাকবে, সে গ্রামের সঙ্গে এ গ্রামের অসদ্ভাব বাড়ছে সেই ঠিক হবে। শরীর সারলে সে গাঁয়ের মোড়লের অনুমতি নিয়ে গাঁয়ের কাছে বনের ভিতরে নিজের চাষ ঘর একখানা তৈরী করে নেবে আস্তে আস্তে। কারও আশ্রিত হতে হবে না। এ গাঁয়ের সাঁওতাব ভাই হয়ে সে ও গাঁয়ের সাঁওতার কাছে মাথা বিকিয়ে গোতি হয়ে সে থাকতে পারবে না। আলাদা থেকেই সে নিজের গুডা বসাবে। যার স্বামীকে বাঘে খেয়েছে তেমন মেয়েকে সে বিয়ে করতে পারবে কন্ধ আইন লঙ্ঘন না করে। তার নিজের ঘর, তার নিজের চাষ।

বন্দিকার—সেই ভালো। দূরে থেকে সব কিছু অস্বীকার করতে পারা যাবে : বারিকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল না, সোনাদেঈকে সে চেনে না। কে দেখেছে? দিউড়ু তার শত্রু, তার কথায় কার বিশ্বাস হবে? তাদের বংশের মাথা সে, লেঞ্জু। সেই দিউড়ু সেই সোনাদেঈয়ের কপালে আগুন দেবার জন্য মিণিআপায়ুর কাছে আলাদা হয়ে থেকে সে কলহের বীজ বপন করবে, তাতে জল দেবে, গাছ তৈরি করবে। তার পর দেখে নেবে তার শত্রুদের।

এই বিদ্বেষ তাকে শক্তি দিল, জরো রোগীকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল। রাগ মাথায় চড়লে না কন্ধ পথের গাছপালা কেটে ফেলে, পাথর গড়িয়ে ফেলে দেয়?

সকাল হয়েছে, গাল দিয়ে মিণিআপায়ুর মুণ্ডপাত করতে করতে কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ঠুক ঠুক করে। দেখলে কেবল মনে হবে রোগা

দুর্বল আধ বুড়ো নিরাশ্রয় কন্ধ একটি, কোথায় কোন দূর পাহাড়ের ভিতর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছে, ঘোলাটে চোখে মূক অর্থহীন দৃষ্টি, উৎপীড়িত দরিদ্র অসহায় মানুষ।

॥ ছিয়াশি ॥

বন্দিকার গাঁয়ে পিওটি পথ চেয়ে বসে ছিল, সেই ঝোরার পথ দিয়ে পার হয়ে দিউড়ু সাঁওতা আসবে, মিণিআপায়ু গাঁয়ের সাঁওতা। এই রকমই ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন—অসময়ে; এখন প্রবল বর্ষা, বর্ষা ঋতু। ঝোরায় গেলে সেই দিনের কথা মনে পড়ে, নিরাশ হয়ে সে ফিরে আসে। এক একদিন বাদলা অন্ধকারে বারান্দায় বসে বসে ভাবে ভগবান দয়া করে তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন কেবল ভেবে মরতে, ঘটনা আপনাআপনি একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে যায়, জড়িয়ে যায়, ফলাফলের ছবি এঁকে দিয়ে মনকেকষ্ট দেয়। এই অল্প বয়সেই অভিজ্ঞতা তার কম হয়নি। দক্ষিণের শহরতলি, কত সোমাইয়া, সংগন্না, পেণ্টাইয়া।

ভাবে পুরুষের স্বভাবই এমনি, তার অভাব মিটলেই সে কোথায় উড়ে চলে যায়। নারীর স্বভাব তার উলটো, যত সে চেনে ততই সে ভর দিতে হেলান দিয়ে পড়তে চায়। মনে পড়ে তার সখী পিয়াড়ি-তেলিআম্মার উপদেশ—গা ছাড়া দিয়ে থাক, দূর্ দূর কর্, তবে তুই জিতবি, তারা হারবে, —তবে তুই হাসবি, তারা কাঁদবে, নুঙ্ নুঙ্ করবে তোর পায়ের তলায় কেনা গোলাম হয়ে। সখী পিয়াড়ি-তেলিআম্মা সুন্দরী বটে, কোমরে সোনার কোমরবন্ধ করেছে, হাতে বাজুবন্ধ, কিন্তু কি নির্দয়া হৃদয়হীনা সে, বাজালে কাঁসার ঘটির মতন ঠাঁই ঠাঁই করে বাজে। বলে, এই নীতিতে চলে একবার প্রাণটা পোড়াবার পরে তার ছাইয়ের উপরে কোঠাঘর তৈরি করতে পেরেছি। ভাল আছি আমি। দেখ্, শেখ্।

শিখতে পারা গেল না, যার ধরন যেমন।

দিউড়ু সাঁওতাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে নিজেই পায়ে ফাঁস পরেছে সে। কেবল পেটের দায়ে অন্যান্য কন্ধনীদের মতো

পাতার বর্ষাতি বেঁধে আর মাথায় পাতার ছাতা নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সে যায় ক্ষেতের কাজ করতে, পাহাড়ের উপরে মাটি খুঁড়তে। সব অভ্যাস হয়ে গেছে, হাতে ঘাঁটা পড়ে গেছে, পায়ের তলা বালি খেয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গেছে চালুনির মত। কোনো দিন এর জমিতে কোনো দিন তার জমিতে কাজ। বীজ বোনা, রোয়া, নিড়ানো, জলের নালা কাটা। সবই করে সে, কিন্তু তার এক একটা কাজে ধরা পড়ে তার বিদেশী ধরন। যুবতীরা কাজ করতে করতে গান ধরলে তাতে সে সুর মেলাতে পারে না, সকলের সামনে লাউয়ের খোল থেকে পাতার দোনায় ঢেলে সড়র সড়র করে মাড়ুয়ার ফেন খেতে তার কুণ্ঠা বোধ হয়, চাল চলন চটক চাউনিতে ফুটে ওঠে পিয়াড়ি-তেলিআম্মার দেশের ঢং। কিন্তু এখন আর কেউ তাকে ঠাট্টা করে না, কেউ তাকায় না নতুন মানুষকে যাচাই করবার প্রবৃত্তি নিয়ে, তাদের ঘর অসহায় বিধবার ঘরের মধ্যে ধরা হয়, তারা গ্রামের অভাগা প্রজা, এক বুড়ী আর তার মেয়ে, শুধু মজুর, দলের করুণার পাত্র। বেশী মেলামেশা করতে পারে না। সাঁওতা হাগুর্ণা কন্ধের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না। হোক সে কৌপীন পরা কন্ধ, সে পুরুষ, সে তার গুমর জানে। নিঃসঙ্গ সহানুভূতিহীন এই বর্ষা ঋতুর মতনই কাঁদনভরা, ভিজে, সেঁতসেঁতে তার জীবনটা পিওটি কাটিয়ে যাচ্ছে কোন হতভাগ্য মালভূমির উপরে। আশার আলোর এক ঝলক রেখাও কোথাও দেখে না, যেদিকে তাকায়, কেবল অরণ্য, মেঘ, ঝোরা, নালা, অন্ধকারে ছল ছল জল, উলটো পৃথিবী। শুধু বাতাস আর বৃষ্টি, আর—কি শীত। ভরসা আসেনা, পথ দেখা যায় না, পরিস্থিতি মাটিতে ঘাড় ধরে নুইয়ে দেয় কেবল আর সকলের সঙ্গে যন্ত্রের মতো কাজ করে যেতে। কেবল দিন কাটিয়ে দিতে হবে।

কেবল ভাগ্যবাদী নগণ্য মানুষ এই কন্ধ, ইঁদুরের মতো মানুষ, শেয়ালের মতো মানুষ। সে আশার নোঙর তুলে নিয়ে প্রকৃতির স্রোতের মুখে ভেসে চলে যায়, উড়ে চলে যায়, কপালে যাই থাক।

সে নিজের বড়াই করতে শেখেনি, এক আরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে যার আলাদা বড় হয়ে উঠতে শেখেনি, আলাদা হয়ে যুদ্ধ করতে শেখেনি, মুজরা দিতে শেখেনি।

কেবল শুওরের মতো গোঠের জীবন এদের, দল বেঁধে চলে দল বেঁধে

বেঁচে পরস্পরের নিশ্বাসের তাতে শরীর গরম রেখে শীত আর বর্ষা পার করে দেওয়া এদের রীতি। দলের মধ্যে ধনী দরিদ্র ভেদ নেই, সবাই সমান। একই রকমের গন্ধ, একই রকম অর্ধনগ্ন, এক ভাব, এক ধ্যান। সকলে মিলে পালা করে সকলের জমি চাষ করে দেয়। পয়সার মূল্য নেই, পয়সার গর্ব নেই। কোমরের সোনার কোমরবন্ধ, হাতের কাঁকন—কি জানে এই মূর্খ কন্ধ কি গর্ব জমাট হয়ে থাকে তার মধ্যে। মজুরি খেটে খেটে এখানে কেউ দেবে কেবল মাড়ুয়া, কেউ দেয় কেবল মদ, কেউ বা কেবল ধুঙ্গিআ। কেউ বলেও না আরো দাও, কারো দুঃখ নেই তা নিয়ে, তাই এই অন্ধ রাজ্যে সুন্দরীকে বশ করতে কেউ বারো হাত দক্ষিণী শাড়ী উপহার দেয় না, কেউ টাকা দেখায় না, আদর করে সোহাগ করে নিজের ধন সম্পত্তির ব্যাখ্যান করতে বসে না। মুজরা নেই, মউজ নেই। পশু—পশুর অধম এরা, সভ্য দৃষ্টি নিয়ে পিওটি কন্ধনী বিচার করে দেখে, তার হাবভাব, তার চটক সব এখানে বৃথা।

তবু মিণিআপায়ুর সাঁওতাকে সে ভালোবেসেছিল। সেই নির্বোধ পশু, বলিষ্ঠ পশু এসে হাত চেটেছিল তার, বড় বড় চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বলেছিল : বলে দে—আমি কেমন করে মরলে তুই খুশী হবি। তুই যদি বলিস্ তাহলে এই পাহাড়ে বার বার গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আমি মরতে পারি, গাছ ওপড়াতে পারি, দূর থেকে ছুটে এসে শিঙের গুঁতোয় বড় বড় পাথর গোড়া থেকে উপড়ে, পায়ের খুরের ঘায়ে ঝোরাতে গড়িয়ে ফেলে দিতে পারি। দেখবি একবার?

সেই বলিষ্ঠ পশুকে সে ভালোবেসেছিল, রাশি রাশি গাছ আর পাথরের এই অজানা পৃথিবীতে তার ঐ একটি বন্ধু, মিণিআকর দিউডু সাঁওতা।

মায়ের মন খুশী হত, হিকোকা হার্গুণা বাছাধনের গর্ব খর্ব হত, কন্ধ সমাজে নাম ডাক হত, আর—এই বর্ষার ঠাণ্ডায় মাকড়সার জালে ভরা শুকনো পাতা দিয়ে গাঁথা বর্ষাতিতে গায়ের তাত বাঁচিয়ে রেখে বনে বাদাড়ে কাদায় পাথরে খেটে মরতে হত না বুঝি। সংগন্না সোমাইয়ার মতো নয় সে, সাত জন্মেও হতে পারবে না, কিন্তু এখানে তাদের পাওয়া যাবে না।

দিনের শেষে ধোঁয়া আর মদের গন্ধে চেতনা-ডোবানো গোষ্ঠীর আড্ডায় সে যেতে পারে না, মনের দুঃখ মনেই চেপে নিজের কুঁড়ে ঘরে সে পড়ে

থাকে। প্রথম প্রথম সে কি চুলবুল করা তার প্রতি সন্ধ্যায়, এখন তা নেই। ঠাণ্ডায় কালিয়ে যাওয়া ভিজে ভিজে সিঁটকে যাওয়া মুখে তেল মাখতে তার হাত ওঠে না, চুল বাঁধতে ভুলে যায়, মোটা ময়লা কাপড় পরে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, অবিরাম বৃষ্টির শব্দ শুনে ঘুম আসে না সন্ধ্যে রাতে,—হাঁই পাঁই করে মনে মনে, মুখে কথা নেই।

তার মনের অভিমানকে উপহাস করে সেই বর্ষা রাত্রে কার বাড়ী থেকে ঢোল মাদলের আওয়াজ শোনা যায়, কারও বাড়ি থেকে জোড়া বাঁশির। যে ঋতু তার মোটেও ভালো লাগে না সেই ঋতুতেই এই জাত আনন্দ করে তাদের শেয়ালের গর্তের মধ্যে, মদ উষ্ণতা আনে, ধুঙ্গিআয় মুখ খোলে, ছোট হোক বড় হোক এই পাতার ঘরগুলিই তাদের স্থিতিবান্ জীবনের আশ্রয়ময় ভিত্তির পরিচয় দেয়, বৃষ্টি তাদের ভাসিয়ে নিতে পারে না।

মা আর মেয়ে, শুধু দুই জন। মাকে সহ্য করা যায় যখন সে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলে না, বলে না "একলা কেন বসে আছিস্ মেয়ে, যা না পাড়ায়।" কিন্তু গুমসানী এসে জোটে, শলপু কন্ধ খোঁজ খবর নিতে আসে, উপদেশ দিতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে। মেয়ের মুখের উপর সেই আঁধার রাতে বার বার পাংগিআনী ডিসারীকে শুধোয়, "নক্ষত্রদের কাছ থেকে কোনো জবাব পেলে ডিসারী—এই পিওটির কপালের ভালোমন্দের কথা ?" বিষের মতো লাগে, ছটফট করে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পথ অন্ধকার, মাল দেশের কন্ধ বস্তি, কোথায় যাবে সে ?

বাদলা যতই বাড়তে থাকে কেবল মনে পড়ে দিউড়ু সাঁওতার কথা। মনের ভিতর তার দাবিয়ে রাখা ইচ্ছা তাকে বসে বসে একটু একটু করে গড়ে, শক্ত করে, ভরসা দেয়—নিশ্চয় সে আসবে। মনে মনে কত খেলা খেলে। কখনো বুক দুম দুম করে, কান গরম হয়ে ওঠে। আবার সব নেমে যায়, শুকিয়ে যায়, মুখখানা কালো হয়ে ওঠে। পাহাড়ী বৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে পিওটি ভাবতে থাকে—সে আসবে না, বর্ষা ফুরাবে না, পিওটি এইখানে মরবে, আঁধার ঘুচবে না, সূর্যের মুখ আর দেখা যাবে না।

আপন মনেই স্বীকার করে পিওটি—সে ছোট নয়, সামান্য নয়, কেউ তাকে কাঠের পুতুল বানিয়ে নাচাতে পারবে না, দক্ষিণের সেই শহরগুলিতে

কত শিক্ষা কত উপদেশ পেয়ে কঠিন জীবনের নির্মম সংঘর্ষের মধ্যে ঠেকে শিখে সে বড় হয়েছে, পরীক্ষা দিয়েছে, কত বার জিতেছে, জিতেছে আর দূর করে দিয়েছে, আজ সে সব জিৎ তার হার কেবল—জীবন নিঃসঙ্গ।

কিন্তু সে ভেবেছিল বুঝি মোহের বয়স তার কেটে গেছে, অল্প বয়সেই অভিজ্ঞতায় ডাঁটো হয়েছে তার মন। যে সমাজে সে বড় হয়েছে সেখানে মোহকে ভেঙে ফেলা হয় হাতুড়ির ঘায়ে। ব্যবসায়ীর কাল, মনের রোগ দেহের রোগ সেই মোহ। জীবনের সরের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া সব জায়গা থেকে কেবল লাভ নিয়ে, কোথাও লোকসান না দিয়ে, আটকে না গিয়ে, ডুবে না গিয়ে, হাতে হাতে ধরাধরি করে, উপহার সংগ্রহ করে করে চলা, সারা দিনের অনুভূতি একত্র করে পর দিন ফুলদানির শুকনো ফুলের মতো সেগুলো ফেলে দেওয়া, নতুন ফুল তোলা—এই মালিনী সমাজে সে বেড়ে উঠেছিল। কোথায় সেই শিক্ষা? কোথায় সেই সংযম? কিসের চটকে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বসল সে?

মনকে শুধোয়, বুক পাথর করবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মানুষ পাথর নয়, রক্ত মাংসের দেহ তার। মানুষ কল নয়, ভুল করা তার স্বভাব। পিওটি অস্থির হয়, মাল দেশে পুরুষ তার চোখে মিণিআকার দিউড়ু সাঁওতা।

আষাঢ় যায়, তার যাওয়ার ঘণ্টা কন্ধদের আমের আঁটি ছেঁচার পর্ব, টাকু পর্ব, বাঘ দেবতার পূজা। যখন তখন বনস্থলীর ভিতর থেকে বাঘ দেবতার রক্ত-জল-করা গর্জন শোনা যাচ্ছে। তাকে শান্ত করতে হবে। এতেও নির্ঘণ্ট অনুসারে বিধান, কন্ধ ডিসারী 'রোহিণী' যোগ ধার্য করে দিলে, জানী আর ডিসারীর মন্ত্র পাঠ, রেজুণীর কিলকিলা রব আর নাচ। আমের আঁটি জড়ো করে ছেঁচে, মুরগীর ছানার গলা ছিঁড়ে, মাটিতে তার রক্ত ঢেলে, মদ ঢেলে পথের মাঝখানে হাঁটু সমান উঁচু ছোট্ট ছায়ামণ্ডপের উপরে ফুল, মুরগীর ডিম, ভাত আর 'মুরুজ' সাজিয়ে গ্রামের কাছের জঙ্গলের ভিতরে ঢোল মাদল বাজিয়ে টাকু পর্ব উদ্‌যাপন হল। গাছ তলায় বাঘের গায়ের মতো চিত্র করা কাঠের তলোয়ার, বর্শা। ভারে ভারে আমের আঁটি তুলে রাখা হল, অন্য খাদ্য শেষ হয়ে গেলে এই আঁটির ভিতরকার শাঁস

জাউ করে খাওয়া যেতে পারবে, গোল সাগু গাছের কাঠ ছেঁচে ভিতর থেকে ধুলোর মতো গুঁড়ো বেরোয়, তাই রান্না হবে।

টাকু পর্ব গেল, কিন্তু বাঘ দেবতা শান্ত হল না, খবর আসছে বনের ভিতরে বাঘ গরু ধরে ধরে খেয়ে ফেলছে, কোথাও কোথাও এক একটা মানুষও। চম্পি সাহুকারের মোষের গোঠের পাহারাদার দু'জন বাঘের পেটে গেল। তার পর খালকণার বারিক বুড়ো। মিটিং গাঁয়ের লোকেরা লচ্ছিপুর হাটে আসছিল, সেই দল থেকে এক জন কামারকে বড় বাঘে তুলে নিয়ে গেছে। বড়-শংকা গ্রামের এক কন্ধ বাঘের সামনে পড়েছিল, কপাল জোর ছিল তাই দেশী বন্দুক ফুটিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। বাদলা দিনে বাঘের গল্প। খবর যেন কেমন করে কোথা থেকে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে। যারা মরল তাদের কথা ভেবে যারা বেঁচে থাকে তারা জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে দেবতাকে নমস্কার করে—বিপদ না ঘটে।

রোজ শুনে শুনে গা সওয়া হয়ে যায়। জল ঝড় নিত্যি দিনের দৃশ্য, পরিবর্তন নেই। বর্ষা বেড়ে চলেছে, কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়েছে। কত বীর কত দুঃসাহসী পড়ল জর কাশি বুকব্যথায়। যেদিকে তাকাও জঙ্গল বেড়ে যাচ্ছে। চেনা পথে গাছ গজিয়ে পাথর গড়িয়ে এসে পথের চেহারা বদলে গেছে। ঝোরা নালা ভরে জলের গতি এসেছে মন্থর হয়ে। দশ হাত চওড়া ঝোরাকেও বিশ্বাস নেই, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ডুবিয়ে দেবে। অন্ধকার আর মেঘের বাষ্পের নীচে বড় বাঘ হয়তো ঘাপটি মেরে আছে। নদীতে হয়তো 'ষাঠী' সাপ, সুতোর মতো, ষাট হাত লম্বা, গায়ে জড়িয়ে যায়, চোখ খুবলে খায় নাকি লোকে বলে। সব ভয় অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়লেও অতিশয় পিছল শেওলা ধরা খাড়া ঢালু পাথরে পথে ঝড়ো বাতাস দুদর্শার এক শেষ করে, সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে পা ফসকালেই প্রাণটি গেল।

কাজ-কর্ম বন্ধ, ভীষণ বৃষ্টি, চেতনা-ডুবানো বৃষ্টি। পিওটি শুধোয়, "কত কাল ধরে এমনি চলবে, মা?" তার প্রশ্নে তীব্র অভিমানের সুর মা ধরতে পারে না। আশ্বাস দিয়ে বলে, "আর কত দিন, তেমন বেশী দিন ধরে চললে বীমা রাজার পুজো দিয়ে বৃষ্টি কমিয়ে দেবেনা লোকেরা?" পূজো দিলে বৃষ্টি বন্ধ হবে, আবার পূজো দিলে বৃষ্টি ঢালবে। রোজ রোজ পূজো

দেখে দেখে পিওটি জ্বালাতন। "এই রকম চললে এখানে আমরা বেঁচে থাকতে পারব তো মা? দেখ্ তো কি হয়রানি! কি অসুবিধেটা হচ্ছিল তল দেশে?" মা এর জবাব দেওয়ার গরজ করে না। এই বনের মুলুকে নতুন নতুন যারা আসে, একটানা কুড়ি দিন পঁচিশ দিন সূর্য না থাকা আঁধার দিন দেখে, প্রথম এই রকমই ভাবে তারা, পরে সয়ে যায়। তাই বলে এর বদলে তল দেশ! বুড়ী ভাবতেও পারে না। এমন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে মানুষ আর কুকুর এক সঙ্গে গুটিসুটি হয়ে আছে ঘরে ঘরে, মজুরিপত্র বন্ধ, তবু খাবার জোটে, নিজের ঘরে না থাকলে সাঁওতার বাড়ি থেকে আসে। নিজের দেশে ভালো মন্দ কিছু ঘটলে সাহায্য করবার জন্য সবাই আছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে, তল্‌রা-তল্‌রি গায়ে দিয়ে জলে ছপর ছপর করতে করতে গুমসার বুড়ী এসে হাঁক দিলে—"ওলো পিওটির মা, ওলো পাংগিআনী, ঘরে আছিস্?" পিওটি পাশের ঘরে রান্না বসিয়েছিল। গুমসানীর আজ যেন বড় উৎসাহ। "দে দে, ধুঙ্গিআ দে। উঃ, ভারী শীত! হাঁ, শুনেছিস্ তো?"

পাড়ার খবরকাগজ বুড়ী, ঐটুকু শখ তার।

"শুনেছিস্ পিওটির মা? মিণিআপায়ুর সাঁওতার কাকা এসেছে!" ও ঘরে পিওটি চমকে উঠল। টাট্‌কা খবর, তাজা খবর, ভালো খবর। পিওটির মা অন্যমনস্কভাবে বললে, "অ্যাঁ?"

"মিণিআপায়ুর লেঞ্জু গো, সরবু সাঁওতার ভাই। আহা, বড় ভালো লোক ছিল সরবু সাঁওতা।"

তাড়াতাড়ি বলে না কেন বুড়ী? এই ঘোর ঝড-বৃষ্টিতে কাকা কি একলা এসেছে, সঙ্গে ভাইপো নিশ্চয়ই এসে থাকবে।

"কত দিন হল দেখিনি গো, কি দশা হয়েছে তার। আহা, সরবু মরে গেল, ঘরটা উজাড় হয়ে গেল।"

দিউড়ু সাঁওতা কোথায় গেল? কি এনেছে এবার, সেবারের মতো মোয়া? আসছে হয়তো; কিংবা হয়তো না, সোজাসুজি আসা বুঝি তার অভ্যাস নয়।

"শুনেছিস্ পিওটির মা, গোটা গাঁয়ে যেন হাট বসেছে। এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কেমন করে এল? বেঁচে কেমন করে এল? অবাক হয়ে যাই!

জ্বরে পড়ে আছে সোভেনার ঘরের দাওয়ায়, কত কি বকছে—হায়, এই ছিল দিউড়ুর কপালে—দিউড়ুর মতো ছেলে—এই সব।”

“কি হয়েছে, কি হয়েছে দিউড়ুর?” পিওটি চেঁচিয়ে উঠল, “মা, তুই তো তাকে দেখেছিস্ সেবার—আমাদের এখানে এসেছিল—’

গুমসানী কিছু না বলে তামাকপাতা চিবুতে লাগল, অতি অবজ্ঞার সঙ্গে একবার চেয়ে দেখলে মেয়েটার দিকে। পিওটি চুপ করে গেল, বুকের ভিতর দুর দুর করছে, নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইল। দিউড়ু কখনই আসেনি।

খারাপ খবর—হাঁ, নইলে জ্বর নিয়ে কি আসত তার কাকা?

গুমসানী বলতে লাগল। ধীরে ধীরে পিওটির দুশ্চিন্তা কেটে গেল। তার মুখে ফুটল নীরব হাসি। গুমসানী বলে যাচ্ছে—দিউড়ু তার কাকাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, নিজের স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করছে, মদ আর গোঁয়াতুর্মির জন্য কত অন্যায় অসঙ্গত কাজ করছে সে। নিষ্ঠুর নির্মম নীচ পাষণ্ড দিউড়ু সাঁওতা।

দুই বুড়ী সমালোচনায় লেগে গেল। হাগুর্ণা সাঁওতা মিনিআপায়ুর লেঞ্জু কন্ধকে অভয় দিয়েছে, সাহায্য দিয়েছে, এখানকার রায়ত হয়ে থাকায় কোনো বাধা হবে না। লেঞ্জু চায় সে ভালো হয়ে উঠলে বনের মধ্যে একটা চাষ ঘর খুলবে। সেকেলে ধরনের কন্ধ, কেবল হাত পেতে নেওয়া সে পছন্দ করে না। লোকেরা তার প্রশংসা করছে, সে গাঁয়ের অতিথি। সকলে দিউড়ুর নিন্দা করছে—বোনের অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়েছে, কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছে, তার জঙ্গলে অন্য গাঁয়ের গরু গেলে আর রক্ষা নেই, কোথায় সে হারিয়ে যায়, সর্বদা মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে, অমানুষ।

পিওটির মনে প্রথম আশ্বাস এই যে দিউড়ু ভালো আছে। দ্বিতীয়তঃ মনে উল্লাস: কোন অজ্ঞাত কারণে দিউড়ু তার স্ত্রী আর ছেলের দিকে চায় না, বাকী সব বাজে খবর, বৃথা খবর। তার মনের ছবির সঙ্গে এ সব শোনা কথা কোথাও খাপ খায় না, দিউড়ু এলে মাথা উঁচু করে সব বুঝিয়ে দিতে পারবে।

যতই নিন্দা শুনুক, তার বিশ্বাস হয় না যে দিউড়ু খারাপ। বলুক লোকে তাদের যা খুশি।

দিন কত গাঁয়ে চলল সেই আলোচনা। সোভেনার ঘরের বারান্দার অর্ধেকটা বাঁশের টাটি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেইখানে একটি লোক বসে থাকতে দেখা যায়। হাত পা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে আধবুড়ো মানুষ, মুখখানা ভয়ঙ্কর, ছোট ছেলেপিলেরা কাছে ঘেঁষে না, স্ত্রীলোক দেখলে তার চাউনি বিকৃত হয়ে লেপটে থাকে যেন, বসে বসে ধুঙ্গিআ টানে, খকর্ খক্ খক্ কাশে।

দিউড়ুর শত্রু সে।

গাঁয়ের অতিথি।

রোজ সন্ধ্যায় গুমসানী আনে মিণিআপায়ুর সাঁওতার ঘরের খবর। কি সহানুভূতি সাঁওতার স্ত্রীর প্রতি, সন্তানের প্রতি, মনে হয় যেন তারা গুমসানীরই পেটের। ভেবে ভেবে পিওটি নিজের মনকে বোঝায় যে দিউড়ু গোয়াল সাফ করছে, ঘর ঝাঁটাচ্ছে, হয়তো হঠাৎ একদিন এসে পড়বে। নিজের কথা ভেবে পিওটি বুঝতে পারে, এত বিপদের মধ্যেও তার থেকে গেছে একটা মন। এইটুকুই দুর্বলতা নিজের সে ক্ষমা করতে পারে।

॥ সাতাশি ॥

ঝড়—তুফান—বৃষ্টি। বারবার—বারবার সব কিছুর শিকড় শুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়ে উপড়ে দিয়ে যায় সে। বাইরের দিকে তাকানো যায় না। মানুষ ভিতরের দিকে চায়, মাপে, তুলনা করে, ওজন করে, ব্যাকুল হয়, অস্থির হয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থাকে কখনো একটা কিছু ঘটবে হয়তো, সে কবে—কবে— ?

কিছু ঘটে না, যা হাতে নিয়ে চোখে দেখে সে বলবে—হাঁ, ঘটেছে, এরই জন্য ছিল তপস্যা। বাহ্য প্রকৃতি শুধু একটা পটভূমি হয়ে মানুষকে দেখিয়ে যায় তার নিজের চিন্তাগুলিকে, বর্ষার আঘাত লেগে প্রতিঘাত করে বেজে ওঠে মনের ভিতরের বেসুরো রাগিণী, বিচ্ছন্দ, বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ।

তেমনি মাড়ুয়ার সঙ্গে আমের আঁটির শাঁস আর তেঁতুল বিচির শাঁস মিশিয়ে ঘরের ঘরনীরা দুই বেলা খাবার তৈরী করছে, সেই পুরাতনের মতোই চলেছে গ্রামের রীতি, সেই পুরাতন ছবি বর্ষাকালের, তেমনি চারিদিক ঘিরে

ছোট ছোট কুটীরগুলিকে কাঁপিয়ে দুলিয়ে চলেছে মাল দেশের বর্ষা। সবই পুরানো।

লেঞ্জু কন্ধ চলে গেছে। হাল চালানো মজুর, গরুর আগলদার, হাটের লোক, সকলের মুখে মুখে কেমন করে জানি খবর এসে পৌঁছেছে যে সে বন্দিকার গাঁয়ে আছে। দিউড়ু সাঁওতা শোনে, মতামত দেয় না। মোষের মতন গুম মেরে থাকে। কম কথা বলে। বারান্দার উপরে চুপ করে বসে একটার পর একটা ধুঙ্গিআ চুরুট ভস্ম করতে থাকে। সব তাতে তার বিরক্ত লাগে। গাঁয়ে সব কথা সবাই জানে, কিন্তু ভালোমন্দ আলোচনা করতে কেউ আসে না।

ঘটনা ঘটে গেছে, লেঞ্জু কন্ধকে সে তাড়িয়ে দিয়েছে, মন অপেক্ষা করে আছে যে কেউ যদি এসে তাকে গালি দিত, কেউ এসে ধমক দিত, সে কৈফিয়ৎ দিত, বুঝিয়ে বলত। কেউ সে খোঁজই করে না। এই পথে যেতে যেতে সেদিন জাম্বা কন্ধ যেন কেমন গড়িমসি করছিল। বুড়ো জাম্বা কন্ধের বার্ধক্যের প্রতি দিউড়ুর পূর্ণ সহানুভূতি। চোখ নিচু দিকে করে দিউড়ু অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু জাম্বা কন্ধ দাঁড়াল না। সারাদিন বসে বসে সে কি ভাবে, পুয়ু দেখে দেখে যায়, কিছু বলতে সাহস পায় না। দিউড়ু চেয়ে থাকে। ঐ কুঠরিতে লেঞ্জু কন্ধের খাটিয়া পড়ে আছে। ছেঁড়া কাপড় কানি ঝুলছে। পুরানো ফাটা তম্বুরা-তম্বুরি দেওয়ালের গায়ে ঠেসানো রয়েছে। সেই কুঠরিতে তার লাঠিগাছটি আছে। এই পায়রার খোপের ভিতর থেকে সকাল হলে মানুষটা বাইরে বেরুত, যার কথা একবারের বেশী দু'বার সে ভাবেনি, রাগে ঈর্ষায় অবহেলায় যার সঙ্গে মনের অদল বদল। খালি ঘরখানার দিকে অনুভূতিহীন চোখে চেয়ে থাকে সে। ঘরখানি তেমনি পড়ে আছে, কেবল পরিষ্কার করে ফেলার মতো আছে অতীতের স্মৃতি মেশানো একটা না থাকা মানুষের ছায়া সেখানে। ঘরের চালের নীচে চড়াই পাখী এদিক ওদিক উড়ছে। ফাঁকা—শূন্য—সেই দেয় দিউড়ুকে জবাব।

কত দিন হয়ে গেল না, কত বছর হয়ে গেল? তেমনি বর্ষা লেগে আছে। সময়ের হিসেব সে রাখেনি, লেঞ্জুকাকার কুঠরিটি তেমনি এক ধারে চোখের সামনে মাল দেশের আঁধার, বৃষ্টির শরবর্ষণ, গলিপথে জল, পিছনে যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্যহীনা এক স্ত্রী—তার পুরুষত্বের পূর্ণচ্ছেদ।

একটা ছেলে, চীৎকারে কান ঝালাপালা করে দেয়। চারিদিক থেকে বিদ্রূপ আর ধিক্কার, লুকিয়ে লুকিয়ে চুপি চুপি মনে এসে বেঁধে। গুম হয়ে দিউড়ু বসে থাকে। দসরু কুকুরকেও মারে না, তাড়া দেয় না, পিছন দিকে শীতে লোম খাড়া করে দসরু কুকুর শুয়ে থাকে। কত যুগ হয়ে গেছে?—সেই প্রথম বারের মতোই এক হাঁড়ি মদ নিয়ে বারিক আসে সন্ধ্যায়, দিউড়ু সাঁওতা গর্জন করে—"বারিক", বারিক মদ এগিয়ে দেয়। তার পর আর কোনো কথাবার্তা হয় না। বারিক নিজের ঘাড় বাঁচিয়ে চলতে জানে। মদ গিলে, আঁধার গিলে, অনুশোচনা গিলে দিউড়ু সাঁওতা প্রস্তুত হয়—ঘটনা ঘটবে, ঘটনা ঘটবে। অন্ধকার যেন কেমন বেড়েই চলেছে, পথে চলাচল বন্ধ, ক্ষেতে ফসল আপনি বাড়ছে, যে যার ঘরে রয়েছে। দিউড়ু কেবল উদাস হয়ে বসে আছে। চিন্তা করবার অবসর পেয়েছে। গোলমাল করবার কেউ নেই, সমাজ তাকে ভুলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টিটা কমেছে, ঘোর অন্ধকার। বারিকের আসবার সময় পার হয়ে গেছে। পাড়ার বারান্দায় বারান্দায় ঘরের আলোর আভাস ছিটকে পড়েছে। অন্ধকারে কে যেন আসছে। এই, মদের গন্ধ, মদের গন্ধ! দিউড়ু সাঁওতা নেমে পড়ল রাস্তায়।

"সাঁওতা—"

"কে রে—?"

"আমি সোনাদেঈ, মদ এনেছি?"

"বারিক কোথায় গেল?"

"বুকের ব্যথায় পড়ে আছে, সাঁওতা।"

কেবল অন্ধকারে গড়া একটি মূর্তি, কিছু দেখা যায় না। মদের হাঁড়ি নেবার জন্য হাত বাড়াতে হাতে ঠেকল সোনাদেঈয়ের কোমল বাহু। নিটোল নরম মাংস। আকৃতিটি পোতা খুঁটির মতন দাঁড়িয়ে আছে, সরে যায় না।

"এনেছিস?"

"হুঁ।"

তেমনিভাবেই তার হাত ধরে থেকে তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে মদের হাঁড়ি ধরল দিউড়ু। একটু খেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আজ তুই এলি যে?"

"হুঁ।"

"তোর বর—?"

"বুড়োর বুকে তেল মালিশ করছে।"

"তুরুঙ্গা— ?"

অন্ধকারে হাসি শোনা গেল। মদের উষ্ণতা রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে। হাসতে হাসতে সোনাদেঈ বলল, "তুরুঙ্গা ভয় পেল আসতে।—আচ্ছা আমি যাই সাঁওতা।"

দিউড়ু কিছু বলল না। অন্ধকারের মূর্তি দু'পা গিয়েছে কি না দিউড়ু ডাকল—"এই—" সোনাদেঈ থামল। দিউড়ু তার পিছু নিল।

আজ এত দিনে ঢেকে রাখা মনের ভিতরের আঁধার পাহাড়ের তলায় তলায় স্রোত চলেছে, সড় সড় করে ধসে পড়ছে চাঙ চাঙ অন্ধকার। বাইরে অন্ধকারের বিরাম নেই, ঝিম ঝিম করে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আজ দিউড়ুর মনের অন্ধকার ছলকে উঠেছে, চেতনা ডুবিয়ে ছুটছে অজ্ঞানের বেগ, কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিছু বুঝতে পারছে না। কালকের মতো মনে হচ্ছে যে বছর রাজা মরেছিল। নন্দপুর অঞ্চলে বরিগিমুঠা পাহাড়ী মালে আর পট্টাঙ্গীর কাছের পাহাড়ে বয়েছিল এমনি আঁধার স্রোত। পাহাড়ের নীচে ছোট ছোট গ্রামে বস্তিতে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছিল, মনুষ্য বসতির স্বস্তি, গরম আরামের উপর পাহাড় ধসে পড়ল। গ্রাম নিশ্চিহ্ন হল, মানুষ নির্মূল হল। যুগ যুগের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিল যে তুঙ্গ গিরিচূড়া সে হঠাৎ ভেঙে পড়ল, সেখানকার রূপ বদলে গেল চিরকালের মতো। কে জানত ? কে ভাবতে পেরেছিল যে পাহাড়ের তলায় কোথায় জল উথলে মাটিকে নরম কাদা করে দিচ্ছে ? কে খোঁজ করতে গিয়েছিল পাহাড়ের চাপ কতটা, কি ভাবে বেড়ে চলেছিল দিনের পর দিন ধরে অবরুদ্ধ বিপ্লবের বেগ সেই বিরাট অসুরের মতো বুড়ো পাহাড়ের জড় বোঝার তলায় তলায় ? ঘটনা ঘটল, ধসে পড়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল সব রসাতলে।

অন্ধকারের ছায়া চলেছে, মুখে কথা নেই, চলেছে আগে।

শাস্তি দেবে হয়তো—গাঁয়ের সাঁওতা, গোষ্ঠীর রক্ষক, দলের মাথা। পিতৃপুরুষদের সৃষ্টি এই জাতির রক্ত যেন ঘোলা না হয়, গোষ্ঠীর বনিয়াদ মজবুত থাকে, কন্ধ সংস্কার অ-কন্ধ না হয়। নানা রকম বেড়া, জল ঢুকবে

না, বাতাস ঢুকবে না। মরে হেজে যাওয়া পূর্বপুরুষদের নির্দেশ! জাতিকে অটুট রাখবার জন্য কত রকমের বিধি-বিধান আর বিদ্বেষের সংস্কার, রক্ত ঢেলে হয় তার শাস্তি।

ঐ যাচ্ছে অ-জাতি। ডোম, পান, গণ্ডা, অজাতি। কন্ধ নয় সে, কন্ধ জাতির দ্বারা কবে কোন কালে বিজিত ডোম জাতি। কন্ধ জাতিতে মিশতে পারবে না সে, জন্মকাল থেকেই কত রকমের ধারণার বীজ বপন করা হয়েছে মানুষের মনে কেবল সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখতে। সে ডোম, হোক না কেন মানুষ, মানুষের মতন চেহারা, মানুষের মতো তার খাদ্য, তবু সে চোর, ডাকাতের জাত, অসৎ, গণ্ডা, পটকার, অস্পৃশ্য।

গোষ্ঠীর একজনকে অন্ততঃ গাঁয়ের বার করেই দিয়েছে সে। গাঁয়ের সাঁওতা শাস্তি দেবে, নির্মম কঠোর শাস্তি। সামান্য মেয়েমানুষ, সরু ঘাড়, এক দলা নরম মাংস, হাতের মুঠোয় রাখা যায়। ধীরে ধীরে মুঠো ছোট হয়ে আসবে, কন্ধ সাঁওতার শাস্তি, নির্মম শাস্তি। নীচে ধর্তনী, উপরে দমু। আমাদের দোষ লাগছে না, আমাদের পাপ লাগছে না, তুমি সৃষ্টি করেছ, তুমিই খাচ্ছ। হে দেবতা, আমাদের দোষ নেই। গাঁয়ের সাঁওতা শাস্তি দেবে। শাস্তি দিত।

গ্রামের কন্ধ বস্তি পেরিয়ে এসেছে, বারিকের ঘরের দিকে, নীচেকার চাষের জমির দিকে নির্জন পথ চলে গেছে। কেবল অন্ধকার। ধীরে ধীরে আঁধারী সোনাদেঈ চলেছে। পালাবার জন্য সে ব্যস্ত নয়, হারাবার মতো তার কিছু নেই। এই কুচকুচে কাজল-কালো রাত্রি, তারার আলোও নেই, সব তার গা-সওয়া হয়ে গেছে, জীবন হবে না এর চেয়েও কালো, এর চেয়েও নির্দয়। পিছনে পিছনে মদখোর সাঁওতা আসছে। সোনাদেঈ চলেছে। নির্জন পথ অর্ধেক পেরিয়ে সোনাদেঈয়ের গান গাইতে শখ গেল। প্রথমে গুন গুন করে তারপর নিজের কাছে ভরসা পেয়ে আরো স্পষ্টভাবে আরো গলা ছেড়ে। অন্ধকার রাত্রে একলা সে, চিন্তা নেই, ভয় নেই, বাপের বাড়ি কেলার গাঁ ফেরার পথে পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ে একলা ডোম ধাংড়ী গান ধরেছে। ডোমনীরা পথ চলতে গান গায়, গাঁয়ের আসরে ডোমনী গান শেখে। লোকে বলে মায়াবী জাতি ডোম, গান গেয়ে ভুলিয়ে দেয়, চটক দেখিয়ে চুরি করে নেয়। সোনাদেঈয়ের গভীর-মনে কুমারী-

যুগের গানের সুর বেজে উঠছিল, অন্ধকারের পাকেচক্রে সব মিলে আবার তার পুনর্জন্ম হয়েছে।

দিউড়ু সাঁওতা হাঁকলে, "সোনাদেঈ—ও সোনাদেঈ—গান গাইছিস ?"

উত্তরে এক রাশ হাসি। খান খান হয়ে ফেটে পড়ে টুকরো টুকরো পাপড়িগুলি আবার এক হয়ে জুড়ে যায়। আঁধার ঢাকা দিয়ে জ্যোৎস্নার মায়া মেখে ঢল ঢল ফুল সে একটি। ফুটে ওঠে, ছুঁতে গেলে ধুলো হয়ে যায়, আবার ফুটে ওঠে, আবার টুটে যায়, মানুষ-পশুর গভীর মনে তার তমসা-ডোরের অদেখা আঁকশি—কিছু নয়, সে শুধু একটা খেয়াল—।

"গান গাইছিস সোনাদেঈ—!"

"কেমন রাত, কেমন পথ, সহায় সাথী নেই কেউ, ভয় লাগছে, সাঁওতা!"

সোনাদেঈ আবার গাইতে লাগল। দিউড়ু সাঁওতা কাছিয়ে এল।

সেই রাত্রে। পুয়ু শুয়ে ঘুমাচ্ছে হাকিনাকে বুকের ভিতরে নিয়ে। ক্লান্তি-বিহ্বল মন তার জেগে থাকতে অক্ষম। স্বপ্নে বুঝি সে সুখের সন্ধান করছে। পরিষ্কার আকাশ, রোদ ঝলমল করছে। টুকটুকে লাল একটি পাখী তার ছানাটিকে সঙ্গে নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে—উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির শোভায় হালকা ভর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। ছানাকে খাওয়াচ্ছে, ঠোঁট মেলে ছানা খাবার নিচ্ছে। একবার পুয়ু পাখীর ছানাটি হয়ে ভাবে, আর বার সে হয় লাল টুকটুকে মা-টি। কখনো সে ঢেউ খেলানো মাঠভরা ফসলের সঙ্গে নিজেকে এক করে নিতে চায়, অমনি ঢেউ খেলে যায়, ভাবনা সামলাতে পারে না। পুয়ু তখন ছানাকে খাওয়ানো দেখে। চোখ দিয়ে কেন জানি তার বইতে থাকে জলের ধারা।

মাঝ রাতে দিউড়ু ফিরল। দসরু ডেকে উঠল, দিউড়ু ধমক দিয়ে খেদাল, দরজায় ধাক্কা দিল। পুয়ুর ঘুম ভেঙে গেল। চচ্‌ চচ্‌ করে হাকিনাকে শান্ত করে ঘুম-জড়ানো চোখে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে ফিরে এল। মদের তীব্র গন্ধ। দিউড়ু গর্জন করে কি বলছে। ঘুমের ঘোরে পুয়ুর মনে পড়ল যে সন্ধ্যা হতেই দিউড়ু বেরিয়ে গিয়েছিল, কিছু খায়নি। এখন আর ভালোমানুষি করতে ইচ্ছে হল না, পুয়ু আবার শুয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দিউড়ু আর বসে রইল না। বৃষ্টি বাদলা তেমনিই রয়েছে, তবু

তলুয়া-তলরি বেঁধে দিউড়ু ক্ষেতের দিকে গেল। আজ তার প্রতাপ বেড়ে গেছে, সকলের উপরে সে সাঁওতা। বারিকের বারান্দায় বসে সে বারিকের ছেলে বালমুণ্ডাকে দিয়ে জাম্বা কন্ধকে ডাকিয়ে পাঠালে। বারিক বুকের ব্যথায় অছিলায় ঘরের ভিতরে নেশায় বুঁদ হয়ে শুয়ে আছে। দরজার কাছে মুখ নিচু করে সোনাদেঈ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, শান্ত মসৃণ নির্বাক মাংসপিণ্ড এক দলা। চোখ তার ঘুম ঘুম, প্রতিদিনের মতো ছেঁড়া কাপড় পরে আছে, সাজে পরিপাটী কিছু নেই। দিউড়ু সাঁওতা জাম্বা কন্ধের অপেক্ষায় বসে আছে। সোনাদেঈকে তার কিছু বলবার নেই, মাথার মধ্যে একটা কথা যেন মনে পড়ছে—আঁধার রাতে কাল কে গান গাইছিল, কত বৃষ্টি ঢেলেছে তার পরে, রাত্রির কাহিনী ধুয়ে চলে গেছে অতল ঝোরায়। এই তার দেহ, নীরোগ, কর্মঠ, অটুট। এই তার গ্রাম, এখানে সে সাঁওতা। মনের মধ্যে কর্তব্যবোধ আছে, দ্বিধা নেই।

বালমুণ্ডার সঙ্গে জাম্বা কন্ধ এল। ডোমের আঙিনায় ঢুকতে ইতস্তত: করতে লাগল—দিউড়ু চেয়ে আছে। অবজ্ঞা আর ঘৃণা দেখিয়ে জাম্বা কন্ধ মুখে খানিকটা কাপড় চাপা দিলে, বার বার থুতু ফেললে। ছাঁচতলায় দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সাঁওতার সামনে।

"তোকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম, জাম্বা বুড়ো—"

"থুঃ—হুঁ—"

"দিন চারেক আমার ক্ষেতের কাজটা চালিয়ে দে।"

"অ্যাঁ?"

"দিন চারেক আমার ক্ষেতের কাজটা চালিয়ে দে। চল্ গুড়িআয় যাই।"

"আমি যাব? আমার কাজ কে করবে?"

"কথা রাখবি না? রায়ত হয়ে, সাঁওতার দরকার হলে তার কাজ করে দিবি না? আচ্ছা, না করবি তো করিস না—"

জাম্বা কন্ধ অবাক হল। হাঁ, সাঁওতা 'কাজ কর' বললে রায়ত কাজ করতে বাধ্য, কিন্তু কন্ধদের গোষ্ঠীমানা গাঁয়ে তো এর তেমন চলন নেই। সরবু সাঁওতা একআধ বার ডাকত বটে, কিন্তু খুব কম। আর দিউড়ু সাঁওতা তো একেবারেই ডাকা ছেড়ে দিয়েছিল। হঠাৎ এ কি আপদ!

"চুপ করে রইলি যে জাম্বা? ইচ্ছে না হয় তো 'না' বলে দে।"

ঢোক গিলতে গিলতে জাম্বা বলল, "না কেন বলব সাঁওতা? তবে গাঁয়ে এত রায়ত থাকতে এই বেগার আমার উপরেই কেন? আরো তো কত লোক আছে।"

"এত কথা আমি শুনব না জাম্বা। একা পড়ে গেছি, বেশী চাষ। তোর তো ছেলেরা আছে। তুই চার দিন কাজ করে দে আগে। অমন বেগার বেগার বলছিস কেন? এটা কি রাজার ঘরের বেগার? কাজ চাইছি, কাজ দে।"

"আচ্ছা" বলে মাথা নিচু করে জাম্বা চলে গেল। ডিসারীর হিসাবে তার জন্ম 'ব্‌ড়েতাই' যোগে, যত উৎপাত আসবে আগে তার ঘাড়েই চাপবে।

দিউড়ু ক্ষেতের দিকে চলল। আজ সকালে বৃষ্টিটা ধরে আসছে, কেবল মেটে আর পাঁশুটে রঙের মেঘের বাষ্প। রোদ নেই, তবে আলো বেরিয়েছে, জোর বাতাস বইছে। আজ কন্ধ গুড়িআতে আবার সাড়া জেগেছে। এত দিনের আঁধার কালো দিন কেটে যাচ্ছে পাঁশুটে সাদা মেঘের বাষ্পে।

॥ অষ্টআশি ॥

মালদেশের বর্ষায় একটু ফাঁক পড়েছে। চারিদিকে লেগে গেছে নিজাণি অর্থাৎ ক্ষেত নিড়ানোর কাজ। মেঘের ছুটি, মানুষের কাজ। এক দিন না দেখলে শত্রুর মত আগাছা এসে চেপে ধরবে, পাকবার সময় রাশি রাশি ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। বিলাতী গাছ 'কোরাপুটিআ' ঝাড় উড়ে উড়ে কতদূর ছড়িয়ে পড়েছে, কার বাগান থেকে কার বেড়া থেকে, যতই মারো তারা মরে না। নীচেকার ধানের ক্ষেতে বাঁশ জাতীয় গাছ, শরের গাছ, বেনা গাছ। ঢালুর ফসলে বুনো গাছের প্রকোপ—গিলি, ধাতুকী, কুরেই, কেন্দু। এক বার বাড়তে পেলে শত্রু মাটির নীচে শিকড় মেলে দেয়। তাই এই নিজাণির সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ কেবল মাঠেই, গাঁ পাহারা দিতে থাকে কেবল কুকুর।

কঠিন কাজ, এখানকার এই চাষ-বাস। আঁধার বনে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলো নেই, আছে কেবল যা মানুষ পুরুষানুক্রমে অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে। বিজ্ঞান বলতে মাটি আছে, জল হাওয়া আছে, ফসল নেই ; চাষের জমিতে শস্য বদলে বদলে মাটির সার বাড়ানো এখানে জানা নেই। অভ্যাসের জোরে মন থেকে যতটা বেরোয়, বাকী যা কিছু কাজের জন্য ধর্তনী মাতা। ছোট ছোট বলদ জুতে মাটির ভিতরে বিঘতখানিক চেপে হালকা লাঙ্গলের চাষ, নয় তো কোদাল দিয়েই খুঁড়ে খুঁড়ে বীজ বোনা। পাথুরে মাটি, উঁচু-নিচু, এবড়ো খেবড়ো, বড় বড় চাঙ্গড়, রোড়া কাঁকরে ভরতি। পাহাড়ে স্তরে স্তরে কন্ধ আল বেঁধে দিলে সেখানে ফসল হয়। তেমনি ঢালু জায়গায় উঁচু নিচু জমিতে উপর থেকে নীচে ধাপে ধাপে নেমেছে ধানের কেয়ারি, নিচু জায়গাতেও ধাপে ধাপে কেয়ারি। ঝোরার খাড়া পাড় যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরে আরো একটু চওড়া করে এপার ওপার বাঁধ দিয়ে দু'বছর ডুবিয়ে রাখলে ঝোরার ভিতর থেকে 'অটাল' জমি বেরোয়, একটু সতর্ক না থাকলে ঝোরার নতুন ঝরনা নেমে এসে জমি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে যায় বালি। বাঁধের জোরেই চাষের জোর। 'অটাল'-এ তামাক গাছ হয়, রবি শস্য হয়। ঝোরার ভিতরের ক্ষেতে ধান হয়—ষোল কাহন, আঠারো কাহন, পদর্ অর্থাৎ অল্প উঁচু ক্ষেতেও ধান হয়, ক্ষেতের রস কমে গেলে মাড়ুয়া। উঁচু জমিতে শ্যামা, আরো উপরে পেয়ারা গাছের মত মোটা মোটা কান্দুল বা বড় অড়হর। পাহাড়ের মাথার দিকে বড় বড় রেড়ির গাছের ক্ষেত। উঁচু পাহাড়ে খানিক খানিক পোড়ু করে পরিষ্কার করে ফসল করা হয়, পাহাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে বুনো জন্তু ফসল খেতে আসে। বাঘ সাপ ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ। সার বলতে কেবল কাঠ কয়লার ছাই, গোবরের ছিটে আর পদর জমিকে মাঝে মাঝে অনাবাদী রেখে বিশ্রাম দেওয়া। এমন পরিস্থিতিতে ধর্তনী মা দয়া করে,—'শিআরি লতার মতন ফসল বেড়ে যাক" কন্ধের এই প্রার্থনা সার্থক হয়। পাহাড়ের পচা পাতার সার আর বনের মাটির সার ভেসে আসে, জঙ্গলের ফসল জঙ্গলের মতোই বাড়ে, প্রচুর শস্য হয়। জমি বেশী, মানুষ কম।

বর্ষা ঋতুর ফাঁকে ফাঁকে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। আকাশ পরিষ্কার হয়েছে, মেঘ-দেবতা বীমা রাজার একটি অভিযান গুটিয়ে গিয়ে পিছু হটে গেছে,

কেবল কুয়াশা, হালকা এক এক পশলা বৃষ্টি, অল্প দিন এই রকমের বিরামের পর আবার ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে, সেই অবধি চাষের জমিতে কাজের হই-চই চলবে। রঙের কণিকা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠেছে, লতাপাতা, গাছ-গাছড়ার ঠেলাঠেলি, জলে সরসরে ভিজে আলো আর ঝকঝকে পাহাড়ের রাজ্য। চাষের উপত্যকা মুখরিত করে আকাশ ছাপিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী, পাহাড়ের ঢালুতে দলে দলে ময়ূর, আম গাছেও ঝাঁকে ঝাঁকে ময়না—আর সব রকম শব্দের চাইতে বেশী মনোহারী মানুষের কণ্ঠস্বর, যেখানেই চাষ সেখানেই মানুষ। কোথাও কাজের হুড়োহুড়ি লেগেছে—কাজের মানুষ নরম ভূমিকা করে কথা বলতে জানে না। বেখাপ্পা সম্পর্ক—মানুষের সঙ্গে, বলদের সঙ্গে, জমির সঙ্গে। কোথাও বা পাখীর ডানার মত তল্‌রা-তল্‌রি গায়ে দিয়ে এক দল ধাংড়ী একসঙ্গে নুয়ে পড়ে কাজ করে চলেছে, এক তানে গীতধ্বনি উঠছে, সে গানের শেষ নেই। তেমনি পাহাড়ের খাল খোলের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে জোড়া জোড়া বাঁশির চড়া সুর, এদিকে ওদিকে অপথে অজায়গায় মোষের পাল নিয়ে ঘুরছে মোষের আগলদার। শব্দ আর রঙের পৃথিবী, সুন্দর দেখায়, সুন্দর লাগে।

সেই পৃথিবীতে ফসলের পিছু পিছু ছোট ছেলের মত চেঁচামেচি করে লাফাচ্ছিল দিউড় সাঁওতা, তার লোকজনের কাজ তদারক করছিল, নিজেও কাজ করছিল। পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে ক্ষেতের আল মেরামত করে, নালা কেটে দেয়, হাওয়ার বেগে টাঙ্গি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝোপ জঙ্গল কেটে কেটে গাদা করে ফেলে। উৎসাহ পায় গাঁয়ের লোকের চেঁচামেচিতে—"ওই ওদিক ধসে পড়েছে···দেখ্‌তো 'গাড' (নদী) কি করে ফেলেছে···কেটে ফেল্‌ ঐ 'কোরাপুটিআ' ঝাড়গুলো···ওরে ও কুঁড়ে, কতক্ষণ ধোঁয়া খাবি—"। ক্ষেতের কাছে কাছে রান্নার ধোঁয়া উঠছে, কাজের অবসরে গানে গানে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ভালবাসার যাত্রা চলেছে, ফুল পরা হচ্ছে, খোঁপা ঠিক করা হচ্ছে, ছোট ছেলেরা মাছ ধরছে। এত কাজ। কিসের জন্য? কোন সাহুকারের সোনার বালা মোটা করবার জন্য এই বনের মধ্যে অর্ধনগ্ন লোকেদের লেগেছে এই হাট? এ প্রশ্ন কেউ করে না। জীবনের শেষ মৃত্যু সুনিশ্চিত, তবু জীবনকে কেউ মরণ-কান্না বলে মনে করে না। আসুক যখন যে সাহুকার আসে, কন্ধ চাষ করে যায়।

কাজের নেশায় দিউড়ুর কল্পনায় জেগে উঠছিল তার নতুন জীবনের ছবি। মনের গোমড়ানি কেটে গেছে, লেঞ্জুকাকা গেছে যাক, বন্দিকারের রায়ত হয়ে থাক্‌ বনের ভিতরে, আফশোস নেই। সে মানুষ। কবে সে বাপের অবর্তমানে বাপের বসবার জায়গায় সাঁওতা হয়ে বসে গর্ব অনুভব করছিল— সেই পাথরের উপরে তেমনি ধুঙ্গিআ ধরিয়ে হাত পা মেলে দিয়ে বসে থেকে। কবেকার কথা সে? সে ধারণা তার মজ্জায় থেকে গেছে। তার পর গেল লেঞ্জুকাকা, আজ লেঞ্জুকাকার কথা ভাবলে মনে হয় সে নিজে যেন একটা মানুষ-খেকো বাঘ, জিয়ন্ত মানুষকে মেরে ফেলে তার রক্ত পান করে, মদগর্বে ফুলছে। বনের মানুষ, বন্য, পশুবলবাদী, জড়বাদী, সে মানুষ কেবল জয় করে ক্ষান্ত হয় না, জয়ের পর ছারখার করে, নারীধর্ষণ করে, নারীকে হত্যা করে। মানব মনের সেই অন্ধকার গুহার এই পশুপ্রবৃত্তির বশে সে লেঞ্জুকাকাকে তাড়িয়ে সোনাদেঈকে পায়ে দলেছিল। চাষের ক্ষেতে কাজের জায়গায় রায়তপনা সাঁওতাপনা দুয়ে মিশিয়ে কপালে জয়তিলক পরে আজ যখন সে আনন্দ পায় তখন সোনাদেঈ তার চোখে কিছু নয়, শবের চেয়েও হীন সে, তার জন্য তার কোনো ভাবনা নেই। আজ নেই অকারণ কৌতূহল, অকারণ বুক ঢিপ ঢিপ করা। সোনাদেঈ এক ডোমনী মাত্র, এক অলক্ষণা অভাগী স্ত্রীলোক। একজনের পর আর একজন গেছে, জাম্বা কন্ধ মাথা নত করেছে, বারিক কেবল পোষা কুকুর, গাঁয়ে এমন কেউ নেই যে সাঁওতার চোখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে পারে। নিজের ক্ষেত তার নিজের বলে মনে হচ্ছিল, সময় তাকে জানিয়ে দিচ্ছে সে বলে বলীয়ান্‌, সে প্রাণে প্রাণবান্‌, ভাল মন্দ বিচারের তার অবকাশ কোথায়? উদ্ধত সে, দুর্মদ, দুর্ধর্ষ। মনকে দ্বিধা-বিভক্ত করা কোনো দুর্বলতা নেই তার।

জোরে জোরে কাজ করে।

অস্থায়ী বন্ধন নিয়ে স্বাধীন জীবনযাপন করতে মনের প্রবণতা বার বার তাগিদ জানায়। সেই তার স্বাধীনতা, নিত্য নূতন, ইচ্ছামতো যেমন খুশি দু' দিনের খেয়াল, আজ গড়ে তুলে কাল ভেঙে ফেলবার। লেংটিপরা বুনো কন্ধ একটি, তারও মন আছে, মনের সহজ গুণে সেখানেও ফুল ফোটে।

নিজেকে মিলিয়ে দেখে সরবু সাঁওতার সঙ্গে, লেঞ্জু কন্ধের সঙ্গে, নিজেকেই

বড় দেখে। পিওটির সামনে পুযুর ক্ষীণ দেহ বাতাসে মিলিয়ে যায়। পিওটি —সে বর্ষা শেষের শরতের হাউই, সে ভোলা যায় না।

কন্ধ কন্ধনীদের গান শোনা যায়। নিবেদন আর তার উত্তর, প্রশ্ন আর জবাব। কাজ করতে করতে গানের কোন পদ মনে বিঁধে যায়, পা টলে যায়, কাজ ধিমিয়ে যায়। কেন আর সে বসে আছে, কিসের অপেক্ষায়? ঠিক—পিওটি—পিওটি—মনকে ভুলিয়ে রাখতে সে তাড়াতাড়ি কাজ করে চলে।

মাটির অঞ্জন সর্বাঙ্গে মেখে কাজে লেগে গেছে মানুষ।

চাষের উপত্যকায় বেজুণী বুড়ী নেমে আসছিল।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। বৃষ্টি নেই। রোদের রঙ বনের রঙ মিশে গিয়ে ভাসছে ধোঁয়াটে কুয়াশা।

বেজুণী জবা ফুলের মালা পরেছে গলায়, নানা রকমের মাদুলি জড়ি-বুটির হার। একখানি লাল গামছা পরে হাতে লাঠি নিয়ে নেমে আসছে সরু এক ফালি ছায়ার মতো, ক্রমে নীচের পানে।

তার অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎ নেই, এই বর্তমানে দুই মুড়োয় গিঁঠ পড়েছে। আজকের মতো দিনে দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, কেবল চোখ খুলে রাখলেই দেখা যায় ঐ পুরের লোক আর এই পুরের লোকের মধ্যে মেলামেশা। গাঢ় নীল মোটা সাপের মত এঁকে বেঁকে ধানের ক্ষেত লম্বা হয়ে পড়ে আছে। কত ফসল হবে তার মধ্যে। শস্য, মানুষের খাদ্য, মানুষের গৃহস্থালি, তার আত্মসম্মান। ঐ ধর্তনী মা হাসছে, দেখছে বেজুণী! "নমস্কার মা, কোটি কোটি নমস্কার তোর চরণে। তুই না পালন করলে কোথায় থাকতাম আমরা। অমনি চিরদিন যুবতী মেয়েটির মতো হয়ে বিরাজ করতে থাক্, অমনি প্রশান্ত হাসি খেলা করুক তোর চোখে, 'পাদুকা শীতল থাক্'।" বেজুণী ভাবে ধর্তনী মাকে সে দেখতে পায়, সে না পেলে আর কে দেখতে পাবে দেবতাকে? ধর্তনী মা দেখতে সুডোল কন্ধনী মেয়েটির মতো। মাথায় ওড়না, হলুদ আর রেড়ির তেলে চুকচুকে মুখখানি, গলায় সরু সরু লাল রঙের কালো রঙের নর নর হার, স্নেহে দুধ বয়ে যাচ্ছে। ধান ক্ষেত থেকে মাথা তুলে চায়, কান্দুল-এর ক্ষেত থেকে মুখখানি দেখায়, মাড়ুয়ার বনে বসে থাকে চুল এলো করে।

"জানি মা, দিন দিন হীন দশা পড়বে, প্রজাদের খামারের ফসল চলে যাবে পরের মুখে, কত ছলে শুষে যাবে মাঠের পাকা ফসল, ধড়ের উপর থেকেও মাথাটা হবে পরের, মানুষ আর মানুষ হয়ে থাকবে না। সব আমি জানি তোর কৃপায়। যা হবার হোক, পরে হোক, আমার দেখতায় নয়। এতদিন তোর সেবা করেছি, আমার মিনতি রাখিস্ মা।"

ধর্তনী মা চাষের উপত্যকায় বসে ঘাড় নাড়ে, পাহাড়ের ঐ পারে 'বীমা' রাজা বসে বাহবা নেয়—বেশ বৃষ্টি দিয়েছে, জঙ্গলের বাঁকে ধার ধার দিয়ে দেখা যায় ঝরনার আরশি, ঐখানে বুঝি বনের দেব দেবীদের ঘাট। কেউ চুল খুলে শুকোচ্ছে, কেউবা একজন আর একজনের পিছনে ছুটেছে, কেউ কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, উজ্জ্বল দিনের আলোয় দেবতাদের খেলা চলেছে। কত কি অজানা সম্বোধন করতে করতে আপন মনে বিড়বিড়িয়ে বেজুণী নীচে নেমে গেল। গ্রামের লোকেদের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, লোকেদেরও দেখা যাচ্ছে। বেজুণীর আপনার কেউ নেই, এরাই তার আপনার। নিজের জন্য বেঁচে থাকা সে কবেই ভুলে গেছে, গ্রাম-গোষ্ঠীই তার সংসার। পাতা ঝরে গেছে, ডাল ভেঙে গেছে, শুকনো ঠুঁটো হয়ে দশ জনের উনুন-গোঁজা জ্বালানি হওয়াতেই তার আনন্দ।

আকাশের কথা, দেবতার কথা, এ সবেরই গোড়ায় তার দল, তার সমাজ। এদেরই ভরসায় মরণ জিনে অকলন বয়সের কুয়াশা ঘেরা কিনারায় মাটিতে পা রেখে আজো সে টিকে আছে! কত কে চলে গেছে, সে রয়েছে। পুনর্জন্ম তার দরকার নেই।

"কোথায় চলেছে?—বেজুণী, ও বেজুণী—"

"ক্ষেত নিড়াবি, বেজুণী?—"

"শুনবে না, ডাক পড়েছে বোধ হয় ওর, দেবতার থানে যাচ্ছে।"

শোনবার তার গরজ নেই, হঠাৎ তার মনে পড়ে আত্মসম্মানের কথা, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উঁচুতে সে। পেয়ারা গাছের নীচে বসে রেন্দ, কাঠ্‌ক, টিট সবাই পেয়ারা খাচ্ছে। ডালের উপরে বসে আছে

একটি গরুকে দুজনে দুদিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে বনের দিকে গেল—পুল্‌মে আর বাত্রি।

দিউড়ু সাঁওতার ঘরনী ছেলে কোলে করে মাথায় হাঁড়ি নিয়ে ক্ষেত থেকে ফিরছে, হাত বাড়িয়ে হাকিনাকে দেখাচ্ছে—"ঐ দেখ্, বেজুণী।"

বেজুণী সোজা একদিকে চলেছে, সব দেখছে, দাঁড়াচ্ছে না। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে আলের উপর দিয়ে দিয়ে চলেছে, ডাইনে বাঁয়ে ঘামে ভেজা কালো কালো পিঠ অগনতি, কাছাকাছি। কাজের সময়কার চীৎকার, কাজের শব্দ। এই তার পরিচিত পৃথিবী, তার পরিসর, নিত্য নূতন, নিত্য পুরাতন। প্রজাপতির মতন বেজুণী উড়ে চলেছে, পরিচিত বন্ধনীর মধ্যে সে স্বাধীন।

নতুন কাটা একটা নালার ভিতরে পাহাড়ের খাড়া গা থেকে একটা পাথর গড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল পাণ্ডু ডিসারী। নুয়ে পড়ে দুই হাতে ঠেলছে সে। দিনের বেলায় আর তারা গোনা নেই, দিনের বেলা চাষের কাজ। বললে, "কোথায় চললি, বেজুণী—?"

থেমে গিয়ে তার একটি মাত্র দাঁত নেড়ে সে হাঁ করলে, সেই তার খুব হাসি। নীল ধূমল গর্তে-বসা চোখের উপরে কোঁচকানো হলদে চামড়া ঝুলে পড়েছে, তার পরতে পরতে রয়ে গেছে বছর বছরের যত যন্ত্রণা, দুর্ভোগ।

বেজুণীর প্রসন্ন হাসি।

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের এক মুঠো ধুলো।

"কোথায় যাচ্ছিস্, বেজুণী? একটু বসে যা, একটু দাঁড়া।" ডিসারী বড় বড় নিশ্বাস ফেলে দম নিল। কোমর থেকে ধুঙ্গিআ বার করল, আপন মনেই বলতে লাগল, "ভারী জল, এই তো সবে রোহিণীর আরম্ভ, খুব জল হবে এ বছর।" অন্যমনস্ক হয়ে বেজুণী একটা পাথরের উপরে বসে রইল। ডিসারী চাষ বাসের কথা বলতে লাগল : ফসল ভালো হবে, গরুর মড়ক নেই। কথার মাঝে বেজুণী বসে বসে মাথা নাড়তে লাগল, দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ভালো নেই—ভালো নেই—"

"বাঘ লাগবে? বাঘের উৎপাত হবে বলছিস্?"—গভীর বনের দিকে তাকাতে তাকাতে ডিসারী জিজ্ঞাসা করল। বেজুণী উদাসভাবে চারিদিকে চাইল, জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলতে লাগল "কিছু ভালো নেই—" তার পর উঠে চলে গেল।

ডিসারী পিছন থেকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। পাহাড়ের দিকে চলেছে বেজুণী। পাহাড়ের ঢালুতে শ্যামার ক্ষেতে মাডুয়ার ক্ষেতে মানুষ রয়েছে, কোথাও দাঁড়াচ্ছে না, সোজা চলে যাচ্ছে সে। কোথায় যাচ্ছে? আপন মনে ডিসারী বলে উঠল, "পাগল—মাথায় পাগলামি চেপেছে।" তার পাথর গড়ানোয় লাগল সে। রোদ ফিকে হয়ে এসেছে। এক টুকরো মেঘ পাহাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে ধোঁয়া খেলিয়ে খেলিয়ে আসছে। জল আসার আগেই পাথরখানা দোরগোড়ায় ফেলা দরকার।

"ভালো হবে না"—বুড়ো বুড়ীরা এমনিই ভাবে। তারা দিনের বেলায় ভূত দেখে, অকারণে অমঙ্গলের আশঙ্কা করে নিজেরা ভয় পায়, অন্যদের ভয় দেখায়।

ক্ষেত ভরে উঠেছে, উথলে উঠছে ফসলের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর বুক, ভালো না হবার কোনো কারণ খুঁজে পেল না ডিসারী, সে কাজে মন দিল।

বেজুণী পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। চাষের ক্ষেতের আলের মত দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের একাংশ। ঘন জঙ্গলের ঠেসাঠেসি, মাঝে তে-কোণা হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে খানিকটা পোড়ু করা জমি, এখানে অনেকের চাষ, লোকেরা রয়েছে। দিউডু সাঁওতা কাজ করে বেড়াচ্ছে।

দিউডু জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছিস্, বেজুণী?" তার পর তামাসা করে বললে, "কাঠ পাতা আনবি নাকি?"

বেজুণী দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে সাঁওতার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু না বলে আস্তে আস্তে চলে গেল। ঢালু বেয়ে কিছু দূর পর্যন্ত উপরে উঠে গেল। গ্রামের পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে চাষের ক্ষেতের ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে নতুন দৃষ্টি কোণ নিয়ে মানুষের কর্ম ভূমিকে দেখতে তার ভাল লাগে, মনে নতুন নতুন ধারণা আসে।

এত গুলি মানুষ কাজ করছে, সকলে একই ঘরের। উপরে মানুষ নীচে মানুষ, সব ভাই ভাই। আকাশে দর্মু আছে নীচে আছে ধর্তনী, দুই দেবতার সন্তান এরা, সংসারের একই ঘরে এত গুলি মানুষ। সুন্দর পৃথিবী, এই তার ঘর।

রোদ কত ঢলে পড়েছে, ঘরমুখো রোদের আভা পাহাড়ের রাজ্যে ঢেলে দিয়েছে নানা জাতের রঙ। তবু সব ছবি যেন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ার

নিবে আসার সূচনা, এ দৃশ্য থাকবে না, সব নিবে যাবে। এই সময়ে, এত উঁচু থেকে চিন্তার চোখ মেলে দিয়ে চেয়ে দেখলে কেবল কেমন উদাস লাগে। একদিক থেকে আকাশে কয়লার কালি লেপে দিতে দিতে নীচে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে আসছে একখানা মেঘ, হালকা চালে উড়ে আসছে। এমন সময়ে কোন ফাঁক ফোকর থেকে মনের ভিতরের হারিয়ে যাওয়া চিন্তা, কাঁদনভরা ভাবনা উড়ে উড়ে সব আবার কাছে আসে, বেজুণী আর বেজুণী হয়ে থাকে না, হয় শুধু একটি শুকনো রোগা মানুষ। এই সময়ের এই অবস্থার ছবি পিছনে টাঙিয়ে দিয়ে কত ক্ষত আবার অতীতের অন্ধকার থেকে রূপ নিয়ে উপরে উঠে আসে, নির্জন শ্যামলতায় একটিমাত্র লাল ফুলের মতো দৃষ্টিকে ধরে রাখে। শুকনো হাড় আর চামড়ার খোলার মধ্যে হঠাৎ জাগে অনাহূত অনুভূতি, বেজুণী নিজের মনের কথা শুনতে থাকে।

কোন পুরানো দিনের কাহিনী সে, আজ তার ছায়াটুকুও নেই, কোনো চিহ্ন নেই। কবে কোন দিন এই বেজুণী বুড়ী ধাংড়ী ছিল। দিউডুকে দেখলে সরবু সাঁওতাকে মনে পড়ে। তার ধাংড়ীর দিন গেছে, সরবু সাঁওতা গেছে। সব চলে গিয়ে বছর বছর আসে যায় এই চেনা পৃথিবীর চেনা দৃশ্য, জানা খেলা, ধাংড়ীর দিন আর আসে না।

সরবু সাঁওতা একদিন ধাংড়া ছিল। যতই সে ভাবুক এই নিরালা সময়টির সঙ্গে বুড়ো সরবু সাঁওতা কোনোমতেই খাপ খায় না। সে কালের যুবা এসে জিজ্ঞাসা করে—'কই তৈরী হস্ নি? আজ আর বনে বেড়াতে যাওয়া হবে না? মিথ্যে আমাদের 'খারি' খেয়ে সম্বর হরিণ পালিয়ে যাবে?' তারি সঙ্গে সঙ্গে পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে চড়াই ভেঙে হরিণীর মতন ছুটে বেড়াবার নেশা! কিন্তু কি লাভ হয়েছে তাতে? প্রতিদান চেয়ে অভিমানের উত্তাপে নিজেকে অসময়ে ঝলসে ফেলেনি, ধীরে ধীরে পাথর হয়েছে,—পাথর।

'সুন্দর চলন তোর, চলিস্ না তো, নাচিস্!'

'এত তাকাস না তো আমার দিকে, তাকালে আমার নজর ছুটে যাবে জেনে রাখিস, জন্তু পালিয়ে যাবে।'

'না, আর কোনো দিন তোকে সঙ্গে আনব না, তুই এলে আর কোনো কিছুতে আমার মন লাগে না।'

সম্বর হরিণ 'খাব্বি' খেতে খেতে মানুষের শব্দ শুনতে পেয়ে পালিয়ে যায়, তারই মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মানুষটা, বিহ্বল চোখে পলক পর্যন্ত পড়ে না যেন, সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলে যায়, হাসি উছলে পড়ে।

'আচ্ছা বেশ, তাই, আর শিকার নয়। চল, ঐ পাথরের চাতালে বসি গিয়ে, ওঠ্, ওঠ্—'

আর একটু বাঁয়ে ফাঁক ফাঁক শাল গাছের উপর দিয়ে দিয়ে ঘরের চালার মতো শিআরির লতা ঘন হয়ে উঠেছে, তারই নীচে চওড়া চাতাল। সামনের দিক খোলা, পাহাড়ের অতট দেখা যায়, চাষের উপত্যকা দেখা যায় বিশাল ভাতের হাঁড়ির মত।

সূর্যাস্ত সেখান থেকে ভাল দেখায়।

সেই যৌবনের তীর্থ, আর একটু—আর একটু বাঁয়ে।

সরবু সাঁওতা তার হয়নি, সেজন্য আজ দুঃখ নেই, মানুষের মন নানাখানে ঘোরে, সবখানেই আটকে থাকে না। সংসার করা হল না, কেমন করে জানি রক্তের তেজ শীতল হয়ে গেল, সে মুখ, সে চোখ, সে শরীর গেল কোথায়। ধীরে ধীরে এ সংসারের দিক্ থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেবতার রাজ্যে সে মন বসাল। স্বামী নেই, সন্তান নেই, দেবতার বাহন, গাঁয়ের বেজুণী।

ঐ যে নীচে,—দিউড়ু সাঁওতা কাজে লেগে রয়েছে, উপরে লোক নীচে লোক, পোড়ুর মাটিতে ভালুকের মতো গাছপালা বেড়ে উঠেছে। নিড়ানোর কাজ ঢের। বেজুণী বাঁ দিকে চলে গেল। বর্ষা সেখানে প্রলয় কাণ্ড করে দিয়েছে। মাটি ফালা ফালা হয়ে ধুয়ে চলে গেছে, উপর থেকে নেমে আসা জলস্রোতের পথে পথে রাশি রাশি টুকরো পাথর। চেনা পথে জঙ্গল গজিয়েছে, অচেনা পথ বার হয়েছে, সব নতুন, পর্বতের বিস্ময়। ক্ষেতের ধারে ধারে পাহাড়ের হেলে পড়া দেওয়ালে জঙ্গল দাঁড়িয়ে উঠেছে, নানা জাতের ককোড়ি (ফার্ন্) এর বনে ঢাকা পড়ে নীচেকার মাটির ভোঁতা পাথর নজরে পড়ে না, খালি চাতালে নানা জাতের শেওলার গদি। স্থানে অস্থানে হঠাৎ রঙিন ফুল গোছা গোছা। থোপা থোপা বাঘনখী ফুল ঝুলছে, গাছের গুঁড়িতে কুলোর মত কাঠ-ছাতা, সবুজ আর সাদা হাতীর কানের মত হাড়-জোড়া গাছের পাতা। একদিকে রোদ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি

দিচ্ছে, আর একদিকে মেঘ করে আসছে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে। উড়ো মেঘ, দু'চার ফোঁটা ফেলে দিয়ে চলে যাবে, ভাবলে বেজুণী। পা তার আপনিই পড়তে লাগল সেই পাথুরে চাতালের দিকে, বেশী দূরে নয় সেটা।

পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে বেজুণী অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে রইল। আজকের দিনটাও সুন্দর, ঠিক সেই দিনের মত সুন্দর, কিন্তু সেদিন নেই। দূরের ভাতের হাঁড়ির মত উপত্যকার ওপারের ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল বেজুণী। কি নিস্তব্ধ, কি নির্জন। দীর্ঘশ্বাস এল, দুটো গর্তপানা চোখ ভরে দিল আঁধারী মায়ায়। সব যেন সত্যি সেদিনের কথা, দেখতে দেখতে চলে গেল, দিন গুনতে পারা গেল না, দড়ির গিঁঠে ধরা গেল না, সন্ধ্যা হয়ে গেল, সব শেষ—।

নিত্যি ওঠে এই সূর্য, নিত্যি চলে যায় ঐ পারে, চিরকাল ধর্তনীর উপরে পায়ের ভর রেখে একই অবস্থায় থেকে তার আসা যাওয়া দেখবার কিমিয়া নেই কারো কাছে, চাবিকাঠি দেবতার হাতে, মানুষ তার খেলার পুতুল।

সে বেজুণী হয়েছে, দেবতার জ্ঞান অর্জন করেছে, পড়ে আছে মানুষের দুর্বলতার বেড়ি পায়ে পরে।

সব সে দূরে ফেলে দিয়েছে—সংসারের যত ভোগ বিলাস, মানুষেব সুখের ঘর-করনা, সংসারীর যত প্রবৃত্তি সে ত্যাগ করেছে, সে সব কিছুর স্বাদ ভুলে, সংযম সঞ্চয় করে দেবতার পায়ে নিজের সব কিছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে সে হয়েছে বেজুণী। কিন্তু এই পুরানো পাথুরে চাতালের উপর পুরানো দৃশ্য চোখে ভরে নিরালায় নির্জনে নিজের সঙ্গে কথা বলবার সময় সে বিশ্বাসও তার থাকে না।

ঠকে ঠকে বুড়ী হয়েছে সে, মন বলে সব ফাঁকা।

ওদিক থেকে মেঘ ঘনিয়ে এল। নিমেষে আলো নিবে গেল। উপরে আকাশ চিকন কালো, ক্ষেতের উপরে যেন ভোরবেলাকার পাতলা অন্ধকার। আকাশের এদিক থেকে ওদিকে মালার মতো দুলতে দুলতে উড়ে গেল সাদা বকের সারি, চিকন কালোর নীচ দিয়ে। মুখ তুলে বেজুণী সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ক্ষণেকের তরে আপনা ভুলে ক্ষণেকে আবার হারানো

হাহাকারের রাগিণী ফিরিয়ে এনে বেজুণী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেঘের ধোঁয়া কাছে আসছে, তার ভয় নেই ভাবনা নেই। ভিজে গন্ধ। ভিজে বোটকা গন্ধ। কিসের পোড়া গন্ধ, মড়া পোড়ার মতো আবার পচা মড়ার মতো, দুয়ে মেশানো। কাছে আসছে। 'কালথুন্ট' গাছের ফুল হয়তো। কাছে আসছে, বৃষ্টির টপ্ টপ্ শব্দ এগিয়ে আসছে, চারিদিক ঘন কালো। বক উড়ে যাচ্ছে—ঐ চারিদিক সাদায় সাদা হয়ে গেল।

হঠাৎ অন্যমনস্ক বেজুণী চমকে উঠল, মাটি থেকে পা ছেড়ে গিয়েছে, কে তাকে তুলে নিয়েছে বজ্রবন্ধনে। ঝড়ের সঙ্গে মিশে কিসের টানে সে কোথায় চলে যাচ্ছে। প্রাণপণে সর্বশক্তি দিয়ে বুড়ী তিন বার চীৎকার করলে, তারপর জ্ঞান লোপ পেল, চোখ বুজে গেল। মানুষখেকো ডোরাকাটা বাঘ বেজুণীকে শক্ত করে ধরে নিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে গেল পাহাড়ের আরও উপর দিকে। কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রণায় জেগে উঠে বিড় বিড় করার মত বুড়ী আরও দুইবার চেঁচালে, শেষ চীৎকার গলার ভিতর ঘড়ঘড়িয়ে মরল। শিকার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে গর্জন করে বাঘ লাফ দিয়ে এসে চেপে বসল।

উড়ো মেঘ ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে ভেসে চলে গেল।

বেজুণী আর ফিরল না।

বৃষ্টির সময় মুখ গুঁজে গাছের তলায় বসে বৃষ্টির ঝুপুর ঝুপুর সোঁ সোঁর মধ্যে অস্বাভাবিক চীৎকার কেউ কেউ শুনেছিল, কেউ তেমন খেয়াল করেনি, জঙ্গলে ঘর করে থেকেও জঙ্গলের সব তত্ত্ব কেউ বোঝে না। বনের কত রকম শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, সেদিকে মন দিয়ে প্রত্যেকটি খড় খড় শব্দে চমকে উঠলে তো আর কাজ করা যায় না।

দূরে হলদে রোদে পাহাড়ের আধখানা ঝলসে উঠল, ধীরে ধীরে রোদ এগিয়ে এল। জলের উপর আলো পড়েছে, বেজুণী থাকলে দেখতে ধর্তনী মা সাঁঝ বেলার স্নান সেরে রোদে দাঁড়িয়ে আছে, দমুর্ সাতরঙা ধনুক তুলে ধরেছে, আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর! চির দয়া থাক্ দেবতা, তোর পাদুকা শীতল থাক্! এই পড়ন্ত রোদে দিনের কাজ সারা হবার সঙ্কেত এই আলোটুকু মরে যাবে, তার পর ঘরে ফেরার পালা। হঠাৎ চারদিক নানা রকম শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। পাহাড়ের নীচে ময়ূর-ময়ূরীর দল সারা

দিনের সায় করা নাচ নাচতে লাগল, ডাকতে লাগল—কেঁয়াও—কেঁয়াও—। গাছের উপর ঝোপের ভিতর স্বরলিপির ভগ্নাংশের মত ছোট ছোট পাখীর কলরব, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে বেড়াতে লাগল, চাষের উপত্যকা থেকে উঠল যুবক-যুবতীদের মন দেয়া-নেয়ার গান। দিন শেষের রোদে চারি দিক্ হেসে উঠছে, সূর্য নুয়ে পড়ছে পর্বতের মুকুটের দিকে, গিরিশিখরের মেঘের পাগড়িতে অপরূপ বর্ণবিন্যাস।

পাহাড়ের উপরে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "বেজুণী কোথায়? বেজুণী কোথায়?" কয়েকজন এক সঙ্গে বললে "বেজুণী কোথায় গেল?" বেলা যায়। লোকেরা বললে তারা দেখেছিল বৃষ্টি আসবার আগে এই বনের কিনারের দিকে চলে যাচ্ছিল বুড়ীটি। সাত পাঁচ ভেবে বনের কাছে গিয়ে তারা ডাকলে—"বেজুণী—বেজুণী—" জবাব নেই। কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে 'বেজুণী—বেজুণী' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এক দল পাথরের চাতাল অবধি উঠে গেল,—জবা ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে আছে।

সরু লাল পুঁতির মালার এক টুকরো বুক-সমান উঁচু একটা ঝোপের গায়ে ঝুলছে, ভিজে বনে চামসা পচা গন্ধ লেগে রয়েছে, আর কোনো চিহ্ন নেই। লোকেরা দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল। হাতের মুঠোয় শিঙা করে ফুঁ দিলে, নীচের উপত্যকার দিকে মুখ করে হাঁক ছাড়লে। ছুটতে ছুটতে লোক এসে জমা হল, হাত মুখ নেড়ে কেবল তর্ক, মনে অজানা ভয়, আশঙ্কা। কেউ দৌড়ে গিয়ে কাছের খোলের ভিতর থেকে মোষের আগলদারের সঙ্গে সঙ্গে মোষের একটা ছোট পাল তাড়িয়ে নিয়ে এল। রোদ যায় যায়, আগে মোষের পাল আর পিছনে টাঙ্গি নিয়ে লাঠি নিয়ে হই হই চীৎকার করতে করতে গাছের গায়ে লাঠির ঘা মারতে মারতে এক দল লোক বনের মধ্যে ঢুকল। বেশী দূর যেতে হল না। একটা ঝোপে বেজুণীর লাল গামছাখানি টুকরো টুকরো হয়ে লেগে আছে, হাওয়ায় বাঘের গন্ধ। একটু উপরে একটা পাথরের উপরে আরো পুঁতির মালা পড়ে আছে, রক্ত জমে আছে, নেড়া ভিজে মাটিতে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ায় দাগ পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উপরের দিকে চলে গেছে। সেখানে দাঁড়াতে শোনা গেল উপর থেকে আসছে বড় বাঘের বিরক্তির ছোট হুঙ্কার! তারপর মোষের পালের সামনে ভয়ঙ্কর গর্জন করে গা ফুলিয়ে একটা মোষের মতো হয়েই বাঘ উঠে দাঁড়াল। মোষের

পালের পিছনে লোকেরা কাঠ হয়ে সবাই দাঁড়িয়ে রইল, জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল : "মহাপ্রভু, মহাপ্রভু! আমাদের উপর রাগ করিস্ না, দয়া কর্, মহাপ্রভু!" উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে নিজের পরাক্রম বুঝিয়ে দিয়ে 'মহাবল' বাঘ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর গাছের পাতা ঝরিয়ে বুক কাঁপিয়ে আরো দু'বার গর্জন ছাড়ল। বিদ্যুতের মত তার সারা গায়ে যেন ঢেউ খেলে গেল, হাঁ করে মাটিতে লেজ আছড়ে এক পাশে লাফ মারল সে। সবাই হতভম্ব হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ ঝাড়া দিয়ে ডোরাকাটা বাঘ একধারের একটা পাথরের খাঁজের ভিতর থেকে বুড়ী বেজুণীর বিকলাঙ্গ মৃতদেহ মুখে তুলে নিল, টিকটিকি যেমন করে বর্ষাতি পোকা নিয়ে যায় তেমনি উঁচু করে ধরে পাহাড়ের দেওয়াল দিয়ে দিয়ে নিয়ে চলে গেল রক্তঝরা লাসটাকে।

সবাই তাকিয়ে দেখছিল, কারও মুখে কথা সরছিল না। 'নিল' 'নিল' বলে শব্দটুকুও বার হল না কারো মুখ দিয়ে। নির্ভয়ে লাফ দিতে দিতে চলে গেল বাঘ।

চোখের আড়াল হয়ে যাবার পর লোকেরা হই চই আরম্ভ করল, যে দিকে বাঘ গেছে সেই দিকে তাকিয়ে সকলে টাঙ্গি উঁচিয়ে লাঠি আফসে চীৎকার করলে। সূর্য অস্ত গেছে, বন দেশের উপর বিষণ্ণ ছায়া। "চুপ কর্, চেঁচাস্ নে, নিরাপদে ঘরে পৌঁছাই আগে, বাঘভুমা পথ আগলাবে।"

'বাঘভুমা'—বাঘে খাওয়া মানুষের প্রেতাত্মা। বাঘকে যত না ভয় বাঘভুমাকে তার চেয়ে বেশী। নিজে মরেছে বলে যারা বেঁচে আছে তাদের প্রতি তার ভারী ঈর্ষা, পথ ভুলিয়ে দেবে, ভয় দেখাবে, বিপদে ফেলবে। লাল মুখ, লাল মাথা, চুল নেই, ছোট্ট শিশুর রূপ ধরে বাঘের লেজের উপরে বসে বাঘকে বুদ্ধি দেয় কোন ফিকিরে কোন মানুষটাকে খেতে হবে। রাত হয়ে আসছে, পথে ঘাটে হয়তো বেজুণীর বাঘভুমা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সামনা-সামনি পড়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়।

মোষ-রাখাল মোষের পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। মাথা নিচু করে এক সঙ্গে গাদাগাদি হয়ে মিণিআপায়ু গাঁয়ের লোকেরা বাড়ি ফিরল। কারুর পা পেছলায়, কেউ বা এক টুকরো ডালে বা পাতায় হোঁচট খেয়ে চমকে লাফিয়ে ওঠে, কেউ দূরে আঁধার হয়ে আসা বনের দিকে আঙুল

দেখিয়ে সঙ্গীদের থামিয়ে দেয়, নিশ্বাস বন্ধ করে সেই আঁধারের ভিতরে চোখ চালিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে থাকে, বেরোয় একটা শেয়াল।

এমনি করে উঠে পড়ে পথ কেটে গেল, উপর থেকে গ্রামের আলো সাহস দিল, গাঁয়ের পাহাড়ের ঢালুতে শোরগোল করতে করতে যে যার পথে গেল। আগে আগে গিয়ে নিজের ঘরে আজকের এই বড় খবর সবাইকে শোনাতে হবে—বাঘ কেমন ড্রোঁ (হালুম) করল, কেমন করে তাকালে, কে ভয় পায়নি, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—এমনি কত বাহাদুরি, কত ব্যাখ্যান। গোলমাল হই চইয়ে গ্রাম কাঁপতে লাগল। প্রিয়জনেরা ফিরে আসা লোকদের জড়িয়ে ধরল, আদর করল, তাদের বাঘে খায়নি বলে কৃতজ্ঞতায় কত কাঁদল। তাদের ভরসা দিয়ে বুক ফুলিয়ে কত লোক বক্তৃতা শুরু করল বাঘে খাওয়ার জায়গার কত কাছেই তারা ছিল, বিপদের ঠিক মুখের সামনে, তবু তারা বেঁচে ফিরেছে।

গাঁয়ে ঢোকবার সময় দিউড়ু সাঁওতা পিছনে আস্তে আস্তে আসছিল। ভাবছিল যা দেখেছে তা ভোলা যায় না। একটু আগে যে মানুষটি তার সঙ্গে কথা বলে গেল, সে নেই বলে বিশ্বাস হয় না। কি ভয়ঙ্কর! মাথার ভিতরে মেঘের বোঝা চেপে বসেছে যেন, চিন্তাশক্তির কল বিগড়ে গেছে।

বারিকের বাড়ি থেকে গাঁয়ে যেতে নির্জন পথের বাঁকে মুর্বার বেড়ার অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে আছে—সোনদেঈ! দিউড়ু কাছে এল, সোনাদেঈকে পেরিয়ে দু'পা এগিয়ে গেল, হাঁটা আস্তে হয়ে এল। পিছন থেকে আস্তে ডাক শুনতে পেল—

"সাঁওতা—"

"কেন রে? কি বলছিস্ তুই?" বড় বিরক্ত হয়ে দিউড়ু গর্জন করলে।

"ভয় লাগছে সাঁওতা, কিসব বলছে—বেজুণী—"

"ভয় লাগছে তো মর্"—বিনা কারণে দিউড়ু রেগে উঠল, আগের মতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। এবার মনটা হালকা লাগতে লাগল।

খানিক হই হল্লা করার পর সবাই থামল।

সেই রাত্রিতে,—সবাই ভালো করে দেখে শুনে ঘরের দরজায় হুড়কো আঁটল, রাত্রে কেউ আর বাইরে বেরুল না। মুখ ঢাকা দিয়ে ফোঁস ফোঁস

নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কান খাড়া করে ঘরে ঘরে পড়ে রইল মানুষ—বাঘ-ডুমার শব্দ শোনবার জন্য। কিছুই শোনা গেল না, কেবল রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝরাতে বৃষ্টি শুরু হল।

॥ উননব্বই ॥

সকালে আর বৃষ্টি নেই, অলস কুয়াশার উপরে নীরবে আলোক-কণা ঝরছে। রাতের তারার দেখনদার পাণ্ডু ডিসারী পাথরের উপরে বসে চাষের উপত্যকার ধারের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল, তার চোখ সেইখানে আটকে গেল। এখানে কোথায় হয়তো পড়ে আছে বেজুণী, কোন পাথরের ফাঁকে, কোন অজানা গাছের তলায় যার নাম নেই। রোদ উঠছে। ঐ ওখানে আকাশের যেখানটা পরিষ্কার সেখানে শকুন চক্কর দিচ্ছে ' হয়তো বাসী মড়াটা পড়ে আছে, ভিজে জবজবে. হিম শীতল। ক্ষত বিক্ষত মানুষের দেহ, চেনা যায় না। মাছি লেগেছে, পিঁপড়ে ধরেছে, মানুষের দেহ—উঃ—ভাবতে ভাবতে ডিসারীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সেই দেহকে হয়তো শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, লাফ দিয়ে এসে দাঁত দিয়ে ফালা ফালা করছে হয়তো বাঘ। কাল পথ চলছিল, কথা বলছিল, ভবিষ্যৎ দেখছিল আর ভাবছিল। ঐ ওখানে কোথায় পড়ে আছে তার লাস ঐ গহন বনের ভিতরে। সেখানে মানুষ নেই, শুধু ধর্তনীর পাথরের কোল, ধর্মুর আগুন জ্বলা চোখ, কেবল বাঘ, শকুন, পিঁপড়ে।

সিরসিরিয়ে—সিরসিরিয়ে ডিসারীর মনের ভিতর সাহস এল, শক্তি এল —সে ওখানে পড়ে নেই, সে আছে, বেঁচে আছে। বেঁচে নিজের বসবার জায়গাটিতে স্বচ্ছন্দে বসে বেজুণীর জন্য সৌখীন দুঃখ হল তার, সে তার ভিতরে জীবনের প্রতিক্রিয়া। বেজুণী গেছে, সমাজের কাজ চালাবার জন্য আবার এক বেজুণী তৈরী করা হবে, আবার ডিসারী যোগ দিলে নতুন বেজুণী দেবতার বন্দনা আর মানুষের মঙ্গলগীতি গেয়ে গেয়ে লাফাবে, নাচবে। কিন্তু এই বেজুণী—কি ছিল সে, কন্ধ দেশের প্রাচীন বিস্ময়, এক হারিয়ে যাওয়া যুগের ইতিহাস। ডিসারী ভেবে চলল—আর কেউ নেই যে ডিসারীর

গণনাকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বয়ান করবে দিব্যদৃষ্টির দর্শন। সে কি দেবতাদের দেখতে পেত, না ঘোলাটে চোখে আঁধারের ছায়া দেখে ভাবত দেবতাকে দেখছে? নক্ষত্রের যোগ হেতু ক্রিয়া, ক্রিয়া থেকে ফল, দুই আর দুইয়ে চার, এ কথা ভুল বলে সে প্রমাণ করে যেতে পারেনি। নক্ষত্রের যোগ লাগল, বেজুণীকে বাঘে খেল, সে মরল। মৃত বেজুণীর প্রতি তার দয়া হল, আপন বিশ্বাসে শক্তি সঞ্চার হল, বললে—'আহা, আহা, ক্ষেপী পাগলীর মতো বুড়ীটি ছিল, কত কালের সে, চলে গেল—।'

বেজুণীকে বাঘে খেল, তার কাজ বাড়ল। গ্রামবাসীদের হিতার্থে বাঘ-ডুমাকে বশ করতে হবে তাকে। রবিবারে রোহিণী যোগে বাঘডুমাকে ডেকে খুঁটি পুঁতে তাকে আটকে ফেলবে সে। জেটি যোগে বন-বন্ধন করে দিলে বাঘ আর তা ডিঙিয়ে এদিকে আসতে পারবে না। কত প্রবীণতা কত বিচক্ষণতার প্রয়োজন এই কাজটুকুর জন্য। ডিসারী আকাশকে নমস্কার করে বলল—"তুমিই উদ্ধার করবে, তুমিই জানো।"

আলিস্থি ভেঙে ধুঙ্গিআ ধরিয়ে সেই পাথরের উপর বসে বসে ডিসারী পাহাড়ের উপরে শকুনদের পাঁয়তারা দেখতে লাগল। বার বার মনে অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল জাগছিল—আর কিছু তার আছে না নেই? হাড় আর চামড়াটুকু নিয়ে ছিল তো সে এক মুঠো একটি মানুষ, আর কি বা এতক্ষণ আছে তার?

এত দিনের সম্বন্ধ দু'জনের মধ্যে। দু'জনে মিলে না গাঁয়ের ধর্মবল। ডিসারী যোগ দেবে, পূজা করতে করতে বেজুণী নাচবে, মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কারো একটু সরদি হলে, কারো হাত মচকে গেলে—সামান্য অনিষ্ট দূর করতে হলে ডিসারী আর বেজুণী। বাঘে খেয়েছে বলে আজ পূজা করতে হবে, এ সময়ে বেজুণী থাকত যদি! বেজুণীর পন্থা যাই হোক ডিসারীর রোজকার জীবনের সে ছিল ডিসারীর সঙ্গী, একটা বল—আজ আর নেই।

লোকেদের চলাফেরা শুরু হল। ঘুরে ফিরে সেই আলোচনা, বেজুণীর মৃত্যু। তা নিয়ে বেশী কথা বললে কেবল ভয় বাড়ে। নীচের ক্ষেতের দিকে তাকালে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। গোষ্ঠীর একজনকে বাঘে খেল, এবার আরো বাঘে খাওয়া শুরু হবে। মানুষের মাংসের স্বাদ

একবার মুখে লেগেছে, এখন থেকে মানুষই তার খাদ্য। মানুষের চলার পথে ওত পেতে বসে থাকবে। ক্ষেতে কাজ করতে গেলে কোনো একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বে, দিনের বেলায় ক্ষেতে, সন্ধ্যায় ক্ষেত থেকে ফেরার পথে, আর রাত্রিতে গ্রামের নীচেকার ঢালুতে জেগে বসে থাকবে। দু'দিনে একটি মাথা চাই তার, যে গ্রাম থেকেই হোক জুটিয়ে নেবে। সে মহাবল, সে দেবতা, কারো প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব নেই।

বনের ভিতরে ঘর করে বন এড়িয়ে থাকা যায় না, বাঘে খাবেই। এই আলোচনায় দিউড়ু সাঁওতা যোগ দিল। সকালে উঠেই বারিককে ডাকিয়ে চার জনকে সঙ্গে দিয়ে পুলিসের থানায় খবর দিতে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সরকারের 'অর্ডার', 'রিপোর্ট' না পাঠালে শাস্তি হবে। বাঘ লাগার সময় এক দল লোক পুলিসকে খবর দিয়ে ফেরার পথে আর এক দলের সঙ্গে দেখা হয়, বাঘ মানুষ খেতে থাকে, পুলিসের কাছে খবরও যেতে থাকে। দিউড়ু সাঁওতা বললে, ''কাল দুপুর নাগাদ পুলিসের কাছে খবর পৌঁছে যাবে, তার পর চার দিনের মধ্যে কেউ আসলে আসতে পারে !"

"তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছিস্ ভাল করেছিস্, সাঁওতা, নইলে আবার—"। পুলিস এসে তদন্ত করে যাবে যে মানুষটা বাঘের মুখে গেছে না আর কোনো রকমে মরেছে। বাঘ মারবার জন্য পুলিস আসে না।"

কেউ বাঘ মারতে আসবে না. বাঘ মরলে হঠাৎ এক দিন মরবে কন্ধের ওড়িআ নলিতে। সেজন্যও ডিসারীর যোগের দরকার। চার হাত লম্বা নলি একটা গাছে বেঁধে নেওয়া হয়। বারুদের পলতেতে আগুন দিলে অনেকক্ষণ ধরে সর্-সর্ সর্-সর্ শব্দ হতে থাকে, বাঘ যেদিকে যাবে শিকারী নলির মুখ সেই দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তোপ পড়ার কত শব্দ করে নলি ফুটবে, যদি বাঘ পালিয়ে গিয়ে না থাকে আর তার গায়ে যদি গুলি লাগে তাহলে সে নিশ্চয় মরবে। সব কিছুর জন্যই ডিসারীর নক্ষত্রের যোগ দরকার। এই কথা নিয়ে নানা এলোমেলো গল্প চলছিল। ডিসারী আজ দ্বিগুণ জোরে তার যোগের ক্ষমতা প্রচার করছে। যোগ লঙ্ঘন করলে কেমন করে ক্রিয়া নিষ্ফল হয় সেই কথা বিপদে পড়ে হাঁ করে শুনতে থাকা গোষ্ঠীর লোকদের বোঝাতে বোঝাতে ডিসারী খুব জোরে জোরে ধোঁয়া ছাড়ছে।

দলবদ্ধভাবে যারা ঘর সংসার করে তাদের একজনের বিপদ হলে সকলে নিজের বিপদ মনে করে অভিভূত হয়ে পড়ে। তাদের মনে বল দিয়ে ভরসা দিয়ে খাড়া করে রাখা ডিসারীর কাজ, সেই তার পৌরহিত্য।

"নিয়ম মেনে চললে কোনো দুঃখকষ্টে পড়তে হবে না"—বলছিল ডিসারী, "যা করবি জিজ্ঞেস করে করবি, বুঝেশুনে করবি, ভয় কিসের—"

মনের বিহ্বলতা হেতু ছেলে-ছোকরারাও ডিসারীর কথার প্রতিবাদ করতে পারল না। ডিসারীর কথাগুলি মৃত বেজুণীর স্মৃতি মনে এনে দেয়। এমনি কত কথাই সে বলে যাচ্ছিল যা সাধারণ মানুষ নিজের জীবনকালের মধ্যে অনুভব করতে পারে না। কত জ্ঞানের কথা বেরুচ্ছিল সেই ফোকলা মুখ থেকে, এমন সব কথা যাতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, মাথা ঘুরে ওঠে। তবু তো অদৃস্টের ডোর বেজুণীকে টেনে নিয়ে গেল বাঘের পেটে, সব তন্ত্রমন্ত্রের অলৌকিক জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল তাতেই।

ডিসারী বলছিল, "এই দেখ, বেজুণী মল। বুড়ো মানুষ, উনুন-ভাতের কাছে বসে থাকবার কথা, আমরা কি তাকে দিতাম থুতাম না, তাকে চাইতাম না? ক্ষেতে ঘুরতে যাওয়ায় তার কি কাজ? যদি বা গেল তো গেল, পাগলের মতো এই বর্ষার জঙ্গলে ঢোকবার কি দরকার ছিল? কেন সেখানে গেল, কেন তাকে বাঘে নিল বলতে পারে কেউ? সব ভাগ্য, নক্ষত্রের যোগ, তাঁদেরই দয়া। এই যোগের ফেরে পড়ে খুব বুদ্ধিমান জাত বা মানুষও ঠিক সময়টিতে একটা কিছু ভুল করে বসে, সোজা এগিয়ে যায় মরণের মুখে। কেন আজ রায়ত রায়ত, সাহুকার সাহুকার, কেন আজ এক একটা গোটা গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর কাছে মাথা বিকিয়ে গোলাম হয়ে আছে? কেউ কয়েদ দেয়, কেউ কয়েদ ভোগ করে, কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার,—কেন? (উপরের দিকে হতে তুলে) সব ওঁদেরই লীলা, সব ওঁদের মনের খেয়াল। তার আগুপিছুও নেই, ভালোমন্দও নেই, ওঁরাও অদৃষ্টের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে কার জন্য কোন ঘটনা গড়ে দেন। তাই তো আমরা বলি ছোট হোক বড় হোক সব কিছুতে যোগ মেনে চল্, যোগ মেনে কাজ কর, তারপর যাই হোক নিজের দোষ নেই।

"কলা গাছ লাগাবি লদা যোগে, আমগাছ লাগাবি জেটি যোগে, কমলা তুলবি মেড়িংশিরা যোগে, গোল সাগুর গাছ কাটবি সমজা যোগে,

শিআরির ফল আনবি রোহিনী যোগে, সাতাশ নক্ষত্রে সাতাশ যোগ। বসলে যোগ, চললে যোগ, যোগ না মানবি কেন?"

ডিসারীর ব্যাখ্যানে বাধা পড়ল, পাড়ার ভিতর থেকে মেয়েদের কান্নার রোল উঠল, সবাই এক সঙ্গে কাঁদতে শুরু করেছে। সত্যিই তো বেজুণী মরেছে গ্রাম-গোষ্ঠী তার জন্য কাঁদবে না? পুরুষদের চেয়ে কন্ধনীদেরই উপস্থিত কর্তব্যজ্ঞান প্রকাশ পেল। সকালে উঠে ঘরে ঘরে এ ওকে ডেকে নিয়ে প্রাচীন প্রথা অনুসারে গ্রামেব মাঝখানে ভেরামনে (সাধারণের বসবার জায়গা) গোল হয়ে বসে গিয়েছিল। সকলে এসে জমলে প্রস্তুত হয়ে ঐকতান আরম্ভ করে দিল, মৃতের জন্য শোক—

অলো অলো, হাতেয়ুঁ হাতেয়ুঁ, পাপু

(হায় হায়, মরে গেল, মরে গেল, হা কপাল)

নিংগে ওইয়া তানাকি, নিংগে তিঞ্জাতানাকি, পাপু

(তোকে শুষে নিল কি, তোকে খেয়ে ফেলল কি, হা কপাল)

ধীরে ধীরে মরণ-সঙ্গীতের এই ছন্দ হয়ে উঠল বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না, ক্রমে করুণ ক্রন্দন, সকলের চোখ থেকে জল পডতে লাগল, মনের আবেগ বাড়তে লাগল, দুই হাতে নিজেদের গাল খামচে মুখ খামচে হু হু করে গাঁয়ের সব স্ত্রীলোক কাঁদতে লাগল, সে কান্না আর থামতে চায় না।

মানুষ হয়ে জন্মালে কাঁদবার কারণের অভাব নেই, কারো বাপ মরেছে কারো ছেলে মরেছে, কারো কেউ না মরে থাকলে অন্যান্য দুঃখ আছে, কত রকমেব অভাবের পোড়া দাগ, কত বিচ্ছেদের ক্ষতি। কাঁদব বলে কোমর বেঁধে বসলে স্মরণে আসে কাঁদবার কতই উচিত কারণ, তারপর বিলাপ আপনি বেরোয়, তা অদৃশ্য দেবতার জন্যই হোক আর বেজুণীর জন্যই হোক, তারপর কেবল স্রোতের মুখে বয়ে যাওয়া জলকে নালা কেটে চালিয়ে দেওয়া।

বেজুণী গেছে। চাষের ক্ষেতের কাছের পাহাড়েব উপরে এখনও শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে, গ্রামে বিলাপ উঠছে—।

কে সে বেজুণী? সে কার কে? তার ছেলে নেই মেয়ে নেই, রক্ত সম্পর্কের কেউ নেই, কেউ নেই তার, সে মরে ভূত হয়েছে। তার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, শত্রু নেই, যে যত দিন থেকে তাকে দেখেছে বুড়ীই দেখেছে, তার কাছ

থেকে কাজ নিয়েছে, যেন সে ধরনের কাজ তার কাছ থেকে আদায় করার হকদার সবাই। গাঁয়ের ও মুড়োয় মুর্বাঝোপের ভাঙা বেড়ার ভিতরে ভাঙা-চোরা চালাঘরে নির্জনে থাকত সে এক বুড়ী, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ভূত, দূরে নিরালায় বসে কি যেন সব ভয়ঙ্কর কাজ করত সে, কেউ কেউ কানাকানি করে যে সে সাপ পুষত, শেয়ালের সঙ্গে কথা বলত, মরা মানুষদের দেখতে পেত। তাকে দেখলে ভয় লাগে, চোখে চোখে চাওয়া যায় না, মানুষের জীবনের তীরে তীরে জীবন কাটিয়ে সেই ভয়ঙ্কর উপায়েই সে মারা গেল। ভাবলে স্বার্থে টান পড়ে না, মায়া হয় না, তার কেউ নেই।

তবু তার জন্য গ্রাম কাঁদবে।

সে ছিল গোষ্ঠীর এক জন।

॥ নব্বই ॥

রবিবার দুপুর বেলা।

আসে পাশের গ্রামের কন্ধেরা কাতার দিয়ে চলেছে মিণিআপায় গাঁয়ে।

হাতে বর্শা, কাঁধে টাঙ্গি, কারও কাঁধে ওড়িআ নলি। হাতে লাঠিতে বাঁক করে পথের জন্য বিদেশের জন্য নিয়ে চলেছে মাড়ুয়ার আটা লাউয়ের খোল আর কাঠ। বৃষ্টির জন্য পিঠে পাতার ছাতা আর বর্ষাতি। কোনো কোনো দলে দলের লোকেদের সকলের ছাতা-বর্ষাতি একজন মানুষই বইছে একই রকম লেংটি, ফুর্‌ফুর্ করছে চুলের জট, মাথায় কানে কোমরে যেখানে পারে সেখানে ধুঙ্গিআ গোঁজা। বনের মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী বনের পথে এক জনের পিছনে একজন চলেছে। খাল জায়গায়, ঘাঁটিতে, চৌমাথায় কয়েক গ্রামের লোক একসঙ্গে হয়, দল বাড়ে। একই রকম সকলের চোখে মুখে যেন থম ধরা মেঘের ছায়া, সেই গম্ভীর ভাব, সেই এক কথা—বাঘ লেগেছে। নীচের কুট্টিং গাঁয়ের সাঁওতা এসেছে, সোনা সাঁওতা—পাঁচ হাত উঁচু চেহারা, কেন্দু অড়ারর চাচিরি সাঁওতা—সাড়ে তিন হাত। চারিদিক থেকে লোকেরা আসছে, কত রকম নাম তাদের গাঁয়ের, তাদের 'গুড়া'র—খালকণা পিপলপদর, কেশাকারেড়ি, দামনগণ্ডা, বড়শংকা, কাইপদর,

ভালুজোড়ি, বাঘমারি, বল্লিকারা—কত গাঁ। সব গাঁয়ের প্রতিনিধি এসেছে। মিণিআপায়ুতে বাঘে খেয়েছে তারি প্রতিকারের পূজা হবে। লাঠিতে লঙ্কামরিচ বেঁধে খবর পাঠানো হয়েছিল, খবর পাওয়ামাত্র চলে এসেছে সবাই'। বাইরের বিপদের সময় কন্ধরা এক জোট, এবার হয়েছে এই বাঘ মারা পর্বের জন্য।

নানা গাঁয়ের লোক পথ চলতে একত্র হওয়ায় নানা রকমের আলোচনা হচ্ছে—কত রকম তার ঠিক ঠিকানা নেই, ইয়ত্তা নেই: বিপদ সম্বন্ধে, নিজেদের সম্বন্ধে, আপন জাতির কুঁড়েমি সম্বন্ধে। বাইরের শত্রু হামলা করেছে এক জোট হতে হবে, ফল তার যাই হোক—কন্ধদের জাতিগত লক্ষণ। হাতিয়ার কেবল ঠেঙ্গা-লাঠি, তীর ধনুক বর্শা, এইটুকুতে হিংস্র জন্তু মরে না, ওডিআ নলিও সুবিধার নয়, বেজায় ভারী, বাঘ মারতে হলে চাই চটপট কাজ, যাতে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়, নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। কবে কোন যুগে মানুষ বলশালী ছিল, বাঘের মত শত্রুকে লাঠিপেটা করে জব্দ করত, খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেলত। সময় বদলে গেছে, বাঘের শক্তি বল নাকি বেড়েছে, মানুষের বল কমেছে, এখন গুপ্ত অস্ত্রের কেরামত বেশী। 'সী—মা' অর্থাৎ বিদেশী বন্দুক যখন ইচ্ছে ভাঁজ করে গুলি ভরা যায়, যেমনটি তাকে বলা যায় তেমনটি করে, চট করে মুখ ঘোরানো যায়, আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিশানা করে গুড়ুম করে ছুঁড়ে দিলে ধাঁই করে গুলি লাগা সুনিশ্চিত। দূর থেকে অস্ত্র প্রয়োগ করা যায়, বাঘ টেরও পাবে না, ঠিক সে নিজে যে উপায়ে মারে সেই উপায়ে তাকে মারা যায়।

বাঘ বলবান্ বটে কিন্তু সামনাসামনি মারে না, চোর সে, অতি কৌশলী। সেই যে ঢাপু* সাহেব ছিল, নাচের মাঝ থেকে দুই বগলে দুটি ধাংড়ী তুলে নিয়ে বাঘের মত কোথায় কোন পাহাড়ের খাঁজে লুকাত, 'সী—মা' বন্দুক দিয়ে একটার পর একটা ডোরাকাটা বাঘ শুইয়ে ফেলত। কেমন অস্ত্র তার, কি হালকা। কন্ধের ভাগ্যে সেরকম অস্ত্র জোটে না, গাঁয়ের সমস্ত জমি বেচে ফেললে সেইরকম বন্দুক একটা ছোট মত কেনাও যেত বা, কিন্তু 'অডর' (অর্ডার) নেই, 'লাইসন্' (লাইসেন্স্) নিতে হয়। 'লাইসন্' চাইতে গেলে অধিকারী হয়তো বলবে—'তুই লেখা পড়া জানিস্ না, তোর মাথার ঠিক নেই,

* ইংরাজী 'ডাফ্' নামের অপভ্রংশ।

তোদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আছে, মারামারি করে মারবি মরবি, তুই এর যোগ্য নস্।' কোন ভরসায় কন্ধ যাবে এত বড় জিনিস চাইতে ?

দূরে মালকানগিরি পর্বতের জঙ্গলে 'বণ্ডা পরজা' জাতির লোকেরা আছে। বেঁটে বেঁটে মানুষ, ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল, হাতে শুধু তীর ধনুক। তাদের দেশে কখনো বাঘে উৎপাত করলে সকলে একজোট হয়ে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে বাঘের পিছনে ধাওয়া করে। নিজে ঘায়েল হয়, বাঘকে মারে, পোড়ায়, তার মাংস খায়, তবে গিয়ে তাদের রিষ শান্ত হয়, তারা ঘরে ফেরে। তাদের এই একজোট হওয়া আর প্রাণের মায়া ছাড়া সাহসের জন্য তাদের দেশে বাঘের উৎপাত নেই, নিশ্চিন্তে জমি চাষ করে, বাঘ তার বনরাজ্যে মুখ লুকিয়ে ঘোরে।

এরাই বণ্ডা পরজা। এদের স্ত্রীলোকদের কাপড় পরার উপর অভিশাপ আছে সীতা দেবীর। বনবাসের সময়ে সীতা দেবী ডুড়ুমার* জলে নগ্ন হয়ে স্নান করছিলেন. বণ্ডা পরজা স্ত্রীলোকেরা তাই দেখে নাকি ঠাট্টা করেছিল, তাই তাঁর অভিশাপে সেই দিন থেকে তারা উলঙ্গ, নেড়া মাথা। সেই বণ্ডা পরজার দেশে স্ত্রীলোকেরা এত স্বাধীন যে পুরুষদের সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে পাছায় ছেঁকা দেয়। যে পুরুষ ছটফট করে না, চমকায় না, তাকেই বেছে নিয়ে বিয়ে করে। সেই বামনের মতো ছোট ছোট বীরাঙ্গনারা সারা দেহে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে অসাধ্য সাধন করে। কোণ্ডাকাম্বেরু আর ভালুমেলার পর্বতকন্দরে ঘুরে ঘুরে বুনো গয়াল, বুনো মোষ শিকারও করে আনে, ঘর গেরস্থালিও সামলায়, রোজগার করে, পুরুষদের পোষে।

মালকানগিরি সে কোথায় কত দূর মিণিআপায়ু থেকে, সে কেবল সেই বুড়ী দিদিমার গল্পকাহিনী। কন্ধ বণ্ডা পরজার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারবে না, কারণ সে সভ্যতর, বাঘের মাংস সে খায় না। সভ্য সমাজ সভ্য শাসনে যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে চক্রবর্তীর কল্যাণে শান্ত শিষ্ট হয়ে বেজুণী আর ডিসারীর ধর্ম, দেবতা, পুনর্জন্ম, পুরুষকার—এই সব শুনতে শুনতে তার বন্য দুঃসাহস ঘুচে গেছে, সে শান্ত শিষ্ট হয়েছে, অনাসক্ত হয়েছে,

* মাছকুণ্ড নদীর প্রসিদ্ধ ডুড়ুমা জলপ্রপাত, ইহা হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ হয়।

তাদের জোট সমগ্র জাতির জোট থেকে কেটে গিয়ে হয়েছে গাঁয়ের শাসন মানা এক একটি গাঁয়ে এক একটি গোষ্ঠী। গাঁয়ের স্বার্থের জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে বিবাদ, সীমানার গাছ নিয়ে ঝগড়া, গরুমারা। দশ গাঁয়ের লোক এক জোট হওয়া কেবল উপরে উপরে। এ গাঁয়ের বেজুণীকে বাঘে খেয়েছে বলে ও গাঁয়ের প্রজারা বাঘের পিছনে ধাওয়া করে কাঁটার খোঁচাটুকু সইতেও মনে মনে নারাজ।

এমনি অবস্থায় পশুবলে বলীয়ান্ বনের শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে, সেই হিংস্র ভয়কে প্রতিরোধ করতে কন্ধের সম্বল কেবল মন্ত্রবল। পূজা দেওয়া হবে, হাঁটু সমান উঁচু মণ্ডপ তৈরী হবে। তার উপরে মুরগীর ডিম ভেঙে রাখা হবে, ধূপ জ্বালানো হবে, পাথরকে ঠাকুর করে তার কাছে প্রদীপ জ্বেলে মুরগীর রক্ত আর ঘরে তৈরী মদ ঢেলে মানত করা হবে। বুড়ীদের উপরে দেবতার ভর হবে, তারা কিলকিলা রব ছাড়তে ছাড়তে ভূতের মতন লাফালাফি করবে। পুরুষানুক্রমে প্রচলিত পদ্ধতিতে গ্রামের পুরোধা বুড়ো ডিসারী বাঘের বল এবং হিংসা ঘুচাবার জন্য "আংডুগুরু মাংডুগুরু—কালি গাই পেতা গাই—দিকি রাই পাইক রাই" করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্র উচ্চারণ করবার পর খোঁটা পুঁতে দেবে, লোকেরা সবাই বনের দিকে লাঠি টাঙ্গি আফসে হুলুস্থূল চীৎকার করবে—

"হো বাঘ, হো বাঘডুমা, হো মহাপুরু, হো বাঘ-দেবতা বাঘরাজা, তুমি তোমার রাজ্যেই থাক, যেটুকু এসেছিলে সেইটুকুই, এদিকে আর এসো না, এই খুঁটি ডিঙিয়ে আমাদের চাষের জমিতে নেমো না। আমাদের ডিসারী মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, আমরা সকলে মিলে আজ মুখে তোমায় বারণ করে দিলাম, মন্ত্রে বারণ করে দিলাম, তুমি আর আমাদের জমিতে নেমো না, তুমি আর আমাদের রক্ত মাংস খেও না কি মানুষের মাংস খেও না। হে হিংসার আত্মা বাঘডুমা, 'নিনু ইম্বি জিরুওআতি এজিরু হালামুডে' (তুমি যে পথে এসেছিলে সেই পথে চলে যাও)। আমাদের কাকুতি-মিনতি শোনো। মহাপ্রু, আমাদের 'দিকু' (দুরবস্থা) দেখো, দেখে তুমি দয়া করে আর এসো না, কেঁদে ককিয়ে বলছি, কি অস্ত্র আছে যে তোমায় ঠেকাব? কথা শোনো, খুঁটি পুঁতে দিলাম, আর এসো না।"

এত প্রস্তাবনা সত্ত্বেও বাঘ একটির পর একটি নিয়ে যায়, যতই বলা হোক

বাঘ কথা শোনে না, কি আশ্চর্য অভদ্র গোঁয়ার সে। গরুর রক্তে স্নান করে, মানুষের রক্তে জটা বেঁধে লাল চেহারা করে, মাংস খায়, রক্ত খায়, গড়াগড়ি দেয়, মাতামাতি করে—এমনি চলে বাঘলাগা শীত শেষ হয়ে চৈত্র মাসে বন শুকিয়ে যাওয়া অবধি।

বন্দিকারের সোভেনা কন্ধ, শলপু কন্ধ, পোড়াপদরের লিংগা সাঁওতা, পাটিশীলের কাহ্নু সাঁওতা, কাট্রাগেড়ার রেল্লি সাঁওতা, সুগুরিগুড়ার কিআ সাঁওতা, বুর্জার বেহ্নু সাঁওতা, চনাবাড়র অর্জু, মিনাপাইর সুন্দ্রু কন্ধ, বড় কুট্টিংগার নিলি কন্ধ, গিলিপুটের কেশব জানি, মহুলকণার শিব, কালিয়া ঝোলার নচিকামালতি—কত গাঁয়ের কত কন্ধ মোড়ল এমনি আলোচনা করতে করতে চলেছে, কোথায় একটা বুড়ী মরেছে তার জন্য এত কাণ্ড। সাঁওতাদের কথার ওজন আছে, তাই বাকী এত দলে দলে লোক কখনো এর কথায় কখনো ওর কথায় "হোই—হোই" করে সায় দিচ্ছে। এমনি নানা দিকের নানা রকমের গল্পে পথের ক্লান্তি ভুলে থাকা যায়, মুখ চলতেই থাকে।

বুড়ো শলপু বললে, "যা হবার হয়ে গেছে। তেমনি কপাল পড়লেই না বাঘে খেতে আসে! নইলে কত লোক তো বাঘের মুখে পড়েও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে।"

"ঠিক কথা, সবই কপাল। তেমন কপাল পড়লেই বাঘে খায়, কপালে থাকলে বাঘ মরে"—কেশব জানি বললে।

শলপু বললে, "ঠিক ঠিক, দশা কাকে ছাড়ে, কি মানুষ, কি পশু আর কি রাজ্য, দশার অধীন সবাই। বাঘ কি তার আপন ইচ্ছায় খায়? যারা জানে তারা বলে যে ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বাঘ নিজের হাত দেখে—আজ শিকার জুটবে কি না, জুটলে কেমন করে জুটবে সব সে দেখতে পায়। নিজের হাতে একবার সে ছবি দেখে নিলে সে নদী ঝোরা ডিঙিয়ে পাহাড়ে পর্বতে উঠে দৌড়ে দৌড়ে এসে যেন কিছু জানে না এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। শিকার আসে, আর বাঘ ধরে নিয়ে যায়,—সহজ ব্যাপার। ধন্য সে কালপুরুষ"—শলপু বললে।

সোভেনা বললে, "সত্যি হে, মিছেই লোকে বলে যে বাঘ গন্ধ পেয়ে ছুটে আসে। আমাদের গায়ে এমন কি গন্ধ মাখানো রয়েছে? 'টাপু' সাহেব গায়ে কি গন্ধ মেখে রেখেছিল?"

চনাবাড়ির আজু বললে, "না, মিথ্যে নয়। যে মরবে, যার মরণ নিকট, তার গা থেকে এক রকম গন্ধ বেরোয়। সে গন্ধ টের পায় শেয়াল কুকুর শকুন, সব চাইতে বেশী টের পায় ডোরাকাটা বড় বাঘ, তাই সে জল পেরিয়ে এসে ঠিক তাঁকেই ধরে। আমি নিজেও গন্ধ টের পাই। আমার এক বুড়ো মামা ছিল, মরবার আগে গায়ে কি গন্ধই হয়েছিল! আমি বললাম —মামা, তোর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি আমি। সে বললে, কই তোর গায়ের গন্ধ আমি পাচ্ছি না তো। আমি বললাম—মামা, তোর রোগ হয়েছে, তোঁর গায়ের গন্ধ লাগছে আমার। তার চার দিন পরেই মামা মরল। আমিই তো টের পেলাম আর বাঘ টের পাবে না? তার হাতে পাঁজী আছে, সব আছে, সে তো কালপুরুষ?"

পাটিশীলের কাঙ্গু বললে. "কপালে থাকলে বাঘে বাঘে লড়াই করে মরে। চিতাবাঘকে 'মহাবল' কামড়ে দেয়, যে বনে ডোরাকাটা বাঘ থাকে সে বনে চিতা বাঘ লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। সেই রকম একদিন আমাদের গ্রামের পাহাড়ের কাছে সারারাত বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, দুই ডোরাকাটা মহাপ্রভুর লড়াই হচ্ছিল। এমন ভয় করছিল যে সারা রাত আমরা কেউ ঘুমাইনি। কত রকমের বিকট হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লড়াই করে সকালে সব চুপ চাপ। রোদ উঠল, আমরা দেখতে গেলাম। উঃ সে কি দেখলাম! ছয় ছয় হাত লম্বা দুটো ডোরাকাটা কামড়াকামড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি রক্তারক্তি করে মরে পড়ে আছে। মাটির উপর সে কি দাপা-দাপি আঁচড়াআঁচড়ি কাণ্ড, মাটি একেবারে খুঁড়ে ফেলেছিল., ঘাস পাতা কুটি কুটি হয়ে পড়ে ছিল, পাথর সব এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। আসে পাশের ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় গাছ-পালা আঁচড়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। দেখলাম আর বললাম—হে ধর্ম, তোর দয়া, এমনি করে যদি সব বাঘ মরে যায়, মানুষ সুখে থাকে।"

সোভেনা বললে, "মরবে, অমনি করেই মরবে, কিন্তু তার জন্য যোগ চাই, লগ্ন চাই। সেই লগ্ন আসতে আসতে তত দিনে আমরা মরে আমাদের ছেলেরা মরে আমাদের নাতিদের পুতিরাও মরে যাবে। যেই থাক আমরা তো থাকব না। বরং আমরা এতগুলো লোক জুটেছি, আমাদের হাতে যা অস্ত্র আছে তাই নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে বাঘকে ঘায়েল করলে সে

শুকিয়ে মরবে, শিগগির মরবে। যোগ আসবে বলে আমরা কত দিন বসে থাকব ?”

“বেশ, তুই যা বাঘ মারবি, তোর নাম হবে বাঘমারু”—শলপু রুক্ষ তিরস্কার করলে।

নচিকামালিতি বললে, “হাঁ হে ভাই, ঠাট্টা করছ তুমি! বাঘ আমাদের ধরে ধরে খেতে থাকবে আর আমরা বসে থাকব কবে যোগ পড়বে বাঘ আপনি মরবে—সেই অপেক্ষায়! বেশ বলছ! আরে বাপু, নিজে নিজের কথা না ভাবলে আর কেউ এসে আমাদের বনের বাঘ মেরে দিয়ে যাবে তোমরা বিশ্বাস করো ? প্রত্যেক বছরই বর্ষার সময় বাঘে খায়, শীতের সময় আরো বেশী খায়, হাটে বাটে কেঁদে কেঁদে বাঘ বাঘ করে ঘুরে ঘুরে আমরা হয়রান! লোকে কি শোনেনা, না জানেনা যে আমাদের বন দেশে বর্ষা-কালে শ' শ' মানুষ বাঘের পেটে যায় ? শহরের লোকে আহা আহা বলে লোক-দেখানো দুঃখই করবে, নিজেদের কোঠাবাড়ি ছেড়ে, শহরের আলো বাতি যান-বাহন ছেড়ে কার গরজ পড়েছে পরের জন্য বাঘের সঙ্গে বাদ সাধতে ছুটে আসবে এই বনে হয়রান হবার জন্য ? আমাদের দেশ তাদের জানা নেই, রাস্তা জানা নেই, থাকবার জন্য পাকাবাড়ি নেই, খাবার জন্য তাদের দেশের খাবার নেই, কে পারে এত অসুবিধা সইতে ? শুধু কি তাই ? বাঘ মারতে এলেই কি বাঘ পাওয়া যাবে না তাকে মারা যাবে ? আমাদের পানুড্রামালি, কোড়িংগামালি, বাঘডঙ্গর এই সব জায়গার বনজঙ্গলে কত দিন থেকে বাঘ গুহার মধ্যে ঢুকে ঢুকে বাসা করে রয়েছে, তাদের খুঁজে খুঁজে খেদিয়ে খেদিয়ে মারতে সময় লাগবে। পরকে ডেকে লাভ নেই, নিজেরাই যতটা পারি—”

শিব জানী বললে, “এ কথা তো ঠিক, কিন্তু বাঘকে মারবে কে ? আমাদের শাস্ত্রে বলে বাঘকে পূজা করো। বাঘ তো কেবল জন্তুই নয়, সে আমাদের দেবতা। কথা আছে ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কেউ যদি 'মহাবল' মারে তাহলে তার বংশ লোপ হবে। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে যাবে বাঘ-ভক্তি গেল বাঘ-ভক্তি গেল। ধরো যদি নিয়ম অমান্য করে বাঘ-ভক্তি ভুলে কেউ যায়ই বাঘ মারতে, মারবেই বা কেমন করে ? আমরা তাকে দেখতে পাব না, আর সে আমাদের কাছেই আমাদের মধ্যে থেকেই সব দেখতে থাকবে।

আমরা আমাদের মাচান বেঁধে তৈরী হয়ে নিরাপদে ওড়িআ নলি নিয়ে বাঘ মারতে যাব আর সে পিছনের কোনো পাথরের ফাঁক থেকে হঠাৎ বেরিয়ে চক্ষের পলকে আমাদের ঘাড় ভেঙে মুখে করে নিয়ে পালিয়ে যাবে। এই তো সেদিন আমি আমার কুকুর দস্‌রুকে নিয়ে আমাদের গাঁ মহুলকণার খেন্দার কাছে আমার ক্ষেত দেখতে যাচ্ছি, ঠিক ছয় হাত দূরে বড় চাঁপা গাছের নীচে পাথরের আড়াল থেকে 'মহাবল' উঠে দাঁড়াল, গোঁ গোঁ করতে লাগল। ভাবলাম এবার তো মরলাম। বন্দুক তুললাম। বললাম,—'মহাপ্রু, তুমি আমাকে খেতে এসেছ, কিন্তু মরতে আমার মোটে ইচ্ছে হচ্ছে না মহাপ্রু, ঘরে বউটা আছে কাঁদবে, দু'টা কাচ্চাবাচ্চা আছে, না খেয়ে মরবে। তুমি চলে যাও মহাপ্রু, নইলে বন্দুক ছুঁড়ব, আমার দোষ নেই মহাপ্রু। রক্ষা করো, আমাকে পাপে ডুবিও না।' বাঘ মহাপ্রভু হাঁ করে শাবলের মত মোটা দাঁত বার করে হাসলে। আমার তো প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। বাঘ মাটিতে লেজ আছড়াচ্ছে, কান দুটোকে মাথার সঙ্গে লেপটে দিয়ে ঘাড় কুঁচকে মাথাটা এগিয়ে দিলে। বুঝলাম—এবার লাফ দেবে। কুকুরকে বললাম—'বাপু দস্‌রু তোর মাকে বলে দি গে যা, তুই পালা।' দস্‌রু বেটা পালাল না, বসে রইল। কি আর করি বলো, বন্দুক তুলে বললাম—'মহাপ্রু, চার ধর্ম তোর, আমার দোষ নেই।' বন্দুক সোজা টিপ করে দাগলাম গুড়ুম করে। কেমন করে জানি বুঝতে পারল, দৌড়তে দৌড়তে পালিয়ে গেল। দেখ তো কে জানত যে ঐ জায়গাতেই সে বেরিয়ে পড়বে?" শিব জানী পাকা শিকারী, কিন্তু সে বড়াই করে না।

মিনাপাইয়ের সুন্দ্রু বললে, "হাঁ হে, বাঘ বাঘ করতে করতে বন তো পোড়ু করে করে শেষ হয়ে যাবে। যেদিন হোক একদিন তো শেষ হবেই, তখন আর বাঘ কোথায় থাকবে দেখা যাবে। মামাকে বাসু বাসু (এস এস) বলে ডেকে কুকুরপেটা করে শেষ করে দেব আমরা। শালার যত দিন ভোগ করার আছে গাঁ উজাড় করতে থাকুক, খেতে থাকুক, তার উপর আমাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারের চোখের জল পড়ুক।" সুন্দ্রু বুড়োর রাগ দেখে সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল। শিব জানী বললে, "অমন কথা বলা বিধি নয়, কোথাও বসে হয়তো শুনছে।"

শীতের সময় বনে বনে কেবল বাঘের গল্প।

রবিবার ঢুপুর। ঐ মিণিআপায়ুর বস্তি দেখা যাচ্ছে। মিণিআপায়ুর লোকেরা আসছে। ' গাঁয়ের মাঝে পূজার ধুম লেগেছে। ডিসারী ক্লান্ত হয়ে অলসভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে। লোকেরা আসছে দেখে ঢাক ঢোল টমক বেজে উঠল। বুড়ীদের উপরে দেবতাদের ভর হল, তারা নাচতে লাগল। আগন্তুক ভিন গাঁয়ের লোকেদের অপেক্ষা করবার আদৌ ইচ্ছে নেই, কোনো মতে তাড়াতাড়ি কাজ চুকে গেলে তারা নিজের নিজের গ্রামের পথ ধরে। বাঘ লাগার সময়, বাদলা দিন, হেনস্তা হওয়া পথ। "লগ্ন কখন ধরেছিস, ডিসারী?" মাটিতে পোঁতা খুঁটির দিকে হাত দেখিয়ে ডিসারী বললে, "আর দেরি নেই, জল খেতে ধোঁয়া খেতে লগ্ন পোঁছে যাবে।" বাজনদারদের ইঙ্গিত করে ডিসারী বললে, "বাজা, তাড়াতাড়ি করে বাজা, থামিস্ না।"

যত লোক এসেছিল সবাই এক সঙ্গে বসে পড়ল। কেবল চাষী নয় তো একটা সৈন্যদল যেন। কিন্তু সে বীরত্বের কোন মূল্য নেই। রক্ত আছে, মাংস আছে, টাঙ্গি আছে, নলি আছে, কিন্তু হাত তোলবার মতো সময় অনুকূল নয়, তাই মাথার ভিতরে কেবল ডিসারীর শ্লোক আর তন্ত্রমন্ত্রের অপেক্ষা। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কৌপীন একখানি পরে ডান হাতের উপর মুখ রেখে মাটিতে পোঁতা সেই খুঁটির দিকে তাকিয়ে মিণিআপায়ুর পাণ্ডু ডিসারী বসে আছে, ক্লান্ত উদাস চোখের দৃষ্টি কোথায় কোন দূরে, যেন সে সেখানে নেই। ফরসা চেহারা, আধবুড়ো হলেও তার ধাঁজ ধরন সুন্দর। লোকেরা কোলাহল করছে, বেজুণী কেমন করে মরল শত মুখে সেই কাহিনীর বয়ান হচ্ছে, হাটের মতো গোলমাল। স্থির হয়ে তার আসনে ভাগ্যবাদী পাণ্ডু ডিসারী বসে আছে, সেই খুঁটির দিকে মুখ করে, কোন অনাগত লগ্নের ধ্যানে। সরল বিশ্বাসী সাদাসিধে প্রাচীন সংস্কারসম্পন্ন কন্ধ সে।

এক ঘড়ি সময় গেল, ডিসারী হাঁক দিলে, "ওঠো, চলো।"

বাজনা বাজিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিণিআপায়ু গাঁয়ের লোকেরা আর সহানুভূতির ভার বয়ে আসা বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিরা এক সঙ্গে গ্রাম থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে পড়ল। বুনো কন্ধ, আপন দলের মধ্যে থাকলে বিভীষণ-দর্শন। কিন্তু এই ধুলোবালিমাখা কন্ধেরা এত বড় মিছিল করে,

চলেছে কেবল মন্ত্রযোগের ভাগী হতে। কারো বিশ্বাস নেই যে মাটিতে খোঁটা পুঁতে দিলেই আর বাঘ আসবে না, কিন্তু ডিসারীর বিশ্বাস আছে, সে বিশ্বাস না থাকলে তার জীবনের ভিত্তি থাকে না। সত্য আছে, সত্য আছে, মন্ত্র-শক্তি ছিল, মন্ত্র-শক্তি আছেও, লাঠি না ঘুরিয়েও সে হাততালি দিয়ে আর মুরুজ (খড়ি চাল ইত্যাদির রঙিন-গুঁড়ো) ছড়িয়ে দিয়েই বন থেকে সে বাঘকে দূর করে দেবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে ডিসারী বলে এমন মানুষ কি নেই যারা মন্ত্রবলে মুখ বন্ধ করে দেয়, সাপকে বন্ধন করে, 'পাতি' ফেলে বাঘকে ডাকলে বাঘ চলে আসে?

ডিসারী পাণ্ডু কন্ধ অটল বিশ্বাসে বলে, ঠিকমত মন্ত্র বলতে পারলে বন্দুকের মুখও বন্ধ করে দেওয়া যায়, কোনো কোনো জন্তুও এ বিদ্যা জানে, তাই শেয়ালকে গুলি মারলে বন্দুক অকেজো হয়ে যায়। ছিল এক শক্তিমান লোক, দুর্লভ মাঝি বলে একজন। রাজার বাড়িতে দশহরার যাত্রার সময় দেখিয়েছিল তাকে বন্দুকের গুলি করলে তার গায়ে গুলি লাগে না, গুলি সে হাতে লুফে নেয়। মন্ত্রশক্তি! পাণ্ডু জানী তা বিশ্বাস করে। সব সে জানে এমনিভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে নিয়ে চলে তার বন্য গোষ্ঠীকে পূজা দেবার জায়গায়। কম কথা বলে, যা বলে বিশ্বাসের কথা, সুদূরের কথা। কেউ তা নিয়ে প্রশ্ন করলে সরল উদাহরণ একটি তুলে ধরে তার সামনে, শান্ত সৌম্য হাসি হাসে। অবিশ্বাসীও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা ব'লে তার কথা কাটতে পারে না।

"হেই ওখানে" বলে লোকেরা বনের দিকে হাত দেখালে। দু'শ চোখ লেগে রইল সেইখানে। দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খোলা পাথুরে জায়গাটা, বাগানের মত পাতলা বন গজিয়েছে সেখানে, তার চারি-দিকে নিবিড় অরণ্য, ঐখানেই বিনা দোষে 'মহাবল' বুড়ী বেচারীব ঘাড় মটকেছিল। ভয়, ঘৃণা, রাগ—এক সঙ্গে মিলে কোলাহল। সরু একখানি হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে নিমেষে থামিয়ে দিলে পাণ্ডু ডিসারী। বললে, "চুপ করো।"

নিমেষে চুপ করে গিয়ে অপেক্ষা করে রইল এতগুলো মানুষ। এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়। বাঘে খাওয়া আর তার জন্য ডিসারীর পূজা বনদেশে লেগেই আছে। ডিসারী এখন পূজা করবে। পাথরের উপরে উঠে

আকাশের দিকে হাত তুলে ধর্মু'কে নিজের জাতির দুঃখ নিবেদন করবে। মানুষ নীচে পৃথিবীতে থেকে বিপত্তি ভোগ করছে, বার বার ডিসারী ধর্মু'কে সাক্ষী করবে,—"দেখ্ ধর্মু, তুই থাকতে ভাগ্যের এত বিড়ম্বনা, এত দুঃখ দুর্দশা, ঝড় বৃষ্টি অজন্মা, বাঘ লাগা, হাহাকার।" শেষ বেলায় রোদের তেজ হলদে হয়ে এসেছে, দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে লেগে আছে মেঘের অভ্র-পর্দা। ডিসারী পাথরের উপরে উঠল, ধর্মু'র দিকে মুখ তুলে আকাশের দিকে হাত বাড়াল, গম্ভীর হয়ে দেবতার উদ্বোধন করল।

"দেখ্ ধর্মু, দেখ্ তোর ছেলেমেয়ের দুর্দশা।

"তোর নিয়ম মেনে চলি, কারও সঙ্গে বাদ করি না শত্রুতা করি না, নিজেদের মাটি কেটে কেটে জঙ্গলের ভিতরে পাথরের গাদার মধ্যে বনের বানরের মতন আমরা বাস করি। নিঃসম্বল অকিঞ্চন আমরা, কত কষ্টে আমাদের বেঁচে থাকা। কারও একটি পূজাও আমরা বাকী রাখি না, তবু বাঘ দেবতা আমাদের ধরে ধরে খাচ্ছে, তুই দেখছিস্, ধর্তনী মা দেখছে, আমাদের জাতি নাশ হয়ে যাচ্ছে. এর কি প্রতিকার?"

পাথর থেকে নেমে এসে ডিসারী মঙ্গল আশীর্বাদ উচ্চারণ করল, মাটিতে মণ্ডপ তৈরী করে ফুল মুরুজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে নানা রকমের মন্ত্র পড়ে এক ঘণ্টা ধরে পূজা করল, কত গুপ্ত মন্ত্র যার রহস্য কেবল ডিসারীই জানে। বাজনা বেজে চলেছে, লোকেরা বসে বসে চুরুট টানছে। অনেকক্ষণ পরে ডিসারী উঠে বনের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে মন্ত্র পড়তে পড়তে খোঁটা পুঁতে দিল, সবাইকে বারণ করে দিল আজ থেকে এই বনে কেউ যাবে না।

ডিসারী মুখের কথায় বাঘ আর বাঘডুমা দুই আটকে ফেলল।

মিণিআপায়ুর একজন উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রপূত জলের কলসী ডিসারী তার মাথায় রাখল। এবার বাঘডুমা অভিনয়, সে মুখ খুলবে না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কেবল "হুঁ" বলবে। মাথায় কলসী নিয়ে দূরে গিয়ে জল ঢেলে দিয়ে আসবে। তাকে প্রশ্ন করবার অধিকার সকলের, তার অধিকার কেবল 'হুঁ' বলার।

"তুই বেজুণীর বাঘডুমা?"

"হুঁ।"

"তুই চলে যাচ্ছিস্?"

"হুঁ।"

"বনে থাকবি ?"

"হুঁ।"

"আমাদের কোনো অনিষ্ট করবি না, ভালোভাবে থাকবি ?"

"হুঁ।"

ভিসারী তার উপরেও মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, তার উপরে ধুলোপড়া দিয়েছে, ফুল দিয়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছে, সে পিছনের দিকে মুখ ফেরাবে না, মুখ খুলবে না, কেবল সে চলে যাবে। কিছু দূর যাবার পর—

"তুই চোর ?"

"হুঁ।"

"তুই খংগার, পট্‌কার্, দুষ্টু, বদমাশ ?"

"হুঁ।"

যত অবৈধ অশ্লীল গালি, সব তাতে হুঁ, 'না' বলার সাধ্য নেই। এমনি দেখতে কন্ধ একটি, যাচ্ছে কলসীর জল ঢেলে দিয়ে আসতে, অন্য কন্ধেরা হাসছে, ঠাট্টা করছে। এমনি ক'রে বাঘডুমা তাড়াবার পূজা হয়ে গেল, এইবার যে যার গাঁয়ে ফেরা, ঘরে ফেরা।

হই হই করে সবাই উঠে পড়ল, বাজনা বেজে উঠল, বাঘে খাওয়া বনের দিকে চেয়ে মুখভঙ্গী করে হাত নেড়ে লোকেরা এ ওকে বুঝিয়ে দিল মানুষের কেরামতি। বেজুণীর আত্মাকে বনে রেখে সকলে ফিরে গেল। একটা কাজ সারা হয়ে গেল।

॥ একানব্বই ॥

আকাশ তেমনি মেঘে বোঝাই হয়ে রয়েছে, কখনো অন্ধকার করে বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো একটু থামছে। তারি মধ্যে কাজকর্ম চলেছে, ঘরের কাজ, ক্ষেতের কাজ, এক দিনের ঘটনা থেকে আর দিনের ঘটনা বেশী আলাদা নয়, সব একই রকম।

ঘটনা,—ঘটনা,—ঘটনা ঘটে না। বড় ছায়া ছোট্ট হয়ে আবার বড় হতে

হতে অন্ধকার ঘিরে আসে, কচি পাতা গজায়, বনের অগনতি গাছে অগনতি নতুন ডালপালা হয়, কত গাছ উপড়ে যায়, কত গাছ জন্মায়, ক্ষেতের ফসল বেড়ে বেড়ে জঙ্গলের মতন হয়। নিত্য সেই দিগ্বলয়, সেই মানুষ, কত কার কাশি হল, জ্বর হল, তাতে নতুন কিছু নেই। ঘটনা সংজ্ঞা হারায়, সব কেবল ক্রমিক গতি, নীরব ছন্দ।

কন্ধ সময়ের হিসেব রাখে না, নিজের বয়সেরও খেয়াল রাখে না।

ক্ষেতের নিড়ানির কাজ, নিকাসির কাজ সারা হয়ে গেছে, বাদলা দিনে রোদের পালা দেখে গাঁয়ে এল এক নতুন মানুষ, পথ দেখাবার তার বইবার লোক সঙ্গে করে। সাঁওতার ঘরের বারান্দায় আশ্রয় নিল ভোগিলা জগন্নাথের গোমস্তা, তারই দেশের লোক। সাহুকারের 'গোতি' বাআলির ছেলে সুগ্রি কন্ধ তার থাকবার জায়গা ঠিক করে দিল, কাঠ, আগুন, কন্ধ বস্তি থেকে সিধে, মুরগী। গোয়ালের বাঁশের টাটি দিয়ে বারান্দায় দেওয়াল করে দিল, দড়ির খাটিয়া পেতে দিল, জিনিসপত্র গুছিয়ে দিল।

সাহুকারের গোমস্তা ছোট সাহুকার খাটিয়ায় বসে দক্ষিণী চুরুট ধরাল।

বনের মধ্যে এই অসময়ে অদিনে এই এক নতুন জন্তু এসে উপস্থিত। সভ্য দেশের মানুষ, সর্বাঙ্গ ঢেকে কাপড় পরেছে, তার পাছায় 'যজ্ঞ'* রোগ আছে কি না বোঝা যায় না, বাইরে থেকে দেখা যায় না কোমরে দাদ আছে কি না, কত রকমের জামা পরেছে। ফুলো ফুলো গোছা গোছা গোঁফ রেখেছে, সে একটা দেখবার জিনিস। স্ত্রীলোকেরা দরজার আড়াল থেকে তার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছে, ছোট ছেলেপিলেরা তার থাকবার জায়গার ওপাশে মুরগীর ছানার মত তিতির বিতির করছে। বড়রা সব মাঠে কাজ করতে গেছে। এই মানুষের সব কিছুই অন্য জাতের।

ছোট ছোট কন্ধ ছেলেরা দেখছিল যে তামাক পাতার ধোঁয়া খেতে সে কন্ধদের কলকের মত করে পাকানো চুরুট ব্যবহার করে না, মোটা মোটা কালো কালো কি একটা মুখে গুঁজে দিচ্ছে। কাঠে কাঠে ঘষে আগুন তৈরী করছে না, একটা ছোট্ট বাক্সের ভিতর থেকে কি কাঠি একটা বার করে আঁচড় দেয় আর আপনি আগুন জ্বলে ওঠে। বর্ষায় বাইরে বার হবার জন্য তার পাতার তলুরা-তলুরি নেই, লাঠিতে চামচিকে ঝোলার মতো কি একটা

* চর্মরোগ বিশেষ

কালো কাপড় লাগিয়ে রেখেছে, হাত দিয়ে কি করে দিল আর অমনি কত বড় একটা কালো ফুলের মতো হয়ে ফুটে উঠল, সেটাই মাথার উপরে ধরে ক্ষেতের দিকে চলল। পায়ে গরুর খুরের মতন চামড়ার পা পরেছে—না, সত্যি অনেক আশ্চর্য জিনিষ আছে এর ঠেঞে, একে চোখের আড়াল করা নয়।

কুকুরের মত এক পাল ছোট ছেলে তার পিছনে পিছনে ঘুরছে। ছাতা মাথায় দিয়ে সাহুকার ক্ষেতের দিকে গেল। আগে আগে স্ত্রীলোকেরা মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ে, মাথায় কাপড় টেনে দেয়, কন্ধনী অচেনা লোকের মুখের দিকে তাকায় না। দুর্বল বুড়ো মানুষেরা নুয়ে পড়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, কারণ তার পরনে কাপড়, গায়ে জামা, অতএব সে অধিকারী শ্রেণীর। ঘাঁটির মাথায় যেখানে মাঠে নামবার উৎরাই শুরু সেখানে বুড়ো বারিক এসে জুটল। বাআলির ছেলে সুগ্রি কন্ধ পরিচয় বলে দিলে—এ 'কাজ্জা' (বড) সাহুকারের প্রতিনিধি।' বক বক করতে করতে লাঠি ঠকঠকিয়ে বারিক ক্ষেতের খাতে নেমে এল। "সত্যি কথা,— ফসল তো সে কবে গিয়ে তেমন ভালো হবে, আপাততঃ তো পয়সার অভাব, যা কিছু পয়সা ছিল চেঁচে পুঁছে ফারষ্টিকে বিদায় করতে শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো সাহুকারের কর্জ শোধ করা এখনো বাকী আছে। বর্ষা কমলে তাগাদা করতে পারে, অসম্ভব নয়। হঁা, ফসল ভালোই হয়েছে, মধুও পাওয়া যেতে পারে। নগদ পয়সা আসবে। হঁা, খুব ভালো হয় তাহলে, নগদ পয়সা, কাঁচা পয়সা সব সময় মেলে না এই বনে—"

বক বক করতে করতে বারিক্ চলেছে, তার দৃষ্টি পড়ে আছে ঐ নতুন অধিকারীর দিকে।

কত পয়সা আছে এই জামার গোপন জেবের ভিতরে? কোথায়? কোন জায়গায়? পয়সার একটা সুবাস আছে, পাওয়া যাক না যাক পিছন পিছন ঘুরেও সুখ।

সাহুকারের প্রতিনিধি ভুর্সামুণ্ডা বারিকের কাছ থেকে গ্রামের ভালো মন্দের তথ্য ছেঁকে তুলে নিতে নিতে ক্ষেতের খাতের ভিতর নেমে গেল। বাঃ, কি সুন্দর রাশি রাশি কচি ছেলের মতন ফসল দাঁড়িয়ে আছে, কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি মুখচোখগুলি থেকে এখনও দুধ ছাড়েনি যেন, কত উৎপন্ন হবে,

কত ফসল—গোমস্তার বুক আনন্দে ভরে উঠল। মনে হল এই বনে লুকিয়ে আছে যত চাই তত মাল, গুছিয়ে তুলে রাখবার বুদ্ধি নেই এদের, ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই, খাবার লোক নেই। আর ওদিকে তলদেশে ফসল বন্যায় ধুয়ে যাচ্ছে, ঝড় বাতাসে নষ্ট হচ্ছে, ছোট এক টুকরো জমি নিয়ে লাঠালাঠি। সাহুকার ভোগিলা জগন্নাথন্ ঠিকই বলেছিল, "ভাবিস্ না, যা, আমি জানি মাল আছে। যত দাম পড়ুক সব ঠিক করে আয়। বঙ্গ দেশে অজন্মা হয়েছে, নীচে মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের ভয়। শটি, মধু যোগাড় করতে পারলে সে সদ্য সোনা। নিজের দেশের লোক আলো চালের ভাত রেঁধে বসে আছে, কন্ধ-মাল থেকে লঙ্কামরীচ আনবি, তেতুঁল আনবি। পোলাও পার্টি আটকে আছে, হলুদ গুঁড়োর অপেক্ষা। দুনিয়ার যত স্ত্রীলোক বসে আছে, কন্ধ হলুদ আসবে তারা লাগাবে, রেড়ির তেল আসবে তারা সিঁথি পাতবে—যা, মুখের একটা কথার ওয়াস্তা কেবল, সাঁওতা বুঝে এক আধটা চুরুট, আর কাউকে শালা কাউকে মামা—ভয় নেই, যা—।"

সত্যি কথাই। সাহুকার ভোগিলা জগন্নাথন্ হাসি ঠাট্টার মধ্যেই ঠিক কথা সার কথা সব বলে।

কল্পনা-শক্তি না থাকলে সাত বন তেরো ঝোরা আর নদী পেরিয়ে এসে ব্যাপার করে মানুষ সাহুকার হতে পারে না।

ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি পড়ছে। কাদা প্যাঁক পাথর-গুঁড়ি পাথুরে মাটির মধ্যে কৌপীন পরে কন্ধেরা কাজ করে যাচ্ছে, সাফ কাজ, যত্ন করে করা কাজ। চারি পাশের কাঠের বন ফসলের বন হয়ে উঠে এগিয়ে এসেছে। ঐ বনের মধ্যে বাঘে মানুষ খেয়েছে, কাছাকাছি জঙ্গলে আরো কত বাঘ আছে কে জানে। বনের মানুষ বুনো জন্তু। সভা নেই, সমাজ নেই, পাকা বাড়ি নেই, লোকজন হই হল্লা নেই, সব শুনসান, খাঁ খাঁ করছে। ওখানে তালদেশে বুধবার রাত্রি আর বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই মা লক্ষ্মীর জন্য ঘরের সামনে মুরুজ ছড়িয়ে, পিঠুলি আলপনা দেওয়া হয়, মা লক্ষ্মী আসেন, যান; কিন্তু গোমস্তার মনে হল এইখানেই মা লক্ষ্মীর ঘর। ভাবলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। এইখানেই এসে থাকতে হয়, শালগাছে শালগাছে পাহাড়ে পাহাড়ে ডোর বেঁধে বেঁধে এইখানেই মেলে দিতে হয় ব্যবসার জাল।

গোমস্তার মনে আশা আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই জ্বলে উঠছিল। তার বণিক মন

তাকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল সে যার উপরে পা ফেলছে সে টাকা, সে অর্থ, তার তাৎপর্য এই যে ঘরে গদিতে বসে উপরে-উপরেই মুনফা আর ফাউ থেকে জীবনের যা কিছু প্রয়োজন, ভোগ বিলাস, সব লাভ হবে। ডাইনে বাঁয়ে টাকার ঢেউ খেলে যাচ্ছে, তার পাহারাদার এই কন্ধ, বোকা, হাঁদা, মূর্খ, নিরক্ষর আদিমপন্থী কতগুলো মানুষ, যাদের উপরে আধুনিক কালের আলোর আঁচ ফেলে দিলেই জ্বলে ভূত হয়ে উড়ে যাবে।

এও মনে হচ্ছিল যে সব আছে, কিন্তু এ মাল দেশ, পাহাড় আর পর্বত। আনবার নেবার সুবিধা নেই, পথ ঘাট নেই, দূরও কত, কি বেয়াড়া পথ। রেল লাইন থাকলে সস্তায় মাল কিনে রেলগাড়িতে ঢেলে দিতে মোটে সময় লাগত না। মোটর যাওয়া আসা থাকলে পর পর গাঁয়ের নাম যেমন 'বোদিলি—মকুআ, বোদিলি—মকুআ—'র সঙ্গে 'মিণিআপায়ু—বন্দিকারা, মিণিআপায়ু—বন্দিকারা' হাঁক দিতে দিতে আনা নেওয়া করত মানুষ ওখান থেকে এখানে, এখান থেকে ওখানে গাদা গাদা জিনিস যত! কত কষ্টে কিছু দূর অবধি লাল রাস্তা এসে পৌঁছেছে, তবু জগন্নাথন্ বললে কি না—"আমার কাছে কাজ করতে হলে মরে পুটে যেমন করে হোক, নয় তো মোষের গাড়িতে করেই যা। এই সময়ে দাদন দিয়ে আসবি, ফসল কাটার দিনে কে জানে কি দর হবে। হয় তো রাস্তা তত দিনে একটু শক্ত হবে, বেড়েও যাবে। আগে ভাগে গিয়ে কাজ হাসিল না করলে আবার হয় তো মোপন্না পাপান্না সাহুকাররা গিয়ে হাজির হয়ে যাবে, নয়তো চিপুরুপেড়ি চিঙ্গুডুসেটি, আমাদের ব্যবসা মাটি হবে, হুঁশিয়ার।"

ভাববার আর এখন সময় নেই। বুড়ো বারিক্ লোকেদের কানে কত কি ঢালছে, লোকেরা ছোট ছেলেদের মতন দৌড়াতে শুরু করেছে। ঐ, সব দলে দলে কাজ বন্ধ করে চলে আসছে। যা করার এই বেলা। জগন্নাথন্ সব বাতলে দিয়েছে। কাগজখানা কই? গোমস্তা পকেট হাতড়ে দোমড়ানো মোচড়ানো একখানা ময়লা কাগজ বার করলে। প্রবীণ সাহুকারের নীতিবাক্য লেখা চিরকুটটাতে চোখ বুলিয়ে সে মনে ভরসা আনলে:

"আগে সাঁওতার খোঁজ করবি। তার হাতে পাকা কলা একটি ধরে দিবি। বলবি জগন্নাথন্ সাহুকার মিতালি পাতাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেই সঙ্গে একটা চুরুটও দিস্। নিজেই দেশলাই কাঠি জেলে ধরিয়ে দিস্। সবাইকে চুরুট যাচবি। স্ত্রীলোকের মুখের দিকে না তাকিয়ে বলবি—এ 'আইয়া' (মা গো) ··তার পর···কি লেখা রয়েছে—'নেহি' না 'লেহি' ?—'নেহি' (ভাল) মঞ্জি (আছিস্) ?··· 'এ আইয়া নেহি মঞ্জি ?'—এক গাছি করে পুঁতির মালা তাদের সবাইকে দিবি, এক পয়সাওলা আয়না আর আধ পয়সার চিরুনি এক একখানা দিবি। সাঁওতা ছোকরা মানুষ, যেমন করে ভোলাতে পারিস্ ভোলাবি। বুড়ো কন্ধ দেখলে সাবধান, তারা সব কিছু সন্দেহের চোখে দেখে।"···এমনি আরো কত উপদেশ লেখা আছে, এখানে এখন সে সবের দরকার নেই।

লোকেরা তাকে ঘিরে জড় হল। গোমস্তা সম্ভাষণ শুরু করল। কন্ধেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি কর, এই লোকটির ধরন-ধারন দেখে তাদের বিশ্বাস হল যে সে তাদের হিতৈষী, কত কি বকতে বকতে কিছু দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে চলল সবাই। গোমস্তা মাথা নেড়ে নেড়ে, কারো কাঁধ চাপড়ে কারো পিঠ চাপড়ে জগন্নাথনের উপদেশ স্মরণ করে উলটে পালটে বুড়োদের 'এ আইয়া (ওগো মা),' বুড়ীদের 'এ আবা (ও বাবা,') 'লেহি মঞ্জু—নাহি মঞ্জা—নেহি মঞ্জি—' বলতে লাগল। সকলে খুব হাসতে লাগল। গোমস্তা আরও উৎসাহিত হয়ে মাথা নাড়তে লাগল। বারিক সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। চাষীরা ক্ষেতেই রয়ে গেল, তার সঙ্গে গাঁয়ের দিকে চলল সাঁওতা আর বারিক্।

দিউড়ু দক্ষিণী চুরুট টানছিল, পাকা কলা হাতে নিয়ে ভাবছিল পিওটি থাকলে তাকে দিত। পুয়ুকে দেবে না। ঘরে নিয়ে যাওয়া বিপদ, একটু পিছিয়ে পড়ে কলাটা মুখে পুরে দিলে। বারিক্ গোমস্তার কাছে ঘেঁষে গিয়ে স্বভাবসুলভ নরম নরম নাকী সুরে আবদার করতে লাগল, "মোকে এক কদলি দে না, বুড়ালোক, এক কানি কামু (আধলা পয়সা) নয় দে।" গোমস্তা দিল। বারিক্ তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "সব কথা তোকে বলে দিব, মুই জানি।"

ব্যাপারী বোঝে মুখের কথার কদর। সংসারে এত রকমের দেহযন্ত্র কোনোটা মজবুত, কোনোটা কমজোর কিন্তু সব যন্ত্রের চাবি রয়েছে মনে, সেই চাবির কাছে সহজে পৌঁছায় পরের মুখের কথা। কেবল একটা ভাব,

একটা খেয়াল তাতে ঢুকিয়ে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিলেই কন্ধ দেশের বলিষ্ঠ মানুষ যন্ত্রটিও বিকল হয়ে ঝুলে পড়ে। ঐ হাতে হাতুড়ির বজ্রশক্তি, ঐ মাংসপেশীতে পাহাড় উপড়ে ফেলবার ক্ষমতা, কিন্তু মনের চাবিতে মরচে ধরে, হাত ওঠে না।

"তুই একজন ভাল বারিক্ রে বুড়ো, তোর মত প্রাচীন বহুদর্শী লোক না থাকলে এত বড় গ্রাম নাশ হয়ে যেত।"

"এই দেখ্, তুই চিনতে পারিস্ তাই না তুই চিন্‌লি। জানবি নাই বা কেন—আমরা গরু চরাই, তুই মানুষ চরাস্। তুই জানিস্ মহাপ্রভু—বুড়ো সাঁওতা মরে যাওয়া ইস্তক এত লোকের এত রকমের ঝামেলা কেবল মুই বলে সামলেছি, কে বোঝে সে কথা? এখনকার সাঁওতা তো—বলব'খন তার কথা—"

এক আঁচড়েই গ্রামের সব খবর পাওয়া গেল, কে কেমন রায়ত, কার কেমন অবস্থা—সব।

ব্যাপারীর গোমস্তা আরও এক দিন গাঁয়ে থেকে গেল। বর্ষার ঠাণ্ডা অন্ধকার রাতে কন্ধের চারদিক-বোজা ঘরে আগুনের কাছে সকলের সঙ্গে বসে অনেক কায়দা খেলালে, অনেক বুদ্ধি দিলে: "আমরা তোদের বন্ধু, তোদের হিতাকাঙ্ক্ষী, নইলে মহাপ্রসাদ দিয়ে মিতালি পাতাবার জন্য জিনিস-পত্র দিয়ে এত দূরে কেন আমাকে পাঠাবে সাহুকার ভোগিলা জগন্নাথন্? তোরা বনের মধ্যে দুঃখে কষ্টে পড়ে আছিস্, কেবল খাটছিস্ আর মরছিস্, সংসারে সুখ বলতে কি তা জানলি না। শহরে আসবি, তোদের বন্ধু আমাদের সাহুকার কত বড় বাড়ি তৈরি করে রেখেছে, সেই বাড়িতে থাকবি, কত রকম নতুন নতুন জিনিস বিক্রি হয়, কিনবি, নানা মানুষ দেখবি, কোঠাবাড়ি দেখবি, গাড়ি চড়বি, আর দেখবি দশহরার যাত্রা কেমন হয়, লেখাপড়া করা লোকে কেমন দেওয়ালি পরব করে, তোরাও তাদের সঙ্গে মিলে ফুরতি করবি। এ সবের জন্য টাকার দরকার, তোদের এই বন দেশে গাছ পাথর আছে, পয়সা নেই। এত ফসল তোরা করেছিস্, নদীতে ভাসিয়ে নেবে, বন-বরা খুঁড়ে নষ্ট করবে, সম্বর হরিণে খেয়ে যাবে, ঘরে রাখলে পুরানো হয়ে পোকা ধরে খারাপ হয়ে যাবে। ফসল কেটে বেচবার দিনে হাটে বার করলেও কি দাম পাবি তার ঠিক নেই, এত পরিশ্রম সব বৃথা হবে—"

বারিক্ কেবল বলে, "ঠিক ঠিক"। আরো কত লোক সেই ধুয়া ধরে—"ঠিক ঠিক"। সাহুকারের গোমস্তা উৎসাহ পেয়ে তার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করতে থাকে।

"এখন থেকেই আমাদের সঙ্গে দর ঠিক করে নে। ফসল তোলা হলে আমাদের মেপে দিবি। এখান থেকে নিয়ে যাওয়া কি কম কঠিন ব্যাপার! গাড়িভাড়ার খরচা, বলদের খোরাক, 'গোতি'র মজুরি, পথে চুরিচামারি ডাকাতির ভয় তো আছেই। এখন তোদের ইচ্ছে। এই বৃষ্টিতে ঠাণ্ডায় এত কষ্ট করে এসেছি শুধু তোদেরই হিতের জন্য। তোদেরই খুব লাভ, আমাদের অল্প, চার ধরম সাক্ষী করে এই বলে দিলাম,—তোরা ভেবে দেখ্।"

কোনো অজানা জন্তুর চারটি পায়ের মতন 'চার ধরম'-এর দিকে লক্ষ্য রেখে গোমস্তা বলে দিলে, হই হই করে সকলে রাজি হয়ে গেল। জন্তু উঠে দাঁড়াল, কন্ধের সারা বছরের উৎপন্ন পেটে পুরে উঠে দাঁড়াল। সাহুকার জাতির উপকারী, রায়ত জাতির ক্ষয়কারী বাহাদুর জন্তু সে, ব্যাপারী-সমাজে এর নাম 'গড়ম্', অর্থাৎ ফসল কাঁচা থাকাতেই শস্তায় দর ঠিক করে দাদন দিয়ে পাকা ফসল তুলে আনবার কৌশল। 'গোতি' প্রথার বড় ভাই 'গড়ম্' সাহুকারদের ধন দৌলতের ভিত্তি, রায়তের ভাঙা হাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে তার চার ধরম।

কথা পাকা হয়ে গেল। গত বছর দুই টাকা পুটি* দর ছিল, এ বছর দেড় টাকা পুটি হিসাবে ক্ষেতের ফসল আগাম বিক্রি হয়ে গেল। সবাইকে জড় করে কার কত ফসল আন্দাজ করে কাউকে দশ টাকা, কাউকে পাঁচ টাকা গছিয়ে দিয়ে গোমস্তা কাগজ করিয়ে নিলে। বস্, কাজ হাসিল। ভারবাহী আর পাহারাদারকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাস আর ধর্মের কথাটা কন্ধদের হুঁশ করিয়ে দিয়ে গোমস্তা এখনকার পাট তুলে অন্য গাঁয়ে চলল। তার নীতি—পায়েস খাবে ধার ধার থেকে। আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে। সূর্য উঠবে, মাঝে মুক্তার মতো ধারে হীরার মতো, খানিক রূপার মতো তার পর সোনার মতো, তার পর তার কিরণজাল—লাল—লাল, সব লাল হয়ে যাবে।

* শস্যের মাপ বিশেষ, প্রায় দেড় মণ।

॥ বিরানব্বই ॥

ভবিষ্যৎ—

সে কবে, কোন ধূমল দিগন্তে তার আস্থান? আদিম মনে না-দেখা ভবিষ্যতের স্থান নেই। আজ ফসল হাঁটু ভর উঁচু হয়েছে, কিছুদিন পরে কোমর সমান উঁচু হয়ে উঠবে—এ তো জানা কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎ! কে বলতে পারে? ভাবতে গেলে কষ্ট করতে হয়, মনের আরাম নেই তাতে। নগদ টাকা নতুন আনন্দ এনেছে। ঘরে ঘরে সেই কথা চলেছে। একটি টাকা মুঠোয় করে নিয়ে দাঁড়ালে মনে কত কি কথা উঠতে থাকে কতক্ষণ ধরে, কত না-মেটা আশা উপোসী মনের, কত স্বপ্ন! টাকা কোমরে জোর আনে।—দু'জন মিললেই কেবল সে কথা হয়।

টাকার পিছন পিছন গাঁয়ে 'নাচিনী' দেবতা এল। বুড়ো জামিরি কন্ধের ফসলের অনুপাতে ঘরে এসেছে সাতটি টাকা! জামিরির বুড়ী দেখল, তার মনে পড়ল কত বছর আগের কথা—মাথার চুল একটু একটু পাঁশুটে হয়ে এসেছে কেবল—বুড়ো-বুড়ী একবার গিয়েছিল শহরে দশহরা দেখতে। শীতের দিন বলে সেখান থেকে বুড়োর জন্য একখানা গঙ্গোলি (কম্বল) কিনে এনেছিল সে, কি গরম, কি আরাম! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই কম্বলের অস্তিত্বও কবে থেকে টুকরো টুকরো হয়ে শেষ হয়ে গেছে, বুড়োর গা খালি। সারা রাত বুড়ী ভাবল—হঠাৎ অসময়ে এই যে সাতটি টাকা পাওয়া গেছে তাই দিয়ে একটা কম্বল হলেও হতে পারে হয়তো। কবে দশহরা আসছে, তার বুড়োর জন্য একটি কম্বল আনবে সে। গরিবের সামান্য সাধ, সামান্য শখ।—স্বপ্নের মতো মনের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করল। সকালে ঘরের কাজ সারার পর তার ভিতরে কি যেন হয়ে গেল, বুড়ী কেবল নাচতে শুরু করলে। ডিসারির কাছে খবর গেল, পাড়ার লোক দেখতে এল, সাব্যস্ত হল জামিরির বুড়ীর উপরে 'নাচিনী' দেবতার ভর হয়েছে। বাজনা বাজানো শুরু হল, ধূপ জ্বালানো হল, সেই উপলক্ষ্যে গ্রামে ভাতের ভোজ মদের ফুরতি হল। অন্ধকার মেঘের বাষ্পে আর কাঁপুনি ধরানো শীতেও গ্রামে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

বন দেশ পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকে জঙ্গল। হঠাৎ তার কোন কোনা থেকে ছুটে আসে অশরীরী কোন মৃদু বেগ, ছোট ছোট ঝোপ মাথা নাড়তে থাকে, উপরে লতাপাতা কান নাড়ে, দেখতে দেখতে টিপির উপরে শিআরি লতা মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শাল গাছগুলি অস্থির হয়ে হেলতে থাকে দুলতে থাকে পাগলের মতো, শিআরি লতার জটার মধ্যে বিপ্লব খেলে যায়, একল গাছকে আশ্রয় করে বিচিত্র ভঙ্গিমায় নাচে বিস্ময়ের মায়ামন্ত্রে কিম্ভূতরূপী নাট্যদেবতা। কোন অলক্ষ্যে তার জন্ম, কোন গোপনে তার ঘর, কে সে কোনো অন্ত পাওয়া যায় না তার। বনের শিশু অবাক্ হয়ে কেবল চায়, কোথাও কোনো নড়ন চড়ন নেই, কেবল একটি গাছে চলেছে প্রবল আলোড়ন—খানিকক্ষণ, তার পরে আবার সেই গাছ গাছেরই মতো স্থির হয়ে দাঁড়াল, দূরে সাঁই সাঁই সন্ সন্ ক'রে বিপ্লব-দেবতা ক্ষিপ্রবেগে উড়ে যাচ্ছে সংস্থিতিবাদের শিকড় ধরে নাড়া দেবে বলে।

তেমনি এই 'নাচিনী' দেবতা। সে অঘোরী। অকারণেই কতবার এসে বেজুণীকে নয়তো আর কাউকে পেয়ে বসে। উঠতে বসতে খেতে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে সে আট দিন ধরে নাচতে থাকে। আবার, তার সঙ্গে যোগ দিয়ে অন্য স্ত্রীলোকেরাও নাচে। মঙ্গল মন্ত্র আওড়ানো হতে থাকে, হাঁটু সমান উঁচু পত্র-মণ্ডপে মুরগীর ডিম অর্ঘ্য দেওয়া হয়, ডিসারী পূজা করে। কিন্তু 'নাচিনী' দেবতা হাসায়, সবাইকে আনন্দ দেয়, সে কারো অমঙ্গলের জন্য আসে না, আসে দর্মু আর ধর্তনীর তরফ থেকে আশীর্বাদ করে যেতে।

জামিরির বুড়ী নাচছে। গোটা গাঁয়ের ছেলেপিলে আর মেয়েরা গিয়ে জুটেছে সেখানে। হাকিনাকে কোলে নিয়ে পুমু'ও সেইখানে বসে। কানে তালা ধরিয়ে বাজনা বাজছে। দিউড়ু একলা তার বারান্দায় বসে আছে। নিজের সমস্ত ফসল পাকবার আগেই বেচে ফেলে সাঁওতা হিসাবে সে দাদন পেয়েছে কুড়িটি টাকা। সাহুকারের মহাপ্রসাদের মিতা হয়ে সাহুকারের গোমস্তার কাছে আশ্বাসের বাণী শুনে সে গর্বিত, সম্মানিত। গোমস্তার কথার বীজ তার মাথার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে তাতে পাতা ধরেছে, কল্পনাতীত অজানা সুখের অর্ধেক ফাঁকা অর্ধেক রঙিন সুখস্বপ্ন তার চোখে ভাসছে। সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে কঠিন পাথরের ধারালো কোনার মতো

অর্ধোচ্চারিত যত প্রতিজ্ঞা মনের ভিতর প্রবল হয়ে জেগে জেগে উঠছে, মনের গভীরে নিভৃত ধারণা বাস্তব হয়ে যাচ্ছে, কঠিন রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার চাহনিতে দৃঢ়তা আনছে, কোমল ভাবের নরম দুর্বলতা ক্রমেই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে কয়েকটি টাকার চাপে, পারিপার্শ্বিক চিন্তার তাড়নায়—যেন সে বুঝতে পারছে আর দেরি নয়, যা করবার এবার সে করে ফেলবে।

মেঘের অন্ধকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্ষার বিরাম নেই। ঠাণ্ডা আরো আরো বাড়ছে। প্রবল জলের ছাট, বাতাসে জল উড়িয়ে উড়িয়ে নিচ্ছে, আবার একটা একুশ দিনের ঝড় বৃষ্টি শুরু হল বোধ হয়। ঘরের বাইরে বেরুনো যায় না। এই দুর্যোগে প্রতিবেশী নাচছে, কি না তাকে 'নাচিনী' লেগেছে। গোটা গাঁয়ের লোক সেইখানে ভিড় করেছে। সে ভিড় দিউড়ুব বিরক্তিকর ঠেকছিল, কেবলি হট্টগোল সেখানে। তার প্রয়োজন নিরালার—ভাবনাগুলিকে সাজাতে, নতুন পথ ধরতে। এই রাশি রাশি মেঘ ভেসে চলেছে মিণিআপায়ু থেকে বন্দিকার, এই বর্ষায় এনে দিচ্ছে পুরাতনের প্রতি বিদ্রোহ, নূতনের প্রতি আরো অনুরাগ, মনের ধৈর্য হরে নিচ্ছে, সমস্ত ভিড, সমস্ত কোলাহল পিছনে সরিয়ে দিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরছে অন্ধকারের দরিয়া, সমস্ত নিস্তব্ধ সেখানে, কাঁদনভরা ভিজে উদাস মনের কাঁপা সুরের মত কেবল বাতাস।

হঠাৎ উঠে দিউড়ু জামিরির বাড়ি চলল, অজানতেই কখন মুখের ভাব কর্কশ হয়ে উঠেছে তার, চোখে যেন ছাই চাপা আগুন। জামিরির ঘরের বারন্দায় উঠে স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার কানের কাছে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ডাকলে—"পুয়ু!" মুখ ফিরিয়ে দিউড়ুর মুখের দিকে চেয়ে পুয়ুর বুক কেঁপে উঠল। ভিড়ের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে পুয়ুর নড়া ধরে টান মেরে দিউড়ু বললে, 'ঘরে চল্"। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পুয়ু চলে গেল। জামিরির বুড়ী নাচছেই, হতভম্বের মতো তার দিকেই তাকিয়ে বুড়ো বসে আছে। দিউড়ু ঘরে ফিরল। শুনতে পাচ্ছিল পিছন থেকে ডিসারীকে জামিরির অনুনয়: "তাড়াতাড়ি নামিয়ে দে ডিসারী, আট দিন ধরে নাচলে বুড়ীটার আর কিছু থাকবে না।" বার বারই বুড়োর এমনি অনুনয়। সকাল থেকে ঠায় বসে আছে বুড়ো বেচারা। সকলে 'নাচিনী'

দেখছে, আশীর্বাদ নিচ্ছে, গাঁয়ের পরব দেখছে। কিন্তু বুড়োর এক চিন্তা, আর কিছু না: সংসারে এটুকুই তার সম্পত্তি, সদাব্রত করে তা উড়িয়ে ফতুর হতে জামিরির বুক ভেঙে যাচ্ছে। সেও হয়েছে দিউড়ুর চক্ষুশূল। কি যে হয়েছে বুড়োটার, কাণ্ডজ্ঞান ভুলে এত লোকের সামনে সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল সেই এক অনুরোধ—!

পুয়ু ঘরে ফিরেছে, ছেলেকে কোলে নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। দিউড়ু এখন সাহুকারের মিতা, কুড়িটা গোটা টাকার মালিক, গাঁয়ের মাথা, সাঁওতা! লেঞ্জু কন্ধ নেই, বেজুনী নেই। মেঘের অন্ধকারে গহন নিবিড় চিন্তা। দিউড়ু ডাকল—"পুয়ু—"

"হঁা—"। ঘরের ভিতরে উনুনের কাছে নিবন্ত আগুনে ফুঁ দিচ্ছিল পুয়ু, উঠে দাঁড়াল। তার দুই কাঁধে দুই হাত চাপিয়ে দিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে দিউড়ু বলল—"পুয়ু—"

ছিটকে দূরে সরে গিয়ে পুয়ু বলল, "চলে এলে কেন? 'নাচিনী' দেখলে না? এত লোকে দেখছে, তুমি থাকলে না, কি ভাববে সবাই?"

দিউড়ুর মনটা কেবল গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। বারান্দায় এসে বসল সে। অস্থির লাগছিল তার। একটি একটি করে পুয়ুর দোষ গুনতে লাগল সে: এমন নির্বোধ, এমনই জ্ঞান-গম্যি তার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, রান্না-বান্নার ঠিকঠিকানা নেই, মদ তামাকপাতার কোনো বন্দোবস্ত নেই। থেকে থেকে তাকে গাল দিতে লাগল। ঘরের ভিতরে কাজ করতে করতে পুয়ু কেবল হাসছে।

গাল দিয়ে দিয়ে মুখ ব্যথা হয়ে গেল। দিউড়ু চুপচাপ উঠে তল্‌রা-তল্‌রি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

॥ তিরানব্বই ॥

ডোম বারিকের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে দিউড়ু শান্ত হল। হাড়ের ভিতর পর্যন্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি চলেছে। কত তাড়াতাড়ি দিনের আলো চলে গিয়ে ঐ ঘিরে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। দিনের কোলাহল মিলিয়ে

গেছে। এই তো একটুখানি সময় যখন দূরের আকাশের দিকে তাকালে কোন এক বিরাট নেতিবাদের বড় বিচ্ছেদে মন আপনি কুঁকড়ে উঠে ভেঙে পড়ে,—কেউ নেই, কিছু নেই, বর্ষার নির্জন পথে একলা পথিক চলেছে অনির্দিষ্টভাবে। দূরে চিকন কালো উড়ুনী, বিনা সঙ্কেতে লম্বা হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, তার আগে আগে কুয়াশার মতো হালকা পাঁশুটে মেঘের ধোঁয়া, আর তার মুখোমুখি হয়ে কাটাকাটি আড়াআড়ি সাদা সাদা তীর যেন কত, বিনা আড়ম্বরে তাদের বর্ষণ চলেছে, বিঁধছে মাটির গায়ে, তাদের লক্ষ্যও নীচের অন্ধকারে ডুবে গেছে। সেই শুনসান রাস্তা। শীতে কাঁপার মতন ঝোপ ঝাড় কাঁপছে, চারিদিকে চেয়ে দেখলে কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো রাশি রাশি পাহাড় পর্বত।—মানুষের মনকে সতেজ করে না, দমিয়ে দেয়।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে ইতস্তত: করতে করতে ডোম বারিকের আঙিনার সামনে দিউড়ু সাঁওতা এদিক ওদিক করতে লাগল। শীতের অন্ধকারে খিদে বেড়ে উঠছে, তাকে গ্রাস করে ফেলছে, প্রকৃতির মহা বিদায়ের নির্বাক মুহূর্তে সে শুনছে আপন বুকের ধকধকি। কেবল দেখছে নিজেকে, সে কি চায়, কি তার গোপন মনের এত দিনের অভিযোগ। যেন হাট থেকে সরে এসে পথের পাশের আমগাছের তলায় একলা বসে নিজেকে যাচাই করা। কত বার এমনি সে ভেবেছে—কিসের মমতায় সঙ্কল্প করা কাজটা করে ফেলতে তার হাত ওঠে না? কেন এই দুর্বলতা? বাহির থেকে দেখায়—একলা একটা মানুষ মুখ নিচু করে কিসের ছলে বারিকের বাড়ির পানে চলেছে।

পায়ে পাথরের ঠোক্কর লাগল। থেমে যেতে হঠাৎ মনে পড়ল লেঞ্জু কন্ধ চলে গেছে, বেজুনী নেই, সরবু সাঁওতা মরেছে। কি বিচিত্র পর্যায়ে কেন মনে আসে বিগত দিনের ঠিক সেই অনুভূতি? দিউড়ু সাঁওতা বারান্দার কাছে এল, বারান্দার উপরে ওদিকটা অন্ধকার। নিজের মন আলো জ্বালিয়ে দিলে, মন গহনের অতি প্রিয় পিশাচ সারা অস্তিত্বটাকে গ্রাস করে সতেজে উঠে দাঁড়াল। সমাজের নীতি, সমাজের সঞ্চিত বিশ্বাস আর ন্যায় বোধ গুহাবাসী বন্য মানুষের বেড়ি মাত্র, কারও অপেক্ষা না রেখে সে আপনাকে নিয়ে আপনি থাকতে চায়, দিনের আলোয় সঙ্গী সাথীর দলের মধ্যে দেবতা হয়ে থাকা তার ভালো লাগতে পারে। এই অবেলায় এমনি

দুর্যোগে সে উলটোটাই হতে চায়, সমাজের দশ জনকে নিয়ে ঘর করতে গিয়ে নিজেকে ক্রমাগত দাবিয়ে দাবিয়ে নিজের যে নিভৃত অস্তিত্বকে নীচে ঠেলে দিয়ে চেপে রেখেছে, তাকে বাইরে বার করতে চায়। না, বনের মানুষ অত তলিয়ে ভাবে না।

অন্ধকার দেখে উত্তেজনা এসেছে, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। বারান্দার উপর উঠে পড়ে দিউড়ু ডাকল—"বারিক।"

বারান্দার এক কোণে চুপচাপ বসে ছিল বালমুণ্ডা। উঠে এসে দাঁড়াল। সাঁওতার কথা বলার অপেক্ষা না করেই বললে, "পাড়ায় আছে হয়তো বুড়ো, আমি গিয়ে ডেকে দিচ্ছি।" এমনি অদ্ভুত এর আচরণ, পাশ কাটিয়ে থাকে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। দিউড়ু থমকে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে ঘরেব মধ্যে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। ডাকলে—"বালমুণ্ডা—"। বালমুণ্ডা চলে গেছে, জবাব নেই। বালমুণ্ডা চলে গেছে, এ ছাড়া দিউড়ু আর কিছু ভেবে উঠতে পারল না। উত্তপ্ত মন, মাথা তেতে উঠেছে। সে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

কোণের ঘর থেকে শোনা যায় সেই খুটখাট খুটখাট, খাড়ুর ঝনঝন—পাগল করছে তাকে। বারিককে ডাকতে গেছে, বারিক আসছে হয়তো। বালমুণ্ডাও। বারিকের সঙ্গে কাজ আছে। না, সে সব মনের ভিতর নেই। যে দিন বেজুনীকে বাঘে খেয়েছিল, সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফেরবার সময় পথের পাশে সুযোগ বুঝে কে সে দাঁড়িয়ে ছিল ভিখারিনীর মতো? সে সব মনে নেই, কিছুই মনে পড়ছে না, কেবল অন্ধকার আর সে—অন্ধকারের আত্মা। কোন পারে তার অস্তিত্ব? বার বার হোঁচট খাচ্ছে, হাঁড়িকুড়ি ওলটাচ্ছে, শিকেয় ঝোলানো জিনিস মাথায় লাগছে, কালো ঝোরার কাদার ভিতরে বন-বরার মত সোঁ সোঁ করতে করতে সে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে, সে খোঁজার অন্ত নেই।

হঠাৎ কার গায়ে গা লাগল—দরজার দিকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে যাচ্ছিল বেরিয়ে। দু'খানা হাতে পাগলের শক্তি সঞ্চার করে কঠিন বাহু বন্ধনে তাকে বাঁধল সমস্ত শরীর দিয়ে। নুয়ে যাচ্ছে, নিষ্পিষ্ট হয়ে দিউড়ুর গায়ে মিশে যাচ্ছে—গরম মাংস, নরম মাংস। আর কত চাপ দিলে তার

ভিতর অবধি ভাঙবে? কেন থাকবে তার স্থূল বাস্তব পৃথক অস্তিত্ব? তার সত্তালোপ হোক, খাদ্য সে, সে দেহে মিশে যাক। বন-গয়ালের মত গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বাঘের মুঠোয় ধরে দিউড়ু চাপতে লাগল, হুঁশ নেই তার, জ্ঞান নেই। তেমনিই হঠাৎ পর মুহূর্তে মুখের গ্রাস, হাতের গ্রাস, তার বন্ধনের মধ্যে ছটফট করে উঠল প্রবলভাবে, কেমন করে যেন সে বাঁধন আলগা হয়ে টুটে গেল, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বন্দী জন্তু বাইরে ছুটে পালাল। মুহূর্তের জোয়ার ভাঁটা। দূর থেকে তিরস্কার করে সে স্বপ্ন ভেঙে দিল—"সাঁওতা"! কত দূরের সে ভেঙে-পড়া ঢেউ, চূর্ণ ফেনা, কার সে "সাঁওতা" ডাক, কত দূরের সে।

দিউড়ু সাঁওতা বাইরে এল, মনের পিশাচ আশা ছাড়েনি। বাইরে অন্ধকার কত বেড়েছে। নির্জন ঘর, আর কেউ নেই, ঝর ঝর করে বৃষ্টি ঢালছে মেঘ, আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দিউড়ু এগিয়ে গেল।

সোনাদেঈ দাঁড়িয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে ভীত করুণ স্বরে কি কতকগুলো বলে গেল—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—কেন এসেছ সাঁওতা, কি মনে করে,—এমন করছ কেন—কি—কি—?"

এই না সে সোনাদেঈ! দিউড়ুর মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল। বললে—"সোনাদেঈ—"। উত্তর নেই। "সোনাদেঈ—" আস্তে নরম সুরে দিউড়ু ডাকল আর এক বার, দু'পা এগিয়ে গেল।

সোনাদেঈ ছোট মেয়ের মতো চীৎকার করে উঠে বাইরে বৃষ্টিতে লাফিয়ে [illegible], দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে বলে উঠল, "ভয় করছে আমার—কোথায় গেল সবাই—"। ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে শাঁখে ফুঁ দেওয়ার মতো গলার সবটুকু জোর দিয়ে চীৎকার ছাড়ল—"বাবা—বাবা—"

নেশা ছুটে যাচ্ছে, দিউড়ু ডাকল, "ভিজছিস কেন, আয় উপরে আয়।" সে কথায় কান না দিয়ে শ্বশুরের উদ্দেশে সোনাদেঈ আবার ডাক পাড়ল—"ও বাবা—"

মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বুকের ভিতরে দুরমুশ পেটার শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে আপনিই। আর সোনাদেঈকে অনুরোধ করে উপরে ডাকবার মতো মনের অবস্থা নেই। থকে গিয়ে দু'হাতের উপর মুখ রেখে দিউড়ু বসে আছে। দমে গেছে সে। আশ্চর্য হয়ে ভাবছে এ কি হল? কেন সোনাদেঈ

এমন করছে, কি বিচিত্র স্ত্রীলোকের চরিত্র! নিজেকে দিউড়ু একবার যাচাই করে দেখল, গত কতদিনের ঘটনা মনে করে করে ভাবতে লাগল কবে সে কি করেছে যে সোনাদেঈ তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল, কি হল যার জন্য সব এমন গোলমাল হয়ে গেল। ভাবল, সে তো কখনো গায়ে পড়ে ডাকেনি সোনাদেঈকে, সোনাদেঈ নিজেই তার দিকে ঢলেছিল, নিজেই আবার কি ভেবে আজ পর হয়ে গেছে। কন্ধের ধারণা বলে স্ত্রীলোকের উপরে কারও জোর খাটে না, সে তার আপন খেয়ালেই চলে, তার মনে কখনো 'হাঁ' কখনো 'না'। সেদিন সোনাদেঈ আশ্রয় খুঁজেছিল, আজ তার আশ্রয়ের দরকার নেই। বর্ষার অন্ধকারে নিজের ঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতেই তার ভাল লাগছে। কেন? কি হল? ভেবে কুল পায় না সে, থেকে থেকে দূরের পানে সোনাদেঈয়ের ডাক তার চিন্তায় জট পাকিয়ে দেয়—"বাবা—বাবা—ও বাবা—"

এবার ঠাণ্ডা বুলি ধরে অভিমান করে দিউড়ু বলল—"কেন ভিজে মরছিস সোনাদেঈ? কেউ তো এল না, তুই থাক, আমি যাচ্ছি।" উঠে পড়ল—"শুনছিস, আমি যাচ্ছি। বারিক এলে ব'লে দিস বরং—"

সোনাদেঈ কিছু শুনল না। আরো দূরে সরে গিয়ে তেমনি ডাকতে লাগল। জেনে শুনেই আর একটু মাকড়সার জাল পায়ে জড়িয়ে দিউড়ু দাঁড়িয়ে আছে, চলে যেতেও সে সোনাদেঈয়ের অনুমতি চায়।

ইতস্তত: ভাব কেটে গেল, দূর থেকে "হাঁ—হাঁ" জবাব শোনা যাচ্ছে, বারিক আর বালমুণ্ডা দু'জনে আসছে। সোনাদেঈ বালমুণ্ডার কাছে গিয়ে অভিমান করে শোর তুলে বলতে লাগল—"বাঃ, বেশ লোক তুমি, আলো জাললে না, বসবার জায়গা দিলে না, সাঁওতাকে অন্ধকারে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সেই যে গেছ তো গেছই, ডেকে ডেকে শুনছই না—" সোনাদেঈর সেই আবেদনের মধ্যে গর্ব আর তাচ্ছিল্য। বালমুণ্ডার হাত ধরে টেনে আনতে আনতে আবার বলল, "কেমন বুদ্ধি তোমার বলো তো?" কত দিন পরে তার স্ত্রী আজ তার গা ছুঁয়েছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাঁওতা। "আমি যাই, আলো জেলে আনি" বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বালমুণ্ডা দৌড়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। এতক্ষণে সোনাদেঈ বল

পেয়েছে, বারিকের দিকে চেয়ে গজ গজ করে কি বলতে লাগল। দিউড়ু সাঁওতা তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

তার উদ্বেগ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বারিক বলল, "আরে, কি হয়েছে কি, ঘরে আর কেউ না থাকলেও তুই তো ছিলি, রাখতে পারলি না তুই তোর সাঁওতাকে, এই বুড়ো মানুষটার উপরে দোষ চাপাচ্ছিস্। খাট পেতে দিতিস্, দীপ জ্বেলে দিতিস্, বর্ষাকালের রাত। তোর সাঁওতা, না আমার সাঁওতা? আমার রাজা সে, তোকে জানা নাই রে? সত্যি না মিছে, কি বল সাঁওতা?" সাঁওতার দিকে চেয়ে বারিক হেসে হেসে বকে যাচ্ছে। দীপ এসেছে। মুখ শুকিয়ে নীচের দিকে চেয়ে সোনাদেঈ দাঁড়িয়ে আছে। সাঁওতা হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল—"হুঁ।"।

বারিক বলল, "তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছিস, বস সাঁওতা। ও সোনাদেঈ, হাঁড়িতে কি আছে আন। বস সাঁওতা, নিজে ভিজে চলে এসেছিস, তোর দয়া। তোর ঘর তোর দুয়ার, তোর দয়া না থাকলে আমরা বাঁচি কি করে?" নানা রকম কথায় সে স্তুতি করলে। লেঞ্জু কন্ধের ব্যাপার নিয়ে সাঁওতার রাগ বারিক ভুলে যায় নি, এ যেন ভালুককে গান গেয়ে গেয়ে শান্ত করা, ভিতরে ভিতরে প্রাণে ভয়। কি আবার ভাবছে এ? কি মতলব, কিছু বলে না যে! বারিক গলা চড়িয়ে ডাকল—"কোথায় গেলি সোনাদেঈ, এত দেরি কিসের?—ভেবার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে বালমুণ্ডা? আরে, গিয়ে খুঁজে আন না।"

"তুই কোথায় রেখেছিস আমি কি দেখেছি নাকি যে আমি যাব?"

"কোথায় গেল সোনাদেঈ?—আর কে যাবে, আমি আবার দেখলে তো সবই খেয়ে বসে থাকব। বুড়ো মানুষ, নিজেকে সামলাতে পারব না। আচ্ছা, কেউ না যাক, সাঁওতা নিজেই গিয়ে খেয়ে আসুক। যা সাঁওতা, সোনাদেঈ দেখিয়ে দেবে। পেট ভরে খেয়ে নিস্, পেট ভরে।" এই বলে সাঁওতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। বলল, "যা তুই যা, আমি আছি এই দোরগোড়ায়।" আপন মনেই বলে চলল, "উঃ, কি শীতের রাত, কি অন্ধকার রাত, কোথাও কেউ নেই।"

দিউড়ু তার নিমন্ত্রণে সাড়া দিলে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, "বারিক—"

"আর কি কথা, সাঁওতা ?"

"কথা না থাকলে কি এমনি দৌড়ে এসেছি তোর বাড়িতে, মুখ্যু ঢেঁকি ?"

"অ্যাঁ—অ্যাঁ—" বলে মুখ নামিয়ে বারিক সাঁওতার সামনে বারিকের মতো দাঁড়াল এবার। বলল, "বল্, বল্, ।"

"কাল আমার সঙ্গে বন্দিকারে যেতে হবে, তুই আর বালমুণ্ডা, দু'জনকেই।"

"কিসের জন্য ? লেঞ্জু কাকাকে খুঁজতে ?"

দিউড়ু আর সামলাতে পারল না। এতক্ষণের সব রাগ হঠাৎ ফেটে পড়ল। মুখে যা আসে তাই গাল দিয়ে হাত উঁচিয়ে বারিকের দিকে এগতেই চীৎকার করতে করতে সোনাদেঈ ছুটে এল। সোনাদেঈকে দেখেই দিউড়ু চুপ করল। রাগ উবে যাচ্ছে, উসকে তোলা যাচ্ছে না। শান্তভাবে সোনাদেঈ বলল, "বুড়ো মানুষ কি দোষ করেছে তোমার যে মারতে যাচ্ছ ?" বারিকের কাঁধে হাত দিয়ে সোনাদেঈ তাকে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিল, বারিক থর থর করে কাঁপছিল। "বোস্ বোস্। মা গো, বুড়োমানুষ কি রকম কাঁপছে। এমনি করে এই গাঁয়ে পড়ে থাকলে কোন দিন মার খেয়ে মরে যাবি বাবা। ডোম হয়েছে বলে কি জীবন নয়, কথায় কথায় জুলুম জবরদস্তি, মার ধর, গালি গালাজ। মা গো মা, কি বলেছিস বাবা, কি দোষ করেছিস বুড়ো মানুষ।" সাঁওতার মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললে, "বল না—"

লেঞ্জু কন্ধের কথা ব্যাখ্যান করতে গিয়ে সোনাদেঈয়ের মুখের দিকে চেয়ে দিউড়ুর কথা তার গলায় আটকে গেল। কোথা থেকে এত তেজ এল সোনাদেঈয়ের ! এ কি শুনছে সে ! কিসে তার মুখের কথা মর্মে নিয়ে গিয়ে বেধাচ্ছে ? ভেবার মত দিউড়ু সাঁওতা দাঁড়িয়ে রইল। ভাব বদলে ঠাণ্ডা হয়ে সে বলল, "আমাকে রাগাস না বারিক, বুঝে শুনে কথা বলিস। হাঁ, কাল সকালে বন্দিকারে যেতে হবে, কাজ আছে। বাঘলাগা পথ, একলা যাব না। বারিক তুই, লোক চাইলে তুই লোক দিবি, এত কথা কিসের ? এত কাল তো বারিক হয়েছিস, কখনো কাউকে এত কথা জিগ্যেস করেছিলি, না আমাকেই জিগ্যেস করছিস হাঁ রে ?"

"দোষ হয়ে গেছে, সাঁওতা, ঘাট হয়েছে আমার। তুই আমায় মারবি

না তো আর কে মারবে? মার কাট—তোর দয়া।—তুই কেন বক বক করছিস মেয়ে মানুষ তুই? তোর বাপের বাড়ির গাঁ পেয়েছিস নাকি? সব তাতে গায়ে পড়ে লড়াই করতে আসিস—?''

সোনাদেঈ চলে গেল।

"মার আমায় সাঁওতা, আমায় নিয়ে গিয়ে বলি দে, প্রাণে মেরে ফেল। কাল মোরগ ডাকে আমরা বন্দিকার যাব। বুড়ো মানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। ভুল করেছি, ঘাট হয়েছে আমার।"

"মোরগ ডাকে হাজির থাকবি—" বলে সাঁওতা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বারিকের কি দোষ হয়েছে সে ভেবে পাচ্ছিল না। পিছন থেকে বারিকের চেঁচামেচি কানে আসছিল, কি বলছে শোনবার জন্য পা আস্তে আস্তে পড়তে লাগল—"কেমন অবুঝ তুই, এসেছিল তো তাকে যত্ন আত্তি করলি না কেন? কেন সে রাগ করল?"

বালমুণ্ডার গলা শোনা যাচ্ছে না। সোনাদেঈ কিসব একথা সেকথা বলে দোষ ছাড়াচ্ছে, কথায় কান্না মিশে যাচ্ছে, বারিক আরও গাল দিচ্ছে। ঐ সোনাদেঈ ডুকরে কাঁদতে শুরু করল, দূরে অন্ধকার বর্ষার মধ্যে কেবল সোনাদেঈয়ের বিনিয়ে কান্নার সুর।

আজ সব উলট পালট।

কি জন্য এসে কি সব হয়ে গেল। কেন এই সব কান্নাকাটি গালাগালি ঝগড়া, কেন মানুষ এমন বদলে যায়? কিছু সে বুঝতে পারল না। কেবল কে যেন তাকে পিছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে—এখানে এক দণ্ডও নয়, এক দণ্ডও নয়। দিউড়ু সাঁওতা পালিয়ে এল। ধীরে ধীরে সব ভাবনা আর সব কিছু থেকে গুটিয়ে এসে একত্র হল পিণ্ডটিতে। মনে বল এল। আঁধারী বাদলায় পরের চিন্তায় মনে তা দিতে দিতে সে ঘরে ফিরল।

আগুন জেলে পুয়্ বসে আছে। ছেলে ঘুমোয় নি। হাকিনা যেন অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে চাইল, পুয়্ হাসল। বলল, "তোমার কাছে যেতে চাইছে, নেবে একটু?" দিউড়ু কিছু বলল না। পুয়্ অভিমান করে বলল, "খিদে পেয়েছে বললে, না খেয়ে চলে গেলে—''

"সব তো করে রেখে থুয়ে গিয়েছিলি কিনা, তাই খাইনি বড় দোষ হয়ে গেছে''—বলল দিউড়ু।

"আচ্ছা আচ্ছা, আর রেগো না, খেয়ে নাও তো—"

তাড়াতাড়ি করে পুয়ু খাবার বেড়ে দিলে। দিউড়ু কিছু বলল না, চুপ করে বসে খেয়ে নিলে। জামিরির বুড়ীর উপর থেকে 'নাচিনী' দেবতা নেমে গেছে—বোধ হয় জামিরির অনুনয়েই। সব নিঝুম, খাঁ খাঁ করছে।

কতক্ষণ পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই। এই ভোরেই তার নিষ্পত্তি। মোরগ-ডাকে উঠে সে বন্দিকার রওনা হবে। অস্থির লাগছে কেবল, মনে ঝড়, ঘুম নেই।

ভাবে, পুয়ুকে বলবে কি সে বন্দিকার যাচ্ছে? পুয়ু বলবে, কেন। তারপর? তারপর কি বলবে ভেবে পায় না। আর সব দিনের মতো আজও —শেষ বিচ্ছেদের দ্বারে থমকে থেকে আপনা আপনিই অপ্রস্তুত লাগে তার। পুয়ু ঐ শুয়ে আছে, গভীর ঘুম। সে কি জানে? কোনো সন্দেহ হয় তার? দেখতে কেমন লাগছে? মনে হয় যেন আজন্ম এই বাড়িতেই সে রয়েছে, এ সবই তার, ষোল আনাই তার। ঘাড় তুলে দিউড়ু দেখল। না, বলতে পারবে না, পরে দেখা যাবে।

দিউড়ু শুয়ে রইল।

ভাবল, এমন হয় না—দু'জনেই থাকে, পিওটি আর পুয়ু? সে উদার সে দয়ালু, তার আপত্তি নেই। সে চায় না বিয়ে করা বউকে ঝড়ে জলে বাইরে ঠেলে দিতে, কিন্তু পুয়ু একা তার প্রয়োজন মেটাল না, মানুষের সইবার একটা সীমা আছে।

একবার এদিকটা ভাবে, একবার ওদিকটা ভাবে। চোখ বন্ধ করে থাকলেও অপ্রিয় চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, মনটা অনর্থক ঘায়েল হতে থাকে। যতই সে ভাবে, যতই সে মনকে বুঝ দেয় যে সে ঠিকই করেছে, একটা সামান্য 'কিন্তু' ভোঁ ভোঁ করে তার মাথার মধ্যে, কানের কাছে একটা মশার ভনভনানির মত। ঐ 'কিন্তু'র উপর ভর করেই আজকের এই রুগ্ন স্বাস্থ্যহীনা পুয়ু সেদিনের নতুন বউয়ের মত কেঁপে উঠে দাঁড়ায় যেন তার সামনে, তখন তার স্বাস্থ্য ছিল, দীপ্তি ছিল, আকর্ষণ করবার শক্তি ছিল। সেই পুয়ুর স্মৃতি অতীত হতে এসে এক লাফে বর্তমানকে ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ভবিষ্যতের মধ্যে। মশার ভনভনানি বাড়ে, অস্থির করে।

ক্লান্ত হয়ে দিউড়ু ঘুমিয়ে পড়ল, যা হবার পরে হবে, সমাধানের অন্ত নেই।

বৃষ্টির মধ্যে বাতাসের হু হু শব্দ। দূরে সেই হাহাকারের পটভূমি, বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—"সাঁওতা, সাঁওতা—" দিউড়ু ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বাইরে মুড়িসুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো বারিক আর তার পিছনে বালমুণ্ডা। এই দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে দেখে দিউড়ু জিজ্ঞাসা করল, "এত অন্ধকার, মোরগ ডেকেছে ?"

বারিক বলল, "অন্ধকার বর্ষা শীত। মোরগ অবিশ্যি ডেকেছে, তা তোর ইচ্ছে।"

"উঃ, ভারী শীত।"

দিউড়ু যেন কি করবে ভেবে না পেয়ে একটু থমকে রইল। তারপর হঠাৎ আপনিই তার মনে কিসের বেগ এল। বললে, "চল্ চল্।" তাড়াতাড়ি গিয়ে তলরা-তলরি, বর্শা, টাঙ্গি নিয়ে এল। পোঁটলা, লাউয়ের খোল সব গুছিয়ে রাখাই ছিল, নিয়ে এল। ঘর থেকে পা বাড়াবার আগে চোখ পড়ল পুয়ুর উপর। একটু ইতস্ততঃ করল। পুয়ু ঘুমের মধ্যে আড়মোড়া ভাঙছে হাকিনা মায়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ডাকলেই পুয়ু উঠবে। ভাবল, বলে যাবে নাকি ?

না, থাক,—দিউড়ু বেরিয়ে পড়ল। ভারী ব্যস্তভাবে বারিককে বলল, "চল—চল।"

॥ চুরানব্বই ॥

বন্দিকার !

বর্ষার দিনে কবাটে খিল দিয়ে আগুন পোয়াতে পোয়াতে ঘুরে ফিরে সেই গল্প—কেমন করে লেঞ্জু কন্ধ মিণিআপায়ু থেকে বন্দিকারে এল কেন এল, কি হয়েছিল। নতুন খবর বলতে ঐ একটি, গল্প করতে করতে অল্প দিনেই পুরানো হয়ে গেল, ঘেঁচডা পড়ে গেল। গাঁয়ের অতিথি আর সোভেনার বারান্দা থেকে ওঠে না। ক্রমে দেখা গেল তার আর অতিথির

ক্ষণিকতার চমক নেই, সে হয়েছে গাঁয়ের রায়ত একজন। কারও ঘরে যায় না, হৃদ্যতার সঙ্গে কথা বলে না, যখনই দেখ গুটিসুটি হয়ে বসে আছে, মার খাবার সময়ে গাঁয়ের কুকুরের ভঙ্গীতে। যেন সে নগণ্যের নগণ্য। সংসারে নিজেকে মেলে দেবার তার প্রবৃত্তি নেই, কেবল কুঁকড়ে-কুঁকড়ে বসে থাকতে যেটুকু জায়গা দরকার তাতেই তার চলে যাবে। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, খাওয়া-দাওয়ার খেয়াল নেই, কেবল দুঃখে দুঃখে মাথা ভারী হয়ে ঝুলে পড়ে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, কথা নেই বার্তা নেই, খালি বসে আছে।

জল আনতে যাওয়ার সময়ে পিওটি তার দিকেই তাকাকে তাকাতে যায়, ইচ্ছে করেই গহনা ঝুন ঝুন করে, কাপড় ঝেড়ে শব্দ করে। দুঃখের ধ্যানে নিরত ভাঙাচোরা আধবুড়ো লোকটা মাথা তুলে তাকায়ও না।

গ্রামে থেকেও লেঞ্জু কন্ধ সকলের কাছে বিস্মৃত হল।

একদিন হঠাৎ দেখা গেল সে নেই।

কোথায় গেল? পিওটি ভাবলে। "মা, সেই যে ভালো মানুষ বুড়োটি এসে উঠেছিল সোভেনার ঘরের বারান্দায়, কোথায় গেল সে? আহা, অসহায় বুড়ো মানুষ।"

"তাকে যেমন তেমন ভাবলি নাকি মা? ও গাঁয়ের বুড়ো সাঁওতার ভাই সে। এই গাঁ মাড়াতে আসবে কেন, তেমনি কপাল পড়েছে বলেই না! পরের ঘরের বারান্দায় ভিখারীর মতো থাকবার মানুষ কি সে?"

"কোথায় সে গেল গো মা? আর তো কই দেখাই যায় ন' তাকে—"

"আমায় কি আর বলে গেছে মা? গেছে কোথাও—"

সেই দিনই বিকালে পিওটির সন্দেহ দূর করলে গুমসানী। না, লেঞ্জু কন্ধ মিণিআপায়ু ফিরে যায়নি। একদিন হাগু'ণা সাঁওতার সঙ্গে কথা বলে বন্দিকার থেকে একটু সরে বনের ভিতরে চাষের গুড়িআতে সে উঠে গেছে। কেবল আর এক ঘর রায়ত সেখানে আগে থেকে গিয়ে বসেছে, চাষের গুড়িআ দেখাশোনা করবার জন্য সেখানে ঘর আছে, সেই খালি ঘরে থেকে লেঞ্জু কন্ধ চাষ বাস করবে, পারলে বস্তি বসাবে—এই গাঁয়ের রায়ত হয়ে।

"বাপের বেটা আমাদের হাগু'ণা সাঁওতা," গুমসানী বলে যায়, "ছেলে ছোকরা হলেই বা, কেমন পাকা বুদ্ধি, কি বিবেচনা। কেন কাউকে না

করে দেবে, বলে মাটি কোপাও, চাষ বাড়াও, সবাই ভালো থাকো, তাহলেই গাঁয়ের নাম-ডাক হবে। আগে ঐ চাষের গুড়িআতে দুই ভাই রায়ত ছিল যে, কত কাজই লেগে থাকত সেখানে। জঙ্গল চেঁচে সাফ করে ঝোরার ধারে কমলাগাছ লাগিয়ে গাইগরু রেখে তারা আবাদ বাড়িয়েছিল। কে বলবে পাহাড়ের খোলে এমন সুন্দর জায়গা আছে বলে। বাইরে থেকে মোটে বোঝা যেত না যে ভিতরে এত কাজ চলেছে। এই হালেই তো, এক ভাই জ্বরে পড়ে মল, এক বছর ভারী বাঘের উৎপাত হল, অন্য ভাইটিকে বাঘে খেলে। সেই ইস্তক সে জায়গায় ছিরি ঘুচে গেছে। এখন আবার একজন রায়ত জুটল।"

তাহলে লেঞ্জু কন্ধ পাহাড়ের খোলে গিয়ে লুকাল। বুড়ো মানুষ, সেখানে বাঘ আছে, জ্বর আছে, বিস্তর জঙ্গল, এরাই তার সৎকার করবে। সেই খানে থাকবে দিউড়ু সাঁওতার শত্রু যার মুখ দেখলে ভয় লাগে।

পিওটির চিন্তা ভাবনা উলট পালট করে এক দিন এ গাঁয়েও এল জগন্নাথম্ সাহুকারের গোমস্তা। অনেক দিন পরে আবার সভ্যদেশের লোক, তার চেনা হারিয়ে যাওয়া জগতের পরিচিত মানুষের মতো। আবার পুরানো শখ, পুরানো জীবনের ডাক, সেই দুটো দিন দিউড়ু সাঁওতাকেও ভুলে ছিল পিওটি। কিন্তু সব মনে মনেই। ইচ্ছে হয় নিরালা দেখে এই নূতন অতিথির কাছে গিয়ে তেলুগু ভাষায় একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করে—কোন দেশ থেকে এসেছ? কোন পথ দিয়ে এলে? এই জঙ্গল থেকে নিস্কৃতি পাওয়া কি খুবই কঠিন? অন্তত: একজন মানুষও বুঝত যে এই বনে পড়ে আছে বলেই যে সে এই কন্ধ কন্ধনীদেরই মতো তা নয়। সে দেশের সভ্য ভাষা ব্যবহার করেনি সে সেই কবে থেকে, মনের ভিতরে তেলুগু ভাষায় ভাবতে ভাবতে ক্রমে সে কন্ধ ভাষায় ভাবতে শুরু করেছে। ঠোঁট সুড়সুড় করছিল, চঞ্চল হচ্ছিল পিওটি কোনোমতে বিদেশী গোমস্তা-সাহুকারের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা বলবার জন্য।

মাকে কিছু না বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঝাঁপি পেটরা খুলে তার বন্ধ করে রাখা পোশাক বার করে পরল, তেমনি গহনাও সব পরল। কাজ-কর্ম ফেলে অনেকক্ষণ ধরে বিনুনি বাঁধল, মুখ মাজল। আধ আঁধারে ছোট আয়নাটি সামনে রেখে মুখের সাজ করতে করতে গুনগুন করে তেলুগু দেশের

গান ফুটে উঠল মুখে, কবে কোন ষোড়শী কলাবতী 'কলাবররিং' গেয়ে নেচেছিল : 'তোর মুঁখ লুকো চাঁদ, কেন মিছে লজ্জা পাবি ত্বনিয়ার কাছে, আমার মুখ এবার উঠল, তোর মুখ লুকো।' পুরাতন খোলসের মধ্যে ঢুকে আর একবার সে আপনাকে অনুভব করে দেখল। সব ঠিক আছে যেমনটি সে এসেছিল, তল দেশের পথ ভোলা বেনে বউ পাখী বনে উড়ে আসার মতন। দরজা একটু ফাঁক করল, বাইরে কন্ধ দেশের গন্ধ, নোংরা, দূর দূর থেকে শোনা যায় কন্ধের গলার আওয়াজ। পথে কেউ নেই। দরজার কাছে আয়নার সামনে বসে পিওটি কেবল নিজের মুখ দেখতে লাগল, আপনাতে আপনি বিভোর। মুখ মাজতে মাজতে কেবল সেই গানের মন চাগানো ধুয়োটি উৎসাহে গাইতে লাগল—'তোর মুখ লুকো চাঁদ।'

হঠাৎ তার খেয়াল হল—সব তো হল, কিন্তু সেঁওতি ফুল তো নেই মাথায় গোঁজবার জন্য। সেঁওতি কিম্বা গোলাপ ফুল একটি না হলে সাজ-গোজ সম্পূর্ণ হয় না। সেই চিন্তায় ধীরে ধীরে স্মৃতির জগতের ভিতর অভাবের কলরোল এসে ঢুকল, স্বপ্ন ভেঙে দিল। বারো-হাতী শাড়ী পরে বিনুনি ত্বলিয়ে কবাটে খিল দিয়ে বসে পড়ল পিওটি, শান্তি নেই তার।

মা ডাকল, "দরজা খোল।" গুমসানী বুড়ী ডেকে বলল, "শীত করছে গো মেয়ে, দোর খোল।" তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই ত্বই বুড়ী তাকে দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

গুমসানী মুখ বেঁকিয়ে বলল, "এ কেমন সাজ লো মা? এ যে চেনাই যায় না গো!"

পিওটির মা বলল, "পাগলী মেয়ে, কি মনে পড়ে গেছে—" এইটুকু বলেই নিজেকে সামলে নিল। গুমসানী যেন কেমন মুখ করে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তার দিকে তাক করে আছে। বলল, "কি এমন কথা এত মনে পড়ে গা?"

পিওটি রাগে জ্বলে যাচ্ছিল। মা আছে বলে কিছু বলতে পারল না। তার মা বলল, "এখানে কি আর এমন কাপড় চোখেও দেখতে পাবি মা? যা খুলে রেখে দে, খারাপ হয়ে গেলে আর পাবি না।"

পিওটির শুকনো গলা থেকে আওয়াজ বেরুল—"একবার পরলে কি খারাপ হয়ে যাবে?"

মা বলল, "থাক, খুলে ফেল, বর্ষার দিন, জল কাদা—"

গুমসানী বলল, "হাঁ, এ সব আবার কি, যে দেখবে সেই নানানটা জিগ্‌গেস করবে। কি হবে এ খেলায়?"

মার খাওয়ার মতো মুখ শুকিয়ে পিওটি কোণের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ছেলেমানুষের মতো ছল করে হাত পা ছুঁড়ে শব্দ করে বাইরের ঘরকে জানিয়ে দিল যে সে কথা শুনল কেবল দায়ে পড়েই। এই তার প্রথম বউল, শুকিয়ে গেল, সমাজের বাঁধা গৎ থেকে এক ধারে একটু উপচে পড়লেই এই অরণ্যেও নিস্তার নেই।

সাহুকারের গোমস্তার কাছ পর্যন্তও সে পৌঁছে উঠতে পারল না। গোমস্তা উঠেছে সাঁওতার ঘরের বারান্দায়, যদি সেখানে গিয়ে পিওটি তেলুগু ভাষায় তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে তাহলে হাগুর্ণা বিকৃতভাবে তাকিয়ে একটু হাসবে, গাঁয়ের মাথা মাথা লোকেরা সেখানে বসে আছে, সেখানে যাবারও পথ নেই।

সব খবর পিওটি শুনতে পেল। গোমস্তা এসেছে, আগাম টাকা দিয়ে ক্ষেতের ফসলের দর পাকাপাকি করে যাবে, পাকলে সেই দরেই কিনবে। গাঁয়ে এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। গোমস্তা যত রকম ভালো ভালো কথা বলতে পারে তাই বলে বোঝাচ্ছে, হাগুর্ণা সাঁওতার অনুর্বর মস্তিষ্কে সে সব ঢুকছে না, সে রাজী হচ্ছে না।

"টাকার কি দরকার সাহুকার?" হাগুর্ণা নাকি বলেছে, "আমাদের তো কিছু আটকাচ্ছে না, আমাদের গাঁয়ে আমরা ভালো আছি। ফসল পাকুক, খেয়ে দেয়ে যদি বাড়তি থাকে তখন দেখা যাবে দর কি হয়। তুমি বলছ তখন দর কমে যাবে। যায় যাবে, তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। কবে মরব বলে আজ থেকেই কি ভাত ছেড়ে দিতে হবে?" সাহুকার কত করে বুঝিয়ে বলল যে কাছেই মিণিআপায়ুর লোকেরা সব ফসল এখন থেকেই বিক্রি করে দিয়েছে। "তাই নাকি?" হিকোকা হাগুর্ণা কেবল হাসল। মিণিআপায়ু যদি বিক্রি করে থাকে তাহলে তো বন্দিকার কখনই বিক্রি করবে না, ঠিক তার উলটো করবে। মিণিআপায়ুর খবরে হাগুর্ণা বরং মনে জোর পেল, সে মত বদলাল না।

পিওটির মন দু'দিনের জন্য চঞ্চল করে চাপা প্রবণতাকে উপর মনের দিকে

উসকে দিয়ে সাহুকারের গোমস্তা গাঁ ছেড়ে চলে গেল নিজের পথে। তার সঙ্গে গেল তল দেশের স্মৃতি, নিরালা মনের বন থেকে মুক্তির আশা, অতীত জীবনের মোহ। নিবিড় বন থম থম করছে, কত উঁচু পাহাড়ের উপরে বুনো ঘাস দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের বস্তিতে বেঢপ মুর্বার বেড়ার কাছে উলঙ্গ শিশু নাচছে, বন থেকে কাঠ কাটার ঠক্ ঠক্, সেই পুরাতন দৃশ্য, সে তার কারাগার। কয়েক দিন পর্যন্ত তার মনটা দমে রইল, বুড়ী মা পাংগিআণী তার কি বা বুঝবে। তার কেবল থেকে থেকে করুণ বিলাপ—"আহা, বনের জলে মেয়ে আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। কি করব, আমার আছে কি, বৃষ্টি হোক ঠাণ্ডা হোক কাজে না গেলেই নয়।" পাশাপাশি তাড়াতাড়ি কাজ করে যাচ্ছে অন্যান্য কন্ধনীরা, তারা এর কি অর্থ করে কে জানে, ক্ষেতের মালিক দুঃখিত হয়, "এ মেয়ের হাতে কাজ ভালো হচ্ছে না।" আলোচনা হয়: কন্ধনী হলে কি হবে তলদেশে মানুষ হয়ে সে সব ভুলে গেছে, এমন আলসে এমন নিষ্কর্মা করে দেয় তলদেশের শিক্ষা—ছ্যাঃ!

আবার মুখে পিঠে সেই হিম বৃষ্টির ঝাঁটার মার, পায়ে সেই কাদা, সেই পাথরের খোঁচা, চলবার পথে সেই এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু পিছল, যেখানে প্রতি মুহূর্তে বাস্তব জীবনকে বাস্তব বলে না ভাবলে পদে পদে বিপদ, আর এই গাঁয়ে থাকা—সব চাইতে ছোট, সব চাইতে সামান্য রায়ত হয়ে খেটে খেটে গোষ্ঠীর আশ্রয় মেনে জীবন ধারণ। স্বপ্ন দেখা রোগ, বসে ভেবে মরবার অলসতা, নিরাশার জড়তা, জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতের ধাক্কায় কোন কোণায় গিয়ে লুকিয়ে থাকে। পিওটি আবার সহজ হয়ে উঠল কয়টা দিনেই। ফিরে চলে যাওয়া আশা ও কল্পনার ফাঁকে এই জীবনের ইন্দ্রধনুর মতন আবার ঝকমক করে উঠল দিউডু সাঁওতা। না হেদিয়ে বুঝি মানুষ থাকতে পারে না। বৃষ্টির দিকে চেয়ে, বিগত অভিজ্ঞতার ঘটনার স্থল বন্দিকারের কাছের বনের দিকে চেয়ে চেয়ে পিওটি আবাব হেদাতে লাগল দিউডু সাঁওতার জন্য। দুই পাশে স্রোতের মতো ছুটে চলা অন্যদের সুখ-দুঃখের ঘর-করনা বিসদৃশ ভাবে তার মনোভাবকে উগ্র থেকে উগ্রতর করল, পিওটি প্রতীক্ষায় রইল। সবই মনে থাকে, তার মধ্যে কখন কোনটাকে ভোলে মানুষ। পিওটি তলদেশকেই ভুলল।

কত ছলে প্রশ্ন। ক্ষেতে কাজের জায়গায়, গুমসানীর কাছে, গাঁয়ের গলি পথে। "আমাদের গাঁ বড় না মিশিআপায় বড়, হাঁ লো—? এত বোকা ওরা, আগে থেকেই ফসল বেচে দিলে? এত কন্ধ আছে, কারও মাথায় বুদ্ধি এল না? হাঁ হাঁ, সাঁওতাটা বুঝদার নয় বটে, তা তার স্ত্রী তো আছে, সে বুদ্ধি দিল না? হাঁ হাঁ, সত্যি বটে, সাঁওতা তার স্ত্রীকে ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করে না। তা ফসল তো বেচল, টাকা পেল, এখন করছে কি তারা? নিশ্চয় টাকা পেয়েছে বলে ঘরে বসে ভোজ লাগাচ্ছে সবাই। ঠাণ্ডার দিন, তাতে আবার ওদের গাঁয়ে বাঘ লেগেছে, এমন দিনে টাকা পেলে ভোজ পেলে কেউ বাইরে বেরোয়? তুমি দেখেছ সেই নির্বোধ সাঁওতার স্ত্রীকে? কি তার দোষ যে তার বর তাকে পোছে না? কোনো দোষ নেই? বেশ ভালো মানুষটি?"

মুখ শুকিয়ে ঘুরিয়ে উত্তর দেয় পিওটি। বলে, "হবে হয় তো, অমনি গোঁয়ার বরের ভালো বউই জোটে।" ইচ্ছে হলে পিওটি হাসতে হাসাতেও জানে। তার তলদেশের সংস্কৃতির আবরণ কেবল অভিনয়!

"কি বললে? শুকিয়ে হাড় চামড়া হয়ে গেছে বউটি? আহা,—চুচ্চুঃ—কি আর করবে বেচারী, উপায় কি তার? বরই যদি সোহাগ না করে তখন কি সুখ থাকে বেঁচে থাকায়, আহা—" পুয়ুকে সে কল্পনা করে, পুয়ুকে ভাবলে তার কেন জানি মনে হয় লেঞ্জু কন্ধের কথা। পুয়ুকে সে দেখতে চায়, কিন্তু সহানুভূতি আসে না তার। কয়টা দিনের দেখা তার দিউড়ুর সঙ্গে, কিন্তু একথা সে কখনো ভাবে না, তার মন কত যে ভেবেছে জানতে অজানতে, ভেবে ভেবে দিউড়ুকে সে নিজের অস্তিত্বের অণুতে অণুতে ভরে নিয়েছে, দিউড়ু তার, সেখানে পুয়ুর স্থান নেই।

মনে মনে দিউড়ুকে সে টানতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসে চাহনিতে মনের সবটুকু শক্তি ভরে দিয়ে ঐ পাহাড়ের উপরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে পিওটি ডাকে—দিউড়ু আসুক, শিগগির আসুক।

॥ পঁচানব্বই ॥

—ঐ বন্দিকার

কত শিগগির পথ শেষ হয়ে গেল দিউড়ু সাঁওতার। মেঘের ফেনার উপরে এক লাঠি মোটে উঠেছে সূর্য, পাঁশুটে রঙ। সামনে ঝোরার কলকল। বালমুণ্ডা পিছিয়ে পড়েছে। সাঁওতার সঙ্গ ধরে রাখতে তার পিছন পিছন দৌড়-ধাপ করে বারিক চলেছে, পেট পিঠ এক হয়ে গেছে তার। তার অকর্মণ্য ছেলের উপরে রাগ করতে করতে সে বিড় বিড় করছে। ঝোরা আর কিছু দূরে থাকতে বারিকের অপেক্ষায় দিউড়ু দাঁড়াল। আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে বারিক বুড়ো ধুঁকতে লাগল, খুব এক চোট হয়রানি হয়েছে আজ তার।

কথা নেই বার্তা নেই, চুরি করে ভদ্রলোকের মতো তাড়াতাড়ি পা ফেলে সরে পড়ার মতো এ লোকটা যে কেন বন্দিকারে এল বারিকের জানা নেই। পথের চড়াই দিউড়ু লাফ দিয়ে দিয়ে উঠেছে, উৎরাই দৌড়ে দৌড়ে পার হয়ে এসেছে, মুখে চোখে বৃষ্টির ছাট, কানে সোঁ সোঁ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা সয়ে কেবল সে চলেই এসেছে, থেকে থেকে গান গেয়েছে বটে, কিন্তু কখনও ক্লান্ত হয়ে থামেনি। কেন? বারিকের অবাক লাগছিল। কিছু জিজ্ঞেস করলেও আবার রেগে যাবে, পাগলা হাতী, গোঁয়ার। আর বারিকের সে কৌতূহলও নেই। মাথা ঝুলে পড়ছে, চোখ বুঁজে আসছে। একমাত্র চিন্তা কেমন করে এই লোকটির কাছ থেকে ছুটি পাবে, তবু মুখ ফুটে বলতেও পারে না।

"বন্দিকার তো এল সাঁওতা। তা—কি জন্য আসা? এখন কি করব আমরা?"

"অ্যাঁ—?" দিউড়ুর মুখে কোনো কথা এল না, আঙুল চুষতে চুষতে দাঁড়িয়ে রইল কেবল।

"বড় চলা চলিস তুই সাঁওতা। জোয়ান মা'নুষ, তোর আর কি। আমিই না বুড়ো হয়েছি। আধমরা হয়ে গেছি।"

সামনে গাছ আর পাথরের আড়াল থেকে বন্দিকারের বস্তি দেখা যাচ্ছে, ঝোরার ওপারে। দিউড়ুর কানে কিছুই যাচ্ছে না, বারিকের সঙ্গে সঙ্গে সেও ভাবছে—এখন কি করা যায়। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বারিককে বলল, "এইবার তুই ফিরে যা বারিক, পৌঁছে তো দিলি।" নরম হয়ে বলল, "বর্ষার দিনে এত দূরে তুই এলি, মদ নেই ধুঙ্গিআ নেই, তোর কষ্ট হচ্ছে।" বিস্ময়ে বারিকের চোখ বিস্ফারিত হল। এ কি, সাঁওতার মুখে এমন নরম কথা! "যা বারিক, তোকে আর টানব না, বাঘলাগা পথ তাই না, নইলে আর কেন তোকে হয়রান করা। বালমুণ্ডা কোথায় রইল? ঐ যে গুটিগুটি আসছে। আচ্ছা, তুই যা।"

মোলায়েম করে কথা বলছে, তাড়াতাড়ি কথা বলছে—এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? বারিক চট্‌পট সব ভেবে নিল। একটা বাঁকা হাসি হেসে খুব বিনয় দেখিয়ে বলল, "তোর সঙ্গে থাকলে আমার আর কষ্ট কি সাঁওতা? আমার সুখ সুবিধের জন্য আবার এত ভাবনা চিন্তা। তোকে একলা পর-গাঁয়ে ছেড়ে দিয়ে আমি কেমন করে ফিরে যাব বল তো? তোর কাজ সারা হলে তো ফিরব সবাই। দেরি না হয় হল একটু, তাতে কি?"

"না না, তোকে আর কষ্ট দেব না, তোর যা অবস্থা। অনর্থক তোকে আনলাম, দু'জন জোয়ান সঙ্গে আনলেই হত—"

"আমার জন্য ভাবিস না সাঁওতা।"

"না না, তুই যা। পরে আরও বেশী বৃষ্টি আসবে, এখন সকাল সকাল আছে, পালা।"

এর পর আর কথা কাটাকাটি করা চলবে না। ছোকরার ভাব ভঙ্গীতে উদ্বেগের লক্ষণ। বারিক চুপ করে রইল। কিছু আর না বলেই দিউড়ু তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। বারিক একটু ইতস্ততঃ করলে, তার পর অদম্য কৌতূহলে ভয় ডর ভুলে ঝোরার ধারের ঢালুতে দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে ডাকল, "সাঁওতা—"

দিউড়ু গর্জে উঠল, "আবার কেন এলি?"

"একটু তামাক পাতা থাকে তো দিয়ে যা সাঁওতা, এতখানি পথ মুখে ফেলতে থাকব বরং—"

ট্যাঁক থেকে বড় দেখে এক টুকরো তামাকপাতা বার করে তার হাতে

দিতে দিতে দিউড়ু বলল, "নে, যা এবার, বৃষ্টি আসছে।" এগিয়ে যাবার জন্য দিউড়ু পা বাড়াল। তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন, তবুও বারিক তোষামোদের ভঙ্গীতে আবার বললে, "সাঁওতা—"

অস্থির হয়ে দিউড়ুর মুখ দিয়ে বেরুল "ওঃ—"

বারিক জবাব পেল। মাথা নাড়তে নাড়তে হাত জোড় করে বিনিয়ে বিনিয়ে বলল, "সাঁওতা, মারতে হয় মার্, যা করতে হয় কর্, তোর ইচ্ছে। আমি বুড়ো মানুষ, তোর বাপের চাকর, ছেলেবেলা থেকে তোর কত লাথি খেয়েছি তার ঠিক নেই। সেই তখন থেকে ভাবছি, কিছু বুঝতে পারছি না, তুই কিসের জন্য এলি, কি কাজ তোর, কেন আমায় তাড়াচ্ছিস, আমায় বলবি না?"

দিউড়ু দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল।

বারিক বলেই চলেছে—"তোর বাপের আমল থেকে তার তলায় আমি বারিক। সরবু সাঁওতা আমার কাছে কোনো কথা লুকোয় নি। কি অপরাধ করেছি তোর কাছে যে তুই আমাকে সন্দেহ করছিস, ছল করছিস, আমাকে তোর বিশ্বাস নেই? তবে আমায় মেরে ধরে লাথি মেরে দে দূর করে দে সাঁওতা, আমার বেঁচে থেকে কাজ কি? তোর যদি আমার উপর বিশ্বাসই না থাকে তা হলে তোর জমিতে কেন আমায় রাখবি?"

দিউড়ুর বিরক্তি বেড়ে গেল, কিন্তু মুখ বন্ধ তার। বললে, "কেন নিজেকে নিজে দোষী করছিস বারিক? লুকোবার কথা কিছু নেই, বাজে কাজ।"

"আমি কি ছেলেমানুষ সাঁওতা যে বুঝতে পারব না। ফের রাগ করছিস তো, তোর দয়া, মার খাবার জন্য পিঠ পেতে না রাখলে আর তোর কাছে বারিক হয়ে থাকতাম কেন?" বারিক গড় গড় করে বলে চলল। দিউড়ু ফাঁপরে পড়ল, এর কাছে আর রেহাই নেই।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল, "বারিক, পরে তোকে বুঝিয়ে বলব, পরে তুই জানবি। কাউকে বলিস না। এখন বোঝাতে পারছি না। তুই সঙ্গে থাকলে আমার কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে।"

এই বলে দিউড়ু চলে গেল। ঝোরার ধারে গিয়ে পিছন ফিরে দেখল, বারিক নেই, কেউ নেই, তাড়াতাড়ি জলে নেমে পড়ল। ও পারে গিয়ে

পাড়ের উপর থেকে আবার তাকাল। দূরে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে ভুর্যামুণ্ডা বারিক, আগে আগে তার ছেলে বালমুণ্ডা। চলে যাচ্ছে তারা—মিণিআপায়ুর প্রতিনিধির মতন। ক্ষণিকের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল তার বিয়ে করা বউ পুয়ুর মুখ,—অকারণে স্মরণে এল, তাতে আনন্দ নেই, সহানুভূতি নেই, ফাঁকি দিতে পারলেই আনন্দ। দিউড়ু ও কূল ছেড়ে এ কূল পেয়েছে, তাড়াতাড়ি চলল সোজা পিওটির ঘরের দিকে।

ছোট ছেলেপিলেরা মেলা বসিয়েছে যেন, বড়রা সব হয়তো বেরিয়ে গেছে ক্ষেতের কাজে। গাঁয়ের ঘরনীরা ভিন্ গাঁয়ের মানুষ দেখে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। বন্দিকারের কুকুর এক একটা পা টিপে টিপে এসে গলা লম্বা করে ভিন্ গাঁয়ের সাঁওতাকে পিছন থেকে শুঁকে দেখছে—সে শত্রু না মিত্র। বস্তির মধ্যে ঢুকে একলা মানুষ দিউড়ু ইতস্তত: করতে লাগল, কেমন বাধ বাধ লাগছে যেন। পিওটির বাড়ি যাবার পথে বুড়ো শলপু কন্ধের সঙ্গে দেখা।

"কি মনে করে, সাঁওতা?"

"দরকার আছে।"

"সকলে তো ক্ষেতে গেছে, ফিরলে তবে না—"

"হুঁ।"

"বাঘ-লাগার হাল কি?" গল্প চলল অন্য একথা সেকথা নিয়ে। "দরকার আছে" শোনার পর কি দরকার কেমন দরকার এসব জিজ্ঞাসা করে নিজের অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল প্রকাশ করা শলপু কন্ধ উচিত মনে করে না। দুজনে পাশাপাশি গল্প করতে করতে দিউড়ু এগিয়ে চলল পিওটির ঘরের দিকে, বারান্দার উপরে উঠতে যাচ্ছে শলপু বললে, "এখানে কি? এ এক অসহায় বিধবার ঘর।"

"কেন, কে থাকে—এখানে?"

"এক বুড়ী। তার বর কলিঙ্গ্* দেশে মারা গেল, মা আর মেয়ে সে দেশ থেকে চলে এল, এখানে তাদের জমি নেই জমা নেই, দিন মজুরি করে চালায়, আমাদের সাঁওতার দয়া এদের উপর।" বারান্দায় বসে পড়ে

* অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী সমতলদেশকে আদিবাসীরা 'কলিঙ্গ্' দেশ বলিয়া থাকে।

শলপু কন্ধের সঙ্গে কথা বলতে লাগল দিউড়ু। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল পিওটির মা বুড়ী এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে বস্তির দিকে এগুল। যেন দিউড়ুর মনের প্রশ্ন কেড়ে নিয়ে সন্দিগ্ধভাবে শলপু কন্ধ জিজ্ঞাসা করলে, "পিওটির মা, তুই তো ফিরেছিস দেখছি, পিওটি ঘরে আছে ?"

অন্যমনস্ক হয়ে দিউড়ু সাঁওতা বাঘ লাগার কথা বলছিল। পিওটির মা বলে গেল, "না, পিওটি এখনো ফেরেনি।"

শলপু কন্ধ আশ্বস্ত হল, স্ত্রীলোকের ঘরের সামনে অপর লোক বসিয়ে গল্প করা তার শিষ্টাচারের ধারণার বিরোধী।

একথা সেকথায় দিউড়ু সাঁওতা বুঝে নিলে যে অন্যদের চোখে এ বাড়ির ওজন কতখানি। এ গাঁয়ে এত দিন থাকলেও মেয়েটি কলিঙ্গ্ দেশের রীতি নীতি একেবারে ছাড়তে পারেনি। সব ভালো, কিন্তু নিজের বলতে রক্ষক কেউ নেই, গাঁয়ে তার আসন নেই, বিদেশী ধরন ছাড়তে পারেনি বলে বিবাহের প্রস্তাবও আসেনি।

বেলা হচ্ছে দেখে শলপু জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে আজ থেকে যাবি তো সাঁওতা ?"

"হাঁ, বাঘ-লাগা পথ, দুপুর গড়িয়ে গেলে মেঘ উঠবে, তখন আবার হয়রানি।"

"তা হলে আমাদের বারন্দায় থাকবি আয়, সাঁওতা, কোনো অসুবিধে নেই।"

জোঁকের মত বুড়ো লেগে আছে, তার অতিথি-সেবার শখের খাতিরে পড়ে বাধ্য হয়ে দিউড়ুকে যেতে হল। শলপু গল্প করছে তো করছেই— কন্ধ পৃথিবীর নানা রকমের সমালোচনা।

"আগের থেকে ফসল সব বেচে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করিস নি, সাঁওতা—"

"কি আর করা—" দিউড়ু কৈফিয়ৎ দিল, "টাকার বড় অভাব। সাহুকার—"

"সাহুকার কি আমাদের গ্রামে আসেনি ? কিন্তু তাতে কি হয়েছে, আমরা সে লোভ সামলে গেলুম, একবার তাকে আশকারা দিলে, একবার পথ

দেখিয়ে দিলে আর কি কারো রক্ষা আছে? বাবা, ওরা অধিকারীদের ঠিক নীচেই, আমরা কোন গুণে তাদের সমান যে তাদের সঙ্গে পেরে উঠব? বড় লাল সড়ক খুলতে খুলতে লচিংপুরা পর্যন্ত, দেখবি এবার কত যাওয়া আসা শুরু করবে এখানে—"

দিউড়ু হাসল কেবল। কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল আপনিই—ক্ষেত ফেরতা চাষীদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে, কাছে আসছে, এবার হয়তো ওরা আসছে। মুহূর্তের মধ্যেই আবার পিওটিকে মনে পড়ল। পরিস্থিতির জটিলতা ভুলে নিজের উচ্ছ্বাসে তৈরী তার বিকৃত জীবন তার চোখে সরল হয়ে দেখা দিল। তার কিসের লজ্জা? কিসের ভয়? সাফ কথা, সে এসেছে কন্যা যাচ্ঞা করতে, এতে ক্ষতি কি?

শলপু তার সাদা সাদা চোখের পাতার নীচ দিয়ে বাঁকা চাউনিতে লক্ষ্য করে দেখলে যে ছোকরা তার কথায় কান দিচ্ছে না, তার মন আর কোথাও। বেলার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললে, "আর চঞ্চল হয়ে কি হবে, সাঁওতা? বেলা গড়িয়ে গেছে, আজ ঘরে ফিরে যাবার আশা ছেড়ে দে—"

"ঘরে—!" অন্যমনস্ক হয়ে দিউড়ুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘরের নাম শুনে তার হাসি পেল।

শলপুও হাসলে, "একলা আছে ডোক্রী (স্ত্রী), তুই তাকে হয়তো বলে এসেছিস এই তো কাছেই বন্দিকার, কাজ সেরে দেখতে দেখতে ফিরে আসব, এদিকে একবার এখানে এসে পড়ে এখন ফেরার পথ বন্ধ! তা, এমনিই হয় বটে, একটা দিনও ডোক্রী একলা থাকতে পারে না!"

বুড়োর রসাল সান্ত্বনা বাণী দিউড়ুর কান ছুঁলও না। মন অনেক দূর পথ পেরিয়ে চলে এসেছে, ঘর মনে পড়ল না।

"আরে—দিউড়ু—!"

"আরে—মিণিআপায়ুর সাঁওতা, কখন এলি?"

"ওড়ে সোই ওড়ে সোই' (হে বন্ধু), তুনিয়ার খবরগতিক কেমন?"

চারিদিকে লোকেরা এসে জড় হল। নানা বিষয়ে নানা কথা হতে হতে দিউড়ু সাঁওতা কি জন্য এসেছে সে কথা লোকে ভুলে গেল। শলপুর বারান্দায় বসে বসে গল্প করার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া আর মদে অতিথিসৎকার

আরম্ভ হল। আগে অতিথি সেবা, কত পরে আসে কাজের কথা। আরও লোক আসছে, গাঁয়ের পুরুষেরা, গাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা। আড় চোখে চেয়ে দিউড়ু দেখল দাঁতে আঁচলের খুঁট চিবাতে চিবাতে পিওটি আড়ে আড়ে তাকাতে তাকাতে নিজের ঘরের বারান্দায় তর তর করে চলে গেল। গায়ে অন্যান্য কন্ধনীদের মতই শুকনো পাতার তলরাতলক্ষি আঁটা, কিন্তু কি ভঙ্গী, কি চটক। হাতে কোদাল আছে অবশ্য, কিন্তু হাত পা অন্যদের মতো কাদামাখা নয়, কোন'ঝোরায় পরিষ্কার করে ধুয়ে এসেছে, মাথায় পরিপাটী খোঁপা, যেন সদ্য গা হাত পা ধুয়ে সেজেগুজে সে ফিরছে। সেই-খানেই দিউড়ুর মন আটকে রইল, সেই দেহের ধ্যান করতে করতে ছলনার আবরণ গড়তে দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে সে গল্পে মেতে রইল। দেখা-সাক্ষাতের প্রথম ঝলক চলে যাওয়ার পর কেজো লোকেরা একে একে যে যার ঘরে গেল। দিউড়ুর জন্য সিধে এল, কারো কারো ঘর থেকে ভাত তরকারি। শলপু কন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। শুধাল, "কি দরকার আছে তা তো বললি না, লোকেরা খেয়ে দেয়ে আবার মাঠে চলে যাবে যে।"

দিউড়ু পিওটির ঘরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে ছিল। ভিড় পাতলা হতেই পিওটি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভিজে কাপড় নিংড়ে শুকোতে দেওয়া, ভিজে বর্ষাতি ঝেড়ে ঝুড়ে মেলে দেওয়া—বারান্দায় তার অনেক কাজ। রান্না করার অছিলায় দিউড়ু মুগ্ধ হয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে, পিওটি আড়-মোড়া ভাঙছে। শলপু কন্ধ আর একবার বলল, "বুঝলি না সাঁওতা, কি দরকার তা বললি না তো—"

নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা গলায় দিউড়ু বলল, "দরকার কি একটা? কাকে বলব? হই হই করে তো সবাই চলে গেল।"

"তুই বা রান্না করতে বসেছিস কেন, সাঁওতা? হতে পারে আমাদের গাঁয়ের রান্না ভাত তোর মুখে রুচবে না, যাই হোক ভালোবেসে লোকেরা দিয়েছে। কষ্ট বরং হোক, কাজ চালিয়ে নে। এখন রাঁধতে গেলে কোন যুগে সিদ্ধ হবে?"

'তা বটে।"

" তাহলে তুই খেতে বস, আমি পাতা এনে দিচ্ছি। দেখি কি আছে আমার কুঁড়ে ঘরে—" বলে শলপু ভিতরে গেল। দিউড় তাকিয়ে রইল

পিওটির দিকে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা লম্বা করে পিওটি বসেছে। আবার উঠে বারান্দার ধারে এল। অন্যান্য বারান্দাতেও লোকেরা আছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, গ্রামের লোক বলে মাঝে মাঝে কেউ কেউ এদিকে তাকিয়েও দেখছে। দুই হাতে ঘরের চালা ধরে শরীর বেঁকিয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে পিওটি কেবল তাকিয়ে আছে। কত কথা সেই চোখে, মাঝরাস্তার উপর দুনিয়ার লোকের ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে কেবল চোখে চোখেই কথাবার্তা। শলপু উঁচু গলায় বলতে বলতে এল—"হাতমুখ ধুবি না?"

বিরক্তি চেপে অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখিয়ে দিউড়ু হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। ও বারান্দায় মায়ের পিছন পিছন পিওটি ঘরের ভিতরে চলে যাচ্ছে। দোর গোড়ায় গিয়ে একবার গলা বাড়িয়ে মুখটি দেখিয়ে কি কথায় সে হেসে দিয়ে গেল। দিউড়ুর খাবার আগ্রহ কমে যাচ্ছিল, সেই দিকেই সে চেয়ে ছিল। আর এক ঘরের বারান্দায় ছোট ছেলেপিলেরা ভাত খেতে খেতে দিউড়ুর দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলছে। শলপু কন্ধ চটে উঠে বলল, "আমারই ভুল, বুড়ো হয়ে আক্কেল খুইয়েছি। গোয়ালের টাটি একখানা এনে বেঁধে দিলে তুই নিশ্চিন্ত মনে দুটি খেতে পারতিস। দেখনা, দুষ্টু ছেলেগুলো কি গোলমাল করছে--" শলপুর ধমকে ছেলেরা মুখ নিচু করে বসে রইল। শলপু কন্ধ তবুও খানিক গজগজ করল। দিউড়ু দেখল পিওটির বারান্দা খালি। আস্তে আস্তে খেতে লাগল। শলপুকে একটা অছিলা দেখাতে তার এখানে আসবার একটা উদ্দেশ্য ভেবে নিয়ে বলতে লাগল—"হালে জুতবার মত দু'জোড়া বলদ দেখতে হবে, কিনব। তোদের গাঁয়ে তো অনেক গরু—"

শলপু আগ্রহের সঙ্গে এই আলোচনায় যোগ দিল। হাসতে হাসতে বলল, "ফসল বেচা পয়সা আছে, কেন বলদ জুটবে না!" শলপু ভাবল তাহলে এই জন্যই বৃষ্টি মাথায় করে দিউড়ু এসেছে, নিজে না এসে লোক পাঠালেই তো চলত, কিন্তু ছোকরা হুঁশিয়ার আছে। নিজেই চলে এসেছে, নিজের চোখে দেখে দর ঠিক করবার জন্য। চালাক আছে। তবে যে বলে মিণিআপায়ুর সাঁওতার বিষয়বুদ্ধি নেই। কে যেন বলছিল? লেঞ্জু কন্ধ। লেঞ্জু কন্ধ এখানে আসার পর যত কথা বলেছিল শলপুর মনে পড়ল। বিশ্রী

কথা, সমাজদ্রোহী কথা। যার বিষয়ে বলেছিল সে-ই শলপু কন্ধের বারান্দায় বসে খাচ্ছে।

চিন্তিত হয়ে দিউড়ুর মুখের দিকে তাকিয়ে শলপু ভাবতে লাগল।

এই এক বলদ কেনার কথাতেই ওষুধ ধরেছে, ভাবল দিউড়ু,—আরও তো কত কথা ছিল : দুই গাঁয়ের মধ্যে জমির অদল বদল, সীমানার গাছ, খাজনা দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ। পাশাপাশি দুটি গ্রাম, মন্ত্রণা পরামর্শের কথা অনেক আছে।

ভাত খেতে খেতে আবার ও বারান্দা—না, পিওটি বাইরে আসেনি।

ভেবে চিনতে শলপু বলল, "মনে কিছু করিস না, সাঁওতা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব—"

দিউড়ু চমকে উঠে পিওটির ঘরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফাঁপা গলায় বলল, "কি?"

"সাঁওতা, বাপও যে খুড়োও সে, লেঞ্জু বুড়োকে কেন গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলি? বেচারা কেঁদে মরছে।"

আশ্বস্ত হয়ে দিউড়ু বলল, "ওঃ,—এই কথা?"

"আমাদের বড় খারাপ লাগে, সাঁওতা। আমি বুড়ো-হাবড়া মানুষ, কেনই বা তোরা আমাদের গ্রাহ্য করবি, তবু সব বিষয়ের একটা সীমা আছে তো।"

"তা বটে।"

"হয়েছিল কি?"

দিউড়ু হাসল। বলল, "যে মানুষ ভিখারীর মতন তোমাদের পায়ের কাছে দৌড়ে এসে তোমাদের গাঁয়ের শরণ নিয়েছে, তার কথা বিশ্বাস করবে না আমার কথা, তাই আগে বলো। তোমরা তাকে আশ্রয় দিয়েছ, তোমাদের গাঁয়ের একটু জমিও দিয়েছ। ভালোই হয়েছে, তোমাদের গ্রামে একটি রায়ত বাড়ল। এসব কথা আমার সঙ্গে আলোচনা করলে কি তোমার মনে শান্তি হবে? তুমি তোমাদের রায়তের পক্ষ না নিয়ে কি আমার পক্ষ নেবে? আমি তো তোমাদের রায়ত নই—"

শলপুর চোখ ছাইচাপা আগুনের মত জ্বলতে শুরু করেছে। দুজন দুজনের দিকে চেয়ে রইল। একটু থেমে দিউড়ু বলল, "ঘরের ব্যাপার

নিয়ে পরের সঙ্গে পঞ্চায়েত করা যায় কি? তুমিই বলো। ঠিকই বলেছ, বাবাও যে কাকাও সে, সেটুকু আক্কেল যদি তার থাকত তাহলে ছেলেকে ফেলে ঘরের দিকে পিছন ফিরে চোরের মতন পালিয়ে আসত কি? কেন এল? নিজের গাঁয়ে কি তার জোর নেই, আমার জোর বেশী? এই দিক দিয়ে একবার ভেবে দেখো, নিজেই তোমার কথার জবাব পাবে। তার আপন গাঁয়ে মুখ দেখাবার জায়গা নেই। সে আমার কাকা, সে কুকুর হলেও হাটে বাজারে তার হাঁড়ি ভাঙলে আমাকে পাপ লাগবে। সে কেন এল তা আর কারুর চেয়ে সেই বেশী জানে। পরের ঘরের কথা নিয়ে কারো দিক টেনে আলোচনা করা তোমার মতো প্রবীণ কন্ধের শোভা পায় না, শল্‌পু ডিসারী।"

শল্‌পুর মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

কবে কার কাছে যেন সে শুনেছিল এমনি কথা—পুরানো কন্ধ পঞ্চায়েতে এমনি ধারা নিষ্পত্তি আগে শোনা যেত, এমনিই মুখের উপর উচিত কথা, ঠিক এমনি গম্ভীর ভঙ্গীতে শুনিয়ে দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিত আর এক জন। ঠিক হোক ভুল হোক, অন্যকে কাহিল করে দিতে জানে বটে।

নিজের মনের বেড়ে ওঠা বিরক্তি চেপে রেখে শল্‌পু কন্ধ ভাবতে লাগল, কুলবৃদ্ধ সরবু সাঁওতা ঠিক এমনি করে বলত, এই রকম তার যুক্তি, যতই উত্তেজিত হয়ে তর্ক করতে আসুক কেউ, তার পায়ের কাছে থেমে যেতে বাধ্য।

এর পর এখন আর তর্ক চলে না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ কোথাও বেয়াড়া হয়ে বাজলে কন্ধ হয়ে ওঠে বন্য মানুষ, তর্কের সূত্র ছিঁড়ে গেলে তাতে গিঁঠ বেঁধে বেঁধে মীমাংসাকে অনির্দিষ্ট কাল বিলম্বিত করতে সে ভালোবাসে না, তখন সে ভয়ঙ্কর—মরুক বা মারুক।

শল্‌পু কন্ধ দেখল দিউড়ুর মূর্তি গম্ভীর। খাওয়া শেষ হয়েছে। দিউড়ু উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুতে লাগল। কথা বলবার তার ইচ্ছে নেই মোটেই।

মনে মনে সরবু, দিউড়ু আর লেঞ্জু এই তিনজনকে পাশাপাশি রেখে শল্‌পু মিলিয়ে দেখতে লাগল। লেঞ্জুর মধ্যেও সরবুপনা-আছে, নইলে বন্দিকারের বস্তিতে রায়ত হয়ে না থেকে বাঘ ভালুকের মাঝখানে নির্জন চাষঘরে বাসা

বাঁধাই পছন্দ করবে কেন? দিউড়ু সরবুর ছেলে, এই দণ্ডে পুরোপুরি সরবু হয়ে গিয়ে চোখ রাঙিয়ে শল্‌পুর মতো মানুষকেও তার আসন সমঝিয়ে দিল। বাপের বেটা বটে, কিন্তু একাল আর সেকালের পার্থক্য আছে, প্রাচীনের আত্মা নবীনের মধ্যে আছে, তবু নবীন প্রাচীন নয়, কত তফাত।

শল্‌পুর মনে হল এবার সে উঠে যায়। বলল, "তুই থাক্ সাঁওতা, আমি একটু ক্ষেত দেখে আসি। সকালে তো যেতে পারিনি, এ বেলা একবার না গেলে চলবে না। আমি যাই।"

শল্‌পু চলে গেল। দিউড়ু একলা বসে রইল। বেলা পড়ে এসেছে। বৃষ্টি নেই, রোদ উঠেছে, মধ্যাহ্নের বিশ্রাম সেরে গ্রামের লোকেরা আবার মাঠে চলল। দিউড়ু দেখল পিওটি আর বাইরে এল না। গাঁ শুনসান, পিওটি সেই ঘরের ভিতর।

ছল করে দিউড়ু বাঁকা চাউনিতে গাঁয়ের গলিপথের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো দেখে নিচ্ছিল। দুই ধারে সারি সারি বারান্দায় কোথাও একটি দুটি মানুষ ঘুরছে ফিরছে। আর আছে কেবল কুকুর আর মুরগী। স্বপ্নের ঘোরে ঠাণ্ডা বাদলা দিনে মিণিআপায়ু থেকে বন্দিকার ছুটে আসবার সময় লোকলজ্জার কথা তার একবারও মনে পড়েনি, কিন্তু কি গ্রহের ফেরে শল্‌পু বুড়োর সঙ্গে দেখা হল, কত কথা সে খেয়াল করিয়ে দিয়ে গেল, মিথ্যে মনে মনে যেন সে চোর হয়ে উঠল।

নিশ্বাস উত্তপ্ত করে বুকে মাদল বাজিয়ে তার প্রতীক্ষা। কতক্ষণে সে দেখল যে আর কোথাও লোক নেই, সব বারান্দা খালি। কেবল কার কাঁদুনে ছোট একটি ছেলে ঐ দিকের বারান্দায় বসে কাঁদছে। দিউড়ু তাড়াতাড়ি উঠে দুইদিকে চাইতে চাইতে পিওটির ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"পিওটি, আমি এসেছি।"

ঘরের দেওয়ালের গায়ে যেন গা ঢেলে দিয়ে পিওটি বসে ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজায় খিল দিয়ে দিল। দিউড়ু দেখল ঘরের মধ্যে সেই পরিচিত অন্ধকার, চেনা আগুনের আলো তেমনি মুচকি হাসি হাসছে, চাকার ঘূর্ণিতে সেই মুহূর্তটি ফিরে এসেছে, জীবন আবার পূর্ণ, আবার অমৃত।

॥ ছিয়ানব্বই ॥

কত কথা নিরালায়।

সেই সে পিওটি, তল দেশের মেয়ে. কত নরসিং রাও সোনাইয়া পেণ্টাইয়ার স্মৃতি তার মধ্যে।

সেই দিউড়ু সাঁওতা, কন্ধদেশের ধাংড়ীদের পায়ের গহনা হাতের গহনার ঝনঝনানিতে তার কান কালা হয়েছে। পিওটির ব্যক্তিত্বে কত আছাড় খাওয়ার বেদনা, দিউড়ুরও। হাণ্ডর্ণা কন্ধ পিওটির হল না, সোনাদেঈ দিউড়ুর হাতের মুঠোর ভিতর থেকে ফসকে গেল। আর পুয়ু, কত রকমে মন ভুলিয়ে সেই কোন মিটিং গাঁয়ের জঙ্গল থেকে যাকে দিউড়ু ধরে এনেছিল, সেও আজ দিউড়ুর জীবনের কতটুকু? দিউড়ু আর পুয়ু, পাশাপাশি দুটি আরশি, কত ছায়া পড়েছিল তাতে। আজ তাদের সব সত্তা মুছে গেছে। এই ক্ষণটিতে দুজনেই মুক্ত নতুন বাঁধনে বাঁধা পড়তে। জীবনের ক্রমিক ইতিহাসের বনিয়াদ মনে ছিল না কারও, সমাজ আর ভালো-মন্দ সে সব ভুলে যাওয়া কথা এই মুহূর্তটিতে। দরজা বন্ধ, শেয়ালের গর্তের মতো ছোট ঘরখানির চালা দেওয়ালের উপর এইটুকু সীমা বেঁধে দিয়েছে। তার পর যাই থাক, তা থেকেও নেই। সময় ভুলেছে, বেলা শেষ হয়ে গেছে, গাঁয়ের লোক কাজ থেকে ফিরছে বুঝি, কিছু মনে নেই।

পিওটির মা কোণের কুঠরিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখন সেইখান থেকেই ডেকে বললে, "বেলা হল, ঝোরায় যাবি তো পিওটি!"

দিউড়ু দরজা খুলে বাইরে চলে এল। সূর্য নামতে নামতে মেঘের মধ্যে ঢলে পড়েছে, গাঁয়ে কেউ কেউ এদিকে ওদিকে যাওয়া আসা করছে, ভাববার অনেক কথা বাকী এখনো। বন্দিকারের বস্তি থেকে বেরিয়ে দিউড়ু নীচের ক্ষেতের দিকে চলল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে লোকেরা ফিরছে। ছল করে দিউড়ু একে তাকে জিজ্ঞাসা করে ফিরতে লাগল—ভালো বলদ কার আছে বেচবার। গাঁয়ের ভিতরে বলদ কিনতে প্রায় পাওয়া যায় না, নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ বলদ বিক্রি করে না। 'নেই নেই' শুনেও দিউড়ু নিরাশ

হল না। মিছে মিছে বলদ খুঁজতে খুঁজতে সত্যিই মনে হল ভালো বলদ এক জোড়ার সন্ধান করতে পারলে মন্দ হত না। সোভেনা কন্ধ ফিরছে, আরো আসছে শল্‌পু, হাগু'ণা, গাঁয়ের বড় রায়তরা।

সোভেনা পরামর্শ দিল, "বলদ কিনতে হলে গুড়িআর (চাষবাড়ী) মধ্যে গিয়ে গোয়ালে গোয়ালে তল্লাস করতে হবে সাঁওতা; কেবল দু' একটা দেখলে কি তোর মন উঠবে?"

সব কথাতেই দিউড়ু 'ঠিক ঠিক' 'হাঁ হাঁ' করে সায় দিচ্ছে। তাকে যে যত ইচ্ছে উপদেশ দিক, উপদেশে কারও ক্ষতি হয় না। উৎসাহ দেখিয়ে বলদের কেমন শিং কেমন দাঁত, কি রকম গড়ন হওয়া চাই তার ব্যাখ্যান করতে করতে দিউড়ু গ্রামে ফিরল। কথা রইল কাল সূর্য ওঠার সময় সে গুড়িআয় যাবে, নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে আসবে। কালকের জন্য লম্বা কাজের ফর্দ হয়ে গেল।

সন্ধ্যের সময় শল্‌পু কন্ধের বারান্দায় আড্ডা বসল, গল্প-সল্প করতে লোক জমল। হাগু'ণা সাঁওতাও এসে বসল। দিউড়ুর বোন পুবুলিকে হাগু'ণার আজও মনে পড়ে, কিন্তু তা সে বাইরে দেখাবে না। শল্‌পু কন্ধ আছে, বয়স গুণে সহজেই লেঞ্জু কন্ধের প্রতি তার সহানুভূতি, লেঞ্জু যে বর্ণনা দিয়েছিল তা সে ভুলতে পারে না, কিন্তু সে কথা এখন আর ওঠে না, সেও ভদ্র। লোকে জানে মিণিআপায়ুর সরহদ্দের মধ্যে বন্দিকারের গরু চরতে গেলে অনেক গরু কোথায় গায়েব হয়ে যায়, আর পাওয়া যায় না, কিন্তু ভদ্র আলোচনায় সে সব অভিযোগের কথা তোলা হয় না। অতিথি সৎকারের ত্রুটি নেই, শিকার করা জন্তু কাটা হয়েছে, মদ ধুঙ্গিআ আনা হয়েছে। গল্প করতে করতে অনেক দেরি হল। একজন হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। হাগু'ণা বাইরের দিকে তাকাল, বলল, "আরে, এত দেরি হয়ে গেছে, তুই খাসনি যে—।" তারপর বলল, "চল, আমার ঘরে শুবি।" দিউড়ু শল্‌পু বুড়োর দিকে তাকাল। সন্ধ্যা না হতেই শল্‌পু কত যত্ন করে বারান্দায় বাঁশের টাটি দিয়ে ঘরের মতন করে দিয়েছে, বিচালি বিছিয়ে তার উপরে চট পেতে দিয়েছে, একটু আগুন করে রেখেছে। দিউড়ু বললে, "না, থাক। এইখানেই সুবিধে হবে।" সভা ভাঙল।

পিওটির ঘরের সামনে ঘরের আলো এসে পড়েছে। দিউড়ু ছটফট

করতে লাগল। শলপু কত কি বলে যাচ্ছে, তার কানে ঢুকছে না। এদিকে মুখ ফেরাল, শলপু বলছে, "গ্রামের সাঁওতা হোক আর রাজাই হোক তাতে কি, অতিথি কুটুম যার তারই তো। কেমন আমার ঘর থেকে তোকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল হাণ্ডণা! এমনিই যুগ এখন, ছোকরারা মান মর্যাদা ভুলে যাচ্ছে! 'না' বলেছিস ভালই করেছিস, সাঁওতা।" দিউড়ুর প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। "আমিও তোর কাছে শোব, বুঝলি সাঁওতা।"

দিউড়ু চমকে উঠল। বলল, "তুই যেখানে যেমন ভাবে শুস্ তেমনি শুবি, আমার তো কিছু অসুবিধে হবে না।"

"এও কি একটা কথা? অতিথিকে একলা ফেলে যাব?"

বিরক্ত হয়ে কোনো লাভ নেই, ভাবল দিউড়ু, বুড়োর আবার কি খেয়াল গেছে, আগেকার আমলের আদর আপ্যায়নের আদর্শ দেখাবে। শলপু বোঝালে যে রাতে মাঝে মাঝে এ গাঁয়ে চিতা বাঘ আসে—কুকুর ধরে খেতে। তেমন বড় নয়, ছোট বাঘ। দিউড়ু আশ্বস্ত হল—তা হলে রাতে বাইরে বেরুলে কুকুর গোলমাল করবে এমন আশঙ্কা নেই। বারান্দায় দুইজনে খাওয়া দাওয়া করল। দিউড়ুর কাছে শলপু কন্ধও তার বিছানা পাতল। রাস্তার উপরে এক একটি ঘর থেকে এসে পড়া আলো একে একে নিবে গেল, দরজা বন্ধ হল। শলপু শুল, দিউড়ু শুল।

দিউড়ু সাঁওতা ঘুমের ভান করে শুয়ে শুয়ে শলপুর নিশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল, তার মনোযোগ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। এক জন বুড়ো মানুষের সম্বন্ধে এত তৎপরতার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে চিন্তা করা এই তার প্রথম। বাস্তবিক জোঁকের মতোই বুড়ো তাকে আঁকড়ে ধরে ছিল বসা থেকে শোয়া অবধি। ক্রমে ক্রমে বুড়োর নিশ্বাস পরিণত হল নাক ডাকায়। চারিদিক নিঃশব্দ, কারও দরজা বন্ধ করার শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। কোথাও এক একটা কুকুর ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ডাকছে, রাতের কুরুরি পাখী থেকে থেকে দূর থেকে কেঁদে উঠছে। দিউড়ু একবার উঠে দাঁড়াল, বিচালি খস খস করে উঠল, শলপু বুড়োর নাক ডাকার তাল কেটে গেল, নাক ডাকার বদলে এক এক জায়গায় ফোঁ—স্ ফোঁ—স্ দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে তাকে গণ্ডা পট্টকার বলে গাল দিয়ে দিউড়ু আবার শুয়ে পড়ল। এই লোকটির ঘুম পাতলা না গাঢ় তা সে জানে না। আশঙ্কায় আশঙ্কায় সময় চলে যাচ্ছে।

শেয়াল ডেকে উঠল। কিছুক্ষণ পরে চাঁদের আলো উঠল। শল্‌পুর ধ্যান করতে করতে যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে দিউড়ু ছটফট করতে লাগল। তার পর হুঁশ হল কেমন বোকা সে, শল্‌পুর যদি ঘুম ভেঙেই যায় তাহলে বললে হবে না যে সে বাইরে গিয়েছিল? বাধা পেয়ে আর উৎকণ্ঠায় অতি সাধারণ কথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে।

এবার ইচ্ছে করেই বিচালি খস খস করে দুপ দুপ করে পা ফেলে দিউড়ু বাইরে গেল। শল্‌পুর ঘোর নিদ্রা, নাক ডাকছে সমান তালেই। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে দিউড়ু তাকিয়ে দেখল। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পানসে চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘের ছায়া পড়েছে, বাড়িগুলো যেন সব ভূতের বাড়ি।

পিওটির কুঁড়ে ঘরখানির দিকে চাইতে বুক দুপ দুপ করে উঠল, পাগল হয়ে যেন নিশিতে পাওয়ার মত দিউড়ু চলে গেল সেখানে। দরজা খোলা আছে।

"পিওটি—"

"পিওটি ঘুমুচ্ছে,—এসো।"

দিউড়ু চমকে উঠল। অন্ধকারে আস্তে আস্তে কথা বলছে, ঘুম জড়ানো গলা এ কার? দিউড়ু পিছন ফিরে দুয়ারের দিকে চলল। আবার—

"দাঁড়াও, কেন চলে যাচ্ছ?"

গা ছমছম করছে, বুকের ভিতর হিম হয়ে আসছে। বাইরে কি শুনসান। আবার সেই স্বর—দেওয়াল থেকে না চালা থেকে, কে কথা বলছে? মনের কথার জবাব এল—"আমি পিওটির মা। দাঁড়াও, আগুনে ফুঁ দিই।"

দিউড়ু শান্ত হল। দেখতে দেখতে আবার সমস্ত লজ্জা এসে ঘিরল তাকে, ভয় হল—বুড়ী কি বলবে? উনুনে ফুঁ দিয়ে বুড়ী আগুন জ্বালল। আদেশ করল—"দরজা বন্ধ করে দাও। বসো।"

দেখা যাচ্ছে পিওটি উনুনের কাছে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দিউড়ুর চোখ ঘুরে ফিরে বার বার উনুনের দিকেই যাচ্ছে। মাথায় কাপড় দিয়ে বুড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলছে না। কিছু জিজ্ঞাসা করতেও দিউড়ুর মুখে কথা যোগাচ্ছে না। কতক্ষণ পরে—মনে হল যেন এক যুগ—বুড়ী জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ছেলেপিলে ক'টি?"

দিউড়ু উত্তর দিল।

বুড়ী বলল, "তোমার সঙ্গে যাবে বলে আমার মেয়ে নাচছে। তুমি কি তাকে বিয়ে করবে?"

মাথা নেড়ে দিউড়ু জানাল—"হাঁ"।

"এই আমার সব। যুবতী মেয়ে, আগুনের মতো। তোমার আবার একটি স্ত্রী আছে"—দিউড়ুর অস্বস্তি লাগছিল—"সব সামলে উঠতে পারবে তো?"

দিউড়ু ঘাড় নাড়ল।

"দেখো, হুঁশিয়ার। আমার মেয়ের দুঃখ কষ্ট হবে না তো?"

দৃঢ়ভাবে দিউড়ু বলল, "কখনো না।"

"তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ—এই আগুন সাক্ষী রইল—না রাখলে এই বুড়ীর চোখের জল তোমার উপরে পড়বে, তুমিই জানো।" এই বলে বুড়ী কোণের কুঠরিতে চলে গেল।

দিউড়ু হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নড়ন চড়ন নেই। এ কি শুনছে, এ কি দেখছে? আগুন নিবু নিবু হয়ে এসেছে, উনুনের কাছে পিওটি অঘোরে ঘুমচ্ছে, কোণের ঘরের অন্ধকারের ভিতর থেকে বুড়ীর কান্না শোনা যাচ্ছে। কত কাঁদছে পিওটির মা। স্তব্ধ হয়ে দিউড়ু সেই দৃশ্য কল্পনা করছে। ছায়ার মতো একটি বুড়ী। কখনও এসে দাঁড়ায়নি তার আর পিওটির মাঝখানে, কখনো শাসন করেনি, সে যেন কেউ না এমনিভাবে জেনে শুনে বা না জেনে শুনে সরে দাঁড়িয়েছে স্রোতের মুখ থেকে। কি হয়েছে তার আজ, অন্ধকারে কান্নায় কান্নায় তার আত্মনিবেদন। কত রাত হয়ে গেছে, ইঁদুরটিও খুট করে শব্দ করছে না, এর চোখে ঘুম নেই, বসে ছিল কখন সে আসবে বলে।

মাথা ঘুরে উঠল। মোহের জাল আলগা হয়ে খুলে আসছে, যে কর্তব্য-জ্ঞানের মূলে আছে আত্মরক্ষার চিন্তা সেই কর্তব্যের কথা ভাবতে বসল দিউড়ু। সত্যিই তো সমাজে সংসারে বিষম শোরগোল উঠবে, বুকে বজ্রের আঘাত পেয়ে পুয়ুও ছেড়ে চলে যাবে। ও কুঠরি থেকে বুড়ীর আকুল কান্না উঠছে। মাথার ভিতরটা এমন ঝিম ঝিম করছে কেন? কেমন যেন চারিদিকে কেবল কান্নার প্রতিধ্বনি। পুয়ু চলে যাচ্ছে, কি তার অপরাধ?

যতই দাবিয়ে রাখতে চাক্ বুকের ভিতরে খানিকটা ফাঁপা থেকে গেছে যেন, খালি ধক ধক করছে। চারিদিক কাঁদন ভরা, ভিজে, কেবল নৈরাশ্য। তুফান উঠল বুঝি, দূর বনের ঘাড় মটকে দিয়ে কাতর ক্রন্দনের সুর তুলে বইছে হিমেল বাতাস। অন্ধকার, অন্ধকার,—সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটি জীবনের সমস্ত অনুভূতি নিংড়ে নিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে পুয়ু চলে যাচ্ছে। হাকিনা—নির্দোষ অবোধ শিশু, বংশের ছোট প্রদীপটি—সেও চলে যাবে। ভেবে ভেবে কুল কিনারা পাওয়া যায় না। বুড়ী কাঁদছে। মন সান্ত্বনা পাচ্ছে না—সে ভুল করেছে—ভুল করেছে।

সময়ের ঠিক পাওয়া যায় না। কখন থেকে সব চুপচাপ হয়ে গেছে। দিউড়ুর হুঁশ হল। বুড়ীর সাড়া শব্দ নেই। চমক ভেঙে দিউড়ু দরজা খুলে বাইরে এল। বারান্দায় ছায়ায় অন্ধকারে গিয়ে বসল। সব নিথর। বড় ঠাণ্ডা। দরজার সামনে খাপচা খাপচা চাঁদের আলো থকথকে কাদার উপর। নিজেকে অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে আলোর দিকে চেয়ে সাত পাঁচ ভাবনা ভাবছে সে, একটার পর একটা। আস্তে আস্তে আবার শরীর গরম হয়ে উঠল, আবার নেশার ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে নুয়ে আসা অন্ধকার ছাঁচতলায়। গা ছম ছম করা ঠাণ্ডা রাত। মেঘ আর চাঁদের নিঃশব্দ কিমিয়া। দরজা খোলা। ভিতরে শুয়ে আছে পিওটি।

দিউড়ু উঠে চলা-ফেরা করতে লাগল। কয়েকবার দরজার কাছে গিয়ে চুরি করে তাকাতে তাকাতে শেষে পা টিপে টিপে আপনভোলা হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। উনুনের কাছে সামান্য আলো। দেখা যাচ্ছে পিওটি শুয়ে আছে। তার কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে আগুনের আভা। পিওটি ঘুমের ঘোরে আড়মোড়া ভাঙল। কিসের অদম্য আকর্ষণে দিউড়ু এগিয়ে গেল। উনুনে ফুঁ দিতে গিয়ে আস্তে আস্তে পিওটির কানে ফুঁ দিতে লাগল। "পিওটি, ওঠ্,"—বার বার নাড়া দিল। সব দুর্বলতা কোথায় উবে গেল: এত দূর এগিয়ে এসে কেন সে বোকার মত বসে ছিল? "ওঠ্—ওঠ্ পিওটি!"

ঘুমের ঘোরে তেলুগু ভাষায় পিওটি আদরের সুরে বিড় বিড় করে উঠল, এওরেঁা (কে?)। তার স্বপ্নে সেই তল দেশ। গভীর নির্জন পুকুরের পাড়ে খানিক তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা নারকেল গাছ, বালদোয় চাঁদের আলো লেগে আছে। বাতাস বইছে, ধীরে ধীরে গাছ দুলছে।

ওদিকে শল্‌পু কন্ধ তার বারান্দায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকাতে ডাকাতে গলায় আটকে গিয়ে নানা বিচিত্র শব্দ বেরুচ্ছিল। জীর্ণ দেহের ভিতর গুমরে গুমরে স্বপ্নের মধ্যে মন সুখ পায়; শল্‌পু স্বপ্ন দেখছিল—জেগে থাকার সময়কার শেষ কথা। পাহাড়ের উপর থেকে নিচু সমান জায়গায় নেমে আসছে গরুর পাল। উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে সে আর দিউড়্‌ সাঁওতা বলদ বাছাই করছে। পালে পালে চলেছে, লালচে রঙের বলদ ছাই রঙের বলদ, অন্য রঙের দেখা যাচ্ছে না। ডাকলে শোনে না, থামালে থামে না, শিং নেড়ে ঠেলা ঠেলি করতে করতে দৌড়ে চলে যাচ্ছে পালে পালে। লম্বা সারি দিয়ে গরু চলেছে।

কি রকম করে বুড়োর কাশি উঠতে লাগল, শীত শীত করতে লাগল। ঘুম ভেঙে গিয়ে শল্‌পু কন্ধ দেখল দিউড়্‌ নেই। উঠে বসে কাশির বেগে বার বার কাশতে লাগল, ক্লান্ত হয়ে আবার শুল। ভাবল দিউড়্‌ হয়তো বাইরে গেছে, আসবে। বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল।

ও বাড়িতে দিউড়্‌ জেগে, পিওটি জেগে। বুড়োর কাশির শব্দ শুনে দিউড়্‌ উঠল। বলল, "আমি যাই, দেখে আসি।" হাত তুলে দিউড়্‌কে থাকতে বলে পিওটি আগেই দরজার কাছে গেল। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। আজকের রাতটুকুই তো, দিউড়ু ভাবছে, এই একটা রাত ভিন গাঁয়ে তাকে চোরের মতন থাকতে হবে, কাল আর এই শঙ্কা থাকবে না। পিওটি ফিরে এসে কি বলে তারি অপেক্ষায় মন অস্থির হচ্ছে। আর কিছু শোনা যায় না। ঘরের ভিতরে অন্ধকার কেমন পাক খাচ্ছে যেন, বুকের ধুকধুক শব্দ যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার শুরু হচ্ছে দুড় দুড় করে। মনে হচ্ছে যেন এক যুগ হয়ে গেল। পিওটি ফিরে এল, বলল, "বুড়ো নাক ডাকাচ্ছে।" বাইরে বেরুতে হল না, দিউড়্‌ শুধোল, "রাত কত হয়েছে, পিওটি?" পিওটি আবার বাইরে গেল। ফিরে এসে বলল, "পোয়াতে তারা উঠেছে।" তাহলে সময় হয়ে এসেছে। এবার কেবল তাড়াতাড়ি কথাবার্তা। পিওটি মত দিয়েছে। পা বাড়িয়ে রয়েছে। এত দিনে তার যেমনটি চাই তেমনটি মিলেছে, তবু লোক দেখানোর মতো কত শর্ত তার। অন্যের স্বার্থকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যার কাছে মনে হয় কেমন নখের ডগায় এক টুকরো কাঠি ভাঙার মতো, তর সয়

না, মায়া হয় না, নিজের তিল থেকে তাল প্রমাণ সব কিছু স্বার্থ সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে জমিয়ে রাখে, তাতে সামান্য আঁচড়টিও তার সহ্য হয় না, সব কিছু পাকাপাকি করে রাখবার জন্য প্রতিশ্রুতি চায়। বার বার দিউড়ু শুধোয়—"রাজী তো?" বার বার তার হাত চেপে ধরে পিওটি বলে, "রাজী"। দিউড়ুর মুখে শপথের স্রোত বয়ে যায়, কোণের কুঠরিতে কান খাড়া করে শুনতে থাকে পিওটির মা পাংগিআণী, কাঁদতে থাকে আর কষতে থাকে এই জোড়ের বাঁধন কতখানি মজবুত।

কার গোয়ালে গরু ডেকে উঠল। পিওটি বলে উঠল, "মাগো, কি তাড়াতাড়ি সময় চলে যাচ্ছে দেখ না।"

দিউড়ু কিছু বললে না। কোণের কুঠরি থেকে পিওটির মা বেরিয়ে এল। বলল, "পিওটি, শীত লাগবে, গায়ে একটা কিছু দে।" পিওটি উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঢাকাঢুকি দিয়ে পিওটি আর তার মা বেরিয়ে এল।

তামাশা করে পিওটি বলল, "কাল গিয়ে আজ হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামের ভাত মুখে রুচেছে তো, তাহলে এইখানেই ঘরজামাই হবে নাকি?"

দিউড়ু বলল, "বেরুনো যাক্ এবার?"

"তোমার ইচ্ছে," হাসছিল পিওটি।

তার তল দেশের কথার ভঙ্গী দিউড়ু বুঝতে পারল না। বলল, "জঙ্গলে পথ, শেষ রাতে জন্তুদের ফেরবার সময়, তোর ভয় করবে না তো?"

পিওটি বলল, "বাঘ কি কেবল জঙ্গলেই থাকে, গাঁয়ে থাকে না? তোমার ইচ্ছে থাকলে চলো বেরুই, আমার ভয় করবে না।"

পিওটির মা বলল, "ওঠ বাছা, ওঠ, রাত থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি। পথে তো গদবাদের বস্তি আছে। যার কাজ থাকে পথ ঘাটের ভয় করলে তার চলে না।"

তিন জনেই বাইরে বেরিয়ে পড়ল। লোকেরা ওঠেনি। গলি পথের দুই দিকের গোয়াল থেকে ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের শব্দ। ঘন কুয়াশার উপরে ভেংচি কাটার মত মরকুটে চাঁদের আলো, আর কতক্ষণই বা। ঝোরার ঢালু বেয়ে নীচে নামবার সময় ঢালুর মাথায় কার ঘরের ভিতর থেকে যেন

ঝিমুতে ঝিমুতে মোরগ ডেকে উঠল। দিউড়ু চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি—! ঢাকাঢুকি দিয়ে তিন জন চলেছে, কারও মুখে একটি কথা নেই। ঝোরায় নেমে পার হবার সময় জলের ছল-ছল শব্দে আতঙ্ক জাগছে।

পিওটির মা পিছন থেকে ডেকে বললে, "সাবধান, বাবা সাবধান, ডান দিকে যেও না, গর্ত আছে।" দুই দিকে কি যেন সব চলে যাচ্ছে, ক্ষেত ঝোপ জঙ্গল, কচি আমগাছ, কত উঁচু-নিচু। দিউড়ু সামনে ঝুঁকে মুখ নিচু করে তাড়াতাড়ি চলছে, তার সঙ্গে যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা এক ধাংড়ী আর এক বুড়ী—পিছন পিছন চলেছে। কতক্ষণ পরে সামনে কার মন্দিরের চুড়োর মত চালার উপরে একটা মোরগ উঠে বসল, ডানা ঝেড়ে তীব্র স্বরে ডেকে উঠল। দিউড়ু দেখল ভোর হয়েছে, গদবাদের বস্তি দেখা যাচ্ছে। দিউড়ু পিছন ফিরে একবার তাকাল, কুয়াশায় বন্দিকারের কাছের দিগ্‌লয়ও আর দেখা যায় না। পিছন থেকে পিওটির গলা শুনতে পেল, কত কথা সে বলে যাচ্ছে, ভোরের ফিঙে পাখীর মতো সে ডেকে উঠেছে যেন। মন-মাতানো আশা-মাখানো তার মিষ্টি নরম বুলি। বনে এসে বন দেশের প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনের নির্ঘণ্ট থেকে আজ থেকে তার ছুটি। মনের মতো জীবন, সব করে হাতে ধরে দেবার পোষমানা মানুষ পেয়েছে সে। ছুটি, কেবল ছুটি।

"এই গদবাগুড়া (গদবাদের বস্তি) হল"—পিওটির মা বলল, "আমি এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি পিওটি, তোরা যা। পরে তোর ঘর-দোর হলে আবার যাব, তোকে দেখে আসব। যা মা, যা, দেরি করিস না, বেলা হয়ে যাবে।" দিউড়ুকে বলল, "আমার মেয়ের ভার তোমার হাতে দিলাম বাবা, তোমার হাতেই আজ থেকে সঁপে দিলাম। তোমার কাছ থেকে পণ চাইবার কেউ নেই। ফুলের মতো পালন করো, বেশী আর কি বলব। এই আমার সর্বস্ব।" এই বলে বুড়ী দাঁড়িয়ে রইল। দিউড়ুর বুকের বোঝা হালকা বোধ হল, একটা আশঙ্কা ছিল, ঘুচে গেল। পিওটি দিউড়ুর পিছনটিতে এসে দাঁড়াল, উপর মন দিয়ে এক বার হেঁকে বলল—"তুই আসসি্ না, মা ?"

"না, তুই যা, আর কথা বাড়াস না।"

দিউড়ু বলল, "তাড়াতাড়ি আয়, গড়িমসি করলে দেরি হয়ে যাবে।"

একলা বুড়ি ঐ পথে সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার চোখের সামনে উড়ে চলে যাওয়ার মতন ওরা দুজন অদৃশ্য হয়ে গেল। দিউড়ু পিওটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমার হাত ধর, তুই চলতে পারছিস না।"

আজ ভোরেই জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ, ভাবছিল দিউড়ু, আজ থেকে সব নতুন। ভাবছিল পুরাতন সংসারের কথা, সে কি থাকবে না, চলে যাবে? গাঁয়ের লোকে কি বলবে? পুয়ু কি চোখে দেখবে? কি ভাববে? এত দিনের ভাবনার পর আজ সত্যি সে পিওটিকে নিয়ে চলেছে—দিন রাত সে কি ভাবনা। কত কঠিন হবে ভেবেছিল, কত সহজে সে চলে এল তার হাত ধরে। ভালো, কিন্তু আগ বাড়িয়ে নিয়ে যাবে কে? বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ—।

এ কি সকাল আজ! কিলিয়ে ইঁচড় পাকালেও কিসের অভাব রয়ে গেল যেন, আবার কিসের গাঁইগুঁই। গাঁ যতই কাছে আসছে মন ততই দমে যাচ্ছে, কপালের ঘাম মোছে, অকারণ বুক কাঁপে।

পিওটি ছল করে বলল, "এই জন্যই এত কথা বলেছিলে? বাইরে বেরুতেই অমনি মুখে তালা চাবি পড়ল? একটা কথা নেই। মাগো, থকে গেলাম, এত কে দৌড়বে।"

দিউড়ু বলল, "তাড়াতাড়ি গেলে হবে—"

পিওটি বলল, "আর তাড়াতাড়ি কেন? গাঁয়ের কাছেই থাকতে না কেমন কেমন লাগছিল, তা আমরা চোর ডাকাত তো নই যে ভয় পেতে হবে।"

"না না, আমি কি বলছি তুই চোর? তুই চোর নস কিন্তু আমি তো চোর—!" দিউড়ু হাসতে লাগল, এ কথার জবাব নেই পিওটির। পিওটি বকে চলল—"এক বার না থামলেই নয়। দেখছ তো সামনে বন, এত ভোরে একলা অন্ধকার সেঁতসেঁতে বনের ভিতর ঢুকতে কার গরজ পড়েছে। বৃষ্টি নেই বলেই কি। ভালো করে রোদ না ওঠা পর্যন্ত আর আমি যাচ্ছি না, জঙ্গল আমার ভালো লাগে না।"

অগত্যা দিউড়ুও বসল।

পিওটি বলল, "তুমিও তো কম থকে যাওনি, উঃ কি ঘামছ, মাথার চুলের কি অবস্থা! চিরুনী থাকলে চুল বেঁধে দিতাম। তোমার কি হয়েছে? রাত জেগে ঠাণ্ডা লেগে শরীর ভালো লাগছে না? মুখ ভার করে আছ। কি ভাবছ? রাস্তা—জঙ্গল—বাঘ—ঘর? হাঁা, ঠিক, ঘরের কথাই মনে পড়ছে, ঘরে বউ আছে, আমি তো আর বিয়ে করা বউ নই।" পিওটি হেসে গড়িয়ে গেল।

দিউড়ু বলল, "না ঠাট্টা নয়। চল্, যাই। কোনো ভয় নেই, চেনা পথ তো। ওদিকে কাজ বাকী। দূর আর বেশী নেই। এই ডান দিক দিয়ে দিয়ে চলে গেলে নীচে নেমে পড়বার পথ আছে—সোজা আমাদের চাষবাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। সেইখানে একখানি ভালো বাসা আছে। এই বছরই চাল ছাওয়া হয়েছে, মজবুত ঘর। সুন্দর কলা বাগান, কমলা লেবুর বাগান, সুন্দর জায়গা, সেখান থেকে গাঁ দেখা যায় না—"

পিওটি চোখের পলক না ফেলে মুখ বাড়িয়ে সব শুনছিল, হঠাৎ ধাঁ করে উঠে দাঁড়াল, চোখ জ্বলে উঠছে, ঠোঁট কাপছে। চেঁচিয়ে ওঠার মতো করে বলল, "তার পর? বলে যাও, থামলে কেন? সেই সুন্দর চাষবাড়ীর ভিতরে মজবুত ঘরে কলাবাগান থেকে কলা আর কমলার বাগান থেকে কমলা খেয়ে খেয়ে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে থাকব তোমার রক্ষিতা হয়ে, কি চমৎকার হবে। ঘরে বউ থাকবে, চাষবাড়ীতে চাষবাসের সঙ্গে রক্ষিতা, তুমি আসা যাওয়া করবে, কত সোহাগ করবে—বলে যাও, থামলে কেন? মনে এত কথা ছিল, পটিয়ে আনবার আগে কই একটি কথাও তো বলোনি? বেশ, পথ পড়ে আছে, ঐ ডান দিক দিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি যাও।"

ঢোক গিলতে গিলতে দিউড়ু বলল, "ছি পিওটি, ভোর না হতেই ঝগড়া বুনলি, এই বিশ্বাস তোর আমার উপর? আমি কি এই কথা বললাম— ?"

"তবে কি বললে, বল। বল, আমি টাঁক করে আছি—"

মনে মনে গড়ে তোলা সমস্ত কথাবার্তা দিউড়ুর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত নিষ্পত্তি করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে সে, এসপার নয় ওসপার। খেলা খেলবার মজা উড়ে গেল। মাথার ভিতরে কেমন করে উঠে কপালে দাগ কেটে বসে গেল, দুলতে দুলতে সব যেন ঘুরে গেল এদিক থেকে ওদিকে, নিষ্পত্তি হয়ে গেল। লাল লাল চোখ মিট মিট করতে করতে

দিউড়ু বলল, "এমনি কথায় কথায় সন্দেহ থেকে সন্দেহে লাফিয়ে লাফিয়ে নিজে কষ্ট পাবি, আমাকেও কষ্ট দিবি তা তো আমি জানতাম না পিওটি। আমি কি বলছি আর তুই কি ভাবছিস? রক্ষিতা! কে বলল তোকে যে রক্ষিতা রাখব? ভালোবেসে বিয়ে কি হয় না? আমার যাকে ইচ্ছে বিয়ে করব। কার সাহস আছে আমাকে ভয় দেখাবে, আমাকে শাসন করবে?"

অদৃশ্য সমাজের উপরে মনের ভিতরকার সবটুকু রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে দিউড়ু ফুলতে লাগল। বলতে বলতে তার বল বেড়ে উঠল। পিওটি দেখছিল সেই মানুষ অবতার, ঠোঁট ফুলিয়ে জল টলটল করা চোখে তাকিয়ে দেখছিল। কি সুন্দর তার বলিষ্ঠ পশু, মাথা-বিকনো গোলাম! বাগাতে জানলে তার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেবে!

দিউড়ু বলছে, "থকে গেলি বলছিস, পথে বসে পড়লে যে যাবে সেই তাকাবে, একথা সে কথা জিজ্ঞেস করবে, মিথ্যে যাবার পথে হাট বসে দিকদারি। এই জন্যই বললাম চাষবাড়ীর পথে যাব, সেখানে ভাল জায়গা আছে, বিশ্রাম করে নিবি। তার পর গ্রামে যেতাম।"

পিওটি অমনি বদলে গেল। উঠে পড়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো করে, আগে আগে চলতে চলতে বলল, "কে বললে আমি থকে গেছি? দেখি তো কে আগে যায়! চাষবাড়ীর পথে আমি যাব না, সদর রাস্তা দিয়েই চলো। নির্জন পথ, জঙ্গলে পথ আমার ভালো লাগে না, গ্রামের পথই আমার ভালো লাগে।"

পিছন পিছন দিউড়ু চলল।

॥ সাতানব্বই ॥

ভোরে উঠে পুয়ু দেখল দিউড়ু নেই।

তার বিছানা যেমন তেমনি উনুনের কাছে পড়ে আছে, তার শোবার চট, গায়ের কাপড়—সব আছে, সে নেই। পুয়ুর আশ্চর্য লাগল। ঠাণ্ডা বাদলা দিন, হু হু বাতাস। এত সকালে সে তো কখনো ওঠে না। যতই দূর দূর করুক

রোজ ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে থাকার সময় পুয়ু তার পা টিপে দেয়, এমনি শেষ রাতে আরামের ঘুমটির মধ্যে একটু গা গরম করে নেবার জন্য উনুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে একটু আগুন জালে। আর আজ সে উঠে চলে গেছে, আশ্চর্য! পুয়ু নিজের কাজ করতে লাগল! মনটা কেবল পড়ে রইল এই সামান্য ব্যাপারটার দিকে। ছোট হোক বড় হোক আজ ভোরেই এ একটা অঘটন ঘটেছে, এত বছরের তাল দিয়ে চলতে থাকা গেরস্থালির মধ্যে একটা বেতালা ব্যাপার।

ঝোরার ঘাটে নানা ছুতোয় জিজ্ঞাসাবাদ করল। না, কেউ কিছু জানে না, কেউ দিউডুকে দেখেনি। পুবুলির সখী পুলমে মস্করা করলে—"দিনের বেলাতেই এত খোঁজ পড়েছে কেন গো বউদি?" জঞ্জইটা হুড়মুড় করে কথা বলে, পুয়ুর কাছ থেকে হাকিনাকে কেড়ে নিয়ে এক ঘাট মেয়ের সামনে বলে বসল, "হুঁশিয়ার বাছা, হুঁশিয়ার!" এমনি হাসি-তামাশা অন্যদের যতই ভালো লাগুক পুয়ুর কেমন অস্বস্তি লাগছিল। যাক্‌ গে, কোথাও হয়তো গিয়েছে, সেজন্য এত ভাবনা করা কেন। প্রথম পরিচয়ের সময়কার কথা মনে পড়ে। তখনও সরবু সাঁওতার ছেলে এমনি চুপ চাপ হঠাৎ কোথায় চলে যেত, তারপর তাকে অবাক করে দিয়ে বন থেকে একটা কুটরা নয়তো ময়ুর শিকার করে এনে পুয়ুর সামনে রেখে দিত। সবাই এসে জমত। বাপকে দেখলে লজ্জা লজ্জা করে বলত, "যাচ্ছিলাম এমনি, পথে পেয়ে গেলাম।" পুয়ুর দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখত। গেরস্থালির এমনি ছোট ছোট খেলা কাজ করতে করতে পুয়ুর মনে পড়ে যায়, কাজে হাত সরে না। আজও তেমনি, কিন্তু সেই দিউডু আজ আর নেই।

রান্নাবান্না সেরে পথ চেয়ে চেয়ে খাবার সময় পার হয়ে গেল। দুপুর পেরিয়ে গেল, না খেয়ে না দেয়ে পুয়ু বসে আছে। বৃষ্টি হয়ে গেছে, একটু-খানি ফিকে রোদ উঠেছে। লোকেরা খাওয়া দাওয়া সেরে ক্ষেতের কাজে গেল, দিউড়ুর দেখা নেই।

"সাঁওতা কোথায় গেল, কেউ কি দেখেছ? কেউ জানো?"

"না তো।"

জামিরি বুড়ো তার বুড়ীকে বলল—"গিয়ে দেখে আয় তো বউটা কেন বসে বসে ভেবে মরছে।"

বুড়ী এল—"কি গো, হয়েছে কি?"

"কোথায় যে গেল, খেতেও আসেনি। দেখেছ নাকি? একটু খোঁজ করতে যদি।"

জামিরি বুড়ো লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে বেরিয়ে পড়ল গ্রামে খোঁজ নিতে। পুয়ু তেমনি দূরের দিকে তাকিয়ে চেয়ে বসে রইল, আশা—বুড়ো যদি কিছু খবর আনে। লেঙ্গু কন্ধের ঘরের সামনে তেঁতুল গাছের ছায়া গাঁয়ের রাস্তায় ছাড়িয়ে পড়েছে। কোথায় দিউড়্? বেলা যে গেল। ঐ জামিরি বুড়ো ফিরছে। বুড়ো বুড়ীতে কথা হচ্ছে—"কই কোনো খোঁজ পেলাম না তো। যদি খামারে গিয়ে থাকে—কোনো কাজ আছে হয়তো।"

পুয়ুর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ল বেজুনীও গিয়েছিল, আর ফেরেনি। বাঘ লাগার দিন, তবে কি— হাকিনার দিকে চেয়ে দেখল, চোখ জলে ভেসে গেল, কত কি বিশ্রী ভাবনা এল মনে। এও কি হতে পারে! এমনও কি হয়! থকে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দূরের ভয়ঙ্কর ঘন বনের দিকে চেয়ে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না। কোথায় সে গেল? খোঁজ খবর নেই!

নিজেকে সামলে নিয়ে পুয়ু উঠে দাঁড়াল। আর এক রকম ভাবনা মনে এল। কিছু না বলে কয়ে যদি সে কোনো দূর গাঁয়ে গিয়ে থাকে? নিজের চাষবাসের ভালো মন্দের কথা খানিক খানিক সে বলে, আবার কত কথা বলে না। ঘরের মধ্যে পুয়ু দেখল তলরা তলরি নেই, লাঠি বর্শা নেই। এ তো সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু গায়েব চাদর কোথায় গেল? চালে ঝোলানো ছিল যে লাউয়ের খোল সে কোথায় গেল? ঘরে যেন কোথাও কিছু নেই, খাঁ খাঁ করছে। সামনের বারান্দার উপরে শুকনো কাদায় আঁকা মানুষের পায়ের চিহ্ন। মাথায় বুদ্ধি এল, বারিককে জিজ্ঞেস করে জানবে। ঠিক,—হাতের লোক বারিক, সে না জানলেও খুঁজতে যাবে।

ভুর্যামুণ্ডা বারিক নিজের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছে। এক দিকে ঢপ ঢপ্ চলেছে—সোনাদেঈ পা ছড়িয়ে বসে শ্যামাধান কোটার গর্তে শ্যামাধান কুটছে। পুয়ু এল সেখানে।

"বারিক, একটা কথা আছে।"

তামাক ফেলে বারিক তাড়াতাড়ি দৌড়ে এল। সাঁওতানী এসেছে। সোনাদেঈ হাত বন্ধ করে স্থির হয়ে তাকাল। পুয়ু ব্যস্তভাবে বারিককে নিচু গলায় কি যেন বলছে, বারিক ঘাড় নাড়ছে, পুয়ুর মুখ ম্লান।

"এর জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন, সাঁওতানী? হয়েছে কি এতে? সাঁওতা কি আর কোথাও হারিয়ে গেছে?"

একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবতে ভাবতে বারিক বলল, "গেছে তো গেছে, তোকে বলে গেল না কেন তাই ভাবছি।"

হেসে ব্যঙ্গের সুরে সোনাদেঈ বলল, "এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিস্ কেন বাবা? বলে দে না যে সাঁওতা বন্দিকার গেছে, বললে কি পাপ লাগবে?"

"বন্দিকার!" অবাক হয়ে পুয়ু বলে উঠল।

বারিক হাসল। বললে, "কি জানি কি বলে ফেললাম। ভাবলাম তুই তো নিশ্চয় জানিস, উলটে তুই জিজ্ঞেস করছিস, আমি তো অবাক! বড় লোকের কথার উপর কথা চলে না, নয়তো বলতাম দেখ না এত বড সাঁওতা হয়েও আমাদের সাঁওতা ছেলেমানুষের মতোই আছে।" আবার হাসল, বলল, "তোর সঙ্গে তামাশা করছে সাঁওতানী, তা নয় তো ভোরে এসে আমাকে তুলে বলে 'তুই চল, তোর ছেলেও চলুক।' গেলাম বাপ বেটা দুজনে, না যাবার মতন কি আমাদের ঘাড়ে দুটো মাথা আছে? এই তো ফিরছি আমরা।"

"কবে আসবে?" পুয়ু জিজ্ঞাসা করল।

"আজ তো আসতে পারবে না, কাল সকালে হয়তো—",

"কি জন্য গেছে তুই জানিস হয়তো, বারিক—" লাজুক মুখে পুয়ু বলল।

বারিক কোনো উত্তর দেবার আগেই হো হো করে হেসে সোনাদেঈ বলল, "তোমার জন্য কিছু ভালো জিনিস আনবে বলে গেছে হয়তো, সাঁওতানী! নইলে এমনি বাদলা দিনে বাঘ লাগার সময়ে ঘর থেকে কেউ কোথাও পা বাড়ায়?"

বারিকও হেসে উঠল। বলল, "দেখ, ঠাট্টা করছে। তা মিথ্যে বলেনি।" তার পর পুয়ুর দৃষ্টির সামনে নম্র হয়ে গিয়ে বলল, "আমি জানিনা, সত্যি বলছি।—কাল তো ফিরবেই।"

পুয়ু ফিরে চলে গেল। তখন শুরু হল সোনাদেঈয়ের খিল খিল হাসি ধান কোটার মুষলের তালে তালে।

যাক, একটা চিন্তা ঘুচল।

কোনো কারণে দিউড়ু বন্দিকারে গেছে।

কিন্তু এত হাসি কেন? কি বিকট ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল সোনাদেঈয়ের হাসির পিছনে। হাড থেকে মাংস খুলে নেওয়া নিষ্ঠুর ঠাট্টা? পুয়ু ধাঁধায় পড়ল। বারিক হয়তো সব জানে,কিছু বলছে না। চতুর ডোম পাতায় পাতায় যায়। তার কাছে কিছু লুকানো থাকে? জানে তো বলছে না কেন?

যাই হোক, আর তার আশঙ্কা ছিল না, খবর মিলেছে। কিন্তু যত ভাবে তত মনটা তেতো হয়ে যায়। অভিমান থেকে আসে রাগ, নিজেকে ভস্ম করে ফেলতে ইচ্ছা হয়। এমন অকারণে স্বামী তাকে তাচ্ছিল্য দেখাতে ভালোবাসে। বার বার বুঝিয়ে দেয় যে সে কেউ নয়, তার সুখ দুঃখ নেই, মান অপমান নেই, সে কেবল সয়ে যাবে, কিছু বলবে না। কেউ কি দিউড়ুকে দড়ি বেঁধে দরজার কোনায় টাঙিয়ে রাখতে চেয়েছিল? ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে লুকিয়ে লুকিয়ে গেল কেন? নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। সোনাদেঈ জানে, বারিক জানে, সে জানে না। মেয়ে মানুষেব মনে এতে বড বাজে, সেইখানে তার ব্যথা।

সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখ শুকিয়ে সে বসে রইল। আঁধার নামতে ছেলেকে ভোলাতে ভিতরে গিয়ে সে উনুন ধরাল। ছেলেকে শুইয়ে দিল। রান্নাবান্না নেই, উপোষ করেই শুয়ে পড়ল। ভেবে ভেবে চোখে ঘুম নেই। কি অনাদর, কি অবহেলা, কি জীবন। যতই কান্নাকাটি করুক মনের এই জ্বালা ঘুচবার নয়, মুখ শুকিয়ে যতই দীর্ঘশ্বাস ফেলুক এই বোঝা হালকা হবার নয়, এর প্রতিকার নেই।

নিশুতি রাত, আঁধার মেঘলা রাত। আজ সে একা। চোখ বুজলে সোনাদেঈয়ের সেই উৎকট হাসি বার বার খোঁচা দিতে থাকে, কুরতে থাকে, এক একটি করে ঘটনা গেঁথে গেঁথে ঝুলে পডে, কান্না পায়, ঘুমও আসে না, আজকের রাতও আর কাটতে চায় না। চিন্তা—চিন্তা, অন্ধকার রাতে কেমন যেন তারা বাদুড়ের মতো পাখা মেলে উড়ে আসে রক্ত চুষতে, না ভাবলে সময় কাটে না, ভাবলে প্রাণ বাঁচে না! ছেলেবেলা থেকে

আজ অবধি সব কথা কত ভাবে কত রঙে কত রকম হয়ে বার বার আসে, আবার সব বদলিয়ে হয়ে যায় দু' ফোঁটা চোখের জল।

যুগ উলটে গেছে, গাঁট আলগা হয়ে গেছে, তার জন্য হেদিয়ে হেদিয়ে কেঁদে মরলেও পুরানো আর নতুন হবে না।

॥ আটানব্বই ॥

রাত পোহাল।

আজ দিউড়ু আসবে।

আজ মন গেছে কালকের ঢিলে দেওয়া কাজ গুছিয়ে নিতে। মন চঞ্চল। সব পরিপাটি না থাকলে পাছে দিউড়ু এসে রাগ করে। পুরানো ঘরকে নতুন চোখে নিরীক্ষণ করে পুয়ু দেখলে অনেক কাজই বাকী, ঘরের ভিতরে, ঘরের বাইরে। ঝাঁট পাট দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা শুরু হল। তাড়াতাড়ি ঝোরা থেকে স্নান সেরে এসে রান্না বসিয়ে দিল। মাড়ুয়া বদল দিয়ে মদ আর ধুঙ্গিআ কিনে রাখল। জেদী লোক—ঘরে ঢোকামাত্র হাতের কাছে সব ঠিক থাকা চাই। এত দিন পরে রোদ উঠেছে। কান্নার পালা শেষ করে জল টলটল করা চোখে চেয়ে আছে বন দেশ। গ্রামের গলি পথে হাসি উছলে পড়ছে, আজ সবাই খুশী। রোদে বসে সকলে চুল বাঁধছে। পুয়ু চুল আঁচড়াল, পরিষ্কার কাপড় পরল।

এক নাগাড়ে বৃষ্টির পর আজকের মতো দিনে সকলের মুখে গুনগুন গান, হাসি। পাড়ার মেয়েরা এসে ডেকে বলে গেছে, 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নে, আজ বনে ঘুরতে যেতেই হবে।' মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে গিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে কয়বার পুয়ু ফিরে এসেছে। দিউড়ু আসতে দেরি করলে আবার সব উৎসাহ নিবে যাবে, সে না আসলে কাজ ফুরাবে না। গাঁয়ের মোরগ প্রহর বেলার ডাক ডাকল। দু' লাঠি বেলা হয়ে গেল, লোকেরা যে যার বারান্দায় খেতে বসল। তবু দিউড়ুর দেখা নেই। পুয়ু দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ডিসারীর ঘরের চালে বসে একটা কাক অনবরত কা কা করছে, গলি পথে ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে। সামনে চোখ ঝলসিয়ে ভিজে বন

রোদে রুপোর মত ঝলমল করছে। এই সব ফাঁকা দৃশ্যের দিকে তার দৃষ্টি নেই। মনের ভিতরে সেই দুরু দুরু, কেন এখনো পর্যন্ত সে এল না? বারান্দায় বারান্দায় সেই পুরাতন দৃশ্য। পড়শীদের ঘরে হাশিখুশি, সবাই মিলেমিশে হাঁড়ি থেকে লাউয়ের খোল থেকে পাতার দোনায় ঢেলে ঢেলে খাচ্ছে, হই হই করছে। এদের সামনেই তার ফাঁকা গেরস্থালি—দিউড়ু ফেরেনি।

খাবার সময় গড়িয়ে গেছে। না খেয়ে না দেয়ে শুকনো মুখে বসে আছে পুয়ু। দূরে থেকে যেন লোকেদের গলা শোনা গেল। হুড়োহুড়ি করে লোকেরা গাঁয়ের মুড়োয় ছুটল। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে স্ত্রীলোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে পডল। পুয়ুর যাবার আগ্রহ হল না। গাঁয়ে এমনি একটা না একটা আনন্দ লেগেই থাকে, কথায় কথায় হাট বসে যায়। আগ্রহ হবার মতো আর তার মনের বল নেই। ঐ কাছে আসছে গাঁয়ের আনন্দ, ক্রমেই বেড়ে উঠছে লোকেদের কোলাহল, যেন কেউ এই কলরবের পৃথিবীর উপর থেকে আস্তে আস্তে ঢাকনিটা তুলে নিচ্ছে। ব্যাপার কি? এরা সব কি বলাবলি করছে? কিসের এই গোলমাল ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এগিয়ে আসছে কাছে? কি বলছে?—"সাঁওতা"! ঘূর্ণির টানে হিঁচড়ে যাওয়ার মতন নিজেকে ভুলে পুয়ু বাইরে দৌড়ে গেল। দেখল।

বারান্দা থেকে দরজার সামনে নামতে না নামতেই আটকে গেল পা, স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পুয়ু দেখল,—দুয়ারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিউড়ু—সাঁওতা, তারই কাছে মাথায় পোঁটলা নিয়ে দাঁড়িয়ে একটি নতুন ধাংডী। সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে, কত মুখে মুখে কত রকমের প্রশ্ন, তর্ক-বিতর্ক—তাকিয়ে আছে সেই দুই জনের দিকে—পুয়ুকে দেখামাত্র হই চই বেড়ে যাচ্ছে—জনতার মধ্যে যেন স্রোত বয়ে যাচ্ছে—কি যেন সব হয়ে যাচ্ছে—সব নাচছে, ঘুরছে, ওলটাচ্ছে, টলছে—জগৎ সংসার পাগল হয়ে উঠেছে। এই কি 'মেরিআ' বলি হচ্ছে সে নিজে—কত টুকরো টুকরো কথা চারিদিক থেকে উড়ে আসছে, তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলছে, দিউড়ু কি বলছে?—নতুন ধাংড়ী এনেছি, এক স্ত্রী থাকতে আর একটি আনতে কি মানা আছে—কেন লোকেরা তার দিকে ধেয়ে আসছে—এমন চাকার মত ঘুরছে কেন মানুষ ঘর সব মিশে গিয়ে।

তার পর আর কিছু নেই। সব অনুভূতি শেষ হয়ে গেছে। পুয়ু মূর্চ্ছা গেছে।

যখন চোখ খুলে চাইল, হাতড়াল হাকিনা কোথায়, কাছেই শুয়ে আছে। আগুন জলছে ধিকিয়ে ধিকিয়ে, ঘরের ভিতরে অন্ধকার। সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আবার। ভাবল, রাত অনেক, ঘুমের ঘোরে কি সব বাজে স্বপ্ন দেখছিল। পাশ ফিরল। এসব ভিজল কেমন করে? কে কথা বলছে? সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়াল জামিরির বুড়ী। মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে মিষ্টি করে বললে, "উঠেছিস্ মা"—তার পাশেই জামিরি বুড়োর কাঁপা কাঁপা মোটা গলায়—"গরম মাড়ুয়ার ফেন একটু ওর মুখের কাছে ধর্, এখন ওকে বকাস্ নে।" ধীরে ধীরে ভাবনা ফিরে এল। অল্পে অল্পে, জল চোয়ানোর মত করে, চুইয়ে ওঠা ঝরনার মতো বেড়ে বেড়ে মনে পড়ল—রাত হল, দিউড়ু ফিরল না!—বড় বড় চোখ মেলে চারি দিকে তাকাল। জামিরির স্ত্রী তার উপরে ঝুঁকে পড়ে চুমকুড়ি দিতে দিতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দরজা খুলে বুড়ো বাইরে গেল। এখনো তো অনেক বেলা আছে, রাত হয়ে গিয়েছিল কেমন করে? সব মনে পড়ল। ধীরে ধীরে প্রাণের অন্তস্তল হতে সব কিছু নিংড়ে চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা। বুড়ী সান্ত্বনা দিল, "ছি মা, ছেলেমানুষ হলি তুই? সামলে নে। পরে যে এসেছে সে পরেই, আগের যে সে আগে। তোর লোকসান কিসের? কেন কাঁদছিস্?"

ঝড়ের মত হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। তাই তো, এ তার নিজের বাড়ী নয়, জামিরির বাড়ী। নিজের বাড়ীতে—,আর ভাবনার তর নেই, সব ভাবনা চাপা ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে চলল কান্না, যত জল তার চোখে আছে আজ সব তার দরকার, সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ধন।

লেগে রইল, বাড়তে থাকল পুয়ুর কান্না, আর বুড়ীর সান্ত্বনা,—বান ডাকা বৃষ্টির মত। চমকে জেগে উঠে হাকিনা এ সবের সঙ্গে জুড়ে দিল তার ছোট্ট গলার আওয়াজটি।

॥ নিরানব্বই ॥

"এ কি, কাঁদতেই থাকবি কেবল—ওলো, ওলো পুয়ু, দেখ তো তোর ছেলের কি দশা হয়েছে—ছেলেটাকে মাই দে—ওলো পাগলী, শুনছিস্—?" জামিরির বুড়ী তার গায়ে হাত দিয়ে বার বার নাড়া দিচ্ছে। কান্নার স্রোত শেষ হয়ে এসেছে, নীরবে শুধু চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে। পুয়ু মুখ তুলে চাইল। হাকিনা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে মুখ কালো হয়ে গেছে, ছটফট করতে করতে হাতে পায়ে খিল ধরছে। কখন সে একটু খেয়েছিল কি না। পুয়ু ছেলেকে কোলে তুলে নিল। আহা, কচি ছেলে, কি হবে এর দশা। আর এক পশলা চোখের জল, তার পর আবার এক পশলা। একসঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি জলের ফোঁটার মত চোখের জল ঝরে পড়ে থেকে থেকে—বৃষ্টির শেষে হঠাৎ কখন বয়ে আসা দমকা বাতাসে ভিজে গাছ থেকে ঝরে পড়া জলের ফোঁটার মতো।

হাকিনা মায়ের স্তনে মুখ পুঁতে দিয়েছে, কতক্ষণ ধরে খিদে পেয়েছে তার, শুষে ফেলতে চাইছে সে। চুরি করে করে তাকিয়ে দেখছে মায়ের মুখের দিকে। ছেলেকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে পুয়ুর বিবেচনাশক্তি ফিরে আসছে। পায়ের নীচে সহিষ্ণু সুদৃঢ় বসুন্ধরা, আশ্রয় দিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে। চারিদিক ফাঁকা হয়ে গেছে, অশ্রুসিক্ত চোখের সামনে পড়ন্ত বেলার নরম রোদ এসে পড়েছে বারান্দার উপরে। খোলা হাওয়া হাত বুলিয়ে যাচ্ছে মনের বেদনার উপরে। স্মৃতি ফিরে আসছে—জীবন আছে, সংসার আছে।

"চল না বাইরে, আয়—" ছোট ছেলেকে ভোলানোর মত যত্ন করে আদর করে জামিরির বুড়ী বোঝাতে লেগেছে। দরজাটা ভাল করে খুলে দিলে। "আয় মা, আয়—" তার পিছনে পিছনে পুয়ু বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসল। কত শিগগির গাঁয়ের ময়দান নির্জন হয়ে গেল! কে কোথায়! উদাস হয়ে কাতর দৃষ্টিতে ঘাড় পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে একটি স্ত্রীলোক ঠায় বসে আছে। জামিরির বুড়ী এক ধারে কোমরে হাত

দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে। কত কি বলে যাচ্ছে সে, পুয়ুর মনের ভিতর ঢুকছে না, অর্ধেক শুনতে পাচ্ছে অর্ধেক শুনতে পাচ্ছে না। কি আছে তার মধ্যে? সব অর্থহীন কথা, এ পৃথিবীর নয়।

"এমন করে বসে আছিস কেন মা, কথা বলছিস না পুঁয়ু, কথা বল। ওঃ, কি হয়েছে মুখের ছিরি, হাঁ লো, দুদণ্ড সামলে থাকতে পারলি না পাগলী, আরও তো আছে, পাকা চুলে তুই ঘর করবি, ছেলে মানুষ করবি। তোর হয়েছে কি যে এত কাতর হয়ে পড়লি? তোকে দেখলে কে স্থির হয়ে থাকবে! এই তো, সইতে পারলে না বুড়ো, চলে গেল। কি কান্না!"

বিরাম নেই, এমনি বকর বকর বকর—। পুয়ুর মন রা ধরেছে—আঃ, থাম্ না, কেন মিথ্যে কে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে কানের কাছে।

ভাবতে দে, চেয়ে দেখতে দে।

ফাঁপা ফাঁকা দুনিয়াটাকে চেয়ে দেখতে দে একলা একলা। মুখের সামনে সে যেন পর্দার মতন টাঙানো রয়েছে। যেখানে যা ছিল সব চলে গেছে। ঘর পড়ে আছে, মানুষ নেই। গোয়াল চেয়ে আছে, খালি খুঁটি থেকে দড়ি ঝুলছে, গাই গরু নেই। পোড়া ধান ক্ষেতের মাঝে বসুধা ফেটে হাঁ করে আছে, মুখে দেবার এক বিন্দু জল নেই। ঝোরার ধারে ধারে লালচে সাদা হাড় গাদা গাদা, জলের বদলে কালো বালির চর, সব শুকিয়ে গেছে, সব নেড়া, রুক্ষ, ছিবড়ের মত নীরস। কোথায় ছিল এত তাত? নেড়া পাহাড়ের আবড়া-খাবড়া পাথুরে ফাটলের ভিতর থেকে কে কেবলি উড়িয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে ছাই আর ছাই, ভাঙা চুপড়িগুলো গড়াতে গড়াতে এ ওর পিছনে ধাওয়া করতে করতে উড়ে যাচ্ছে ভাঙা হাঁড়ি কুড়ির আস পাশ দিয়ে। ফুটো চালা আস্তে আস্তে ধসে পড়েছে, খড় কুটো ফুর ফুর করে উড়ে যাচ্ছে, কালো লালচে বাঁশ, ছাই রঙের বাঁশ, বুড়ো মানুষের দাঁতের মতন নড়তে লেগেছে ঝড়ে, নড়তে নড়তে নীচে এসে পড়ছে গোছা গোছা ছপ্পরের চাল। ঐ ধোঁয়ার মত ছাইয়ের রাশ চারিদিক আঁধার করে উড়ে আসছে, ঘিরে আসছে, পাহাড়ের খোল থেকে উঠছে অদ্ভুত আওয়াজ। উঃ, কি তাত, সব শুকিয়ে গেল! কি হল?...আর ভাবতে পারছে না পুয়ু। কাচের মত চোখ দুটো কপালে তুলে দেওয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে

মানুষটা, নড়ন নেই চড়ন নেই। গরু ঘরে ফেরার বেলা, গলি-পথ দিয়ে কাদায় ছপর ছপর করতে করতে গেল কত লোক। মুখ বন্ধ করে এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে কলসী কাঁখে মেয়েরা চলেছে ঝরনা নদীর দিকে, ছোট ছেলেরা লাফালাফি করছে, রোদ মুচকি হাসি হেসে নেমে পড়েছে পাহাড়ের মাঝে। পুয়ুর সাড়া নেই।

ও বাড়ি থেকে কে হাসছে? ও কার গলা? ঘুম ভেঙে ওঠার মতো পুয়ু মুখ তুলে শুনল। দিউড়ু হাসছে, তার নতুন বউ হাসছে, পড়শী বাড়িতে শত্রুরা হাসছে। ধীরে ধীরে চোখের জল শুকিয়ে এল, মলিন মুখের উপর তাত ছুটে এল এক এক প্রস্ত করে, কানের গোড়া গরম হয়ে কান খাড়া হয়ে উঠল। ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হচ্ছে, গলা খুলে হাসাহাসি হচ্ছে। তারই বাড়ীতে তারই মুখের উপর বসে শত্রু বাদ সাধছে। রাগে রাগে ফুলে পুয়ু কঠিন হল, আর কান্না নেই, বল এল, তাতানো লোহার মত রাগের বল। মনে হল সে বসে বসে শুনতে থাকে আর রাগতে থাকে। কখন এক ঝাঁকি দিয়ে উঠে বারান্দা থেকে নেমে পড়ে নিজেকে দেখেই অবাক হয়ে সে ভাবল—ছি, এখানটাতে কেন বসে রয়েছে সে? কি দেখবে বলে? ছেলেকে বুকে করে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে।

॥ একশ ॥

"কে যায়?"

পুয়ু চমকে উঠল। থেমে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল।

মুখ নোনতা হয়ে গেছে, মনে আগুন। গাঁ শেষ হয়ে এল বুঝি, কোথায় চলেছে সে।

আবার দু' এক পা এগতেই পিছন থেকে আবার ডিসারী হাঁক দিলে—"অন্ধকার বনের দিকে যাচ্ছে কে? শুনতে পাও না? এসো, ফিরে এসো।"

কিছু না বলে মাথাটি নিচু করে পুয়ু ফিরে চলল। আকাশে তারা ছড়িয়ে পড়ে আছে, রোজকার মত আজও পাণ্ডু ডিসারী তার ঘরের সামনে

উঁচু পাথরটার উপরে বসে নক্ষত্রের যোগ দেখছিল। তারার মিটমিটে আলোয় তার মূর্তি ঠাহর হয়। নড়া নেই চড়া নেই, পাথরের মতন।

ডিসারী আবার সব ভুলে গেছে, শুধু উপরের দিকেই তার চোখ। নীরবে এসে পাথরের গোড়ায় পুয়ু দাঁড়াল। দূরে গলি পথের উপরে কোথাও কোথাও রান্নার উনুনের লাল আভা জ্বল জ্বল করছে। লোকেরা এখানে ওখানে জটলা করছে, নানা কথাবার্তা হচ্ছে।

কি কথা? শুধু তারই কথা। সারা দুনিয়ার সহানুভূতি তার পিছনে তাড়া করে আসছে। হাট বসেছে। গাঁয়ের পথের ধুলোয় গড়াচ্ছে তার নাম। গাঁয়ের ও মুড়োয় তার ঘর, তার ঘর সংসার, তার ধাংড়ী জীবনের সমাধি। মনে হলে প্রাণের ভিতরটা পুড়তে থাকে।

কোলে বাচ্চাটি আড়-মোড়া ভাঙ্গছে, কোলেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, বেচারা। কি হবে এর দশা! কে একে নিজের মনে করে আঁচলের তলায় রেখে পুষবে পালবে? কার জোরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এই মানব শিশু?

দর দর করে চোখের জল ঝরে পড়ল, মনে পড়ল ভগবান্, আকাশে ধর্ম নীচে দর্তনী। ডিসারীর পাথরের আসন-তলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে পুয়ু শূন্যের দিকে মুখ তুলল।

চরম বেদনার মূর্ত রূপের মতন কালো নিরাশার অন্তরের ভিতর থেকে ডাক উঠল: ভগবান্—ভগবান্—, ভাঙা হাঁড়ির শূন্যগর্ভ আধেয়, দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বাতাস, চোখের জলে ভেজা মানুষের হাতে গড়া সংস্কার—আঁধারী ভগবান্।

"কে কাঁদে? কি হয়েছে?" ডিসারী নীচে লাফ দিয়ে পড়ে কাছে এল। "ও, সাঁওতার ডোক্রী (স্ত্রী)! কাঁদিস্ নে মা,—চল্, চল্।" মিষ্টি করে কথা বলে তাকে নিজের ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গেল। ডাকলে, "ওগো, ও বুড়ী, দেখ্ তো কে এসেছে!" দরজা খুলে বুড়ী পুয়ুকে দেখলে। কিছু না বলে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভিতরে টেনে নিলে, পিছনে পিছনে গেল পাণ্ডু ডিসারী।

কারও মুখে একটি কথা নেই। উনুন জ্বলছে। রান্না বসেছে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে পুয়ু বসে রইল। বুড়ী উনুনে কাঠ গুঁজে দিলে। আগুনের

আঁচের কাছে হাঁটুর উপর হাঁটু পেতে বসে হাতের উপর গাল রেখে ডিসারী ভাবছে। তার চকচকে ফরসা কপালের উপর কিসের যেন ছায়া ভেসে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কতক্ষণ গেল, বুড়ী নিচু গলায় আস্তে আস্তে কথা পাড়ল। ডিসারী মাথা নাড়ল। সর্বত্র ঐ এক কথা! পুয়ু ভাবছে সংসারী মানুষের সরল উপদেশ—সয়ে যাও, চোখ কান বুজে, অদৃষ্টে যা আছে মাথা পেতে নাও, আপনি এক দিন না এক দিন সব ঠিক হয়ে যাবে, খাঁটি আর মেকী প্রকাশ পাবে, দুষ্ট দণ্ড পাবে, ন্যায়বন্ত পাবে পুরস্কার। সেই ভবিষ্যতের পানে চেয়ে, আশা রেখে ধৈর্য ধরো, বুক বাঁধো।

মন ভোলানো সান্ত্বনা। মানুষের কি হবে তা দিয়ে?

সান্ত্বনার বাণীও আস্তে আস্তে ফুরিয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। আগুনের আভা এসে পড়েছে পুয়ুর মুখের উপর! চোখের জল শুকিয়ে আসছে, বাইরের তুফান ভিতরে ঢুকেছে। সেখানে কথা পৌঁছায় না। আবার সেই নিস্তব্ধ ঘর। কাঠের পুতুলের মতো বুড়ো বুড়ী বসে আছে। রান্নার হাঁড়িতে এক তালে টগবগ শব্দ। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে মানুষের ছোট্ট একটি উনুন, তাতে ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন নানা রঙে—লাল বেগুনী সবুজ আগুন। নিবে আসছে আবার আপনি জ্বলে উঠছে।

বাহিরে শুধু অন্ধকার।

সেখানে সহানুভূতি নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিসারী উঠল। তার চোখের পাঁশুটের নীচ থেকে লাল ফুটেছে বুঝি। তাড়াতাড়ি বলে দিয়ে গেল, "যা, দুটি খেয়ে নে মা, আমার দেরি আছে।"

বুড়ী চমকে উঠে রান্নায় মন দিলে। পুয়ু বাইরে এল। ধাপের উপর দাঁড়িয়ে পাণ্ডু ডিসারী দূরের দিকে চেয়ে আছে। কিছু বলবে নাকি সে? সব সে জানতে পারে, প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী। জিজ্ঞেস করলে কি বলবে না? দেওয়াল লেপটে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবে করবে করতে লাগল পুয়ু, ঠোঁট কেঁপে উঠে আবার স্থির হল। সেই ক্ষণটি চলে গেল, জিজ্ঞাসা করা হল না।

খস্ খস্ শব্দ শুনে ডিসারী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, "আবার বাইরে এলি কেন? ছেলের ঠাণ্ডা লাগবে যে। যা মা, ভিতরে যা, খেয়ে দেয়ে নে।

আমার দেরি হবে। যা, এত দুঃখ কিসের? মনকে ভুলিয়ে নে, ভুলে যা। আনন্দের জন্য আমাদের জন্ম, নিজে না চাইলে কার ক্ষমতা আছে আমাদের মনে কষ্ট দেয়? এ সংসারে দুঃখ নেই।"

বলে চলে গেল। কি সুন্দর! আবার তার পাথরের উপর গিয়ে উঠছে। সারা রাত ধরে কত নক্ষত্র গোনা। সে বড়, সে জ্ঞানী, তার আছে বিশ্বাস, আছে আনন্দ। তাই বলে সকলের তো নেই। সকলেই কি তার মতো?

ভুলে যা! দুঃখ নেই! এ কি তার প্রাণের কথা? এ কি সত্যি? এ তারার কথা, আকাশের কথা, রক্ত মাংসের মানুষের নয়।

আঁধার দুলছে, কালো ঝোরার ভিতরে আঁধার বন্যার মতো।

আকাশে মিট মিট করছে তারা, অতি দূর, উদাসের দ্যোতকের মতো।

জিজ্ঞাসা করলে জবাব মেলে না। নির্মম নীরন্ধ্র যবনিকা।

পাথরের উপরে বসে আছে ডিসারী, সত্যের সন্ধানী। দেখতে পাবে, কথতে পারবে না; বুঝবে, বোঝাতে পারবে না। ভরা বর্ষার মধ্যে একটি পরিষ্কার রাত, কার জন্য? তার জন্য নয়।

জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে, চারিদিকে গোল করে ঘিরে ঢেউয়ের মতো অন্ধকার বিছিয়ে আছে। সব যেন ঘুমচ্ছে, গাঁয়ের রাস্তায় আলোর আভাসও নেই, মানুষের গলার আওয়াজ নেই, সব ডুবিয়ে দিয়ে একটা ভারের মতো চেপে বসছে যেন শীতল বিস্মৃতি।

রাত বেড়েছে। ডিসারী এল। দোরের কাছে চুপ করে বুড়ী বসে আছে। ফিসফিস করে দু' একটি কথাবার্তা। বুড়ী হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। আঁচলটি গায়ে দিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে গুটি সুটি হয়ে শুয়ে আছে পুয়ু। ডিসারী নুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ঘুমের ঘোরেই পুয়ু একবার কেঁপে উঠল, কান্না আসার মতো শোনাল তার নিশ্বাসের শব্দ। বুড়ী বলল, "এই খানটাতেই শুয়ে থাকবে?"

"থাক—" ডিসারী বলল, "যত খুশি ঘুমোক তুলিস্ না, ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে একটা ঢাকা দিয়ে দিই, বারান্দায় একটা টাটি দাঁড় করিয়ে দিই। ভয় কি, আমরা তো আছি। কার মেয়ে—কার ঘরের বউ—আহা!"

আপন মনেই ডিসারী বলতে লাগল' "সরবু সাঁওতা, সরবু সাঁওতা, এ কি হল!"

॥ একশ এক ॥

ভোরের আলো সবে ফুটছে।

ছেলেকে ভোলাতে ভোলাতে পুযু উঠে দাঁড়াল।

ডিসারী আর তাব বুড়ী ঘুমিয়ে আছে। সকলেই ঘুমচ্ছে। নতুন জীবনের সমস্যা নিয়ে ফুটে উঠছে উষা। কন্ধের একটি কথা—আমার তোতে মন নেই। তাব পব আর কি রইল? কি স্বার্থ তাব এই গাঁয়ে? লোকেরা উঠবে, ঝঞ্চাট বাডবে। কার হাত তোলায় থাকবে সে!

এক বস্তি পাখীরও বাসা আছে, পিঁপডেবও আছে আহার। তার থাকবাব ঠাঁই নেই? বাত্রির প্রতিজ্ঞা রূপ ধবে উঠল চোখেব সামনে। দেখা গেল দূব পাহাডের ভিতরে মিটিং গাঁ। বাপেব বাডিব দেওয়াল ধসে পডে গেছে, কত পুরানো লোক মবে হেজে গিযেছে। তবু আমার বলতে আছে সেই গাঁ। সেই মহাবলী পর্বত তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, সেই চম্পা ঝবনা তেমনি বযে যাচ্ছে। মানী রঘু সাঁওতা আদর করে টেনে নেবে। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক পুবুলি বুঝবে। দর্তনাব কোলে সকলেরই ভিটে আছে, কিসের ভাবনা? এই দু'দিনের জীবন তো, তার পর আবাব পরিবর্তন, এই দু' দিন কাটবে না?

ঠিক বলছিল ডিসাবী, মরণ নেই, দুঃখ নেই।

নেমে পডল পথে। তাড়াতাডি চলতে লাগল, চলে চলল। কিন্তু এ কি? এ যেন কেমন কবে উঠছে—নতুন যুগ, নতুন জগৎ, যত জোর দিয়েই ধরুক তাকে, প্রাণের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে,—ঠোঁট কেঁপে উঠছে, চোখ থেকে জল গডিয়ে গডিয়ে গাল বেয়ে মুখে এসে ঢুকছে, উদীয়-মান সূর্যের দিকে চেয়ে পুযু মনে মনে বার বার—বার বার বলছে—

জীবনে স্বাদ আছে, মরণ নেই, দুঃখ নেই।

সমাপ্ত